বাঙলার ইতিহাস

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

কথাশিল্প প্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট · কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট—খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক :

অবনীরঞ্জন রায়

কথাশিল্প প্রকাশ

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২

মুদ্রক :

সুধীরকুমার বসু

রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৪১ অনাথনাথ দেব লেন কলিকাতা ৩৭

কুড়ি টাকা

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৯৪৭।১৫ আগষ্টে দেশ বিভাগের পর পূর্ব্ব পাকিস্তানে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয় তাহাতে তথাকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের পক্ষে তথায় সসম্মানে ও নিরাপদে বাস করা অসম্ভব মনে করিয়া অনেক হিন্দু পরিবারের ন্যায় আমাদের সেন পরিবারও পূর্ব্ব পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায় মহেশপুর গ্রামে ও বগুড়া সহরে উভয় স্থানেই আমাদের বাড়ী ছিল। বগুড়ায় আমি ওকালতি করিতাম। রাজসাহীর 'বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র (Varendra Research Society) সহিত যুক্ত থাকিয়া কিছু কিছু ঐতিহাসিক গবেষণাও করিতাম। ১৯১২ খৃঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম শাখা রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক সংকৃত 'বগুড়ার ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯২২খৃঃ আমার বরেন্দ্র কাহিনী প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খৃঃ বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি আমার 'Mahasthan and its environs' প্রকাশ করেন। প্রায় এই সময়েই আমার শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বও প্রকাশিত হয়। আমার জন্ম তারিখ ১২৮৪ সালের ২১ ভাদ্র। সুতরাং আমি যখন এখানে চলিয়া আসি (১৯৫০।১৪ আগষ্ট) তখন আমার বয়স প্রায় ৭৩ বৎসর। এই বয়সে নতুন করিয়া জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করা সম্ভব নহে। সুতরাং তখন হইতেই পূর্ণ অবসর লাভ করি। অতঃপর সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের পর এই অফুরন্ত অবসর কাটাইবার জন্য, দীর্ঘকাল ঐতিহাসিক গবেষণা ও ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহার সাহায্যে কলিকাতার মাসিক পত্রিকাগুলিতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। ইহার ফলে রাজা গণেশ সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধ 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার পত্রিকায় আমার প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় তদবধি উক্ত পত্রিকায় ও পরে 'বিশ্ববাণী' পত্রিকাতে বাংলার প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে আমার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময় রাধারমণ বাবু আমাকে বাঙলাদেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিতে পুনঃ পুনঃ উদ্বুদ্ধ করেন। প্রধানতঃ সেই অনুপ্রেরণার ফলেই এই ইতিহাসখানি রচিত হয়।

প্রাচীনকালের কথা জানিবার মানুষের যে স্বাভাবিক আগ্রহ ও ভবিষ্যত

কালের মানুষকে নিজের কালের কথা জানাইবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেই আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার ফলে ইতিহাসের সৃষ্টি। ছবি আঁকিয়া, মূর্ত্তি ও মন্দির গড়িয়া অক্ষরে লিখিয়া অনাগত কালকে নিজের কালের কথা জানাইবার যে সকল উপায় প্রাচীনকাল হইতে মানুষ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে তাহাই ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। প্রাচীনকালের লোকেরা ঐরূপ কোনো না কোনো উপায়ে ইতিহাসের প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে বলিয়াই মানুষ প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারে। মানুষ অতীতের মধ্যে নিজকে দেখিতে চায় ও ভবিষ্যতকে নিজের স্পর্শ দিতে চায়। ইতিহাস মানুষের এই চিরন্তন আগ্রহ মিটাইবার প্রধান উপায়। ঐতিহাসিকের কাজ উপাদানগুলিকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নিরীক্ষা সমীক্ষার নিকষে বাছাই করিয়া লইয়া কাজে লাগান। এই গ্রন্থ রচনায় আমি যথাসাধ্য এই পন্থাই অনুসরণ করিয়াছি।

মানব সভ্যতার আদিতে পুরোহিত তন্ত্র, তৎপর ক্রমশঃ রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র; শেষে সমাজতন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে। সভ্যতার এই ক্রমবিকাশের পথে মানুষকে বহু অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা, বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আপোষ মীমাংসার মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে। জীব কেবল বিরোধের মধ্যে বাঁচিতে ও বিকাশ লাভ করিতে পারে না। যাহারা কেবল দ্বন্দ্বই জানে, মীমাংসা জানে না, পরিণামে তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়—পুরাতত্ত্বের খাতায় ইহার অনেক প্রমাণ আছে। ইতিহাস মানব জাতির এই দ্বন্দ্ব ও আপোষ লীলার সাক্ষী। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন লইয়া মানুষ। সুতরাং জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে তাহার এই সমগ্র রূপের প্রতিফলন আবশ্যক।

যাহারা ইতিহাসকে বিজ্ঞানের আসনে বসাইতে চান, তাঁহারা কার্য্যকারণ সম্পর্ক দিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান অতীতের কার্য্য ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে মানব-ইতিহাসের যে সকল গৌরবময় অধ্যায়, তাহার অনেকগুলি ঘটনাই সে ঘটাইয়াছে অতীত অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া ও প্রচলিত ব্যবস্থাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া। যুগে যুগে মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার, ভাব ও চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার ইতিহাসের মূর্ত্তিকেও সে নিজেই পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে।

বাঙলার ইতিহাস রচনায় প্রথমে বাঙলার প্রাচীন ও আধুনিক রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ভৌগোলিক অবস্থার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতঃপর বাঙালীর জাতি তত্ত্বের পরিচয় দিতে যাইয়া আমাকে মানবের উৎপত্তি, মানব

সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও আর্য্যজাতির আদি নিবাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইয়াছে। বিরুদ্ধ মতবাদ সত্ত্বেও ভারতে সরস্বতী তীরে আর্য্য সভ্যতার প্রথম বিকাশ হওয়ার পক্ষে আমি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি। মানবের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক মতবাদ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারেরা এ সম্বন্ধে অন্য এক প্রকার বিশিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে জীব ৩০ লক্ষ স্থাবর ৯ লক্ষ জলজ, ১০ লক্ষ কৃমিজ, ১১ লক্ষ পক্ষী, ২০ লক্ষ পশু ও ৪ লক্ষ বানর এই চুরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া মানবত্ব লাভ করে। যথা—

"স্থাবরা স্ত্রিংশলক্ষশ্চ জলজা নবলক্ষ কঃ।
কৃমিজা দশলক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষশ্চ পক্ষিণঃ॥
পশবো বিংশ লক্ষশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

(শব্দকল্পদ্রুমে 'যোনি' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে ধৃত 'কর্ম্মবিপাক' বচনং ও বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ)

বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস লিখিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে ভারতের ও ভারতের বাহিরের কিছু কিছু কথা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি পুরাকালের একাধিক সভ্যজাতি তাঁহাদের রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও নানা বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। বিপুলায়তন সংস্কৃত, পালি, ও দ্রাবিড় সাহিত্যে তাহার পরিচয় আছে। ঐ সকল গ্রন্থে প্রধানতঃ আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রচুর উপাদান সঞ্চিত আছে। আমরা আজিও আমাদের জীবন যাত্রা ও জীবনের বিচিত্র সমস্যাগুলির সমাধানে যে দার্শনিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করি, তাহার অনেকটাই ঐ গ্রন্থসমূহের ভাবধারায় পরিপুষ্ট। ঐ সকল গ্রন্থে ইতিহাসের উপাদান সামান্য থাকিলেও তাহা গবেষণা-সাপেক্ষ। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান কালে ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝি, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদের প্রাচীন যুগের ঐরূপ কোন ইতিহাস রাখিয়া যান নাই। ইহাকে কেহ কেহ প্রাচীন হিন্দুগণের ঐতিহাসিক চেতনার অভাব বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া লেখকের নিকট প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থের এই অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

যাহা হউক বর্ত্তমান কালের অনেক বিদেশী ও দেশী মনীষীর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণার ফলে অনেক প্রাচীন নগরী ও শিলালিপি, মুদ্রালিপি, মূর্ত্তিলিপি, মন্দিরলিপি, শাসনলিপি, স্তম্ভলিপি প্রভৃতি আবিষ্কৃত ও

লিপিগুলির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা সাধিত হওয়ায় এবং প্রাচীনকালের বিদেশী ভ্রমণকারী ও ঐতিহাসিকদের লেখা ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' প্রভৃতির ন্যায় দুই একখানি সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্য প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে। স্যার উইলিয়ম জোন্স মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকায় লিখিত 'Sandrokottus'কে "মৌর্য্য-রাজ চন্দ্রগুপ্ত" বলিয়া স্থির করায় ভারতের প্রাচীন যুগের একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখ জানা যায়। ভারত-গ্রীক (Indo-Greek) রাজগণের (২০০-২২৫ খৃঃ পূঃ) কতকগুলি মুদ্রার একদিকে গ্রীক অক্ষর ও অপর দিকে ব্রাহ্মী অথবা খরোষ্ঠী অক্ষরে রাজার নাম উৎকীর্ণ থাকায় ঐ মুদ্রাগুলির আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধারের পর ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির রহস্য ধরা পড়ে। অতঃপর ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত অশোক লিপিগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। এ সম্বন্ধে জেমস্ প্রিন্সেপ ও আলেকজাণ্ডার কানিংহামের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় (১৮৩৮ খৃঃ)।

মধ্য যুগের ইতিহাস প্রধানতঃ এদেশের হিন্দু রাজা ও সামন্তগণের সহিত বিদেশী মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী তুর্কী, পাঠান ও মোগল আক্রমণকারীদের ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ও আপোষের ইতিহাস। মুসলমান ঐতিহাসিক-গণ এই যুগের ইতিহাস বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে না হউক, তাহাদের দিক দিয়া অনেকটা ধারাবাহিক ভাবেই লিখিয়া গিয়াছেন।

নূতন যুগের ইতিহাস প্রধানতঃ ইউরোপবাসী খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ ও পর্ত্তুগীজগণের সহিত এদেশের মুসলমান ও হিন্দু শাসকগোষ্ঠীর ও পরিশেষে ইংরেজের সহিত জাগ্রত ভারতের সংঘর্ষের ইতিহাস। পাশ্চাত্ত্য জাতিরা সাধারণতঃ ইতিহাস-সজাগ জাতি। সুতরাং এই যুগের লিখিত ইতিহাসের অভাব নাই। বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরেজ শক্তি ভারতে সার্ব্বভৌম অধিকার লাভ করায়, তাহার একটি সুফল এই হয় যে সমগ্র ভারত এক সূত্রে গ্রথিত হয় এবং মধ্য যুগের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা-মুক্ত প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয়েরা মধ্য যুগের কুসংস্কার মুক্ত হইবার সুযোগ লাভ করে ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনতা স্পৃহা জাগ্রত হয় ও সমগ্র ভারত একই ভাবের ভাবুক হইয়া উঠে। সেই নূতন ভাবধারায় স্নাত হইয়া ভারতের তথা বাঙলার যেসকল লোকোত্তর মহানায়ক অষ্টাদশ হইতে বিংশ শতকের মধ্যে ভারতের এই নব চেতনায়, চিন্তায়, কর্ম্মে, সাধনায় ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়াছেন, যে সকল অকুতোভয় বিপ্লবীবীর ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, অপরিমিত

দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, বীরের ন্যায় হাসিমুখে কারাবরণ ও প্রাণদান করিয়াছেন, আর যে জাগ্রত গণদেবতা সাগর তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গায়িত হইয়া ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইতে সাহায্য করিয়াছেন, ভারতের তথা বাঙলার নূতন যুগের ইতিহাস প্রধানতঃ তাহাদেরই ইতিহাস। প্রকৃত পক্ষে সমবেতভাবে ইহারাই স্বাধীনভারতের জনক।

নূতন যুগের এই বিপ্লবের ও সংগ্রামের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া আমার অযোগ্যতা আমি পদে পদে অনুভব করিয়াছি। তথাপি বাঙলার ইতিহাসের এই অংশ না লিখিলে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এই চিন্তা করিয়াই আমি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যদিও এইরূপভাবে এই গ্রন্থে আগাগোড়াই অনেক ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে তথাপি ভবিষ্যতে যোগ্যতর ও বিজ্ঞতর ব্যক্তিগণের হস্তে বাঙলার যখন পূর্ণতর ইতিহাস রচিত হইবে তাহাতে আমার এই ত্রুটীপূর্ণ ইতিহাসখানি তাঁহাদের সামান্য উপকারে লাগিলেও আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শেষ হইলে ইহা মুদ্রিত করিবার চিন্তা আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। আমি এখানে নবাগত এবং কলিকাতার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সমাজে অপরিচিত বিশেষতঃ এখানকার প্রকাশকগণের সহিতও আমার কোন পরিচয় ছিল না। এইরূপ অবস্থায় সৌভাগ্যক্রমে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সতীন সেন ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটের 'কথাশিল্প প্রকাশ-এর শ্রীঅবনীরঞ্জন রায় মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। তজ্জন্য এই সুযোগে আমি তাহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। অবনীবাবু প্রাথমিক প্রুফগুলি ও অনেক স্থলে সম্পূর্ণ প্রুফগুলি যত্নের সহিত দেখিয়া দিয়া ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশ করা' আমি তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিষ্ণুপদ সেন আবশ্যক মত প্রুফগুলি দেখিয়া দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তজ্জন্য তাহাকেও আমি আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। অধ্যাপক নির্ম্মাল্য আচার্য্য আধুনিক সাহিত্য অংশটি দেখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পাটকপাড়ার ১৩৷এল সর্ব্ব খাঁ রোডের শ্রীসুধীরকুমার বসু মুদ্রণকার্য্যে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করায় তাঁহাকেও আমি এই অবসরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থখানি আমার দেশবাসীগণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকারে লাগিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ এই গ্রন্থের ভ্রম প্রমাদগুলি

প্রদর্শন করিলে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিব এবং ভবিষ্যত সংস্করণ সম্ভব হইলে ঐ ভ্রমগুলি সংশোধন করিব। যে সকল পূর্ব্বসূরিগণের গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি হইতে সাহায্য লইয়াছি এই সুযোগে আমি তাঁহাদিগের ঋণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। এই গ্রন্থে যে সকল গ্রন্থ ও পত্রিকাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি গ্রন্থমধ্যেই তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি একটি সংক্ষিপ্ত প্রমাণপঞ্জী ও মুদ্রণ দোষে যে সকল ভ্রম ঘটিয়াছে তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত শুদ্ধিপত্র গ্রন্থে প্রদত্ত হইল।

কলিকাতা
১৯৪৯

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

সূচীপত্র

সেন রাজবংশ

শাসন ও সংস্কৃতি

মধ্য যুগ (ক)

সুলতানী আমল

সুবাদারী আমল

মধ্য যুগ (খ) ৪৬৯—৪৯০

কোম্পানী আমল

নূতন যুগ (ক) ৪৯১—৫৪১

বৃটিশ আমল

প্রমাণপঞ্জী

বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রকাশিত

(১) গৌড় রাজমালা (২) গৌড় লেখমালা ১ম ও ৩য় খণ্ড, (৩) Indo Aryan Races, (৪) পাণিনি ; কাশিকা বিবরণী পঞ্জিকা, (৫) The Ancient Monuments of Varendra, (৬) Annual Reports and Monographs, (৭) সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম্‌।

ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ প্রকাশিত—A New History of Indian People—The Bakatak-Gupta Age

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত—

The History of Bengal Vol I & II

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত—কামরূপ শাসনাবলী।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড।

অশোক শিলালিপি—অমূল্যচরণ সেন সম্পাদিত।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত—(১) Iconography of Buddhist and Brahminical Sculptures in the Dacca Museum, (২) Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal

John Allan's Catalogue of Coins of the Gupta Dynasty and of Sasanka in British Museum, London, 1914—Catalogue of Coins in the Indian Museum, Oxford, 1906

সমুদ্রগুপ্তের নালন্দা ও গয়া শাসন—Epi. Indica (Vol XXV. 50, XXVI. 135 ;) Indian Culture X. 77, XI. 225 ; Corpus Ins. Ind. III, 254

তৃতীয় কুমার গুপ্তের ভিটারী শিলমোহর (Journal Asiatic Society of Bengal, 1889, Part I, p. 89)

Beal's Life of Hiuen Tsang ; Watter's—On Yuan Chowang's Travels in India ; Fa-Hian's Travels (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় বৌধায়ণ ধর্ম্মসূত্র ; ঋগ্বেদীয় বশিষ্ট ধর্ম্মসূত্র ; সামবেদীয় লাট্টায়ণ শ্রৌত সূত্র ; ঋগ্বেদ-সামবেদ-যজুর্ব্বেদ-অথর্ব্ববেদ সংহিতা।

বিনয় পিটক (মহাবোধি সোসাইটি)

বিপুলশ্রী মিত্রের নালন্দা শাসন—(Epi. Indica Vol XXI, p. 97)

কাম্বোজ রাজ নয়পালদেবের ইত্রা শাসন (Epigraphia Indica Vol XXII, p. 150)

অর্থশাস্ত্র—শ্যাম শাস্ত্রী সম্পাদিত (১৯০৯)

J. W. Mc.Crindle—The Invasion of India by Alexander the Great as described by Arrian, Curtius, DeoDorus, Plutarch, and Justine (1896)

মিনহাজ-ই- সিরাজ—তাবাকাত-ই-নাশেরী (রেভার্টির ইংরাজী অনুবাদ)

ইলিয়ট ও ডসন সম্পাদিত—History of Mahomedan India as told by its own Historian

(হাসান নিজামির তাজউল মাছির, জিয়াউদ্দিন বার্ণির তারিখ-ই-ফিরোজসাহি, আব্বাছ সওয়ানির তারিখ-ই-শেরসাহি।)

নিজামউদ্দিন আহম্মদ—তবকাৎ-ই-আকবরী

আবুল ফজল আল্লামি—আইন-ই-আকবরী (জ্যারেটের ইংরাজী অনুবাদ); আকবরনামা—(বিভারিজের ইংরাজী অনুবাদ)

ফিরিস্তা—(ব্রিগসের ইংরাজী অনুবাদ)

সাদিক মুস্তাদখাঁর তারিখ-ই-আলমগিরি (যদুনাথ সরকারের ইংরাজী অনুবাদ)

ইউসফ আলির আওয়াল-ই-মহব্বৎজঙ্গ (আলিবর্দ্দী খাঁ)

গুলাম হোসেন তাবাৎ বাই—সায়র উল মুতাক্ষরীণ রেমণ্ড (মুস্তাফা)র ইংরাজী অনুবাদ

সলিমুল্লার—তারিখ-ই-বাংলা (গ্লাডউইনের ইংরেজী অনুবাদ)

গুলাম হুসেন সলিম—রিয়াস্ উস্ সালাতিন

সিতাব খাঁ (মীর্জ্জা নাথন)—বাহারীস্তান ঘাইবী (ডাঃ বোরার ইংরাজী অনুবাদ)

ইবন বতুতার ভ্রমণ কাহিনী—(ব্রডওয়ের ইংরাজী অনুবাদ)

আব্দুল লতিফের ভ্রমণ—(যদুনাথ সরকারের ইংরাজী)

C. R. Wilson—Early Annals of the English in Bengal (1895-1917)

Hedges' Diary Ed. by Yulu

S. C. Hill—Bengal 1756-57

Rev. Long's—Selection from Unpublished Records (1748-67)

W. H. Carey—The Good old Days of John Company
(1600-1848)

J. A. Holwell—Interesting Historical Events

M. E. M. Jones—Warren Hastings in Bengal 1772-74

N. N. Ghosh—Memoirs of Maharaja Nabakisen

Report of the Archeological Survey of India

ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী, প্রবর্ত্তক, বিশ্ববাণী, শ্রীভারতী, উদয়ন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, আনন্দবাজার, যুগবাণী, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকা

পাহাড়পুরের তাম্র শাসন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৯ । ১৩৯ পৃঃ)

The Origin of Man—Mikhail Nesturkh (1958)

R. M. Martin's—The History, Antiquities, Topography and
Statistics of Eastern India—3 Vols
(London 1838)

Fifth Report—Edited by Firmingum

Ralph Fitch's Travels—Edited by Rigby

বঙ্গবাসী সংস্করণ—(১) রামায়ণ (২) মহাভারত (৩) হরিবংশ (৪) পুরাণসমূহ

সংক্ষিপ্ত

I. C.—Indian Culture, Calcutta

D. U. S.—Dacca University Studies

I. M. P.—Inscription Madras Presidency

S. I. I.—South Indian Inscription

E. I.—Epigraphia Indica

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৩	২৩	বোগাসকুই	বেহিস্তান
৪৫	৭	গৃহীসূত্রের	শ্রৌতসূত্রের
	২৯	র্যতী	র্য্যাত্যা
৭৬	৬	খৃঃ পূঃ ৪র্থ	খৃঃ পূ প্রথম
৮১	১৬	এন্টিয়োকস	এন্টিয়োকস (৩য়)
	১৮	ঐ	এন্টিয়োকস (১ম)
৯৬	৪	সজ্জিত	লজ্জিত
১০৭	২৬	গোপীচন্দ্র	গোপচন্দ্র
১৫৩	২৮	৯৮৮	৯৬২
১৫৭	২৩	বিগ্রহপাল	প্রথম নয়পাল
১৬৯	৮	S. H	Sii
১৭৬	২৩	রামপাল	রাসপাল
১৮৬	২৮	১১০৯	১১৬৯
২১১	১৮	হীনযানীদের	মহাযানীদের
২১৮	২৩	জৈন মুনীশ্বর	ফণীশ্বর
২৫৫	৩	তুরমতি	আমিন
২৯১	২৫	বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।২

৩৩৬ পৃষ্ঠার পর ১৬টি পৃষ্ঠার পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৩৩—৩৪৮এর পরিবর্তে ৩৩৭—৩৫২ হইবে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬৬	৩০	১৬৯৭	১৬৯০
৩৬৭	৪	১৬৯৭	১৬৯০
৪৬৬	৮	যুগয়ো	মৃণয়ো
৪৬৭	১৭	দদিধতি	দিধীতি
৪৬৮	১৫	জটিব্যাখ্যা	পটিব্যাখ্যা
	২২	বৌদ্ধ	বৈদ্য
৪৬৯	১৮	মহারাজ চাঁদ	মহাতাপচাঁদ

ভৌগোলিক পরিচয়

ইংরাজ আমলে বর্দ্ধমান বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, এই পাঁচটি বিভাগ লইয়া গঠিত দেশকে বাঙলাদেশ বলা হইত। কিন্তু প্রাচীন কালে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগ সম্পূর্ণ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের চব্বিশ পরগণা, যশোহর ও খুলনা জেলা লইয়া যে ভূভাগ, মোটামুটি তাহাই বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। তৎকালে বর্দ্ধমান বিভাগ সম্পূর্ণ ও মুর্শিদাবাদ জেলার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত তাহা রাঢ় দেশ এবং রাজসাহী বিভাগ ও নদীয়া জেলা সম্পূর্ণ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার যে অংশ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, মোটামুটি সেই ভূভাগ বরেন্দ্র দেশ বলিয়া গণ্য হইত। আরও প্রাচীনকালে রাঢ় দেশের নাম সুহ্মদেশ ও বরেন্দ্র দেশের নাম পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র দেশ ছিল এবং বঙ্গদেশ কখনও বঙ্গাল, কখনও সমতট, কখনও বা হরিকেল নামেও কথিত হইত। রাঢ় ও বরেন্দ্র একত্র গৌড়দেশ নামেও অভিহিত হইত।

রাজা টোডরমল্ল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আকবরের আদেশে 'আসল তুমার জমা' নামে যে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহাতেই সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গদেশকে একত্র 'সুবে বাঙলা' নামে উল্লেখ করা হয় এবং তদবধি এই নামই প্রচলিত হইয়া যায়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই সুবে বাঙলার দেওয়ানী লাভ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরাজ সরকার ঐ নাম বহাল রাখেন এবং পরে উহাই প্রথমতঃ ইংরাজী ভাষায় বেঙ্গল ও পরে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী এবং বাঙলাভাষায় বাঙলা বা বঙ্গদেশ নামে পরিচিত হইতে থাকে।

এই প্রদেশের উত্তরে পর্ব্বতরাজ হিমালয়; পশ্চিম সীমান্তে পার্ব্বত্য নেপাল রাজ্য, বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জেলা, ভাগলপুর জেলা ও ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যা প্রদেশের পর্ব্বতময় ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল ও বালেশ্বর জেলা; পূর্ব্ব সীমান্তে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা এবং গারো, জয়ন্তিয়া ও খাসিয়া পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং মণিপুর, লুসাই, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতশ্রেণীর অপর পারে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ সীমান্তে সুদূরপ্রসারী বঙ্গোপসাগর।

নেপাল যুদ্ধের অবসানে (১৮১৬ খৃঃ) গুর্খাগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত

তরাই অঞ্চল ইংরাজগণ নেপালের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বাধিকারী সিকিমরাজকে প্রদান করে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ইংরাজ সরকার মনোরম দার্জ্জিলিং অঞ্চল বার্ষিক বৃত্তির বিনিময়ে সিকিমরাজের নিকট হইতে গ্রহণ করে। ১৮৫০ খৃঃ ডাঃ হুকার ও দার্জ্জিলিং-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ ক্যাম্বেল বাণিজ্যপথের সন্ধানে সিকিমরাজ্যে গমন করিলে সিকিমরাজ তাঁহাদিগকে বন্দী করেন। ইহাতে ইংরাজের সহিত সিকিম রাজ্যের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের ফলে দার্জ্জিলিং ও তরাই প্রদেশ ইংরাজ অধিকারে আসে এবং সিকিমের মধ্য দিয়া তিব্বতের সহিত ইংরাজের বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত হয়। ১৮৬৪ খৃঃ ভুটান যুদ্ধের ফলে দুয়ারের কালিম্পং প্রভৃতি পশ্চিমাংশ দার্জ্জিলিং-এর সহিত যুক্ত হইয়া বর্ত্তমান দার্জ্জিলিং জেলার এবং দুয়ারের দক্ষিণাংশ ও রঙ্গপুর জেলার কতকাংশ দ্বারা ১৮৬৯ খৃঃ জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি হয়। দুয়ারের পূর্ব্বাংশ আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।[১]

দার্জ্জিলিং জেলা হিমালয়ের দার্জ্জিলিং পাহাড়ের উপর অবস্থিত। উহা সমুদ্রবক্ষ হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চ। সিঞ্চল, কালিম্পং, টাইগার হিল নামক শৃঙ্গগুলি উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের পাদদেশস্থ শিলিগুড়ি হইতে রেলপথ পাহাড়ের গায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়াছে। উভয় পার্শ্বের দৃশ্য অতীব মনোরম। এখানে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস। ইহার উত্তরে সিকিম ও ভোটরাজ্য। পশ্চিমে সিঙ্গুলিয়া পাহাড় এই জেলাকে নেপাল রাজ্য হইতে পৃথক করিয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরে ভোট রাজ্য। এই জেলার উত্তরে সিঞ্চুলা পাহাড় ৪০০০ হইতে ৬০০০ ফিট উচ্চ। উত্তরের এই পাহাড় হইতে ভোটরাজ্যের পর্ব্বতশ্রেণী সুন্দর দেখায়। এই জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমার বক্সার নামক স্থানে সেনানিবাস ছিল। ইহা সমুদ্রবক্ষ হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। এখান হইতে ভোটদেশে যাইবার একটি গিরিপথ আছে। এই গিরিপথ ধরিয়া ভুটানের মধ্য দিয়া তিব্বতে এবং তথা হইতে মধ্য এশিয়া পর্য্যন্ত একটি বাণিজ্যপথ আছে। এই জেলার অধিকাংশ অধিবাসী কোচ ও মেচ জাতীয়।

যেখানে পূর্ব্ববাহিনী গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া বাঙলা দেশে মালদহ জেলায়

১। ১৮১৩ খৃঃ পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার কতকাংশ লইয়া মালদহ জেলা, ১৮২১ খৃঃ রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কতকাংশ লইয়া বগুড়া জেলা ও ১৮২৯ খৃঃ রাজশাহী ও যশোহর জেলার কতকাংশ লইয়া পাবনা জেলার সৃষ্টি হয়।

প্রবেশ করিয়াছে, তথায় গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ভাগলপুর জেলার সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত রাজমহল অঞ্চল অবস্থিত। রাজমহল পাহাড়-শ্রেণী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড শৈলমালায় পরিপূর্ণ ছোটনাগপুরের পর্ব্বতমালা অবস্থিত। এই পর্ব্বতমালার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলায় পরেশনাথ নামক শৈলশৃঙ্গ অবস্থিত। ইহার অপর নাম সমেতশিখর। ইহার শীর্ষদেশে প্রসিদ্ধ জৈন-তীর্থঙ্কর পরেশনাথ দেবের মন্দির অবস্থিত। সাঁওতাল, কোল, হো প্রভৃতি জাতি এখানকার প্রধান অধিবাসী। ইহারা নিজদিগকে 'হড়' জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। যে ভাষায় ইহারা কথা বলে তাহার নাম হড় বা রড় ভাষা। সমগ্র সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরে হড়জাতির বাস।

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা প্রদেশের ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল। উড়িষ্যায় সমুদ্রতীর ব্যতীত প্রায় সমুদয় স্থানই পর্ব্বতময়। ময়ূরভঞ্জে নীলগিরি ও উড়িষ্যার অন্যত্র উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মেঘাশনি, দক্ষিণ-পূর্ব্বে খণ্ডগিরি ও মধ্যস্থলে উদয়গিরি প্রধান। এখানেও সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি হড় জাতীয় মানুষের সংখ্যা অনেক। রাজমহল ও ছোটনাগপুরের পর্ব্বতমালা প্রকৃত পক্ষে মধ্যভারতের বিন্ধ্য পর্ব্বত-মালার পূর্ব্বাংশ এবং উড়িষ্যার পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার উত্তর-পূর্ব্বাংশ।

বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছোটনাগপুর বিভাগ, এবং ছোটনাগপুরের পর্ব্বতশ্রেণী এই সীমান্ত জুড়িয়া অবস্থিত। বীরভূম জেলার[১] বীরভূম ও সেনভূম, বর্দ্ধমান জেলার অজয় নদের দক্ষিণ তীরস্থ গোপভূম, বাঁকুড়া জেলার[২] শেখরভূম (সেরগড়), সামন্তভূম, ধলভূম, তুঙ্গভূম ও মল্লভূমের এবং মেদিনীপুর জেলার উত্তর ভাগের ব্রাহ্মণভূম ও বাঙলার বাহিরে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে সিংভূম ও ভঞ্জভূমের সামন্ত রাজগণ সেকালে গৌড় দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমার প্রহরীর কার্য্য করিতেন। মানভূম জেলার পঞ্চকোট রাজ্য ও মল্লভূমের (বিষ্ণুপুর) মল্লরাজগণ তুর্কীদের আমলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ভাগের জঙ্গলময় ভূ-ভাগকে ঝাড়খণ্ড বলিত। ঝাড়খণ্ড

১। ১৭৯৩ খৃঃ বর্দ্ধমান জেলা হইতে পৃথক হইয়া বীরভূম স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়।

২। ১৮৩৫-৩৬ খৃঃ বর্দ্ধমান জেলা হইতে পৃথক হইয়া বাঁকুড়া ও ১৭৯৫ খৃঃ হুগলী জেলার সৃষ্টি হয়।

ও ছোটনাগপুরের পাহাড়িয়াগণের আক্রমণ রোধার্থ শের শাহের সময় বীরভূম জমিদারী সৃষ্ট হয়।

গঙ্গার উত্তর তটভূমি বহু নদনদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকায় এবং দক্ষিণ তীরে গঙ্গা ও শোণ (হিরণ্য বাহু) সঙ্গমে পরাক্রান্ত মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্র অবস্থিত থাকায় প্রাচীন কালে গঙ্গার উত্তর তীরে কোন সামরিক পথ গড়িয়া উঠে নাই। গঙ্গার দক্ষিণ তটে অরণ্যসঙ্কুল দুর্ভেদ্য বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা কাম্বে উপসাগর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত প্রায় ১০০০ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। প্রয়াগের (এলাহাবাদ) নিকট এই পর্ব্বতশ্রেণী হইতে গঙ্গার দূরত্ব প্রায় ৫০ মাইল। মুঙ্গেরের নিকটস্থ উহার একাংশ যাহা মুদ্গগিরি বা খড়্গপুরের পর্ব্বতশ্রেণী নামে পরিচিত, তথা হইতে গঙ্গার দূরত্ব পাঁচ মাইল। কিন্তু রাজমহলের পর্ব্বতমালা হইতে গঙ্গার এই দূরত্ব প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

এই বিশাল বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার অন্তর্গত ভাংরার (Bhanrer) পর্ব্বতশ্রেণী ও কাইমুর পর্ব্বতশ্রেণী হইতে রাজমহল পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিন্ধ্য পর্ব্বত ও পরেশনাথ পাহাড় হইতে দেওমুণ্ডী পাহাড় পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতশ্রেণী। এই দেওমুণ্ডী পাহাড় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার মহাদেব পাহাড় পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-খণ্ড সেকালে হিংস্র জন্তু, দুর্দ্দান্ত আদিবাসী মানব, নিবিড় অরণ্যানী ও দুর্ভেদ্য পর্ব্বতমালায় পরিব্যাপ্ত থাকায় তৎকালে ভারতের এই অংশের মধ্য দিয়া কোন বৃহৎ বাহিনীর পক্ষে অভিযান করা সম্ভব ছিল না। তজ্জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে যে সকল আক্রমণকারী গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-কলিঙ্গ ও আরও দক্ষিণে অভিযানের সঙ্কল্প করিতেন তাঁহাদিগকে এলাহাবাদের নিকট গঙ্গা পার হইয়া গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিয়া অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহ অথবা পরবর্ত্তীকালের পাটলীপুত্র অধিকার করিতে হইত, এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া নববলে বলীয়ান হইয়া অগ্রসর হইলে প্রথমতঃ মুঙ্গেরের পর্ব্বতমালা এবং পরে রাজমহলের পর্ব্বতমালা তাঁহাদের গতিরোধ করিত। তজ্জন্য বহুকাল যাবৎ এই রাজমহল গৌড়ের প্রবেশদ্বার বলিয়া গণ্য ছিল। রাজমহলের সিক্রীগলির মুখে তেলিয়াগড়ী দুর্গের চিহ্ন অদ্যপি দৃষ্ট হয়। একদিকে সুবিস্তৃতা খরবাহিনী গঙ্গা, অন্যদিকে তাহারই অদূরে রাজমহলের পর্ব্বতমালা; এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ পথ প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুরও ভীতি উৎপাদন করিত। যে যুগে উন্নত ধরনের কামান ও বিস্ফোরক-পদার্থের অভাব ছিল, তখন এই স্থানের যে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তৎকালে, মুর্শিদাবাদ জেলার সূতী নামক স্থান হইতে উত্তর-পশ্চিমে রাজমহল, মুঙ্গের ও পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত

একটি রাজপথ ছিল। এই পথের রাজমহলের নিকট পরবর্ত্তীকালে গৌড়েশ্বর মহম্মদ শাহ, ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ রণপণ্ডিত শের শাহকে বাধা দিয়াছিলেন। শূরবংশের শেষ রাজা আদিল শাহ এইখানেই সুরযগড়ের যুদ্ধে (১৫৬৪ খৃঃ) রাজ্য হারাইয়াছিলেন। শেষ পাঠানরাজ দায়ুদশাহ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মোগল বাহিনীর সহিত এইখানে যুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছিলেন। শাহসুজা আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বাঙলায় পলায়ন কালে প্রথমতঃ মুঙ্গের, তৎপর সাহেবগঞ্জের পথে এবং তৎপর সিক্রীগলিতে মীরজুমলার সেনাদলের পথ রোধের ব্যর্থপ্রয়াস করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার এই অংশ অধিক উচ্চ না হওয়ায় শের শাহ ও মীরজুমলার ন্যায় বিচক্ষণ ও দুর্দ্ধর্ষ সেনানায়কের পক্ষে এই দ্বার অতিক্রম করা অসম্ভব হয় নাই।

মিনহাজউদ্দিনের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' (১২৪৩ খৃঃ)-তে লিখিত আছে যে, গঙ্গার দুই ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুইটি বিভাগ ছিল। পশ্চিম ভাগের নাম 'রাল' (রাঢ়)। ইহার রাজধানীর নাম 'নগর' (বীরভূম জেলার রাজনগর)। পূর্ব্ব-ভাগের নাম 'বরিন্দ' (বরেন্দ্র)। ইহার প্রধান নগর 'দেবকোট'। লক্ষ্মণাবতী হইতে নগরের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত ও অপর দিকে দেবকোট পর্য্যন্ত একটি পুরাতন রাস্তা ছিল। তাহা বর্ষাকালে জলমগ্ন হইত বলিয়া লক্ষ্মণাবতীর তুর্কী মালিক সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইয়জ (১২১১-১৬ খৃঃ) এই পথটিকে উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই রাজপথ অতিক্রম করিতে সেকালে দশদিন সময় লাগিত। ১৭৮১ খৃঃ অঙ্কিত রেনেলের ২নং মানচিত্রে এই রাস্তাটি স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। বর্ত্তমানে গৌড় নামে পরিচিত ভূ-খণ্ডের দক্ষিণ সীমা হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণে সুতীর নিকট গঙ্গা পার হইয়া এই রাস্তাটি পশ্চিম দিকে বীরভূম জেলায় প্রবেশ করিয়া জেলাটিকে প্রায় দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে এবং ময়ূরাক্ষী (মোর) নদী অতিক্রম করিয়া ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'রাজনগরে' পৌঁছিয়াছে। গৌড় হইতে এই রাজনগরের দূরত্ব প্রায় ৯০ মাইল ও দেবকোটের দূরত্ব প্রায় ৫০ মাইল।

রেনেলের ৭নং মানচিত্রে দৃষ্ট হয় যে একটি রাস্তা রাজনগর হইতে দক্ষিণমুখী হইয়া অজয় অতিক্রম করতঃ দামোদর নদের তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই স্থানে রাস্তাটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক শাখা দামোদর পার হইয়া বাঁকুড়া জেলার ছাতনা[১] দিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। অপর শাখা দামোদরের

১। ছাতনায় কবি বড়ু চণ্ডিদাসের বাশুলী মন্দির এবং বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে রাজা চন্দ্রবর্ম্মার শিলালিপি আছে।

উত্তর তীর দিয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখার একটি প্রশাখা নওপাড়া হইতে দক্ষিণে দামোদর পার হইয়া বাঁকুড়া জেলায় বীর হাম্বিরের ঘন অরণ্য বেষ্টিত বিষ্ণুপুর রাজ্যে গিয়াছে। তথা হইতে আরও দক্ষিণে মেদিনীপুরে প্রথমোক্ত শাখার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণে জলেশ্বর ও তথা হইতে সুবর্ণরেখা পার হইয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়াছে। রাজা টোডরমল্লের 'আসল তুমার জমা'য় মেদিনীপুর ও হিজলি উড়িষ্যার পাঁচটি সরকারের অন্যতম সরকার রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে যে সকল আক্রমণকারী গৌড়বঙ্গ হইতে দক্ষিণে ওড্র-কলিঙ্গাদি দক্ষিণ দেশ আক্রমণ করিত, কিংবা দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চল হইতে গৌড়বঙ্গ বিজয়ে প্রবৃত্ত হইত তাহাদিগকে এই মেদিনীপুর পথেই অগ্রসর হইতে হইত।

রেনেলের ৫নং মানচিত্রে দৃষ্ট হয়, একটি রাস্তা লক্ষ্মণাবতী হইতে আরম্ভ করিয়া দিনাজপুর জেলার দেবকোট সহরে, তথা হইতে রঙ্গপুর হইয়া কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়া আসামের গোয়ালপাড়া জেলার রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত গিয়াছে। তৎপর পূর্ব্বমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়া দুইটি পাহাড়ের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তরমুখী হইয়া বিজণীতে পৌছিয়াছে। তৎপর বর্ত্তমান আমিনগাঁও রেলষ্টেশনের ৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী পুষ্পভদ্রার পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত গমন করতঃ তথায় একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু[১] পার হইয়া পার্ব্বত্য ভোটরাজ্যের মধ্য দিয়া তিব্বতের দিকে গিয়াছে।

এই রাস্তার দক্ষিণে অপর একটি রাস্তা লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) হইতে পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ নিশানপুর, বক্সীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় করতোয়া পার হইয়া উলিপুরের মধ্য দিয়া কুড়িগ্রামে প্রথমোক্ত রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই দ্বিতীয় রাস্তার নিশানপুর হইতে অপর একটি রাস্তা আরও দক্ষিণে মহাস্থান-গড়ের প্রায় দুই মাইল উত্তরে শিবগঞ্জের নিকট করতোয়া পার হইয়া উত্তরে গোবিন্দগঞ্জ ও বর্দ্ধনকুঠীর মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া গমন করতঃ কিছুদূরে দ্বিতীয় রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া রাঙ্গামাটির দিকে গিয়াছে।

একদিকে বিশালকায় ব্রহ্মপুত্র নদ, অপরদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালা ও দুর্ভেদ্য

১। ১৮৫১ খৃঃ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় মেজর হেনে ২১টি ফাঁক যুক্ত এই সেতুটির বিবরণ দিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে এই সেতুটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

জঙ্গল, এই উভয়ের মধ্যস্থিত (গোয়ালপাড়া জেলার) সুরক্ষিত রাঙ্গামাটি সহর সেকালের কামরূপের প্রবেশদ্বার রূপে পরিগণিত হইত। বুকানন হ্যামিলটন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এই শহরটির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন— "কথিত আছে পূর্ব্ব-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি সহর ছয় মাইল বিস্তৃত ছিল এবং এখানে ৫২টি বাজার বসিত। বর্ত্তমান কালে এখানে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে" (Martin's Eastern India Vol III p 472)। সম্ভবতঃ এই রাঙ্গামাটির পথেই ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে হোসেন শাহ ও মীরজুমলার আসাম আক্রমণ এই পথেই পরিচালিত হইয়াছিল। শের শাহের সময় সুবর্ণগ্রাম হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হয় তাহা এখন গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামে সুপরিচিত।

মোগল আমলে সুবে বাঙলার উত্তর ভাগ ঘোড়াঘাট, পাঞ্জরা, তাজপুর ও পূর্ণিয়া এই চারিটি সরকারে বিভক্ত ছিল। কোচ, মেচ, গারো প্রভৃতি জাতি এই ভূভাগের প্রধান অধিবাসী। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে পাঠান আমলে সরকার ঘোড়াঘাটের (মোটামুটি বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলা) উত্তরে কমতাপুর রাজ্য স্বাধীন ও পরাক্রমশালী ছিল। পরে ঐ রাজ্যের এলাকা লইয়া কোচবিহার ও কোচহাজো রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সুবে বাঙলার পূর্ব্ব সীমান্তে দুইটি প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। গারো, জয়ন্তিয়া, খাসিয়া ও কাছাড়ের পর্ব্বতগুলি প্রথম শ্রেণীর, ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকান পর্ব্বতমালা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব্বে লুসাই পাহাড়। তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ। উত্তর পূর্ব্বের পাতকই, নাগা পাহাড় ও মণিপুরের পাহাড় এবং মিসমি, মিকির, খামতি ও দফাবুল পাহাড় আসামের অন্তর্ভুক্ত। আসামের খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে শিলং পাহাড়ের উচ্চতা ৬৫০০ ফিট। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা পূর্ব্বে ত্রিপুরার মাণিক্য রাজগণের শাসনাধীন ছিল। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি চক্রে বিভক্ত ছিল: (১) চক্‌মা চক্র। ইহা উত্তরভাগে অবস্থিত। এখানে প্রধানতঃ চকমা জাতীয় বৌদ্ধগণের বাস। ইহা চকমা রাজার শাসনাধীন ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গামাটি কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। (২) মঙ চক্র। ইহা উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। এখানে প্রধানতঃ টিপরাজাতির বাস। ইহা মঙ জাতীয় মঙরাজের শাসনাধীন ছিল। রাজধানী মাণিকছড়ি। (৩) ভোমং চক্র। ইহা এই অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগ। মগেরা ইহার প্রধান অধিবাসী। ইহা ভোমংরাজের শাসনাধীন ছিল। রাজধানী বন্দরবন সঙ্গু নদীর তীরে অবস্থিত।

বাঙলার পূর্ব্ব সীমান্তের এই স্বাধীন পাহাড়ীয়া অঞ্চলগুলির পশ্চিম ভূভাগ মোগল আমলে সোনার গাঁ, বাজুহা ও ঘোড়াঘাট এই তিনটি সরকারে বিভক্ত ছিল। ত্রিপুরার রাজগণ বাঙলার এই পূর্ব্ব সীমান্তে প্রহরীর কাজ করিত। ত্রিপুরার রাজগণকে ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তের বাকলা চন্দ্রদ্বীপের ও ভুলুয়ার রাজগণকে আরাকানের মগদিগের সহিত সঙ্ঘর্ষের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণকে ফিরিঙ্গি (পর্ত্তুগীজ) জলদস্যুদের সহিতও যুদ্ধ করিতে হইত।

উত্তর সীমায় কমতাপুরের খেন রাজগণ[১] ও পরে কোচবিহার ও কোচহাজের রাজগণকে আসামের আহম্‌দের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। তথাপি আহমেরা জলপথে ব্রহ্মপুত্র দিয়া দক্ষিণে ফতেহাবাদ (ফরিদপুর) পর্য্যন্ত আসিয়া এবং মগেরা মেঘনা দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করিত। হিন্দুরাজগণ বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া এবং জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় সুবেদার ইছলাম খাঁ ঢাকায় (জাহাঙ্গীর নগরে) রাজধানী করিয়া পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতঃ ঐ সকল অত্যাচার অনেকাংশে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী হইতে একটি রাস্তা মুর্শিদাবাদ, পলাশী, অগ্রদ্বীপ দিয়া ভাগীরথী পার হইয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়াছে, এবং অপর একটি রাস্তা পদ্মার দক্ষিণ তীর দিয়া ফতেহাবাদ (ফরিদপুর) পর্য্যন্ত যাইয়া পদ্মা উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর একটি রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে সালিমাবাদ, হুগলী, যশোহর, ভূষণা ও ফতেহাবাদ দিয়া লাক্ষা ও ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপর একটি রাস্তা বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ হইতে মহাস্থানগড়, বগুড়া সেরপুর ও সাজাতপুর হইয়া পূর্ব্বোক্ত রাস্তার সহিত সংযুক্ত ছিল।

বাঙলা একটি নদীমাতৃক দেশ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপনদী ও শাখানদী সমূহ দ্বারা সমগ্র বাঙলা দেশ পরিব্যাপ্ত। তাহাদের ভিত্তিতেই প্রাচীন, এমন কি আধুনিক কালেও বাঙলার রাজনৈতিক বিভাগগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

১। এখানে খেন জাতীয় রাজা নীলধ্বজ, তৎপুত্র রাজা চক্রধ্বজ, তৎপুত্র রাজা নীলাম্বর রাজত্ব করেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে রাজা নীলধ্বজ (১৪৫০-৬০ খৃঃ ?) কমতাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

গঙ্গা এবং তাহার উপনদী ও শাখানদী

গঙ্গা নদী মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট ভাগীরথী নাম ধারণ করতঃ প্রাচীন গৌড়পুরের পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। জাও-ডি-ব্যারোসের (১৫৫০ খৃঃ) নক্সায় 'গোরিস' (Goris) নামে এবং গ্যাস্টালডির (Gastaldi) নক্সায় (১৫৬১ খৃঃ) 'গৌড়' (Gour) নামে যে স্থানটির উল্লেখ আছে তাহাকে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই দেখান হইয়াছে। এই স্থানটিকেই প্রাচীন গৌড়পুব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের পাণিনি ব্যাকরণে এই গৌড়পুরের উল্লেখ আছে (পাণিনি ৬।২।১০০)। ভাগীরথীর সেই পুরাতন নালার চিহ্ন ভাগীরথী নামে এখনও দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে ভাগীরথী পশ্চিমে ও দক্ষিণে সরিয়া গিয়া তদবধি উহা বর্ত্তমান খাতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা এক্ষণে বহরমপুর শহরের পশ্চিম, কাটোয়া, নবদ্বীপ, হুগলী ও হাওড়ার পূর্ব্ব ও কলিকাতার পশ্চিম দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। হুগলী হইতে সাগর পর্য্যন্ত ইহা হুগলী নদী নামে পরিচিত। সেকালে হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম (সাতগাঁ) ও পরে হুগলী শহর ভাগীরথীর তীরে প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ, কংশাবতী ভাগীরথীর প্রধান উপনদী। ইহারা ছোটনাগপুর ও রাজমহলের পর্ব্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। সুবর্ণরেখা নদী ছোটনাগপুর পর্ব্বতশ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। সপ্তগ্রামের নিকটে ত্রিবেণীতে ভাগীরথীর সরস্বতী ও যমুনা নামক দুইটি শাখানদী বাহির হইয়া সাগরে পড়িয়াছে। ইহা মুক্তবেণী ও দক্ষিণ প্রয়াগ নামে খ্যাত। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার তীর্থতত্ত্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

একটি উপাখ্যানে বলা হয় যে গঙ্গা হিমালয় ও মেনকার প্রথমা কন্যা। দেবগণের চেষ্টায় মহাদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার অদর্শনে শোকা-ভিভূতা মেনকা ইঁহাকে জলরূপী হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। তৎপর গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিতে থাকে। পরে ভগীরথ ইঁহাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন।

পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে যে একদা দেবর্ষি নারদের গান গাহিবার দোষে রাগ-রাগিণী বিকলাঙ্গ হইলে নারদ মহাদেবের নিকট প্রতিকারার্থ গমন করেন। মহাদেব বলিলেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শ্রোতা হইলে তিনি সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া উহার প্রতিকার করিতে পারেন। নারদের অশেষ সাধনায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শ্রোতা রূপে মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইলে মহাদেব সঙ্গীত আরম্ভ করেন। তাহাতে

কিছুকাল মধ্যেই রাগ-রাগিণীগণ সুস্থ দেহ লাভ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহাদেবের গানের মর্ম্ম ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বিষ্ণু বুঝিতে পারিয়া দ্রবীভূত হইয়া গেলেন এবং ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডলুতে সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুকে গ্রহণ করিলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত হন। কঠোর তপশ্চরণে ভগীরথ ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার কমণ্ডলু হইতে গঙ্গাকে বাহির করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে পতনকালে মহাদেব গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। তথা হইতে গঙ্গা বিন্দুসরোবরে পতিত হন। তৎপর তিনি সপ্তধারায় প্রবাহিত হন। তন্মধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামক তিনটি ধারা পূর্ব্বদিকে; সীতা, সিন্ধু ও কুচক্ষু নামক তিনটি ধারা পশ্চিম দিকে গমন করে। কেবল এক ধারা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভাগীরথী নামে প্রবাহিত হয়। ঐরাবৎ ইঁহার গতি রোধে অগ্রসর হইলে ইনি ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া যান। হিমালয়ের গোমুখী নামক স্থানে ইনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। পথে জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিলে জহ্নুমুনি ইঁহাকে উদরস্থ করেন। কিন্তু ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় জানু বিদীর্ণ করিয়া ভাগীরথীকে বাহির করিয়া দেন, এবং গঙ্গা জাহ্নবী নামে পরিচিতা হন।

প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে গাড়োয়াল প্রদেশে হিমালয়ের একটি তুষারগুহায় উৎপন্ন হইয়া ৮ মাইল প্রবাহিত হইবার পর গঙ্গোত্রী নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে। অতঃপর ইহার গতিপথে জাহ্নবী ও অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা নাম ধারণ করে। মিলনের পূর্ব্বে ইহার নাম ভাগীরথী। এই মিলন স্থানের নাম দেবপ্রয়াগ। তথা হইতে গঙ্গা সুখী নামক স্থানে হিমালয় ভেদ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া হরিদ্বারে উপনীত হয়। অতঃপর বক্র গতিতে দেরাতুন, সাহারানপুর হইয়া ফরাক্কাবাদে রামগঙ্গার সহিত মিলিত হয়। তৎপর প্রয়াগে (এলাহাবাদে) যমুনা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতীকে গ্রহণ করিয়া বারাণসী হইয়া রাজমহল ও গৌড়ে উপনীত হয়। জলঙ্গী পদ্মার একটি শাখা নদী। ইহা মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার মধ্য দিয়া নবদ্বীপের নিকট গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

কালক্রমে ভাগীরথীর গতিপথে পলি পড়িয়া উচ্চ হওয়ায় মুর্শিদাবাদ জেলার সূতী হইতে ভাগীরথীর অধিকাংশ জলরাশি পূর্ব্বদিকে (গঙ্গার পুরাতন শাখা) পদ্মার খালে প্রবাহিত হইয়া পদ্মাকে প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বে এই প্রবলতর পদ্মাকে বড়গঙ্গা বলা হইত। এই বড়গঙ্গা বা পদ্মা উত্তরকূলে মালদহ, রাজশাহী, ও পাবনা জেলা ও দক্ষিণকূলে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলাকে রাখিয়া পাবনা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও ফরিদপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে

গোয়ালন্দের নিকট (ব্রহ্মপুত্রের শাখা) যমুনার সহিত মিলিত হইয়া তথা হইতে এই মিলিত নদী ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার মধ্য-সীমা নির্দ্ধারণ করতঃ দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়। তৎপর ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নাগা ও মণিপুরের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আগত সুর্মা ও বরাক নদীর মিলনে গঠিত মেঘনা নদীর সহিত মিলিত হইয়া মেঘনা নাম ধারণপূর্ব্বক বাখরগঞ্জ জেলার পূর্ব্বে ও নোয়াখালি জেলার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র এবং তাহার উপনদী ও শাখানদী

ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম লৌহিত্য[১] মূল ব্রহ্মপুত্র এক্ষণে ক্ষীণভাবে জামালগঞ্জ (ময়মনসিংহ) শহরের পূর্ব্ব দিয়া ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার ভৈরব বাজারে মেঘনার সহিত মিশিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের এই মূলখাতে ক্রমশঃ পলি পড়িয়া উচ্চ হওয়ায় উহার অধিকাংশ জল জামালপুর মহকুমার বাহাদুরাবাদের নিকট ব্রহ্মপুত্রের জনাই নামক শাখায় প্রবাহিত হইয়া প্রবল যমুনা নদীতে পরিণত হইয়াছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের রেনেলের নক্সায় ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের বুকানন হ্যামিল্টনের বিবরণীতে এই যমুনা নদীকে প্রবল নদীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। লক্ষ্যা নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া ময়মনসিংহ জেলা হইতে আগত বানার নদীকে গ্রহণ করিয়া ঢাকা সহরকে পশ্চিমে রাখিয়া মুন্সীগঞ্জের নিকটে যমুনা হইতে আগত ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে

১। এই নদ তিব্বতে মানস সরোবরের নিকটে উৎপন্ন। তিব্বতে ইহার নাম সম্পূ। সম্পূ শব্দের অর্থ পবিত্র। ইহা আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আসিয়া লোহিত, দিবং ও দিহং এই তিনটি নদীর সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নাম গ্রহণ করতঃ আসাম ও পূর্ব্ব বঙ্গে প্রবেশ করে। আসামে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের অর্দ্ধ মাইল দূরে স্নানের স্থান। ইহারই নিকট পাণ্ডুঘাট। কথিত আছে এইখানে পুরাণোক্ত ব্রহ্মকুণ্ড ছিল। কুণ্ডটি এক্ষণে ব্রহ্মপুত্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। পুরাণ মতে ব্রহ্মার ঔরসে শান্তনুমুনির পত্নী অমোঘার গর্ভে একটি পুত্র জন্মে। প্রসবান্তে পুত্রটি ব্রহ্মনির্ম্মিত ব্রহ্মকুণ্ডে স্থাপিত হয়। ব্রহ্মা ইহার নাম লৌহিত্য রাখেন। লৌহিত্য বারিরূপে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদরূপে পরিণত হন। পরশুরাম এই কুণ্ডে স্নান করিয়া মাতৃবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন এবং তাঁহার হস্তাবদ্ধ কুঠার হস্ত হইতে স্খলিত হয়। পরশুরাম কুঠার দ্বারা পথ করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ইহাকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করেন।

মেঘনায় পতিত হইয়াছে এবং আরও দক্ষিণে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। উক্ত ধলেশ্বরী ও পদ্মার মধ্যে মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় বিক্রমপুর (রামপাল) অবস্থিত। ধলেশ্বরীর প্রায় মধ্যভাগে বাম তীর হইতে বুড়ীগঙ্গা নামক একটি শাখা বাহির হইয়া লক্ষ্যা ও মেঘনার সঙ্গম স্থলের কিছু উত্তরে পুনরায় ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। এই দ্বীপাকার ভূভাগ পারজোয়ার নামে পরিচিত। ঢাকা সহর এই বুড়ীগঙ্গার বাম তীরে অবস্থিত। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যপথে সুবর্ণগ্রামের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

বানার ও সোমেশ্বরী নদী ময়মনসিংহ জেলার অপর দুইটি নদী। সুর্ম্মা ও কুশিয়ারা শ্রীহট্ট জেলার এবং ডাকাতিয়া, গোমতী ও খোয়াই ত্রিপুরার, বরাক, এরাং ও মণিপুব নদী মণিপুরের প্রধান নদী। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী, সঙ্গু, মাতামুহুরি নদীই প্রধান।

উত্তর বঙ্গে করতোয়া, অপুনর্ভবা (পুনর্ভবা,) আত্রেয়ী, মহনন্দা, কালিন্দী, বড়ল (বলভী), গড়ই, কুমারী ও পদ্মানদী প্রধান। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুব ও জলপাইগুড়ির ত্রিস্রোতা, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের জলঢাকা-শিঙ্গিমারী ধবলা ও তোর্শা নদী এবং ঘর্ঘরিয়া, কালজানি, রায়ডাক ও গদাধর নদী উল্লেখযোগ্য।

করতোয়া

হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে নেপালের পর্ব্বতমালা হইতে পুরাণ-প্রসিদ্ধা করতোয়া নদীর উৎপত্তি। 'করতোয়া মাহাত্ম্য' নামক পৌরাণিক গ্রন্থে ইহার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম সদানীরা (অমরকোষ)। পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ইহা কতকদূর পর্য্যন্ত নেপাল ও ভারতের সীমা নির্দ্ধারণ করে এবং ক্রমশঃ জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করতঃ জলপাইগুড়ি ও পূর্ণিয়ার মধ্য-সীমা নির্দ্দেশপূর্ব্বক বুড়াতিস্তার সহিত মিলিত হইয়া ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তথা হইতে প্রায় ১৬ মাইল পর্য্যন্ত রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার মধ্য-সীমা দিয়া রঙ্গপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার মধ্যদিয়া গোবিন্দগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে, এবং ক্রমশঃ বগুড়া জেলায় প্রবেশ করিয়া শিবগঞ্জ, মহাস্থানগড়, বগুড়া সহর, সেরপুরমরিচা স্পর্শ করিয়া সেরপুর থানার খানপুরের নিকট হলহলিয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়া তথা হইতে ফুলজোড় নাম লইয়া দক্ষিণে চাঁদাইকোনার নিকট পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর আত্রাইনদীর সহিত মিলিত হইয়া হুরাসাগর নাম ধারণপূর্ব্বক আরও দক্ষিণে দাওকোবার (যমুনার) সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ গোয়লন্দের নিকট পদ্মায় পতিত হইয়াছে।

মহানন্দা

মহানন্দা নদীও হিমালয়ের পাদদেশে উৎপন্ন হইয়া মালদহ জেলায় প্রবেশ করতঃ উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে এবং পুরাতন মালদহের নিকট নিমাসরাই নামক স্থানে গঙ্গা হইতে আগত কালিন্দী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই কালিন্দী ও পুরাতন ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাজা রামপালের প্রতিষ্ঠিত রামাবতী নগরী ও বল্লালবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই পুরাতন ভাগীরথীর দক্ষিণে ও পাগলা নামক নদীর মধ্যে মুসলমান আমলের গৌড়[১] ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৩৩৯ খৃঃ সুলতান হাজি ইলিয়াস শাহ গৌড় হইতে মহানন্দার পূর্ব্বতীরে পাণ্ডুনগরে (পাণ্ডুয়া) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

আত্রাই

আত্রাই নদীর উৎপত্তি হিমালয়ের পাদদেশে। ইহা ক্রমশঃ দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়া রাজশাহী জেলার আত্রাই রেলষ্টেশনের নিকট দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে গমন করতঃ পদ্মা হইতে আগত বড়ল (বলভী ?) নদীকে গ্রহণ করিয়া পাবনা জেলার রাবণ হ্রদ বা চলনবিল অতিক্রম করিয়া বেড়া নামক বাণিজ্যকেন্দ্রে ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং আরও দক্ষিণে করতোয়ার সহিত মিলিয়া হুরাসাগর নাম গ্রহণ করতঃ দাওকোবা (যমুনা) নদীতে পতিত হইয়াছে।

অপুনর্ভবা নদী দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। 'রামচরিতমে' ইহার উল্লেখ আছে।

মোটামুটি পূর্ব্বোক্ত বড় বড় নদীগুলি দ্বারা ইংরাজ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আমলে সুবে বাঙলা বা গৌড়-বঙ্গ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মেঘনা নদী ঢাকা বিভাগকে চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে, এবং পূর্ব্বে দাওকোবা বা যমুনা নদী, দক্ষিণে পদ্মা ও পশ্চিমে গঙ্গা বা ভাগীরথী ও মহানন্দা রাজশাহী বিভাগকে একদিকে ঢাকা বিভাগ, অন্যদিকে প্রেসিডেন্সী বিভাগ হইতে পৃথক করিতেছে। পূর্ব্বদিকে গঙ্গা, পদ্মা ও পদ্মার শাখানদী মধুমতী প্রেসিডেন্সী বিভাগকে ঢাকা বিভাগ হইতে এবং

১। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী নিজ জন্মভূমি ঘোর বা গোর উপত্যকার নামানুসারে লক্ষ্মণাবতীর সীমানায় গোর নামক নগরী স্থাপন করেন। তাহাই এক্ষণে গৌড় নামে পরিচিত হইতেছে। 'Badauni states that Baktiar Ghori founded a city and named it after his name Ghor.' (মস্তসখব-উৎ-তত্ত্বারিখ p 83)।

মোটামুটি ভাগীরথী বর্দ্ধমান বিভাগকে প্রেসিডেন্সী বিভাগ হইতে পৃথক করিতেছে।

ভাগীরথীর পশ্চিমে সুবে বাঙলার (গৌড়-বঙ্গ) যে অংশ অবস্থিত তাহা প্রাচীনকালে রাঢ় বা রাঢ়া দেশ ও আরও পূর্ব্বে সুহ্ম দেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহাভারতে 'সুহ্ম' নামের উল্লেখ আছে (সভাপর্ব্ব ৩৩অঃ)। টীকাকার নীলকণ্ঠ ইহার অর্থ করিয়াছেন 'সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ' অর্থাৎ সুহ্ম অর্থ রাঢ় দেশ। 'মেদিনী কোষে' 'রাঢ়া' অর্থ 'রাঢ়া স্ত্রী সুহ্ম শোভায়াঃ' অর্থাৎ রাঢ়া অর্থে সুহ্ম দেশ ও শোভা। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে সুহ্মগণকে রঘুর নিকট 'বৈতসী বৃত্তি' ধারণকারী বলা হইয়াছে (৪ সর্গ। ৩৫ শ্লোঃ)। সুহ্ম বা রাঢ় দেশ উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অজয় নদী ইহাদের মধ্যসীমা ছিল। ১০২৬ খৃঃ খোদিত রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ় ও বঙ্গাল দেশের উল্লেখ আছে। নৈহাটি তাম্রশাসন দ্বারা রাজা বল্লাল সেন উত্তররাঢ়ে ভূমিদান করিয়াছিলেন। মোটামুটি রাজশাহী বিভাগ সম্পূর্ণ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত নদীয়া জেলার সম্পূর্ণ ও মুর্শিদাবাদ জেলার যে অংশ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে পড়িয়াছে তাহা পাল ও সেন রাজগণের সময় বারেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামে ও আরও পূর্ব্বে 'পুণ্ড্র' দেশ নামে পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের পুরুষোত্তমদেব তাঁহার 'ত্রিকাণ্ডশেষ' অভিধানে 'পুণ্ড্র' শব্দের অর্থ 'পুণ্ড্রা স্যূর্ব্বরেন্দ্রী গৌড় নীবৃতি' অর্থাৎ 'পুণ্ড্র' অর্থে 'বরেন্দ্রী' ও "গৌড় দেশ" লিখিয়াছেন। ঐ শতকের শিলিমপুর লিপিতে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রীর একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে[১]। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিতম্' কাব্যে 'অপ্যভিতো গঙ্গা করতোয়ানর্ঘ প্রবাহ পুণ্যতমাং' অর্থাৎ (বরেন্দ্রী) একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে করতোয়ার অনর্ঘ প্রবাহ দ্বারা পুণ্যতমা[২]। পূর্ব্বকালে গঙ্গার উত্তর তীরের

১। 'তং প্রসূতশ্চ পুণ্ড্রেষু শকটী ব্যবধানবান্।
বরেন্দ্রি মণ্ডণোগ্রাম বালগ্রাম ইতি শ্রুতঃ॥'

(শিলিমপুর লিপি)

(ভারতবর্ষ ১৩২২। অগ্রহায়ণ। ৪ শ্লোঃ)

২। পরবর্ত্তী কালে করতোয়া ক্ষীণতোয়া হইলে এবং গঙ্গার শাখানদী পদ্মা প্রবলতর হইলে বরেন্দ্রীর সীমা বোধহয় কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কারণ ষোড়শ খৃষ্টাব্দের কবি রামের 'দিগ্বিজয় প্রকাশে' বরেন্দ্রীর সীমা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

'পদ্মা নদ্যা পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
বরেন্দ্র সঙ্গকো দেশো নানা নদনদী যুতঃ॥'

উপনদী কৌশিকী বা কুশী নদী মিথিলা ও পুণ্ড্র রাজ্যের মধ্য-সীমা ছিল[১]। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্ট নিজকুল ও বাসস্থানের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন 'গৌড়ে নন্দনাবাসী বরেন্দ্র্যাং কুলে।' পুরুষোত্তমদেবের ত্রিকাণ্ডশেষ ও কুল্লুক ভট্টের টীকা হইতে জানা গেল যে বরেন্দ্রকে পুণ্ড্র ও গৌড়দেশ বলা হইত। অপর পক্ষে ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের কবি কৃষ্ণ মিশ্র তাঁহার 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে 'গৌড়ংরাষ্ট্র মনুত্তমং তত্রাপি রাঢ়াপুরী ভূরিশ্রেষ্টিক নাম ধাম পরং তত্রোত্তমো নঃ পিতা' এই বাক্য দ্বারা 'রাঢ়া'ও যে গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত তাহা পরিষ্কার রূপে বলিয়াছেন। সুতরাং গৌড় দেশ বলিতে রাঢ়া ও বরেন্দ্রী উভয় দেশই বুঝাইত। আবার ১৮১২ খৃঃ উৎকীর্ণ কক্করাজের তাম্রশাসনের 'গৌড়েন্দ্র বঙ্গপতি নির্জ্জয়' ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায় যে গৌড় (রাঢ়া ও বরেন্দ্রী) হইতে বঙ্গদেশ স্বতন্ত্র ছিল। পূর্ব্বোক্ত রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে বঙ্গকে বঙ্গাল বলা হইয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনি ব্যাকরণের 'পুরে প্রাচাম্' (৬।২।৯৯) ও 'অরিষ্ট গৌড় পূর্ব্বেচ' (৬।২।১০০) এই দুইটি সূত্রে প্রাচ্যের গৌড় ও গৌড়-পুরের সন্ধান পাওয়া যায়[২]। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২।১৩) ও বাৎসায়নের কামসূত্রেও (৬।৪।৯, ৫।৬।৩০) গৌড় দেশের প্রসঙ্গ আছে। হারহা লিপিতে (৫৩৩ খৃঃ) "সমুদ্রাশ্রিতান্ গৌড়ান্" (সমুদ্রাশ্রিত গৌড়গণের) উল্লেখ আছে। কবি বাণভট্ট (৭ম খৃঃ) হর্ষচরিতে গৌড়পতির ও হর্ষচরিতের

১। মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর History of Mithila during Moghal Period. (P. A. S. B 1915 page 407-08) ও Martin's Eastern India (Vol II p. 37)-তে কুশী নদীকে মিথিলা ও উত্তর বঙ্গের (বরেন্দ্র) মধ্য সীমা বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। মৈথিল কবি ঝাণ্ডাকা (১৩১৬ সালে মৃত) ত্রিহুত মিথিলার বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

'গঙ্গা বহথি দক্ষিণ দিশি পূর্ব্বে কৌশিকি ধারা
পশ্চিমে বহথি গণ্ডকী উত্তরে হিমবৎ বল বিস্তারা ॥'

২। 'অরিষ্টপুরং গৌড়পুর মিত্যেতাবপি ষষ্ঠী সমাসাবেব। পূর্ব্বগ্রহণং কিমিতি * * পূর্ব্বগ্রহণেতু সতি বহুব্রীহি লভ্যতে। অরিষ্টগৌড়াদৌ পূর্ব্বৌ যস্মিন সমাসে সো অরিষ্টগৌড় পূর্ব্ব ইতি। তেনারিষ্টাশ্রিতপুরং গৌড়ভৃত্য পুর মিত্যত্রাপি যদুত্তরপদং তস্যাপি অন্তোদাত্তত্বং ভবত্যেব। অত্রাপি অরিষ্ট শব্দঃ গৌড় শব্দশ্চ পূর্ব্বঃ। পূর্ব্বশ্চায়মবয়ববচনঃ।' (কাশিকাবিবরণী পঞ্জিকা টীকা)

উপক্রমে 'গৌড়েশ্বক্ষর ডম্বরাঃ' বাক্যে 'গৌড়ীরীতির' উল্লেখ আছে। প্রায় ঐ সময়ের কবি দণ্ডী তাঁহার কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে গৌড়ীরীতিকে 'অক্ষর ডম্বরা' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনতর ভামহ তাঁহার কাব্যাদর্শে (২।৩১।৩২) বৈদর্ভীরীতির পক্ষপাতী হইলেও গৌড়ীরীতির প্রশংসা করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে গৌড়ীয়েরা খৃঃ সপ্তম শতকের পূর্ব্ব হইতেই কাব্যে একটি বিশিষ্ট রীতি গড়িয়া তুলিয়াছিল।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে ডিওডোরস (Deodorus) মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, পূর্ব্বদিকে 'গণ্ডরিডই' (Gandaridoi) ও 'প্রাসিয়ই' (Prasioi) নামক দুইটি পরাক্রান্ত জাতি (tribe) বাস করিত। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্লুটার্কও (Plutarch) তাহাই লিখিয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতকের অপর লেখক কার্টিয়াস রুফাস (Curtius Rufus) ও প্লিনী (Plini) Gandaridoi স্থলে Gangaridae ও Prasioi স্থলে Prasii পাঠ লিখিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আধুনিক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ প্রাচীনতর 'গণ্ডরিডই' পাঠের পরিবর্ত্তে কোন হেতু প্রদর্শন না করিয়া 'পরবর্ত্তী গঙ্গারিডি' পাঠ গ্রহণ করতঃ উহাকে কেহ রাঢ়, কেহ গঙ্গারাঢ়ী, কেহ বা গঙ্গারাষ্ট্র, কেহ বা গঙ্গাহৃদয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন[১]। প্রকৃতপক্ষে উহা গণ্ডরিডি অথবা গঙ্গারিডি যাহাই হউক না কেন, গ্রীক ও লাটিন লেখকগণ ঐ শব্দ দ্বারা কোন দেশকে নির্দ্দেশ করেন নাই। ঐ নামের জাতি (tribe) বিশেষের কথাই বলিয়াছেন। প্লিনী গঙ্গরিডি-কলিঙ্গী জাতির রাজধানীর নাম লিখিয়াছেন 'পর্থলিস' (Parthalis)। সেন্ট-মার্টিন (St. Martain) এই নামটিকে বর্দ্ধন শব্দের গ্রীক রূপান্তর বলিয়া মনে করেন[২]। ইহা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে এই 'বর্দ্ধন' শব্দটিকে আমরা 'পুণ্ড্র বর্দ্ধন' শব্দের

১। ৺রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত 'গৌড় রাজমালা' পৃঃ ১, (১৩১৯ বঙ্গাব্দ), ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বাঙ্গালার ইতিহাস', প্রথম ভাগ (১৩১১ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ২৯। শ্রীনীহাররঞ্জন রায় কৃত 'বাঙালীর ইতিহাস' প্রথম পর্ব্ব (৪৪১ পৃঃ)।

২। St. Martain লিখিয়াছেন, 'The city which Pliny speaks of as Parthalis can only be Vardhan' (Ancient India ; Ptolemy. Edited by S. N. Mazumder p 174) par=বর্, tha=ধ, lis=ন এইরূপ কল্পনা করিলে Parthalis=বর্দ্ধন হইতে পারে। সাধারণ কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদাই 'ল' স্থানে 'ন' হইয়া থাকে।

সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়া মনে করিতে পারি।

আমাদের মতে প্রাচীনতর 'গণ্ডরিডই' পাঠই ঠিক এবং উহা বহুবিখ্যাত গৌড়ীয় শব্দের গ্রীক অপভ্রংশ[১]। আমরা দেখিয়াছি পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রী ও সুহ্ম বা রাঢ় দেশ একত্রে গৌড় নামে অভিহিত হইত। পাণিনিতে যে গৌড়-পুরের উল্লেখ আছে তাহা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল এবং তাহা পশ্চিম গৌড় বা রাঢ়ের রাজধানী ছিল। পূর্ব্ব গৌড় বা পুণ্ড্রের (বরেন্দ্রী) রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বা সংক্ষেপে পুণ্ড্রনগর। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েনসঙ্গ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। মহা-স্থানগড়ের ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা শিলালিপিতে ইহাকে পুণ্ড্র নগর বলা হইয়াছে। ডিওডোরস একস্থানে লিখিয়াছেন—'গঙ্গা নদী গণ্ডরিডইদের রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পড়িয়াছে'। গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত পশ্চিম গৌড়ের রাজধানী 'গৌড়পুর'কে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় ঐরূপ বলা হইয়াছে। প্লিনী লিখিয়াছেন, গঙ্গা নদীর শেষভাগ 'গঙ্গরিডি-কলিঙ্গি'দের দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মীলিপি

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি পূর্ব্ব-গৌড় বা বরেন্দ্রীর রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্র নগর। এই পুণ্ড্র নগর যে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের সহিত অভিন্ন তাহা মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের একখানি শিলালিপি[২] হইতে জানা যায়। এই

১। Gandaridoi শব্দের গণ্ডর=গোঁড়=গৌড় ও ইডই (idoi)=ঈয় কল্পনা করিলে গণ্ডরিডইকে গৌড়ীয় শব্দের গ্রীক রূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গৌড়ীয় অর্থ গৌড়জাতি। মল্লিখিত 'গৌড়দেশ ও গণ্ডরিডই' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (প্রবর্ত্তক ১৩৬০, মাঘ সংখ্যা পৃঃ ৩৫৯)।

২। এই লিপিটির প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। Epigraphia Indica Vol XXI, Part II p 83-এ অধ্যাপক ডি, আর, ভাণ্ডারকর ও Indian Historical Quarterly Vol X pp 57-66-তে অধ্যাপক বি, এম, বড়ুয়া উক্ত লিপিটির দুইটি বিভিন্ন পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পাঠের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'নেন' কে ভাণ্ডারকর 'শাসনেন' অথবা 'বচনেন' ও বড়ুয়া 'অনেন' পদের অংশ বলিয়া মনে করেন। 'নেন' র পরবর্ত্তী পদকে ভাণ্ডারকর 'সংবং গিয়ানং' ও বড়ুয়া 'সবগিয়ানং' পাঠ করিয়াছেন। মূলে 'সব-

লিপিটি একটি ক্ষুদ্র লাল পাথরে মৌর্য্য যুগের মাগধী প্রাকৃতে ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত। লিপিটির ত, প, হ, ড, স, অক্ষরের লম্বা টানগুলি অশোক লিপির ঐ টানগুলি অপেক্ষা দীর্ঘতর। বুহ্‌লারের (Buhler) মতে ইহা অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের লিপির লক্ষণ। এই মতে মহাস্থান লিপিটি সম্ভবতঃ অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আদেশলিপি। আমার মতে এই লিপিটির পাঠ এইরূপ—

১। ... ... [রাঞোবচ]
২। নেন সবগিয়ানং তেল দিনস। তুমদি [নেমহা]
৩। মাতে। সুলখিতে পুংডনগলতে। এতং
৪। [নি] বহিপয়িসতি। সবগিয়ানং [চ] দিনে
৫। ধানিয়ং। নিবহিসতি। দগতিয়া য়ি কে পি অ [গি অ]
৬। [তিয়া] য়িকসি। সু অতিয়ায়িক [সি] পি গংড [কেহি]

গিয়ানং' পাঠই আছে। বড়ুয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন 'ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সঙ্ঘ'। ভাণ্ডারকর তাঁহার পাঠের অর্থ করিয়াছেন 'সংবঙ্গীয়গণ'। তৎপরবর্ত্তী পদকে ভাণ্ডারকর 'গলদনস' ও বড়ুয়া 'তেলদিনস' পাঠ করিয়াছেন। 'ত' অক্ষরের উপরাংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভাণ্ডারকর ঐ অক্ষরকে 'গ' বলিয়া মনে করিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী পদকে ভাণ্ডারকর 'তুমদিনমহা' ও বড়ুয়া 'তুমদিন সু' পাঠ গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী 'মাতে সুলখিতে পুংডনগলতে'র সহিত একত্র করতঃ ভাণ্ডারকর 'তুমদিন মহামাতে। সুলখিতে পুংডনগলতে' ও বড়ুয়া 'তুমংদিন সুমাতে। সুলখিতে পুংডনগলতে' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাণ্ডারকর উহার অর্থ করিয়াছেন 'তুমদিন নামক মহামাত্র সুলক্ষ্মী পুণ্ড্রনগর হইতে' ও বড়ুয়া 'সুমা সুলখি ও পুণ্ড্রনগর হইতে দ্রুম অর্থাৎ কাষ্ঠ দিবার জন্য'। আমরা আমাদের পাঠ ও অর্থ পরে দিয়াছি। এখানে 'সুলখি' পদটি 'সুলক্ষ্মী'র প্রাকৃত রূপ বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ 'শ্রীপুণ্ড্রনগর হইতে' এইরূপ বুঝাইবার জন্য প্রাকৃতে 'সুলখিতে পুংডনগলতে' লিখিত হইয়াছে। 'এতং' ও 'এস কোঠাগালে' এই এক বচনান্ত কথাটির সহিত সঙ্গতি না থাকায় বড়ুয়ার 'সুমা, সুলখি ও পুণ্ড্রনগর হইতে' এই ব্যাখ্যা ও পাঠ সঙ্গত হইতে পারেনা। বড়ুয়ার পাঠের অবশিষ্টাংশ সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। অশোকের 'রাজ্জীস্তম্ভানুশাসনের' 'দেবানং পিয়সা বচনেনা সবত মহামতা বতবিয়া' (দেবগণের প্রিয়ের বচন বা আজ্ঞা দ্বারা সর্ব্বত্র মহামাত্রগণকে বলিতে হইবে) এই বাক্যটি এস্থলে স্মরণীয়।

মহামাত্র=মহামাত্য (Chief Officer)?

৭। [কাক ণি] [য়ি] কেহি এস কোঠাগালে কোসং [ভল]

৮। [নিয়ে]

অনুবাদ॥ "রাজার আজ্ঞা (বচন) দ্বারা ষড়বর্গীয়দিগকে তেল প্রদানের জন্য দ্রুম বা কাষ্ঠ প্রদানের মহামাত্রের প্রতি। (তিনি) সুলক্ষ্মীযুক্ত পুণ্ড্রনগর হইতে ইহা সরবরাহ করাইবেন। ষড়বর্গীয়দিগকে দেয় ধান্যও পরিবহন করিবেন। উদক-জনিত (বন্যাজনিত) আপদের, অগ্নিজনিত আপদের ও শুকপক্ষীজনিত আপদের (প্রতিবিধান) জন্য এই (পুণ্ড্রনগরের) কোষাগারের কোষ গণ্ডক ও কাকনিকা (মুদ্রা) দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে।"

এই আদেশলিপি হইতে জানা যায় এই সময়ে পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রী পর্য্যন্ত মৌর্য্যাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। 'এস কোঠাগালে' কথা হইতে মনে হয় শিলা-লিপিখানি পুণ্ড্রনগরের কোষাগারের গাত্রে সংযুক্ত ছিল। গত্তিনি সুত্ত (উদান ২।৬) হইতে জানা যায় সেকালে শ্রমণগণকে তেল ও ঘৃত রাজকোষ হইতে দিবার বিধি ছিল। কিন্তু মৌর্য্যরাজ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুসঙ্ঘকে তেল, দ্রুম (কাষ্ঠ) ও ধান্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; জলপ্লাবন, গৃহদাহ ও শুকপক্ষী জনিত শস্যহানির জন্য প্রজাসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

বিনয়পিটকে সবগ্গীয় (চবগ্গীয়) ভিক্ষু সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। বোধিজ্ঞান লাভের পর বুদ্ধদেব (৬২৩-৫৪৩ খৃঃ পূঃ) সারনাথে যাইয়া (১) কোন্দন্ন, (২) ভদ্দক (৩) অশ্বজি (৪) বপ্প ও (৫) মহানাম এই পঞ্চ শিষ্যের নিকট ধর্ম্মচক্র ব্যাখ্যা করেন। বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই তাঁহার অপর শিষ্য দেবদত্ত ও কোকালিক বুদ্ধের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া একটি বিরুদ্ধ দল গঠন করিয়াছিল। এজন্য বিনয়পিটকে ইহাদিগকে 'সঙ্ঘভেদক' বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধদেবের (১) পাণ্ডুক (২) পুনব্বসু (৩) লোহিতক (৪) মেত্তিয় (৫) ভূম্যজক ও (৬) অশ্বজি এই ছয়জন শিষ্য মিলিয়া আর একটি দলের সৃষ্টি করে। এই দলটি 'চবগ্গীয়' (ষড়বর্গীয়) আখ্যা লাভ করে। এই দল বুদ্ধের নেতৃত্ব অস্বীকার না করিলেও, তাঁহার বিনয়ধর্ম্ম যথাযথ মানিয়া চলিত না। এজন্য বিনয়পিটকে ইহাদিগকে 'পাপভিক্ষু' বলা হইয়াছে। ষড়বর্গীয় সম্প্রদায়ের উক্ত ছয়জন ভিক্ষুই কোশল দেশের শ্রাবস্তীর অধিবাসী ছিল। পাণ্ডুক ও লোহিতক শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে, অশ্বজি ও পুনব্বসু কাশী প্রদেশের কীটাগিরিতে এবং মেত্তিয় ও ভূম্যজক রাজগৃহে সঙ্ঘারাম ও ফলপুষ্পোদ্যান স্থাপন করিয়া লোকহিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাস্থানগড়ের লিপি হইতে জানা যায় যে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুসঙ্ঘ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে অথবা তাহার পূর্ব্বে পুণ্ড্র নগরের অদূরে একটি সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাস্থানের তিন মাইল পশ্চিমে হিউয়েন-

সঙ্গ যে 'ভাসিভা' সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন তাহাই বোধ হয় ঐ সঙ্ঘারাম।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর) হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শক বঙ্গদেশ, ও বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ গৌড়দেশ[১]। বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, তৎকালে বঙ্গের তিনটি বিভাগ ছিল, যথা—নাব্য বিভাগ, বিক্রমপুর বিভাগ, চন্দ্রদ্বীপ বিভাগ[২]। বর্ত্তমান নোয়াখালি (নব্যাবকাশিকা), চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলা লইয়া নাব্য বিভাগ, মেঘনা হইতে দাওকোবা (যমুনা) পর্য্যন্ত বিক্রমপুর বিভাগ এবং বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা ও তথা হইতে গঙ্গার পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত ভুভাগ লইয়া চন্দ্রদ্বীপ বিভাগ। উক্ত তাম্রশাসনে বঙ্গের এই তিনটি বিভাগকে এবং দামোদর দেবের মেহার শাসনে (১২৩৪ খৃঃ) ত্রিপুরা জেলাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে 'বঙ্গ' কখনও সমতট, কখন হরিকেল নামে খ্যাত হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপিতে, নারায়ণ পালের ভাগলপুর শাসন,

---

১। 'রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়াপ্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ॥
বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ॥
(শক্তিসঙ্গমতন্ত্র। ৭ম পটল)

২। 'পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে নাব্যে রামসিদ্ধি পাটকে ** তথা নাব্যে বিনয় তিলক গ্রামে পূর্ব্বে সমুদ্র সীমা। ** তথা বিক্রমপুর ভাগে লাভহস্ত চতুরকে **। তথা চন্দ্রদ্বীপে (কন্দ্র দ্বীপে) পুরাচতুরকে' [বিশ্বরূপ সেনের (সাহিত্য পরিষদ) তাম্র শাসন]।

শ্রীচন্দ্রের রামপাল শাসন দ্বারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত নান্ন মণ্ডলে ভূমি দান করা হইয়াছে। এই নান্ন মণ্ডল বোধহয় নাব্য মণ্ডল হইবে।

খৃঃ ষষ্ঠ শতকের মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র ও ধর্ম্মাদিত্যের শাসনে নব্যা-বকাশিকা ভুক্তির অন্তর্গত বারক মণ্ডলের (বাখরগঞ্জ অঞ্চল) ও বৈন্য দেবের (৫০৬ খৃঃ) গুনাইঘর শাসনে উত্তর মণ্ডলের (নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলা) উল্লেখ আছে। নব্যাবকাশিকা ভুক্তির বারক মণ্ডল বোধ হয় পরবর্ত্তীকালে চন্দ্রদ্বীপ বিভাগে ও উত্তর মণ্ডল বোধ হয় নাব্য বিভাগে পরিণত হইয়াছিল। 'বারক' শব্দের অপভ্রংশে বোধ হয় বাখর বা বাকলা হইয়াছিল।

মহীপালের সময়ের বাঘাউড়া ও নারায়ণপুর লিপি, বীর্য্যেন্দ্র ভদ্রের বোধগয়া লিপি, বিজয় সেনের বারাকপুর শাসনে ও হিউয়েনসঙ্গের বিবরণীতে সমতটের উল্লেখ আছে। মহীপালের (৯৯২-১০৪০ খৃঃ) সময়ের ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া ও নারায়ণপুরের মূর্ত্তিলিপিতে ত্রিপুরাকে সমতটের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। বিজয় সেনের তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত খাড়ি-বিষয়ে সমতটীয় নল প্রচলিত থাকার উল্লেখ থাকায় এই খাড়ি-বিষয় পর্য্যন্ত যে সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাই প্রতীয়মান হয়[১]। লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর শাসনদ্বারা বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত 'পশ্চিম খাটিকায়' বেতড্ড চতুরকের বেতড্ড (বেতড়) গ্রাম দান করা হয়। শাসন লিপিতে দেখা যায় এই বেতড্ড চতুরকের পশ্চিম সীমায় জাহ্নবী। হাওড়া জেলার জাহ্নবীতীরস্থ প্রসিদ্ধ বেতড় গ্রামই যে উক্ত বেতড্ড গ্রাম তাহা বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেন। দেখা যাইতেছে যে জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত সমতটে (পূর্ব্ব) খাড়ি-বিষয় ও পশ্চিমতীরে বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিমখাটিকা বা 'পশ্চিমখাড়ি' অবস্থিত ছিল। অতএব সেকালে সমতট বা বঙ্গ জাহ্নবীর পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হেমচন্দ্র অভিধানে বঙ্গকে 'বঙ্গাস্ত হরিকেলিয়াঃ' হরিকেল বলা হইয়াছে। খৃঃ সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিং 'হরিকেল'-এ(রাজধানীতে) একবৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, হরিকেল (রাজধানী) পূর্ব্ব ভারতের পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। ফরাসী পণ্ডিত ফুসে তাঁহার গ্রন্থে হরিকেলের 'শিল লোকনাথের' উল্লেখ করিয়াছেন (Iconographia Buddhique p 200)। বঙ্গপতি শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে তাঁহার পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে 'আধারো হরিকেল-ককুদ-ছত্র-স্মিতায়াং শ্রীয়াং' (হরিকেলের রাজচিহ্নসূচক ছত্র যে রাজলক্ষ্মীর হাস্যদ্বারা

১। 'শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যান্তঃ পাতি খাড়ি বিষয়ে ঘাস সম্ভোগ ভট্টবড়া গ্রামে * * সমতটীয় নলেন পাটক চতুষ্টয় * ভূমি রিয়ং' (বিজয়সেনের বারাকপুর লিপি ও রাখালবাবুর বাংলার ইতিহাস ১ম খণ্ড, ৩০৫ পৃঃ)।

'That it (Samatata) extended upto Sundarban appears very probable from this.' [Barrackpur copperplate of Bejoy Sen Inscription of Bengal Part III]

শ্রীমদ্দমন পালের সুন্দরবন তাম্রশাসনেও (১১৬৯ খৃঃ) পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত পূর্ব্ব খাটিকার উল্লেখ আছে। হরিকেল নগর বোধহয় চন্দ্রদ্বীপে অবস্থিত ছিল।

উদ্ভাসিত হইত সেই রাজলক্ষ্মীর আধার) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১।৫) একটি প্রাচীন ঋকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে 'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' [পক্ষীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল অর্থাৎ যাযাবর বঙ্গ, বগধ (মগধ) ও চেরগণ] এই তিন প্রকার প্রজা সত্যপথ লঙ্ঘন করিয়ছিল[১]। মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণে বঙ্গগণকে, অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গগণের সগোত্রীয় বলা হইয়াছে (মহাভারত, আদি ১০৪।৫০ ; হরিবংশ ৩১।৩৩-৩৫ ; বিষ্ণু পুরাণ ৪।১৮)।

ধর্ম্মপালের খালিমপুর লিপি হইতে আরম্ভ করিয়া সেন রাজগণের শাসনলিপি পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সেকালে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ সমগ্র বরেন্দ্রীমণ্ডল ও বঙ্গপ্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি নামক একটি বৃহৎ ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত খৃঃ ষষ্ঠ শতকের মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের মহাসামন্ত মহারাজ বিজয় সেনের মল্ল সারুল শাসন, খৃঃ দশম শতকের কাম্বোজ মহারাজাধিরাজ নয়পালদেবের ইর্দ্রাশাসনে, খৃঃ দ্বাদশ শতকে বল্লাল সেনের নৈহাটি শাসনে ও লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর শাসনে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ বর্দ্ধমানভুক্তির কথা বলা হইয়াছে। ইর্দ্রাশাসন দ্বারা 'শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতি দণ্ডভুক্তি মণ্ডলে' ভূমি দান করা হইয়াছে। এখানে দণ্ডভুক্তিকে বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত একটি মণ্ডল রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু খৃঃ সপ্তম শতকের মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেবের মেদিনীপুর তাম্রশাসনে দণ্ডভুক্তিকে একটি পৃথক ভুক্তি বলা হইয়াছে। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে (১০২৩-১০২৫ খৃঃ) উৎকলের পর দণ্ডভুক্তি, তৎপর বঙ্গাল দেশ, তৎপর দক্ষিণ রাঢ়, তৎপর উত্তর রাঢ়ের উল্লেখ আছে। এখানেও দণ্ডভুক্তিকে রাঢ দেশ হইতে পৃথক করা হইয়াছে। সুতরাং দণ্ডভুক্তি কখনও বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত, কখনও উহা হইতে স্বতন্ত্র থাকিত। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিমভাগে দাঁতন নামক স্থানকে প্রাচীন দণ্ডভুক্তির প্রধান নগর বলিয়া মনে করা হয়। এই দণ্ডভুক্তির মধ্যেই সেকালের প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল। মেদিনীপুর জেলার তমলুককে প্রাচীন দামোলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত বন্দরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনেকে মনে করেন। বর্ত্তমানে ইহা রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। রূপনারায়ণ তমলুকের প্রায় বার মাইল দক্ষিণে হুগলীর (ভাগীরথীর) সহিত মিলিত হইয়াছে। দামোদর, রূপনারায়ণ ও হুগলীর

১। সায়নাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বঙ্গাঃ বনগতবৃক্ষাঃ অবগধাঃ ওষধি ঈরপাদা সর্পাঃ।'

গতিপথের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে যে তাম্রলিপ্ত এক সময়ে (ভাগীরথীর অপর শাখা) সরস্বতী, রূপনারায়ণ ও দামোদরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। দামোদরের সহিত লিপ্ত বলিয়া ইহার নাম দামোলিপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। পরে দামোলিপ্তের অপভ্রংশে তামোলিপ্ত ও তাহাকে সংস্কৃত করিয়া তাম্রলিপ্ত হইয়া থাকিবে। দশকুমারচরিতে (খৃঃ ষষ্ঠ শতক) ইহার নাম দামোলিপ্ত বলিয়া লিখিত হইয়াছে[১]। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, ইৎ-সিং ও হিউয়েনসঙ্গের বিবরণীতে তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির পরিচয় আছে। খৃঃ ষষ্ঠ শতকের চৈনিক গ্রন্থ সুই-চিং-চুতে খৃঃ তৃতীয় শতকের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, তাম্রলিপ্ত রাজের প্রেরিত দূত চীন সম্রাটের দরবারে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক বিষয় লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। টলেমীও (Ptolemy) খৃঃ দ্বিতীয় শতকে এই তাম্রলিপ্ত (Tamalites) বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি গঙ্গা (Gange) নামক নদী, বন্দরের ও রাজবাড়ীর বিবরণ দিয়াছেন। খৃঃ প্রথম শতকের পেরিপ্লাস (Periplus of the Erythrean sea)-এর বিবরণীতেও ভারতের পূর্ব্বকূলস্থ এই গঙ্গা নদী ও গঙ্গাবন্দরের বর্ণনা আছে। ইহাতে গঙ্গা নদীর (১) Kambyson (২) Mega (৩) Kamberikhon (৪) Pseudostomon (৫) Antibole নামক পাঁচটি মোহানার উল্লেখ আছে। এই গঙ্গা বন্দর ও গঙ্গার মোহানাগুলির ঠিকানা নির্দ্দেশ করা এখন খুবই কঠিন। গঙ্গার বর্ত্তমান প্রবাহ হইতে প্রায় কুড়ি মাইল পূর্ব্বে বারাসত মহকুমার (২৪ পরগণা) মধ্যে দে গঙ্গা (দেবগঙ্গা) নামক একটি গ্রাম দৃষ্ট

১। দশকুমারচরিতে (ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস) এইরূপ একটি কাহিনী লিখিত আছে যে, মগধরাজের মন্ত্রিপুত্র কুমার মিত্রগুপ্ত সুহ্মদেশের অন্তর্গত দামোলিপ্তে (তাম্রলিপ্তে) আগমন করিয়া তথাকার রাজকুমারী কন্দুকবতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু রাজকুমার ভীমধন্বা তাহাতে প্রতিবন্ধক হন, এবং চক্রান্ত করিয়া মিত্রগুপ্তের হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করতঃ তাঁহাকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করেন। মিত্রগুপ্ত ভাসিতে ভাসিতে একটি যবন বাণিজ্য জাহাজ কর্ত্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। অতঃপর একদল জলদস্যু ঐ যবন জাহাজ আক্রমণ করে। মিত্রগুপ্ত তাঁহার উদ্ধার কর্ত্তা যবন বণিক রামেস্বর পক্ষ হইয়া অসাধারণ রণকৌশলে সেই জলদস্যুগণকে পরাভূত করিলে দেখা গেল যে সেই জলদস্যুগণের দলপতি স্বয়ং রাজকুমার ভীমধন্বা। মিত্রগুপ্ত যুদ্ধে ভীমধন্বাকে পরাজিত করিবার ফলে রাজকুমারী কন্দুকবতীকে বিবাহ করিতে সমর্থ হন।

হয়। ইহার নিকটে আর একটি গ্রাম আছে তাহার নাম দেবালয়। এই দেবালয় গ্রামটি বর্ত্তমানে বেড়াচাঁপা নামে পরিচিত। বারাসত-বসিরহাট রেলপথের ইহা একটি ষ্টেশন। এখানে চন্দ্রকেতুরগড় নামে ধ্বংসাবশেষপূর্ণ একটি স্থান আছে। বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখাও ইহার নিকট দিয়া প্রবাহিত। এই চন্দ্রকেতুর গড খনন করার ফলে, কালো পালিশ করা মৃৎপাত্র ও ভাঙ্গা ফুলদানি পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি মৃৎপাত্রের উপর রোমান অক্ষর খোদিত আছে। রোমান পোষাক পরিহিতা নর্ত্তকী মূর্ত্তি ও রোমান শিরস্ত্রাণ পরিহিত পুরুষ মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। অশোক ও কুশান যুগের ব্রাহ্মী অক্ষরযুক্ত ও গ্রীকো-রোমান অক্ষরযুক্ত পোড়া মাটির শীলমোহরও এখানে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল নিদর্শন দৃষ্টে উক্ত দেবগঙ্গাকে গঙ্গাবন্দর ও চন্দ্রকেতুর গড়কে রাজবাড়ীর অবস্থান বলিয়া মনে হয়।

বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে 'শ্রীবর্দ্ধমান ভুক্ত্যন্তঃপাতি উত্তর রাঢ়া মণ্ডলে' ভূমিদানের বিবরণ আছে। সুতরাং ঐকাল পর্য্যন্ত উত্তর রাঢ়া বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের শক্তিপুর শাসন দ্বারা কঙ্কগ্রাম ভুক্তির মধ্যগত উত্তর রাঢ়া মণ্ডলে ভূমিদান করা হইয়াছে। বর্দ্ধমান ভুক্তি হইতে উত্তর রাঢ়া মণ্ডলকে অথবা উহার অধিকাংশকে লইয়া তদ্দ্বারা এই নূতন ভুক্তিটি যে লক্ষ্মণ সেনের সময় সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাই প্রতীয়মান হয়।

আকবর বাদশাহের আমলে সুবে বাঙলা ১৮টি সরকার ও ৬৮২টি মহালে (পরগনায়) বিভক্ত হয়। পরে ইংরাজ আমলে উহা বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট র‍্যাডক্লিফ সাহেবের বাঁটোয়ারার ফলে এই বাঙলাদেশ দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বভাগের নাম পূর্ব্বপাকিস্তান ও পশ্চিম ভাগের নমে পশ্চিম বঙ্গ হইয়াছে। সমগ্র বাঙলার এক তৃতীয়াংশ পশ্চিম বঙ্গের ভাগে ও প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পূর্ব্বপাকিস্তানের ভাগে পড়িয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগ সম্পূর্ণ ; প্রেসিডেন্সী বিভাগের কলিকাতা, ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পূর্ণ, যশোহর জেলার বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা ও নদীয়া জেলার প্রায় অর্দ্ধেক ; রাজশাহী বিভাগের দার্জ্জিলিং, কয়েকটি থানা বাদে জলপাইগুড়ি জেলা এবং দিনাজপুর ও মালদহ জেলার কতকাংশ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হইয়াছে। বাঙলাদেশের অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বপাকিস্তানে গিয়াছে। ভূমির শতকরা ৩৬·২০ ভাগ ও লোকসংখ্যার শতকরা ৩৪·১৪ ভাগ পশ্চিবঙ্গ পাইয়াছে। পরে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বিহার প্রদেশের মানভূম জেলা হইতে ২৪০৭ বর্গমাইল ভূমি ও

২৭৭৮৮ জন লোক ও পূর্ণিয়ার অংশ পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইয়াছে। মানভূমের এই অংশদ্বারা পুরুলিয়া জেলা গঠিত হইয়াছে। পুর্ণিয়ার অংশ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমাভুক্ত হইয়াছিল। পরে উহাদ্বারা ইসলামপুর মহকুমার সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে দুইটি বিভাগ হইয়াছে—বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী। বর্দ্ধমান বিভাগে বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, হুগলী, হাওড়া এই সাতটি জেলা ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে ২৪ পরগনা, কলিকাতা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং ও কোচবিহার এই ৯টি জেলা। ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর (লোক সংখ্যা ৪৫০০০) গণভোটের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া হুগলী জেলার মহকুমায় পরিণত হইয়াছে (১৯৭৯ খৃঃ)। যশোহর জেলার বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা লইয়া বনগাঁ মহকুমা গঠিত হইয়া ২৪ পরগণা জেলাভুক্ত হইয়াছে। রাজশাহী বিভাগের যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে তাহা প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মহকুমার সংখ্যা ৪৭। গ্রামসংখ্যা ৩৭৫০০। মণিপুর (লোক সংখ্যা ৭,৭৮,৩৮৮) ও ত্রিপুরা রাজ্য (লোক সংখ্যা ১১,৪১,৪৯২) কেন্দ্রশাসিত এলাকা। পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার হিজলি হইতে পূর্ব্বে ২৪ পরগনা জেলার সীমান্তে রায়মঙ্গল নদীর শাখা হাঁড়ি-ভাঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের উপকূল। এখানে নদীমুখে অসংখ্য খাড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে হুগলী নদীর মোহানার সাগর দ্বীপের নাম উল্লেখ যোগ্য। যে সকল নদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে তন্মধ্যে হুগলী, মাতলা, গোসবা, হাঁড়িভাঙ্গা প্রধান। সুবর্ণরেখা নদী হুগলী নদীর মোহানার অনতিদূরে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

'ডায়মণ্ডহারবার' কলিকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীর মোহানার অনতিদূরে অবস্থিত বন্দর। কলিকাতার সহিত ইহা রেলপথ দ্বারা যুক্ত। সমুদ্রগামী জাহাজ ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে আসিতে পারে। ডায়মণ্ডহারবার হইতে কলিকাতার খিদিরপুর পর্য্যন্ত হুগলী নদীর খাত সর্ব্বদা ড্রেজার দ্বারা কাটাইয়া গভীর রাখা হয়। খিদিরপুর কলিকাতা বন্দরের সুবৃহৎ পোতাশ্রয়। ইহার নাম 'কিং জর্জ্জ ডক'। ইহা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ডক। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক কলিকাতা বন্দর যোগে নির্ব্বাহিত হয়। মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্রতীরে দীঘায় স্বাস্থ্যনিবাস ও হলদিয়াবন্দর নির্ম্মিত হইতেছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা দ্বারা বীরভূম জেলায় একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিউড়ীর নিকটে তিলপাড়ার ব্যারেজ নির্ম্মিত হইয়াছে। দামোদরের খাল ও মেদিনীপুরের খাল প্রধানতঃ জলসেচের

কাজে ব্যবহৃত হয়। মেদিনীপুরের খালের একাংশ হিজলী খাল। কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব্বাংশের খাল দিয়া নৌকা চলাচল করে[১]।

কলিকাতা একটি আন্তর্জ্জাতিক শহর। এখানে ইংরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫০টি জাতির ১৪০০০ বিদেশী লোক বাস করে। তন্মধ্যে চীনাদের সংখ্যা ১০০০০।

পুনর্গঠিত পশ্চিম বঙ্গের আয়তন ৩৩৯৪১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১৯৫১ খৃঃ লোক গণনা অনুসারে ২,৬৩,০২৩৮৬ জন, তন্মধ্যে শতকরা ২৪.৬ জন লেখাপড়া জানে। লেখাপড়া জানা পুরুষ শতকরা ৩৪.৬২ জন, স্ত্রীলোক শতকরা ১১.৪২ জন। ১০০০ জন পুরুষে ৮৫৯ জন স্ত্রীলোক। লোকসংখ্যার শতকরা ৫৭.২২ ভাগ কৃষিজীবী। শতকরা ২৫ জন সহরবাসী। বৃহত্তর কলিকাতার আয়তন ১৬০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৪৫,৭৮,০৭১ জন [২]। দেশের আবাদী জমি ১,১৩,৪১,৫০০ একর। দার্জ্জিলিং, কোচবিহার, ও জলপাইগুড়ি জেলায় ১২০০ বর্গমাইল, সুন্দরবনে ১৬০০ বর্গমাইল, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে ১২০০ বর্গমাইল বনভূমি। মোট জনসংখ্যার ১৯.৮৫ ভাগ মুসলমান, .৭১ ভাগ খৃষ্টান, অবশিষ্ট, ৭৯.১১ ভাগ হিন্দু ও বৌদ্ধ .৩৩ ভাগ।

র‍্যাডক্লিফের বণ্টনে হিন্দু-প্রধান খুলনা জেলা পূর্ব্বপাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ায় হিন্দুদের আশাভঙ্গ হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ হাতছাড়া হইলে কলিকাতা বন্দরের প্রাণধারা ভাগীরথী পাকিস্তানের প্রভাবাধীন হইত। উত্তর বাঙলার যে অংশ পূর্ব্ব পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে, ভূপ্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক দিয়া পশ্চিম বাঙলার সহিতই তাহার সাদৃশ্য অধিক। রাঢ়ের লাল মাটির অঞ্চলই রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর ও বগুড়ার মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়া বরেন্দ্র ভূমি

১। দামোদর পরিকল্পনা অনুসারে তিলাইয়া (১৯৫৩ খৃঃ), কোনার (১৯৫৫ খৃঃ), মাইথন (১৯৫৭ খৃঃ) ও পাঞ্চেৎ পাহাড়ে (১৯৫৯ খৃঃ) ৪টি বৃহৎ জলাধার নির্ম্মিত হইয়াছে। কোনার ব্যতীত আর তিনটি কেন্দ্রে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বোকারো, দুর্গাপুর, চন্দ্রপুর ও ব্যাণ্ডেলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১৯৫৫ খৃঃ দুর্গাপুরে ২২৭ ফুট বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা উল্লেখযোগ্য।

২। ১৯৬১ সালের লোক গণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা শতকরা ৩২.৯ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৪৯,৬৭,৬৩৪ জন হইয়াছে। কলিকাতার বর্ত্তমানে লোক সংখ্যা ২৯,২৬,৪৯৮ জন। বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষ। বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষিতের হার ২৯.১। মিউনিসিপ্যালিটি ১৪৫টি।

সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভূভাগে অতি প্রাচীনকালেই আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্থানেই পুরাপ্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, বানগড়, প্রভৃতি অবস্থিত। এই ঐতিহ্যপূর্ণ ভূভাগটি হস্তচ্যুত হওয়ায় হিন্দুদের মনে দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, এবং মালদহ দিনাজপুরের যে অংশ পশ্চিম বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, অর্থনীতির ও সংস্কৃতির দিক দিয়া তাহার মূল্যও কম নহে। নদীমাতৃকা বাঙলার প্রধান তিনটি নদী—পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা পাকিস্তানে চলিয়া গেলেও, আছে নগাধিরাজ হিমালয় ও পুরাণ প্রসিদ্ধ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। পূর্ব্ববঙ্গের পলিমাটি গঠিত বিস্তীর্ণ উর্ব্বরা ভূমি পাকিস্তানভুক্ত হইলেও পশ্চিম বাঙলার আছে রাঢ়ের মূল্যবান কয়লাখনি। সুন্দরবনের অনেক অংশ পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াছে তরাই অঞ্চলের বিরাট অরণ্যানী। পূর্ব্বঙ্গের দুধ মাছ—ব্রহ্মপুত্রের রুই, বাঁশপাতা, পদ্মার ইলিশ, সোমেশ্বরীর মহাশাল, মেঘনার গল্‌দা চিংড়ি, পাবনার ঘৃত, নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও রাঘবসাই, পুটিয়ার অম্বিকা, ভবানীপুরের (বগুড়া) ক্ষীরতক্তি, মণ্ডল চকের ক্ষীর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ঘোল, টাঙ্গাইলের চন্দনচূড়, পাবনা বগুড়ার খাসা দই, পাংসার (ফরিদপুর) চমচম, ঢাকার পাতক্ষীর, প্রাণহরা, বাখরখানি, পরোটা, অমৃতি পড়িয়াছে পাকিস্তানের ভাগে। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়া, মুড়াগাছার ছানার জিলাপি, বহরমপুরের ছানাবড়া, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা, কলিকাতার বাটাছানার সন্দেশ, স্পঞ্জ রসগোল্লা ও রাবড়ী, মোল্লাচকের লাল দই, গুমা হাবড়ার খাসা দই, জয়নগরের মোয়া। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ময়মনসিং, রংপুর, বগুড়া, পাবনায় জাত পাট (যাহা পৃথিবীর বাজারে গোল্ডেন ফাইবার নামে খ্যাত) ও রংপুরের তামাক, চাউলের মধ্যে বগুড়ার শালিধান, দিনাজপুরের কাটারিভোগ, বাখরগঞ্জের বালাম ; ফলের মধ্যে বগুড়া ও রংপুরের কাঁঠাল ও আম, রামপালের সবরী কলা, গোয়ালন্দের তরমুজ পড়িয়াছে পাকিস্তানের ভাগে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াছে কামিনী, গোলাপসরু, সীতাশাল, শশীবালাম ও গোবিন্দভোগ চাউল ; মালদহ ও মুর্শিদাবাদের ফজলী ও ল্যাংড়া (যাহার তুলনা মেলা ভার), হুগলীর হিমসাগর, টালিগঞ্জের গোলাপখাস আম ; দার্জ্জিলিং ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের চা, দার্জ্জিলিং ও শিলিগুড়ির কমলালেবু, কোচবিহারের তামাক। কুটির শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে পাকিস্তান পাইয়াছে ঢাকা, টাঙ্গাইল, বাবুরহাটের তাঁতশিল্প, ও বগুড়া-রাজশাহীর রেশম শিল্প। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াছে শান্তিপুর, রাজবলহাট, ধনেখালি, শ্রীরামপুরের তাঁত শিল্প ও মালদহ, মুর্শিদাবাদ,

বীরভূমের রেশম শিল্প, টিটাগড় পেপার মিল ও বেঙ্গল পেপার মিল। পাকিস্তানের অন্তর্ব্বাণিজ্য বিতরণকেন্দ্র নদীভিত্তিক, সুতরাং ইহার সংখ্যা বহু। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ রেলপথকে অবলম্বন করিয়াই বাণিজ্য ও বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহা প্রধানতঃ কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চল সমূহে কেন্দ্রীভূত। বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য পশ্চিমবঙ্গে যাহা আছে তাহা বিপুল। যাহা গিয়াছে তাহা নগণ্য। শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা একাই একশো। স্মরণাতীত কাল হইতে পশ্চিমবঙ্গেই পূর্ব্বভারতের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীনকালের গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্ত; মধ্যযুগের 'সপ্তগ্রাম' ও হুগলী, চুঁচুড়া, আধুনিক যুগের কলিকাতা এই পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থিত। ঢাকাই মসলিন পশ্চিম বঙ্গের পথেই বিদেশে রপ্তানি হইত। পূর্ব্বপাকিস্তানের চট্টগ্রাম বন্দর এখনও নগণ্য। সংস্কৃতি ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা, যাদবপুর, বিশ্বভারতী, বর্দ্ধমান, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী, ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহিত তুলনায় ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও নগণ্য। সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে পূর্ব্বপাকিস্তানে গিয়াছে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও ঢাকা মিউজিয়াম; পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াছে কলিকাতা মিউজিয়াম (যাহা এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ও আশুতোষ মিউজিয়াম, বিখ্যাত ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এসিয়াটিক সোসাইটি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, জুলজিক্যাল ও বোটানিক্যাল গার্ডেন। আরও পাইয়াছে প্রাচীন ও আধুনিক সঙ্গীত ও কলাবিদ্যার কেন্দ্র হিসাবে বিষ্ণুপুর, কলিকাতা, শান্তিনিকেতন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে বসু বিজ্ঞান মন্দির, ভারতীয় গবেষণা সমিতি।

দেশ বিভাগের ফলে লাভ ক্ষতি যাহাই হউক, একই ভাষাভাষী বঙ্গদেশ ধর্ম্মের ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত হওয়াটাই দুর্ভাগ্য।
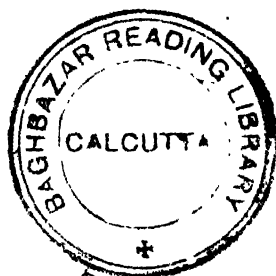
বাঙালীর জাতিতত্ত্ব

পৃথিবীর সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির পথে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ও মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ—সরস্বতী তীরে আর্য্য সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বাঙালী জাতি।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে, বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে এইরূপ একটি মতবাদ [১] দৃষ্ট হয় যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার এক কল্পে তাঁহার এক অহোরাত্র। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চতুর্যুগে এক মহাযুগ। ৭১ মহাযুগে এক এক মন্বন্তর। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প। বর্ত্তমানে শ্বেত বরাহ কল্পের সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে, এবং এই মন্বন্তরের সপ্তবিংশ মহাযুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশ মহাযুগের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগ অতীত হইয়াছে। এক্ষণে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে ১৮৮৪ শকাব্দে (১৯৬২ খৃঃ) কলিযুগের ৫০৫৯ বৎসর চলিতেছে। এক মহাযুগের পরিমাণ ৪৩,২০,০০০ বৎসর। যুগসন্ধির পরিমাণ ১৭, ২৮, ০০০ বৎসর। অতএব শ্বেত বরাহ কল্পের ৬ × ৭১ + ২৭ = ৪৫৩ মহাযুগ অর্থাৎ ১৯৫,৬৯,৬০,০০০ বৎসর + সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর তিনযুগে ৩৮,৮০০০০ বৎসর + কলিযুগের ৫০৫৯ বৎসর + ৭ সন্ধি (৭ × ১৭২৮০০০)-তে ১২০,৯৬,০০০, বৎসর = ১৯৭,২৯,৪৯০৬০ বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুমতে ইহাই পৃথিবী সৃষ্টির অতীতাব্দ।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষীদের মতে নীহারিকা মণ্ডল হইতে নক্ষত্রোৎপত্তি হয়। সূর্য্য এইরূপ একটি নক্ষত্র। আদি সৌরমণ্ডল হইতে গ্রহ উপগ্রহাদি উৎপন্ন হইয়া সৌর জগতে পরিণত হইয়াছে। এই পাশ্চাত্ত্য মতে সৌর জগতের আবির্ভাব কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় ২০০ কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য ভূতত্ত্ববিদ ও বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, রেডিয়ম প্রভৃতি স্বদীপন ও স্বতঃ-তেজবিকিরণশীল পদার্থের পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বহির্গত হইতে হইতে ক্রমশঃ উহা সীসকে পরিণত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে সহস্র

১। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা (৮।১৭), মনুসংহিতা (১।৬৫-৭৫), বিষ্ণুপুরাণ (৩।১-২ অঃ) জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ইত্যাদি। অপর দিকে ওল্ড টেষ্টামেন্টের (Old Testament) উপর নির্ভর করিয়া আর্চ্চবিশপ উশার বলেন, খৃঃ পূঃ ৪০০৪এ পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে।

সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হয়। পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশের প্রস্তরাদিতে এই জাতীয় পদার্থের অস্তিত্ব ও তাহাদের সীসকে পরিণতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই ঘটনা হইতে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন এইরূপে সীসকে পরিণত হইতে রেডিয়মের পক্ষে প্রায় ১৫০ কোটি বৎসর লাগিতে পারে। সুতরাং ইঁহাদের মতে পৃথিবীর বয়ঃক্রম ন্যূনকল্পে প্রায় দেড়শত কোটি বৎসর।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা জীবোৎপত্তির আদিযুগের নাম দিয়াছেন, প্রটারো-জয়িক (Proterozoic) যুগ। প্রায় ছয়কোটি বৎসর পূর্ব্বে এই যুগ আরম্ভ হইয়া প্রায় তিনকোটি বৎসর এইযুগ চলিয়াছে। এই যুগে কেবলমাত্র আণুবীক্ষণিক জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুর উৎপত্তি হয়।

অতঃপর প্রায় ৪০ লক্ষ বৎসরের যে যুগ চলিয়াছে তাহার নাম প্রটোপেলিও-জয়িক (Proto-Palaeozoic) বা আদি জীবীয় যুগ। এই যুগে মেরুদণ্ডহীন নানা প্রকার জলবৃশ্চিক সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিত।

অতঃপর প্রায় এককোটি ২০ লক্ষ বৎসর যে যুগ চলিয়াছে তাহার নাম পরবর্ত্তী পেলিওজয়িক (Palaeozoic) বা পুরা জীবীয় যুগ। এই যুগে উভচর জীব, মৎস্যাদি জলচর জীব, অশ্বপুচ্ছ, ব্যাংছত্র, জল শ্যাওলা জাতীয় অপুষ্পক (Fern) উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। এই অপুষ্পক উদ্ভিদেরা আধুনিক তালগাছের ন্যায় লম্বা হইত এবং ইহাদের অরণ্য সমূহ মাটির নীচে চাপা পড়িয়া কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

অতঃপর প্রায় এককোটি বৎসর যে যুগ চলিয়াছে তাহাকে মেসোজয়িক (Mesozoic) বা মধ্য জীবীয় যুগ বলা হয়। এই যুগে শামুক জাতীয় বিশালকায় সরীসৃপ সমূহের ও একপ্রকার অদ্ভুত পক্ষীজাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। ইহার পর প্রায় ২৮ লক্ষ বৎসর যে যুগ চলে তাহার নাম কেইনোজয়িক (Kainozoic) বা আধুনিক জীবীয় যুগ। এই যুগে ভূপৃষ্টে গরু, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীব এবং উন্নত ভূভাগে তৃণ ও বৃক্ষাদির উৎপত্তি হয়।

অতঃপর প্রায় তিনলক্ষ বৎসর যে যুগ চলে তাহার নাম ইয়োসিন (Eocene) যুগ। ভূপৃষ্ঠ হইতে ১২০০০ ফুট নীচে এই যুগের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই যুগে মনুষ্যাকৃতি ক্ষুদ্রকায় মর্কট জাতীয় একপ্রকার জীবের উৎপত্তি হয়। ইহার পরবর্ত্তী তিনলক্ষ বৎসরের যুগের নাম ওলিগোসিন (Oligocene) যুগ। এই যুগে পূর্ব্ব যুগীয় মর্কট জাতীয় জন্তুগুলি ক্রমোন্নতির বিভিন্ন ধারায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

অতঃপর প্রায় দুইলক্ষ বৎসর যে যুগ চলিয়াছে তাহাকে মিওসিন (Mioc‹ ne) যুগ বলা হয়। এই যুগে প্রাগৈতিহাসিক গিবন ও বিরাটকায়

বনমানুষের উৎপত্তি হয়। ভূপৃষ্ঠের এক হাজার ফুট নীচে ইহাদের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী প্রায় একলক্ষ বৎসরের যুগের নাম দেওয়া হইয়াছে প্লাইয়োসিন (Pliocene) যুগ। এই যুগে 'পিথেকান্‌থ্রোপাস' ও 'ইয়োনথ্রোপাস' মানবের ও মানব জাতির সাধারণ শাখা প্রসূত 'নিয়াণ্ডারথাল' মানবের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু ইহারা পরবর্ত্তী প্লেইষ্টোসিন (Pleistocene) যুগের মধ্যভাগে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে পাঁচ হাজার ফুট নিম্নে ইহাদের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী প্রায় দুইলক্ষ বৎসরের যুগের নাম শেলিয়ান (Chellean) যুগ, এই যুগে জাভার কপি-মানব, চীনের অর্দ্ধমানব, হাইডেলবার্গ ও পিল্টডাউন মানব ও ক্রোমানন্ মানব পৃথিবীতে বিচরণ করিত[১]। তাহারা এই যুগেই বিলুপ্ত হয়। আবার এই যুগেই বর্ত্তমান মানবের ক্রোমানন্ পর্য্যায়ের[২] পূর্ব্বপুরুষদেরও আবির্ভাব ঘটে।

উত্তর ভারতের শিবালিক পর্ব্বতমালার মধ্যে নৃতত্ত্বের দিক দিয়া কতকগুলি মূল্যবান কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সিভাপিথেকাস ও পেলিওপিথেকাস্ জাতীয় কঙ্কালগুলি সম্ভবতঃ আদিম মানবের সহিত সম্পর্কিত। নৃতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন ইহারা বোধহয় কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত। ডারউইন বলেন ওরাংওটাং ও বেবুন জাতীয় বানরেরা পাথরের সাহায্যে বাদামের খোলা

১। ১৮৫৬ খৃঃ জার্ম্মানীর নিয়াণ্ডারথাল অঞ্চলে প্রস্তরীভূত নরকঙ্কাল পাওয়া যায়। ইহারা আগুন জ্বালাইতে জানিত। ১৮৯১ খৃঃ মধ্য জাভায় কপি-মানব (পিথেকানথ্রোপাস ইরেক্টাস অর্থাৎ সোজা দাঁড়াইয়া হাঁটিতে ও দৌড়াইতে সক্ষম বনমানুষ) ও ১৯২৯ খৃঃ চীনে অর্দ্ধমানব (সিনেনথ্রোপাস পিকিনেনসিস) জাতীয় নরকঙ্কাল পাওয়া যায়। ১৯১২ খৃঃ সাসেক্স অঞ্চলে পিল্টডাউন নামক স্থানে পিল্টডাউন মানবের মাথার খুলি পাওয়া যায়। তৃতীয় বরফ যুগে ইহারা বর্ত্তমান ছিল। জার্ম্মানীর হাইডেলবার্গ নামক স্থানে ৮০ ফুট মাটির নীচে কয়েকখানি অস্থি ও চোয়াল পাওয়া যায়। ক্রোমানন্ গুহায় পেলিওলিথিক যুগের নরকঙ্কাল ও গ্রীমল্ডি গুহায় ঐরূপ দুইটি পূর্ণ কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

২। ফ্রান্সের ভেজের নদীর তীরে একটি পাহাড়ের গুহার নাম ক্রোমানন্। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই গুহায় পাঁচটি প্রস্তরীভূত নরাকৃতি কঙ্কাল পাওয়া যায়। গুহাভ্যন্তরে ইহাদের নির্ম্মিত হাড়ের ও পাথরের যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে ও গুহাগাত্রে ইহাদের আঁকা ছবিগুলিও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাঙ্গিয়া ভিতরের শাঁস খাইতে পারে এবং অন্যকে আঘাত করিবার জন্য লাঠি ও প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করে। শিম্পাঞ্জিরা গাছের ডাল দিয়া একপ্রকার কুটির নির্ম্মাণ করে। কিন্তু এ সব ব্যাপারে লেমুর জাতীয় বানরেরা অধিক দক্ষ ছিল।

প্রায় এক লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০০০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্লেইষ্টোসিন (Pleistocene) যুগ চলে। এই সত্তর হাজার বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমান মানুষের পূর্ব্ব পুরুষেরা নানা বিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়, এবং (১) নর্ডিক, (২) আলপাইন, (৩) দ্রাবিড়, (৪) মোঙ্গল, (৫) নিগ্রো ও (৬) কোল বা নিষাদ এই সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছয়টি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হইতে থাকে।

প্রকৃত পক্ষে প্রায় ৩০০০০ বৎসর পূর্ব্বে মানব জাতির দৈহিক বিশিষ্টতা পূর্ণতা লাভ করে। প্রায় ১৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ কৃষিকার্য্য আবিষ্কার করিয়া মানব জাতির অগ্রগমনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং প্রায় ৭৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হয়।

উপরে মানব-অভিব্যক্তির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহা কল্পনা-প্রসূত নহে, ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভূপঞ্জর হইতে প্রাপ্ত অস্থি ও কঙ্কালের উপর নির্ভর করিয়াই স্থির করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব জাতির উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস এখনও কুহেলিকাচ্ছন্ন রহিয়াছে। যদিও আজ হইতে প্রায় ৬।৭ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আদি মানবের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু মানুষ বলিতে এক্ষণে আমরা যাহা বুঝি, তাহারা মাত্র ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে দেখা দিয়াছে। বুভুক্ষা, পিপাসা, আত্মরক্ষা ও সিসৃক্ষা জীবমাত্রেরই আদিম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিগুলির বশীভূত অরণ্যবাসী আদিমানব বৃক্ষতলে অথবা পর্ব্বতগুহায় বাস করিত, এবং স্বভাবজাত ফলমূল দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ও ঝরণা অথবা নদীর জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিত। কিরূপ যুগবিপ্লবের ফলে নিরামিষাশী আদিম মানবকে আত্মরক্ষার্থ মাংসাশী হইতে হইয়াছিল, এবং তীক্ষ্ণ নখদন্তের অভাবে মৃগয়োপযোগী অস্ত্র সন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। নিরস্ত্র মানব প্রথমে বাহুমাত্র অবলম্বনে এবং ক্রমে অভিজ্ঞতালব্ধ বিচারবুদ্ধির ফলে বৃক্ষশাখা অথবা বংশদণ্ডের অথবা উপলখণ্ডের সাহায্যে আত্মরক্ষা ও প্রকৃতিজাত ফলমূলের অভাবে পশুপক্ষী ও মৎস্য শিকার করতঃ তাহাদের কাঁচা মাংস ভক্ষণদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে ভল্ল বা বর্শার ব্যবহার আরম্ভ হয়। সে ভূপৃষ্ঠ-লব্ধ প্রস্তরখণ্ডের অগ্রভাগ দ্বিতীয় প্রস্তরখণ্ডে ঘষিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া তাহা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে

বনজাত লতা দ্বারা বাঁধিয়া এই বর্শা প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। এই যুগেই কৃত্রিম উপায়ে অগ্ন্যুৎপাদনও মানবের দ্বিতীয় আবিষ্কার[১]। নবাবিষ্কৃত অগ্নি ও ভল্লের সাহায্যে আদিম মানব সে যুগের অতিকায় ভীষণ হিংস্রজন্তুসমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিত এবং পশুপক্ষী ও মৎস্যাদি প্রাণী হত্যা করিয়া সম্ভবতঃ আগুনে ঝলসাইয়া তাহাদের মাংস উদরস্থ করিত এবং এইভাবে সমগ্র জীবজগতের উপর তাহারা আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। পুরাতন প্রস্তর যুগের শেষভাগে অগ্ন্যুৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেও, তাহারা বহুকাল যাবৎ ধাতুর ব্যবহার অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। ইতিমধ্যে তাহারা পাষাণখণ্ডকে মসৃণ করতঃ তীক্ষ্ণধার করিয়া লইবার দক্ষতা অর্জ্জন করে। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ স্যার জন লবক এই পরবর্ত্তী শিল্প-নিপুণতাপূর্ণ মসৃণ প্রস্তরায়ুধের যুগকে 'নব্য প্রস্তর যুগ' (Neolithic Age) ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শিল্প-নিপুণতাহীন প্রস্তরায়ুধের যুগকে 'পুরাতন প্রস্তর যুগ' (Palaeolithic Age) নামে অভিহিত করিয়াছেন। নব্য প্রস্তর যুগের বর্শাফলক, শরফলক, কুঠারফলক, ছুরিকা প্রভৃতি যাহা হাতলে আটকান যায়, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আকারের তীক্ষ্ণধার সযত্ননির্ম্মিত সুদৃশ্য প্রস্তরাস্ত্র পাওয়া যায়। এইযুগে আদিম মানব ঐ সকল তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে ম্যামথ প্রভৃতি অতিকায় জন্তু শিকার করিত। অতঃপর ঘোড়া, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি দ্রুতগামী পশু শিকারের তাগিদে মানুষ বাটুল ও তীর নিক্ষেপের জন্য ধনুকের আবিষ্কার করে।

পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ প্রকৃতিজাত খাদ্যের অন্বেষণে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। এইরূপে নানা গোষ্ঠীর মানব নানা স্থান হইতে আসিয়া একস্থানে মিলিত হইত। কখনও তাহারা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইত, কখনও একত্র মিশিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, আবার জীবিকার অভাব হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিত। কিন্তু লোকবৃদ্ধির সহিত বন্য ফলমূল, পশুপক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক খাদ্যের ক্রমশঃ অভাব হওয়ায়, নব্য প্রস্তর যুগেই মানুষ খাদ্য উৎপাদন ও সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রায় ৬।৭ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহারা পশুপালন ও ধান্য, গম, যবাদি খাদ্যশস্যের আবাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইল। ক্রমে শস্যের রক্ষণার্থ ক্ষেতের পার্শ্বে বাসের জন্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়া গুহা ও বৃক্ষতলবাসী মানব গৃহবাসী হইল

১। পাঁচলক্ষ বৎসর আগেকার মানবের অধ্যুষিত গুহায় অধুনালুপ্ত জীবজন্তুর আগুনে ঝলসান হাড়গোড়ের পাশে বিশিষ্ট আকৃতির পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গিয়াছে।

এবং ক্রমে গ্রামসমূহের পত্তন হইল। কোটি কোটি বর্ষ পূর্ব্বে সাগরোপকূলে সৌরতপ্ত জলধারার সংস্পর্শে অণুপরমাণুতে প্রাণের যে প্রথম স্পন্দন সূচিত হইয়াছিল, তদবধি আজ পর্য্যন্ত জলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া জলের সাহায্যে জীবিত থাকিয়া যুগে যুগে জীব জলের গতিপথেরই অনুসরণ করিয়া সমুদ্র, নদী ও জলাশয়ের ধারেই বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতে সরস্বতী, সিন্ধু ও গঙ্গা নদী তীরে, ইরাকে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস তীরে, মিশরে নীল নদীর তীরে এই জন্যই পুরাকালের সমৃদ্ধিশালী সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল ও তথায় নানা গোষ্ঠীর মানবের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে মানুষ জলাভূমি হইতেই সংগ্রহ করিয়াছে তাহার প্রথম প্রকৃতিজাত যব-গম-ধান্যাদি আহার্য্য এবং ক্রমশঃ জলের মধ্যেই ফলাইয়াছে তাহার প্রাথমিক ফসল। পরবর্ত্তী কালে মাটি খুঁড়িয়া ও বৃষ্টিপাতের সাহায্যে মানুষ শস্য উৎপাদন করিত। আরও পরে গরু, গাধা, মহিষ ও অশ্বের সাহায্যে লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করিয়া ফসল ফলাইতে শিখিয়াছিল[১]।

নব্য প্রস্তর যুগে যেমন প্রস্তরের তীক্ষ্ণধার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তেমনি সেই সময়েই মানুষ রৌদ্রে শুকাইয়া ইট, হাঁড়ি প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল পাত্রে যে সব হাতের ছাপ আছে তাহা নারীদের। সম্ভবতঃ পুরুষেরা যখন বাহিরে মৃগয়াদিতে লিপ্ত থাকিত তখন নারীরা গৃহে থাকিয়া শস্য সঞ্চয়ের প্রয়োজনে মাটি দ্বারা হাঁড়ি তৈয়ারী করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইত। পরে হাঁড়ি তৈয়ারী করিবার জন্যই বোধহয় চাকার আবিষ্কার হইয়াছিল। এই সময়েই বোধহয় সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়নের কৌশল নারীরাই অর্জ্জন করে। মাকু ও টাকুগুলি এ সময়ে কাঠ অথবা পাথরে প্রস্তুত হইত। এই নব্য প্রস্তর যুগেই যাযাবর মানব পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। রন্ধন কার্য্যের প্রয়োজনে এই যুগেই বোধহয় মাটির হাঁড়িগুলি আগুনে পোড়াইয়া লওয়া হইত।

বাঙলার সীমান্তেও এই উভয় প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ১৮৮৮ খৃঃ রাঁচি জেলায় প্রস্তর নির্ম্মিত শত শত বর্শাফলক, অস্ত্র তীক্ষ্ণ করিবার যন্ত্র, কুঠারফলক, ছেদনাস্ত্র, ছুরিকা, মুষল, চক্র প্রভৃতি ও শস্য পেষণের উদখল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নব্য প্রস্তর যুগের পর আসিল তাম্র যুগ। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানিত না। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন ধাতুর মধ্যে স্বর্ণই সর্ব্বপ্রথম মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং স্বর্ণের স্থায়ী সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা এই

১। মিশরে গরু ও গাধা দিয়া লাঙ্গল চালাইবার প্রাচীন চিত্র দৃষ্ট হয়

ধাতু সংগ্রহের চেষ্টা করে। স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে যাইয়া তাহারা তাম্রের সন্ধান লাভ করে। মানব জাতির আদিম ধাতব অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র, পূজার সামগ্রী, ও অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্তই তাম্র নির্ম্মিত। আজিও আমরা পূজায় তাম্রনির্ম্মিত টাট, কোষাকোষী, পুষ্পপাত্র ব্যবহার করি। সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় যাহারা তাম্র যুগের নাগরিক সভ্যতার মৃত্যুঞ্জয়ী বুনিয়াদ গড়িয়া গিয়াছে ও তাম্রনির্ম্মিত শিল্পকলা ও অস্ত্রশস্ত্রের অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, তাহাদের অমর ইতিহাস মাত্র পাঁচ ছয় হাজার বৎসরের অধিক নহে। মিশরের লোকেরা মৃৎশিল্পে চাকা ব্যবহার করিতে শেখে খৃঃ পূঃ ১৭৯০-৮৯ অব্দে পশ্চিম এশিয়ার হিকসোসদের নিকটে[১], কিন্তু গঙ্গা ও সিন্ধু উপত্যকায় মৃৎশিল্পে চাকা ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায় খৃষ্টের প্রায় পঁয়ত্রিশ শত বৎসর পূর্ব্বে। ইহাই বোধ হয় মৃৎশিল্পে চাকা ব্যবহারের প্রাচীনতম নিদর্শন। এই চাকা যে কেবল মৃৎপাত্র প্রস্তুতের কাজেই লাগিত তাহা নহে, যানবাহনের কাজে লাগাও অসম্ভব নয়। তাম্র যুগের সভ্যতা ভারতে যে কেবল সিন্ধুর মহেঞ্জোদারো ও পঞ্জাবের হরপ্পাতেই[২] সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, সমগ্র

১। মেনেস (Menes) নামক বাজপক্ষী গোষ্ঠীর এক রাজা মিশরে প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন (৩৪০০ খৃঃ পূঃ)। গিজোর পিরামিডগুলি নির্ম্মিত হয় চতুর্থ রাজবংশের সময় (২৭০০ খৃঃ পূঃ)। প্যালারমো (Palarmo) প্রস্তর ফলকে চিত্রাক্ষরে এই চারিটি রাজবংশের (৩৪০০-২৭০০ খৃঃ পূঃ) বংশাবলী লিখিত আছে। দ্বাদশ রাজবংশের পর (১৭৮০ খৃঃ পূঃ) হিক্‌সোসেরা অশ্ববাহিত রথের সাহায্যে প্রায় সমগ্র মিশর জয় করিয়া রাজত্ব করে (১৭৮৮-১৫৮০ খৃঃ পূঃ)। অষ্টাদশ রাজবংশের (১৫৮০-১৩৫০ খৃঃ পূঃ) সময় মিশর পুনরায় স্বাধীন হয়। ষড়বিংশ রাজবংশের (৬৬৩-৫২৫ খৃঃ পূঃ) রাজা থটমশ ফিনিসিয়া সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন জয় করেন। পারসীকেরা ৫২৫ খৃঃ পূঃ মিশর জয় করেন। মিশরীয়দের চিত্রাক্ষর শব্দ-সমষ্টিক। অতঃপর গ্রীকেরা মিশর জয় করে।

২। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা মিশ্র সভ্যতা ছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদে (৬ মঃ। ২৭ সূক্ত) যব্যাবতী (ইরাবতী ?) তীরস্থ হরিয়ূপীয়া নগরে আর্য্য ও দস্যুগণের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে (৪-৮ ঋক)। এই যুদ্ধে আর্য্যপক্ষে দেবরাত বংশীয় চায়মানের পুত্র ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী দস্যু পক্ষের (বরশিখের পুত্র) বৃচিবানের যজ্ঞপাত্র ভঞ্জনকারী ত্রিংশৎশত বর্ম্মধারী পুত্রগণকে বিনষ্ট করেন। তাহাতে বরশিখের শ্রেষ্ঠ পুত্র (বৃচিবান ?) ভয়ে বিদীর্ণ হইয়াছিল। ঋগ্বেদের এই হরিয়ূপীয়া পঞ্জাবের হরপ্পা নগর কিনা অনুসন্ধেয়।

গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বক্সার ও পাটনার কাছে এবং ইন্দোর রাজ্যে মহেশ্বর নামক স্থানে (প্রাচীন মাহিশ্মতীপুর), কনৌজ ও উজ্জয়িনীতেও ঐ কালের অনেক মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্ব্বাপেক্ষা নীচের স্তরে এক রকম ধূসর রং-এর মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে (১৯৫৬ খৃঃ), যাহা প্রাচীন আর্য্যদের সময়ের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই ধরনের মৃৎপাত্র হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ ও মথুরাতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সুরাটের কাছে ভগত্রবে ও মধ্যভারতের চম্বল উপত্যকায় নাগদদে ও গুজরাটে এইরূপ মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কৌশাম্বীতে (এলাহাবাদের ৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনাতীরস্থ কোশাম গ্রাম) খননের ফলে হরপ্পার ন্যায় একটি প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেদেও মৃৎপাত্রের উল্লেখ আছে। আমাদের বাঙলার মৃৎশিল্পও সুপ্রাচীন। কিছুদিন হইল অজয় নদীর তীরবর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবি খননের ফলে তাম্রযুগের নির্দশন বাহির হইয়াছে। তাম্রযুগের আর একটি অবদান চুল্লী, হাপর ও ছাঁচ। তাম্র গলাইবার জন্য চুল্লী ও হাপরের উৎপত্তি এবং গলিত ধাতুকে ইচ্ছামত আকার দিবার জন্য ছাঁচের উদ্ভব হয়।

তাম্রযুগের পর লৌহযুগ। এই যুগে মানুষ লোহা গলাইতে শেখে এবং তীক্ষ্ণধার অসি প্রভৃতি লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণে ও তীর-বর্শাদির তীক্ষ্ণ লৌহফলক নির্ম্মাণে দক্ষতা অর্জ্জন করে। এইরূপে লৌহাস্ত্রে ও লৌহবর্ম্মে সজ্জিত হইয়া এই যুগের মানুষ অজেয় হইয়া উঠে। জলে স্থলে দ্রুতগতির জন্য এই যুগেই চক্রযান, নৌযান, অশ্বযান প্রচলিত হয়। নৌকায় পালের ব্যবহারও এই যুগেই প্রথম হয়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে আর্য্য জাতিই সর্ব্বাগ্রে লৌহাস্ত্র ও ঐ সকল দ্রুতগ্রামী যানবাহনের অধিকারী হয় এবং তৎসাহায্যে তাম্রযুগের সাম্রাজ্যগুলির ধ্বংসসাধন করিয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে সেকালের বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। লৌহযুগে লৌহফলকযুক্ত হলের সাহায্যে কৃষিকার্য্যের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হওয়ায় কৃষকেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করিতে লাগিল এবং এই অতিরিক্ত ফসল আমদানি-রপ্তানির প্রয়োজনে বণিক সম্প্রদায় গাড়িয়া উঠিল। কৃষি-কৌশলের বিকাশের সহিত সামাজিক অর্থনীতির বহুমুখী বিকাশের তাগিদে এই যুগের মানুষকে কলাকৌশল, যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের ক্রমশঃ উন্নতি করিতে হয় এবং তাহার ফলে শিল্পী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই যুগেই ভাষা ও লিপি আবিষ্কার করিয়া মানুষ অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ লাভ করে। অতঃপর বারুদ, গোলাগুলি ও কামান-বন্দুক, আরও পরে বাষ্পীয়

শক্তি ও মুদ্রাযন্ত্র, বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় যান এবং বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ ও আণবিক শক্তি ও শক্তিশালী উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, ব্যোমযান ও রকেটের রহস্য অবগত হইয়া মানুষ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইতেছে।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র মানবজাতিকে আচার ও কৃষ্টিভেদে আর্য্য ও অনার্য্য এবং গুণ ও কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত করিয়াছে। বলা বাহুল্য ইহা কৃষ্টিগত ও কর্ম্মগত বিভাগ। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজগত কৃষ্টির উন্নতি-অবনতি এবং কর্ম্মস্থানের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে। এইজন্য এরূপ বিভাগ চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা মানব জাতির মধ্যে আর এক প্রকারের জাতিভেদ আবিষ্কার করিয়াছেন। কোষবিজ্ঞান (Cytology), প্রজনন বিদ্যা (Genetics), ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে মানবের দৈহিক যে সকল বিশেসত্ব বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় তাহা প্রায় সমভাবেই চলিতে থাকে। প্রধানতঃ করোটি, নাসিকা, চক্ষু ও মুখমণ্ডলের গঠন এবং গাত্র, চক্ষু ও কেশের বর্ণ এই ভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে করোটির গঠনই শ্রেষ্ঠ ও অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়। এই সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা মানব জাতির মধ্যে কতকগুলি গোষ্ঠীগত বিশেষত্ব (racial type) বাহির করিয়াছেন। করোটির প্রস্থকে ১০০ দিয়া গুণ করিয়া দৈর্ঘ্য দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল ৭৭ হইতে নিম্নে হইলে তাহাকে দীর্ঘ করোটি, ৭৭ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত মধ্যম করোটি এবং তদূর্দ্ধে প্রশস্ত করোটি এবং নাসিকার প্রস্থকে ১০০ দিয়া গুণ করিয়া উচ্চতা দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল ৭০ হইতে নিম্নে হইলে তাহাকে উচ্চনাসা, ৭০ হইতে ৮৫ পর্য্যন্ত মধ্যমনাসা ও তদূর্দ্ধে প্রশস্তনাসা বলা হয়। উক্ত নিয়মানুসারে এবং গাত্র, কেশ, চক্ষুর বর্ণ ও গঠন ও হস্তপদের পরিমাপ বিচার করিয়া তাঁহারা মানবজাতিকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা :—

১। নিগ্রো—প্রশস্ত করোটি, প্রশস্ত নাসা, হস্তপদ লম্বা (কোন কোন স্থলে আজানুলম্বিত), বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, কেশ কুঞ্চিত ইত্যাদি।

২। অষ্ট্রেলয়েড (কোল বা নিষাদ)—দীর্ঘ করোটি, প্রশস্ত নাসা, চক্ষু গোল, দেহ হ্রস্ব, বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ কুঞ্চিত।

৩। মঙ্গোল—দীর্ঘ করোটি, নাসা প্রশস্ত ও চেপ্টা, চক্ষু বঙ্কিম, অক্ষিকোণে মাংসের পর্দ্দা (Epicanthic fold), কেশ শ্মশ্রু ও গুম্ফের স্বল্পতা, বর্ণ পীত, চিবুক উন্নত। কিন্তু চট্টগ্রামের চকমা, হিমালয়ের লেপচা ও ভূটানীদের করোটি প্রশস্ত।

৪। দ্রাবিড়—করোটি দীর্ঘ (৭৫) নাসা মধ্যম (৭৭এর নীচে)।

৫। আলপাইন কেল্টিক ও স্লাভোনিক—করোটি প্রশস্ত, নাসা উচ্চ। গাত্রবর্ণ শ্বেত ও শ্যাম, কেশ পিঙ্গল, কৃষ্ণ ও মসৃণ, উচ্চতা মধ্যম।

৬। নর্ডিক—করোটি দীর্ঘ, নাসা উচ্চ, গাত্রবর্ণ শ্বেত অথবা শ্যাম এবং কেশ পিঙ্গল অথবা কৃষ্ণ ও মসৃণ, দেহ দীর্ঘ।

নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ভারতে নর্ডিক, আলপাইন, দ্রাবিড় ও কোল (নিষাদ) গোষ্ঠীর মানবের এবং কিছু মঙ্গোল ও সামান্য পরিমাণ নিগ্রো রক্তের সন্ধান পাইয়াছেন।

পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, অযোধ্যা, বিহার ও রাজপুতানার অধিবাসীগণের উচ্চ শ্রেণীর শতকরা ৭৫ জনের করোটি দীর্ঘ ও নাসা উচ্চ।

পক্ষান্তরে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কুর্গ এবং বাঙলা ও উড়িষ্যার উচ্চশ্রেণীর শতকরা ৮০ জনের করোটি প্রশস্ত ও নাসা উচ্চ। বাঙলার উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শতকরা ৬ জন দীর্ঘ-করোটি উচ্চনাসা মনুষ্যও দৃষ্ট হয়। ইহা পশ্চিম ভারতের দীর্ঘ করোটি উচ্চ নাসা মানবের সহিত সংমিশ্রণের ফল। কোল গোষ্ঠীর মানবেরাই বোধ হয় বাঙালীর আদিম স্তর। দীর্ঘ করোটি মধ্যম নাসা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সহিত দীর্ঘ করোটি প্রশস্ত নাসা কোল গোষ্ঠীর দৈহিক বৈষম্য যদিও সামান্য কিন্তু ভাষাগত বৈষম্য দ্বারা এই উভয়ের পার্থক্য সূচিত হয়। কোল বা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ভাষার মধ্যে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খাসিয়া প্রভৃতি জাতিগুলির ভাষা উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মূলভাষা 'মন্‌খ্মের' জাতীয়। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, ইণ্ডোচীনের কোন কোন অংশ ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেক জাতির ভাষাও এই অষ্ট্রিক বা কোল শাখার অন্তর্ভুক্ত। বাঙালী সমাজে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সংস্রব কতখানি তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। মিঃ সিউয়েল এর মতে টেথিশ সমুদ্র হইতে হিমালয়ের উত্থানের পূর্ব্বে নিগ্রোদের ভারতবর্ষে প্রবেশের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। হিমালয়ের উত্থানের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ একটি দ্বীপাকার ছিল এবং ইহার উত্তরভাগ টেথিস সমুদ্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। হিমালয়ের আবির্ভাবের পর এশিয়া ও আফ্রিকার সংযোগ সাধিত হয়। আফ্রিকার নিগ্রোজাতি সুপরিচিত। বাঙালীদের মধ্যে নিগ্রোজতির চিহ্ন পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারতে প্রধানতঃ দ্রাবিড়গণের বাস। তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম্ ও টুলু ইহাদের ভাষা এবং ইহাদের সংখ্যা প্রায় ছয় কোটি। বেলুচিস্থানের ব্রাহুই ভাষার সহিত এই দ্রাবিড় ভাষার সাদৃশ্য আছে। ভূমধ্যসাগরের চারিপার্শ্বে ও উহার দ্বীপপুঞ্জে এই জাতির সদৃশ জাতি বাস করে।

মধ্য ইউরোপের আলপস্ অঞ্চলে ও ভলগা উপত্যকায় আলপাইন মানবের (কেল্টিক ও স্লাভ) একটি সুবৃহৎ গোষ্ঠী দৃষ্ট হয় এবং এশিয়ার পামীর অঞ্চলের গালচা প্রভৃতি কতকগুলি জাতিও এই লক্ষণাক্রান্ত। ইউরোপের সুইডেন, নরওয়ে, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশবাসী নর্ডিক গোষ্ঠীর লোক। মঙ্গোলিয়া, চীন, ব্রহ্ম, জাপান প্রভৃতি উত্তর ও পূর্ব্ব-এশিয়ার অধিবাসিগণ সাধারণতঃ মঙ্গোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

মানবজাতি এক দম্পতি হইতে কি বহু দম্পতি হইতে, একই সময়ে কি বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ কোন স্থানে কি বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হইয়াছে সে সমস্যা হয়ত চিরদিনই রহস্যাবৃত থাকিবে। তথাপি কতিপয় পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন যে দ্রাবিড়গণ ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে বাহির হইয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া সমগ্র উত্তরাপথে আধিপত্য বিস্তার করে এবং পরবর্ত্তীকালে আলপাইন ও নর্ডিক শাখার মানবগণ ঐ পথে ভারতে প্রবেশ করিয়া দ্রাবিড়গণকে দক্ষিণ ভারতে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত হল (H.R.Hall) নানা কারণ প্রদর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে দ্রাবিড়গণ ভারতেরই আদিবাসী এবং ইহারাই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারত হইতে উত্তর-পশ্চিমের পথে অথবা সমুদ্রপথে বাবিলনে (বাবিরুষ) গমন করিয়া ক্রমশঃ সুমের, বাবিরুষ ও আসুরের (এসিরিয়ান্) প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। বাবিরুষ বা বাবিলনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুমেরিয়গণের যে সকল প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, হল সাহেব মনে করেন তাহাদের মুখ ও অবয়ব ভারতের দ্রাবিড় জাতীয় হিন্দুগণের ন্যায়। তিনি আরও মনে করেন, ভারতীয় দ্রাবিড়গণ যখন বাবিরুষ অধিকার করে, তখন তাহারা তদ্দেশীয় আদিম আদিবাসিগণ অপেক্ষা সভ্যতর, ধাতব অস্ত্রের ব্যবহারে অভ্যস্ত, কীলকাক্ষর (Cuneiform Script) দ্বারা ভাব প্রকাশে সমর্থ ও নানাবিধ শিল্পে দক্ষ ছিল (H. R. Hall. The Ancient History of the Near East pp. 171-174)। দাক্ষিণাত্যে পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীন সমাধিস্থান খনন কালে মৃন্ময় শবাধারে মনুষ্যের শব আবিষ্কৃত হইয়াছে[১]। এই জাতীয় শবাধার প্রাচীন বাবিলনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও পাওয়া গিয়াছে[২]।

১। Anderson's Catalogue and Handbook of the Archaeological Collections in the Indian Museum, Calcutta Part II, p. 426; Indian Antiquary Vol II, p. 233.

২। Maspero's Dawn of Civilisation p. 686.

মধ্য ভারতের পার্ব্বত্য উপত্যকাসমূহের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার প্রস্তর কীলক পাওয়া গিয়াছে। এই কীলকটির গাত্রে কতকগুলি মনুষ্য মূর্ত্তি ও অক্ষর দৃষ্ট হয়। এই কীলকটি নাগপুরের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। কীলকটির খোদিত লিপিকে কীলকাক্ষর-লিপি ও কীলকটিকে বাবিলনের প্রাচীন শীলমোহর (Cylinder seal) এর অনুরূপ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এই জাতীয় বহু শীলমোহর প্রাচীন বাবিলন, এসিরিয়া, এমনকি প্রাচীন মিশরে পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে (Maspero's Dawn of Civilisation p. 757)। নাগপুরের চিত্রশালার কীলকটির একদিকে দুইটি মনুষ্য মূর্ত্তি, চন্দ্র সূর্য্যের চিহ্ন ও তিনটি ক্ষুদ্র মনুষ্য মূর্ত্তি ও অপর দিকে দুই পঙক্তি কীলকাক্ষরে 'লেবুব বেলি' (শক্তিমান দেবতা) লিপি আছে। বৃহদাকার মনুষ্য মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে একটি বাবিলনের বল অদাদ[১] বা মরুৎ দেবতার অনুরূপ, অপর মূর্ত্তিটি দেবী মূর্ত্তি। বল আদাদ প্রাচীন সিরিয়া দেশে আমুরু (Amuru) ও বেবিলোনিয়ায় মরতু (Martu) নামে পূজিত হইত। খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাবিরুষের রাজা মার্দুক-নাদিন-আখি-একল্লাতি নগর জয় করিয়া তথা হইতে আদাদের মূর্ত্তি বাবিরুষ নগরে লইয়া আসেন (Hall's Ancient History of the Near East p. 399)। এই সকল নিদর্শন ও উত্তরাপথের পশ্চিমপ্রান্তে বেলুচিস্থানে ব্রাহুই ভাষার অস্তিত্ব হইতে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতির সহিত প্রাচীন বাবিলনবাসিগণের সম্পর্ক সূচিত হয়।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্যর উইলিয়ম জোন্স সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়া ১৭৮৬ খৃঃ প্রচার করেন যে সংস্কৃত ভাষার সহিত ইরানী, গ্রীক, রোমান, কেল্টিক, স্লাভ ও জার্ম্মান ভাষাসমূহের নিকটতম সম্পর্ক আছে এবং ইহারা একই মূল হইতে উৎপন্ন।

ইহার প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ পরে বপ্ (Bopp) তাঁহার তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করিয়া ঐ সমস্ত ভাষার একমূলত্ব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দে রোসেন, লাংলোয়া, বেনফী, বর্ন্যুফ প্রভৃতি জার্ম্মান পণ্ডিতগণের সাধনার ফলে ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ ঋগ্বেদের রসাস্বাদনে সমর্থ হন।

আচার্য্য ম্যাক্সমূলর সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আজীবন বেদের আলোচনা ও বেদের প্রচারে অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৮৬১ খৃঃ ম্যাক্সমূলর লিখিলেন, 'এক সময়ে ভারতীয়, পার্শী, গ্রীক, রোমান, স্লাভ, কেল্ট ও

১। ঋগ্বেদে বল, বৃত্র ও অহি নামক অসুরেরও উল্লেখ আছে (১।৩২।১০)।

টিউটনগণের আদি-পুরুষগণ মধ্য এশিয়ার একই বেষ্টনী, এমনকি একই গৃহে বাস করিত এবং তথা হইতে ভারতীয় ও পার্শীগণ দক্ষিণাভিমুখে এবং গ্রীক, রোমান, কেণ্টিক, টিউটনিক ও স্লাভনিকগণ ইউরোপের দিকে গমন করিয়াছিল[১]।'

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের এই মতবাদ নৃতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মানিয়া লন নাই। ইঁহাদের মতে ভাষার সাদৃশ্য এক-জাতীয়তার প্রমাণ হইতে পারে না। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ব্রোকা (Broca) অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইছেন, অনেকগুলি জাতি ঐতিহাসিক যুগেই তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়াছে[২]। (Aryanisation of India by Professor N. K. Dutt. M.A. Ph.D. p 4)

ইউরোপে নর্ডিক বা টিউটনগণ ও আলপাইন বা কেণ্টিকগণ ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক হইলেও খৃষ্টীয় উনবিংশ শতক হইতে উভয়েই নিজদিগকে আর্য্যজাতি (Aryan) বলিয়া দাবী করিতে আরম্ভ করেন। জার্ম্মানীর অধিবাসীরা দীর্ঘ করোটি নর্ডিক বা টিউটন গোষ্ঠীর লোক। এই দেশের পণ্ডিতগণের মতে তাঁহারাই বিশুদ্ধ আর্য্য। ফরাসী প্রশস্ত করোটি কেণ্টিক বা আলপাইন গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। ফরাসী পণ্ডিতগণ জার্ম্মানদের দাবী উড়াইয়া দিয়া বলেন যে আর্য্যজাতি বলিয়া যদি কাহারও দাবী করিবার অধিকার থাকে তাহা আলপাইন বা কেণ্টিক গোষ্ঠীরই আছে (A.C. Haddon's History of Anthropology,

১। "There was a time when the first ancestors of the Indians, the Persians, the Greeks, the Romans, the Slavs, the Germans were living together within the same enclosures, nay under the same roof and that the place was central Asia from where the Indians and Persians started for the south and the leaders of the Greek, Roman, Celtic, Teutonic and Slavonic colonies marched towards the shores of Europe." (Maxmuller's Lectures on the Science of Languages).

২। "Races, frequently within historic period, have changed their languages with apparently not having changed their racial types."

London, 1910, p. 140)। জার্মান ও ফরাসী পণ্ডিতগণের এই প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধতা করিয়া মার্কিন পণ্ডিতগণ বলিতে লাগিলেন আর্য্য শব্দ কতকগুলি ভাষার প্রতি প্রযোজ্য, উহার দ্বারা কোন জাতি বা গোষ্ঠী বুঝায় না। ম্যাক্স-মূলারকেও জীবনের সায়াহ্নে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ম্যাক্সমূলারের 'আর্য্য গোষ্ঠী' উক্তিকে অনুসরণ করিয়া ১৮৪৭ খৃঃ হইতে একদল পণ্ডিত প্রচার করিতেছিলেন যে ভাষার ভেদ অনুসারে মানুষের রেস্ বা গোষ্ঠী বিভাগ করিতে হইবে। কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমূলর স্বয়ং ভাষা বিজ্ঞানের ও নৃতত্ত্বের এইরূপ মিশ্রণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে আর্য্য বলিতে আমি আর্য্য ভাষাভাষীই বলিতে চাই, আর্য্য বংশ, আর্য্য শোণিত, আর্য্য কেশ বা আর্য্য করোটি বুঝি না'[১]।

'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা (১৯২৯ খৃঃ)'-তেও আর্য্য (Aryans) শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে যে উহার অর্থ "সম্ভ্রান্ত" (noble) এবং কেবলমাত্র ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত হিন্দু ও ইরানীগণই নিজদিগকে আর্য্য বলিতে পারে'[২]।

ভারতে আর্য্যদের পূর্ব্বপুরুষগণের আবির্ভাব কিরূপে ঘটিল তাহার সমাধান আজিও নিশ্চিতরূপে সম্ভব হয় নাই। ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির সাহায্যে অনেক বিদেশী ও দেশী পণ্ডিত আর্য্যদের আদি নিবাস স্থির করিতে বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। ওটো শ্রাডের (Otto Schrader) স্থির করিলেন

১। "I have declared again and again that if I say Aryan, I mean neither blood nor bone, nor hair, nor skull. I simply mean those who speak an Aryan language."

(Maxmuller's Biography of Words and the Home of the Aryans. 1853)

২। "This word is used by some of the 'Satem' speakers of Indo-European languages with the meaning 'noble' and is the name of one of the tribes of these peoples. As Sir George Grierson points out, 'Indians and Iranians who are descended from an Indo-European stock have a perfect right to call themselves Aryans, but we English have not'."

(Encyclopaedia Britannica, 1929)

দক্ষিণ রাশিয়া, জেঁ য়াদে মর্গ্যান্ (J. De Morgan) দেখাইলেন সাইবেরিয়া, ডঃ গাইল্‌স্ (Dr. Giles) বলিলেন আর্য্যদের আদি নিবাসের পূর্ব্ব সীমা কার্পেথিয়ান, দক্ষিণ সীমা বলকান, পশ্চিম সীমা অষ্ট্রিয়ান আল্‌পস ও উত্তর সীমা এরজ্‌গেব্রিজ (Erzgebrige)। এইরূপ কেহ দেখাইলেন এশিয়া মাইনর, কেহ দেখাইলেন মধ্য এশিয়া, কেহ দেখাইলেন উত্তর মেরু। আর্য্যেরা যে বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছেন, এই মত প্রায় সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মানিয়া লইবার সপক্ষে বা বিপক্ষে যে সব যুক্তি আছে তাহা বড়ই দুর্ব্বল, চূড়ান্ত তো নহেই।

ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু আর্য্যেরা যে বাহির হইতে আসিয়াছিলেন তাহার একটি প্রমাণও বেদে পাওয়া যায় না। বরং তাঁহারা কতিপয় যজ্ঞহীন গোষ্ঠীকে যে ভারতের বাহিরে বিদূরিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়[১]।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক ৺অবিনাশচন্দ্র দাস তাঁহাব 'Rigvedic India'-তে দেখাইয়াছেন উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে কাবুল উপত্যকা, পূর্ব্বে সরস্বতী, মধ্যে সপ্তসিন্ধু বিধৌত ভূভাগ, ইহাই আর্য্যদের আদি জন্মভূমি। আমাদের মতে আর্য্য সংস্কৃতি ভারতের সরস্বতী তীরে উদ্ভূত হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য ও ইরানীয় আবেস্তা গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন জাতির প্রাচীন সাহিত্যে সেই জাতিকে আর্য্য বলা হয় নাই। পারসীকেরা নিজদিগকে অইর্য্য (আর্য্য) বলিত। আবেস্তা গ্রন্থে 'অইর্য্য' শব্দের উল্লেখ আছে। মিডাস্ (মদ্র) গোষ্ঠীভুক্ত পারস্য সম্রাট দারয়বউস (Darius) তাঁহার বোগাস্কুই শিলালিপিতে নিজেকে অইর্য্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ভেন্দিদাদে (১।৩) অইর্য্যগণের প্রথম বাসস্থান দৈত্যা (দৃষদ্বতী ?) নদী তীরস্থ

১। "ন্যক্রতূন্‌গ্রথিনো মৃধবাচঃ পণীরশ্রদ্ধাঁ অবৃধা অযজ্ঞান্।
প্র প্রতান্দস্যূঁরগ্নির্বিবায় পূর্ব্বশ্চকারা পরা অযজ্যূন্॥ [ঋগ্বেদ ৭।৬ সূ।৩]
"অগ্নি, যজ্ঞরহিত অল্পক হিংসিতবাক্ শ্রদ্ধারহিত বৃদ্ধিশূন্য পণিনামক যজ্ঞহীন দস্যু দিগকে বিদূরিত করুন। তিনি প্রধান হইয়া অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় করুন।"

ঋগ্বেদ ৬ মণ্ডল। ৬১। ৩ ঋকে "সরস্বতি, তুমি দেবনিন্দকদিগকে বধ কর।"

ঐরিয়ানা বীজো (Airyana Vaejo) বলিয়া লিখিত আছে[১]। পারসীকেরা ও মিদাসেরা নিজদিগকে ইরানী ও তাহাদের বাসভূমিকে ইরান (আর্য্যস্থান) বলিত। যম, ত্রিত, মিত্র, বায়ু, শর্ব্ব, ইন্দ্র, বৃত্রহন্, নাসত্য ও অসুর প্রভৃতি দেবতা প্রাচীন ইরানী ও হিন্দুগণের সাধারণ দেবতা। উভয় জাতিই যজ্ঞে সোমরস আহুতি দিত। উভয়েরই পুরোহিতের নাম অথর্ব্বন্। উভয়ের মধ্যে পুরোহিত, যোদ্ধা, শিল্পী ও কৃষক এই চারিশ্রেণীতে সামজিক বিভাগ ছিল।

পারস্যে ও আফগানিস্থানে দীর্ঘ ও প্রশস্ত করোটি—এই দুই শ্রেণীর মানব দৃষ্ট হয়। সেলিগম্যান (Seligman) দেখাইয়াছেন, দক্ষিণ আরবের সেমিটিকগণের মধ্যেও বহুসংখ্যক প্রশস্ত করোটি লোক বর্ত্তমান। কিরূপে মানব জাতির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর (racial type) উদ্ভব হইল এবং কিরূপে কোন স্থান হইতে যাযাবর আদিম মানব গোষ্ঠীগুলি নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িল তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নাই। ভারতীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানব ভারতেই আবির্ভূত হউক কি অন্যস্থান হইতেই আসিয়া থাকুক, তাঁহারা এখানে যে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বৈদিক যুগ হইতে ভারতের একদল লোক তাঁহাদের সংস্কৃতিকে আর্য্য সংস্কৃতি ও ভাষাকে আর্য্যভাষা এবং নিজদিগকে আর্য্য বলিতেন। ইঁহাদের করোটি কিরূপ ছিল তাহা জানা যায় না। মনুসংহিতার মতে "সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নামক দেব নদীদ্বয়ের[২] মধ্যে অবস্থিত দেবনির্ম্মিত প্রদেশের নাম

১। আবেস্তায় একটি উপাখ্যান আছে যে অহুরমজদা প্রথমে 'দৈত্যা' নদী তীরে 'ঐরিয়ানা বীজো' সৃষ্টি করেন। তৎপর 'হরখইতি (সরস্বতী), 'হপ্তহিন্দু' (সপ্তসিন্ধু) প্রভৃতি ১৭টি প্রদেশ ও 'রংঘ' নামক পঞ্চদশ প্রদেশ সৃষ্টি করেন। দৈত্যানদী বৈদিক 'দৃষদ্বতী' ও 'ঐরিয়ানা বীজো' আর্য্যাবর্ত্ত কিনা তাহা অনুসন্ধেয়।

ঋগ্বেদে দেবগণ অদিতির ও দৈত্য বা অসুরগণ দিতির সন্তান। অসুরগণের প্রথম অহি। বজ্রধর ইন্দ্র এই অহিকে হনন করিয়াছিলেন। "অহন্ অহিং"। বৃত্র ও বলাসুরের উল্লেখও ঋগ্বেদে আছে। (ঋগ্বেদ ১০।১৩৮।১)

২। ঋগ্বেদেও (৩।২৩।৪) এইরূপ একটি ঋক দৃষ্ট হয়—

নিত্বাদধে বর আ পৃথিব্যা ইচ্ছায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥

হে অগ্নি, আমি শুভ দিনে পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করি। তুমি দৃষদ্বতী ও গভীরসলিলা সরস্বতী নদীর মনুষ্যপূর্ণ তটে প্রদীপ্ত হও।

ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই প্রদেশের বর্ণ চতুষ্টয় ও সংকীর্ণ জাতিগণের আচারকে সদাচার বলে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা প্রদেশের নাম ব্রহ্মর্ষি দেশ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, পশ্চিমে বিনশন (অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদী) ও পূর্ব্বে প্রয়াগ (এলাহাবাদ) এই সীমাবদ্ধ দেশকে মধ্যদেশ বলা হয়।" (মনু ২।১৭-২১ শ্লোঃ)। ঋগ্বেদের মতে উক্ত ব্রহ্মাবর্ত্তে সরস্বতী তীরে সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

* লাট্যায়ন গৃহী সূত্রের ১০।১৫।১ সূত্রটি এইরূপ—"সরস্বতী নাম নদী প্রত্যক স্রোতা প্রবহতি। তস্যা প্রাঙ্ পরভাগৌ সর্ব্বলোক প্রত্যক্ষৌ। মধ্যমস্তভাগঃ ভূম্যান্তঃ নিমগ্নঃ প্রবহতি নাসৌ কেনচিৎ দৃশ্যতে। তদ্ বিনশনমুচ্যতে।" ইহা হইতে জানা যায় তৎকালে সরস্বতীর প্রথম ও শেস ভাগ সর্ব্ব লোকের দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু মধ্যভাগ অন্তঃসলিলা বিধায় দৃষ্টিগোচর হইত না। মহর্ষি কাত্যায়ন যখন 'শুক্লপক্ষ সপ্তম্যাং দীক্ষা সরস্বতী বিনশনে' এই সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তখনও সরস্বতীর একাংশ অন্তঃসলিলা ছিল।[১] মহাভারতের শল্য পর্ব্বে, গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়ে, বলদেবের তীর্থযাত্রাধ্যায়ে, সারস্বতোপাখ্যানে সরস্বতী নদী ও কুরুক্ষেত্রের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বলদেবের তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হইয়াছিলেন। "ততো বিনশনং রাজন্ জগামাথ হলায়ুধঃ। শূদ্রাভীরাণ্

- মনুতে এই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়কে দেব নদী ও ব্রহ্মাবর্ত্তকে 'দেব নির্ম্মিত' দেশ বলা হইয়াছে।

১। পঞ্জাবের সিবালিক পর্ব্বতশ্রেণীর প্লক্ষ প্রস্রবণ (ঋক ১০।৭৫) হইতে নির্গত হইয়া সরস্বতী আম্বালার অন্তর্গত আদবদরীর সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছে। পরে চলৌর গ্রামের নিকট অন্তঃসলিলা হইয়া পুনরায় ভবানীপুরে প্রকট হইয়াছে। বালছপ্পরে ইহা পুনরায় অন্তহিতা হইয়াছে। পরে বড়ঘেরায় আবার দেখা দিয়াছে। অতঃপর পেহোবার নিকট উর্ণই নামক স্থানে ইহা মার্কণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতী নামে থানেশ্বরের ও কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়া পাতিয়ালা রাজ্যের পশ্চিমবাহী ঘর্ঘরের (দৃষদ্বতী)-র সহিত মিশিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের আখ্যান অনুসারে ইহার ধারা লুপ্ত হইয়া অন্তঃসলিলা রূপে প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু সরস্বতী যে (পশ্চিম) সমুদ্রে পড়িত তাহার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। "একা চেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ"। এই সময় সরস্বতীর ন্যায় প্রকাণ্ড নদী ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ছিল না (৭ মণ্ডল। ৯৫সূঃ)।

প্রতিস্রোতাং যত্রা নষ্টা সরস্বতী॥" যেখানে গিয়া সরস্বতী বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই দেশ বিনশন্ নামে খ্যাত। এই বিনশন প্রদেশ বর্ত্তমান মেবার, উদয়পুর ও রাজপুতানার পশ্চিম প্রান্তের মরুদেশ।

মহাভারতকার বলদেবের মুখ দিয়া সরস্বতীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলাইয়াছেন—

সরস্বতী সর্ব্ব নদীষু পুণ্যা। সরস্বতী লোক সুখ-বহা সদা॥

সরস্বতীং প্রাপ্যজনা সুদুষ্কৃতং। সদান শোচন্তি পরত্র চেহ চ॥২

ঋগ্বেদে (৬।৬১।১০) উক্ত হইয়াছে সরস্বতী সপ্তভগ্নীসহ আর্য্যগণের স্তুতিভাজন ছিলেন। "উতনর প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা। সরস্বতী স্তোম্যাভূৎ" (সপ্তভগিনীযুক্ত প্রিয়তমা সরস্বতী আমাদের স্তুতিভাজন হউন)। মহাভারতে (শল্য পর্ব্ব। ৩৯। অঃ) উক্ত হইয়াছে, 'সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা এই সপ্ত সরস্বতীসহ মূল সরস্বতী জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। পিতামহ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া সরস্বতী পুষ্করতীর্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তথায় সরস্বতীর নাম সুপ্রভা। নৈমিষারণ্যে মহর্ষিগণ যজ্ঞকালে সরস্বতীকে আহ্বান করায় সরস্বতী তথায় উপস্থিত হইয়া কাঞ্চনাক্ষী নামে খ্যাত হন। গয় নামক ভূপতি গয়তীর্থে মহাযজ্ঞে সরস্বতীকে আহ্বান করায় তথায় আগতা সরস্বতী বিশালা নামে খ্যাত হন। মহর্ষি ঔদ্দালকি উত্তর কোশলে যজ্ঞস্থলে সরস্বতীকে স্মরণ করায় তথায় আগতা সরস্বতী মনোরমা নামে খ্যাতা হন। কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞপরায়ণ কুরুরাজের পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া তথায় সমাগতা সরস্বতী ওঘবতী নামে প্রসিদ্ধ হন। যজ্ঞনিরত দক্ষ কর্ত্তৃক গঙ্গাদ্বারে সমানীতা হইয়া তথায় সরস্বতী সুরেণু নাম প্রাপ্ত হন। হিমালয়ে ব্রহ্মার কার্য্য সাধনার্থ সমাগতা হইয়া সরস্বতী বিমলোদকা নামে খ্যাত হন। যে স্থানে ঐ সপ্তনদী একত্র মিলিত হইয়াছে তাহার নাম সপ্তসারস্বত তীর্থ।'

সরস্বতী ছিলেন প্রাচীন আর্য্যগণের প্রিয়তমা নদী (১মঃ। ১৩। ৯ ঋক, ৬মঃ ৬১ ও ৭ম মঃ। ৯৬ সূক্ত)। বর্ত্তমান যুগে গঙ্গার মাহাত্ম্য যেরূপ, পূর্ব্বে সরস্বতীর গৌরব ততোধিক ছিল। মধ্যদেশের পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে যেখানেই আর্য্যগণ গিয়াছেন, তাঁহারা সুরই হউন, কিংবা অসুরই হউন সরস্বতীর নাম তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। তাই আবেস্তা গ্রন্থেও আমরা সরস্বতীর নাম দেখিতে পাই। আর্য্যগণ যখন আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র আর্য্যসভ্যতা প্রচারে সমর্থ, তখনও তাঁহারা সরস্বতীর নাম ভুলিতে পারেন নাই। হিন্দুকে ক্রিয়া কলাপে 'গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতী। নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥' এই মন্ত্র অদ্যাপি উচ্চারণ করিতে হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণের (৪।১।১৪-১৭) মতেও এই সরস্বতীর তীর হইতেই অগ্নির অনুসরণ করিয়া রাজা বিদেঘ মাথব পূর্ব্বদিকে সদানীরা (করতোয়া) পর্য্যন্ত গমন করেন। সরস্বতী নদীর শুচিতা সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২ পঞ্জিকা, ৩ অধ্যায়, ১ম খণ্ড) এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে—

ঋষিগণ সরস্বতী তীরে যজ্ঞে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা ইলুষের পুত্র কবষকে অব্রাহ্মণ ও দাসীপুত্র বলিয়া যজ্ঞস্থল হইতে মরুভূমিতে বিতাড়িত করিলেন। কবষ তথায় পিপাসার্ত্ত হইলে 'অপোনপত্রীয়' সূক্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন জল-দেবতা তাঁহার পশ্চাতে আগমন করিলেন এবং সরস্বতী তাঁহার চারিদিকে ধাবিত হইলেন। তখন ঋষিগণ কবষকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিয়া তাঁহার দৃষ্ট সূক্ত যজ্ঞে প্রয়োগ করিলেন। ঋগ্বেদের ১০মঃ ৩০ সূক্তটি সেই 'অপোনপত্রীয়' সূক্ত যাহা ঋষি কবষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল।

এই আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় সরস্বতীর কৃপায় কবষের ন্যায় হীনজাতিও ঋষিপদবাচ্য হইতে সমর্থ হইয়াছিল[১]।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে (৩। ৩৮অঃ) 'পূর্ব্বদিকে প্রাচ্যগণের পশ্চিম দিকে নীচ্য ও অপ্রাচ্যগণের উত্তরদিকে হিমবানের অপর পারে উত্তর কুরু (ইরাণ ?) ও উত্তরমদ্র (মিডিয়া ?) ও দক্ষিণদিকে সত্বংগণের এবং ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত মধ্যদেশে বৎস, উশীনর ও কুরু-পাঞ্চালগণের বাস।' শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৮।১৫) প্রাচ্যদিগকে অসুর বলা হইয়াছে (আসুর্য্যাঃ প্রাচ্যাঃ)।

বিষ্ণুপুরাণের (১।১৮) মতে চন্দ্রবংশীয় যযাতির পুত্র যদু, তুর্ব্বসু, পুরু, দ্রহ্যু ও অনু। অনুর পুত্র সভানর হইতে সপ্তম পুরুষে মহামনা। মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। উশীনরের বংশে শিবি, সুবীর, কৈকেয়, মদ্র প্রভৃতি। তিতিক্ষু হইতে চতুর্থ পুরুষে সুতপা। সুতপার পুত্র বলি। এই বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচজন বালেয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করেন। ইহরা নিজ নিজ নামানুসারে অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি নামে পাঁচটি রাজ্য স্থাপন করেন। মহাভারত আদি পর্ব্বে (১০৪।৫০) ও হরি বংশে (৩১ ৩৩-৩৫) উপরোক্ত কাহিনীর উল্লেখ আছে। হরিবংশের মতে এই

১। 'ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। তে কবষমৈলুষং সোমাদনয়ন্ দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবোঽব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যে দীক্ষিষ্টেতি। * * স বহির্ধন্বো দুহলঃ পিপাসয়া বিত্ত এতদপোনপত্রীয় মপশ্যৎ * * এনং সরস্বতী সমন্তং পরিসসার। তেবা ঋষয়োব্রুবন্ বিদুর্বা ইমংদেবা। উপেমং হবয়ামযাইতি।'

বলি অসুররাজ বলি ছিলেন। মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। দেহান্তে বলি স্বস্থানে সুতলে গমন করেন[১]। সুতপার পিতামহ উশদ্রথ পূর্ব্ব দিকের রাজা ছিলেন।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩৩ অঃ ষষ্ঠ অস্ত) পুণ্ড্রদের সম্বন্ধে অন্য একটি কাহিনী লিখিত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র তাঁহার পঞ্চাশজন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শাপ দিলেন "তোমাদের বংশধর অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মুতিবগণ প্রত্যন্তদেশ ভোগ করিবে। ইহারা দস্যুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"।[২] মহাভারতের শান্তি পর্ব্বেও (৬৮ অঃ) দস্যুজীবী পুণ্ড্রগণের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মহাভারতাদির মতে প্রাচ্যের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মগণ অসুরবংশীয় ছিল। প্রাচীন মঞ্জুশ্রী মূলকল্প নামক গ্রন্থেও (এই গ্রন্থ খৃঃ একাদশ শতকে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়) লিখিত আছে 'সর্ব্বেষামসুর পক্ষাণাং বঙ্গ সমতটাশ্রয়াং।' অথর্ব্ববেদে (১৫ অঃ) মগধগণকে ব্রাত্য বলা হইয়াছে। পাণিনির 'বাহীক গ্রামেভ্যশ্চ' (৪।২।১১৭) সূত্রে বাহীক দেশের উল্লেখ আছে। মহাভারতের কর্ণ পর্ব্বে (৪৪-৪৫ অঃ) লিখিত আছে 'পঞ্চানাং সিন্ধু ষষ্ঠানাং অন্তরং চ সমাশ্রিতাঃ। বাহীক নামতে দেশাঃ ন তত্র দিবসং বসেৎ'। (৪৪।৭ শ্লোঃ) টীকাকারের মতে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা এই পঞ্চ উপনদীসহ সিন্ধু নদের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগের নাম বাহীক। এখানে এক দিবসও বাস করিবে না। সুতরাং মধ্যদেশের পশ্চিম দিকের ভূভাগও বিশুদ্ধ আর্য্য-অধ্যুষিত ছিল না।

মধ্যদেশের উত্তরে হিমবানের অপর পারে অবস্থিত উত্তর কুরু ও উত্তর মদ্রগণ সম্ভবতঃ প্রাচীন ইরানী ও প্রাচীন মিদাস (Midas) বা মিডিয়াবাসী[৩]। পাণিনির "পার্শ্বাদি যৌধেয়াদিভ্যঃ (৫।৩।১১৭) সূত্রে যে 'পর্শু'" জাতির কথা আছে উহারই পার্শী জাতি। উত্তর কুরু (ইরাণী) ও উত্তর মদ্র (মিডিয়া) গণের মিশ্রণে বোধ হয় পার্শী জাতি সংগঠিত হইয়াছে।

১। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন 'যঃ পূর্ব্বং বলিদানবেন্দ্র আসীৎ স এব সুতপস্ত পুত্রো বলিনামাভূৎ। স্বস্থানং সুতলং (প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচণ। তৎপুত্র বলি।)

২। অন্তান্ বঃ প্রজাভক্ষীষ্টেতি। এতেন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রা শবরাঃ পুলিন্দাঃ মতিবাঃ ইত্যুদণ্ডাঃ বহবো ভবন্তি। যে বৈশ্বামিত্রাঃ দস্যূণাং ভূয়িষ্ঠাঃ।"

৩। Herodotus refers to Midas (H. 1. 95) as revolting from the Assyrian domination in about 1700 B. C. Arrian

মহাভারতের (ভীষ্ম পর্ব্ব ৭ । ১২) বলা হইয়াছে "তীক্ষ্ণ ঠোঁট বিশিষ্ট ভারুণ্ডা নামক মহাবল শকুনসমূহ উত্তর কুরুদের মৃতদেহ হরণ করিয়া গুহায় নিক্ষেপ করে"[১]। এতদ্বারা পার্শীগণের মৃতদেহ পক্ষী দ্বারা ভক্ষণ করাইবার যে রীতি আছে, তাহা সমর্থিত হইতেছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মধ্যদেশের দক্ষিণে সত্বংগণের দেশ। কিন্তু মনুসংহিতায় সত্বংগণকে মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া ইহার দক্ষিণ সীমা বিন্ধ্যগিরি বলা হইয়াছে। প্রাচীনকালে কেবলমাত্র মধ্যদেশই আর্য্যাবর্ত্ত নামে পরিচিত ছিল। কারণ বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র (১।৪-৮) ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে (১।৫-৬) মতে অদর্শনের (অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর) পূর্ব্বে, কালকবনের (অযোধ্যার পশ্চিম সীমান্ত) পশ্চিমে, হিমবানের দক্ষিণে ও পারিযাত্রের (বিন্ধ্য) উত্তরে অবস্থিত ভূভাগই আর্য্যাবর্ত্ত[২]। বলা বাহুল্য ইহা রক্ষণশীল দলের মত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও রক্ষণশীল দলের এই মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। পতঞ্জলি লিখিয়াছেন "শিষ্ট কাহারা? আর্য্যাবর্ত্তবাসী ও তথাকার আচার পালনকারী

states in his Indica (1. 1-3) that the Indians between the rivers Indus and Cophen (Kabul) were in ancient times subject to the Assyrians, afterwards to Midas and finally to Persians and paid Cyrus (কুরুষ) son of Combyses (কম্বুস্) tribute that he imposed. (Cambridge History of India Vol I p. 332)

মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে, (৭অঃ।২।১২) উত্তর কুরুর উল্লেখ আছে ও আদি পর্ব্বে (১২৭ অঃ) উত্তর কুরুদের রমণীগণের স্বৈরিণী স্বভাবের উল্লেখ আছে। মদ্র, বাহীক, আরট্ট, গান্ধার, খস, সিন্ধু, সৌবীরগণের রমণীগণ সম্বন্ধেও কর্ণ পর্ব্বে (৪১, ৪৪অঃ) ঐরূপ বলা হইয়াছে। পারসীকদের রাজার কুরুস্ (Cyrus) নাম হইতে মনে হয় কুরু নামটি উহারা ভুলিতে পারে নাই।

১। ভারুণ্ডা নাম শকুনাস্তীক্ষ্ণতুণ্ডা মহাবলাঃ।
তান্নিহরন্তীহ মৃতান্ দরীষু প্রক্ষিপন্তি চ ॥ ১২

২। 'আর্য্যাবর্ত্তঃ প্রাগাদর্শনাৎ প্রত্যক্ কালকবনাৎ দক্ষিণেন হিমবন্তমুত্তরেণ পারিযাত্র'—বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র (১।৪-৮), বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র (১।৫-৬)। অঙ্গুত্তর নিকায়-এ লিখিত আছে 'একং সময়ং ভগবান্ সাকেতে বিহরতি কালকারামে' (অঙ্গু, নিকায় ২।২৪)। সাকেত বা অযোধ্যায় অবস্থিত এই কালকারামই কালকাবন। ইহা প্রয়াগের প্রায় সমসূত্রে অবস্থিত।

বিদ্বান শাস্ত্রজ্ঞগণই শিষ্ট। আর্য্যাবর্ত্ত কাহাকে বলে? আদর্শের পূর্ব্বে, কালকবনের পশ্চিমে, হিমবানের দক্ষিণে ও পারিযাত্রের উত্তরে যে দেশ তাহাই আর্য্যাবর্ত্ত[১]।"

অপর পক্ষে সামবেদীয় ভাল্লবী ব্রাহ্মণে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা দেওয়া হইয়াছে 'পশ্চাৎ সিন্ধু বিধারনী সূর্য্যস্তোদয়নং পুরঃ। যাবৎ কৃষ্ণাঃ বিধাবন্তি তাবৎ বৈ ব্রহ্মবর্চ্চসমিতি' অর্থাৎ পশ্চিমে সিন্ধু, পূর্ব্বে সূর্য্যোদয়, যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে তথায় ব্রহ্মবর্চ্চ লাভ হয়। মনুসংহিতাতেও আর্য্যাবর্ত্তের সীমা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—'পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমগিরি ও দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন। যথায় কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে তাহা যজ্ঞীয় দেশ। তদ্ভিন্ন স্থান ম্লেচ্ছ দেশ' (মনু ২। ২২-২৩)। যাজ্ঞবল্ক্যও 'যস্মিন দেশে মৃগঃ কৃষ্ণঃ তস্মিন ধর্ম্মান্ নিবোধত' (যাজ্ঞবল্ক্য ১।২) বলিয়া সমুদয় উত্তরাপথকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়াছেন।

এক্ষণে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা সম্বন্ধে দুই প্রকার মত পাওয়া গেল। এক প্রকার মতে মধ্যদেশই আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যনিবাস। বলা বাহুল্য, ইহা রক্ষণশীল মত। কিন্তু প্রগতিশীল মতে সমগ্র উত্তর ভারতই আর্য্যাবর্ত্ত। এমন কি মনুসংহিতায় এমন শ্লোকও পাওয়া যায় যে মনুসংহিতা কথিত আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে পশ্চিমে ও পূর্ব্বে অনেক দেশে আর্য্য বসতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

এক্ষণে দেখা যাক আর্য্য কাহাকে বলে। পাণিনির ৩।১।১০৩ সূত্রে 'আর্য্যঃ স্বামী বৈশ্যয়োঃ'। ইহার অর্থ স্বামী ও বৈশ্য অর্থে গমনার্থক ঋ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় করিয়া অর্য্য ও ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া আর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'ঋ সৃ—গতৌ', ঋ ধাতুর অর্থ গমন করা। অতএব আর্য্য শব্দের ধাতুগত অর্থ গন্তব্য বা যাহার নিকট যাওয়া যায় এমন ব্যক্তি[২]। এই অর্থ ধরিয়াই বোধহয় কোষকারগণ আর্য্যশব্দের পর্য্যায় করিয়াছেন 'মহাকুল কুলীনার্য্য সভ্য সজ্জন সাধবঃ' (অমরকোষ)

১। 'কে পুনঃ শিষ্টাঃ। * * বৈয়াকরণাশ্চ শাস্ত্রজ্ঞাঃ নিবাসতশ্চ আচারতশ্চ। স আচার আর্য্যাবর্ত্তে এব। কঃ পুনঃ আর্য্যাবর্ত্তঃ। প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্ কালকবনাৎ দক্ষিণেন হিমবন্তঃ উত্তরেণ পারিযাত্রং।' (মহাভাষ্য ৬। ৩। ১০৯)

২। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ 'অর' ধাতু আবিষ্কার করিয়া তাহা হইতে আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে চান। তাঁহারা বলেন অর ধাতুর অর্থ 'হল চালনা' অতএব 'আর্য্য' অর্থ যাহারা হল চালনা করে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে 'অর' ধাতু দৃষ্ট হয় না। নির্ঘণ্টু নামক বৈদিক অভিধানেও 'অর্য্যতি' অর্থ 'গচ্ছতি'।

='পূজ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ বুদ্ধঃ' (শব্দ রত্নাবলী)। যিনি মহাকুল, কুলীন, সভ্য, সজ্জন, সাধু, পূজনীয়, শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী তিনি আর্য্য। সায়ন ঋগ্বেদের এক স্থলে 'আর্য্যং (১।১৩০।৮) অর্থ 'অরনীয়ং গন্তব্যং' (যাঁহার নিকট জ্ঞানার্থ যাইতে হয়)। অন্যত্র আর্য্যায় (১।১১৭।২৯) অর্থ 'বিদুষে' এবং 'আর্য্যাঃ (১।১৩০।৩) অর্থ 'বিদ্বাংসঃ স্তোতারঃ' করিয়াছেন। সভ্য শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, কিন্তু অথর্ব্ব বেদে পাওয়া যায়[১]। সভেয় শব্দ ১।৯১।২০, ১।২৪।২৯ ঋগ্বেদীয় সূক্তে পাওয়া যায়। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'সভায়াং সাধুঃ সকলশাস্ত্রাভিজ্ঞঃ।' সভ্য শব্দের অর্থও 'সভায়াং সাধুঃ'। সুতরাং আর্য্য সভ্যতার স্রষ্টা, ধারক, বাহক ও গ্রাহক মাত্রই আর্য্য, তাহাদের বর্ণ ও আকৃতি যাহাই হউক।

ঋগ্বেদে (১০।৪।৫৩-৮) ও অথর্ব্ব বেদে (১২।২।৯) এই ঋকৃটি দৃষ্ট হয়—

'অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং বীরয়ধ্বং প্রতরতা সখায়ঃ।
অত্রাজহীত যে অসন্ দুরে বা অনমীবান্থুত্তরেমাভি বাজান্॥'

অর্থাৎ বন্ধুগণ অশ্মন্বতী (দৃষদ্বতী) নদী প্রবাহিত হইতেছে। তোমরা উৎসাহ ও বীর্য্যের সহিত এই নদী উত্তীর্ণ হও। আমাদের যে সকল দুর্দ্দশা ছিল তাহা এইখানেই বিসর্জ্জন করিয়া যাই। আমরা এই নদী পার হইলেই প্রচুর অন্ন লাভ করিব।

এখানে ঋষি সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নামক দেবনদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের ক্ষত্রিয়গণকে দৃষদ্বতী নদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে নূতন নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উৎসাহিত করিতেছেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে কুরুক্ষেত্র এবং কুরুগণের রাজ্য ছিল এবং এই প্রদেশের আচারকে সদাচার বলা হইত। সম্ভবতঃ এই কুরুগণই দৃষদ্বতীর পূর্ব্ব তীরে প্রয়াগ পর্য্যন্ত মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন (মথুরা) রাজ্য গড়িয়া তোলে। ইহাই ব্রহ্মর্ষী দেশ। অতঃপর পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্ব্বে সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ (এলাহাবাদ) পর্য্যন্ত ভূভাগ মধ্যদেশ নামে প্রসিদ্ধ হয়। মনু উক্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষী দেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'এই দেশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের নিকট পৃথিবীর যাবতীয় লোক নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবেন' (মনু ২।১৭-২১)[২]।

১। সভ্য সভামে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদাঃ', (অথর্ব্ববেদ ১৫।৫৫)

২। 'এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥'
(মনু ২।২০ শ্লোঃ)

আমরা দেখিয়াছি শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৮।১৫) প্রাচ্য দিগকে ("আসুর্য্যাঃ প্রাচ্যাঃ") এবং মহাভারত ও পুরাণে প্রাচ্যদেশীয় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রগণকে অসুর বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অন্যত্র (৩।১০।১।২৩-২৪) উক্ত হইয়াছে প্রাচ্যে সদানীরা (করতোয়া) তীরের যুদ্ধে 'হে অলবঃ হে অলবঃ' বলিতে বলিতে অসুরগণ দেবগণের নিকট পরাভূত হইয়াছিল[১]। এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন (১।১।১) 'তেহ সুরা হেহ লবো হেহ লবঃ ইতি বদন্তঃ পরাবভূবুঃ। তস্মাৎ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতব্যো নাপভাষিতব্য'। মহাভাষ্যকার এখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের অসম্মত অসুরগণের কথিত অপভাষাকে ম্লেচ্ছভাষা বলিতেছেন। মনুসংহিতায় (১০।৪৫) উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র বর্ণেরা ক্রিয়া লোপাদি হেতু বাহ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। আর্য্যভাষীই হউক অথবা ম্লেচ্ছভাষীই হউক উহারা দস্যু আখ্যা পাইয়া থাকে[২]। এতদ্বারা মনে হয়, মধ্য দেশীয় আর্য্যগণের মধ্যে কালক্রমে যে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দুইটি দলের উদ্ভব হইয়াছিল তন্মধ্যে প্রগতিশীল দল মধ্যদেশ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উভয় দিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। তখন তাহাদের অনেকের মধ্যে মধ্যদেশের সদাচারে শিথিলতা আসিল, ভাষা বিশুদ্ধতা হারাইয়া অপভাষায় পরিণত হইল। ক্রিয়া লোপাদি হেতু ও অপভাষা ব্যবহারের জন্য তাহারা মধ্যদেশের রক্ষণশীলগণের নিকট বাহ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। এই রক্ষণশীলগণ নিজদিগকে সুর বা দেব ও প্রগতিশীল, বাহ্য জাতিগণকে অসুর বা দস্যু এবং প্রগতিশীলগণের কথিত অপভাষাকে (অপভ্রংশকে) ম্লেচ্ছভাষা বলিতে লাগিলেন। রক্ষণশীল ঋষিরা তখনও কেবলমাত্র মধ্যদেশকেই আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যনিবাস বলিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রগতিশীল ঋষিরা সমগ্র উত্তর ভারতকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক সাহিত্যে সুর ও অসুর বৈমাত্র ভ্রাতা। বৈদিক সাহিত্যে শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।৩৪) তাহারা "দেবাশ্চ অসুরাশ্চ উভয়েবা

১। 'প্রাচ্যা মগধ শোণৌ চ বারেন্দ্রী গৌড় রাঢ়কাঃ
বর্দ্ধমান তামলিপ্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ।' (জ্যোতিস্তত্ত্ব, কূর্ম্মচক্র)

২। "মুখবাহূরুপাজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥" (মনু ২।৪৫)

মনুর ২।১৬৮ শ্লোকে আছে, যে দ্বিজ বেদাধ্যায়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করেন তিনি শীঘ্রই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

প্রাজাপত্যাঃ" (৫।১।১৮)। উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। তাঁহারা পরস্পরকে 'ভ্রাতব্য' বলিতেন। প্রথমে অঙ্গিরা ঋষি, তৎপর অথর্ব্ব ঋষি ও তৎপুত্র দধিচি অগ্নি পূজার প্রবর্ত্তন করিলেন[১]। দেব ও অসুর উভয়ে সেই অগ্নিযজ্ঞে যোগ দিতেন। শেষে যজ্ঞকারী বলিলে কেবল দেবগণকেই বুঝাইত। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে 'যজ্ঞেণ বৈ দেবাঃ' (১।৫।৫।২৬)। একদা 'দেব' শব্দের ন্যায় 'অসুর' শব্দও শ্রদ্ধাবাচক ছিল। ইন্দ্র (১।৫৪।৩), বরুণ (১।২৪।১৪), সবিতা (১।৩৪।১০), মরুৎ (১।৬৪।২), ত্বষ্টা (১।১১।৩), ইহাদের সকলেরই ঋগ্বেদে সম্মানসূচক অসুর উপাধি দৃষ্ট হয়। বেদে ১০৫ বার অসুর শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে ৯০ বারই ভাল অর্থে প্রযুক্ত। যতদিন দেবাসুরে সদ্ভাব ছিল, ততদিন অসুরদেরও মর্য্যাদা ছিল। পরে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা ও যুদ্ধ চলিত। যখন যুদ্ধ বাধিত, তখন ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য্য (৭।৯৯।৫, ৬।২২।৪, ৭।১৩।১, ১০।১৪০।৯, ৫।৪২।১১) দেবতাদের সাহায্য করিতেন। রুদ্র ছিলেন "মহান্ অসুর" (অহুর মজদা ?)[২]। অসুরেরা তাঁহার ভক্ত ছিল। বৃহস্পতি দেবতাদের ও শুক্রাচার্য্য অসুরদের গুরু ছিলেন।

এই প্রগতিশীল আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সরস্বতী তীর হইতে পূর্ব্বদিকে পুণ্ড্র দেশ পর্য্যন্ত আর্য্য সভ্যতা বিস্তার সম্বন্ধে বাজসনেয় সংহিতায় (শুক্ল-যজুর্ব্বেদ) মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে।

মনুসংহিতার (১০। ৪৩-৪৫ শ্লোঃ) লিখিত হইয়াছে "ক্রমশঃ ক্রিয়া লোপাদি হেতু পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড় কাম্বোজ (কাম্বোডিয়া), যবন (আইয়োনিয়া), শক (সিথিয়া), পারদ (পার্থিয়া), পহ্লব (পারস্য), চীন (ইণ্ডোচীন), কিরাত (হিমালয় প্রদেশ), দরদ (দর্দ্দিস্তান) ও খস (হিমাচল) দেশগত ক্ষত্রিয়েরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত (বৈদিকাচারহীন) বাহ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাহ্য জাতিতে পরিণত হইলে তাহারা আর্য্য ভাষীই হউক অথবা ম্লেচ্ছ ভাষীই হউক দস্যু বলিয়া পরিগণিত হয়[৩]।"

১। "ত্বমগ্নে প্রথমাহঙ্গিরাঋষিঃ (ঋক প্রথম মণ্ডল। ৩১ সূঃ। ১-২ঋক্)

২। "তমগ্নে রুদ্রো অসুরোমহো" (ঋগ্বেদ ২।১।৬।৬মঃ ১৬।১১-১৪)

৩ শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ৪৪

বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই "তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মান্ধাতা বংশীয় রাজা বাহুকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করে। পরে বাহুর পুত্র সগর বয়োপ্রাপ্ত হইয়া তালজঙ্ঘ, হৈহয় প্রভৃতিকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের মধ্যে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণ সগরের কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়। বশিষ্ঠের অনুরোধে রাজা সগর তাহাদিগকে বিনষ্ট না করিয়া যবনগণের মস্তক মুণ্ডিত, শকগণের মস্তক অর্দ্ধ মুণ্ডিত, পারদগণকে লম্বিতকেশ ও পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করিলেন ও তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৩ অঃ) ১।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত ধর্ম্মশাস্ত্র বর্ণিত ও পৌরাণিক জনশ্রুতিমূলক বিবরণ হইতে মনে হয় ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের অপর পারে ইরান্ শক, যবন (Ionia) প্রভৃতি রাজ্য ভারতীয় প্রগতিশীল ক্ষত্রিয়গণই স্থাপন করিয়াছিল। পাণিনির একটি সূত্র এইরূপ—'জনপদ শব্দাৎ ক্ষত্রিয়াদঙ্' (৪।১।১৬৮) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের নামে জনপদের নাম হইবে। এই সূত্রের কাত্যায়ণ এইরূপ বার্ত্তিক করিয়াছেন, 'পাণ্ডোর্ড্যন্'। এই বার্ত্তিক না করিলে 'পাণ্ড্য' শব্দের পরিবর্ত্তে 'পাণ্ডব' হইত। পাণিনির আর একটি সূত্র 'কম্বোজাল্লুক' (৪।১।১৭৫)। ইহার উপর কাত্যায়ণের বার্ত্তিক এইরূপ 'কাম্বোজাদিভ্যো লুগ্ বচনং চোড়াদ্যর্থং' অর্থাৎ কাম্বোজদের ন্যায় চোড়াদি অর্থেও দেশ, জাতি, ও দেশের রাজাকে বুঝায়। এই কাম্বোজগণ উত্তর পশ্চিম ভারতে ও কাম্বোডিয়ায় এবং পাণ্ড্য ও চোড়গণ ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের অধিবাসী এবং উত্তর ভারতের ঐ ঐ নামক ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক ঐ ঐ রাজ্যগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। 'পাণ্ড্যকে' কাত্যায়ণ পাণ্ডু শব্দ হইতে উদ্ভব বলিয়াছেন। এই পাণ্ডু উত্তর ভারতের একজন ক্ষত্রিয় রাজা। লক্ষ্য করিবার বিষয় দক্ষিণ ভারতের এই পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী মাদুরা বা মথুরা।

মুখবাহূরুপাজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৫

বিষ্ণুপুরাণে (৩। ১৮অঃ) বৌদ্ধ ও জৈনগণকে অসুর বলা হইয়াছে।

১। "স (সগরঃ) তথেতি তদ্গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বমকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্ পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্ নিঃস্বাধ্যায়বষটকার এতাননন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ-ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৩।২১)।

কেহ কেহ মনে করেন পারস্য উপকূলের চাল্ডি (Chaldae) রাজ্য দক্ষিণ ভারতের ঐ চোড় বা চোল জাতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই চাল্ডিয়গণই সুমেরিয় ও বাবিলনীয় (বাবিরুষ) রাজ্য স্থাপন করে। ঐ সম্বন্ধে বাবিলনীয়-গণের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, একদা এক মৎস্য-মানব আরব সাগর হইতে আসিয়া চাল্ডিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে নানা প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। পুরাণের মতে দক্ষিণ ভারতে বিষ্ণুর মৎস্যাবতার হইয়াছিল[১]। এই মৎস্যাবতারের মাহাত্ম্যই কি চোলগণ চাল্ডিয়ায় প্রচার করিয়াছিল? সুপণ্ডিত হল সাহেব নানা প্রমাণ দিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভারতের দ্রাবিড়গণই প্রাগৈতিহাসিক যুগে সুমের, বাবিলন ও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। (Hall's The Ancient History of the Near East pp 171-74)

অধ্যাপক ফ্লিণ্ডার্স পেট্রির মতে ইজিপ্টবাসিগণ মনে করিত যে, তাহারা লোহিত সাগরের পরপারের বহু দূরবর্ত্তী "পাণ্ট" (Punt) নামক দেশ হইতে আসিয়াছে। এই পাণ্টদেশ সম্বন্ধে তাহারা বলে, এই দেশ মহাসাগরের উপকূলে পর্ব্বত ও উপত্যকা মধ্যে অবস্থিত। সেখানে হস্তীদন্ত, নানাপ্রকার সুগন্ধ মশলা, ধূপ, রত্ন, চিতাবাঘ, নানা প্রকার বানর, বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী, চন্দন ও নারিকেল গাছ সমূহ উৎপন্ন হয় (Historian's History of the World, Vol I p. 77, 108)। হীরেণের (Heeren) মতে ইজিপ্টবাসীগণের করোটির আকার কোন কোন ভারতীয় জাতির করোটির সদৃশ (Historian's History of the World, Vol I pp. 77, 108)। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য ও পাণ্ট (Punt) দেশ অভিন্ন।

১। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, একটি মৎস্য মনুকে প্লাবন হইতে রক্ষা করে। ভাগবৎ পুরাণ, অষ্টম স্কন্ধে, 'মৎস্য চরিত কথা' নামক শেষ উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবী প্লাবিত হইলে দ্রাবিড়েশ্বর সত্যব্রতের নিকট একটি বৃহৎ নৌকা উপস্থিত হইল ও বিষ্ণু একশৃঙ্গধারী অযুত যোজন বিস্তৃত স্বর্ণময় মৎস্যের রূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা সত্যব্রত যাবতীয় বৃক্ষাদি ও প্রাণিগণ লইয়া ঋষিগণের সহিত সেই নৌকায় আরোহন করিলেন এবং সর্পরজ্জু দ্বারা নৌকাটিকে ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া প্রলয়ান্ত পর্য্যন্ত সেই প্রলয়পয়োধি জলে ভাসমান রহিলেন। প্রলয়ান্তে রাজা সত্যব্রত বৈবস্বত মনু নামে সপ্তম মনু হইলেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি মহাভারতের সময়ে সরস্বতী নদীর পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকায় বাহীকগণ বাস করিত। মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে লিখিত আছে, "*পর্ব্বত হইত নিঃসৃত হইয়া পঞ্চনদ যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে সেই দেশের নাম আরট্ট। সাধুলোক কদাচ দুই দিন তথায় থাকিবে না। বাহীকেরা বাহু ও* বহীক নামক পিশাচদ্বয়ের অপত্য[১], তাহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে এবং শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম জানে না। আরট্ট দেশ বাহীকগণের বাসস্থান। তথায় যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করে তাহারা বেদাধ্যয়ন কিম্বা যজ্ঞানুষ্ঠান করে না। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন (ব্রাত্য) দুরাচারগণের অন্ন ভোজন করে না। আরট্ট দেশের ন্যায় মদ্র, গান্ধার, খস, সিন্ধু ও সৌবীর দেশেও ঐরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।…পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম, কৌরবেরা সত্যধর্ম্ম, মৎস্য ও শূরসেনবাসীরা যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্ম পালন করেন। পূর্ব্ব দেশীয়েরা শূদ্রধর্ম্মী, দাক্ষিণাত্যগণ ধর্ম্মদ্রোহী, বাহীকেরা তস্কর ও সৌবীরেরা (মুলতান) সঙ্কর। অঙ্গ ও মগধ দেশীয় বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্ট জনের আচারের অনুসরণ করিয়া থাকেন (কর্ণ ৪৫।৪৬ অঃ)।"

ঋগ্বেদে সরস্বতী তীরস্থ পণি নামক জাতির উল্লেখ আছে, ৬।৬১।১ ঋকে বলা হইয়াছে, "এই সরস্বতী বধ্র্যশ্বকে দিবোদাস নামক পুত্র দিয়াছেন। যিনি আত্মচিন্তনকারী দানবিমুখ পণিগণকে সংহার করিয়াছেন।" ৬।২০।৪ ঋকে বলা হইয়াছে, "ইন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কুৎস হইতে ভীত হইয়া পণিগণ শত সৈন্য সহ পলায়ন করিয়াছে"। অনেকে মনে করেন, এই পণি জাতিই বাণিজ্যতরী যোগে[২] ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে উপস্থিত হইয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ভারতীয় পণিগণের এই উপনিবেশ গ্রীকগণের নিকট "ফিনিকিয়া" (Phinaekia) নামে পরিচিত ছিল। পণিগণ সম্ভবতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের পনিক ও বণিক[৩]। সংস্কৃত পণ, পণ্য, বিপণি শব্দগুলি এই 'পণি' নামের সহিত সম্বন্ধসূচক। রোমানগণ এই জাতিকে পণিক (Punic) বলিতেন। ফিনিকিয়া উপনিবেশটি টায়ার নগর হইতে উত্তরে আরাডস নগর পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৬০ ক্রোশ ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে লেবানন পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রস্থে ১০ ক্রোশ ছিল। ফিনিকিয়ার সমুদ্রোপকূলের বালুকা

১। এই বাহীকগণের ভাষাই কি 'ব্রাহুই ভাষা'?

২। ঋগ্বেদে (৬।২০।১২, ৬।৪৫।১, ১০।৬২।১০) আর্য্যগোষ্ঠীগণের সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ আছে।

৩। বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বার্ত্তিকঃ পণিকো বণিক্।' (রাজ নির্ঘণ্ট)

হইতে উত্তম কাঁচ ও সমুদ্রে একপ্রকার মৎস্য হইতে লাল রং প্রস্তুত হইত। লেবানন পর্ব্বতের খনি হইতে তাম্র ও লৌহ প্রচুর পাওয়া যাইত। এখানকার দেবদারু বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে অর্ণব-যান প্রস্তুত হইত। ফিনিকিয়ার প্রধান বন্দর ছিল ছয়টি, যথা—আরাসস, ট্রিপলিস্, বাইব্রস, বেরাইটস্, সাইডন ও টায়ার। টায়ার নগর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এই পণি বা পণিকগণ ভূমধ্যসাগরের উপকূলে আফ্রিকাতে কার্থেজ ও উটিকা এবং স্পেন দেশে কেডিজ নামক প্রসিদ্ধ বন্দর স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ হইতে নানা প্রকার পণ্য আমদানী করিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার বাজারে বিক্রয় করতঃ অত্যন্ত ধনশালী ও শক্তিশালী হইয়াছিল। ইহারা ইউরোপে বর্ণলিপি, মুদ্রার ব্যবহার ও ওজনের পরিমাণ প্রচলিত করিয়াছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ ও ইরাক (মেসোপোটামিয়া) ও এসিয়া মাইনরের যে যোগাযোগ ছিল, প্রায় ২১০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের শিলালিপির প্রমাণ হইতে তাহা জানা যায়। বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য, সূর্য্য ও মরুৎ দেবের নাম এশিয়া মাইনরের বোগাস্কুই শিলালিপিতে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্ত্তী মিটান্নি রাজ্যের তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে এবং সিরিয়ার ক্যাসাইট (Kassite)-দের রেকর্ডে পাওয়া যায়। ক্যাসাইটেরা বোধ হয় ভারতীয় খস জাতি। খসেরা হিমালয় প্রদেশের জাতি বিশেষ। মনু-সংহিতায় খসদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে (১০।২২ শ্লোঃ)। তেল-এল-অমরনার রাজা তশরত্ত (Tusratta) যে পত্রগুলি মিশরের রাজা আমেন হোটপকে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মিটান্নির রাজার সহিত আসিরিয়া (আসুর) রাজ্যের যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া আছে। এই লিপিগুলিও বোগাস্কুই লিপির সমসাময়িক। মিটান্নির রাজাদের মধ্যে তশরত্ত (দশরথ), অর্ত্ততম, সুতর্ণ, আর্ত্তসুমর প্রভৃতি রাজা বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও নাসত্যের পূজা করিতেন। ইহার পাঁচশত বৎসর পরে (১৭৭৬-৮০ খৃঃ পূঃ) ক্যাসাইটরা বাবিলন অধিকার করিয়াছিল। ক্যাসাইটেরাও বৈদিক সূর্য্য (Shuriash) ও মরুৎ (Marutta) দেবের উপাসক ছিলেন। সিমালিয়া (Shimalia) বা তুষার ধবল পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবী (বৈদিক হিমালয় পর্ব্বত) ইহাদের পরিচিত ছিল। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের তৃতীয় থুৎমসিস্ (Thutmosis) এশিয়ায় যুদ্ধযাত্রা কালে মিটান্নিরাজকে পরাজিত করেন (মিশরের কর্ণাকের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যস্থ তৃতীয় থুৎমসিসের প্রশস্তি দ্রষ্টব্য)। রাজা তশরত্তের সময় হইতে মিটান্নি রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়। তাঁহার পুত্র

মত্তিউয়স ১৩৬৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিরিয়ার উত্তরে অবস্থিত কাপাডোসিয়া রাজ্যের খাটি (Khati বা Hittite) রাজ কর্ত্তৃক পিতৃরাজ্যে স্থাপিত হন। এই ঘটনার অল্পদিন পর মিটান্নি রাজ্য খাটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে বাবিলনের শেষ রাজা কাষ্টিলিয়াস আসুর রাজ[১] প্রথম তিগলাত পিলেসার কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন।

শেষ আসুর রাজ আসুরবনীপাল মাটির টালিতে লিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর চাল্ডীয়, মিডাস (মদ্র) ও পারসীকরা[২] মিলিয়া আসুর রাজ্য ধ্বংস করে (৬০৬ খৃঃ পূঃ) ও *চাল্ডীয়গণ বাবিলনে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইহার ৬৭ বৎসর পর শেষ* চাল্ডীয় রাজ নরোনিডাসকে পরাজিত করিয়া পারস্যরাজ কুরুস্ (Cyrus) বাবিলন অধিকার করেন।

আর্য্যদের যে শাখা পারস্যে গমন করিয়াছিল, তাহারাই সম্ভবতঃ উত্তর কুরু ও উত্তর মদ্র নামে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের রাজাদের মধ্যে 'কুরু' (Cyrus) নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা 'আবেস্তা' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। আবেস্তার একটি ভাগের নাম যস্ন (যজ্ঞ), দ্বিতীয় ভাগের নাম গাথা, তৃতীয় ভাগের নাম ভেন্দিদাদ। ভেন্দিদাদে অহুর মজ্‌দ্ ও জরথুস্ত্রের মধ্যে প্রশ্নোত্তরগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চতুর্থ ভাগের নাম যষ্‌ত্‌(ইষ্ট)। ইহাতে হব্য ও স্তুতি নিবেদন দ্বারা পূজা পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে। আবেস্তার কতকাংশ পহ্লবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। উহাকে জেন্দ বলা হয়।

আবেস্তার যস্ন নামক প্রথম ভাগের একটি স্তোত্র এইরূপ—

"যুঝেম্ জেবিষ্ঠ্যাং হো এষ-ক্ষত্রেং চা সবংহাম্" (জেন্দাবেস্তা, যস্ন৯)।

(যুঝেম্ = যুয়ম = তোমরা। জেবিষ্ঠ্যাং হো = যবিষ্ঠাসঃ = জবনতম (বেগবত্তম্)

১। প্রকৃত আসুর (Assyria) টাইগ্রিস নদীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ এক্ষণে কুর্দ্দিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সম্ভবতঃ বৈদিক অসুর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ইহারা সমগ্র বাবিলন রাজ্য অধিকার করিয়া নিনেভ নগরে রাজধানী করে।

২। পার্থিয়া, পারস্য ও মিডিয়ার অধিবাসী ও তাহাদের ভাষাকে ইরাণী ও তাহাদের দেশকে ইরাণ বলা হয়। পাণিনিতে (৫।৩।১১৭) ইহাদিগকে 'পশু' বলা হইয়াছে।

এষ=ইষ্=ইচ্ছা, ক্ষত্রেং=ক্ষত্রং=রাজা, চা=চ+আ=সম্বন্ধে, সবংহাম্=স্ববসাং=স্বকামনার জন্য। তোমরা কামনা পূরণের জন্য, যিনি ইচ্ছার রাজা তাঁহার দিকে বেগবত্তম (ধাবিত হও।) ভারতীয় বেদের ভাষা পারস্যে প্রবেশ করিয়া কিরূপ অপভাষায় পরিণত হইয়াছে এই স্তোত্রটি তাহার একটি উদাহরণ।

ভেন্দিদাদে (২।২২) অহুর মজদা ইরাণীদের আদি পুরুষ যিমকে 'বিবংঘতের পুত্র' বলিয়াছেন। তাহাদের আদি বাসস্থান 'আরিয়ানা বীজো'কে দৈত্যানদী তীরস্থ (১।৩) বলা হইয়াছে। "The first of the good lands which Ahur mazda created was Airyana Vaejo, by the good river Daitya' (ডারমেষ্টারের অনুব'দ)। দৈত্যা নদী কি দৃষদ্বতী ও আরিয়ানা বীজো কি আর্য্যাবর্ত্ত? ঋগ্বেদে (১০ম। ১৪ সুক্ত) যম ও মনুকে বিবস্বানের পুত্র বলা হইয়াছে। বিবংঘত=বিবস্বং (সূর্য্য) ও যিম=যম হইলে ইরাণীদের পূর্ব্ব পুরুষ যম ও হিন্দুদের পূর্ব্ব পুরুষ মনু পরস্পর ভ্রাতা হইতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন লিপি সমূহের বিবরণের সহিত বিষ্ণুপুরাণ ও মনুসংহিতার বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে মনে হয় বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য, সূর্য্য, মরুৎ, প্রভৃতির উপাসক ভারতীয় প্রগতিশীল আর্য্যগণ ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর ও আইয়োনিয়া (যবন দেশ) পর্য্যন্ত উপনিবিষ্ট হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে ভারতে যে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত মানবগোষ্ঠীগুলি দৃষ্ট হয় তাহারা ভারতেই জন্মাক, কি ভারতের বাহির হইতেই আসিয়া থাকুক সে প্রশ্নের নিখুঁত মীমাংসা এখন আর সম্ভব নহে। কিন্তু আর্য্যসভ্যতা যে ভারতের সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মর্ষি দেশে জন্ম লাভ করিয়া মধ্যদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং তথা হইতে সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরেও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা বলা অসঙ্গত হয় না। বর্ণাশ্রম প্রথাও এই মধ্যদেশেই উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রথমতঃ চারি প্রকার কর্ম্ম অনুসারে ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হয় [ঋগ্বেদ পুরুষ সূক্ত, গীতা (৪।১৩, ১৮।৪১)]। তৎপর সমাজের যতই বিকাশ হইতে লাগিল ততই নানা প্রকার নূতন নূতন কর্ম্মেরও উৎপত্তি হইল এবং সেই সকল কর্ম্মে চারিবর্ণ হইতে নূতন নূতন লোক যোগদান করিয়া নূতন নূতন দল গড়িয়া তুলিতে লাগিল এবং কর্ম্মানুসারে প্রতিটি দল বিভিন্ন নামে পরিচিত হইতে লাগিল। প্রথমে জাতিভেদ বংশগত ছিল না, গুণ ও কর্ম্মই ইহার নিয়ামক ছিল। কালক্রমে রক্ষণশীলতা প্রবল হইয়া

যখন জাতি বংশগত হইতে লাগিল, তখন এই সকল নূতন নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত নূতন জাতিগুলিও বংশগত হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ তখন এই নূতন জাতিগুলির পরিচয় দিবার জন্য সঙ্করবাদের উদ্ভাবন করিলেন। বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে সকলেই এই বংশগত জাতিভেদ ও তাহার ফলস্বরূপ যে অস্পৃশ্যতা দুষ্টক্ষতের মত সমগ্র সমাজদেহকে দূষিত করিয়াছে সেই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াও ইহার মূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

খুব সম্ভব সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেন অথবা তৎপুত্র রাজা বল্লালসেনের সময় রচিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে যে জাতিমালা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জাতিমালাই প্রায় অপরিবর্ত্তিতভাবে অদ্যাপি বর্ত্তমান বাঙলা দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, ব্রাহ্ম সমাজ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের প্রভাবে, বিশেষ করিয়া সর্ব্বস্তরে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আধুনিক শিক্ষা প্রচারের ফলে জাতিভেদের কঠোরতা ও অস্পৃশ্যতার বিষ বহুপরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে ও হইতেছে।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের (উত্তর খণ্ড। ১৪ অঃ) মতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটি মাত্র বর্ণ বর্ত্তমান। (তন্মধ্যে) শূদ্রবর্ণ ছত্রিশটি সঙ্কর জাতিদ্বারা গঠিত "ষট্ত্রিংশ জাতীয়ঃ শূদ্রাঃ যুগং ভূতাস্তু সঙ্করাঃ (২৬শ্লো)। তন্মধ্যে (১) করণ (কায়স্থ) (২) অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) (৩) উগ্র (আগুরী) (৪) মাগধ (৫) তন্তুবায় (৬) গন্ধবণিক (৭) নাপিত (৮) গোপ (৯) কর্ম্মকার (১০) তৌলিক (তিলি) (১১) কুম্ভকার (১২) কংসকার (১৩) শাঙ্খিক (শাঁখারী) (১৪) দাস (চাষী কৈবর্ত্ত) (১৫) বারুজীবী (বারুই) (১৬) মোদক (১৭) মালাকর (১৮) সূত (১৯) রাজপুত্র (২০) তাম্বুলী, এই বিশটি জাতি উত্তম সঙ্কর (২১) তক্ষণ (সূত্রধর) (২২) রজক (ধোপা) (২৩) স্বর্ণকার (২১) স্বর্ণ বণিক (২৫) আভীর (২৬) তৈলকার (২৭) ধীবর (২৮) শৌণ্ডিক (২৯) শরাক (৩০) নট (৩১) জালিক (৩২) শেখর, এই দ্বাদশটি মধ্য সঙ্কর; এবং (৩৩) মলগ্রাহী (মেথর) (৩৪) কুড়ব (কাওড়া) (৩৫) বরুড় (বাউরী) (৩৬) চণ্ডাল, এই চারিটি অধম সঙ্কর। এতদ্ব্যতীত তক্ষ, ঘট্টজ (ঘটিয়াল), দোলাবাহী, মল্ল (মালো), চর্ম্মকার এই পাঁচটি জাতিকেও অধম সঙ্কর বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই আদি চারিটি জাতি যাহাদের মাতা ও পিতা তাহাদিগকে উত্তম সঙ্কর এবং যাহাদের পিতা উত্তম সঙ্কর, মাতা আদি চারিবর্ণের অন্তর্গত তাহারা মধ্যম সঙ্কর, যাহাদের মাতা পিতা উভয়েই সঙ্কর তাহারা অধম সঙ্কর। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ

উত্তম সঙ্করগণের পুরোহিত। কিন্তু মধ্যম ও অধম সঙ্করগণের পুরোহিত পতিত ব্রাহ্মণ। এতদ্ব্যতীত দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও গণকব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে।

রঘুনন্দন তাঁহার শুদ্ধি তত্ত্বে লিখিয়াছেন, "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়া দীণামপি শূদ্রত্বং। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাৎ বৈশ্যানামপি তথৈব অম্বষ্ঠাদীণামপীতি শূদ্রত্বমিতি," অর্থাৎ ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতিও শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। মনুর মতে 'করণ' ব্রাত্য ক্ষত্রিয় (১০।২২। শ্লোঃ)। অম্বষ্ঠকে আয়ুর্ব্বেদ ও নীতিজ্ঞ বলিয়া করণকে রাজকার্য্য প্রদান করা হয় (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড ১৪।৩০-৩১ ও ৪১ শ্লোঃ)। লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক এড়ুমিশ্রের কুলকারিকায় লিখিত আছে, বল্লালসেন দেবীর বরে দুই প্রহরের মধ্যে ৭০০ঘর ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন (৩৭-৪১ শ্লোঃ)[১]। তাঁহাদের সহিত আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মিলনে বাঙলার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজ গঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণও বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বোক্ত চারিশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান ছিল না। কায়স্থগণ বারেন্দ্র, বঙ্গজ, উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী এই চারি শ্রেণীতে, বৈদ্যগণ বারেন্দ্র, বঙ্গজ ও রাঢ়ী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যেও বৈবাহিক আদান প্রদান ছিল না। ব্রাহ্মণের অন্ন সকল বর্ণের গ্রহণীয় ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ অন্য কোন জাতির অন্ন ভোজন করিতেন না। ব্রাহ্মণ ও উত্তম সঙ্করের মধ্যে পরস্পরের জল গ্রহণীয় ছিল। উত্তম সঙ্করের মধ্যে পরস্পরের ভোজ্যান্নতা ছিল না। মধ্যম ও অধম সঙ্করের জল কিংবা অন্ন ব্রাহ্মণ কি উত্তম সঙ্করের গ্রহণযোগ্য ছিল না। অধম সঙ্করগণ অস্পৃশ্য ছিল। জাতির গণ্ডী অলঙ্ঘনীয় ছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর অস্পৃশ্যতা আইনবিরুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে। জাতিভেদের কঠোরতা নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে ভোজ্যান্নতা, এমনকি বৈবাহিক সম্বন্ধ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে। সমাজতন্ত্রবাদী সরকার সর্ব্বপ্রকার ভেদ উঠাইয়া দিবার সপক্ষে আইন প্রনয়ণ করিয়াছে। সর্ব্বস্তরে শিক্ষা প্রচারের ফলে কুসংস্কার অন্তর্হিত হইয়া দেশে সমাজতন্ত্রবাদ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

১। কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এড়ুমিশ্রের একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত কারিকার খণ্ডিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তদৃষ্টে ১৫-৪৩ শ্লোকগুলি ১৩৪৭ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যার ৭০২-৭০৪ পৃষ্ঠায় মন্তব্যসহ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে বল্লাল কর্ত্তৃক ৭০০ঘর ব্রাহ্মণ সৃষ্টি ও কৌলীন্য মর্য্যাদা সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩৩ অঃ ৬ খণ্ড) পুণ্ড্রগণকে বিশ্বামিত্র বংশীয় বলিয়া একটি প্রবাদের উল্লেখ আছে। 'একদা বিশ্বামিত্র অজিগর্ত্ত ঋষির পুত্র শুনঃশেপকে (মধুচ্ছন্দা) পুত্রত্বে বরণ করিয়া নিজ শতপুত্রকে বলিলেন, তোমরা নিজদিগকে শুনঃশেপের জ্যেষ্ঠ ভাবিও না। যে পঞ্চাশজন শুনঃশেপের বয়োজ্যেষ্ঠ তাহারা পিতার আদেশ মান্য করিল না। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে শাপ দিলেন, তোমাদের বংশধরগণ প্রত্যন্ত প্রদেশ ভোগ করুক। এইরূপ বহু প্রবাদ আছে যে পুণ্ড্র, অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিবগণ ঐ বিশ্বামিত্র বংশীয় ও দস্যুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' ঐতরেয় আরণ্যকে একটি প্রাচীন ঋকের ব্যাখ্যাস্থলে বলা হইয়াছে 'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' অর্থাৎ বঙ্গ, বগধ (মগধ) ও চেরগণ পক্ষী ধর্ম্মী অর্থাৎ পক্ষিগণের ন্যায় যাযাবর[১]। অথর্ব্ববেদ সংহিতায় পূর্ব্বে মগধ ও অঙ্গ, এবং পশ্চিমে গান্ধার দেশ ও মুজবান্ পর্ব্বতের উল্লেখ আছে[২]।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।১।১৪-১৭) এইরূপ লিখিত আছে—"রাজা বিদেঘ মাথব সরস্বতী তীরে ছিলেন। অগ্নি ঐ স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে এই পৃথিবীকে দহন করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন। বিদেঘ মাথব ও (তাঁহার পুরোহিত) রাহুগণ গৌতম সেই দহন-প্রবৃত্ত অগ্নির পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নি সমস্ত নদী (দৃষদ্বতী, যমুনা, সরযু, গণ্ডকী, কুশী)কে অতিক্রম করিয়া বিদগ্ধ করিল, কিন্তু উত্তরগিরি বিনির্গত সদানীরা (করতোয়া) নদীকে অতিক্রম করিয়া বিদগ্ধ করে নাই। এইজন্য ব্রাহ্মণেরা পুরাকালে ঐ নদী পার হইতেন না। এখন তাহার পূর্ব্বপারে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিয়াছেন। সেই সময় ঐ স্থান ক্ষেত্রের অযোগ্য ও জলপ্রচুর ছিল।

১। 'ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের-পাদাস্ত্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি' (ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১)। বর্ত্তমানে চেরগণ মধ্য প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলের ও দক্ষিণ ভারতে কেরল দেশের অধিবাসী। 'বগধ'কে কেহ কেহ দক্ষিণ বঙ্গের 'বাগদি' জাতি বলিয়া মনে করেন।

২। 'গন্ধারিভ্যো মুজিবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।' (অথর্ব্ব সংহিতা ৫।২২।১৪) কান্দাহার হইতে রাওলপিণ্ডি পর্য্যন্ত ভূভাগকে গান্ধার দেশ বলা হইত। তক্ষশীলা এই দেশের রাজধানী ছিল।

কেননা বৈশ্বানর অগ্নি তাহার স্বাদ গ্রহণ করে নাই; কিন্তু এখন তাহা ক্ষেত্রযোগ্য হইয়াছে। এবং ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিকে ইহার আস্বাদন করাইয়াছেন। এই সেই সদানীরা এখনও কোশল-বিদেহদিগের (পূর্ব্ব) সীমা 'কোশল বিদেহাণাং মর্য্যাদা' এবং এই দুই জনপদ মাথব (বলিয়া প্রসিদ্ধ)[১]।"

এই বৈদিক কাহিনী হইতে অনুমান হয় যে আর্য্য সভ্যতা বৈদিক যুগেই সরস্বতী তীর হইতে করতোয়ার পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

মহাভারতের আদি পর্ব্বে (১০৪।৫০-৫৬) পুণ্ড্র (বারেন্দ্র), সুহ্ম (রাঢ়) ও বঙ্গ (পূর্ব্ব বঙ্গ) সম্বন্ধে বৈদিক যুগের একটি কাহিনীর উল্লেখ আছে। একদা অন্ধ দীর্ঘতমা ঋষি স্বীয় পুত্রগণ কর্তৃক হস্তপদাবদ্ধ অবস্থায় গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে বলিরাজার প্রাসাদের ধার দিয়া যাইতেছিলেন। রাজা বলি গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া দীর্ঘতমাকে দেখিয়া তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া স্বগৃহে আনয়ন করেন। রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। রাজার নিয়োগক্রমে উক্ত ঋষি রাজমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ নামক পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্মদান করেন। বলিরাজের এই পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র স্ব স্ব নামে অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র বঙ্গ, কলিঙ্গ নামে পাঁচটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন[২]।

১। উপরে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল। সদানীরা নদীর অর্থ সায়নাচার্য্য করতোয়া বলিয়া লিখিয়াছেন। অমরকোষেও (১-.৩-৩২) সদানীরার অর্থ করতোয়া। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন কোশল ও বিদেহ জনপদ তৎকালে এক নৃপতির অধীন ছিল। সেই নৃপতিই মাথব। সেই জন্য ঐ দুই জনপদকেই মাথব বলা হইত এবং করতোয়া পর্য্যন্ত ঐ রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

(বিধুশেখর শাস্ত্রী কৃত শতপথ ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১৩৮-৩৯। সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।)

'করতোয়া মাহাত্ম্যে'ও করতোয়াকে সদানীরা বলা হইয়াছে। মৎ-প্রণীত 'বগুড়ার ইতিহাসে' ও 'Mahasthan and its Environs' নামক গ্রন্থদ্বয়ে সমগ্র 'করতোয়া মাহাত্ম্য' মুদ্রিত হইয়াছে।

২। হরিবংশের মতে (৩১।৩৩-৩৫) এই বলি (প্রহ্লাদের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র) অসুররাজ বলি ছিলেন। তিনি মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে স্বস্থান সুতলে গমন করেন।

মহাভারতের মতে ঋষি দীর্ঘতমার মাতার নাম মমতা ও পিতার নাম উতথ্য ঋষি। এই দীর্ঘতমা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্তের রচয়িতা। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৩৯ অঃ ৯ম খণ্ড) লিখিত আছে যে ইনি ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা ভরত দৌষ্মন্তিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ৪।২।৫২ সূত্রের কাত্যায়ণ যে বার্ত্তিক করিয়াছেন তাহার ভাষ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি এই দেশগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"অঙ্গানাং বিষোয়ো দেশঃ অঙ্গাঃ॥ বঙ্গাঃ॥ সুহ্মাঃ॥ পুণ্ড্রাঃ॥" পতঞ্জলি অনুমান ১৫৫ খৃঃ পূঃ সুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন (১।১।৬৮, ৩।১।২৬, ৩।২।১১১ সূত্র মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য)। সুতরাং খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের বহু পূর্ব্বেই এই জনপদগুলির নাম সুপরিচিত ছিল।

মহাভারত সভাপর্ব্বে (৩০ অঃ।২২-২৫) ভীমসেনের পূর্ব্বদিক বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে "তিনি পুণ্ড্রদেশাধিপতি মহাবল বাসুদেবের ও কৌশিকীকচ্ছের রাজা মহৌজাকে পরাজিত ও বঙ্গ রাজকে যুদ্ধে পলায়িত করিলেন। অতঃপর তাম্রলিপ্তরাজ সমুদ্রসেন ও কর্ব্বটপতি চন্দ্রসেনকে জয় করিয়া সুহ্মাধিপতি ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।"

মহাভারত ও হরিবংশে এই পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব "পৌণ্ড্রক বাসুদেব" নামে অভিহিত হইয়াছেন। হরিবংশের মতে (১৩২ অঃ) যদুবংশীয় বসুদেবের অপর পত্নী সুতনুর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্যগণ মধ্যে (মহা, আদি ১৮৬ অঃ) ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত নৃপতিবৃন্দ মধ্যে (সভাপর্ব্ব, ৩৪ অঃ) আমরা এই পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে দেখিতে পাই। এই রাজসূয় যজ্ঞে পুণ্ড্রগণ কৌষেয় বস্ত্রাদি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে[১] অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পৌণ্ড্রগণ পরাক্রান্ত হস্তীসৈন্য লইয়া কৌরব পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন (মহা, কর্ণপর্ব্ব ১।২৩ অঃ)। বৌদ্ধ

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন "যঃ পূর্ব্বং বলি দানবেন্দ্র আসীৎ স এব সুতপসঃ পুত্রো বলি নাম অভুৎ। স্বস্থানং সুতলং।" বিষ্ণুপুরাণের মতে চন্দ্র বংশীয় যযাতির পুত্র অনু হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষে সুতপার পুত্র বলি। ইনি পূর্ব্বদেশের রাজা ছিলেন।

১। বরাহমিহিরের মতে (বৃহৎ সংহিতা, সপ্তর্ষিচার, ৩ শ্লোঃ) খৃঃ পূঃ ২৪৪৯ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে সম্রাট হইয়াছিলেন।

পালি সাহিত্যে (অঙ্গুত্তর নিকায়) ও জৈন ভগবতী সূত্রে জম্বুদ্বীপের (ভারতবর্ষের) ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ আছে। ইহা খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকের কথা। এই মহাজনপদগুলি স্ব স্ব প্রধান ছিল। ইহাদের নাম—(১-২) অঙ্গ-মগধ, (৩-৪) কাশী-কোশল, (৫-৬) বজ্জি-মল্ল, (৭-৮) চেদি-বৎস, (৯-১০) কুরু-পঞ্চাল, (১১-১২) মৎস্য-সুরসেন, (১৩-১৪) অশ্মক-অবন্তী, (১৫-১৬) গান্ধার-কাম্বোজ। ইহার মধ্যে অঙ্গরাজ্য ও মগধরাজ্য পূর্ব্বদেশে অবস্থিত। এই ষোড়শ জনপদের মধ্যে সুহ্ম (রাঢ়), পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) ও বঙ্গের উল্লেখ নাই।

প্রাচীন যুগ

পূর্ব্বাংশ খৃঃ পূঃ ৬২৩—৩১৮ খৃষ্টাব্দ

নাগ (হর্য্যঙ্ক)—শিশুনাগ—নন্দ—মৌর্য—সুঙ্গ—কাণ্ব—যবন শক—কুশান বংশ

খৃঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ শতক পৃথিবীতে কয়েকজন প্রধান চিন্তানায়ক, ধর্ম্মনেতা ও রাষ্ট্রনেতার কার্য্যকালরূপে গৌরবান্বিত। এই সময় চীনদেশে কনফিউসিয়াস ও লাওৎসে, পারস্যে স্পিতম জরথুশ্‌ত্রো এবং ভারতে বর্দ্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ প্রভাব বিস্তার করেন। এই সময়েই হথামনীষ (Achaemenian) বংশীয় সম্রাট প্রথম কুরুষ্‌ খৃঃ পূঃ ৫৫৮-৫৩০ ও কম্বুস খৃঃ পূঃ ৫৩০-৫২২ এবং দারয়বউস খৃঃ পূঃ ৫২২-৪৮৬-তে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তৎকালে তাহার তুলনা ছিল না[১]। আবার প্রায় এই সময়েই ভারতের পূর্ব্বদিকে রাজা বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রু মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

১। ইহার পূর্ব্বে আদিম তাম্র ও লৌহ যুগে দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়ার নিম্নলিখিত সাম্রাজ্যগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যস্থিত ভূভাগের নাম ইরাক। গ্রীকেরা ইহাকে মেসোপোটামিয়া বলিত। ইহার পশ্চিমে সিরিয়া (দামাস্কাস)। সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে জেরুজালেম। ইরাকের দক্ষিণ-পূর্ব্বে সুমের রাজ্য ছিল। সুমেররা বোধহয় দ্রাবিড় জাতীয় ছিল। ইহাদের স্থাপিত এরিডু (Eridu) সহর অনুমান খৃঃ পূঃ ৬৫০০ অব্দের সমকালে সম্ভবতঃ সমুদ্রতীরেই অবস্থিত ছিল। নিপুর নগরে ইহাদের প্রধান দেবতা এনলিল (Enlil)-এর ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির (tower) ছিল। ইরেক (Erech) নগরের দেবতার প্রধান পুরোহিত সুমেরদের সকল নগরের উপর আধিপত্য করিত। ইহারা গরু, গাধা, ও মেষ পালন করিত; কিন্তু ঘোড়া সম্বন্ধে ইহারা অজ্ঞ ছিল। ইহারা মস্তক মুণ্ডিত করিত ও মাটির কাঁচা ইটের উপর আঁচড় দিয়া লিখিত। তাম্র ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানিত। বর্শা ও ঢাল লইয়া যুদ্ধ করিত ও জলাশয় হইতে জল লইয়া কৃষিকার্য্য করিত। এই সভ্যতার সহিত পঞ্জাব, সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচীন তাম্রযুগের সভ্যতার সাদৃশ্য ছিল।

কনফিউসিয়াস (Confucius—খৃঃ পূঃ ৫৫১-৪৭১)—চীনের চৌ *রাজবংশের রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে লু রাজ্যের লু নগরে সম্ভ্রান্ত কিন্তু দরিদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লু রাজ্যের চুং টু সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।* তিনি সমগ্র চীন দেশের জন্য একটি "আচরণবিধি" প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার এই "আচরণবিধি" অদ্যাপি চীনদেশবাসীগণের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ইহারা সমুদ্রগামী নৌযান প্রস্তুত করিত। বাইবেলে সুমেরকে সিনার (Shiner) নগর বলা হইয়াছে। সিরিয়ার ক্যানানাইটেরা ও প্যালেষ্টাইনের ইহুদীরা (হিব্রু) ও আরব দেশের অধিবাসীরা সেমিটিক জাতীয় ছিল। এই সেমিটিক জাতীয় রাজা সার্গন (Sargon) ২৭৫০ খৃঃ পূঃ সুমেরগণকে পরাজিত করিয়া পারস্য উপসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। আক্কাড নগরে ইঁহার প্রধান রাজধানী ছিল। এই সময় সেমিটিকেরা পরাজিত সুমেরদের ভাষা, লিপি ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া সুমেরদের সহিত মিশিয়া যায়।

খৃঃ পূঃ প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সুরু করিয়া প্রাচীন মিসরে মোট ৩১টি রাজবংশ রাজত্ব করে। পরে পারসীকেরা মিশর দখল করে। ৩৩২ খৃঃ পূঃ গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার করিয়া লন। মিশরের প্রথম চারিটি রাজবংশের রাজ্যকালকে পুরাতন রাজ্য বলা হয়। এই সময়ে বিখ্যাত পিরামিডগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আক্কাডিয় রাজ্যের পূর্ব্বদিকে সুসা (Susa) নগরে অর্দ্ধসভ্য ইলামাইটরা (Elamite) ও পশ্চিম দিকে বাবিলন নগরে এরোমাইটেরা (Aromite) বাস করিত। এরোমাইটদের রাজা হামুরাবি (Hammurabi) খৃঃ পূঃ ২১০০ অব্দের সমকালে সুমের ও আক্কাড রাজ্য ধ্বংস করিয়া বাবিলনীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

ইহার প্রায় এক শতাব্দী পর ইলামাইটদের সুসা রাজ্যের উত্তরে ও বাবিলনের পূর্ব্বে বসবাসকারী বৈদিক দেবতার উপাসক ক্যাসাইটেরা (Kassite) অশ্ব ও অশ্বচালিত রথের সাহায্যে বাবিলনীয় রাজ্য আক্রমণ করে। এই সময়ে টাইগ্রিস নদীর উপর দিকে পূর্ব্বতীরে আসুরেরা (Assyrian) আসুর ও নিনেভ নগরে বাস করিতেছিল। লম্বা দাড়ি, উচ্চ টুপি ও লম্বা পোষাক ইহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাদের উত্তর পশ্চিমে ও সিরিয়ার উত্তরে ক্যাপাডোসিয়া (বোগসকুই) নগরে হিটাইটদের বাস ছিল। হিটাইটেরাও বৈদিক দেবতার উপাসক ছিল ও খাটি নগরে ইহাদের রাজধানী ছিল। আসুরদের সহিত হিটাইটদের সংঘর্ষ চলিত।

লাওৎসে (Lao-tse—জন্ম খৃঃ পূঃ ৬০৪) চৌ রাজবংশের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের বিষয়গুলি সূত্রাকারে লেখা—সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। ইহাতে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ লিখিত হইয়াছে। জগতের সুখ দুঃখ ও ক্ষমতার লোভ প্রভৃতির উপর উদাসীন মনোভাব প্রদর্শন ও সরল সহজ জীবন যাপন করাই তাঁহার উপদেশের মূলমন্ত্র। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সম্বন্ধে

বৈদিক দেবতার উপাসক মিটান্নিরাজ তশরত্ত (Tusratta) কিছুদিনের জন্য আসুররাজ্য নিনেভ অধিকার করেন। ১১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আসুররাজ প্রথম টিগলাথ পিলেসার (Tiglath Pileshar I) অশ্ব ও রথের সাহায্যে বাবিলন জয় করেন এবং উভয় নগরেই প্রভুত্ব করেন। ৭৪৫ খৃঃ পূঃ তৃতীয় টিগলাথ পিলেসার পুনরায় বাবিলন অধিকার করেন। অতঃপর দ্বিতীয় সার্গন (Sargon II) আসুররাজ্য অধিকার করেন। সার্গনের প্রপৌত্র আসুর বনীপাল মিশরের নিম্নভাগ জয় করেন। বাইবেলে এইসব রাজার উল্লেখ আছে।

৬০৬ খৃঃ পূঃ চাল্ডীয়গণ বা ক্যাল্ডীয়গণ পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মদ্র (Midas) ও পর্শু (পারসীক)-গণের সাহায্যে নিনেভ অধিকার করে। ইহার পূর্ব্বেই ইলামাইটেরা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এই সময় চাল্ডীয় রাজ দ্বিতীয় নেবুচাডনজর নূতন বাবিলনীয় রাজ্য স্থাপন করেন। ৫৫০ খৃঃ পূঃ পারসীক রাজ প্রথম কুরুষ মিডিয়া রাজ্য লাভ করেন এবং ৫৩৮ খৃঃ পূঃ বাবিলনরাজ নেবুনিডাসের পুত্র বালসাজারের সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া বাবিলন রাজ্য অধিকার করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি এশিয়া মাইনরের লিডিয়া (Lydia)-রাজ ক্রিসাস-কে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রথম কুরুষ এর পুত্র কম্বুস ৫২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মিশর অধিকার করেন। কম্বুসের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁহার পিতৃ-সচিব মদ্র গোষ্ঠীর হিষ্টারপিসের (Hysterpes) পুত্র দারয়বউস পারস্য সম্রাট হন (৫২২ খৃঃ পূঃ)। এশিয়া মাইনরের লিডিয়ারাজ্য, সিরিয়ার হিট্টিরাজ্য, আসুর ও বাবিলন রাজ্য, মিশর, ককেসাস ও কাস্পিয়ান প্রদেশ, মিডিয়া ও পারস্য, ভারতের গান্ধার ও সিন্ধুদেশ ও গ্রীসের মাসিডন ও থ্রেস তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। প্রাচীন ক্রীট (Crete) এবং ট্রয়ের সভ্যতাও অনেক প্রাচীন। প্রায় ২৫০০ খৃঃ পূঃ ক্রীটের অভ্যুদয় হয়। ক্রীটরাজ মিনোস-এর নাম গ্রীক কাহিনীতে পাওয়া যায়। এখানে নসস্ (Knossos) নামক স্থানে পুরাতন প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

কবি হোমরের মহাকাব্য ইলিয়াডে ট্রয়ের কাহিনী লিখিত আছে।

নেক অলীক কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মমতকে 'তাও' ধর্ম্ম বলা হয়। 'তাও' অর্থ 'যাহা হইতে জগত সৃষ্টি হইয়াছে।' এই ধর্ম্মমতে দেহ ও আত্মা স্বীকৃত।

চীনারা বুদ্ধ, কনফিউসিয়াস ও লাওৎসে এই তিন মহাপুরুষের শিক্ষাই মানিয়া চলেন।

খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের সমকালে চীনে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয়। চৌ বংশকে পরাভূত করিয়া চীন বংশীয় রাজারা চীনে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের বিখ্যাত সম্রাট সি-হুয়াং-তি হুনদিগকে বাধা দিবার জন্য চীনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। চীন বংশের পর হান রাজবংশের হস্তে চীন সাম্রাজ্য চলিয়া যায়।

স্পিতম জরথুশ্‌ত্রো—জরথুশ্‌ত্রো নামে পারস্যে একাধিক ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে স্পিতম জরথুশ্‌ত্রো সর্ব্বশেষ ধর্ম্মাচার্য্য। অনেকের মতে ইনি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের লোক। থ্রএতত্তন (বৈদিক ত্রৈতান ?)-এর বংশীয় পৌউরুশস্‌প তাঁহার পিতা ও ফ্রাহিংরবের কন্যা দুগ্‌ধোবা তাঁহার মাতা ছিলেন। তাঁহার পিতামহ পএইতিরস্‌পের সময় হইতে তাঁহারা পর্ব্বতপাদমূলে দরেজ নদীতীরে বাস করিতেন। স্পিতমের জন্মকালে এইরূপ দৈববাণী হয়—"উশতনো জাতো আথ্রব যো স্পিতামো জরথুশ্‌ত্রো" (যস্ন ১৩।১৪) অর্থাৎ "কি সৌভাগ্য আমাদের! আজ আচার্য্য স্পিতম জরথুশ্‌ত্রো জাত হইলেন।" তাঁহার ধর্ম্মমত জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার মতে পৃথিবীতে সত্য ও আলোর দেবতা মিত্র এবং মিথ্যা ও রাত্রির দেবতা সর্পরূপী অহ্রিমণ। জগতে এই দুই শক্তি সৎ ও অসৎ কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে। ইহারা অনেকটা বাইবেলের ঈশ্বর ও শয়তানের অনুরূপ। ইহার মতে সৎ বাক্য, সৎ চিন্তা ও সৎ কর্ম্ম দ্বারা জগতে শ্রেয়ঃ লাভ হয়।

মহাবীর বর্দ্ধমান—জৈনদের মতে ৫৯৯ খৃঃ পূঃ বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ডনগরে কাশ্যপ গোত্রে জ্ঞাতৃ-ক্ষত্রিয় বংশে (নিগণ্ঠ নাট) মহাবীরের জন্ম ও ৫২৭ খৃঃ পূঃ পাবা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতা সিদ্ধার্থ কুণ্ড নগরের রাজা ছিলেন, মাতার নাম ছিল ত্রিশলাদেবী (বিদেহদত্তা)। মহাবীরের পিতৃদত্ত নাম বর্দ্ধমান। তাঁহার স্ত্রীর নাম যশোদা ও কন্যার নাম অনোজ্জা। মহাবীর শেষ জৈন তীর্থঙ্কর। তিনি কঠোর তপশ্চর্য্যার পক্ষপাতী ছিলেন। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে মহাবীরের জন্ম ৫৪০ খৃঃ পূঃ ও মৃত্যু ৪৬৮ খৃঃ পূঃ হইয়াছিল। জৈনেরা বৈদিক যাগযজ্ঞ-বিরোধী কিন্তু পুনর্জ্জন্মবাদী।

গৌতম বুদ্ধ—(৬২৩-৫৪৩ খৃঃ পূঃ)—আমরা দেখিয়াছি গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে

খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকে ভারতে ষোড়শটি মহাজনপদ বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের *সমকালে মগধে নাগ বংশীয়*[১] *সেনীয় বিম্বিসার ও তৎপুত্র কুনিক অজাতশত্রু,* কাশী-কোশলে (রাজধানী শ্রাবন্তী) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রসেনজিৎ, অবন্তী দেশে (রাজধানী উজ্জয়িনী ও মাহিশ্মতী) প্রদ্যোৎ ও বৎসরাজ্যে (রাজধানী কৌশাম্বী) কুরু বংশীয় উদয়ন রাজত্ব করিতেন। তৎকালে মগধের রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। রাজা বিম্বিসার অঙ্গ রাজ্য জয় করিয়া রাজধানী রাজগৃহে লইয়া যান। তিনি বৈশালীর (মুজঃফরপুর জেলার বেশাড় গ্রাম) লিচ্ছবীরাজ চেটকের কন্যা চেল্লনাকে বিবাহ করেন। এই লিচ্ছবীরাজকন্যার গর্ভে কুনিক অজাতশত্রুর জন্ম হয়। বিম্বিসার কোশলরাজ মহাকোশলের কন্যা কোশল দেবীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যৌতুকস্বরূপ কাশীরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিম্বিসার অনুমান খৃঃ পূঃ ৫৮০ অব্দে মগধের সিংহাসন লাভ করেন। সিংহলী মতে ইহার ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে ৬২৩ খৃঃ পূঃ বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করেন। মহাবস্তু অবদানের মতে সাকেত (অযোধ্যা) রাজ্যের ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা সুজাতের অন্যতম পুত্র হস্তীশীর্ষ নির্ব্বাসিত হইয়া কপিলাবাস্তুতে বাস করিয়াছিলেন। মহর্ষি কপিলের আশ্রম ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম কপিলাবাস্তু হয়। হস্তীশীর্ষের পুত্র সিংহ হনু, তৎপুত্র রাজা শুদ্ধোদন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের মতে শুদ্ধোদনের পিতার নাম শাক্য (বিষ্ণুপুরাণ ৪।২২।৩)। সম্ভবতঃ সিংহ হনুর নামান্তর শাক্য ছিল। শুদ্ধোদনের বংশ শাক্য বংশ নামে পরিচিত। শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের পিতৃদত্ত নাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম। শাক্য-শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনি শাক্যসিংহ নামে পরিচিত হন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর তাঁহার নাম হয় বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের মাতামহ সুভূতি শাক্য রাজ্যের অন্যতম জনপদ দেবদহের রাজা ছিলেন। এই সুভূতি কোলিয় বংশের[২] এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার মহামায়া ও মহাপ্রজাবতী নাম্নী কন্যাদ্বয়কে শুদ্ধোদন

১। অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিতে (১২।২) বিম্বিসারকে "হর্য্যঙ্ক কুল জাতঃ" বলা হইয়াছে। হরি শব্দের এক অর্থ নাগ বা সর্প। এই অর্থে বিম্বিসারকে নাগবংশ-জাত বলা যাইতে পারে। পুরাণের মতে তিনি নাগ বংশজাত ছিলেন।

২। শুদ্ধোদনের ভগ্নী অমিতার স্বামী রাজর্ষি কোল। এই কোল হইতে গোষ্ঠীর নামকরণ হয় (মহাবস্তু অবদান ও অবদান কল্পলতা)। শুদ্ধোদনকে শাক্যগণের রাজা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধোদনের সহিত ভদ্দীয় (বিনয় পিটক চুল্লবগ্‌গ)

বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহামায়ার গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় মহামায়া পিত্রালয়ে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে (নেপাল তরাই-এর বস্তী জেলার) লুম্বিনী নামক শালবনে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। মহারাজ অশোক ইহার ৩৫৮ বৎসর পরে নিজ রাজ্যাভিষেকের বিংশতি বৎসরে এই স্থানে খোদিত লিপিসহ একটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই স্তম্ভ ঐ স্থানেই অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সিদ্ধার্থের জন্মের এক সপ্তাহ পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তদবধি সিদ্ধার্থ তাঁহার মাতৃস্বসা ও বিমাতা মহাপ্রজাবতী দ্বারা লালিত পালিত হন। অল্প বয়সেই তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হন। তরুণ সিদ্ধার্থকে সংসারের প্রতি উদাসীন ও ভাবপ্রবণ দেখিয়া পাছে পুত্র সংসারত্যাগী হন এই আশঙ্কায় অল্প বয়সেই শুদ্ধোদন কুলীয়গণের (গণতন্ত্র) রাজা দণ্ডপাণির রূপবতী কন্যা ভদ্রা কাপিলায়নীর[১] সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ দিলেন। কিন্তু ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখিয়া পুত্র রাহুলের জন্মের সপ্তম দিবসেই সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বয়সে পরাজ্ঞানলাভার্থ অর্দ্ধ রাত্রিতে পুষ্যা নক্ষত্রে সকলের অজ্ঞাতসারে ছন্দক নামক অশ্বপালসহ কন্থক নামক অশ্বে আরোহন করিয়া গৃহত্যাগ করেন। পথে অনোমা নদী উত্তীর্ণ হইবার পর রাত্রি প্রভাত হইলে ছন্দককে অশ্ব ও রাজপরিচ্ছদসহ বিদায় দিয়া কেশচ্ছেদন ও একটি ব্যাধের নিকট প্রাপ্ত কাষায় বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রৈবত নামক ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন। অতঃপর তথা হইতে বৈশালী নগরে আড়ালকালামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্র ও যোগশিক্ষা করেন। তৎপর রাজগৃহে যাইয়া উদ্দক রামপুত্তের (উদ্রকরাম পুত্রের) নিকট যোগ সম্বন্ধে আরও কিছু শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু এই সকল শিক্ষায় তাঁহার তৃপ্তি লাভ হইল না। তখন তিনি গয়ার নিকট নৈরঞ্জনা নদীতীরে উরুবিল্ব গ্রামে যোগাসনে আসীন হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকেন। ইহাতে যথোপযুক্ত আহারের অভাবে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও ভঙ্গ হয়।

অবশেষে সুজাতা নাম্নী এক ভক্তিমতী শ্রেষ্ঠীকন্যার প্রদত্ত পায়সান্ন ভক্ষণ

ও দণ্ডপাণিকেও (মঝিম নিকায়—অট্‌ঠ কথা ১।২।৮) শাক্যদিগের রাজা বলা হয়। ইহাতে মনে হয় লিচ্ছবী ও মল্লগণের ন্যায় শাক্যগণের রাজ্যও একটি গণতন্ত্র ছিল। এই গণতন্ত্রের প্রত্যেক সভ্যই এক একজন রাজা ছিলেন। এবং শুদ্ধোদন বোধহয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

১। ভদ্রা কাপিলায়নীর নামান্তর ছিল যশোধরা ও গোপা।

করিয়া বললাভ করতঃ মধ্যমা প্রতিপদা (মধ্যমমার্গ) অবলম্বন করিয়া চিত্তশোধনে প্রবৃত্ত হন এবং ৩৬ বৎসর বয়সে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় বোধিদ্রুমতলে বোধিজ্ঞান লাভে কৃতার্থ হন (মঝিম নিকায় ২।৪)। অতঃপর তিনি কাশীর নিকটে মৃগদাব বা সারনাথে গমন করতঃ তথায় তাঁহার পঞ্চশিষ্য কোন্দণ্ণ, ভদ্দক, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজি-এর নিকট এইরূপ ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন যে, এই জগৎ দুঃখময়, সেই দুঃখের কারণ অবিদ্যা[১]। অবিদ্যার বিনাশে দুঃখের চিরনিবৃত্তি এবং আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ [২] অনুশীলনই সেই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। ইহাই ভগবান বুদ্ধদেবের প্রচারিত চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্য। তিনি বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি হিংসামূলক কর্ম্মকাণ্ড ও বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রায় সমকালে পূরণ কসপ, মক্‌খলিপুত্ত গোসাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ণ, সঞ্জয় বেলঠিপুত্ত ও নিগণ্ঠনাটপুত্ত (মহাবীর) এই ছয়জন 'তীর্থিকে'র নাম ও মতবাদ পালি সাহিত্যে বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে।

১। বৌদ্ধ মতে অবিদ্যা হইতে সংস্কার, তাহা হইতে বিজ্ঞান, তাহা হইতে নামরূপ, তাহা হইতে ষড়ায়তন, তাহা হইতে স্পর্শ, তাহা হইতে বেদনা, তাহা হইতে তৃষ্ণা, তাহা হইতে উপাদান, তাহা হইতে ভব, তাহা হইতে জন্ম ও জন্ম হইতে দুঃখ।

২। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্‌, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি—এই আটটি মার্গ দুঃখনাশের উপায় এবং এইগুলিই বুদ্ধদেব কথিত আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ। শুধু বৌদ্ধ দর্শন নহে, ভারতীয় সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, মীমাংসা, বৈশেষিক ও বেদান্ত এই ছয়টি দর্শনেও সংসারকে দুঃখময় বলিয়া সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি উপদেশ করা হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শনের সহিত অন্যান্য আর্য্য দর্শনের প্রভেদ কেবলমাত্র প্রস্থানে। নতুবা লক্ষ্য একই। সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। বেদান্তমতে জীব ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানে, ন্যায় মতে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের যথার্থ জ্ঞানে, যোগদর্শনে যোগসাধনে সমাধিলাভ দ্বারা, বৈশেষিক মতে দ্রব্যাদি পদার্থের স্বাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানে দুঃখ নাশ হয়। পূর্ব্ব মীমাংসার মতে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গসুখ লাভেও দুঃখের নিবৃত্তি হয়। বৈদিক কর্ম্মবাদ, চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চাতুরাশ্রম্য প্রথা, পুনর্জ্জন্মবাদ, অদৃষ্টবাদ, আত্মাবাদ, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন ভোগবাদী ইহসর্ব্বস্ব নাস্তিক সম্প্রদায়ও ছিল।

ইঁহাদের মধ্যে আবার সঞ্জয় বেলঠিপুত্ত অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) ও গোসাল আজীবক সম্প্রদায়ের স্রষ্টা। এই ছয়জনের সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বৈদিক ধর্ম্ম, সমাজ ও আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন। বুদ্ধদেব যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন বৈদিক মার্গ ও সমাজবিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহবহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। বুদ্ধদেব এই বিদ্রোহকে একটি নূতন আকার দিলেন। যুক্তিদ্বারা যে সব তত্ত্ব বুঝাইবার উপায় ছিল না এমন কোন বিষয়ে তিনি দেশনা করিতেন না। ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মৌনভাব অবলম্বন করিতেন। যে সকল বিষয়ে বুদ্ধদেব দেশনা করেন নাই, ত্রিপিটকে তাহাদিগকে অব্যাকৃত (unexplained) বলা হইয়াছে। দীর্ঘ নিকায়ের (নবম সূত্র) পোট্ঠপাদ সূত্রে দশটি অব্যাকৃত তত্ত্বের উল্লেখ আছে। যথা, (১-২) এই লোক শাশ্বত অথবা অশাশ্বত ; (৩-৪) এই লোক অন্তবান, কি অনন্তবান ; (৫-৬) জীব এবং শরীর ভিন্ন, কি অভিন্ন ; (৭-৮) মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, অথবা থাকে না ; (৯) মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে ও থাকে না ; (১০) মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব নাও থাকে, নাও থাকে না। নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক বৃত্তিতে অব্যাকৃতের সংখ্যা ১৪ (তথাগত পরীক্ষা)।

বৌদ্ধমতে আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্ব্বাণ রূপ পরমা শান্তি লাভের উপায়। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধানতঃ নীতিবাদী (ethical)। ইহার দার্শনিক অংশ অভিধর্ম্ম পরবর্ত্তী বৌদ্ধ আচার্য্যগণের মনীষার দান। বুদ্ধদেব প্রচারিত চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্য, দ্বাদশবিধ নিদান, মৈত্রী-করুণা-মুদিতা ও উপেক্ষাত্মক পরিকর্ম্ম সমস্তই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার ধারার সহিত অবিচ্ছেদ্য। বুদ্ধদেব তাহারই নূতন রূপ দিয়াছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে নয় প্রকার ধ্যান বা সমাধির উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে চারিটি রূপধ্যান ও চারিটি অরূপধ্যান। নবমটি ধ্যানের সর্ব্বশেষ স্তর। তখন সর্ব্ব প্রকার চেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়।

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের পর বুদ্ধদেব রাজগৃহে উপস্থিত হইলে মহারাজ বিম্বিসার দ্বাদশ অযুত মাগধ ব্রাহ্মণসহ তাঁহার নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং বেণুবন নামক একটি রমণীয় উদ্যান ভিক্ষুগণকে দান করেন। ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের দ্বিতীয় বৎসরে তিনি কপিলাবস্তুতে গমন করিয়া উপালী, আনন্দ[১], পুত্র রাহুল প্রভৃতিকে

১। মহাবস্তুতে (তৃতীয়খণ্ডে) আনন্দকে বুদ্ধের পিতৃব্য শুক্লোদনের পুত্র ও দেবদত্তের ভ্রাতা বলা হইয়াছে।

দীক্ষা দান করেন। তিনি শ্রাবস্তীতে গমন করিলে প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র জেতের নিকট হইতে পঞ্চাশকোটি মুদ্রা মূল্যে জেতবন নামক উদ্যান ক্রয় করিয়া তাহা ভিক্ষু সঙ্ঘকে দান করেন।

বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতিকার ৯৩ পল্লবে লিখিত আছে, 'শ্রাবস্তী নগরের জেতবনে যখন ভগবান বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেছিলেন তখন তদীয় শিষ্য অনাথ-পিণ্ডদের কন্যা সুমাগধা পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের শ্রেষ্ঠী সার্থপতির পুত্র বৃষভদত্তের সহিত বিবাহিতা হইয়া পতিগৃহে গমন করেন। একদা জিনদেব মহাবীর নগ্ন-ক্ষপণকগণসহ সার্থপতির গৃহে আগমন করিলে, সুমাগধা তাহাদের কদাচার দৃষ্টে দুঃখিতা হইয়া শ্বশুরের নিকট বুদ্ধদেবের প্রশংসা করেন এবং শ্বশুরের সম্মতিক্রমে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে বুদ্ধদেবকে আহ্বান করেন। বুদ্ধদেবও তদনুসারে তদীয় শিষ্যগণসহ পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আগমন করেন।' চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের উপকণ্ঠে তিনমাস কাল ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং পরবর্ত্তীকালে মহারাজ অশোক তথায় একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। হিউয়েন সঙ্গ লিখিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং এই স্তূপটি দেখিয়াছিলেন এবং তৎকাল পর্য্যন্তও তথায় পর্ব্বোপলক্ষে আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত হইত।

রাজগৃহের সঞ্জয় নামক পরিব্রাজকের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ণসহ সহস্র সহস্র ব্যক্তি বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে উত্তর ভারতে বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া বুদ্ধদেব ধর্ম্ম প্রচার ও সঙ্ঘ স্থাপন করেন। রাজা শুদ্ধোদন ৯০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলে তিনি কপিলাবাস্তুতে যাইয়া পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং বিমাতা মহাপ্রজাবতী ও পত্নী যশোধরাকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘ স্থাপন করেন। অবশেষে ৮০ বৎসর বয়সে কুশী নগরের শালবনে ৫৪৩ খৃঃ পূঃ বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রির শেষ প্রহরে তিনি মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন[১]।

১। ফা-হিয়ান ও হিউয়েন সঙ্গের মতে গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রাম হইতে ৩ লি পূর্ব্বে রাম গ্রাম। তথা হইতে ৩ লি দক্ষিণ-পূর্ব্বে ছন্দকের প্রত্যাবর্ত্তন স্থান। তথা হইতে ৪ লি পূর্ব্বে "ভস্মস্তূপ"। তথা হইতে ১২ লি উত্তর-পূর্ব্বে মল্লদের রাজ্যভুক্ত কুশী নগর। উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কাশিয়া গ্রামকে কুশী নগর বলিয়া মনে করা হয়।

তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার বাণী ও উপদেশ পালিভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া ত্রিপিটক নামে বিরাট পালি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়[১]।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশ ও দ্বীপবংশ হইতে জানা যায় যে রাঢ় (লাল) দেশের রাজা সিংহবাহুর মাতুল বঙ্গাল দেশের রাজা ছিলেন। সিংহবাহু মাতুলের উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ বঙ্গাল রাজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি ঐ রাজ্য না লইয়া অন্য এক আত্মীয়কে প্রদান করিয়া স্বয়ং রাঢ়দেশে সিংহপুর (বর্ত্তমান সিঙ্গুর) নগরে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহ প্রজাপীড়ন দোষে রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া অনুচরগণসহ অর্ণবপোতে অরোহণ করিয়া (বর্ত্তমান বোম্বাইয়ের) সোপারা (সুরাট) বন্দরে উপস্থিত হন। তথা হইতে তাম্রপর্ণী (লঙ্কা) দ্বীপে গমন করিয়া তথায় রাজা হন। সিংহলের ইতিহাসের মতে যে বৎসর বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন (৫৪৩ খৃঃ পূঃ) সেই বৎসর বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জৈনদের আচারাঙ্গ সূত্র খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে রচিত হয়। এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে তীর্থঙ্কর মহাবীর কৈবল্য লাভের পূর্ব্বে পূর্ব্বদেশের সুব্বভূমি, লাঢ় ও বজ্জভূমি অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। লাঢ় যে রাঢ় দেশ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বজ্জভূমি বোধহয় বজ্জিদের রাজ্য বা মিথিলা। বজ্জিগণ আটটি কুলে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে লিচ্ছবীরা প্রধান ছিল। মিথিলার অন্তর্গত বৈশালীতে (মজঃফরপুর জেলার বেশাড় গ্রাম) তাহাদের রাজধানী ছিল। সুব্বভূমি

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বুদ্ধদেবের শেষ জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়।

বুদ্ধদেবের জন্ম ও পরিনির্ব্বাণাব্দ সম্বন্ধে আমরা প্রচলিত সিংহলী মত গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ ও গোপাল আয়ারের মতে ৪৮৭ খৃঃ পূঃ, ম্যাক্সমূলরের মতে ৪৭৭ খৃঃ পূঃ, রিস্ ডেভিডের মতে ৪০০-৪২০ খৃঃ পূঃ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণাব্দ।

নেপালের তরাই অঞ্চলের কুনাই নদী তীরে বর্ত্তমান তিলৌরা গ্রামকে "কপিলাবাস্তু"র অবস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

১। ৫৪৩ পূঃ খৃঃ মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজ্যকালে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি হয়। তাহাতে ৫০০ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে কাশ্যপ বুদ্ধবচনগুলি সংগ্রহ করিয়া সূত্র পিটক, আনন্দ তাহার ব্যাখ্যা করিয়া অভিধর্ম্ম পিটক ও উপালী নীতিগুলি সংগ্রহ করিয়া বিনয় পিটক সংকলন করেন। ললিতবিস্তারের গাথাগুলি সূত্ররূপে স্থান পায়। ললিতবিস্তারে বুদ্ধের জীবনী লিখিত আছে।

(শুভ্রভূমি) ধলভূম হইতে পারে। মহাবীর এই সকল স্থানে সমাদর লাভ করেন *নাই।*

জৈনদের অপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কল্পসূত্র খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে মহাবীরের জীবনী, দ্বিতীয় ভাগে জৈনশূরীদের চরিত কথা, তৃতীয় ভাগে জৈন ভিক্ষুদের আচার নিয়মের বিবরণ আছে। এই কল্পসূত্রের রচয়িতার নাম ভদ্রবাহু (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক)। ভদ্রবাহুর অন্যতম শিষ্য গোদাস গোদাসগণ নামক একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্ত্তন করেন। এই গোদাসগণ হইতে চারিটি শাখার উদ্ভব হয়। তাহাদের নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষিয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও দাসী কব্বটিকা। তাম্রলিপ্তি আধুনিক মেদিনীপুর জেলার 'তমলুক'। কোটিবর্ষের রাজধানী দিনাজপুর জেলার 'বানপুর। পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুর বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়। মহাভারতে সভাপর্ব্বে (৩০।২৪ শ্লোক) "তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কব্বটাধিপতিং তথা" বলিয়া তাম্রলিপ্তের সহিত কব্বটরাজ্যের উল্লেখ আছে। ভরহুত স্তূপের বেষ্টনীর উপর 'পুঞবঢনীয়' ভিক্ষুর কথা উৎকীর্ণ আছে। এই পুঞবঢনীয় যে 'পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়' শব্দের অপভ্রংশ তাহা সহজেই বোধগম্য। এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে অতি প্রাচীন কালেই গৌড়দেশের প্রায় সর্ব্বত্র জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের সময় হইতে গ্রীকরাজ আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের (৩২৭ খৃঃ পূঃ) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গের ইতিহাস খুব অস্পষ্ট। অঙ্গ-মগধের অধীশ্বর বিম্বিসারের (খৃঃ পূঃ ৫৮০-৫৫২ ?) পর তৎপুত্র অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি কোশলের রাজা প্রসেনজিতের কন্যা বজিরাকে বিবাহ করেন এবং কোশল রাজ্য অধিকার করেন। নয়টি কুল দ্বারা গঠিত বৈশালির বৃজি-লিচ্ছবী গণতন্ত্র ও কুশীনগরের মল্ল গণতন্ত্র অজাতশত্রুকে কর দিতে বাধ্য হয়। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ভদ্র মগধের রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাটলী-পুত্রে লইয়া যান। উদয়ভদ্রের পুত্র অনুরুদ্ধ, তৎপুত্র মুণ্ড ও তৎপুত্র নাগদশক যথাক্রমে মগধের রাজা হন। কিন্তু নাগদশকের সেনাপতি শিশুনাগ প্রভুহত্যা করিয়া রাজা হন। শিশুনাগ ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত হইলে তৎপুত্র কালাশোক (পুরাণের কাকবর্ণ) রাজা হন। সম্ভবতঃ এই সময়েই বৈশালিতে বৌদ্ধগণের দ্বিতীয় সংগীতির অধিবেশন হয় (৪৭৭ খৃঃ পূঃ)। কালাশোক ২৮ বৎসর ও তাঁহার দশ পুত্র ভদ্রসেন, কোরণ্ডবর্ণ, মঙ্গুর, সর্ব্বঞ্জয়, জালিক, উদ্রক, সঞ্জয়, কোরব্য, নন্দীবর্দ্ধন ও পঞ্চমক ২২ বৎসর রাজত্ব করেন।

পুরাণের মতে নন্দীবর্দ্ধনের পুত্র মহানন্দী, তৎপুত্র "সর্ব্বক্ষত্রান্তকঃ" নন্দ মহাপদ্ম

সকল ক্ষত্রিয় রাজগণকে ধ্বংস করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করেন [১]। বৌদ্ধ সাহিত্যে (মহাবংশ) এই নন্দ মহাপদ্ম উগ্রসেন নামে পরিচিত।

তিনি ও তাঁহার আটজন ভ্রাতা ২২ বৎসর রাজা ছিলেন। মহাপদ্মনন্দ বা উগ্রসেন বাহুবলে ভারতের এক বৃহৎ অংশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেও উত্তর-পশ্চিম ভারত বিশাল নন্দ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। গ্রীক লেখকগণের বিবরণে দেখা যায়, এই উত্তর-পশ্চিম ভারত সেকালে বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। পঞ্জাবের উত্তরভাগে সিন্ধুনদ ও বিতস্তা (Hydaspes) নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে রাজা অম্ভির ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী তক্ষশিলা। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পুরুরাজ রাজত্ব করিতেন। এতদ্ব্যতীত গণতান্ত্রিক মালব, ক্ষুদ্রক, মশক প্রভৃতি কতকগুলি জাতির বাস ছিল। ৩২৭ খৃঃ পূঃ গ্রীকরাজ আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া কয়েকটি দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতিকে বিধ্বস্ত করেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রায় এক বৎসর লাগে। অতঃপর ৩২৬ খৃঃ পূঃ তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তক্ষশিলায় উপস্থিত হইবামাত্র রাজা অম্ভি বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু বিতস্তা নদীর তীরে পুরুরাজ তাঁহার গতিরোধ করেন। পুরুর সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধকে গ্রীক লেখকগণ 'হিদাস্পিসের যুদ্ধ' (Battle of the Hydaspes) আখ্যা দিয়াছেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে এই যুদ্ধে পুরুরাজ বন্দী হইয়া আলেকজাণ্ডারের শিবিরে নীত হইলে আলেকজাণ্ডার তাঁহার সাহস ও বাক্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু ইথিওপিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের মতে আলেকজাণ্ডার পুরুকে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া পুরুর সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

অতঃপর আলেকজাণ্ডার বিপাশা (Hyphasis) নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন (৩২৫ খৃঃ পূঃ)। এই স্থানে তাঁহার শিবিরে সংবাদ পৌছে যে প্রাসিয়ই

১। আমরা উপরে বিম্বিসার হইতে নন্দ মহাপদ্ম পর্য্যন্ত যে বংশাবলী দিলাম তাহা সিংহলী বিবরণ ও বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত।

পুরাণের মতে শিশুনাগ বংশের রাজগণের নাম এইরূপ—(১) শিশুনাগ, (২) কাকবর্ণ, (৩) ক্ষেমধর্ম্মা, (৪) ক্ষেত্রোজাঃ, (৫) বিম্বিসার, (৬) অজাতশত্রু, (৭) দর্শক, (৮) উদয়াশ্ব, (৯) নন্দীবর্দ্ধন, (১০) মহানন্দী।

মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্ম নন্দ। "একরাট্ স মহাপদ্মঃ একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি" (মৎস, বায়ু ও ভবিষ্য পুরাণ)।

(prasioi) ও গণ্ডরিডই (Gandaridoi) নামক দুইটি পরাক্রান্ত জাতি অসংখ্য সৈন্য লইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

অতঃপর আলেকজাণ্ডার আর অগ্রসর না হইয়া ঝিলাম (চন্দ্রভাগা) নদী দিয়া ফিরিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে মালবগণ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া তিনি আহত হন। সিন্ধুমুখে আসিয়া বেলুচিস্থানের সমুদ্র তীর ধরিয়া অগ্রসর হন। তাঁহার নৌবহর মহানাবিক নিয়ার্কাস দ্বারা সমুদ্র পথে চালিত হয়। ৩২৩ খৃঃ পূঃ তাঁহারা সুসাতে পৌছেন। পর বৎসর বাবিলনে আলেকাণ্ডারের মৃত্যু হয়[১]।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে ডিওডোরাস ইণ্ডিকা ইহতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, পূর্ব্ব দেশে প্রাসিয়ই (Prasioi) ও গণ্ডরিডই (Gandaridoi) নামক দুইটি পরাক্রান্ত জাতি বাস করে (Book XVII)। তাহাদের রাজার নাম জাণ্ড্রামিস (Xandramis)। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্লুটার্ক (Plutarch) লিখিয়াছেন যে গণ্ডরিডই (গৌড়ীয়) ও প্রাসিয়ই (পলাশীয়)-দের রাজগণ (The kings of the Gandaridoi and the Prasioi) ৮০ হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, ৮ হাজার রথ ও ৬ হাজার হস্তী সৈন্য লইয়া আলেকজাণ্ডারের গতিরোধের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু প্রথম শতকের অপর একজন লেখক কার্টিয়স্ রুফাস (Curtius Rufus) এই দুইটি জাতির নাম গঙ্গরিডি (Gangaridae) এবং প্রাসিয়ই (Prasii) বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রাসিয়ই জাতিকে স্ট্রাবো (খৃঃ পূঃ ৫৪ অব্দে জন্ম) আরিয়ান (১০০-১৩৮ খৃঃ) ও প্লিনী (জন্ম ২৩ খৃঃ)-র মধ্যে কেহ কেহ Prasioi-কে Prasii বলিয়া ও ইহাদের রাজধানীকে Palibothra বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনী লিখিয়াছেন, Gangaridae Calingae-দের রাজধানীর নাম 'Parthalis' ও ৬০,০০০ পদাতিক, ১০,০০০ অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী সজ্জিত থাকিয়া এই রাজ্যের অধিপতির দেহ রক্ষা করিত। Saint Martain-এর মতে প্লিনীর কথিত Parthalis (পর্থলিস) শব্দটি "বর্দ্ধন" ব্যতীত আর কিছুই

১। গ্রীক্ ও লাটিন ঐতিহাসিকগণ মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভাস্থ গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা নামক গ্রন্থ হইতে ঐ সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ইণ্ডিকা এখন বর্ত্তমান নাই। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাহার যে সকল অংশ আপন আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই সংগৃহীত হইয়া মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ নামে প্রচারিত হইতেছে।

হইতে পারে না। "বর্দ্ধন" যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংক্ষিপ্ত নাম তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Curtius Rufus এই দুইটি জাতির রাজার নাম Agrammes বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডিওডোরাসের Xandramis ও Curtius Rufus-এর Agrammes-কে ঐতিহাসিকগণ উগ্রসেনের গ্রীক রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। প্রসিই বা প্রাসিয়ইদের রাজধানী "পালিবোথ্রা" যে পাটলিপুত্রের গ্রীকরূপ তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং প্রসিয়ইদের রাজ্য যে মগধ রাজ্য তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না[১]। Prasii শব্দটি পলাশীয় শব্দের গ্রীক রূপান্তর এবং "পলাশ" মগধের প্রসিদ্ধ নাম। শব্দরত্নাবলী নামক অভিধানে "পলাশ" শব্দের অর্থ মগধ দেশ। (শব্দকল্পদ্রুমে "পলাশ" শব্দ দ্রঃ)।

উগ্রসেন (মহাপদ্ম) নন্দ বংশের প্রথম সম্রাট ছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক-গণের মতে প্রাসিয়ই (পলাশীয়) ও গণ্ডরিডই (গৌড়ীয়-গণ) ইহার রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহাতে মনে হয় এই সময় মগধ ও গৌড়রাজ্য একটি যুক্ত-রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁহার অষ্টপুত্রকে লইয়া পুরাণের মতে "নবনন্দ"। কিন্তু "মহাবোধি" নামক পালি গ্রন্থের মতে উগ্রসেন ও তাঁহার অষ্টভ্রাতা পণ্ডক, পশুপতি, ভূতপাল, রট্ঠপাল, গোবিসান, দশসিদ্ধক, কোট্ঠ ও ধননন্দকে লইয়া নবনন্দ।[২] চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য (৩২২ খৃঃ পূঃ) এই নন্দবংশ ধ্বংস করেন।

১। Cunningham-এর মতে 'Prasii is only the Greek form of Palasiya or Parasia, a man of Palasa or Parasa which is an actual and well known name of Magadha of which Palibothra was the capital.' (The Ancient Geography of India, p. 454)

২। পৌরাণিক মতে উগ্রসেন (মহাপদ্ম নন্দ) জাতিতে শূদ্র। বিষ্ণুস্মৃতির মতে "অনুলোমাস্ত্ত মাতৃ সবর্ণাঃ" (১৬২)। সম্ভবতঃ পুরাণকার বিষ্ণুস্মৃতির এই বচন অনুসারে নন্দ মহাপদ্মকে শূদ্র বলিয়াছেন। কারণ তাঁহার মাতা (মহানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী) সুনন্দা শূদ্রা ছিলেন। গ্রীক্ লেখকেরা উগ্রসেন নন্দকে জাতিতে নাপিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্র পরিশিষ্টে তাঁহাকে নাপিতকুমার বলা হইয়াছে। বিবাদার্ণব সেতুধৃত নারদীয় মনুবচনে "শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতো নাপিতোবর্ণ সঙ্করঃ" এই নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। বোধ হয় এই জন্যই নন্দবংশের নাপিত অপবাদ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রুতিতে অশ্বমেধ যজ্ঞকারী

চন্দ্রগুপ্তের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ সূত্রে মোরীয় বা মৌর্য্যকুলকে হিমালয় পাদদেশস্থ পিপ্পলি বন নামক রাজ্যের অধিপতি রূপে এবং এই মৌর্য্যকুলকে একটি ক্ষত্রিয় বংশ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাবংশের মতে এই মৌর্য্যবংশে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়[১]। নন্দবংশের রাজত্বের শেষ ভাগে মগধ সাম্রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত হইলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য মগধেশ্বরের সহিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অল্প বয়সে তিনি আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবং সম্ভবতঃ আলেকজাণ্ডারের শিবিরে অবস্থান করিয়া গ্রীক-সমরপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করেন। আলেকজাণ্ডার তাঁহার আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। গ্রীক্ লেখকগণ চন্দ্রগুপ্তকে 'চন্দ্রকোটস্' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর (৩২৪ খৃঃ পূঃ) তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। সেলিউকসের ভাগে এশিয়া মাইনর হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত, টলেমীর ভাগে মিশর, এন্টিগোনাসের ভাগে মাসিডন পড়ে। মিশরের পশ্চিমে সাইরিনিতে একটি নূতন রাজ্য স্থাপিত হয়। এবং মাসিডনের দক্ষিণে গ্রীস দেশ কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়।

অনুমান ৩১৭ খৃঃ পূঃ পাঞ্জাবের গ্রীক প্রতিনিধি ফিলিপ নিহত হইলে ও গ্রীক সেনাপতি ইউডেমস্ পুরুকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিলে সম্ভবতঃ তক্ষশিলা নিবাসী চাণক্যের পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত (সম্ভবতঃ তক্ষশিলার) পার্ব্বত্য সৈন্য লইয়া পঞ্জাব ও সিন্ধুর গ্রীকরাজ্য আক্রমণ করেন এবং গ্রীকগণকে পরাজিত ও দূরীভূত করেন। অতঃপর সেলিউকস্ সসৈন্যে ভারত সীমান্তে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন (৩১৫ খৃঃ পূঃ)। কিন্তু পরাজিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় কন্যা হেলেনের বিবাহ দিয়া এবং কাবুল, কান্দাহার হীরাট ও বেলুচিস্থান (মাকরাণ) চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। এইরূপে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য পারস্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। অতঃপর তিনি পাটলিপুত্র অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া নন্দ সেনাপতি ভদ্রশালকে যুদ্ধে

ক্ষত্রিয় নৃপতির চারি জাতীয়া পত্নীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (শতপথ ব্রাঃ ১৩।৪।১।৮) এই প্রমাণে কোন কোন মতে ক্ষত্রিয় রাজার শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানও ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত।

১। পুরাণসমূহে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাঁহাকে কেবলমাত্র 'শূদ্রাগর্ভোদ্ভবঃ' বলা হইয়াছে।

পরাজিত করিয়া রাজধানী পাটলিপুত্র ও সমগ্র মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করেন। উত্তরে পঞ্জাব, সিন্ধু আফগানিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে সুরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) ও দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। পূর্ব্বে গৌড়দেশের অন্তর্গত পৌণ্ড্রনগর (মহাস্থানগড়) পর্য্যন্ত যে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীকরাজ সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস্ নামক পঞ্জাবের গ্রীক কর্ম্মচারীকে দূত নিযুক্ত করেন। এই মেগাস্থিনিস রচিত 'ইণ্ডিকা' নামক ভারত-বিবরণ একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ ৩১৫ খৃঃ পূঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২৯০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কোন কোন মতে ইনি প্রসিদ্ধ জৈন শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর শিষ্য ছিলেন এবং মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণ বেলগোলায় দেহত্যাগ করেন।

তৎপর চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার (অমিত্রঘাত) ২৯০-২৭৩ খৃঃ পূঃ) রাজা হন। এই সময় অক্ষুনদীর (Oxus) দক্ষিণ তীরে ব্যাকট্রিয়াতে (বাহ্লীক) একটি গ্রীক রাজ্য ছিল। পার্থিয়া রাজ্যও তাহাদের অধীন ছিল। সেলিউকসের বংশধর সিরিয়ার রাজা এণ্টিওকস্ পার্থিয়া ও ব্যাকট্রিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া হিন্দুকুশের পথে ভারতে প্রবেশ করেন। কিন্তু সীমান্ত শাসক সুভগ সেন বাধা দেওয়ায় তিনি সন্ধি করিয়া ফিরিয়া যান। সিরিয়ার এই গ্রীকরাজ এণ্টিওকস্ বিন্দুসারের সভায় ডেইমেকস (Deimachos) নামক একজন এবং মিশরের রাজা টলেমী ফিলাডেলফাস্ ডিওনিসিয়াস নামক একজন দূত প্রেরণ করিয়া ভারতের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্ব সৌহৃদ্য বজায় রাখেন।

অতঃপর বিন্দুসারের পুত্র অশোক (২৭৩-২৩২ খৃঃ পূঃ) সিংহাসনে আরোহন করেন। ইহার চারি বৎসর পর তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কুমার অবস্থায় তিনি তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীর শাসক ছিলেন। কথিত আছে অশোকের মাতা সুভদ্রাঙ্গী ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন। তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে তিনি কলিঙ্গ বিজয় করায় দক্ষিণ ভারতে চোল (মান্দ্রাজের ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর জেলা), পাণ্ড্য (মান্দ্রাজের মাদুরা, তিন্নেভেলী ও রামনাদ জেলা এবং ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণাংশ), সত্যপুত্র (মালাবারের উত্তরাংশ) ও কেরলপুত্র (ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরাংশ ও মালাবারের দক্ষিণাংশ) ব্যতীত সমগ্র জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ) তাঁহার অধিকারভুক্ত হয় (দ্বিতীয় শিলা শাসন দ্রঃ)।

অশোকলিপিতে গৌড় (রাঢ় ও বরেন্দ্র) ও বঙ্গের কোন উল্লেখ না থাকিলেও ইহা নিশ্চয় যে তাঁহার রাজ্যকালে পূর্ব্ব-ভারতে কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল না। অশোকাবদানের মতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল[১]।

এইরূপে মগধের রাজশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বন্ধনে সংহত করার যে নীতি বিম্বিসারের আমলে আরম্ভ হইয়াছিল অশোকের কলিঙ্গ জয়ের পরেই সহসা সেই নীতি ভিন্ন পন্থাভিমুখী হইল। বিম্বিসারের অঙ্গ বিজয় হইতে অশোকের কলিঙ্গ বিজয় পর্য্যন্ত তিনশত বৎসর ধরিয়া মগধের রাজশক্তি যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১২।১) এই নীতিকে 'অসুর-বিজয়' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতঃপর কলিঙ্গ বিজয়ের এই অসুর নীতির মধ্যে দারুণ নিষ্ঠুরতার দৃশ্য দর্শনে অশোকের মনে মর্ম্মান্তিক অনুশোচনা উপস্থিত হয়। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট বুদ্ধ প্রচারিত বিশ্বমৈত্রী ও অহিংসার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া 'অসুর-বিজয়ের' নীতি পরিহার করতঃ ধর্ম্মবিজয়ের নীতি অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অশোকের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ গিরি-লিপিতে তাঁহার ধর্ম্মবিজিত দেশগুলির নাম জলন্ত অক্ষরে খোদিত আছে। ভারতের দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র এবং তাম্রপর্ণী ও পশ্চিমে সিরিয়ারাজ অংতিয়োগ (এন্টিয়োকস থিয়স ২৬১-২৪৬ খৃঃ পূঃ), মিশর-রাজ তুলময়ে (টলেমি ফিলাডেলফাস, ২৮৫-২৪৭ খৃঃ পূঃ), মাসিডন রাজ অংতেকিনে (এন্টিগোনস গোনেটস, ২৭৭-২৩৯ খৃঃ পূঃ), সাইরিন রাজ মগ (মগস্ ২৮৫-২৫৮ খৃঃ পূঃ), গ্রীসের করিন্থ বা এপিরাসের রাজা আলিকাসুন্দর (আলেকজাণ্ডার ২৭২-৫৫ খৃঃ পূঃ)-এর রাজ্য পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মবিজয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল দেশে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অপর বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী নরপতিগণের ন্যায় রক্তপাতদক্ষ সশস্ত্র সৈন্যদলের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মনীতিজ্ঞ অহিংস শান্তিদূত প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁ[illegible]র সাম্রাজ্যে [illegible] পশুর জন্য আরোগ্য-শালা স্থাপন ও সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় ভেষজ গুল্ম ও ফলমূলাদির বৃক্ষ রোপন ও কূপাদি খননের দ্বারা সর্ব্বজীব কল্যাণের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের এই বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে ও ভারতের ইতিহাসকে যে গৌরব দান করিয়াছে

১। দিব্যাবদান বিনয়পিটকের অংশ। ইহাতে লিখিত আছে—"পুণ্ড্রবর্দ্ধননগরে নিগ্রন্থ-উপাসকেন বুদ্ধপ্রতিমা নিগ্রন্থস্য পাদয়োঃ নিপতিতা চিত্রাপিতা শ্রুত্বা চ রাজ্ঞাভিহিতং পুণ্ড্রবর্দ্ধনে সর্ব্বে আজীবিকাঃ প্রঘাতয়িতব্যাঃ" (দিব্যাবদানে অশোকাবদান)।

জগতে তাহার তুলনা নাই। অশোকের সাম্প্রদায়িক উদারতাও ছিল অসাধারণ।

অশোকের পরলোকগমনের অনতিকাল মধ্যেই মধ্য এশিয়ার মরুদেশে মেষপালনের অধিকার লইয়া উ স্নুন (হূণ) ও ইউচি নামক দুইটি যাযাবর উপজাতির দ্বন্দ্বের ফলে ইউচিগণ যখন পশ্চিমাভিমুখে Oxus (বক্ষু বা অক্ষু) নদীতীরে হটিয়া আসে, তখন ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই সময় বক্ষুনদীর উত্তর তীরে শকদ্বীপে (Soghdiana) যে সকল শকজাতি বাস করিতেছিল তাহারা নবাগত ইউচিগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া বাহ্লীকের গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করে। গ্রীকগণ পরাজিত ও পশ্চাৎপদ হইয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে কপিশা, গান্ধার ও পঞ্জাবে নূতন নূতন রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীকরাজগণের মধ্যে ডেমেট্রিয়াস (১৯০ খৃঃ পূঃ) ও মিনাণ্ডারের (১৬০-১৪০ খৃঃ পূঃ) নাম প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। মিনাণ্ডার মথুরা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। শিয়ালকোটে তাঁহার রাজধানী ছিল।

এই সময় মৌর্য্যবংশের অন্তিমদশা উপস্থিত, এবং অনুমান ১৮৫ খৃঃ পূঃ শেষ মৌর্য্যরাজ বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া সুঙ্গবংশীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র (পুষ্পমিত্র) মগধ সিংহাসন অধিকার করেন। পুষ্যমিত্র সম্ভবতঃ মিনাণ্ডারকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে। স্বয়ং পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করেন।[১] অনুমান একশত বৎসর রাজত্ব করিবার পর সুঙ্গবংশের শেষ রাজা দেবভূমিকে হত্যা করিয়া তাঁহার কাণ্বাংশীয় মন্ত্রী বসুদেব অনুমান ৭৪ খৃঃ পূঃ মগধ সিংহাসন অধিকার করেন। এই কাণ্বগণ অনুমান ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। সুঙ্গ ও কাণ্বগণের সময়ে গৌড়বঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। মহাস্থান হইতে সুঙ্গযুগের পোড়ামাটির স্ত্রী দেবতার মূর্ত্তি ও অপর একটি টেরাকোটা (terracotta) মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পোখর্ণা (বাঁকুড়া) ও তমলুক হইতে যে দুইটি টেরাকোটা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞগণের মতে সুঙ্গযুগের মূর্ত্তি। বানগড় হইতেও সুঙ্গ যুগের মৃৎভাণ্ড ও মৃন্ময় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে শকগণ ধীরে ধীরে মধ্য এশিয়া হইতে অগ্রসর হইয়া ভারত সীমান্তে হেলমণ্ড নদীর তীরে শকস্থান (Sistan) নগর স্থাপন করে এবং ক্রমশঃ কপিশা,

১। পুষ্পমিত্রের যজ্ঞাশ্বকে সিন্ধুতীরে একদল গ্রীক বন্দী করিলে অশ্বরক্ষক (পুষ্পমিত্রের পৌত্র) কুমার বসুমিত্র গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করতঃ যজ্ঞাশ্ব উদ্ধার করেন (মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক)।

গান্ধার ও পঞ্চনদের গ্রীকরাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়া তথায় নূতন রাজ্য স্থাপন করে। কালক্রমে এই শক রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে ইহার ক্ষত্রপ উপাধিধারী প্রাদেশিক শক শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ইহাদের একদল তক্ষশিলা ও মথুরায়, এবং অপরদল সৌরাষ্ট্রে, উজ্জয়িনীতে ও নাসিকে (মহারাষ্ট্র) রাজ্য স্থাপন করে। তক্ষশিলার ক্ষত্রপগণ মধ্যে লিয়ক ও তৎপুত্র পৈটিক এবং মথুরার ক্ষত্রপগণ মধ্যে রাজবুল ও তৎপুত্র সোডাসের নাম বিখ্যাত।

২৮ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত কাণ্ব বংশের রাজত্ব চলে। প্রায় এই সময়ে শিমুক নামক এক ব্যক্তি দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্ত্তী নদীমুখে অন্ধ্র দেশে (রাজধানী ধনকটক) স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। শিমুকের পুত্র সাতকর্ণি কলিঙ্গরাজ খারবেলের সমসাময়িক ছিলেন।[১] শিমুকের বংশের নাম অন্ধ্র বংশ। এই বংশের রাজত্ব প্রায় ২২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে। পৌরাণিক মতে ইঁহারা কিছুকাল পাটলিপুত্রেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

অনুমান ৪০ খৃঃ ইউ'চিদের কুশান শাখার কুজল কদ্‌ফাইসিস অপর শাখাগুলিকে একত্রিত করিয়া হিন্দুকুশ পার হইয়া হারমইস্ (Hermaias) নামক শেষ গ্রীক রাজাকে রাজ্যচ্যুত এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের শকাধিপতিগণকে বিধ্বস্ত করিয়া তক্ষশিলা ও মথুরা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ইঁহার পুত্র বীমকদফাইসিস পিতার মৃত্যুর পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। অতঃপর পুরুষপুরে (পেশোয়ারে) রাজধানী করিয়া শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা কণিষ্ক ৭৮ খৃঃ উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতে প্রবল হইয়া উঠেন। কণিষ্কের ৩-১৮, তৎপুত্র বাসিষ্কের ২৭-২৮, তৎপর হুবিষ্কের ৩১-৬৮, বাসুদেবের ৭৪-৯৮, তৃতীয় কণিষ্কের

১। চেত বংশীয় কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাথিগুম্ফা লিপিতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে তিনি ৩০০ বর্ষ ("নন্দরাজ তিবষ শত মাতিতম") পূর্ব্বে নন্দরাজ যে প্রণালী খনন করিয়াছিলেন তাহা তনশূলীয় (তোষালি) পথ হইতে রাজধানী (কলিঙ্গনগর) পর্য্যন্ত প্রসারিত করেন। এই লিপিতে অন্যত্র আছে যে, তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে রাজা সাতকর্ণিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সৈন্যদল কৃষ্ণবেনা নদীর তীর হইতে অশিক নগরকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, এই সাতকর্ণি পুণা জেলার নানাঘাট লিপির রাজ্ঞী নায়নিকার পুত্র সাতবাহন বংশীয় শ্রীসাতকর্ণির সহিত অভিন্ন (I. H. Quarterly Vol. XIV p. 475)। কোন কোন মতে অনুমান ২২৯ খৃঃ পূঃ সাতকর্ণির পিতা শিমুক অন্ধ্র দেশে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন (I. H. Q. Vol. XXVIII p. 68-78)।

১০২-১৩২, দ্বিতীয় বাসুদেবের ১৩২-১৬২ শকাব্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কুশানগণ এই সময়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এইরূপে খৃষ্টীয় প্রথম শতক হইতে তৃতীয় শতকের কতকদূর পর্য্যন্ত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুশানগণ ও পশ্চিম ও মধ্যভারতে শকগণ ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় সাহিত্যে ইহারা উভয়ে একমাত্র শক নামেই পরিচিত এবং ধর্ম্মে ইহারা ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল। শক ও কুশানগণের গৌড় বঙ্গের উপর কোন প্রভাব ছিল কিনা জানা যায় না। ১৮৮২ খৃঃ তমোলুকে প্রথম কণিষ্কের একটি তাম্র মুদ্রা, ১৯০৬ খৃঃ বগুড়া জেলার রায়কালী গ্রামে প্রথম বাসুদেবের একটি সুবর্ণ মুদ্রা, ১৮৯০ খৃঃ মুর্শিদাবাদে দ্বিতীয় বাসুদেবের একটি সুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাসুদেবের বহু সুবর্ণমুদ্রা কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। দিনাজপুর জেলার বানগড় হইতে প্রাপ্ত কুশানদের কয়েকটি টেরাকোটা মূর্ত্তি কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামে সংগৃহীত হইয়াছে।

অতঃপর ইরাবতী, শতদ্রু ও যমুনার মধ্যে যৌধেয়গণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া কুশানগণকে সিন্ধুনদের পশ্চিমে বিতাড়িত করে। এই যৌধেয়গণ নিজদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিত। ইহাদের মুদ্রায় খরোষ্ঠীর পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মী অক্ষরে "যৌধেয় গণস্য" কথাগুলি খোদিত আছে। শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী কুনিন্দগণ সম্ভবতঃ এই কার্য্যে যৌধেয়গণকে সাহায্য করিয়াছিল। কুনিন্দরাজ ছত্রেশ্বর ভাগবতের (২০৭ খৃঃ) মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই কুনিন্দগণ সম্ভবতঃ ২৫০ খৃঃ পর যৌধেয়গণের সহিত মিশিয়া যায়। খৃঃ চতুর্থ শতকের প্রথমে মদ্রগণ ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যে (রাজধানী শল্যকোট বা শিয়ালকোট) স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। প্রায় এই সময়েই মঘগণ কৌশাম্বীতে ও বাঘেলখণ্ডে এবং নাগগণ মথুরা, কান্তিপুরী ও পদ্মাবতীতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে; এইরূপে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতে শক ও কুশানগণের আধিপত্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু ৮০-১৭০ খৃঃ মধ্যে মধ্যভারতে (উজ্জয়িনী) শকাধিপতি চষ্টন ও তৎপৌত্র রুদ্রদাম (১ম) এবং মহারাষ্ট্রে (নাসিক) শকরাজ খহরাত ও তৎবংশীয় ভূমক ও নাহাপন রাজত্ব করিতে থাকে। রুদ্রদামের (১ম) মৃত্যুকাল (১৭০ খৃঃ) পর্য্যন্ত সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়), গুজরাট, মালব (মধ্যভারত), সিন্ধু, সৌবীর (মূলতান) ও রাজপুতানায় শকাধিপত্য অক্ষুন্ন ছিল। রুদ্রদামের (১ম) পুত্র দামজদ (১ম), তৎপর জীবদামন (১৭৫ খৃঃ), তৎপর রুদ্রসিংহ (১ম) পশ্চিমভারত ও মধ্যপ্রদেশ (মালব) শাসন করিতেন। রুদ্রসিংহ (১ম) আভীররাজ ঈশ্বরদত্ত কর্ত্তৃক ১৮৮

খৃঃ রাজ্যচ্যুত হন। কিন্তু ১৯০ খৃঃ তিনি নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। অতঃপর রুদ্রসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবদামন (১৯৭ খৃঃ) ও তৎপর রুদ্রসিংহের পুত্র রুদ্রসেন (১ম), (২২০।২২২ খৃঃ) রাজা হন। সর্ব্বশেষ শকাধিপ রুদ্রসিংহ (৩য়) ৩৮৮-৩৯৮ খৃঃ পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন[১]। ইতিমধ্যে অন্ধ্রবংশীয় গৌতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি (১৭২ খৃঃ) মহারাষ্ট্র (রাজধানী নাসিক) অধিকার করিয়া তত্রত্য শকাধিকার বিনষ্ট করেন। ২২৫ খৃঃ মালবগণ রাজপুতানায় প্রবল হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে এবং রাজা প্রবর সেনের নেতৃত্বে (২৭৫-২৯০ খৃঃ) বাকাটকগণ মধ্যভারতে প্রবল হইয়া উঠে। প্রবর সেনের পিতা বিন্ধ্যশক্তি (২২৫-২৭৫ খৃঃ) বিদিশা (ভিলসা), বিদর্ভ (বেরার) ও অশ্মকদেশে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু প্রবর সেনের প্রভুত্ব নর্ম্মদার দক্ষিণভাগেও ব্যাপ্ত হয় ও তাঁহার প্রভাব দক্ষিণ কোশল (সম্বলপুর), বাঘেলখণ্ড পর্য্যন্ত অনুভূত হয়। এইরূপে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে যৌধেয় ও কুণিণ্ড্যগণের চেষ্টায় পূর্ব্ব পঞ্জাব হইতে ও মঘ ও নাগগণের চেষ্টায় উত্তর ভারত হইতে কুশানগণ এবং অন্ধ্র, বাকাটক ও মালবগণের চেষ্টায় পশ্চিম, দক্ষিণ ও মধ্যভারত হইতে শকগণ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হইয়া যায়। এইরূপে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক শেষ হইবার পূর্ব্বে কোন স্থায়ী কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে সমগ্র ভারত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে ইহার প্রমাণ আছে। কেবলমাত্র সিন্ধুর পশ্চিম পাড়ে কুশানগণ ও পশ্চিম মালবে (উজ্জয়িনী) শকগণ কোনও রূপে টিকিয়া থাকে।

গঙ্গার উত্তর তীরে তীরভুক্তি (ত্রিহুত, মিথিলা বা বিদেহ) প্রদেশে (বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব হইতে) প্রাচীন লিচ্ছবীগণের একটি স্বাধীন গণতন্ত্র রাজ্য ছিল। বৈশালী নগরে (মজঃফরপুর জেলার বেশাড় গ্রাম) তাহাদের রাজধানী ছিল। মিথিলার

১। রুদ্রসেনের পর তাঁহার ভ্রাতা সঙ্ঘদামন, তৎপর অপর ভ্রাতা দামসেন ২৩৮ খৃঃ পর্য্যন্ত মহাক্ষত্রপ ছিলেন। তৎপর তৎপুত্র যশোদামন, তৎভ্রাতা বিজয় সেন (২৪০-২৫০ খৃঃ), তৎভ্রাতা দামজদ (৩য়) (২৫০খৃঃ), রুদ্রসেন (২য়) বিশ্বসিংহ (২৭৯ খৃঃ) ও ভর্ত্তৃদামন (৩০৪ খৃঃ) যথাক্রমে রাজত্ব করেন। অতঃপর নূতন এক শকবংশ রাজা হয়। এই বংশের রুদ্রসিংহ (২য়) ও যশোদামন (২য়) (৩০৪-৩৪৫ খৃঃ) এবং তৎপর চষ্টন বংশীয় রুদ্রদামন (২য়), তৎপুত্র রুদ্রসেন (৩য়) (৩৪৮-৩৮০ খৃঃ), তাঁহার ভাগিনেয় সিংহসেন (৩৮২ খৃঃ), তৎপুত্র রুদ্রসেন (চতুর্থ) ও রুদ্রসিংহ (৩য়) (৩৮৮-৩৯৮ খৃঃ) পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করেন।

পশ্চিম সীমায় গণ্ডকী নদী ও পূর্ব্ব সীমায় কৈশিকী (কুশী) নদী। তৎকালে গণ্ডকীর পশ্চিমে কাশী ও কোশল রাজ্য ও কুশী নদীর পূর্ব্বে পৌণ্ড্র (বরেন্দ্র) জনপদ বর্ত্তমান ছিল। চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিংএর (৬৭২-৬৯৩ খৃঃ) 'কৌ-ফা-কও-সং-চুয়েন' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানা যায় যে, এ সময়ে হুয়েন-লুম (প্রজ্ঞাবর্ম্মা) নামক একজন কোরিয়া দেশীয় ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন—"জনশ্রুতি অনুসারে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বিশজন চীনা পরিব্রাজক বুদ্ধ গয়ায় আগমন করেন। তাঁহাদের অবস্থানের জন্য মহারাজ শ্রীগুপ্ত 'Mi-li-kia-si-kia-po-no' নামক স্তূপের নিকট একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন, এবং তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য তথায় বিশখানি গ্রাম দান করেন। এই গ্রামগুলি এক্ষণে রাজা দেববর্ম্মার (আদিত্য সেনের পুত্র দেবগুপ্ত ?) অধিকারভুক্ত। গয়ার মহাবোধি হইতে কুরুকবিহার দুই যোজন পূর্ব্বে অবস্থিত। সম্প্রতি মহারাজ আদিত্য সেন (৬৭২ খৃঃ) ইহার নিকটে একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কুরুকবিহার হইতে গঙ্গাতীর ধরিয়া ৪০ যোজন (stadia) পূর্ব্ব দিকে মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো (Deer temple) স্তূপ অবস্থিত। বোধিগয়া হইতে নালন্দা সাত যোজন উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই নালন্দা বিহার রাজা শক্রাদিত্য-(কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত" (Beal's Introduction to the Life of HuenTsing p. XXXVI-XXXVII)।

ইৎ-সিং-এর উক্ত বিবরণ অনুসারে বোধিগয়া হইতে নালন্দার দূরত্ব সাত যোজন। বর্ত্তমান মাপে এ দূরত্ব ৪৭ মাইল। সুতরাং ইৎ-সিং-এর এক যোজন, এখনকার প্রায় সাত মাইলের সমান। এই হিসাবে বোধিগয়া হইতে গুপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো স্তূপটি আধুনিক মাপে ২৮২ মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। বোধিগয়া হইতে পূর্ব্বদিকে পুণ্ড্রাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন-পুরের (মহাস্থানগড়) দূরত্বও ঐরূপ।

Chavannis তাঁহার Religieux Eminents (p. 82-83) নামক গ্রন্থে সন্দেহযুক্তভাবে লিখিয়াছেন যে, 'মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো'র সংস্কৃত রূপ "মৃগশিখাবন" হইতে পারে। ডাক্তার ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী Chavannis-এর মত অনুসারে উক্ত স্তূপের নাম "মৃগশিখাবন" মনে করিয়া উহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়াছেন (I. H. Q. Vol XIV p. 535)। প্রকৃতপক্ষে 'মৃগশিখাবন' নামক কোন স্তূপের উল্লেখ কোন ভারতীয় গ্রন্থে কি লিপিতে দৃষ্ট হয় না। Beal-এর অনূদিত হিউয়েন সঙ্গ-এর জীবন-চরিতে ঐ স্তূপের অনুবাদ "Deer temple" করা হইয়াছে। মহাযানী বৌদ্ধদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ "অষ্ট সাহস্রিকা

প্রজ্ঞাপারমিতা"র (১০১৫ খৃঃ) একটি হস্তলিপি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। উহার আর একখানি প্রতিলিপি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। এই দুইখানি পুঁথিতে স্থানের নাম সহ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দেবদেবীর চিত্র দেওয়া আছে। ফরাসী অধ্যাপক ফুসে ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে "বৌদ্ধ মূর্ত্তিতত্ত্ব" গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তিনি বরেন্দ্র দেশের প্রসিদ্ধ "মৃগস্থাপন" স্তূপের সচিত্র বিবরণ দিয়াছেন। অধ্যাপক ফুসের মতে ইৎ-সিং-এর বর্ণিত "মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো" স্তূপ উক্ত "মৃগস্থাপন" স্তূপের চীনা রূপ। মৃগস্থাপন স্তূপ বরেন্দ্র দেশে অবস্থিত হওয়ায় ও শ্রীগুপ্ত এই স্তূপের নিকট চীনা তীর্থযাত্রীদের জন্য বিহার নির্ম্মাণ ও বিশখানি গ্রাম দান করায় তাঁহার রাজ্য যে বরেন্দ্র দেশ তাহা নিশ্চিত। হিউয়েন সঙ্গ পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের ৪ মাইল পশ্চিমে ভাসিভা (Po. shi-Po) বিহারের নিকট একটি স্তূপ দেখিয়াছিলেন। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাই সম্ভবতঃ 'মৃগস্থাপন স্তূপ'।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির মতে তাঁহার প্রপিতামহের নাম মহারাজ শ্রীগুপ্ত, পিতামহের নাম মহারাজ ঘটোৎকচ গুপ্ত এবং পিতার নাম মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং তিনি স্বয়ং লিচ্ছবী দৌহিত্র। উক্ত প্রশস্তি হইতে আরও জানা যায় যে, তিনি কোতকুলজকে (কাতকুলজ?) বন্দী করিয়া পাটলিপুত্র এবং চন্দ্রবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া রাঢ় অধিকার করিয়াছিলেন।[১] সমতট, ডাবক (আসামের নওগাঁ জেলা), কামরূপ ও নেপাল তাঁহার বশ্যতা

১। এই চন্দ্রবর্ম্মা বোধহয় রাঢ় দেশের পুষ্করণার অধিপতি মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা। রাঢ় দেশে বর্ত্তমান বাঁকুড়া সহরের প্রায় বার মাইল উত্তর-পশ্চিমে শুশুনিয়া পাহাড়। ঐ পাহাড়ের ২৪ মাইল পূর্ব্বে দামোদর নদীর নিকট ধ্বংসাবশেষপূর্ণ পলাশডাঙ্গা ও পখরণা গ্রাম। এই গ্রামের একটি উচ্চ স্থানকে 'গড়ের ডাঙ্গা' ও আর একটি পরিখা চিহ্নযুক্ত স্থানকে রাজবাড়ী বলে।

শুশুনিয়া পাহাড়ে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের অক্ষরের এইরূপ একটি লিপি খোদিত আছে—

(১) চক্রস্বামিনো দাসা গ্রেণাতিসৃষ্টঃ

(২) পুষ্করণাধিপতি মহারাজ শ্রী সিংহ বর্ম্মণঃ পুত্রস্য

(৩) মহারাজ শ্রী চন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতি।"

পাহাড়টির গায়ে একটি চক্র খোদিত আছে। এই চক্রের দক্ষিণ ভাগে প্রথম পঙ্‌ক্তি এবং নীচে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি খোদিত আছে।

স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রশস্তিতে পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) ও মিথিলা (লিচ্ছবীরাজ্য) যে তাঁহাকে অধিকার করিতে হইয়াছিল এইরূপ লিখিত হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রদেশ যে সমুদ্রগুপ্তের পিতৃ-রাজ্য ও মিথিলা মাতামহ-রাজ্য ছিল তাহাই প্রতীয়মান হয়। ইৎ-সিং-এর মতে তাঁহার সময়ের (খৃঃ ৬৭২-৯৩) প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগুপ্ত বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব শ্রীগুপ্ত ১৭২-১৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রায় সমকালে রাজত্ব করিতেন এবং গুপ্ত রাজবংশের রাজা শ্রীগুপ্তের সহিত অভিন্ন ছিলেন।

ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের প্রসিদ্ধ কোটালিপাড়া গ্রামের নিকটস্থ ঘাগরাঘাটি গ্রামে প্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবের তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমির পশ্চিম সীমার বিবরণে লিখিত আছে "পশ্চিমায়াং চন্দ্রবর্ম্ম কোট কোণ"। সুতরাং এখানে রাঢ়ের রাজা চন্দ্রবর্ম্মার একটি সীমান্ত দুর্গ ছিল। সম্ভবতঃ এই কোট হইতে 'কোটালি পাড়া'র নাম হইয়াছে।

প্রাচীন যুগ

[উত্তরাংশ ৩১৯-১২০৬ খৃঃ]

গুপ্ত বংশ

১। মহারাজ শ্রীগুপ্ত (১৯০-১৩৫ খৃঃ ?)

২। মহারাজ ঘটোৎকচ গুপ্ত (২৩৫-২৭৫ খৃঃ ?)

৩। মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত ১ম (২৭৫-৩১৯ খৃঃ ?)

ইং-সিং (৬৭২-৬৯৩ খৃঃ)-এর বিবরণী হইতে জানা গিয়াছে যে তাঁহার সময়ের অনুমান ৫০০শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭২ হইতে ১৯৩ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে শ্রীগুপ্ত নামক একজন রাজা বরেন্দ্র দেশে রাজত্ব করিতেন। Allan ও Chavannis-এর মতে এই শ্রীগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি-কথিত তাঁহার প্রপিতামহ শ্রীগুপ্ত একই ব্যক্তি। গুপ্তাব্দ নামে একটি অব্দ ২৪১ শকাব্দের (৩১৯ খৃঃ, মার্চ্চ) পূর্ণিমান্ত চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে প্রচলিত আছে [১]। কেহ কেহ মনে করেন সমুদ্রগুপ্তের পিতা চন্দ্রগুপ্তের (১ম) সিংহাসনারোহণ কাল হইতে এই অব্দটি প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু সমদ্রগুপ্তের ৫ গুপ্তাব্দে উৎকীর্ণ নালন্দা-শাসন ও ৯ গুপ্তাব্দে উৎকীর্ণ গয়া-শাসন, এই মতের বিরোধী। কারণ গুপ্তাব্দ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ হইতে প্রচলিত হইয়া থাকিলে এই প্রমাণে চন্দ্রগুপ্তের সমগ্র রাজ্যকাল মাত্র ৪ বৎসর ধরিতে হয়। চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় দক্ষিণে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত ধ্বজ-হস্তে দণ্ডায়মান চন্দ্রগুপ্ত, বামে দণ্ডায়মানা [লিচ্ছবী রাজকন্যা] কুমারদেবীকে অঙ্গুরী দান করিতেছেন, এইরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে [২]। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত কুমার দেবীর বিবাহকালে বিবাহের স্মারক স্বরূপ চন্দ্রগুপ্ত এই মুদ্রাগুলি মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই

১। "বিক্রম সংবৎ ১০৮৮=শক সংবৎ ৯৫৩= বলভী (গুপ্ত) সংবৎ ৭১২" (আলবেরুণী)।

২। "Chandra Gupta I type—obv. Chandra Gupta on right holding crescent—topped standard, offering ring to Kumar Debi on left" (C. G. Brown's The Coins of India, Plate V.)

বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। অন্যথা ঐ সময় তাঁহার পক্ষে মুদ্রা প্রচার করা সম্ভব হইত না। কিন্তু এই বিবাহে জাত পুত্র সমুদ্রগুপ্ত যদি ২৫ বৎসর বয়সেও সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ন্যূনপক্ষে ২৫ বৎসরের কম হইতে পারে না। সুতরাং গুপ্তাব্দ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের কালে প্রচলিত হয় নাই, সমুদ্রগুপ্তের কাল হইতেই প্রচলিত হইয়াছে।

এক্ষণে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যারম্ভ ৩১৯ খৃঃ ও তাঁহার প্রপিতামহ শ্রীগুপ্তের রাজ্যারম্ভকাল ১৯০ খৃঃ ধরিয়া শ্রীগুপ্ত, তৎপুত্র ঘটোৎকচ গুপ্ত ও তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত (১ম) পর্য্যন্ত তিন পুরুষের রাজ্যকাল ১২৯ বৎসর হয়।

কোন কোন মতে ইহা অস্বাভাবিক। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত (৩১৯-৩৮০ খৃঃ) ও তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত (২য়) (৩৮০-৪১৫ খৃঃ) ও তৎপুত্র কুমারগুপ্ত (১ম) (৪১৫-৪৫৫ খৃঃ) পর্য্যন্ত তিন পুরুষের পরিজ্ঞাত রাজ্যকাল ১৩৭ বৎসর। সুতরাং শ্রীগুপ্ত হইতে চন্দ্রগুপ্ত (১ম) পর্য্যন্ত তিন পুরুষের রাজ্যকাল মোট ১২৯ বৎসর হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব ইৎ-সিং-এর কথিত শ্রীগুপ্ত ও গুপ্ত-সম্রাটগণের আদিপুরুষ মহারাজ শ্রীগুপ্ত যে একই ব্যক্তি এবং বরেন্দ্র দেশ যে তাঁহার রাজ্য ছিল তাহাই সিদ্ধ হয়।

"শ্রীগুপ্ত" নাম অঙ্কিত দুইটি শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। তাহার একটিতে "গুতস্য" ও অপরটিতে "শ্রীগুপ্তস্য" খোদিত আছে (I.R.A.S. 1901, 199 p. 1905 p 814)। মহারাজ ঘটোৎকচ গুপ্তেরও একটি স্বর্ণমুদ্রা পেট্রোগ্রাডের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় পূর্ব্বোক্ত অঙ্গুরীদানরত মূর্ত্তি ব্যতীত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে "চন্দ্রগুপ্ত" ও "শ্রীকুমার দেবী"র নাম এবং অপর পৃষ্ঠায় সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা লক্ষ্মীমূর্ত্তি ও "লিচ্ছবয়ঃ" কথাটিও খোদিত আছে। মনে হয় এই সময় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তরাজ্যের (বরেন্দ্রের) ও কুমারদেবী লিচ্ছবী রাজ্যের (মিথিলার) সিংহাসনের অধিকারী থাকায় তাঁহাদের বিবাহ দ্বারা এই দুইটি সন্নিহিত রাজ্য মিলিত হইয়া একটি যুক্তরাজ্য গঠিত হইয়াছিল এবং অবস্থানুসারে চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবী একত্র উভয় নামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, এবং লিচ্ছবী সঙ্ঘের প্রভাবসূচক "লিচ্ছবয়ঃ" কথাটি এই মুদ্রায় স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে গুপ্তরাজ্যের মহারাজ ও লিচ্ছবী রাজ্যের অধিরাজরূপে চন্দ্রগুপ্তের "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ সার্থক হইয়াছিল।

৪। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত (৩১৯-৩৮০ খৃঃ)

মহাদেবী—দত্ত দেবী।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে পিতা চন্দ্রগুপ্তের কোন যুদ্ধবিগ্রহের কি দেশ জয়ের কথা লিখিত হয় নাই। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তকে "লিচ্ছবী দৌহিত্র" বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের সম্বন্ধে ইহাতে বলা হইয়াছে যে, পিতা চন্দ্রগুপ্ত ভাবাবেশে রোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ও স্নেহ-ব্যাকুলিত বাষ্পভারান্বিত তত্ত্বদর্শী চক্ষু দ্বারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে আর্য্য, তুমি এইরূপে নিখিল পৃথিবী পালন কর।" এই ঘটনায় তুল্যকুলজগণ ম্লানবদনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সভাসদ্‌গণ আনন্দোচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন [১]। অতঃপর উক্ত প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে যে, তিনি (সমুদ্রগুপ্ত) একাকী অল্পক্ষণ মধ্যে নিজ উদ্বেল ভুজবীর্য্যবলে (তাঁহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত) অচ্যুত নন্দী, নাগ সেন, গণপতি নাগকে উন্মূলিত ও কোতকুলজকে বন্দী করিয়া পুষ্পপুর (পাটলিপুত্র) অধিকার করিয়াছিলেন [২]।

১। "আর্য্যোহীত্যুপগুহ্য ভাবপিশুনৈরুৎ কর্ণিতৈঃ রোমভিঃ
সভ্যেষুচ্ছ্বসিতেষু তুল্যকুলজম্লানাননোদ্বীক্ষিতঃ ॥ ৭
স্নেহব্যাকুলিতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বাক্ষিণা চক্ষুষা
যঃ পিত্রাভিহিতঃ নিরীক্ষ্য নিখিলাংপাহ্যেব মুর্ব্বীমিতি ॥ ৮

এই শ্লোক হইতে অনুমিত হয় যে, চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনের অনেকগুলি দাবিদার ছিল। কিন্তু তাহাদের দাবি উপেক্ষা করিয়া চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী দৌহিত্র সমুদ্রগুপ্তকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই বিষয়ে লিচ্ছবীগণের প্রভাব কার্য্যকরী হইয়াছিল। বিশেষতঃ সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবী দৌহিত্র বলিয়া লিচ্ছবীরাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার দাবি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় সমগ্র রাজ্যে সমুদ্রগুপ্তই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। উদ্বেলোদিত বাহুবীর্য্যরভসাদেকেন যেন
ক্ষণাদুন্মূল্য অচ্যুত-নাগসেন-গ [ণ পতিনাগ]। ১৩
দণ্ডৈগ্রাহয়তৈব কোতকুলজং [কত কুলজং ?]
পুষ্পাহ্বয়ে ক্রীড়তা সূর্য্যোনে * *—*—তট ॥ ১৪"

এখানে "একেন যেন ক্ষণাৎ" কথাগুলি হইতে মনে হয় সমুদ্রগুপ্ত একাকী অল্পক্ষণ মধ্যেই উহাদের সমবেত শক্তিকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ে বহির্গত হইয়া ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ কোশলের (সম্বলপুর) মহেন্দ্র, মহা কান্তারের (বাঘেলখণ্ড) ব্যাঘ্ররাজ, (মহেন্দ্রগিরির উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত) কুরালের মন্তরাজা, মহেন্দ্রগিরি সংলগ্ন কত্তুরের[১] ও পিষ্টপুরের স্বামীদত্ত, এরণ্ডপল্লীর দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, (পূর্ব্বঘাট সংলগ্ন) অবমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গীর (চালুক্যরাজ) হস্তিবর্ম্মণ, (নেলোর জেলাস্থ) উগ্রসেন, পালক্কের দেবরাষ্ট্রের (দেবগিরির) কুবের, কুস্থলপুরের (কাথিয়াবাড়ের) ধনঞ্জয় নৃপতিকে এবং দক্ষিণাপথের অন্যান্য রাজাকে বন্দীকরণ, মুক্তিদান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন "গ্রহণ-মোক্ষানুগ্রহ" দ্বারা তিনি গৌরব লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর উক্ত প্রশস্তিতে লিখিত হইয়াছে যে, আর্য্যাবর্ত্তের রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মণ, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত নন্দী, বলবর্ম্মণকে এবং আরও অনেক রাজাকে বলপূর্ব্বক সমূলে বিনষ্ট করায় তাঁহার উচ্ছলিত মহাপ্রভা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, প্রশস্তিকার সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের পর সর্ব্বপ্রথম তৎকর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্তের গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত নন্দীকে পরাজিত ও কোতকুলজ (মগধপতি)-কে বন্দী করিয়া পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্র অধিকারের কথা বলিয়া, তাঁহার দক্ষিণাত্য বিজয়ের বিবরণ প্রদান করেন। তৎপর আর্য্যাবর্ত্তের রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মণ[২] ও আরও অনেক রাজাকে উন্মূলিত করা প্রসঙ্গেও পুনরায় গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত নন্দী ও (কোতকুলজ স্থলে) বলবর্ম্মাকে উন্মূলিত করার কথা বলিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্ত জয়ের পূর্ব্বোক্ত দুইটি তালিকার মধ্যে দ্বিতীয় তালিকায় প্রথম তালিকার চারিটি রাজার মধ্যে তিনটি রাজার নাম উল্লেখ করায় ও সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পাটলিপুত্ররাজ "কোতকুলজের' উল্লেখ না করিয়া তৎস্থলে 'বলবর্ম্মা'র নাম উল্লেখ

১। কত্তুর বা কলিঙ্গরাজ্যের গঙ্গাবংশীয় চন্দ্রবর্ম্মাকে ১৪৯ খৃঃ সমুদ্রগুপ্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (I. H. Q. Vol I, p. 688)।

ব্যাঘ্ররাজের সম্ভবত বুঁদেলখণ্ডে রাজ্য ছিল। ইনি উচ্চকল্প বংশের রাজা জয়নাথের (৫২৩ খৃঃ) পিতা ব্যাঘ্রদেব।

২। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপির মহারাজা চন্দ্রবর্ম্মা। ইনি রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। (Allahabad Pillar Inscription-identification I. H. Q. Vol I, p. 255)

করায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই বলবর্ম্মাই পুষ্পপুররাজ কোতকুলজ ছিলেন [১]।

ইদানীং বহু সমালোচিত "কৌমুদী মহোৎসব" নাটকে মগধের বর্ম্মবংশীয় একটি রাজবংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মগধরাজ সুন্দরবর্ম্মা চণ্ডসেন নামক একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর সুন্দরবর্ম্মার কল্যাণবর্ম্মা নামক পুত্র জন্মে। ইহাতে চণ্ডসেন সিংহাসন লাভে সন্দিহান হইয়া "মগধকুল-

---

১। কেহ কেহ এই পুষ্পপুরকে 'কান্যকুব্জ' বলিয়া মনে করেন। কারণ হিউয়েন সঙ্গ কান্যকুব্জকে এক স্থলে কুসুমপুর বলিয়া লিখিয়াছেন। (Walters Vol. p. 341) কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে কি অভিধানে ইহার কোন সমর্থন নাই। গার্গী-সংহিতায় একই শ্লোকে কান্যকুব্জ অর্থে কুসুমধ্বজ ও পাটলিপুত্র অর্থে কুসুমপুর বলা হইয়াছে। এই কুসুমধ্বজকেই হিউয়েন সঙ্গ কসুমপুর বলিয়া ভুল করিয়া থাকিতে পারেন। হেমচন্দ্র অভিধানে কুসুমপুর অর্থে পাটলিপুত্র বলা হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষস নাটকে (১ম অঙ্ক) পাটলিপুত্রকে পুষ্পপুর (পুষ্পউর) বলা হইয়াছে। রঘুবংশে (৬।২৪) মগধ রাজধানীকে পুষ্পপুর ও দশকুমারচরিতেও পাটলিপুত্রকে পুষ্পপুর বলা হইয়াছে। গণপতি নাগের অনেকগুলি মুদ্রা মথুরাতে পাওয়া গিয়াছে। হর্ষচরিতে (৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস) পদ্মাবতীর নাগসেন নামক নাগ রাজের উল্লেখ আছে। অচ্যুত নন্দীর নামের প্রথমাংশ "অচ্যু" উত্তর প্রদেশের বেরিলীজেলায় আবিষ্কৃত অনেকগুলি মুদ্রায় খোদিত আছে। এই মুদ্রাগুলির সহিত পদ্মাবতীর নাগরাজাদের মুদ্রার সাদৃশ্য আছে। Smith ও Rapson-এর মতে এই মুদ্রাগুলি এলাহাবাদ প্রশস্তির অচ্যুত রাজার মুদ্রা। (I. R. A. S 1897, V. 28 p 420)।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রের নাম "কত", এই "কত"ই অপভ্রংশে "কোত" হওয়া সম্ভব। "কতকুলজ" অর্থে বিশ্বামিত্রের পুত্র "কত"-এর কুল। মহীশূর রাজ প্রকাশিত "গোত্রপ্রবর নিবন্ধকদম্বং" গ্রন্থে ভরদ্বাজ গোত্রীয় "শুঙ্গ" ও বৈশ্বামিত্র "কতকুল"র উল্লেখ আছে।

"নাগকুলজন্মনঃ সারিকাশ্রাবিত মন্ত্রস্যাসীন্নাশো নাগসেনস্য পদ্মাবত্যাং" (হর্ষচরিত, ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস, পৃঃ ১৭২)।

"ততঃ সাকেতমাক্রম্য পঞ্চালান্ মথুরাং তথা।
যবনাঃ দুষ্ট বিক্রান্তাঃ প্রাপ্স্যন্তি কুসুমধ্বজং ॥
ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে কর্দ্দমে প্রথিতে হিতে।
আকুলাঃ বিষয়াঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ং ॥ (গার্গী-সংহিতা)

বৈরিভিঃ ম্লেচ্ছ লিচ্ছবিভিঃ সহ সম্বন্ধং কৃত্বা লব্ধাবসরঃ কুসুমপুর মুপরুদ্ধবান্" (পৃঃ ৩০) অর্থাৎ মগধবৈরী লিচ্ছবীদের সহিত যোগ দিয়া সুযোগক্রমে পাটলিপুত্র অবরোধ করেন। যুদ্ধে চণ্ডসেন পরাজিত হন। কিন্তু সুন্দরবর্ম্মা চণ্ডসেনের জীবন-নাশ না করিয়া তাঁহাকে লিচ্ছবী রাজ্যে নির্ব্বাসিত করেন। কিছুকাল পরে সুন্দরবর্ম্মার মৃত্যু হইলে চণ্ডসেন মগধ সিংহাসন অধিকার করে। তখন সুন্দরবর্ম্মার পুত্র কল্যাণবর্ম্মা বিন্ধ্যপ্রদেশে (সম্ভবতঃ পদ্মাবতীর নাগ রাজ্যে) পলায়ন করেন। অবশেষে মগধবাসীগণ চণ্ডসেনকে সবংশে ধ্বংস করিয়া ("উন্মূলিত-চণ্ডসেন রাজকুলং") কল্যাণ বর্ম্মাকে মগধ সিংহাসন প্রদান করে। কল্যাণবর্ম্মা রাজা হইয়া মথুরাধিপ কীর্ত্তিসেনের কন্যা কীর্ত্তিমতীকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ এই বিবাহ উপলক্ষে "কৌমুদী মহোৎসব" নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল।

এলাহাবাদ প্রশস্তির পূর্ব্বোক্ত 'বলবর্ম্মা' বোধ হয় এই মগধরাজ কল্যাণবর্ম্মার বংশধর। কল্যাণবর্ম্মার শ্বশুর মথুরাধিপ কীর্ত্তিসেন। এই সময় মথুরায় নাগবংশের রাজত্ব চলিতেছিল। এলাহাবাদ প্রশস্তির গণপতি নাগও মথুরার নাগবংশীয় রাজা ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের অন্য প্রতিযোদ্ধা ছিলেন পদ্মাবতীর নাগরাজ নাগসেন। অচ্যুত নন্দীকেও অহিচ্ছত্রের নাগরাজ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ইহা অসম্ভব নহে যে, লিচ্ছবীগণ সমর্থিত চণ্ডসেনের ধ্বংসের পর কল্যাণবর্ম্মার ভয়ে লিচ্ছবীগণ চন্দ্রগুপ্তের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক যুক্তরাজ্য গঠন করিয়াছিল। এবং কল্যাণবর্ম্মার পর বলবর্ম্মা মগধের রাজা হইলে লিচ্ছবীদৌহিত্র সমুদ্রগুপ্ত পূর্ব্ব-বৈর স্মরণ করিয়া মগধ রাজ্য আক্রমণ করিলে, বলবর্ম্মার সহায়তার জন্য পূর্ব্বোক্ত তিনজন নাগরাজা বলবর্ম্মার সহিত যোগ দিয়াছিল। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত একাকী অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহাদের সমবেত শক্তিকে ধ্বংস করিয়া এবং কতকুলজ বলবর্ম্মাকে বন্দী করিয়া পুষ্পপুর (পাটলিপুত্র) অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অতঃপর এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে যে, আটবিক প্রদেশের অধিপতিগণ পরিচর্য্যা দ্বারা এবং প্রত্যন্তবাসী সমতট, ডাবক (আসামের নওগাঁ জেলার কপিলি ও যমুনার মধ্যস্থিত ডোবোক নামক স্থান), কামরূপ, নেপাল, কর্ত্তৃপুর, (কুমায়ুন ও ঘারওয়াল) প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ এবং মালব, অর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্র, আভীর, প্রার্জ্জুন, সনকনিক, কাক, খরপোরিক প্রভৃতি জাতিসকল করপ্রদান, আদেশপালন ও বশ্যতাজ্ঞাপক আগমন দ্বারা এবং দেবপুত্র সাহি সাহানুসাহি (কুশানরাজ) ও শকমুরুন্দ (শকাধিপ),

সিংহলবাসী[১] ও সর্ব্বদ্বীপবাসিগণ আত্মনিবেদন, গরুড় শাসন গ্রহণাদি দ্বারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

এলাহাবাদ প্রশস্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, তিনি বৃহস্পতি, তুম্বুরু, নারদ ও অন্যান্যকে বিদগ্ধমতি, সঙ্গীতবিদ্যা ও ললিতকলার দ্বারা লজ্জিত করিতেন, এবং বিদ্বজ্জনের উপজীবিকার উপযোগী অনেক কাব্য রচনা করিয়া কবিরাজ শব্দকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ("প্রতিষ্ঠিত কবিরাজ শব্দস্য")।

সম্প্রতি সমুদ্রগুপ্ত রচিত "কৃষ্ণচরিতং" নামক কাব্যের একখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে তাঁহার 'বিক্রমাঙ্ক' উপাধি ছিল এবং কবি কালিদাস কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়া তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন[২]।

তাঁহার প্রায় আট প্রকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে অশ্বমেধযাজী মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি সগৌরবে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই মুদ্রায় এইরূপ লিপি খোদিত আছে—"রাজাধিরাজ পৃথিবীং জিত্বা দিবং জয়ত্যাহৃত বাজিমেধঃ"। অপর একটি মুদ্রায় তাঁহাকে "সমরশতবিজয়ী" বলা হইয়াছে। তাঁহার বীণাবাদনরত রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "কাচ" নাম সংযুক্ত কতকগুলি মুদ্রার সম্মুখ পৃষ্ঠায় "সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তা" (সকল রাজগণের উচ্ছেদকারী) ও অপর পৃষ্ঠায় "কাচোগামবজিত্য দিবং কর্ম্মভিরুত্তমৈর্জ্জয়তি", (কাচ পৃথিবী জয় করিয়া উত্তম কর্ম্মসমূহ দ্বারা দেবলোক জয় করেন)। এখানে "সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তা" বিশেষণ দ্বারা সমুদ্রগুপ্তকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "কচ" শব্দ ঘটোৎকচের সংক্ষিপ্ত রূপ। সুতরাং "কাচ" শব্দে ঘটোৎকচ গুপ্তের পৌত্র সমুদ্রগুপ্তকে বুঝাইতে পারে।

১। চীনাদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বোধগয়া দর্শনে আগত সিংহল-বাসীগণের সুবিধার জন্য সিংহলরাজ মেঘবাহন বোধগয়ার নিকট একটি বিহার ও মন্দির নির্ম্মাণের অনুমতি চাহিয়া মূল্যবান উপহার সহ একটি দূতসংঘ সমুদ্রগুপ্তের নিকট প্রেরণ করেন এবং সমুদ্রগুপ্ত ঐ প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

২। "ইতি শ্রীবিক্রমাঙ্ক রাজাধিরাজ পরম ভাগবত শ্রীসমুদ্রগুপ্ত কৃতে কৃষ্ণচরিতে কথাপ্রস্তাবনায়াং মুনিকবি কীর্ত্তনম্ ইতি।···ইতি রাজকবিকীর্ত্তনম্।" "প্রাভাবয়চ্চ মাং কর্ত্তুং কৃষ্ণস্য চরিতম্ শুভং।" (প্রবাসী, ১৩৫০ সাল। কার্ত্তিক সংখ্যা। অধ্যাপক ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর "সম্রাটকবি সমুদ্রগুপ্ত" প্রবন্ধ)।

৫। চন্দ্রগুপ্ত (২য়) বিক্রমাদিত্য (৩৮০-৪১৬ খৃঃ)
মহাদেবী—(১) কুবেরনাগা (২) ধ্রুবদেবী।

সমুদ্রগুপ্তের পর তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। ভিটারী স্তম্ভলিপিতে ইহার সম্বন্ধে "তৎপাদানুধ্যাত" কথার পরিবর্ত্তে "তৎপরিগৃহীত" (সমুদ্রগুপ্ত-পরিগৃহীত) কথা ব্যবহৃত হওয়ায় কেহ কেহ মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্তের একাধিক পুত্র ছিল, তন্মধ্য হইতে তিনি চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে মনোনীত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণকবি সম্পাদিত 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' (খণ্ডিত) নাটক হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের রামগুপ্ত নামক এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। একদা রামগুপ্ত কোন এক শকরাজা কর্ত্তৃক হিমালয় প্রদেশে যুদ্ধে পরাজিত ও অবরুদ্ধ হন, এবং শকরাজা মুক্তিপণ স্বরূপ রামগুপ্তের নিকট তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্তকে অথবা মহিষী ধ্রুবস্বামিনীকে দাবী করেন। কিন্তু রামগুপ্ত প্রকৃতি সমূহের[১] (রাজসভাসদ্গণের) সন্তুষ্টির জন্য "প্রকৃতিনামাশ্বাসনায়" চন্দ্রগুপ্তকে সমর্পণ না করিয়া ধ্রুবস্বামিনীকেই অর্পণ করিতে উদ্যত হন। এই গুরুতর অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত ধ্রুবস্বামিনীর পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া শকরাজ গৃহে ছদ্মবেশে গমন করতঃ শকরাজের হত্যা ও রামগুপ্তের উদ্ধার সাধন করেন। হর্ষচরিতেও এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়, যথা "অরিপুরে চ পরকলত্রকামুকং কামিনীবেশগুপ্তশ্চ চন্দ্রগুপ্তঃ শকপতিম-শাতয়দিতি" (হর্ষচরিত ১৭৪ পৃঃ)। অর্থাৎ কামিনীবেশধারী চন্দ্রগুপ্ত পরস্ত্রীভোগেচ্ছু শকপতিকে অরিপুরে বিনাশ করিয়াছিলেন। টীকাকার শঙ্কর (ষোড়শ খৃঃ) 'পরকলত্র' অর্থে "চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রাতৃজায়াং ধ্রুবদেবীং" লিখিয়াছেন। রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের সাঙ্গলী লিপি ও কাম্বে শাসনে এবং প্রথম অমোঘবর্ষের সঞ্জন শাসনে এই ঘটনার ইঙ্গিত আছে (I. H. Q. VIII p. 235 and X p. 45)। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে। শ্লোকটি এই—

১। "শুক্রনীতির মতে পুরোহিত, প্রতিনিধি, প্রধান, সচিব, মন্ত্রী, প্রাড্-বিবাক্, পণ্ডিত, সুমন্ত্র, অমাত্য, দূত, এই দশটি রাজার প্রকৃতি।

"পুরোধা চ প্রতিনিধি প্রধান সচিবস্তথা॥ ৬৯
মন্ত্রীচ প্রাড্‌বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ।
অমাত্য দূত ইত্যেতৎ রাজ্ঞঃ প্রকৃতয়ো দশঃ॥ ৭০

"দত্ত্বা রুদ্ধগতিঃ শকাধিপতয়ে দেবীং ধ্রুবস্বামিনীং।
যস্মাৎ খণ্ডিত সাহস নিবৱৃতে শ্রীরামগুপ্ত নৃপঃ॥
অস্মিন্নেব হিমালয়ে গুরুগুহাকোণাক্বণাৎ কিন্নরে।
গীয়ন্তে তব কার্ত্তিকেয়নগরস্ত্রীণাংগণৈঃ কীর্ত্তয়ঃ॥"

অর্থাৎ যে হিমালয়ের কার্ত্তিকনগর হইতে অবরুদ্ধ রামগুপ্ত নৃপতি ভীত হইয়া দেবী ধ্রুবস্বামিনীকে শকাধিপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছিল, সেই স্থানের নারীগণ কর্ত্তৃক গীত তোমার (কোন অজ্ঞাতনামা নৃপতির) গুণগান হিমালয়ের কিন্নরগণ-নিক্কণিত গুহায় ধ্বনিত হয়[১]।

খৃঃ দ্বাদশ শতকে লিখিত "মুজমূলতওয়ারিখ"-এ লিখিত আছে, বর্কমারিস্ (বিক্রমাদিত্য) কর্ত্তৃক শত্রু (শক নৃপতি) হত হইলে রব্বাল (রামগুপ্ত) তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে বর্কমারিস্‌কে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বর্কমারিস্ আত্মরক্ষার্থে উন্মাদের ভাণ করিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। একদা গ্রীষ্মকালে তিনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে নগ্নপদে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রাজা ও রাণী সুখাসনে বসিয়া ইক্ষু চর্ব্বন করিতেছেন। রব্বাল সন্ন্যাসীকে এক টুকরা ইক্ষুদণ্ড খাইতে দিলেন এবং তাহা কাটিবার জন্য একখানি ছুরিকা দিলেন। সন্ন্যাসী ইক্ষু কাটিতে কাটিতে সহসা রব্বালকে আক্রমণপূর্ব্বক সেই ছুরিকা দ্বারা তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন ও স্বয়ং রাজা হইলেন।

মুজমূলতওয়ারিখে আরও লিখিত আছে যে, এক স্বয়ম্বর সভায় ধ্রুবস্বামিনী চন্দ্রগুপ্তকে মাল্যদান করিয়া বরণ করেন। তাঁহাকে লইয়া চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) গৃহে আসিলে রামগুপ্ত ধ্রুবস্বামিনীকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করেন। এই সমস্ত জনশ্রুতিমূলক বিবরণের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক রামগুপ্তকে হত্যা ও ধ্রুবস্বামিনীকে পুনরায় বিবাহ করিবার কাহিনীর মূল পাওয়া যায়[২]। কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রের রচয়িতা শিখর ছদ্মবেশে চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক শক নৃপতির হত্যা সমর্থন করিয়াছেন (শেষ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। প্রথম শ্লোকে যে রাজাকে তিনি তাঁহার নীতি শ্রবণ করাইতেছেন

১। মূলে "শক" স্থলে "খস" ও "রাম" স্থলে "শর্ম্ম" লিখিত আছে। ইহা নকলকারকের ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। কার্ত্তিকনগর যুক্তপ্রদেশের আলমোড়া জেলার বৈদ্যনাথ নামক স্থানের নিকটস্থ কার্ত্তিকপুর বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

২। প্রথম অমোঘবর্ষের লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে—"হত্বা ভ্রাতরমেব রাজ্যমহরদ্দেবীং চ দানং তথা। লক্ষং কোটিমলেখয়ৎ কিল কলৌ দাতা স গুপ্তান্বয়ঃ।"

সেই রাজাকে "দেব" বলিয়া উল্লেখ করায় এবং চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের অন্যতম উপাধি "দেব" থাকায় এই শিখরকে কেহ কেহ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী শিখর বলিয়া মনে করেন (I. H. Q. Vol. VIII p. 236)।

রামগুপ্ত রাজা হইবার কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ তাঁহাকে বধ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পিতা সমুদ্রগুপ্তের ন্যায়ই পরাক্রমশালী ছিলেন। মেহেরৌলী লিপির "চন্দ্র"নামক রাজা যে এই চন্দ্রগুপ্ত তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর বোধ হয় সমতটের সামন্তরাজগণ ও সিন্ধুর পরপারবর্ত্তী বাহ্লীকগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও বশীভূত করিয়াছিলেন [১]। কিন্তু মালব ও গুজরাটের শক-নৃপতিকে পরাস্ত করাতেই তিনি সর্ব্বাধিক গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। শক-নৃপতিগণ প্রায় তিনশত বৎসর যাবৎ ঐ প্রদেশগুলি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনীর শেষ শক-নৃপতি মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ (৩য়)-কে ৩৯৮খৃঃ পরাজিত ও নিহত করায় পূর্ব্বোক্ত শকরাজ্যসমূহ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং গুপ্তসাম্রাজ্য পশ্চিমে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময়ে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত ভ্রমণে আগমন করিয়া ছয় বর্ষ কাল তাম্রলিপ্ত হইতে পুরুষপুর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। মহাকবি কালিদাসের প্রভায় চন্দ্রগুপ্তের সভা সমুদ্ভাসিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের অন্যতম মহিষী নাগবংশীয়া কুবের নাগার গর্ভজাত কন্যা ধারণগোত্রীয়া প্রভাবতীগুপ্তার সহিত বাকাটকরাজ (২য়) রুদ্রসেনের (৩৮৫-৯০ খৃঃ) বিবাহ হয় [২]। রুদ্রসেনের মৃত্যুর পর

১। "যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেস্বাহববর্ত্তিনোলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজা।
তীর্ত্বা সপ্তমুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জিতা বাহ্লিকাঃ॥

* * *

চন্দ্রাহ্বয়েন সমগ্রচন্দ্রসদৃশীং বক্ত্রশ্রিয়ং বিভ্রতা॥
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা বিষ্ণৌ মতিম্
প্রাংশুবিষ্ণুপাদগিরৌ ভগবতো বিষ্ণুধ্বজঃ স্থাপিতঃ॥

(মেহেরৌলী স্তম্ভলিপি)

২। বাকাটক বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিন্ধ্যশক্তি (২৭৫ খৃঃ)-র রাজধানী পৌরাণিক মতে বিদিশায় ছিল। তৎপুত্র প্রথম প্রবরসেন। তাঁহার পুত্র

শিশুপুত্র প্রবরসেন (২য়)-এর অভিভাবিকাস্বরূপ প্রভাবতীগুপ্তা (৩৯০-৪১০ খৃঃ) রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। নাগপুর হইতে তের মাইল দূরবর্ত্তী রামটেকের রামগিরি স্বামীকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। কেহ কেহ বলেন কবি কালিদাস এই সময় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক কুমার প্রবরসেনের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বাকাটক রাজধানীতে আগমন করেন এবং রামগিরি স্বামী ও তাঁহার আশ্রমের সহিত পরিচিত হন, এবং এই রামগিরি আশ্রমকেই নির্ব্বাসিত যক্ষের নির্ব্বাসন-স্থান কল্পনা করিয়া এই সময় তাঁহার মেঘদূত কাব্য রচনা করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের প্রায় ছয়খানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। প্রথম লিপি মথুরায়। ইহা ৬১ গুপ্ত সং (৩৮১ খৃঃ)-তে খোদিত। ইহাই সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের প্রথম রাজ্যাঙ্ক। দ্বিতীয় লিপি বিদিশার দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে উদয়গিরিতে। ইহা চন্দ্রগুপ্তের মহাসন্ধিবিগ্রহিক পাটলিপুত্র নিবাসী বীরসেনের লিপি। বীরসেনের অপর নাম শাব। পৃথিবীজয়েচ্ছু মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত তিনি এখানে আসিয়া শিব প্রতিষ্ঠা ও এই লিপি স্থাপন করেন। এই স্থানেই চন্দ্রগুপ্তের মহাসামন্ত সনকানিক মহারাজা ৮২ গুপ্তাব্দে (৪০২ খৃঃ) একখানি শাসন দান করেন। সাঁচির বিহারে ৯৩ গুপ্তাব্দে (৪১২ খৃঃ) বহু যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতি আম্রকার্দ্দবের একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। গোরক্ষপুর জেলার একটি শিবলিঙ্গ-লিপি হইতে জানা যায় যে, বিষ্ণুপালিত ভট্টের পুত্র কুমারামাত্য শিখর স্বামী চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁহার শ্রীবিক্রম, বিক্রমাঙ্ক, বিক্রমাদিত্য ও দেব উপাধি পরিদৃষ্ট হয়।

গৌতমীপুত্র পদ্মাবতীর ভাবশিব নাগের বংশধর ভব নাগের কন্যাকে বিবাহ করেন। গৌতমীপুত্রের পুত্র রুদ্রসেন (১ম) (৩৩৫-৩৬০ খৃঃ); তৎপুত্র পৃথিসেন (৩৬০-৩৮৫ খৃঃ), তৎপুত্র রুদ্রসেন (২য়) (৩৮৫-৩৯০ খৃঃ) যথাক্রমে রাজা হন। এই রুদ্রসেনের পুত্র প্রবরসেন (২য়) (৪২০-৪৪০ খৃঃ) প্রাকৃত ভাষায় "সেতুকাব্য" রচনা করিয়াছিলেন এবং কাব্য রচনায় কালিদাসের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রবরসেনের (২য়) পর তৎপুত্র নরেন্দ্রসেন (৪৪০-৫৬০), তৎপুত্র পৃথিসেন (২য়) যথাক্রমে রাজা হইয়াছিলেন।

৬। কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (৪১৫-৪৫৫ খৃঃ)
পট্টমহাদেবী অনন্তদেবী

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারগুপ্ত সম্রাট হন। বৈশালীতে প্রাপ্ত মহারাজ গোবিন্দগুপ্তের রাজমুদ্রা হইতে জানা যায় যে, এই গোবিন্দগুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের সহোদর ছিলেন। গোবিন্দগুপ্ত বোধ হয় প্রথমে বৈশালীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে তিনি পশ্চিম মালবের শাসনকর্ত্তা (গোপ্তা) হন। উজ্জয়িনীতে বোধ হয় তাঁহার শাসনকেন্দ্র ছিল। পশ্চিম মালবের অন্তর্গত মন্দশোরের রাজা প্রভাকরের সেনাপতি দত্তভট্টের ৫২৪ মালবাব্দের (৪৬৮ খৃঃ) একখানি লিপিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র গোবিন্দগুপ্তের নাম উল্লিখিত আছে। উহাতে আরও লিখিত আছে যে, দত্তভট্টের পিতা বায়ুরক্ষিত গোবিন্দগুপ্তের সেনাধিপ ছিলেন। মহারাজ ঘটোৎকচগুপ্ত বোধ হয় গুপ্তসম্রাট বংশীয় ছিলেন এবং এই সময় তিনি পূর্ব্ব মালবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তুম্ববন (তুমইন) নামক স্থানে তাঁহার শাসনকেন্দ্র ছিল। ৪৩৫-৩৬ খৃঃ খোদিত ঘটোৎকচগুপ্তের একখানি লিপি এই তুম্ববনে পাওয়া গিয়াছে। বেত্রবতী নদী-তীরস্থ ঐরিকানা (ইরান) হইতে পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই তুম্ববন অবস্থিত। এই সময় ঐরিকানা পূর্ব্ব মালবের একটি বিষয় (জেলা) ছিল। বারেন্দ্রের অন্তর্গত দামোদরপুরে প্রাপ্ত ১২৪ গুপ্তাব্দ (৪৪৩ খৃঃ) ও ১২৯ গুপ্তাব্দের (৪৪৮ খৃঃ) তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, এই সময় মহারাজ চিরাতদত্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উপরিক (Governor) ছিলেন, এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরে তাঁহার শাসনকেন্দ্র ছিল।

পশ্চিম মালবের দশপুরে (মন্দশোর) অবস্থিত একটি প্রাচীন সূর্য্যমন্দির কুমারগুপ্ত[১] নামক পৃথিবীপতির রাজ্যকালে ৫২৯ মালবাব্দে (৪৭২ খৃঃ) সংস্কৃত হয় এবং উহাতে একটি শিলালিপি স্থাপিত হয়। ঐ শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, ৪৯২ মালবাব্দে (৪৩৬ খৃঃ) রাজা বিশ্ববর্ম্মার পুত্র রাজা বন্ধুবর্ম্মার রাজ্যকালে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে রাজা বিশ্ববর্ম্মার রাজ্যকালে স্থাপিত ৪৮৩ বিক্রমাব্দের (৪২৭ খৃঃ) একখানি শিলালিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশ্ববর্ম্মার পিতা রাজা নরবর্ম্মার সময়ের ৪৬১ বিক্রমাব্দের (৪০৪ খৃঃ) একখানি শিলালিপিও এখানে এবং ৪৭৪ বিক্রমাব্দের (৪২৮ খৃঃ) অপর একটি শিলালিপি এতদঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিগুলি হইতে জানা যায় যে, নরবর্ম্মার

১। এই কুমারগুপ্ত বোধ হয় দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত।

পিতা সিংহবর্ম্মা ও পিতামহ জয়বর্ম্মাও মন্দশোরে রাজত্ব করিতেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই লিপিগুলিতে সমসাময়িক গুপ্তসম্রাটগণের উল্লেখ নাই এবং গুপ্তাব্দের পরিবর্ত্তে বিক্রমাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মহারাজ কুমারগুপ্তের অন্যতম পুত্র স্কন্দগুপ্তের ভিটারী লিপি হইতে জানা যায়, কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে একাধিক শত্রুর সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত ("যুধ্যমিত্রাংশ্চ")[১] হইতে হইয়াছিল। পুত্র স্কন্দগুপ্ত এই সমস্ত যুদ্ধের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হইতেই ৪৫৫ খৃঃ সম্রাট কুমারগুপ্ত দেহত্যাগ করিলেন। কুমারগুপ্তের রাজ্যসীমা সম্বন্ধে রাজকবি বৎসভট্টির নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য—

চতুঃসমুদ্রান্ত-বিলোল মেখলাং
সুমেরু-কৈলাস বৃহৎ পয়োধরাং
বনান্তরান্ত-স্ফুট-পুষ্পহাসিনীং
কুমারগুপ্ত পৃথিবীং প্রশাসতি ॥

কুমারগুপ্তের বহু উৎকীর্ণ লিপি ও মুদ্রা ভারতের বহু প্রদেশে আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে হয় যে, তাঁহার সুদীর্ঘ রাজ্যকালে বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য অক্ষুন্ন ছিল। তাঁহার স্বর্ণ মুদ্রায় রাজমূর্ত্তির সহিত দুইজন মহিষীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়[২]। কুমারগুপ্তের মুদ্রায় তাঁহার মহেন্দ্রাদিত্য, শ্রীমহেন্দ্র, মহেন্দ্রসিংহ, অশ্বমেধ মহেন্দ্র, মহেন্দ্রসিংহ পরাক্রম উপাধি দৃষ্ট হয়। তিনি পিতামহের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

৭। স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৪৫৫-৪৬৭ খৃঃ)

বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য যখন শত্রুগণ দ্বারা আক্রান্ত সেই দুঃসময়ে সম্রাট কুমারগুপ্ত পরলোকগত হইলেন। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। স্কন্দগুপ্তের ভিটারী লিপিতে তাঁহার সম্বন্ধে "তৎপাদ পরিগৃহীত" কথাগুলি বলা হয় নাই। উহাতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত সম্রাটগণের মাতার নাম উল্লিখিত হইলেও তাঁহার নিজ মাতৃনাম লিখিত হয় নাই। জুনাগড় লিপিতে তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ["ব্যপত্যে সর্ব্বান্

১। "যুধ্যমিত্রাংশ্চ" পাঠের স্থলে "পুষ্যমিত্রাংশ্চ" পাঠ গ্রহণ করিয়া অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

২। British Museum Catalogue of Indian Coins p. 87.

মনুজেন্দ্র পুত্রান্ লক্ষ্মী স্বয়ং যং বরয়াঞ্চকার”] সমস্ত রাজকুমারগণকে ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ হইতে মনে হয় যে, তাঁহার মাতা পট্টমহিষী ছিলেন না। এজন্য তিনি সাম্রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না। তিনি স্বয়ং বাহুবলে বিজয়ী হইয়া রাজলক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। “মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে” এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়, যথা—

‘সমুদ্রাখ্যো নৃপশ্চৈব বিক্রমশ্চৈব কীর্ত্তিতঃ।
মহেন্দ্র নৃপবরো সকারাদ্য মতঃপরং ॥”

অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের পর বিক্রমাদিত্য (চন্দ্রগুপ্ত) তৎপর মহেন্দ্র বা কুমারগুপ্ত তৎপর সকারাদ্য অর্থাৎ স্কন্দগুপ্ত সম্রাট হন।

মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের শ্লোক ও স্কন্দগুপ্তের ভিটারী লিপি হইতে জানা যায় কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্তই সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে শত্রুগণের আক্রমণে গুপ্তকুললক্ষ্মী বিচলিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরাক্রমে সমস্ত অরিকুল পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল এবং বিপ্লুতা কুললক্ষ্মীকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাহুবলে দুর্দ্দান্ত হূন আক্রমণকারীগণ[১] পরাজিত হইল ও ভারতের শস্যশ্যামল প্রান্তর ও জনপূর্ণ নগরমালা রক্ষা পাইল। অতঃপর পিতার পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় স্কন্দগুপ্ত ভিটারী গ্রাম দান করিয়া তথায় একটি প্রস্তর

১। হূনগণ মধ্য এশিয়ার একটি পরাক্রান্ত যাযাবর জাতি। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে ইহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ ভল্গা নদী পার হইয়া রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসকারী গথদিগকে ডানিয়ুব নদীর দক্ষিণ তীরে তাড়াইয়া দেয় এবং আতিলা নামক একজন নেতার অধীনে ভল্গা ও ডানিয়ুব নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে। ৪৫৩ খৃঃ আতিলার মৃত্যুর পর তাহাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়। ঐতিহাসিক গিবন লিখিয়াছেন যে, হূনদের সংখ্যা, শারীরিক শক্তি, দ্রুতগতি ও ঘোর নৃশংসতা গথ জাতিকে ভীতিবিহ্বল করিয়াছিল। হূনেরা নিজ অধিকৃত স্থানের গৃহ ও শস্যসমূহ আত্মসাৎ ও নির্ব্বিচারে নরহত্যা করিত। ইহাদের কর্কশ কণ্ঠস্বর ও কুৎসিত গঠন, প্রশস্ত স্কন্ধদেশ, স্থূল নাসিকা ও সুগভীর কৃষ্ণতারা ক্ষুদ্র চক্ষু, গুম্ফ ও শ্মশ্রুবর্জ্জিত মুখ দেখিলেই তাহাদিগকে চিনিতে পারা যাইত। য়ুরোপ ১৫০ বৎসর ইহাদের অত্যাচারে পীড়িত হয়।

ইহাদের অপর দল অক্ষুস নদীর দিকে অগ্রসর হয়। পারসীকেরা দুইশত বৎসর ইহাদের গতিরোধ করে। ইহারা কাবুলের পথে কুমারগুপ্তের (১ম) রাজত্বের শেষভাগে ভারতে প্রবেশ করে।

স্তম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক তাহার শীর্ষে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহাতে শ্রীগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পিতা কুমারগুপ্ত পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের ও নিজের পরিচয় ও কীর্ত্তিকাহিনী সমন্বিত লিপি খোদিত করেন।

অতঃপর তিনি শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সমুদয় প্রদেশে উপযুক্ত গোপ্তা (শাসনকর্ত্তা) নিযুক্ত করেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে চিরাতদত্ত তখনও বোধ হয় উপরিক ছিলেন। মহারাজ গোবিন্দগুপ্ত পশ্চিম মালবের (উজ্জয়িনী) শাসনকর্ত্তা ও তদধীনে রাজা প্রভাকর মন্দশোরের সামন্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ ঘটোৎকচগুপ্ত অথবা তাঁহার বংশধর তুম্ববনের রাজধানী হইতে পূর্ব্ব মালব শাসন করিতেছিলেন। পর্ণদত্ত সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা এবং তাঁহার পুত্র চক্রপালিত তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পর্ণদত্ত ১৩৭ গুপ্তাব্দে (৪৫৬ খৃঃ) শতহস্ত দীর্ঘ ও সপ্ততি হস্ত উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া গিরিনগর (গির্ণার)-স্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত সুদর্শন হ্রদের পুনরুদ্ধার ও তথায় শিলালিপি স্থাপন করতঃ[১] প্রজাপুঞ্জের হিতসাধন করিয়াছিলেন। কহায়ুং হইতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে ১৪১ গুপ্তাব্দ (৪৬০-৬১ খৃঃ) "শান্তবর্ষ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রায় সাত বৎসর পর অনুমান ৪৬৭ খৃঃ "যাহার দ্বিভুজ ভীম আবর্ত্তকারী হূনদের সহিত সমরে লিপ্ত হইয়া ধরা কম্পিত করিয়াছিল এবং শরনিকর শত্রুগণের কর্ণে গঙ্গা ধ্বনির ন্যায় বোধ হইত" (ভিটারী লিপি) সেই বহু যুদ্ধবিজয়ী মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত পরলোকগমন করেন। দীর্ঘকালব্যাপী হূন যুদ্ধে ও অন্যান্য যুদ্ধে অপরিমিত অর্থব্যয়ের জন্যে রাজকোষ শূন্যপ্রায় হওয়ায় তাঁহাকে নিকৃষ্ট স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মুদ্রায় তাঁহার বিক্রমাদিত্য উপাধি দৃষ্ট হয়। তাঁহার কোন কোন মুদ্রায় তাঁহার মূর্ত্তির সহিত একটি স্ত্রীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহার কোন মহিষীর নাম এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

১। মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা পুষ্যগুপ্ত এই সুদর্শন হ্রদ খনন করেন। অশোকের সময় শাসনকর্ত্তা তুষাস্প ইহার একটি প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ৭২ শকাব্দে (১৫০ খৃঃ) শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামের আদেশে তাঁহার অমাত্য সুবিশাখ এই হ্রদ পুনর্নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর চক্রপালিত ১৩৭ গুপ্তাব্দে ইহার সংস্কার করেন। (সুদর্শন হ্রদের শিলালিপি)।

৮। কুমারগুপ্ত (২য়) প্রকাশাদিত্য ? (৪৬৭-৪৭৭ ?)
পট্টমহাদেবী বৈন্যদেবী ?-

স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্ত-সম্রাটগণের বংশলতা সঠিক নির্দ্ধারণ করা কঠিন। প্রথম কুমারগুপ্তের পট্টমহিষী অনন্তদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ পুরগুপ্তের পৌত্র সম্রাট তৃতীয়কুমারগুপ্তের ভিটারীতে প্রাপ্ত রাজমুদ্রায়[১] শ্রীগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম কুমারগুপ্ত পর্য্যন্ত ও তৎপর তৎপুত্র পুরগুপ্ত, তৎপুত্র নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য ও তৎপুত্র তৃতীয় কুমারগুপ্তের নামগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত, কুমারগুপ্ত (২য়), বুধগুপ্ত ও বৈন্যগুপ্ত নামধেয় গুপ্তসম্রাটগণের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে মনে হয় এই সম্রাটগণ স্কন্দগুপ্তের শাখার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সম্ভবতঃ স্কন্দগুপ্তের পুত্র ছিলেন। ১৫৪ গুপ্তাব্দের (৪৭৪ খৃঃ) সারনাথে প্রাপ্ত একটি শিলালিপির "ভূমিং রক্ষতি কুমারগুপ্তে" এই কথাগুলি হইতে এই কুমারগুপ্তের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ের "প্রকাশাদিত্য" উপাধিযুক্ত কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাগুলির একদিকে "প্রকাশাদিত্য" অপরদিকে অশ্বের নিম্নে "কু" এই আদ্যক্ষর ও চতুর্দ্দিকে "বিজিত্য বসুধাং দিবং জয়তি" কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে। 'কু' অক্ষর খোদিত থাকায় এই মুদ্রাগুলিকে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মুদ্রা বলিয়া মনে হয়। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত ও প্রকাশাদিত্যের মুদ্রাগুলি একত্র প্রোথিত থাকাতেও (Bharsar Hoard) উক্ত অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়।

৯। বুধগুপ্ত শ্রীবিক্রম বা বিক্রমাদিত্য (৪৭৭-৫০৭ খৃঃ)

সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর বুধগুপ্ত সম্রাট হন। বুধগুপ্ত বোধ হয় দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পুত্র ছিলেন। বুধগুপ্তের রাজ্যকালের ছয়খানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্যসীমা পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দামোদরপুরের শাসনলিপি হইতে জানা যায় যে, এই সময় মহারাজ ব্রহ্মদত্ত (৪৮২ খৃঃ) পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উপরিক ছিলেন। সৌরাষ্ট্রের (বলভী) মৈত্রক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি ভটার্ক ও তৎপুত্র সেনাপতি ধরসেন নিজদিগকে গুপ্তসম্রাটগণের সেনাপতি বলিয়া মনে

১। I. A. S. Bengal, 1889 p. 87.

করিতেন। ধরসেনের ভ্রাতা মহারাজ দ্রোণসিংহের ১৮৩ গুপ্তাব্দের (৫০২ খৃঃ) লিপিতে দৃষ্ট হয় যে, গুপ্তসম্রাট স্বয়ং তাঁহাকে সৌরাষ্ট্রের সামন্ত পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ সুরশ্মিচন্দ্র কালিন্দী (যমুনা) হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব মালবের পশ্চিমভাগের সামন্ত রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার অধীনে মহারাজ মাতৃবিষ্ণু (৪৮৪ খৃঃ) ঐরিকিনা (ইরান) বিষয়ের বিষয়পতি ছিলেন। এই সামন্ত রাজ্যের পূর্ব্বে (পূর্ব্ব মালবে) পরিব্রাজক মহারাজ সুশর্ম্মণের সামন্তরাজ্য ছিল। এই বংশের মহারাজ হস্তিন্ (১৫৬-১৯৮ গুপ্তাব্দ = ৪৭৫-৫১৭খৃঃ) ও মহারাজ শঙ্খোভ (১৯৯-২০৯ গুপ্তাব্দ = ৫১৮-৫২৮ খৃঃ) নিজ রাজ্যকে "গুপ্তনৃপরাজ্যভুক্তৌ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরিব্রাজক মহারাজদের রাজ্যের পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বমালবের অন্তর্গত বুন্দেলখণ্ড উচ্চকল্পমহারাজগণ শাসন করিতেন। ইঁহাদের সাতখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই সামন্ত রাজবংশের মহারাজ জয়নাথ (১৭৪ গুপ্তাব্দ = ৪৯৪ খৃঃ ও ১৭৭ গুপ্তাব্দ = ৪৯৭ খৃঃ) ও মহারাজ সর্ব্বনাথের (১৯১-২১৪ গুপ্তাব্দ = ৫১১-৫৩৪ খৃঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে মহারাজ কৃষ্ণগুপ্ত পশ্চিম মালবের গোপ্তা (শাসনকর্ত্তা) ছিলেন। এই কৃষ্ণগুপ্ত বোধহয় গোবিন্দগুপ্তের বংশধর। কোন কোন মতে কৃষ্ণগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্ত অভিন্ন। উজ্জয়িনী ও ধারানগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। এই সময় রাজা প্রভাকর (৪৬৮ খৃঃ) অথবা তদ্বংশীয় কেহ বোধ হয় পশ্চিম মালবের মন্দশোরে সামন্ত নৃপতি ছিলেন। বুধগুপ্তের ১৭৫ গুপ্তাব্দ (৪৯৪ খৃঃ) ও ১৮০ গুপ্তাব্দের (৫০০ খৃঃ) মুদ্রা পাওয়া যায়। বুধগুপ্তের সময়ে ১৬৫ গুপ্তাব্দে ইরানে একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০। মহারাজাধিরাজ বৈন্যগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য (৫০৭-৫১৫ খৃঃ)

কুমিল্লা জেলার গুনাইঘর তাম্রশাসন[১] হইতে বৈন্যগুপ্তের নাম জানা যায়। এই তাম্রশাসনে ইঁহাকে কেবলমাত্র "মহারাজ" বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, এই সময় বৈন্যগুপ্ত সমতট ও সম্ভবতঃ বর্দ্ধমানভুক্তির গোপ্তা বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই তাম্রশাসন দ্বারা মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ১৮৮ গুপ্তাব্দের ২৪শে পৌষ (৫০৬ খৃঃ ১৩ ডিসেম্বর) মহানৌহস্তীঅশ্ব সমন্বিত ক্রিপুর (ত্রিপুরা?) জয় স্কন্ধাবার হইতে উত্তর মণ্ডলভুক্ত গুণিকাগ্রহার (গুনাইঘর) গ্রামের একটি বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান করেন। দাতার পাদদাস মহারাজ রুদ্রদত্তের প্রার্থনাক্রমে এই দানকার্য্য সম্পন্ন হয়। মহাপ্রতিহার মহাপিলুপতি পঞ্চাধিকরনোপরিক পত্যুপরিক

১। I. H. Q. Vol. VI (1930) p 40; Vol IX p. 784, Vol. X p. 154.

পুরপালোপরিক মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত বিজয়সেন এই শাসনের দূতক ও মহাসন্ধি-বিগ্রহিক করণ কায়স্থ নরদত্ত এই শাসনের লেখক ছিলেন। দূতক মহারাজ বিজয়সেন এই দানের বিষয় উত্তর মণ্ডলের কুমারামাত্য রেবজ্জ স্বামী, ভামহ ও বংসভোগীককে অবগত করান।

উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, উত্তর মণ্ডলের ক্রিপুর নামক স্থানে মহারাজ বৈন্যগুপ্তের জয় স্কন্দাবার (রাজধানী) ছিল। তাঁহার অধীনে অন্ততঃ পাঁচটি অধিকরণ, একজন মহারাজ, একজন মহাসামন্ত, একজন মহাসন্ধিবিগ্রহিক ও তিনজন কুমারামাত্য ছিল। ইঁহাদের মধ্যে মহারাজ মহাসামন্ত বিজয়সেন মহাপ্রতিহার, মহাপিলুপতি, পঞ্চ অধিকরণের উপরিক, পত্ত্যুপরিক ও পুরপালোপরিক ছিলেন[১]। কুমারামাত্যগণ বোধ হয় বিষয়পতি ছিলেন। বৈন্যগুপ্তের মুদ্রাগুলিতে তাঁহার "দ্বাদশাদিত্য' উপাধি এবং নালন্দায় প্রাপ্ত তাঁহার রাজমুদ্রায় (Seal) তাঁহার "মহারাজাধিরাজ" উপাধি দৃষ্ট হয়।

বৈন্যগুপ্ত বোধ হয় প্রথমতঃ বুধগুপ্তের অধীনে বঙ্গ ও রাঢ়ের গোপ্তা (শাসনকর্ত্তা) ছিলেন এবং বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় বুধগুপ্তের পুত্র ছিলেন। নালন্দা রাজমুদ্রায় "পরম ভাগবতো মহা-রাজাধিরাজ শ্রীবৈন্যগুপ্ত * গুপ্তস্য পুত্র" লিখিত আছে। পিতৃনাম লুপ্ত হইয়াছে। কেবল উ-কারটির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। বুধগুপ্তের আদ্যক্ষরে উ-কার থাকায় বৈন্যগুপ্তের পিতৃনাম বুধগুপ্ত হওয়াই সম্ভব।

বুধগুপ্তের সময় ভানুগুপ্ত (৫০১ খৃঃ) পূর্ব্ব মালবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সম্ভবতঃ তুম্ববনেই তাঁহার শাসনকেন্দ্র ছিল এবং বোধ হয় তিনি মহারাজ ঘটোৎকচগুপ্তের বংশধর ছিলেন। এই সময় ইঁহার অধীনে গোপরাজ ঐরিকিনার বিষয়পতি ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে (হূনরাজ তোরমানের ? সহিত) যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। গোপরাজ এই যুদ্ধে (৫১০ খৃঃ) নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন। ইরান-সতী স্তম্ভলিপিতে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল[২]।

১। গোপচন্দ্রের সময়ের মল্লসারুল শাসন দ্বারা মহারাজ বিজয়সেন বর্দ্ধমান-ভুক্তিতে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

২। এই যুদ্ধ যে সম্ভবতঃ তোরমানের সহিত হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, এই সময়ে আমরা তোরমানকে ইরানের সম্রাটরূপে দেখিতে পাই। সম্রাট বুধগুপ্তের রাজ্যকালে (৪৭৭-৫০৭ খৃঃ) ইরানের বিষয়পতি মহারাজ মাতৃবিষ্ণু

১১। মহারাজাধিরাজ পুরগুপ্ত—বিক্রমাদিত্য (৫১৫-৫১৬ খৃঃ)
পট্ট মহাদেবী চন্দ্রদেবী

১২। মহারাজাধিরাজ নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য (৫১৬-৫২৫ খৃঃ)
পট্টমহাদেবী মিত্রদেবী

১৩। তৃতীয় কুমারগুপ্ত (৫২৫- ৫৩১ খৃঃ)

স্কন্দগুপ্তের ভিটারী স্তম্ভলিপিতে এইরূপ লিখিত আছে "যিনি চিরোৎসন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যিনি মহারাজ শ্রীগুপ্তের বংশধর, মহারাজ শ্রীঘটোৎকচগুপ্তের বৃদ্ধ প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তের প্রপৌত্র, মহাদেবী কুমারদেবীর গর্ভজাত লিচ্ছবী দৌহিত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তের পৌত্র, যৌবরাজ্যে পরিগৃহীত পরম ভাগবত অপ্রতিরথ ও দত্তদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তের পুত্র, সেই মহারাজাধিরাজ পরম ভাগবত পিতৃপাদ-অনুধ্যাতা ও মহাদেবী ধ্রুবদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্তের পুত্র বর্ত্তমান রাজা স্কন্দগুপ্ত।" ইহাতে স্কন্দগুপ্তের মাতার নাম নাই এবং কুমারগুপ্তের (১ম) অপর পুত্র মহাদেবী অনন্তদেবীর গর্ভজাত পুরগুপ্তের নাম উল্লিখিত হয় নাই। অপর পক্ষে পুরগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের (৩য়) ভিটারী রাজমুদ্রায় মহারাজ শ্রীগুপ্ত

ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যবিষ্ণু ১৬৫ গুপ্তাব্দে (৪৮৫ খৃঃ) ইরানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মাতৃবিষ্ণুর পর ধন্যবিষ্ণু অপর যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাহা মহারাজাধিরাজ তোরমানের রাজ্যের প্রথম বর্ষে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মন্দির গাত্রে লিখিত হয়। সুতরাং ৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এক পুরুষের (প্রায় ২৫ বৎসর) মধ্যে তোরমান পঞ্জাব ও রাজপুতানা অতিক্রম করতঃ পূর্ব্ব মালবের শাসনকর্ত্তা ভানুগুপ্ত ও তাঁহার অধীনস্থ বিষয়পতি গোপরাজকে পরাজিত করিয়া ইরান পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কেহ কেহ ভানুগুপ্তকে বৈন্যগুপ্তের পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। ভানুগুপ্তের কোন মুদ্রা কি রাজমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইরান লিপিতেও তাঁহাকে কেবল মাত্র রাজা বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ সম্রাট যশোধর্ম্মার এক পূর্ব্বপুরুষের পাদদাস ষষ্ঠীদত্তের পৌত্র রবিকীর্ত্তির সহিত স্বীয় ভগ্নীর বিবাহ দেওয়ায় তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া মনে হয় না। [রবিকীর্ত্তির পৌত্র দক্ষের ৫৮৯ মালবাব্দে (৫৩৩ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত কূপলিপি]। (Fleet's Gupta Inscriptions)।

হইতে মহারাজাধিরাজ পুরগুপ্ত পর্য্যন্ত, সমস্ত রাজগণের নাম, তৎপর তৎপুত্র নরসিংহগুপ্ত ও তৎপুত্র স্বয়ং কুমারগুপ্ত (৩য়) পর্য্যন্ত নাম আছে। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত কি বৈন্যগুপ্তের নাম নাই।

অনেকে মনে করেন প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর সময় স্কন্দগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন এবং পুরগুপ্ত সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। পরে স্কন্দগুপ্ত ফিরিয়া আসিয়া বাহুবলে পুরগুপ্তকে অপসারিত করিয়া সম্রাট হন। কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন ভিত্তি নাই। এরূপ হইলে তৎকালের রাজনীতি অনুসারে পুরগুপ্তকে সংহার করিয়াই স্কন্দগুপ্ত রাজপদ গ্রহণ করিতেন। সম্ভবতঃ বৈন্যগুপ্ত নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইয়াছিলেন এবং অন্য উত্তরাধিকারীর অভাবে বৃদ্ধ বয়সে পুরগুপ্তকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে হইয়াছিল।

বৌদ্ধ সাধু বসুবন্ধুর জীবনী লেখক পরমার্থ (৫৩৯ খৃঃ)[১] তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, অযোধ্যার রাজা বিক্রমাদিত্য বসুবন্ধুর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি যুবরাজ বালাদিত্যকে শিক্ষালাভার্থ বসুবন্ধুর নিকট প্রেরণ করেন। পরে যুবরাজ বালাদিত্য রাজা হইয়া বসুবন্ধুকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৃতীয় কুমারগুপ্তের ভিটারী রাজমুদ্রা হইতে জানিতে পারি যে, সম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের পিতা ছিলেন সম্রাট পুরগুপ্ত। মনে হয় সম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের পিতা সম্রাট পুরগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল এবং সম্রাট হইবার পূর্ব্বে পুরগুপ্ত অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

৪৫৫ খৃঃ স্কন্দগুপ্তের সিংহাসন প্রাপ্তির সময় পুরগুপ্তের বয়স ২৫ বৎসর ধরিলে সিংহাসন প্রাপ্তির সময় অর্থাৎ ৫১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়স অন্ততঃ ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহার রাজ্যকাল চারি বৎসর ধরিলে ৫২০ খৃঃ তিনি পরলোকগত হইয়াছিলেন। পুরগুপ্তের কোন রাজমুদ্রা (Seal) কি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই[২]।

পুরগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য পাটলিপুত্র সিংহাসনে

১। চীনের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ৫৩৯ খৃঃ মগধরাজের নিকট একটি দৌত্য চীনসম্রাট কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। পরমার্থ ঐ দৌত্যের সহিত চীন দেশ গমন করেন এবং তথায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন।

২। কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রাকে Allan সাহেব পুরগুপ্তের মুদ্রা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত সরসীকুমার সরস্বতী ঐ সকল মুদ্রাকে বুধগুপ্তের মুদ্রা বলিয়া স্থির করিয়াছেন (I. C. I. 69-92)।

আরোহণ করেন। তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তিম দশা। স্কন্দগুপ্তের বাহুবলে হূনগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্তের পরপারে বিতাড়িত হইলেও, তাহারা উত্তরাপথ আক্রমণে বিরত হয় নাই। তাহারা কপিশা ও গান্ধার রাজ্য অধিকার করিয়া তথায় নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং তথায় নূতন বল সঞ্চয় করতঃ তাহাদের নেতা তোরমানের নেতৃত্বে পুনরায় ভারত আক্রমণে বহির্গত হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহারা পঞ্জাব ও মধ্য ভারতের মধ্য দিয়া ৫১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই পূর্ব্ব মালবের ইরান পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তোরমানের পর তাঁহার পুত্র মিহিরকুল হূনদের নেতা হন। মিহিরকুল তাঁহার পঞ্চদশ বর্ষ রাজ্যকালে (৫২৪ খৃঃ) গোয়ালিয়রে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন—'অভিবর্দ্ধমান রাজ্যে পঞ্চ দশাব্দে নৃপবৃষস্য" ।

মহারাজাধিরাজ নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের প্রধান কীর্ত্তি মিহিরকুলকে পরাভূত করা। হিউয়েন সঙ্গ (৬৩০-৬৪৪ খৃ.) তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, মগধ-রাজ বালাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের পরম অনুরাগী ছিলেন। তিনি মিহিরকুলকে কর দিতে অস্বীকার করেন এবং সীমান্তরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন। মিহিরকুল তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে বালাদিত্য সসৈন্যে একটি জলাভূমিতে আশ্রয় লন। মিহিরকুল অধিকাংশ সৈন্য তাঁহার ভ্রাতার নিকট রাখিয়া অল্প সৈন্য লইয়া ঐ জলাভূমিতে প্রবেশ করিলে বালাদিত্য তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন, কিন্তু মাতার আদেশে মুক্তি দেন। মিহিরকুল মুক্তি পাইয়া স্বরাজ্য পঞ্জাবের শাকলে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছে। তখন তিনি কাশ্মীর রাজ্যে আশ্রয় লন, এবং অল্পকাল মধ্যেই কাশ্মীররাজকে হত্যা করিয়া কাশ্মীরের রাজা হন। অতঃপর তিনি গান্ধার রাজ্য অধিকার করেন এবং এক বৎসর মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নরসিংহগুপ্তের স্বর্ণ মুদ্রার একদিকে রাজমূর্ত্তি ও উহার বামহস্তের নিম্নে "নর" ও চতুর্দ্দিকে "জয়তি নরসিংহগুপ্ত" এবং অপরদিকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি ও তদ্দক্ষিণে "বালাদিত্য" লিখিত আছে।

এই সময় সৌরাষ্ট্রে মৈত্রক বংশীয় ধ্রুবসেন (৫২৫ খৃঃ), মন্দশোরে বিষ্ণুবর্দ্ধন (যশোধর্ম্ম), পশ্চিম মালবে (ধারা অথবা উজ্জয়িনী) হর্ষগুপ্তের পুত্র জীবিতগুপ্ত (১ম), উত্তর ভারতে (কান্যকুব্জ) মৌখরী ঈশানবর্ম্মা, স্থাণ্বীশ্বরে আদিত্যবর্দ্ধন, পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে ব্রহ্মদত্তের বংশধর এবং সমতট ও বর্দ্ধমানভুক্তিতে গোপচন্দ্র অথবা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীরা বোধহয় গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিত।

অপসড় লিপিতে মৌখরীগণকে হূনবিজয়ী ও প্রথম জীবিতগুপ্তকে হিমালয়

প্রদেশে ও সমুদ্রতটে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কথা বলা হইয়াছে। হর্ষচরিতে আদিত্য-বর্দ্ধনের পুত্র প্রভাকরবর্দ্ধনকে হূনহরিণের কেশরী বলা হইয়াছে।' যশোধর্ম্মদেবের শিলালিপিতে তাঁহার পদযুগল মিহিরকুল নৃপতি দ্বারা অর্চ্চিত "অর্চ্চিতং পদযুগং মিহিরকুলেন নৃপেন" বলা হইয়াছে। মনে হয় ঐ সমস্ত সামন্ত নৃপতিগণের সমবেত চেষ্টায় যশোধর্ম্মের নেতৃত্বে ৫২৮ খৃষ্টাব্দের সমকালে সম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য মিহিরকুলকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য সকলেই সেই গৌরবের অংশভাগী হইয়াছিলেন।

হিউয়েনসঙ্গের মতে সম্রাট বালাদিত্য নালান্দায় একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। হূনবিজয়ের পরেই বোধ হয় নরসিংহগুপ্ত পরলোকগমন করেন।

অতঃপর নরসিংহগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত (৩য়) ক্রমাদিত্য (৫৩০-৫৩২ খৃঃ) সিংহাসন লাভ করেন। যুক্তপ্রদেশের ভিটারী গ্রামে প্রাপ্ত এই কুমারগুপ্তের রাজমুদ্রার বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি স্বুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার একদিকে রাজমূর্ত্তির বামহস্তের নিম্নে 'কু' ও পদদ্বয়ের মধ্যে 'গু' ও চতুর্দ্দিকে "মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্ত ক্রমাদিত্যঃ" এবং অপর দিকে "শ্রীক্রমাদিত্যঃ" লিখিত আছে। কুমারগুপ্ত (৩য়)-ই বোধহয় শেষ গুপ্তসম্রাট ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ৫৩০ খৃঃ সমকালে পরলোকগত হইয়াছিলেন।

গুপ্তোত্তর রাজগণ

বিষ্ণুবর্দ্ধন যশোধর্ম্ম (৫৩৩-৫৪২ খৃঃ)

সম্রাট তৃতীয় কুমারগুপ্তের (৫৩০-৩২ খৃঃ) মৃত্যুর পর তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার কোন বংশধর থাকিলেও তাঁহার পক্ষে সিংহাসন ও সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। কারণ এই সময় উত্তর ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাটের পদ লাভ করিবার জন্য শক্তিশালী সামন্ত রাজগণের মধ্যে সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। সেই সমরানল নির্ব্বাপিত করিয়া যিনি সার্ব্বভৌম সম্রাট-পদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার নাম বিষ্ণুবর্দ্ধন যশোধর্ম্ম। পশ্চিম মালবের অন্তর্গত মন্দশোর নগরের নিকটে যশোধর্ম্ম কর্ত্তৃক স্থাপিত দুইটি প্রস্তরস্তম্ভে তাঁহার কীর্তিসমূহ উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

তন্মধ্যে ৫৮৯ মালবাব্দের (৫৩৩-৩৪ খৃঃ) বসন্তকালে স্থাপিত স্তম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয়—

"প্রাচো নৃপান্ সুবৃহতশ্চ বহূনুদীচঃ
সাম্না যুধাচ বশগান্ প্রবিধায় যেন।
নামাপরং জগতি কান্তমদং দুরাপং
রাজাধিরাজ পরমেশ্বর ইত্যুঢ়ং॥"

"যিনি (বিষ্ণুবৰ্দ্ধন যশোধর্ম্ম) সুবৃহৎ প্রাচ্য ও বহুসংখ্যক উদীচ্য নৃপতিগণকে সন্ধিমূলে ও সংগ্রামে বশীভূত করিয়া জগতে শ্রুতিসুখকর ও দুর্লভ রাজাধিরাজ পরমেশ্বর এই দ্বিতীয় নাম ধারণ করিয়াছেন"। যশোধর্ম্মের অপর স্তম্ভে লিখিত আছে যে, গুপ্তনরনাথগণ ও হূনাধিপ যে সকল দেশ অধিকারে সমর্থ হন নাই, যশোধর্ম্ম সেই সকল দেশও ভোগ করিতেছেন। তিনি লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদের উপকণ্ঠে, গহন তালিবনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা (কলিঙ্গ), গঙ্গাসংলগ্ন সানু হিমাচল ও পশ্চিম সাগর এই চতুঃসীমাভুক্ত সামন্তবৃন্দের ঔদ্ধত্য ভুজবলে দূর করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পদতলে আনত করিয়াছেন। তিনি বাহুবলে মিহিরকুলকেও চূড়াপুষ্পহার দ্বারা স্বীয় পদযুগল অর্চ্চনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন[১]।

যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবৰ্দ্ধন স্বনামধন্য নৃপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ ৫৩৩ খৃঃ তিনি সার্ব্বভৌম সম্রাটের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছাড়া তাঁহার আর কোন বংশপরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার পূর্ব্বে জয়বর্ম্মণ (৩৫০ খৃঃ) হইতে বন্ধুবর্ম্মণ (৪৩৬ খৃঃ) পর্য্যন্ত পাঁচজন সামন্ত রাজা দশোরে রাজত্ব করিতেন। অতঃপর রাজা প্রভাকর (৪৬৭ খৃঃ) এখানে রাজা ছিলেন। অতঃপর আমরা ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভলিপি হইতে জানিতে পারি যে বিষ্ণুবৰ্দ্ধন সকল রাজগণকে বশীভূত করিয়া সমগ্র উত্তরাপথের সার্ব্বভৌম সম্রাট হইয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি "ঔলিকর" বংশোদ্ভব ছিলেন। এই "ঔলিকর" বংশের সহিত পূর্ব্বোক্ত রাজা প্রভাকর ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বন্ধুবর্ম্মার কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা জানা যায় না। ৫৮৯ মালবাব্দে (৫৩৩-৩৪ খৃঃ) দক্ষ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পিতৃব্য অভয়দত্তের স্মরণার্থ একটি কূপ

১। কোন কোন মতে মিহিরকুল ৫০২ খৃঃ রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং প্রথমতঃ যশোধর্ম্মার হস্তে পরাজিত হন। পরে নরসিংহগুপ্তকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। (I. H. Q. p 1)

প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে শিলালিপি স্থাপন করিয়াছিলেন (Fleet's Gupta Inscription)। ইহাতে লিখিত আছে যে, অভয়দত্ত বিন্ধ্যপর্ব্বত ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের রাজ-স্থানীয় (শাসনকর্ত্তা) ছিলেন। এই অভয়দত্তের পিতা রবিকীর্ত্তির সহিত পূর্ব্ব মালবের শাসনকর্ত্তা রাজা ভানুগুপ্তের (৫১০ খৃঃ) ভগিনী ভানুগুপ্তার বিবাহ হইয়াছিল। রবিকীর্ত্তির পিতামহ ষষ্ঠীদত্ত যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধনের পূর্ব্বপুরুষের পাদদাস (কর্ম্মচারী) ছিলেন। এই শিলালিপি হইতে অনুমান হয় যে, যশোধর্ম্মের পূর্ব্বপুরুষগণ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁহার স্তম্ভলিপিতে নিজেকে শৈব বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কালীঘাটে একত্র প্রোথিত বৈন্যগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য, নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, কুমারগুপ্ত ক্রমাদিত্য, বিষ্ণুচন্দ্রাদিত্য ও জয়প্রকাণ্ডযশঃ নামক রাজগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণুবর্দ্ধনের প্রথমোক্ত লিপিতে চন্দ্র ও আদিত্যের চিত্র অঙ্কিত থাকায় কেহ কেহ বিষ্ণুচন্দ্রাদিত্যের মুদ্রাকে বিষ্ণুবর্দ্ধনের মুদ্রা বলিয়া মনে করেন। জয়প্রকাণ্ডযশঃ ও বিষ্ণুবর্দ্ধন যশোধর্ম্মের নামের 'যশঃ' শব্দের ঐক্য হইতে মনে হয় জয়প্রকাণ্ডযশঃ যশোধর্ম্মের বংশধর হইতে পারেন।

বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় উত্তরাপথের কেন্দ্রীয় রাজধানী বোধহয় মন্দশোরে ছিল। তাঁহার অপরোক্ষ শাসনের বাহিরে মালবে, মগধে (শ্রীনগরভুক্তি), মিথিলায় (তীরভুক্তি), পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে, কলিঙ্গে ও দণ্ডভুক্তিতে মহারাজ জীবিতগুপ্ত (১ম); সমতটে ও বর্দ্ধমানভুক্তিতে মহারাজ গোপচন্দ্র, স্থানেশ্বর প্রদেশে মহারাজ আদিত্যবর্দ্ধন ও উত্তর ভারতে কান্যকুব্জ, কোশল ও কাশীতেও সম্ভবতঃ দক্ষিণ বিহারের দেওবর্ণার্ক পর্য্যন্ত মহারাজ ঈশ্বরবর্ম্মা ও সৌরাষ্ট্রে মৈত্রকবংশীয় মহারাজ মহাসামন্ত ধ্রুবসেন (৫২৫-৪০ খৃঃ) বিষ্ণুবর্দ্ধনের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন[১]। ৫৪২ খৃষ্টাব্দের প্রায় সমকালে বিষ্ণুবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কোন বংশধর থাকিলেও তাঁহাদের পক্ষে সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। বিষ্ণুবর্দ্ধনের শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অবসানে আর্য্যাবর্ত্তের সাম্রাজ্য-লোলুপ মহাসামন্তগণ পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিতে আরম্ভ করিল। ঈশ্বরবর্ম্মার জৌনপুর লিপিতে তাঁহার অন্ধ্রে, ধারায় (পশ্চিম মালব) ও রৈবতকে (সৌরাষ্ট্র) যুদ্ধ করার কথা লিখিত আছে। অন্ধ্রগণ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "বিন্ধ্যপর্ব্বতের রন্ধ্রে অন্ধ্রপতি সশঙ্ক অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন", ("বিন্ধ্যাদ্রেঃ প্রতিরন্ধ্রং অন্ধ্রপতিনা শঙ্কপরেণাসিতং")।

১। I. H. Q. Vol. IV. p. 461-462

ঈশ্বরবর্ম্মার পৌত্র শর্ব্ববর্ম্মার ৬১১ মালব অব্দের (৫৫৪ খৃঃ) হারহা লিপিতে (১৩২৩ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পৃঃ ২৮৩) লিখিত আছে যে, ঈশানবর্ম্মা সমরে অন্ধ্রপতিকে জয় করিয়া তিন সহস্র মদস্রাবী গজ ও শূলিক (চালুক্য)-গণকে জয় করিয়া নিযুতাধিক যুদ্ধাশ্ব লাভ করিয়া এবং সমুদ্রাশ্রয়ী গৌড়গণকে ("সমুদ্রাশ্রয়ান্ গৌড়ান্") স্থলভূমিচ্যুত ("মোচিত স্থলভুবং") করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১] ইনি রাজাধিরাজগণের অম্বররূপ মণ্ডলের চন্দ্রস্বরূপ ছিলেন ("রাজন্রাজক মণ্ডলাম্বর শশীঃ")। প্রায় এই সময়ে মগধরাজ্যের অধিকার লইয়া মালবপতি কুমারগুপ্তের সহিত ঈশানবর্ম্মার প্রকাশ্য সংগ্রাম আরম্ভ হয়। কুমারগুপ্তের পিতামহ হর্ষগুপ্তের ভগ্নী হর্ষগুপ্তার সহিত ঈশানবর্ম্মার পিতামহ আদিত্যবর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল। পরস্পর কুটুম্ব হইলেও সাম্রাজ্যলোভ তাঁহাদিগকে যুদ্ধবিরত করিতে পারে নাই। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী কুমারগুপ্তের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। আদিত্যসেনের অপসড়ালিপিতে লিখিত আছে, "শ্রীঈশান-বর্ম্মা-ক্ষিতিপতি-শশীনঃ সৈন্য-দুগ্ধোদসিন্ধু লক্ষ্মীসম্প্রাপ্তিহেতুঃ সপদি বিমথিতঃ মন্দারীভূতেন যেন" অর্থাৎ রাজগণের মধ্যে চন্দ্রতুল্য ঈশানবর্ম্মার সৈন্যরূপ ক্ষীরোদ সমুদ্রকে মন্দার পর্ব্বতরূপ (কুমারগুপ্ত) ক্ষণকাল মধ্যে মন্থন করিয়া লক্ষ্মী (মগধরাজ্য) লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সম্পদের মধ্যেও শৌর্য্য ও সত্যব্রত ধারণ করিয়া প্রয়াগে গমনপূর্ব্বক পুষ্পপূজিত হইয়া সলিলে অবগাহনের ন্যায় নিরুদ্বেগে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে মগ্ন হন। অনন্তর তাঁহার পুত্র দামোদর গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং (সম্ভবতঃ পুনরায় আক্রান্ত হইয়া) হূন বিজয়ী মৌখরীগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাহাদিগের সুশিক্ষিত রণকরীশ্রেণী বিপর্য্যস্ত করতঃ তাহাদিগকে পরাস্ত করেন, কিন্তু স্বয়ং রণস্থলে মূর্চ্ছিত হন ["সম্মূর্চ্ছিতঃ সুরবধূর্বরয়াঙ্ককার"]।

কুমারগুপ্ত ও তৎপর দামোদরগুপ্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে মগধে বরুণিকা গ্রাম পর্য্যন্ত (সাহাবাদ জেলা) ও সমগ্র উত্তর প্রদেশে মহারাজ ঈশানবর্ম্মা, স্থানেশ্বর প্রদেশে মহারাজ প্রভাকর বর্দ্ধন এবং সমতট ও রাঢ়ে মহারাজ গোপচন্দ্র স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মহারাজাধিরাজ হইলেন। সৌরাষ্ট্রে মহারাজ ধ্রুবসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ধরপট্ট অথবা তৎপুত্র মহারাজ গুহসেনও

১। "সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলায় পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়দেশ বুঝাইতেছে। গৌড় শব্দে বরেন্দ্র ও রাঢ় উভয়ই বুঝায়। এই সময় সমতট ও রাঢ় মহারাজ গোপচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল।

(৫৪০-৫৮৭ খৃঃ) স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। উপরোক্ত মহারাজাধিরাজগণের বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। *ঈশানবর্ম্মার পুত্র শর্ব্ববর্ম্মার নালন্দায় প্রাপ্ত রাজমুদ্রায় (seal) উৎকীর্ণ পুত্রানুক্রমিক বংশাবলী এইরূপ*—(১) মহারাজ হরিবর্ম্মা—স্ত্রী জয়স্বামিনী দেবী। (২) মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা—স্ত্রী হর্ষগুপ্তা। (৩) মহারাজ ঈশ্বরবর্ম্মা—স্ত্রী উপগুপ্তা। (৪) মহারাজাধিরাজ ঈশানবর্ম্মা—স্ত্রী মহাদেবী লক্ষ্মীবতী (পরিজ্ঞাত রাজ্যকাল ৬১১ বিক্রমাব্দ=৫৫৪ খৃঃ)। (৫) মহারাজাধিরাজ শর্ব্ববর্ম্মা (৫৭৭ খৃঃ)। (৬) মহারাজাধিরাজ অবন্তীবর্ম্মা (৫৭৯-৫৮৯ খৃঃ)। (৭) মহারাজাধিরাজ গ্রহবর্ম্মা—স্ত্রী রাজ্যশ্রী (৫৮৯-৬০৫ খৃঃ)।

২। মহারাজাধিরাজ আদিত্যসেনের অপসড়লিপি (৬৭২ খৃঃ) ও দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেওবর্ণার্কলিপি হইতে প্রাপ্ত পুত্রানুক্রমিক দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশাবলী :—(১) মহারাজ কৃষ্ণগুপ্ত [৪৩৬ খৃঃ (উজ্জয়িনী)]। (২) মহারাজ হর্ষগুপ্ত (ইঁহার ভগ্নী হর্ষগুপ্তা)। (৩) মহারাজ জীবিতগুপ্ত (১ম)। (৪) মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্ত। (৫) মহারাজাধিরাজ দামোদরগুপ্ত। (৬) মহারাজাধিরাজ মহাসেনগুপ্ত [ইঁহার ভগ্নী মহাসেনগুপ্তা]। (৭) মহারাজ মাধবগুপ্ত [৬৪১ খৃঃ]—স্ত্রী শ্রীমতী দেবী (মগধ ও বরেন্দ্র)। (৮) মহারাজাধিরাজ আদিত্যসেন—স্ত্রী কোণদেবী (৬৭২ খৃঃ)। (৯) দেবগুপ্ত—কমলা দেবী। (১০) বিষ্ণুগুপ্ত—ইজ্জাদেবী। (১১) জীবিতগুপ্ত (২য়)।

৩। স্থানেশ্বরের রাজগণের পুত্রানুক্রমিক বংশাবলী [হর্ষবর্দ্ধনের নালন্দা রাজমুদ্রা হইতে]।

(১) মহারাজ নরবর্দ্ধন—স্ত্রী বজ্রিণী দেবী। (২) মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন (১ম)—স্ত্রী অপ্সরা দেবী (৩) মহারাজ আদিত্যবর্দ্ধন—স্ত্রী মহাসেনগুপ্তা। (৪) মহারাজাধিরাজ প্রভাকর বর্দ্ধন—স্ত্রী যশোমতী দেবী (৫) মহারাজাধিরাজ রাজ্যবর্দ্ধন [৬০৪ খৃঃ] তৎপর তদ্ভ্রাতা (৬) মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন [৬০৫-৬৪৭ খৃঃ]।

৪। সমতট ও বর্দ্ধমানভুক্তির রাজগণ। [ধর্ম্মাদিত্যের সময়ের দুইখানি, গোপচন্দ্রের সময়ের একখানি (I. A. July, 1910)], সমাচারদেবের সময়ের একখানি (I. A. August, 1910) ও গোপচন্দ্রের সময়ের মল্লসারুলে প্রাপ্ত একখানি (সা. প. পত্রিকা, ১৩৪৪ সাল) তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

(১) মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র [৫২৫-৫৫০ খৃঃ ?] (২) মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্য [৫৫০-৫৭৫ খৃঃ ?] (৩) মহারাজাধিরাজ সমাচারদেব নরেন্দ্রাদিত্য [৫৭৫-৫৭৫ খৃঃ ?]।

দামোদরপুরে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ তাম্রশাসনের সম্রাটের নামের পাঠ লইয়া *ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় গুপ্তসাম্রাজ্যের সমাপ্তিকাল সম্বন্ধেও মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।* উক্ত তাম্রশাসনের প্রথমাংশ এইরূপ—

"কোটিবর্ষবিষয়াধিকরণস্য সং ২২৪ ভাদ্র দি ৫ পরমদৈবত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রী········· গুপ্ত পৃথিবীপতৌ তৎপাদ পরিগৃহীতস্য পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তাবুপরিক মহারাজস্য রাজপুত্র দেবভট্টারকস্য হস্ত্যশ্ব জনভোগেনানুবহমানকে কোটিবর্ষ বিষয়ে চ তন্নিযুক্ত বিষয়পতি স্বয়ম্ভুদেবে" [২২৪সং (৫৪৩ খৃঃ) ৫ই ভাদ্র পরমদৈবত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রী······ গুপ্ত যখন পৃথিবীপতি ও তৎপাদ পরিগৃহীত মহারাজ রাজপুত্র দেবভট্টারক যখন আবহমান হস্তী, অশ্ব ও জনগণের ভোগে অধিকারী উপরিক ও কোটিবর্ষ বিষয়ে তন্নিযুক্ত বিষয়পতি স্বয়ম্ভুদেব][১]।

এই তাম্রশাসনে "মহারাজাধিরাজ শ্রী" কথার পরবর্ত্তী নামটি অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহার পাঠ লইয়া ঐতিহাসিকগণ নানাপ্রকার কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। উক্ত তাম্রশাসনের সর্ব্বপ্রথম পাঠোদ্ধারকারী অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে উক্ত নামটি "ভানুগুপ্ত"। কিন্তু পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে ঐ মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎপর ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী (ঢাকা রিভিউ, দশম খণ্ড, ১৯২০ মে ও জুন সংখ্যা) সর্ব্বপ্রথম এই নামটিকে "কুমারগুপ্ত" বলিয়া অনুমান করেন। অতঃপর আর, গুপ্তে ও এইচ্‌ কৃষ্ণ শাস্ত্রীও ঐ নামটিকে "কুমারগুপ্ত" বলিয়া মন্তব্য করেন। কিন্তু অধ্যাপক ডঃ বিনয় সেনের মতে উহা "দামোদরগুপ্ত"। তিনি লিখিয়াছেন : "The letter next to শ্রী is 'দ' with the আ sign mixed up with ও sign on the top of the letter ম which is inserted at a lower level. The next letter is 'দ' followed by a distinct sign for 'র' (Historical Aspect of Bengal Inscriptions, p, 240 by Dr. B. C. Sen).

যাহারা ঐ নামটিকে "কুমারগুপ্ত" বলিয়া মনে করেন তাঁহারা উহাকে সম্রাট নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের (৫১৩-২৭ খৃঃ) পুত্র কুমারগুপ্ত বলিতে চান। তাহা হইলে এই কুমারগুপ্তের রাজ্যকাল ৫২৫ খৃঃ হইতে ৫৪৪ খৃঃ পর্য্যন্ত ধরিতে হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মন্দশোর লিপির মতে ঐ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যশোধর্ম্ম সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অপর মন্দশোর লিপিতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে লৌহিত্য নদ (ব্রহ্মপুত্র) হইতে পশ্চিমে

১। এই তাম্রশাসনখানি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে রক্ষিত আছে।

আরবসাগর ও উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এই সময়ে মগধে কি বরেন্দ্র দেশে অন্য কোন সম্রাটের স্থান থাকিতে পারে না। বিরুদ্ধবাদীদের মতে যশোধর্ম্মদেবের স্তম্ভলিপি বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু সমসাময়িক রাজন্য ও জনগণের সমক্ষে সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে মিথ্যা উক্তি শিলালিপির সাহায্যে ঘোষণা করাও সম্ভব বলিয়া মনে করা কঠিন। অপর পক্ষে যদি অস্পষ্ট নাম "কুমারগুপ্ত" হয় তবে উহা পরবর্ত্তী গুপ্তরাজবংশের প্রথম জীবিতগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত হওয়াই সম্ভব। মৌখরী ঈশানবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইবার পর ঈশানবর্ম্মার ন্যায় কুমারগুপ্তও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু উক্ত নাম "দামোদর গুপ্ত" বলিয়াই বোধ হয়। তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান দামোদরপুরের নামটিও দামোদর গুপ্তের নামানুসারে হওয়া অসম্ভব নহে। তাহা হইলে ৫৪৪ খৃঃ কি তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে দামোদর গুপ্তের রাজ্যকাল আরম্ভ হইয়াছিল এবং রাজপুত্র মহাসেনগুপ্ত দেবভট্টারক[১] মগধ-মিথিলা-বরেন্দ্র ও কলিঙ্গের শাসনকর্ত্তা (উপরিক) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কামরূপ-ভীতি প্রবল হওয়াতেই বোধ হয় অধিকতর নিরাপত্তার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। অবশেষে মহাসেনগুপ্তকে কামরূপের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। মহাসেনগুপ্ত ভাস্করবর্ম্মার পিতা সুস্থিতবর্ম্মাকে (৫৭০-৮৫ খৃঃ ?) লৌহিত্য তীরে পরাজিত করিয়াছিলেন।[২] হর্ষচরিতে মহাসেন-গুপ্তকে মালবরাজ ও তাঁহার কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক পুত্রদ্বয়কে প্রভাকর

১। দামোদর গুপ্তের "পরমদৈবত পরমভট্টারক" বিশেষণ থাকায় রাজপুত্রকে "দেবভট্টারক" বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ রাজপুত্রের নাম সুবিদিত থাকায় তাঁহার নামোল্লেখ করা হয় নাই।

২। সুস্থিতবর্ম্মার প্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মার বিষয়ামাত্য আর্য্যগুণের বড়গঙ্গা শিলালিপি ২৩৪ গুপ্তাব্দে (৫৫৩ খৃঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল (ভারতবর্ষ ১৩৪৮ আষাঢ়, পৃঃ ৮০৩)। ভূতিবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রমুখবর্ম্মা, তৎপুত্র স্থিতবর্ম্মা (৫৬০-৭০ ?) তৎপুত্র সুস্থিতবর্ম্মা (৫৭০-৮৫ খৃঃ), তৎপুত্র সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা (৫৮৫-৬০৫ খৃঃ ?) ও ভাস্করবর্ম্মা (৬০৫-৬৫০ খৃঃ ?)

"শ্রীমহাসেনগুপ্তোঽভূৎ তস্মাদ্বীরাগ্রণী সুতঃ।
শ্রীমৎসুস্থিতবর্ম্ম যুদ্ধবিজয় শ্লাঘাপদাঙ্কং মুহ
যস্যাদ্যাপি ** লৌহিত্যস্যতটেষু ** সিদ্ধমিথুনৈ স্ফীতং যশোগীয়তে॥
(আদিত্যসেনের অপসড়লিপি; C. I. I. Vol VIII p. 203)

বর্দ্ধন কর্তৃক যথাক্রমে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের অনুচর রূপে নির্দ্দিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[১] *স্থানেশ্বর রাজ প্রভাকর বর্দ্ধনের মাতা মহাসেনগুপ্তা মহাসেন*-গুপ্তের সহোদরা ছিলেন। দামোদরগুপ্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহাসেনগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। হর্ষচরিতের প্রমাণে জানা যাইতেছে যে মালবরাজ মহাসেনগুপ্তের অল্পবয়স্ক পুত্রদ্বয়কে অসহায় অবস্থায় প্রভাকরবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা কিরূপে সম্ভব হইল তাহা সমসাময়িক অপর একটি ঘটনা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। কলচুরীরাজ শঙ্করগণ ৫৯৫ খৃঃ (কলচুরী সম্বৎ ৩৪৭) মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী হইতে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করেন।[২] ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ৫৯৫ খৃঃ অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে শঙ্করগণ মালব জয় করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মালবরাজ মহাসেনগুপ্তকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া তিনি মালব রাজধানী উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলেই মহাসেনগুপ্তের পুত্রদ্বয়ের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। মহাসেন গুপ্তের পুত্রদ্বয় স্থানেশ্বরের রাজপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, শঙ্করগণ বোধহয় মালবের রাজপদে দেবগুপ্তকে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং মহাসেনগুপ্তের মহাসামন্ত[৩] শশাঙ্কদেব মহাসেনগুপ্তের রাজ্যের অবশিষ্ট অংশে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর শশাঙ্ক বোধহয়

১। "মালবরাজপুত্রৌ ভ্রাতরৌ ** কুমারগুপ্ত-মাধবগুপ্তৌ অস্মাভির্ভবতোরনুচরার্থ মিমৌ নির্দ্দিষ্টৌ। রাজ্যবর্দ্ধনঃ যৌ প্রতিহারেণ সহ প্রবিশন্তং অগ্রতো জ্যেষ্ঠমষ্টাদশবর্ষ বয়সং কুমারগুপ্তং পৃষ্ঠতস্তস্য কণিয়াংসং * মাধবগুপ্তং দদৃশ।" —(হর্ষচরিতং)।

২। শঙ্করগণের পুত্র বুদ্ধরাজ ৬০৮ খৃঃ (কলচুরী সম্বৎ ৩৮০) বিদিশা হইতে এবং ৬০৯ খৃঃ আনন্দপুর (বলভী রাজধানী) হইতে শাসন দান করিয়াছিলেন।

৩। কোন কোন মতে শশাঙ্কদেব মৌখরী অবন্তীবর্ম্মার (৫৭৯-৮৯ খৃঃ) মহাসামন্ত ছিলেন। কিন্তু কর্ণসুবর্ণ কি রোটাসগড় মৌখরীগণের শাসনভুক্ত থাকিবার প্রমাণ নাই। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেওবর্ণার্ক লিপি হইতে এই মাত্র জানা যায় যে, মৌখরী শর্ব্ববর্ম্মন ও অবন্তীবর্ম্মন শ্রীনগরভুক্তির বলভী বিষয়ভুক্ত বরুণিকা (দেওবর্ণার্ক) গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই বরুণিকা গ্রাম সাহাবাদ জেলার প্রধান নগর আরা হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। রোটাসগড় সাহাবাদ জেলার সাসারাম হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও আরা হইতে ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শোন নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। রোটাসগড় হইতে চাঁইবাসা দঃ পূঃ ৯০ মাইল।

মহারাজাধিরাজ সমাচারদেব অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীকে পরাভূত করিয়া সমতট (বঙ্গ) ও রাঢ় (বর্দ্ধমানভুক্তি) অধিকার করিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব

ভারতের ইতিহাসে যশোধর্ম্মের ন্যায় শশাঙ্কের অভ্যুদয়ও একটি বিস্ময়কর ঘটনা। শশাঙ্কের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ সাহাবাদ জেলার সাসারাম হইতে ২৪ মাইল পশ্চিমে ও আরা হইতে ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শোন নদীর তীরস্থ প্রসিদ্ধ রোটাস (রোহিতাশ্ব)-গড়ে পাওয়া যায়। ঐ গড়ের অভ্যন্তরে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগের অক্ষরে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য" কথাটি একটি রাজমুদ্রার (seal) ছাঁচে ক্ষোদিত আছে। উহার উর্দ্ধভাগে একটি উপবিষ্ট বৃষমূর্ত্তিও ক্ষোদিত আছে। এতদ্দ্বারা শশাঙ্কের কর্ম্মজীবন মহাসামন্ত রূপে এই অঞ্চলেই আরম্ভ হইয়াছিল ইহাই প্রতীয়মান হয়। সম্ভবতঃ তিনি মহাসেনগুপ্তের মহাসামন্ত ছিলেন। এই সময়ে মৌখরী-ভীতি প্রশমিত হইলেও সীমান্ত রক্ষার্থে রোটাসগড়ে শশাঙ্কের ন্যায় একজন সাহসী ও নীতিজ্ঞ যোদ্ধাকে মহাসামন্ত পদে নিযুক্ত রাখা আবশ্যক ছিল। পরবর্ত্তীকালে শশাঙ্ক যখন মহারাজাধিরাজ হন সেই সময়ের তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে (প্রবাসী ১৩৫০। শ্রাবণ পৃঃ ২৯৪-৯৭)। তন্মধ্যে প্রথম দুইখানি দ্বারা তাঁহার রাজ্যের ১৯ সংবৎসরে তাঁহার অধীনস্থ উৎকল ও দণ্ডভুক্তির শাসনকর্ত্তা মহারাজ শ্রীসোমদত্ত এবং দণ্ডভুক্তির শাসনকর্ত্তা মহারাজ শ্রীশুভকীর্ত্তি যথাক্রমে ভাদ্র ও পৌষ মাসে দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত তাবীরে ভূমিদান করেন। তৃতীয় শাসন দ্বারা ৩০০ গুপ্তাব্দে (৬১৯ খৃঃ) তাঁহার অধীনস্থ কলিঙ্গের শাসনকর্ত্তা শৈলোদ্ভব বংশীয় মহারাজ মাধবরাজ (গঞ্জাম জেলার) কোঙ্গদমণ্ডলে ভূমিদান করেন। (Epi. Ind. Vol VI).

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সঙ্গ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণপতি বলিয়াছেন।[১] আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মুর্শিদাবাদের ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত রাঙ্গামাটি গ্রামকে কর্ণসুবর্ণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হিউয়েন সঙ্গ-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (মহাস্থানগড়) হইতে পূর্বদিকে ৯০০ লি. (১৮০ মাইল) যাইয়া একটি বড় নদী (ব্রহ্মপুত্র) পার হইয়া কামরূপে (গোহাটী) উপনীত হন।

১। Watters—On Yuan-Chwang Vol. I. p. 343.

কামরূপ হইতে দক্ষিণে ১২০০লি (২৪০ মাইল) যাইয়া সমতটে (বিক্রমপুর), তথা হইতে পশ্চিমদিকে ৯০০ লি. (১৮০ মাইল) যাইয়া তাম্রলিপ্ত (তমলুক), তথা হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৭০০ লি (১৪০ মাইল) যাইয়া কর্ণসুবর্ণে ও তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৭০০ লি. (১৪০ মাইল) যাইয়া ওড্রে (যাজপুর) পৌছেন। হিউয়েন সঙ্গ-এর দিক্ ও দূরত্ব ঠিক রাখিয়া মানচিত্রে তমলুক ও যাজপুর হইতে ১৪০ মাইল দীর্ঘ দুইটি সরল রেখা টানিলে ঐ দুইটি রেখা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটিতে সংযুক্ত না হইয়া বহু দূরবর্ত্তী ছোটনাগপুরের সিংভূম জেলার চাঁইবাসা শহরের প্রায় ২০ মাইল উত্তরে মিলিত হয়। এইস্থানে সবরান্ (সুবর্ণ ?) নামে একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষপূর্ণ গ্রাম অবস্থিত। জেনারেল কানিংহামের সহকারী মি. বেগলার ইহাকেই কর্ণসুবর্ণ বলিয়া মনে করেন (Arch. Survey Report, Vol. VIII, p. 197)। কর্ণসুবর্ণপতি পরম ভাগবত শ্রীজয়নাগদেবের রাজ্যে ঔড়ম্বর বিষয়ের সামন্ত শ্রীনারায়ণভদ্রের শাসনকালে মহাপ্রতিহার সূর্য্যসেন ভট্টব্রহ্মবীর স্বামীকে বপ্পঘোষবাট নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন (Epi. Ind. Vol. XII. No. 13, p 65)। এই ঔড়ম্বর বিষয় আইন-ই-আকবরী উল্লিখিত সরকার ঔড়ম্বরের সহিত অভিন্ন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার যে অংশ পড়িয়াছে তাহা ও বীরভূম জেলা লইয়া সরকার ঔড়ম্বর গঠিত ছিল। জয়নাগদেবের সময় এই ঔড়ম্বর বিষয় তাঁহার সামন্ত নারায়ণ ভদ্রের অধিকারভুক্ত ছিল। অতএব জয়নাগদেবের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলায় থাকিতে পারে না। অতএব মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি কর্ণসুবর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। হিউয়েন সঙ্গ-এর বিবরণ অনুযায়ী সিংভূম জেলার "সবরান্" গ্রামটিই যে শশাঙ্কের রাজধানী "কর্ণসুবর্ণ" ছিল তাহা মনে করাই সঙ্গত। এইস্থানে রাজধানী করিয়া মহাসামন্ত শশাঙ্ক তৎকালে রোটাসগড় হইতে শ্রীনগরভুক্তি, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি, তীরভুক্তি, দণ্ডভুক্তি ও কোঙ্গদমণ্ডল পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। উপরন্তু মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় স্থানেশ্বর-রাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের আশ্রয়ে গমন করিলে তিনি সমগ্র রাঢ় ও বঙ্গ অধিকার করিয়া মহারাজাধিরাজ হন। হর্ষচরিতে (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্করণ, ১৬১-১৬২ পৃঃ) শশাঙ্ককে গৌড়পতি বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ গৌড়রাজ্যে সার্ব্বভৌম অধিকার লাভ করিবার পর তিনি "গৌড়পতি" বলিয়া পরিচিত হন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মহাসেনগুপ্ত (৫৮০-৫৯৫ খৃঃ) কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মাকে (৫৭০-৮৫ খৃঃ ?) লৌহিত্য তীরে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুস্থিতবর্ম্মার কনিষ্ঠ পুত্র ভাস্করবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, "সুস্থিত

বর্ম্মার মৃত্যুর পর জলযুদ্ধনিপুণ প্রবল গৌড়সেনা পুনরায় কামরূপ আক্রমণ করে এবং সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাস্করবর্ম্মা মিলিত হইয়া সামান্য সৈন্য লইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হন (১ম শ্লোক)। দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা শর বর্ষণ করিয়া গৌড়দিগের হস্তীসৈন্য বিধ্বস্ত করেন। তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে তাঁহারা গৌড়সেনাকে ব্যাকুল ও বিহ্বল করিলেও গৌড়সেনার অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং গৌড়গণ হস্তী দ্বারা তাঁহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। ৪র্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, গৌড়গণ পরে তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন।" (ইতিহাস পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৭)।

সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মার মৃত্যুর পর অনুমান ৬০৫ খৃঃ ভাস্কর বর্ম্মা রাজা হইয়া প্রায় ৬৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ যে মহারাজাধিরাজ গৌড়পতি শশাঙ্কের সহিত সংঘটিত হইয়াছিল তাহাই প্রতীয়মান হয়।

এই সময়ে কান্যকুব্জে মৌখরী গ্রহবর্ম্মা (৫৮৯-৬০৫ খৃঃ ?), স্থানেশ্বরে প্রভাকর বর্দ্ধন (৬০৪ খৃঃ) ও মালবে দেবগুপ্ত রাজত্ব করিতেছিলেন। গ্রহবর্ম্মা প্রভাকর বর্দ্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ৬০৪ খৃঃ প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর সাহসী হইয়া মালবপতি (দেবগুপ্ত ?) সহসা কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার ও রাজমহিষী রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করতঃ স্থানেশ্বর বিজয়ে অগ্রসর হন। কামরূপ-ভীতি প্রশমিত হওয়ায় ইতিমধ্যে শশাঙ্কও কান্যকুব্জ অভিমুখে সৈন্য চালনা করেন। অপর দিকে স্থানেশ্বরপতি রাজ্যবর্দ্ধন গ্রহবর্ম্মার নিধনবার্ত্তা শুনিয়া মালবরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং পথিমধ্যে মালবপতিকে পরাস্ত ও সম্ভবতঃ নিহত করেন[১]। হর্ষচরিতে (৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস, পৃঃ ১৬১) লিখিত আছে যে, অতঃপর রাজ্যবর্দ্ধন অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক তদীয় মাতুলপুত্র ভণ্ডীকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ স্থানেশ্বরে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং শশাঙ্কের সম্মুখীন হন। অনেকদিন অতিক্রান্ত হইলে "অতিক্রান্তেষু বহুষু বাসরেষু" রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন সংবাদ পাইলেন তাঁহার ভ্রাতা অক্লেশে মালবসৈন্যের পরাজয়ে সমর্থ হইলেও গৌড়পতি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া স্বভবনে লইয়া গিয়া একাকী অস্ত্রহীন অবস্থায় নিহত করিয়াছে। হর্ষচরিতের টীকাকার ধনঞ্জয় এই গৌড়পতিকে "শশাঙ্কনামা গৌড়পতি"

১। "রাজানো যুধি দুষ্টবাজিন ইব শ্রী দেবগুপ্তাদয়ঃ কৃতা যেন কশাপ্রহার-বিমুখাঃ * ।—(Fleet's Gupta Ins.)

বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার আরও লিখিয়াছেন যে, শশাঙ্ক দূতমুখে রাজ্যবর্দ্ধনকে কন্যা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রলুব্ধ করিয়া সানুচর আমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং ভোজনকালে ছলপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করেন[১]। হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনদ্বয়ে লিখিত আছে যে, রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে অরাতিভবনে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। (Epi. Indica, Vol. I and Vol. II)। হর্ষচরিতে লিখিত আছে যে, ভণ্ডীর মুখে হর্ষবর্দ্ধন শুনিতে পাইলেন রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইবার পর গুপ্তনামক কুলপুত্র কান্যকুব্জ অধিকার করিলে রাজ্ঞী রাজ্যশ্রী বন্ধনমুক্ত হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করেন[২]। অতঃপর গৌড়পতির বিরুদ্ধে হর্ষবর্দ্ধনের অভিযান আরম্ভ হয়। হর্ষ ভণ্ডীকে গৌড়পতির গতিরোধে নিয়োগ করিয়া ভগ্নী রাজ্যশ্রীর সন্ধানের জন্য বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিয়া গঙ্গাতীরে ভণ্ডীর সহিত মিলিত হইলেন। হর্ষচরিত এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত "গুপ্তনামা কুলপুত্র"কে কোন কোন ঐতিহাসিক শশাঙ্ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শশাঙ্ক যে গুপ্তবংশীয় ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। অপরপক্ষে এই গুপ্তনামা কুলপুত্রকে যে রাজ্যবর্দ্ধনের মাতুল ও প্রিয় সহচর কুমারগুপ্ত তাহাই প্রতীয়মান হয়। ইহা হইতে মনে হয়, রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার পর তাঁহার সহচর কুমারগুপ্ত কান্যকুব্জ (কুশস্থলী) অধিকার করিয়াছিলেন এবং শশাঙ্ক কান্যকুব্জ অধিকারে সমর্থ হন নাই।

"আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা এই সময়ের কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই গ্রন্থের ৬৩৪-৬৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "সোমাখ্য (শশাঙ্ক) রাজা হইয়া বারাণসীর মনোরম বৌদ্ধমন্দিরসমূহ বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকালে মধ্যদেশে (স্থানেশ্বরে) রকারাখ্য (রাজ্যবর্দ্ধন) রাজা হইয়াছিলেন। তিনি নিহত হইবার পর তদনুজ হকারাখ্য (হর্ষবর্দ্ধন) রাজা হন। তিনি সোমাখ্য (শশাঙ্ক) রাজাকে বন্দী করিবার জন্য পূর্ব্বদিকস্থ পুণ্ড্রপুরে

১। "তথাহি কৃতোঽস্তো বিনাশো যেন সঃ শশাঙ্কনামা গৌড়াধিপতি। * * তথাহি তেন শশাঙ্কেন বিশ্বাসার্থং দূতমুখেন কন্যাপ্রদানমুক্ত্বা প্রলোভিতো রাজ্যবর্দ্ধনঃ স্বগৃহে সানুচরো ভুঞ্জমান এব ছদ্মনা ব্যাপাদিতঃ।"—হর্ষচরিত, (ষষ্ঠ অধ্যায়ের টীকা)।

২। "দেবভুবং গতে রাজ্যবর্দ্ধনে গুপ্তোনাম্নাচ গৃহীতে কুশস্থলে দেবী রাজ্যশ্রী পরিভ্রংশ্য বন্ধনাৎ বিন্ধ্যাটবীং প্রবিষ্টা।" (হর্ষচরিতং)

উপস্থিত হন এবং দুষ্টকর্ম্মী সোমাখ্যকে পরাস্ত করেন। তৎপর সোমাখ্য স্বদেশে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। হকারাখ্যও স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। সোমাখ্য দ্বিজগণকে বহু ভোগ্য দান করিয়া ২৪ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন রাজ্যভোগ করতঃ মুখরোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ৮ মাস ৫ দিনের মানবক নামক শিশুপুত্র ছিল। এই সময় গৌড় রাজ্যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সোমাখ্যের পর জয়াদ্যনাগ (জয়নাগ) গৌড়পতি হন এবং পঞ্চদশবর্ষ "বর্ষপঞ্চকমেকং" রাজ্য করতঃ বহু প্রাণী বধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন"।

শশাঙ্ক ও জয়নাগের রাজ্যকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে মঞ্জুশ্রী মূলকল্পের উপরোক্ত বিবরণ শশাঙ্কের মহাসামন্ত মাধবরাজের ৬১৯ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসন ও জয়নাগ-দেবের রাজ্যকালের মালিয়া শাসন দ্বারা সমর্থিত হয়। অনুমান ৫৯৪-৯৫ খৃঃ শশাঙ্ক গৌড়পতি হন। ঐ অব্দে গৌড়াব্দও প্রচলিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ শশাঙ্কই গৌড়াব্দের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অতএব মঞ্জুশ্রী মূলকল্পের মতানুসারে ৬২০ খৃঃ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন রাজত্ব করিয়া শশাঙ্ক এবং তৎপর ৬২১ খৃঃ হইতে ৬৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া জয়নাগ পরলোক গমন করেন। হর্ষচরিতে লিখিত আছে হর্ষবর্দ্ধন গৌড়পতি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিবার প্রথম দিন অতিবাহিত হইলে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার দূত হংসবেগ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভাস্করবর্ম্মা গৌড়পতি শশাঙ্কের সহিত ইতঃপূর্ব্বে যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর ভীত হইয়াই বোধ হয় হর্ষের সহিত মৈত্রী স্থাপনে সচেষ্ট হন। এইরূপে উভয়ের সাধারণ শত্রু গৌড়পতি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষ ও ভাস্করবর্ম্মা সন্ধিসূত্রে মিলিত হন। হিউয়েন সঙ্গ লিখিয়াছেন, "হর্ষবর্দ্ধন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া প্রতিপক্ষ রাজ্যগুলি আক্রমণ করেন এবং অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া ছয় বৎসর কাল পঞ্চগৌড়ের (Five Indies) সহিত যুদ্ধ করেন এবং ত্রিশ বৎসর পর অস্ত্রত্যাগ করিয়া নির্ব্বিরোধে রাজ্য করিতে থাকেন[১]। কলিঙ্গরাজ মাধবরাজের ৬১৯ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়

১। "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়-মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥" ইতি স্কন্দপুরাণম্॥
(শব্দকল্পদ্রুমে 'গৌড়' শব্দ)

সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্তের সময় ঐ সমস্ত দেশ গৌড় সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ঐ "পঞ্চ গৌড়" নামের উৎপত্তি হয়। মগধ ও গৌড় একরাজ্য বলিয়া গণ্য হওয়ায় বোধহয় মগধের নাম পৃথক করিয়া বলা হয় নাই।

যে, তিনি তখন পর্য্যন্ত শশাঙ্কের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেছিলেন। জয়নাগদেবে রাজ্যকালের মালিয়াশাসন হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শশাঙ্কের পর জয়নাগদে *কর্ণসুবর্ণের অধিপতি হইয়াছিলেন। ভাস্করবর্ম্মার নিধানপুর তাম্রশাসন কর্ণসুবর্ণ জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হয়। সুতরাং অনুমান হয় জয়নাগদেবের মৃত্যুর পর* (৬৩৫ খৃঃ ?) অথবা তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হর্ষবর্দ্ধনের পক্ষে তাঁহাকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিবার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইয়াছিল। ৬৩৬ খৃঃ হইতে ৬৩৮ খৃঃ মধ্যে হিউয়েন সঙ্গ কয়ঙ্গল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ ও ওড্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বিবরণে ঐ সকল স্থানের কোন রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ তখনও ঐ সকল স্থানে হর্ষবর্দ্ধন অথবা ভাস্করবর্ম্মার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সম্ভবতঃ ঐ সকল স্থান তখন অরাজক অবস্থায় ছিল। হিউয়েন সঙ্গ লিখিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে (৬৪২ খৃঃ) হর্ষবর্দ্ধন যখন কোঙ্গদমণ্ডলে অভিযান শেষ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে ফিরিবার পথে হিউয়েন সঙ্গের সহিত কয়ঙ্গলে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ভাস্করবর্ম্মা সসৈন্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং হিউয়েন সঙ্গকে কামরূপে আহ্বান করেন।

এই সময় ভাস্করবর্ম্মার সহিত ২০০০০ হস্তী ও ১৩০০০ রণতরী ছিল (Watters—On Yuan-Chwang, Vol I, p. 349)। ৫৫৬ শকাব্দের (৬৩৪ খৃঃ) পূর্ব্বে বাতাপীপুরের চালুক্যরাজ পুলকেশী (২য়) কর্ত্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের পরাজয় ও কলিঙ্গ-কোশলবিজয় ঘটিয়াছিল (পুলকেশীর ঐহোললিপি দ্রষ্টব্য)। তৎপূর্ব্বে ৬৩৩ খৃঃ হর্ষবর্দ্ধন বলভীরাজ ধ্রুবসেন (২য়)-কে পরাজিত করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া শান্তি স্থাপন করেন। ৬৪১ খৃঃ হর্ষবর্দ্ধন মগধ অধিকার করিয়াছিলেন (Ma-Twan-Lieu-এর বিবরণ, Ind. Anti, Bombay, IX, 1880)। আদিত্য সেনের অপসড়লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহাসেন গুপ্তের পুত্র মাধব গুপ্ত মগধের রাজা হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ হর্ষবর্দ্ধন মগধ জয় করিয়া তথায় নিজ মাতুল ও প্রিয় সহচর মাধব গুপ্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (৬৪১ খৃঃ)। হিউয়েন সঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "কর্ণসুবর্ণপতি দুষ্টাত্মা শশাঙ্ক হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্য-

"After thirty years his arms reposed and he governed everywhere in peace."—(Beal)

বর্দ্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন এবং বোধিগয়ার বুদ্ধপদচিহ্নাঙ্কিত পাষাণখণ্ড ধ্বংস করিতে অসমর্থ হইয়া তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি বোধিবৃক্ষ ছেদন *করিয়া নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা রাজা পূর্ণবর্ম্মার*[১] *যত্নে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল।"*

হর্ষবর্দ্ধন রাজপুতানা ও পঞ্জাব ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারত, পূর্ব্ব ভারত ও কাথিয়াবাড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। গৌড়পতি শশাঙ্ক ও চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে শশাঙ্ক কামরূপ আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্যস্পৃহা হর্ষবর্দ্ধনের প্রভাবে দমিত হয়।

শশাঙ্কের কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের একদিকে বৃষের পার্শ্বে উপবিষ্ট শিবমূর্ত্তি, বৃষের দক্ষিণে "শ্রীশ" ও বৃষের নিম্নে "জয়" অক্ষরদ্বয় ক্ষোদিত আছে। অপর দিকে দুইটি হস্তী পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্ত্তির মস্তকে কলসীদ্বারা বারিধারা বর্ষণ করিতেছে। দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে "শ্রীশশাঙ্ক" কথাগুলি অঙ্কিত আছে। শশাঙ্কের পরবর্ত্তী কর্ণসুবর্ণপতি জয়নাগদেবের রাজ্যকালের মালিয়া শাসনের মুদ্রার উপরে জয়নাগদেবের "মহারাজাধিরাজ পরমভাগবত" উপাধি, দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীমূর্ত্তি ও তাঁহার মস্তকে কুম্ভাভিষেককরত হস্তীদ্বয় অঙ্কিত আছে। শশাঙ্কের সহিত জয়নাগদেবের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু শশাঙ্কের মুদ্রার একদিকে "জয়" ও অপরদিকে কুম্ভাভিষেক মুদ্রায় অবস্থিতা লক্ষ্মীমূর্ত্তি ও "শ্রীশশাঙ্ক" অঙ্কিত থাকায় মনে হয়, শশাঙ্ক শেষ বয়সে দুরারোগ্য রোগে কাতর থাকায় জয়নাগদেব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া শশাঙ্কের নামে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন এবং মুদ্রায় "শশাঙ্ক" নামের সহিত স্বীয় নামের আদ্যাক্ষরদ্বয় "জয়" কথাটিও সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শশাঙ্কের মুদ্রার প্রমাণে জানা যায় যে, তিনি শৈব ছিলেন।

১। হিউয়েন সঙ্গ পূর্ণবর্ম্মাকে অশোকের বংশধর বলিয়াছেন। কিন্তু মহাশিবগুপ্ত বালার্জ্জুনের শিরপুর লিপিতে লিখিত আছে যে 'বর্ম্মা' উপাধিধারী এক রাজবংশ গয়ায় রাজত্ব করিতেন এবং এই বংশের সূর্য্যবর্ম্মা মহাশিবগুপ্তের মাতামহ ছিলেন। হারহালিপি হইতে জানা যায় সূর্য্যবর্ম্মা মৌখরী ঈশানবর্ম্মার পুত্র ছিলেন। পূর্ণবর্ম্মা এই মৌখরীবংশীয় হওয়াই সম্ভব।

শশাঙ্ক কর্তৃক বোধিবৃক্ষ ধ্বংসের প্রয়াস, কুশীনগর ও পাটলিপুত্রের বৌদ্ধকীর্ত্তি নাশ প্রভৃতি হইতে হিউয়েন সঙ্গ শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া নহে, বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত হর্ষবর্দ্ধনের পক্ষ সমর্থনের জন্যই ঐ সকল স্থানের বৌদ্ধ যাজকগণকে শাস্তি দিতে গিয়া ঐ সকল ধ্বংসকার্য্য সাধিত হইয়াছিল। হিউয়েন সঙ্গ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণেও দশটি সংঘারামে সম্মতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় দ্বিসহস্র ভিক্ষুকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী হইলে ইহা সম্ভব হইত না।

শশাঙ্কের প্রতিপক্ষ হর্ষবর্দ্ধন অনুমান ৬৪৮ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। জ্যোতিষী-গণনায় জানা যায় যে, ৫৯০ খৃঃ ৪ঠা জুন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[১]। কান্যকুব্জে তাঁহার রাজধানী ছিল। ৬০৬ খৃঃ তাঁহার সিংহাসনারোহণের তারিখ হইতে তাঁহার নামে হর্ষাব্দ প্রচলিত হয়। তিনি শুধু একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও সেনাপতি ছিলেন না। তিনি একজন ধর্ম্মপরায়ণ, সর্ব্ব ধর্ম্মে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময় প্রয়াগে পঞ্চবর্ষ পর পর যে ধর্ম্মসম্মিলনী হইত তাহাতে সকল ধর্ম্মাবলম্বী সমবেত হইত। এইরূপ একটি সম্মিলনীতে স্বয়ং হিউয়েন সঙ্গ ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন। হিউয়েন সঙ্গ তাঁহার গ্রন্থে এই সম্মিলনীর বিবরণ দিয়াছেন। এইরূপ সম্মিলনীর শেষে তিনি তাঁহার সমুদয় ধনরত্ন, পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও অন্যান্য প্রার্থীগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া, তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একখানি সাধারণ বস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাহা পরিধান করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তিনি নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শি নামক তিনখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। হর্ষচরিত ও কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্টের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের পৈতৃক রাজধানী স্থানেশ্বরে থাকিলেও তিনি সাধারণতঃ কান্যকুব্জেই থাকিতেন। তাঁহার নামান্তর ছিল শিলাদিত্য।

শশাঙ্কের পূর্ব্বে সমতট ও বর্দ্ধমানভুক্তিতে মহারাজাধিরাজ সমাচারদেব (৫৭৫-৫৯৫ খৃঃ), তৎপূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্য (৫৬০-৫৭৫ খৃঃ) ও তৎপূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র (৫৪০-৫৬০ খৃঃ) রাজত্ব করিতেন। গোপচন্দ্রের ৩ ও ১৮ বর্ষ, ধর্ম্মাদিত্যের ৩ বর্ষ, সমাচারদেবের ৭ বর্ষ রাজ্যকালের তাম্রশাসন এবং ধর্ম্মাদিত্যের ও সমাচারদেবের সময়ের অপর একখানি করিয়া দুইখানি তাম্রশাসন

১। শ্রী সি. ডি. বৈদ্য প্রণীত মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস। পৃঃ ৪৩ (১৯২১) দ্রষ্টব্য।

মোট ছয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। সমাচারদেবের দুইটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। (১) প্রথমটিতে, একদিকে রাজা গুপ্তযুগের রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বাম হস্তে ধনুক আছে। বাম হস্তের নীচে 'সমা' পদদ্বয়ের মধ্যে 'চা' ও বৃষাঙ্কিত ধ্বজার উপরিভাগে 'র' অক্ষর ক্ষোদিত আছে। অপরদিকে দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে ও বামপার্শ্বে 'নরেন্দ্রবিনত' (নরেন্দ্রাদিত্য) লেখা আছে। (২) দ্বিতীয় মুদ্রার একদিকে রাজা রাজলীলা মুদ্রায় সিংহাসনে উপবিষ্ট। রাজার বামহস্তের উপরিভাগে 'সমা', সিংহাসনের নীচে 'চা' ও রাজার দক্ষিণে একটি স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে 'র' অক্ষর ক্ষোদিত আছে। অপর পৃষ্ঠায় 'উৎকলহংসারূঢ়া কমলবনবিহারিণী' কমলহস্তা সরস্বতী মূর্ত্তির বামপার্শ্বে 'নরেন্দ্রবিনত' (অথবা 'নরেন্দ্রাদিত্য') অক্ষরগুলি ক্ষোদিত। এই মুদ্রাটির সহিত শশাঙ্কের মুদ্রাও ছিল। গোপচন্দ্র, ধর্ম্মাদিত্য ও সমাচারদেবের আনুমানিক রাজ্যকাল দেওয়া হইয়াছে। গোপচন্দ্রের '৩' রাজ্যকালের শাসনখানি বর্দ্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে ও অপর শাসনগুলি ফরিদপুর জেলায় পাওয়া গিয়াছে। ফরিদপুর ও তাহার নিকটে 'পৃথুরাজ' ও 'শ্রীসুধন্যাদিত্য' নামধেয় রাজার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। গোপচন্দ্র বোধ হয় মহারাজাধিরাজ যশোধর্ম্ম কর্ত্তৃক সমতট ও বর্দ্ধমানভুক্তির শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে যশোধর্ম্মের মৃত্যুর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মহারাজাধিরাজ হন। গোপচন্দ্র, ধর্ম্মাদিত্য, সমাচারদেব ও শশাঙ্কদেবের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায় নাই।

৬৪৮ খৃঃ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর কতিপয় বর্ষ মধ্যে তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। তিব্বতীয় কাহিনী হইতে জানা যায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ পাদে তিব্বতে স্রং-সান (Srong-Tsan) নামক একজন পরাক্রান্ত রাজার আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার পুত্র "স্রং-সান্-গাম্পো" (Srong-Tsan-Gampo) নেপাল ও চীনের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই রানীদ্বয়ের প্রভাবে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি লাসায় রাজধানী স্থাপন ও অনেকগুলি বিহার ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইনি হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। চীনের কাহিনী হইতে জানা যায়, হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার ত্রিহুতবাসী অরুণাশ্ব (Na-fin-ti O-lo-Na-Shum) নামক জনৈক অমাত্য তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। ইতঃপূর্ব্বে চীন-সম্রাট ওয়াং-হিউয়েন-সী (Wang-hiuen-tse) নামক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি দৌত্য (mission) হর্ষবর্দ্ধনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অরুণাশ্ব সেই দৌত্যের অধিকাংশ লোককে হত্যা করিয়া তাহাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কিন্তু ওয়াং-হিউয়েন-সী নেপালে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। অতঃপর তিনি

নেপালরাজের নিকট হইতে ৭০০০ ও তিব্বতরাজের নিকট হইতে ১২০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন এবং অরুণাশ্বকে বন্দী করিয়া চীনে লইয়া যান। এই কাহিনীতে আরও বলা হইয়াছে, ভারতের ৫৮০টি প্রাকারবেষ্টিত নগরী তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ভারতীয় গ্রন্থে এই ঘটনার কোন সমর্থন না থাকায় উপরোক্ত অদ্ভুত কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য দেওয়া যায় না।

তিব্বতীয় সূত্র হইতে জানা যায় তিব্বতরাজ স্রং-সান্-গাম্পো নেপাল ও আসাম আক্রমণ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। ৬৫০খৃঃ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কিলি-প-পু (Ki-li-pa-pu) রাজা হইয়া ৬৭৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ৬৭০ খৃঃ চীন আক্রমণ করিয়া খাসগড় অধিকার করিয়া লন এবং ভারতের মধ্যদেশে লুণ্ঠন চালাইতে থাকেন। চৈনিক সূত্র হইতে জানা যায় যে, ৭১৩-৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মধ্যদেশের জনৈক রাজা তিব্বতী ও আরবদের লুণ্ঠনের (raids) বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিয়া চীনে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যশোবর্ম্ম দেব

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কান্যকুব্জের সিংহাসনে কোন্ কোন্ রাজা অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। কিন্তু অষ্টম খৃষ্টাব্দের প্রথম পাদে বর্ম্মা উপাধিধারী একজন পরাক্রান্ত নৃপতি কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বাহুবলে পুনরায় একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মহারাজাধিরাজ যশোবর্ম্ম দেব। কবি বাক্‌পতির প্রাকৃত ভাষায় ১২০৯টি শ্লোকে রচিত 'গৌড়বহো' কাব্য এই সম্রাটের নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি ভবভূতিও এই রাজার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৭৩৪-৭৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি চীন-সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করেন। 'গৌড়বহো' কাব্যের বর্ণনা হইতে মনে হয় তৎকালে মগধ ও গৌড়ে একই রাজা ছিলেন। এবং 'গৌড়পতি' নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।[১] এই কাব্যে যশোবর্ম্মার উপনাম 'কমলায়ুধ' ছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার দিগ্বিজয় ও কীর্ত্তি-

---

১। 'গৌড়বহো' কাব্যের সম্পাদক ডঃ এস্. পি. পণ্ডিত মগধপতি ও গৌড়পতিকে অভিন্ন মনে করেন। উক্ত কাব্যের টীকাকার শ্রী হরিপালও ৮৪৪ শ্লোকের টীকায় ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাব্যের 'গৌড়বহো' নাম হইতেও ঐরূপই প্রতীয়মান হয়।

কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কান্যকুব্জ হইতে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া যশোবর্ম্মা যখন বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভয়ে স্বীয় গজবাহিনীর আবরণে মগধনাথ পলায়নপর হইলে (৩৫৪ শ্লোক) তাঁহার সামন্তগণ তাঁহাকে বাধা দিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন (৪১৪ শ্লোক)। যশোবর্ম্মা যুদ্ধে মগধনাথকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দারুচিনি গন্ধে পরিপূর্ণ সমুদ্রতীরে গমন করেন (৪১৭ শ্লোক) এবং তথায় অসংখ্য হস্তীর অধীশ্বর বঙ্গপতিকে পরাজিত ও বশীভূত করেন। অনন্তর তিনি মলয় পর্ব্বতের সন্নিধানে দাক্ষিণাত্যপতিকে পরাস্ত করেন এবং ক্রমশঃ নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হন। তথা হইতে মরুদেশ ও শ্রীকণ্ঠ (স্থানেশ্বর) হইয়া অযোধ্যা ও হিমালয় প্রদেশ অতিক্রম করতঃ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

প্রসঙ্গক্রমে কবি এই কাব্যের এক স্থানে বলিয়াছেন যে, রাজসভার পণ্ডিতমণ্ডলী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার নিকট যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক মগধনাথের বধবৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে (৮৪৪ শ্লোঃ), কবি ২২৮টি শ্লোকে যশোবর্ম্মার শৌর্য্যকাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, পরদিন প্রভাতে 'গৌড়বহো' বর্ণনা করিবেন। পরদিন প্রভাতে কবি যশোবর্ম্মার অপূর্ব শৌর্য্যকাহিনী বলিলে সভাপণ্ডিতগণ যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক গৌড়পতির শিরোচ্ছেদ বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেন (১১৯৪ শ্লোঃ)। গ্রন্থের নাম "গৌড়বহো" হইলেও গৌড়পতির বধপ্রসঙ্গ কেবল এই একটিমাত্র স্থানেই প্রকাশ্যভাবে বলা হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, পরবর্ত্তী গুপ্তরাজবংশের জীবিতগুপ্ত (২য়)-ই এই গৌড়পতি। হর্ষবর্দ্ধন ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মগধ জয় করিয়া এই জীবিতগুপ্তের (২য়) পূর্ব্বপুরুষ মাধবগুপ্তকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মাধবগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ আদিত্য সেন (৬৭২ খৃঃ) মগধ ও গৌড়ের আধিপত্য লাভ করেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। আদিত্য সেন ও তাঁহার পুত্র দেবগুপ্ত, পৌত্র বিষ্ণুগুপ্ত, প্রপৌত্র জীবিতগুপ্ত (২য়)-এর পরিচয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের ক্ষোদিত লিপি ও অপর ছয়খানি লিপি হইতে জানা যায় (C ii, III, no 42-46 p. 213)। ইহাদের সকলেরই উপাধি "মহারাজাধিরাজ" ছিল। দুঃখের বিষয় যশোবর্ম্মার এই অভ্যুদয় দীর্ঘস্থায়ী হইল না। অনুমান ৭৩৬ খৃঃ কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (৭২৩-৭৬০ খৃঃ) দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করিলেন এবং যশোবর্ম্মা বশ্যতা স্বীকার করিয়া ললিতাদিত্যের সহিত সন্ধি করিলেন (রাজতরঙ্গিণী ৪।১৩৪-১৪৫ শ্লোঃ)। অতঃপর গৌড়পতি ললিতাদিত্যকে বহুসংখ্যক হস্তী উপহার দিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিলেন কিন্তু ইহার

ফল বিপরীত হইল। ললিতাদিত্য স্বপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ পরিহাস কেশবের নামে শপথ করতঃ গৌড়পতিকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়া কাশ্মীরে লইয়া যান, কিন্তু শপথ ভঙ্গ করিয়া ত্রিগ্রামী নামক স্থানে তাঁহাকে বধ করেন। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, এই সংবাদে কতিপয় গৌড়বাসী প্রতিশোধ গ্রহণার্থ কাশ্মীরে গমন করেন এবং পরিহাস কেশবের মন্দির ভ্রমে রামস্বামীর মন্দিরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া রজতনিম্মিত রামস্বামীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া ফেলেন। অতঃপর কাশ্মীর সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া একে একে জীবনদান করেন। দুঃখের বিষয় রাজতরঙ্গিণীতে পূর্ব্বোক্ত গৌড়পতির নাম উল্লেখ না করায় আমাদিগকে অনুমানের আশ্রয় লইতে হইতেছে[১]। খৃঃ অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে শৈল-বংশীয় সৌবর্দ্ধনের তিন পুত্র মধ্যে একজন কাশীতে, একজন বিন্ধ্য প্রদেশে ও একজন "শত্রুবিদারণপটু" পৌণ্ড্রাধিপকে বধ করিয়া পুণ্ড্রদেশে (গৌড়দেশে) রাজ্যলাভ করেন। এই বংশের আদি নিবাস হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকায় ছিল[২]। সম্ভবতঃ ইঁহারা যশোবর্ম্মার দিগ্বিজয়ের সহচর ছিলেন এবং দিগ্বিজয়ের শেষে যশোবর্ম্মা তিন ভ্রাতাকে তিন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই পুণ্ড্রপতিই বোধ হয় ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক কাশ্মীরে নীত ও নিহত হইয়াছিলেন।

নেপালরাজ জয়দেবের (৭৫৯ খৃঃ) শিলালিপি হইতে এই সময়ের অপর একজন গৌড়পতির নাম জানা যায়। উক্ত লিপিতে তাঁহার নাম "হর্ষদেব" ও তাঁহাকে ভগদত্তবংশজ এবং "গৌড়োড্র-কলিঙ্গ-কোশলপতি" বলা হইয়াছে। ইনি রাজা জয়দেবের শ্বশুর ছিলেন[৩] এবং অনুমান ৭৪০ খৃঃ বর্ত্তমান ছিলেন। কামরূপরাজ হর্জ্জরবর্ম্মা (৮২৯ খৃঃ) ও বনমালদেবের তাম্রশাসনে ভগদত্তবংশীয় কামরূপরাজ হর্ষের উল্লেখ আছে। কিন্তু রাজা জয়দেবের শ্বশুরকে 'কামরূপরাজ' বলা হয় নাই।

১। রাজতরঙ্গিণীর মতে ললিতাদিত্যের রাজ্যকাল ৬৯৭-৭৩৩ খৃঃ ও তাঁহার পৌত্র জয়াপীড়ের রাজ্যকাল (৭৫১-৭৮১খৃঃ)। কিন্তু Stein সাহেব চীনের ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া স্থির করিয়াছেন যে, ললিতাদিত্যের রাজ্যকাল ৭২৩-৭৬০ খৃঃ ও জয়াপীড়ের রাজ্যকাল ৭৭২-৮০৬ খৃঃ।

২। Ragholi plates of Jayavardhan (Epi. Ind Vol IX p. 41)

৩। নেপালের লিচ্ছবীংশীয় রাজা শিবদেব আদিত্যসেনের (৭৩২ খৃঃ) দৌহিত্রী ও মৌখরীরাজ ভোগবর্ম্মার দুহিতা বৎসদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পুত্র রাজা জয়দেব ভগদত্তবংশজাত গৌড়োড্র-কলিঙ্গ-কোশলপতি হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন।—(নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের তোরণ-লিপি)।

এজন্য উভয় হর্ষদেব এক ব্যক্তি কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। উড়িষ্যার কোশলরাজ ক্ষেমঙ্কর দেব (৭৪৫ খৃঃ); তৎপুত্র রাজা শিবাকর দেব (১ম), তৎপুত্র রাজা শুভাকর দেব (৭৯৫ খৃঃ), তৎপুত্র রাজা দ্বিতীয় শিবাকর দেবের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহাদিগকে ভৌম (নরক) বংশীয় বলায় তাঁহারাও ভগদত্তবংশীয় হইতেছেন। ভগদত্তবংশীয় গৌড়োড্র-কলিঙ্গ-কোশলপতি হর্ষদেব রাজা ক্ষেমঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন।

অতঃপর রাজতরঙ্গিণী হইতে আমরা জয়ন্ত নামক একজন গৌড়পতির বিষয় জানিতে পারি। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য (৭৭২-৮০৬ খৃঃ) রাজা হইয়াই দিগ্বিজয়ে বাহির হন। পথিমধ্যে তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার শ্যালক জজ্জ তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে কাশ্মীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। তখন হৃতরাজ্য জয়াপীড় প্রয়াগের নিকট গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া ছদ্মবেশে নানা রাজমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে জয়ন্ত নামক রাজা কর্তৃক শাসিত ("গৌড় রাজাশ্রয়") পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন এবং তত্রত্য বিখ্যাত কার্ত্তিকেয় মন্দিরের দেবনর্ত্তকী কমলার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার প্রাসাদোপম ভবনে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন নদীতীরে রাত্রিতে একটি দুর্দ্দান্ত সিংহকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বধ করেন। পরদিন সেই সিংহের দন্তলগ্ন জয়াপীড়ের নামাঙ্কিত কেয়ুর দর্শনে রাজা জয়ন্ত জয়াপীড়ের আগমন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অনুসন্ধানে কমলার গৃহে তাঁহাকে দেখিতে পান। তখন তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক নিজালয়ে লইয়া যান ও নিজ কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। অনুমান ৭৭৪ খৃঃ[১] তিনি কল্যাণদেবী ও কমলাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং জজ্জকে পরাভূত ও নিহত করিয়া পুনরায় কাশ্মীরের রাজা হন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাজিত করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে তাহাদের অধীশ্বর করিয়া দেন এবং কান্যকুব্জেশ্বর বজ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসন গ্রহণ করেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪১৯-৪৭০ শ্লোঃ)। কল্যাণদেবীর গর্ভজাত পুত্র পৃথিব্যাপীড় (২য়) কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন।[২]

১। রাজতরঙ্গিণীর মতে জজ্জ মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

২। "পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরং। (৪।৪৬৯ শ্লোঃ)

* * *

সিংহাসনং জিত্বাচাদৌ কান্যকুব্জ মহীভুজঃ।
স রাজ্যক কুদং রাজা জহারোদার-পৌরুষঃ॥ (৪।৪৭০ শ্লোঃ)

প্রাচীনকালে 'গৌড়' বলিলে যেমন বরেন্দ্র (পুণ্ড্র)ও রাঢ় (সুহ্ম) দেশকে বুঝাইত, বঙ্গ বলিলে সমতট ও হরিকেল রাজ্যকে অর্থাৎ বর্ত্তমানকালের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগকে বুঝাইত। একাদশ শতাব্দীর শব্দকোষ-রচয়িতা হেমচন্দ্র (জন্ম ১০৮৯ খৃঃ) "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ অঙ্গাশ্চম্পোপলক্ষিতাঃ" বলিয়া লিখিয়াছেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের তৃতীয় পাদ হইতে অষ্টম শতকের প্রথম পাদের মধ্যে সমতটে খড়্গবংশীয় কয়েকজন রাজা রাজত্ব করিতেন। আসরফপুরে (ঢাকা জেলা) প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রশাসনে ও দেউলবাড়ীতে (কুমিল্লা জেলা) স্থাপিত একটি সর্ব্বাণী মূর্ত্তিতে উৎকীর্ণ লিপি হইতে ও ত্রিপুরা জেলার কইলান গ্রামে প্রাপ্ত সমতটের রাতরাজবংশীয় শ্রীজীবধারণ নৃপতির পুত্র শ্রীধারণ নৃপতির ৮ম সম্বৎসরের তাম্রশাসন হইতে (ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৫৫।৩৭০-৭৪ পৃঃ) এই বংশের রাজাধিরাজ খড়্গোদ্যম, তৎপুত্র রাজাধিরাজ জাতখড়্গ, তৎপুত্র রাজাধিরাজ দেবখড়্গ ও তৎপুত্র রাজা রাজভট্ট ও রাজা রাজভট্টের মহিষী প্রভাবতীর নাম জানা যায়।

'দেবপর্ব্বত' নামক স্থান হইতে প্রদত্ত রাতবংশীয় শ্রীধারণ নৃপতির ঐ শাসনে তাঁহার পিতা শ্রীজীবধারণ নৃপতির শীলমোহর দেখা যায়। উহাতে "শ্রীমদ্দেব খড়্গ" নামটি উৎকীর্ণ আছে। এই লিপিতে উৎকীর্ণ খড়্গ নামক অপর এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভূমিদানেরও ইঙ্গিত আছে। দেবখড়্গের একটি শাসন তাঁহার রাজ্যের কর্ম্মান্তবাসক হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইৎ-সিংএর (৬৭৩ খৃঃ) বিবরণীতে সেং-চি নামক অপর একজন চীনা ভ্রমণকারীর (৬৫০-৬৫৫ খৃঃ) ভ্রমণ বিবরণ দেওয়া আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ সময় সমতটে রাজভট নামক একজন বৌদ্ধ রাজা রাজত্ব করিতেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খড়্গবংশীয় রাজভট্ট ও এই রাজভট অভিন্ন। কাছাড়ের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত জয়ন্তিয়া উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরা নওয়াখালি জেলা পর্য্যন্ত সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া ও মেহের গ্রামের লিপিতে ঐ ঐ গ্রাম সমতটের অন্তর্গত

"কর্পূরমঞ্জরী" নাটকে কান্যকুব্জপতির নাম 'বজ্রায়ুধ' বলা হইয়াছে। "প্রভাবকচরিতং" নামক জৈন গ্রন্থে যশোবর্ম্মার পুত্রের নাম আমরাজ। ৮৩৪ খৃঃ আমরাজের মৃত্যু হয়।

সম্ভবত জয়ন্ত অথবা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে ললিতাদিত্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় জয়ন্ত কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলেন।

বলা হইয়াছে। ফুশের "বৌদ্ধমূর্ত্তি-তত্ত্ব" গ্রন্থে সমতটে "জয়তুঙ্গ লোকনাথ" অবস্থিত লিখিত আছে। জয়ন্তিয়া উপত্যকাই বোধ হয় এই "জয়তুঙ্গ" ও ৩৪৪ গুপ্তাব্দে (৬৪৪ খৃঃ) উৎকীর্ণ রাজা লোকনাথের ত্রিপুরা শাসনের (সাহিত্য ১৩২১, কার্ত্তিক ৫৪১ পৃঃ) জয়তুঙ্গবর্ষ। এই তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীলোকনাথ[১] সুব্‌বুঙ্গ বিষয়ের অটবী ভূখণ্ডে মহাসামন্ত প্রদোষ শর্ম্মার প্রার্থনাক্রমে যুবরাজ লক্ষ্মীনাথকে দূতক করিয়া শতাধিক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। প্রদত্ত ভূমির পূর্ব্বসীমায় "কণামোটিকা" নামক পর্ব্বত থাকায় অটবী ভূমিখণ্ড যে পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত ছিল তাহাই অনুমিত হয়।

"মুনি ভরদ্বাজ-সদ্বংশজাত" "অধিমহারাজ নাথ"-এর পুত্র সামন্ত শ্রীনাথের প্রপৌত্র লোকনাথ। লোকনাথের মাতামহ 'পারশব' জাতীয় "কেশব" নৃপসন্নিধানে থাকিয়া সৈন্যাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। লোকনাথের মাতার নাম ছিল গোত্র দেবী। সামন্তরাজ লোকনাথের "পরমেশ্বর" (সার্ব্বভৌম নৃপতি) ছিলেন। ["যস্মিন্ শ্রীপরমেশ্বরস্য বহুশো যাতং ক্ষয়ং সৈনিকং ॥ দুর্লঙ্ঘ্যে জয়তুঙ্গ-বর্ষ-সমরে"] জয়তুঙ্গবর্ষের দুর্লঙ্ঘ্য যুদ্ধে সেই পরমেশ্বরের বহুবার সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল। নৃপতি লোকনাথ গুণবান্, সত্যৈকবন্ধু ও যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ডে "জ্বলিতাসি" অত্যন্ত শোভা পাইত। তাঁহার সৈন্যগণ প্রজ্ঞাবলে যুদ্ধে জয়লাভ করিত। তাঁহার অশ্বগুলি বলান্বিত ছিল। সাধু, সর্ব্বাশ্রয় ও পটুমতি লোকনাথ প্রতাপ ও অভ্যুদয় লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। লোকনাথের শৌর্য্য-বীর্য্য প্রভৃতি রাজগুণের পর্য্যালোচনা করিয়াই বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণের সুনিশ্চিত পরামর্শে "শ্রীজীবধারণ নৃপতি" যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া "শ্রীপট্টপ্রাপ্তকরণ"লোকনাথকে

১। কুমারামাত্যগণের নিজস্ব রাজ্য থাকিত—তাহা এই শাসন হইতে প্রমাণিত হইতেছে। কুমারামাত্যগণ সম্ভবতঃ রাজকুমারগণের সমান রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাসম্পন্ন শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

শ্রীধারণ নৃপতির কইলান শাসনের শীলমোহরে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা গজলক্ষ্মী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এইরূপ মূর্ত্তিযুক্ত শীলমোহর শ্রী লোকনাথের শাসনেও দৃষ্ট হয়। শ্রীধারণের ঐ শীলমোহরের নিম্নে "শ্রীমৎ সমতটেশ্বর পাদানুধ্যাতস্য কুমারমাত্যা বিকরণস্য" ও "শ্রীধারণরাতস্য" অক্ষরগুলি ক্ষোদিত আছে। শ্রীধারণের মহাসান্ধি বিগ্রহিক জয়নাথের প্রার্থনানুসারে একটি বৌদ্ধবিহারে ও কতিপয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দানার্থ রাজা শ্রীধারণ পঞ্চবিংশতি পাটক (১ পাটক=৫ কুলবাপ্য= ১৯০ বিঘা) ভূমি দান করেন।

সাধনাঙ্গ[১] সহ উক্ত বিষয়টি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। (°-৯ শ্লোকঃ)। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজগণের যেমন সামন্তচক্র ও বিবিধ রাজপাদোপজীবী থাকিত সামন্তরাজ লোকনাথেরও সামন্তচক্র ও রাজপাদোপজীবীগণ ছিল। লোকনাথকে গুপ্তরাজগণের শাসনকালে প্রচলিত পুরাতন রাজমুদ্রা ব্যবহার করিতে দেখিয়া মনে হয় যে, গুপ্তপ্রভাব এতদঞ্চলেও অনুভূত হইত। জয়তুঙ্গবর্ষের অধিকার লইয়া বোধহয় সামন্তরাজ জীবধারণের সহিত সার্ব্বভৌম নরপতির বহু যুদ্ধ হয়। শ্রীজীবধারণের পুত্র রাজা শ্রীধারণের শাসন 'দেব পর্ব্বত' হইতে প্রদত্ত হওয়ায় ও তাঁহার শাসনে তাঁহার পিতার যে শীলমোহর সংযুক্ত আছে উহাতে "শ্রীমদ্দেব খড়্গ" কথাগুলি অঙ্কিত থাকায় অনুমিত হয় যে, সমতটের মহারাজাধিরাজ দেবখড়্গ সামন্তরাজ জীবধারণের "পরমেশ্বর" ছিলেন। কুমিল্লার পশ্চিমে অবস্থিত লালমাই পর্ব্বত যদি "দেবপর্ব্বত" হয় তাহা হইলে ত্রিপুরা প্রদেশ যে জীবধারণের রাজ্য ছিল তাহাই প্রতীয়মান হয়। জীবধারণ বোধহয় বিদ্রোহী হইয়া সার্ব্বভৌম নৃপতি দেবখড়্গের অধিকারভুক্ত জয়তুঙ্গবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই আক্রমণ প্রতিহত করিতে সার্ব্বভৌম নৃপতিকে পুনঃপুনঃ সৈন্য নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি "শ্রীপট্ট" দ্বারা উক্ত "জয়তুঙ্গবর্ষ" বিষয়টির শাসনভার প্রদান করিয়া লোকনাথকে প্রেরণ করিলে লোকনাথের শৌর্য্য-বীর্য্য ও বলাবল বিবেচনা করিয়া শ্রীজীবধারণ নৃপতি বিষয়টি লোকনাথকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ফুশের "বৌদ্ধমূর্ত্তিতত্ত্ব" গ্রন্থে উল্লিখিত সমতটের জয়তুঙ্গ নামক স্থানের "লোকনাথ বুদ্ধমূর্ত্তি" রাজা লোকনাথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়াও অসম্ভব নহে। যদিও তাঁহার তাম্রশাসনে লোকনাথ নিজকে শৈব বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তথাপি ঐ সময়ের ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার যুগে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। রাজভটের পর সমতটে খড়্গ বংশীয় কে কে রাজা হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না[২]। তিব্বতীয় গ্রন্থকার লামা

১। "নৃপোঽধিকৃত সভ্যাশ্চ স্মৃতির্গণকলেখকৌ॥ হেমাগ্ন্যম্বুপুরুষাঃ সাধনাঙ্গানি বৈদশ" (শুক্রনীতি ৪। ৫৫৭-৫৮ শ্লোঃ)।

২। খড়্গরাজগণ সমতটে রাজত্ব করিতেন। সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে সমতটের উল্লেখ আছে। হিউয়েন সঙ্গ রাজধানীর নাম দিয়া দেশের পরিচয় দিয়াছেন। এককালে সমতট নামক স্থানেই বোধ হয় বঙ্গের রাজধানী ছিল। সমতটের নাম পরিবর্ত্তন হইয়াই বোধ হয় বিক্রমপুর হয়। সম্রাট ধর্ম্মপালের উপাধি বিক্রমশীল ছিল। তাঁহার নামানুসারে বোধ হয় সমতটের নাম বিক্রমপুর ও রামপালের 'নামানুসারে রামপাল' হয়।

তারানাথের "বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস" হইতে জানা যায় যে, অতঃপর চন্দ্রবংশীয় বিমলচন্দ্র, তৎপর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র, তৎপরে তৎপুত্র ললিতচন্দ্র বঙ্গে রাজত্ব করিবার পর বঙ্গাল দেশ (বঙ্গ) রাজশূন্য হয় এবং তথায় অরাজকতা চলিতে থাকে।[১]

১। জার্ম্মান পণ্ডিত A. Schiefner নামা তারানাথের 'বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের' জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। তারানাথ লিখিয়াছেন মগধবাসী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রভদ্র প্রণীত গ্রন্থে রামপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিত আছে। ক্ষত্রিয়জাতীয় পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত প্রণীত বুদ্ধপুরাণে সেনবংশের প্রথম চারিজন রাজার ইতিহাস ছিল। ব্রাহ্মণজাতীয় পণ্ডিত ভট্টঘটী প্রণীত "গুরু পরম্পরার ইতিহাস" তারানাথের গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তারানাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

খৃঃ সপ্তম, অষ্টম শতকের কতকগুলি ক্ষোদিত লিপি আরাকানের মোরাহৌঙ মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটি লিপিতে বিমলচন্দ্র হইতে অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ আনন্দচন্দ্র পর্য্যন্ত নামগুলি লিখিত আছে। তারানাথও বঙ্গাল দেশের রাজা বিমলচন্দ্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

তারানাথের একখানি গ্রন্থের নাম "History of Buddhism in India" (Geschichte) ও অপরখানির নাম Mine of Precious stones (Edelstein mine), ষোড়শ খৃঃ রচিত।

পাল রাজবংশ

১। গোপালদেব (৭৫০-৭৭০ খৃঃ ?)
মহাদেবী দেদ্দদেবী

ভারতের ইতিহাসে গুপ্তসাম্রাজ্য বিনষ্ট হইবার পর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কি মালবপতি যশোধর্ম্মা, কি গৌড়পতি শশাঙ্ক, কি কান্যকুব্জপতি হর্ষবর্দ্ধন অথবা যশোবর্ম্মা, কি কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য কেহই কোন স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু গুপ্তসাম্রাজ্য শেষ হইবার প্রায় দুইশত বৎসর পর এক ব্যক্তি উত্তর ভারতে পুনরায় একটি স্থায়ী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নাম গোপালদেব। এই গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের ৩২ রাজ্য সংবৎসরের একখানি তাম্রশাসন হইতে গোপালদেব ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যায়। এই তাম্রশাসনখানি মালদহ জেলার খালিমপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহা "খালিমপুর লিপি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই শাসন দ্বারা পাটলীপুত্রসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপালদেব—পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মপালদেব তদীয় মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণবর্ম্ম কর্ত্তৃক দূতক যুবরাজ শ্রীত্রিভুবনপালের মাধ্যমে অনুরুদ্ধ হইয়া উক্ত শ্রীনারায়ণবর্ম্মার স্থাপিত ভগবান নন্ন-নারায়ণদেবের সেবা-পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটিমণ্ডলে গ্রামচতুষ্টয় দান করেন।

এই তাম্রশাসনে ধর্ম্মপাল তাঁহার প্রপিতামহ দয়িত বিষ্ণুকে সর্ব্ববিদ্যাবিশুদ্ধ ও বীজিপুরুষ, পিতামহ ব্যপটকে বিপুল কীর্ত্তি, অরাতি নিধনকারী ও কর্ম্মকুশল এবং পিতা গোপালদেবকে নরপালচূড়ামণি বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। পিতা গোপালদেবের রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জন্য প্রকৃতিগণ তাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়াছিল"[১]। "মাৎস্যন্যায়" সম্বন্ধে 'অর্থশাস্ত্র' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে, রাজা সুপ্রণীত দণ্ড

১। "মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভিঃ লক্ষ্মীকরং গ্রাহিতঃ।
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণি।"

(খালিমপুর লিপি)

দ্বারা প্রজাবর্গকে শান্তিতে রাখিতে পারেন, দুষ্প্রণীত দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তাহাদের কেবল কোপ উৎপাদন করেন, আর দণ্ডধরাভাবে দণ্ড প্রণীত না হইলে "অপ্রণীতোহি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি। বলীয়ানবলং গ্রসতে ণ্ডধরাভাবে" (অর্থশাস্ত্র, অধিঃ ১, ৪র্থ অধ্যায়) [অর্থাৎ দণ্ডধর অভাবে দণ্ড প্রণীত া হওয়ায় 'মাৎস্যন্যায়' উপস্থিত হয়। বলবান অবলকে গ্রাস করে]। সুতরাং াতীয়মান হইতেছে যে, গোপালদেব যে দেশে রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন সে দেশে তখন দণ্ডধর বা রাজা ছিল না। এই অবস্থায় তথায় 'মাৎস্যন্যায়' ঘটায় থাকার 'প্রকৃতিগণ' তাঁহাকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। এখানে 'প্রকৃতিভিঃ' দের অর্থ লইয়া মতদ্বৈধ আছে[১]। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে রাজার দশটি প্রকৃতির রিষ্কার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"পুরোধা চ প্রতিনিধি প্রধান সচিবস্তথা ॥ ৬৯
মন্ত্রী চ প্রাড্‌বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ
অমাত্যো দূতইত্যেতা রাজ্ঞঃ প্রকৃতয়োদশঃ ॥

(শুক্রনীতি, ২য় অধ্যায়)

(পুরোহিত, প্রতিনিধি, প্রধান, সচিব, মন্ত্রী, প্রাড্‌বিবাক, পণ্ডিত, সুমন্ত্র, মাত্য ও দূত এই দশটি রাজার প্রকৃতি।)

সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে, গোপালদেব মৃত রাজার পূর্ব্বোক্ত দশজন প্রকৃতি রুষ কর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং পরে প্রজাসাধারণ ও সামন্তগণ াহা মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু গোপালদেব কোন্ প্রদেশে রাজা নির্ব্বাচিত ইয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসনে তাহার কোন উল্লেখ না থাকায় এ সম্বন্ধেও

১। অধ্যাপক কীলহর্ণ (Kilhorn) ইহার অর্থ করিয়াছেন "The 'eople" (Epi. Indica Vol. IV. p. 248)। ঐতিহাসিক অক্ষয়-মার মৈত্রেয় গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায় 'প্রকৃতি' অর্থে 'প্রজা' ধরিয়া ইয়া লিখিয়াছেন, "অরাজকতা দূর করিবার জন্য প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা র্ব্বাচিত করিয়াছিল।" ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এইরূপ নির্ব্বাচনে ন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, "It is open to doubt whether the assage refers to anything like a regular election by the eneral mass of people, and whether this was at all racticable in those days and in such abnormal times." History of Bengal, Vol I, p. 97)।

সমস্যা দেখা দিয়াছে। এ সম্বন্ধে তারানাথের গ্রন্থে এইরূপ একটি কাহিনী উল্লেখ আছে। গোপালদেব (বরেন্দ্র দেশের) পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের নিকটে একটি বৃক্ষদেবতার[১] ঔরসে এক যুবতী ক্ষত্রিয়া রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চুন্দাদেবীর[২] উপাসক ছিলেন। একদা চুন্দাদেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তিনি আর্য্য খসর্পণের[৩]

১। খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে গোপালদেবের পিতার নাম 'ব্যপট"। এই শব্দের অপভ্রংশে লোকমুখে তিনি বোধ হয় "বট" নামে অভিহিত হইতেন। তিব্বতীয় ভাষায় তাহাই বৃক্ষদেবে পরিণত হইয়া থাকিবে।

২। রাজসাহী শহরের "বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" যাদুঘরে একটি অষ্টাদশভুজা চুন্দাদেবীর পাষাণ মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা রাজসাহী জেলার নিয়ামতপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবী একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে বীরাসনে উপবিষ্টা। ইহার মস্তকের জটাজালের মধ্যে একটি স্তূপ আছে। মূল হস্তদ্বয় ব্যাখ্যান মুদ্রায় অবস্থিত। অবশিষ্ট দক্ষিণ বাহুগুলিতে অভয় মুদ্রা, অক্ষমালা, বজ্র, পরশু, অঙ্কুশ, খড়্গ, বাটালী ও পাত্র এবং অবশিষ্ট বাম হস্তগুলিতে পদ্ম, গ্রন্থ, পাত্র, ছত্র, অঙ্কুশ, পাশ, পতাকা ও পাত্র আছে। মস্তকে উড্ডীয়মান বিদ্যাধরগণের মধ্যে একটি ছত্র আছে। পদ্মাসনটি নাগদ্বয় দ্বারা ধৃত। এই নাগদ্বয়ের দক্ষিণে ও বামে দুইটি স্ত্রীদেবতা। দক্ষিণ পার্শ্বের দেবী ষড়ভুজা। ভুজগুলিতে খড়্গ, অঙ্কুশ, চক্র, পতাকা, অক্ষমালা ও পাত্র। বামদিকের দেবী চতুর্ভুজা—হস্তগুলিতে খড়্গ, পাশ, পতাকা ও পাত্র। পাত্রের গাত্রে 'যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা' ইত্যাদি অঙ্কিত আছে।

সাধনমালা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, বজ্রসত্ত্ব হইতে চুন্দাদেবী আবির্ভূতা হন। ফুশের (Foucher) "বুদ্ধ মূর্ত্তি পরিচয়" (Iconographic Boudhique de-i-Inde) গ্রন্থে একটি চতুর্ভুজা, একটি ষোড়শভুজা ও কতকগুলি অষ্টাদশভুজা চুন্দামূর্ত্তির বিবরণ আছে। ঐ গ্রন্থে "পট্টিকেরে চুন্দাবর ভবনে চুন্দা" দেবীর উল্লেখ আছে। কুমিল্লার লালমাই (লোহিত গিরি) পাহাড়ের শীর্ষে পট্টিকেরা নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের পশ্চিম দিকে ৮। ১০ মাইল ব্যাপিয়া পট্টিকেরা পরগণা অবস্থিত।

৩। বৌদ্ধমতে এক্ষণে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভের যুগ চলিতেছে। এই অমিতাভের বোধিসত্ত্বের নাম অবলোকিতেশ্বর ও বুদ্ধের নাম শাক্যসিংহ। এক প্রকার অবলোকিতেশ্বরের নাম 'খসর্পণ'। রাজসাহী জেলার চৌরীপাড়া ও ঢাকা জেলার মহাকালী গ্রাম হইতে খসর্পণ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

বিহারে গমন করতঃ উক্ত দেবতার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করেন। দেবতা তাঁহাকে পূর্ব্ব দেশে গমন করিতে প্রত্যাদেশ করায় তিনি বঙ্গাল (Bhanga'la) দেশে গমন করেন। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্র এই দেশের শেষ রাজা ছিলেন [৭৪০-৪৫ খৃঃ নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে]। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, এই দেশ কতিপয় বর্ষ যাবৎ অরাজক থাকে। এই সময়ে প্রতিদিন এক একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইত, কিন্তু মৃত রাজার পত্নী রাত্রিতে প্রত্যেককে সংহার করিতেন। অবশেষে গোপালদেব তথায় উপস্থিত হন। এবং সেই দেশের রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া রাত্রিকালে ঐ রাজ্ঞীর আক্রমণ প্রতিহত করতঃ তাহাকে হত্যা করেন এবং আমরণ রাজত্ব করেন[১]। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' বারেন্দ্র দেশকে পালরাজগণের "জনকভূ" (পিতৃভূমি) বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা তারানাথের উক্তি সমর্থিত হয়, কারণ তারানাথও বারেন্দ্র দেশকে গোপালদেবের জন্মভূমি বলিয়াছেন। প্রতিহাররাজ নাগভট্টের (৮১৫ খৃঃ) পৌত্র মিহিরভোজের গোয়ালিয়র লিপিতে নাগভট্টের প্রতিপক্ষ ধর্ম্মপালদেবকে 'বঙ্গপতি' বলা হইয়াছে।[২] ধর্ম্মপালদেবের পিতা গোপালদেব মূলতঃ 'বঙ্গপতি' ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ধর্ম্মপালকে উক্ত গোয়ালিয়র লিপিতে "বঙ্গপতি" বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা গোপালদেবের বঙ্গরাজ্যলাভ সম্বন্ধে তারানাথের কাহিনীই সমর্থিত হয়।

ধর্ম্মপালের খালিমপুর লিপি হইতে জানা যায় যে, গোপালদেবের দেদ্দদেবী নাম্নী "প্রিয়তমা মহিষী" ছিলেন। গোপালদেবের পৌত্র দেবপালের মুঙ্গের

১। "The writer (Taranath) tells how the wife of one of the late kings by night assassinated everyone of those who had been chosen kings, but after some years, Gopal who had been elected for a time, delivered himself from her, and was made king for life. He began to reign in Bengal (Bhanga'la), but afterwards reduced Magadh also under his power. He built the Nalanda temple not far from Odantapur and ruled for forty five years." (Ind. Antiquary, Vol IV. p. 366)

২। "নির্জ্জিত্য বঙ্গপতিমাবিরভূদ্বিবস্বানুদ্যন্নিব ত্রিজগদেক-বিকাশকোষঃ॥"১ (Archaeo-Survey of India, Annual Report, 1903-04, p. 281, শ্লোঃ ১০)।

লিপিতে আছে যে, সমুদ্র পর্য্যন্ত বসুন্ধরা জয় করিবার পর গোপালদেব আর যুদ্ধোদ্যম করেন নাই। ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর লিপিতে ধর্ম্মপাল কর্তৃক কান্যকুব্জ প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্য জয় করার কথা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক গৌড় (বারেন্দ্র ও রাঢ়), মগধ ও মিথিলা জয়ের কোন প্রসঙ্গ না থাকায় অনুমিত হয় ধর্ম্মপালকে ঐ সব দেশ জয় করিতে হয় নাই। গোপালদেবই ঐ সকল রাজ্য জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তারানাথের মতে গোপালদেব মগধ জয় করিয়াছিলেন এবং নালন্দায় একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর লিপিতে লিখিত আছে গোপালদেব "করুণার-স্রোতভাসিত বক্ষে [জনগণের প্রতি] মৈত্রী ধারণ করিয়াছিলেন। সম্যক্-সম্বোধ-দায়িনী-জ্ঞান-তরঙ্গিণীর বিমল সলিল-ধারায় [জনগণের] অজ্ঞান-পঙ্ক ধৌত করিয়াছিলেন এবং কামকারিগণের অর্থাৎ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারিগণের আক্রমণ পরাভূত করিয়া [রাজ্য মধ্যে] চিরশান্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন।" "কামকারি" পদের 'কামক [কামরূপ] রূপ অরি' অর্থ করিলে বলা যাইতে পারে যে, গোপালদেব কামরূপ রাজ্যও জয় করিয়াছিলেন।

পালরাজগণের শাসনলিপিতে গোপালদেবকে বুদ্ধের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। খালিমপুর লিপিতে তাঁহাকে সুগত মতাবলম্বী বলা হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মপাল ও বাকপাল নামক পুত্রদ্বয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ধর্ম্মপাল তাঁহার সিংহাসন লাভ করেন (নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপি)।

২। ধর্ম্মপালদেব (৭৭০-৮১০ খৃঃ ?)
মহাদেবী রন্নাদেবী

"অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" নামক গ্রন্থের "তত্ত্বা-লোকবিধায়িনী" নামক একখানি টীকা রাজা ধর্ম্মপালের রাজ্যে আচার্য্য হরিভদ্র কর্তৃক রচিত হয়। তাহাতে ধর্ম্মপালকে "রাজভট্টাদি-বংশপতিত" বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মনে হয় ধর্ম্মপালের মাতা দেদ্দদেবী সমতটের রাজা রাজভটের বংশের দুহিতা ছিলেন। ধর্ম্মপালদেব রাষ্ট্রকূটতিলক পরবলের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

১। "শ্রীপরবলস্য দুহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূটতিলকস্য রন্নাদেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেধিনা যেন ॥ (৯) ॥" (দেবপালদেবের মুঙ্গেরলিপি)। অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী সেই ক্ষিতিপতি (ধর্ম্মপাল) রাষ্ট্রকূটভূষণ শ্রীপরবলের কন্যা রন্নাদেবীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে গুর্জ্জরকবি সোঢ়ল 'উদয়সুন্দরী কথা' নামক চম্পূকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে "উত্তরাপথস্বামী" ধর্ম্মপাল নামক রাজার কথা বলা হইয়াছে। এই ধর্ম্মপাল ও বঙ্গপতি ধর্ম্মপাল যে অভিন্ন তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এই কাব্য হইতে জানা যায় যে 'যুবরাজে'র সভায় অভিনন্দ নামক একজন কবি ছিলেন। এই অভিনন্দ রচিত 'রামচরিতম্' নামক একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে এই যুবরাজ্যের নাম 'যুবরাজ হারাবর্ষ' বলিয়া লিখিত আছে। তিনি ঐ কাব্যে একজন দিগ্বিজয়ী বীর ও 'পালকুলচন্দ্র' ও ধর্ম্মপাল-কুলকৈরবকাননেন্দু' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং আরও লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার পিতার নাম 'বিক্রমশীল' ছিল। এই দুইখানি কাব্যে যুবরাজের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, যুবরাজ উত্তরাপথস্বামী ধর্ম্ম-পালদেবের পুত্র ছিলেন এবং ধর্ম্মপালদেবের উপাধি 'বিক্রমশীল' ছিল। আরও মনে হয় যে এই যুবরাজ ছিলেন ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর শাসনের দূতক 'যুবরাজ ত্রিভুবনপাল'। যুবরাজ বোধ হয় তাঁহার মাতামহের স্বগোত্রীয় রাষ্ট্রকূটরাজগণের 'বর্ষ' উপাধির অনুকরণে নিজেকে হারাবর্ষ নামে পরিচিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালদেবের সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সময় দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূট দন্তীদুর্গ চালুক্যরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মণের (২য়) হস্ত হইতে রাজশক্তি কাড়িয়া লইয়া ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হন এবং এই বংশের কক্কের পুত্র ধ্রুবধারাবর্ষ (৭৮০-৭৯৪ খৃঃ) সর্ব্বভারতে প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত; প্রতিহারবংশীয় [রাজধানী আরাবল্লী পর্ব্বতের পশ্চিমে ভিল্লমাল] বৎস রাজ (৭৮৩-৮৪ খৃঃ) মালবে ও রাজপুতানায় নিজ শক্তি বদ্ধমূল করিয়া কান্যকুব্জ অধিকারে অগ্রসর, এবং পূর্ব্ব ভারতের অধিপতি ধর্ম্মপাল প্রয়াগ অধিকার করিয়া কান্যকুব্জের পথে ধাবিত। এইরূপ অবস্থায় গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগে[১] বৎসরাজের সহিত ধর্ম্মপালের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যুদ্ধে ধর্ম্মপাল পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ

১। রাষ্ট্রকূট প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি তাম্রশাসনে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে রাজ্ঞো গৌড়স্য নশ্যতঃ। লক্ষ্মী লীলারবিন্দানি শ্বেতচ্ছত্রাণি যো হরেৎ॥" রাধনপুর শাসনের ৮ম শ্লোক (Epi. Ind. VI. p. 243) হইতে জানা যায় যে গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ গৌড়েশ্বর (ধর্ম্মপাল)-কে পরাজিত করিয়া তাঁহার শ্বেতছত্রদ্বয় কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাহাই ধ্রুবের হস্তগত হয়। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৮, পৃঃ ১৭১)।

হইতে বাধ্য হন। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ রাষ্ট্রকূটপতি ধ্রুব সসৈন্যে আবির্ভূত হইয়া বৎসরাজকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া রাজপুতানার মরুভূমিতে বিতাড়িত করেন। অতঃপর ধ্রুব কর্ত্তৃক ধর্ম্মপালও পরাভূত হন। কিন্তু ধর্ম্মপালের সৌভাগ্যবশতঃ ধ্রুব স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনুমান ৭৮০-৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ঘটনাগুলি সংঘটিত হয় এবং প্রতিহার, গৌড় ও রাষ্ট্রকূট এই ত্রিশক্তির যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত গৌড়পতি ধর্ম্মপালই লাভবান হন। দৈবক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট-ভীতি তিরোহিত হওয়ায় তিনি দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন। ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর লিপি হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপালকে অসংখ্য সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া কান্যকুব্জপতি মহেন্দ্র (বা ইন্দ্র)[১] যুদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। কান্যকুব্জ অধিকার করিবার পর ধর্ম্মপাল ভোজ (নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী ভোজকট রাজ্য), মৎস্য (রাজপুতানার আলোয়ার, রামপুর ও ভরতপুর), মদ্র (মধ্য পঞ্জাবের শিয়ালকোট), কুরু (পূর্ব্ব পঞ্জাব), যদু (পশ্চিম পঞ্জাবের সিংহপুর, মথুরা ও দ্বারকা), যবন (সিন্ধু দেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), অবন্তী (মালব), গান্ধার (পশ্চিম পঞ্জাব ও কান্দাহার), কীর (পঞ্জাবের কাংড়া) প্রভৃতি রাজ্য জয় করিলেন। দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপি হইতে আরও জানা যায় যে, দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত ধর্ম্মপালদেবের ভৃত্যবর্গ গোকর্ণ তীর্থ, কেদার তীর্থ, গঙ্গাসমেতাম্বুধি তীর্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল[২]।

১। জৈন হরিবংশের উপসংহারে একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ৭০৫ শাকে (৭৮৩-৮৪ খৃঃ) ইন্দ্রযুধ নামক রাজা উত্তর দিক, কৃষ্ণরাজের পুত্র শ্রীবল্লভ (রাষ্ট্রকূট-রাজ ধ্রুব) দক্ষিণ দিক পালন করিতেছিলেন। নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপিতে এই কান্যকুব্জরাজের নাম 'ইন্দ্ররাজ' বলা হইয়াছে। কান্যকুব্জ রাজ্য বর্ত্তমানের 'উত্তর প্রদেশ'। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের ভ্রাতা ইন্দ্রও এই সময়ে লাটেশ্বর মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু কান্যকুব্জের সহিত তাঁর কোন সংস্রব থাকার কথা জানা যায় না। বোধ হয় ইন্দ্রায়ুধই এই সময় কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন।

২। কেদার তীর্থ হিমালয়ের ঘারোয়াল প্রদেশের প্রসিদ্ধ তীর্থ। স্বয়ম্ভু পুরাণের মতে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল নেপাল জয় করিয়াছিলেন। নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাগমতী তীরে 'গোকর্ণ' তীর্থ। স্বয়ম্ভু পুরাণে কপিলাবস্তুর নিকট 'গঙ্গাসমেতাম্বুধি' (গঙ্গাসাগর) তীর্থের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ ভারতে বোম্বাই প্রদেশের কানাড়া জেলাতেও একটি গোকর্ণ তীর্থ আছে।

দিগ্বিজয়ের অবসানে পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মপালদেব তদীয় সাম্রাজ্যে নিজ অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই অভিষেক উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিজিত জনপদসমূহের নরপতিগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের প্রণতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী গর্গের বৃদ্ধ পিতা পঞ্চাল কর্ত্তৃক সুবর্ণ কলসীপূর্ণ গঙ্গোদক মস্তকে সিঞ্চনপূর্ব্বক সাম্রাজ্যে আত্মাভিষেক সম্পাদন করাইয়া পরে অনুগত চক্রায়ুধকে[১] কান্যকুব্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন (৭৯০-৮০০ খৃঃ)। এই সময়ে পাটলিপুত্র সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবারের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, "তৎকালে তথায় ভাগীরথী-প্রবাহ-প্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক সেতুবন্ধনিহিত শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া প্রতীয়মান হইত; ঘনসন্নিবিষ্ট রণকুঞ্জরসমূহ দিনশোভাকে শ্যামায়মান করিয়া নিরবচ্ছিন্ন জলদসমাগমের সন্দেহ উৎপাদন করিত; উত্তরাঞ্চলাগত অগণ্য রাজন্য কর্ত্তৃক উপঢৌকন প্রদত্ত অসংখ্য অশ্বসেনার ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল সমাবেশে দিঙ্মণ্ডলের অভ্যন্তরভাগ নিরন্তর ধূসরিত থাকিত, এবং রাজরাজেশ্বর ধর্ম্মপালদেবের সেবার্থ সমাগত সমগ্র জম্বুদ্বীপাধিপতিগণের অনন্তপদাতি-পদভরে বসুন্ধরা অবনমিত হইত।" তাঁহার "সৌমিত্রীতুল্য" অনুজ বাক্‌পাল তাঁহার "শাসনে অবস্থিত থাকিয়া একচ্ছত্র শাসন সংস্থিত দশদিক্ শত্রুপতাকাশূন্য করিয়া দিয়াছিলেন"[২]। ধর্ম্মপাল কেবলমাত্র পূর্ব্বদিকের (বঙ্গ, গৌড়, মগধ, মিথিলা) অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী গর্গের মন্ত্রণাকৌশলে তিনি অখিল দিকের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন[৩]।

ইত্যবসরে প্রতিহারগণও নিশ্চেষ্ট ছিল না। বৎসরাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় নাগভট সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গ রাজগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বপক্ষভুক্ত করেন এবং ধর্ম্মপালের আশ্রিত কান্যকুব্জপতি চক্রায়ুধকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁহার সামন্ত কক্ক, বাহুকধবল ও শঙ্করগণ তাঁহার বলবৃদ্ধি করে। ফলে মুদ্গগিরির যুদ্ধে ধর্ম্মপাল পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হন। এইরূপে প্রতিহার নাগভট (২য়) ও তাঁহার সামন্তগণের আক্রমণে যখন ধর্ম্মপালের সঙ্কটজনক অবস্থা, ঠিক সেই সময় রাষ্ট্রকূট গোবিন্দ (৩য়) (৭৯৪-৮১৪ খৃঃ সম্ভবতঃ মালবের মধ্য দিয়া) নাগভটের

১। নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর লিপি ৩ শ্লোঃ।
২। নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর লিপি ৪ শ্লোক।
৩। গরুড়স্তম্ভ লিপি ২ শ্লোঃ।
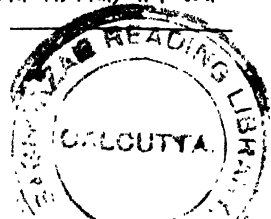
উপর সসৈন্যে আপতিত হন এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া তাঁহার শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন (৮০৮ খৃঃ)। অতঃপর গোবিন্দ (৩য়) প্রতিহার রাজ্যের মধ্য দিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলে তথায় ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন।[১] গোবিন্দ (৩য়) ধর্ম্মপালের অধিকারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। কেহ কেহ মনে করেন ধর্ম্মপালের শ্বশুর 'রাষ্ট্রকূটকুলতিলক' পরবল ও তৃতীয় গোবিন্দ একই ব্যক্তি। ইহা সত্য হইলে ধ্রুব ধারাবর্ষ ও তৎপুত্র তৃতীয় গোবিন্দের ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আচরণের মূল পাওয়া যায়। অতঃপর ধম্মপাল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শান্তিতে রাজত্ব করেন।

ধর্ম্মপাল তাঁহার সময়ের একজন বিচক্ষণ যোদ্ধা ও সমরনিপুণ সেনানায়ক ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে কেবলমাত্র পূর্ব্বদিকের (বঙ্গ-গৌড়-অঙ্গ-মগধ-মিথিলা) অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য ও নীতিজ্ঞানের প্রভাবে 'সকলোত্তরাপথের অধিস্বামী' হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবলমাত্র বিচক্ষণ সেনানায়ক ছিলেন তাহাই নহে, একজন বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। তিনি নূতন নূতন মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অঙ্গদেশের (বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলার) বট-পর্ব্বতিকা বা পাথরঘাটা নামক স্থানে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহার স্থাপন

১। তৃতীয় গোবিন্দের রাধনপুর লিপি (৮০৮ খৃঃ ২৭ জুলাই। শকাব্দ ৭৩০ শ্রাবণ) ও তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের সঞ্জন তাম্রলিপিতে লিখিত আছে 'To whom (Gobinda III) Dharma and Chakrayudh surrendered of themselves।' প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীলগুণ্ডী শিলালিপিতে এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বলা হইয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ গৌড়গণকে পরাজিত করিয়াছিল। এই দুইটি শিলালিপি হইতে আরও জানা যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ কেরল, মালব, গুর্জ্জর ও কাশীনাথকেও পরাজিত করেন।

কক্কের পুত্র বাউকের যোধপুর লিপি (E. I. XVIII. 98, V. 24) হইতে জানা যায় যে, কক্ক মুদ্গাগিরিতে গৌড়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাহুক-ধবলের প্রপৌত্র সৌরাষ্ট্রের মহাসামন্ত অবনীবর্ম্মার ৯৫৬ সংবতের (৮৯৯ খৃঃ) তাম্রশাসনে (Epi. Ind Vol. IX. 6. ৮৭) লিখিত আছে যে, বাহুকধবল ধর্ম্মপালকে পরাভূত করিয়াছিল। অপর এক লিপিতে শঙ্করগণ নামক নাগভট্টের অপর এক সহকারী গৌড় জয় করিয়াছিল বলিয়া দাবী করিয়াছে (Epi. Ind. XV. 14. V. 14)।

করিয়াছিলেন। এই মহাবিহারের নাম 'শ্রীমদ্ বিক্রমশীলদেব মহাবিহার' ছিল (Mitra's Nepal p. 229)। ধর্ম্মপালের নামান্তর 'বিক্রমশীলদেব' হইতে বোধ হয় এই বিহারের নামকরণ হইয়াছিল[১]। ধর্ম্মপালদেবের প্রতিষ্ঠিত অপর একটি মহাবিহারের নাম 'সোমপুর বিহার'। বরেন্দ্রীর অন্তর্গত (বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার) প্রসিদ্ধ পাহাড়পুর নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী "ওমপুর" গ্রাম এখনও ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে। পাহাড়পুরের স্তূপ খননকালে এই বিহারের কতকগুলি মুদ্রা (clay seals) পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের উপর দুই পার্শ্বে দুইটি মৃগমূর্ত্তিসহ ধর্ম্মচক্র ও "শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্ম্মপালদেব মহাবিহারীয় ভিক্ষু-সঙ্ঘস্য" কথাগুলি অঙ্কিত আছে। তাঁহার [খালিমপুর] তাম্রশাসনে লিখিত আছে "গ্রামোপকণ্ঠে বিচরণশীল গোপালকগণের মুখে, প্রতি গৃহচত্বরে ক্রীড়াশীল বালকগণের মুখে, প্রতি পণ্যবীথিকায় মানাধ্যক্ষগণের মুখে, প্রতি প্রমোদগৃহে শুকপক্ষীর মুখে নিজের প্রশংসাগীতি শ্রবণে ধর্ম্মপাল সর্ব্বদা লজ্জাবনত মুখ ফিরাইয়া রাখিতেন।"

রাজা ধর্ম্মপাল কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন, এই শ্লোকটি তাহারই প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। ইহা কেবলমাত্র স্তুতিবাক্য বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না।

ধর্ম্মপাল স্বয়ং বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তিনি বৈদিকধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁহার মন্ত্রী গর্গ বেদপন্থী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বৈদিক দেবতা নারায়ণের পূজার জন্য গ্রামদান করিয়াছিলেন এবং বৈদিক বর্ণাশ্রমের রক্ষক ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের ২৬ সম্বৎসরে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি শনিবারে বুদ্ধগয়ায় উজ্জ্বল নামক ভাস্করের পুত্র কেশব কর্ত্তৃক একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তৎকাল প্রচলিত তিন সহস্র দ্রম্ম মুদ্রা ব্যয়ে একটি

১। তারানাথের "রত্নখনি" (Mine of precious stones, 1608 A. D.) নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আচার্য্য বুদ্ধ শ্রীজ্ঞানের সময় বিক্রমশীল বিহার সদ্য নির্ম্মিত ও সোমপুর বিহারের সংস্কারসাধন, উদ্দণ্ডপুর ও নালন্দার বিহার রাজাদেশে উৎসর্গীকৃত (consecrated) হয়।

তারানাথ আচার্য্য বুদ্ধ শ্রীজ্ঞান ও তাঁহার গুরু সিংহচন্দ্র রাজা ধর্ম্মপালের সময় বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। (Edelstein mine বা রত্নখনি p. 292)।

অগাধা পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল (গৌড়লেখমালা)[১]। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের (৩১৯-৩৮০ খৃঃ) প্রায় চারিশত বৎসর পর গৌড়েশ্বর মহারাজ ধর্ম্মপাল আর একবার সমগ্র উত্তরাপথে গৌড়বঙ্গের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চতুর্ভুজ নামক কবির "হরিচরিতম্" কাব্যের পুষ্পিকায় ১৪১৫ শকে (১৪৯৩ খৃঃ) লিখিয়াছেন যে, করঞ্জগ্রামীন্ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্ণরেখ রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে করঞ্জগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। কায়স্থ টঙ্কদাস ধর্ম্মপালদেবের লেখনাধিকারের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৩ সাল, ১৫৪ পৃঃ)।

১। লাডকের কাহিনীতে ("Chronicles of Ladak") লিখিত আছে যে, তিব্বতরাজ Khri-srong-Lde-Bt-som (খৃ-স্রঙ্-লডে-বটসম) (৭৫৫-৯১ খৃঃ) পূর্ব্বে চীন ও দক্ষিণে ভারতবর্ষকে বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র Mu-Tig-Bt-Son-Po (মু-টিগ্-বট-সন-পো) জম্বু দ্বীপের দুই-তৃতীয়াংশের অধিপতি ছিলেন। তিব্বতরাজ (রল-প-কন্) Ral-Pa-Can (৮১৭-৮৩৬ খৃঃ) গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। খৃঃ নবম শতকে রচিত অপর একখানি তিব্বতীয় কাহিনীতে লিখিত আছে যে, রাজা ধর্ম্মপাল ও দ্রহু-লড্-পণ (Drahu-Ldpun) তিব্বতরাজ মু-টিগ-বটসন-পো-র বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। দ্রহু-লড্-পণ বোধহয় রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবধারাবর্ষ।

এই সকল তিব্বতীয় কাহিনী বিশ্বাসের অযোগ্য। ভারতীয় ঐতিহাসিক উপকরণে ইহার কোন সমর্থন নাই। অপর পক্ষে স্বয়ম্ভু পুরাণের মতে ধর্ম্মপাল তিব্বতের অধিকারভুক্ত নেপাল অধিকার করিয়াছিলেন এবং পাল তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপালের সৈন্যগণ হিমালয়ের কেদার ও গোকর্ণ তীর্থ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

তারানাথের মতে গোপালদেব ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, তৎপুত্র দেবপাল ৪৮ বৎসর, তৎপর তৎপুত্র রসপাল ১২ বৎসর, তৎপর তৎপুত্র ধর্ম্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করেন। সমসাময়িক লিপির প্রমাণে উত্তরাধিকারের এই ধারা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, Bu-Ston (বু-ষ্টোন) নামক অপর একজন তিব্বতীয় গ্রন্থকার (খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম পাদ) লিখিয়াছেন যে, গোপালদেবের পর তৎপুত্র ধর্ম্মপাল ও তৎপর তৎপুত্র দেবপাল রাজা হইয়াছিলেন।

৩। দেবপালদেব (৮১০-৮৫০ খৃঃ)

ধর্ম্মপালদেবের দুই পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহাদের নাম ত্রিভুবনপাল ও দেবপাল। ধর্ম্মপালের খালিমপুর লিপির দূতক ছিলেন যুবরাজ ত্রিভুবনপাল। ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পূর্ব্বেই বোধহয় ত্রিভুবনপাল পরলোকগত হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বোধহয় ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর রন্নাদেবীর গর্ভজাত অপর পুত্র দেবপাল-দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হইয়া তিনি পিতার ন্যায় পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায়ই শক্তিশালী ছিলেন। তিনি পিতার অনধিকৃত অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। [পঞ্চালের পৌত্র ও গর্গের পুত্র] দর্ভপাণি ও দর্ভপাণির পৌত্র কেদার মিশ্র তাঁহার মহামন্ত্রী ছিলেন (গরুড় স্তম্ভলিপি)। ধর্ম্মপালদেবের ভ্রাতা বাক্‌পালের পুত্র জয়পাল তাঁহার সেনাপতি ছিলেন[১]। দেবপালের শাসন-লিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি নিরুপদ্রব (শান্তিপূর্ণ) পিতৃরাজ্য "রাজ্যমাপ-নিরুপদ্রবং পিতুঃ" লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার রণকুঞ্জরগণ বিন্ধ্যাগিরিতে ও যুদ্ধাশ্ব সমূহ কাম্বোজ দেশে উপনীত হইয়াছিল। মন্ত্রী দর্ভপাণির নীতিকৌশলে ও সেনাপতি জয়পালের রণচাতুর্য্যে একদিকে হিমালয়, অপরদিকে সেতুবন্ধ, একদিকে (পূর্ব্বে) বরুণ নিকেতন, অপরদিকে (পশ্চিমে) লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন (ক্ষীরোদ সমুদ্র) পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল তিনি ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিরাজা, ভার্গব, কর্ণ ও বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দাতা ছিলেন। তাঁহার এই মুঙ্গের লিপি দ্বারা দেবপাল তাঁহার বিজয় রাজ্যের ৩৩ সম্বৎসরে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীনগর ভুক্তিতে ভূমিদান করিয়াছিলেন। যুবরাজ রাজ্যপাল এই তাম্রশাসনের দূতক ছিলেন।

গরুড়স্তম্ভ লিপিতে রাজা দেবপালের বিজয়বার্ত্তা আরও একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রী কেদার মিশ্রের মন্ত্রণাবলে গৌড়েশ্বর দেবপাল উৎকলকুল উৎকীলিত, হূণগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত, দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথ-দর্প চূর্ণীকৃত করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের এই দিগ্বিজয় সম্বন্ধে নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর লিপি হইতে আরও জানা যায় যে, দেবপাল দেবের আজ্ঞায় [তাঁহার সেনাপতি] "জয়পাল"[২]

১। নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপি।

২। [সম্ভবতঃ] এই জয়পালের নিকট ছন্দোগ পরিশিষ্ট প্রকাশকার কাঞ্জিবিল্লীয় নারায়ণ ভট্টের পূর্ব্বপুরুষ উমাপতি মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন (ছন্দোগ পরিশিষ্ট প্রকাশ দ্রষ্টব্য)।

দিগ্বিজয়ে ধাবিত হইলে উৎকলপতি ভীত হইয়া রাজধানী ত্যাগ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ (কামরূপ)-পতি যুদ্ধ না করিয়াই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এই কামরূপপতি বোধহয় হর্জ্জর অথবা তৎপিতা প্রলম্ব। উড়িষ্যার কর-রাজবংশীয় তৃতীয় রাজা মহারাজাধিরাজ শুভাকরের (৭৯৫ খৃঃ) পুত্র 'মহারাজাধিরাজ শিবাকর বোধহয় এই সময় উৎকলরাজ্য শাসন করিতেছিলেন। এই সময় হিমালয় প্রদেশে হূণদের একটি এবং পঞ্জাব ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে কাম্বোজদের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির সহিত বোধহয় দেবপালের সৈন্তদলের সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল। বড়া ও দৌলতপুর শাসন হইতে জানা যায় যে, প্রতিহার নাগভট্টের পৌত্র ও রামভদ্রের পুত্র ভোজ কান্যকুব্জ ও কালঞ্জর (৮৩৬ খৃঃ) ও গুর্জ্জর রাষ্ট্র (৮৪৩ খৃঃ) অধিকার করিয়াছিলেন। এই ভোজের সহিত [৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পর] বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন উপত্যকায় বোধহয় দেবপালদেবের রণকুঞ্জর-সমূহের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। দ্রবিড়নাথ বোধহয় পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভ (৮১৫-৮৬২ খৃঃ)। এই পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করায় বোধহয় দেবপালের তাম্রশাসনে তাঁহার রাজ্য সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যদুবংশীয় চন্দেল্লরাজ বিজয় বোধহয় এই অভিযানে দেবপালের সহায় হইয়াছিলেন। কারণ খাজুরাহো লিপিতে (Epi. Ind. Vol. V, p. 20) এই বিজয় রাজাকে সুহৃদের উপকারে দক্ষ "সুহৃদুপকৃতিদক্ষ" বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কতিপয় সাহসী রাজার সহিত তিনি সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন।

যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা) ও মালয় উপদ্বীপ পর্য্যন্ত দেবপালের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ সকল ভূভাগে শৈলেন্দ্র-রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। ঐ রাজবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপনের অনুমতি ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়া দেবপালের নিকট দূত প্রেরণ করিলে দেবপাল ঐ প্রার্থনা পূরণ করেন [দেবপালের ৩৯ বিজয় রাজ্যের নালন্দা শাসন)।

তিনি নগরহার (বর্ত্তমানে জালালাবাদ) নিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব নামক ব্রাহ্মণ জাতীয় জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিতকে নালন্দা বিহারে অধ্যক্ষ পদ প্রদান করেন (ঘোষরাবা লিপি)। বীরদেব তৎপূর্ব্বে বেদাদিশাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়া (পুরুষপুরে) কণিষ্কবিহারে আগমন করতঃ সর্ব্বজ্ঞ শান্তি নামক বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন ও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং প্রাচ্য ভারতে যশোবর্ম্মপুর বিহারে অবস্থান করতঃ রাজা দেবপাল কর্ত্তৃক পূজিত হন (ঘোষরাবা লিপি)।

দেবপালদেবের মহাদেবীর নাম জানা যায় না। নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনে দেবপালের নাম উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার মহাদেবীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

৪। শূরপালদেব (৮৫০ খৃঃ) ও

৫। বিগ্রহপালদেব (১ম) (৮৫১-৫৫ খৃঃ)

মহাদেবী লজ্জাদেবী

দেবপালদেবের মৃত্যুর পর কে পাল-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন তাহা লইয়া মতবিরোধ আছে। দেবপালদেবের ৩৩ রাজ্যাব্দের মুঙ্গেরলিপির দূতক যুবরাজ রাজ্যপাল বোধহয় দেবপালের জীবদ্দশাতেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। গরুড়-স্তম্ভলিপিতে দেবপালদেবের পর শূরপাল নামক রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত লিপির ১৫শ শ্লোকে লিখিত আছে "সেই বৃহস্পতি প্রকৃতি (কেদার মিশ্রের) যজ্ঞস্থলে সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রুসংহারকারী নানাসাগর মেখলাভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী শ্রীশূরপাল নৃপতি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, বহুবার শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র (শান্তি) বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন." এই শ্লোকে রাজা শূরপালকে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ও কেদার মিশ্রকে দেবরাজের পুরোহিত বৃহস্পতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, শূরপালদেবের শাসন সময়েও বরেন্দ্রমণ্ডলে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত এবং বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী রাজা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে শান্তিবারি গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতে প্রজাগণের কল্যাণ হইবে বলিয়া মনে করিতেন।

নারায়ণপালদেবের শাসনলিপিতে দেবপালের পর বিগ্রহপালের নাম লিখিত থাকায় কেহ কেহ শূরপাল ও বিগ্রহপালকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। এবং আরও মনে করেন যে, এই বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র। কিন্তু নারায়ণপালের লিপির ৭ম শ্লোকের "তৎসূনু" পদের 'তৎ' শব্দে "জয়পাল"কে বুঝায় বলিয়া মনে করাই সঙ্গত[১]। আমাদের এই মত সত্য হইলে শূরপালকে বিগ্রহপালের

১। নারায়ণপাল দেবের শাসনলিপির ৪র্থ শ্লোকে বলা হইল, "রামস্যেব গৃহীত-সত্যতপসঃ তস্যানুরূপোগুণৈঃ সৌমিত্রেরুদপাদিতুল্য-মহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ। যঃ * শূন্যাঃ শত্রু-পতাকিনী ভিরকরোদেকাতপত্রাদিশঃ॥ (৪) তস্মাৎ * * পুত্রোবভুব বিজয়ী জয়পালনামা * * দেবপালে যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্য সুখান্যনৈষীৎ॥ (৫) যস্মিন্ ভ্রাতুর্নির্দ্দেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ

নামান্তর গ্রহণ করিবার কষ্টকল্পনার আবশ্যক হয় না। মনে হয় (সম্ভবতঃ দেবপালের অন্যতম পুত্র) শূরপাল কিছুদিনের জন্য রাজা হইয়াছিলেন। এবং তিনি পরলোকগত হইলে অন্য নিকটতম উত্তরাধিকারীর অভাবে সিংহাসনের উত্তরাধিকার ধর্ম্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের পুত্র জয়পালের শাখায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল রাজা হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কথা বুঝাইবার জন্য ধর্ম্মপাল ও দেবপালের শাসনলিপিতে বাক্‌পাল ও জয়পালের কোন উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও নারায়ণপালের শাসনে ধর্ম্মপালের শাখার শূরপালের উল্লেখ না করিয়া বাক্‌পাল ও জয়পালের নাম ও কীর্ত্তিকাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে, যেন তাঁহাদের বাহুবলেই পালসাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নারায়ণপালের শাসনের দূতক ভট্টগুরব মিশ্রও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গরুড় স্তম্ভলিপিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী এরূপভাবে বর্ণিত করিয়াছেন যেন তাঁহাদের জন্যই ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজ্যবিস্তার ও দিগ্বিজয় সম্ভব হইয়াছিল। বিগ্রহপাল জয়পালের পুত্র না হইলে নারায়ণপালের শাসনে বাক্‌পাল ও জয়পালের এরূপ উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে।

হৈহয় (কলচূরী) রাজকুমারী লজ্জাদেবীর সহিত বিগ্রহপালের (১ম) বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বোধহয় বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে বিগ্রহপাল "আমার পক্ষে তপস্যা ও তোমার পক্ষে রাজ্য" এইরূপ বলিয়া পুত্র নায়ায়ণপালকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ও

* * নিজপুর মজহাদুৎকলানাধীশঃ। আসাঞ্চক্রেচিরায় * * বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণাং * * যস্তচাজ্ঞাং॥ (৬) শ্রীমান্ বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিবজাতঃ।" (৭) অর্থাৎ গুণে সত্যব্রতধারী রামের অনুজ সৌমিত্রীর অনুরূপ তাঁহার (ধর্ম্মপালের) বাক্‌পাল নামক এক অনুজ জন্মিয়াছিলেন। যিনি দশদিক শত্রুপতাকাশূন্য করিয়া একাতপত্র করিয়াছিলেন তাঁহা হইতে (সেই বাক্‌পাল হইতে) জয়পালনামা বিজয়ী পুত্র জন্মিয়াছিলেন। যিনি পূর্ব্বজ দেবপালকে ভুবনরাজ্য সুখের অধিকারী করিয়াছিলেন (৫)। ভ্রাতার (জ্ঞাতিভ্রাতার) নির্দ্দেশক্রমে সেই বলবান্ (জয়পাল) দিগ্বিজয়ে প্রস্থান করিলে উৎকলপতি নিজ রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি তদীয় উচ্চ মস্তকে যাঁহার (জয়পালের) আজ্ঞা ধারণ করিয়া চিরকাল (পরম সুখে) অতিবাহিত করিয়াছিলেন (৬)। তাঁহার (জয়পালের) অজাতশত্রুর ন্যায় শ্রীমান্ বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্মিয়াছিলেন।

স্বয়ং সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যাব্রতী হইয়াছিলেন। এই সময় উৎকলে করবাজবংশ ধ্বংস করিয়া শৈলেন্দ্র বংশের সৈন্যভীত মাধববর্ম্ম (৮৫০ খৃঃ) ও কামরূপে হর্জ্জর মহারাজাধিরাজ উপাধি লইয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। অতঃপর বিগ্রহপালদেবের (১ম) পুত্র নারায়ণপাল রাজা হন।

৬। নারায়ণপাল (৮৫৫-৯০৮ খৃঃ)

মহারাজাধিরাজ নারায়ণপালদেব তাঁহার রাজ্যের ১৭শ বর্ষে ৯ই বৈশাখ তারিখে তীরভুক্তির (মিথিলা) অন্তর্গত কক্ষ বিষয়ের মুকুতিকাগ্রাম, কলসপোত নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও পাশুপতাচার্য্য পরিষদের জন্য তাম্রশাসন দ্বারা দান করিয়াছিলেন। কেদার মিশ্রের পুত্র ভট্টগুরব মিশ্র এই শাসনের দূতক ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের ৭ম ও ৯ম রাজ্যাব্দের শাসনগুলি মগধে প্রদত্ত হইয়াছিল[১]। ৮৩৬ খৃঃ প্রতিহার মিহিরভোজ (৮৩৬-৮৮৬ খৃঃ) কালঞ্জর ও কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নারায়ণপালের ৯ম রাজ্যাব্দের (৮৬৩ খৃঃ) পর ও ৮৬৭ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে মিহিরভোজ কলচুরী (চেদী বা হৈহয়) গুণাম্বোধিদেব[২] ও মাণ্ডব্যপুরের প্রতিহারবংশীয় কক্কের[৩] সহিত মিলিত হইয়া গৌড়বঙ্গদিগকে মুদ্গগিরির যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু ৮৬৭ খৃঃ গুর্জ্জরপতি ইন্দ্রের পৌত্র রাষ্ট্রকূট ধ্রুবধারাবর্ষ কর্তৃক পরাস্ত হইয়া এতদঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন (Indian Antiquary, Vol XII, p. 184)। পুনরায় মিহির-ভোজের (আদিবরাহ) পুত্র মহেন্দ্রপালের (৮৮৬-৯১৭ খৃঃ) ২, ৮ ও ৯ ও ১৯ রাজ্যাব্দের প্রস্তরলিপিগুলি মগধে ও ৫ রাজ্যাব্দের লিপি বরেন্দ্রে (পাহাড়পুর ৮৮৭ খৃঃ হইতে ৮৯৪ খৃঃ মধ্যে) আবিষ্কৃত হওয়ায়, ঐ সময় মহেন্দ্রপাল সমগ্র বিহার ও উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আবার নারায়ণ-

---

১। নারায়ণপালের ৭ম রাজ্যাব্দে গয়ায় ভাণ্ডদেব কর্ত্তৃক আশ্রম এবং ৯ম রাজ্যাব্দে উদ্দণ্ডপুরে একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় (Memoirs of A. S. B. Vol V, p. 60)।

২। গুণাম্বোধিদেবের ষষ্ঠ পুরুষ অধস্তন সোঢ়দেবের ১১৩৪ বিক্রমাব্দের (১০৭৬ খৃঃ) কাহ্লালিপি।

৩। কক্কপুত্র বড়িকের ৪র্থ রাজ্যাব্দের যোধপুর (মাণ্ডব্যপুর) শিলালিপি (৮৮৩ খৃঃ)। "ততোঽপি শ্রীযুতঃকক্কঃ পুত্রোযাতো মহামতিঃ। যশোমুদ্গগিরৌ লব্ধং যেন গৌড়ং সমং রণে॥"

পালের ৫৪ রাজ্যাব্দের (৯০৮ খৃঃ) লিপিযুক্ত মগধে (উদ্দণ্ডপুরে) প্রতিষ্ঠিত পিত্তলময়ী পার্ব্বতীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে হয় ঐ সময়ের পূর্ব্বেই নারায়ণপাল মগধ ও বারেন্দ্র পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট অমোঘবর্ষের (১ম) পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ অকালবর্ষ (৮৮০-৯১৪ খৃঃ) বোধ হয় এই সময় গৌড়-গণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ দেউলি তাম্রশাসনে কৃষ্ণ (২য়)-কে "গৌড়ানাং বিনয় ব্রতার্পণগুরু" ও অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধকে তাঁহার আদেশ-পালক বলা হইয়াছে। এই অভিযানে বোধহয় বেলানাড়ুর (কৃষ্ণা জেলার) সামন্ত প্রথম মল্ল দ্বিতীয় কৃষ্ণের সঙ্গী হইয়াছিলেন। কারণ প্রথম মল্লের পীঠপুরম্ লিপিতেও তিনি বঙ্গ, গৌড় ও মগধগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। অবশেষে বোধহয় দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীর সহিত নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের বিবাহ দ্বারা রাষ্ট্রকূট গৌড় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে (প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়লিপি, ৮ম শ্লোঃ)।

৭। রাজ্যপাল (৯০৮-৯৪০)
মহাদেবী ভাগ্যদেবী

রাজ্যপালদেবের ২৪, ২৮, ৩১ ও ৩২ রাজ্যাব্দের লিপি নালন্দা ও কুর্কিহারে (মগধ) আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গ পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর পর পৌত্র ইন্দ্র (৩য়) (নিত্যবর্ষ) রাজা হন। তিনি প্রতীহার মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপালকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী কান্যকুব্জ ধ্বংস করেন এবং ইন্দ্রের (৩য়) সামন্ত নরসিংহ যমুনা পার হইয়া পলায়নপর মহীপালকে অনুসরণ করিতে করিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (কানাড়া ভাষায় পম্পারাজ-রচিত "কর্ণাটক শব্দানুশাসন" Edited by Lewis Rice, পৃঃ ২৬)। রাজ্যপালদেব অগাধ জলধি-মূলতুল্য গভীর গর্ত্তবিশিষ্ট জলাশয়ের ও কুলাচলতুল্য সমুচ্চকক্ষ সংযুক্ত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন (প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড় শাসনলিপি)। রাজ্যপালের পর তৎপুত্র গোপালদেব রাজা হন।

৮। গোপালদেব (২য়) (৯৪০-৯৬০ খৃঃ)

গোপালদেবের রাজ্যের প্রথম বর্ষে নালন্দায় একটি বাগীশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বরেন্দ্রে (জাজিল পাড়ায়) তাঁহার রাজ্যের ৬ষ্ঠ বর্ষে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও পঞ্চদশ রাজ্যাব্দে মগধে বিক্রমশীল বিহারে একখানি

প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ অনুলিখিত হইয়াছে (J. Royal, A. S. 1910, p. 150-51)।

সম্ভবতঃ এই সময়ে চন্দেল্লরাজ যদুবংশীয় যশোবর্ম্মা হিমালয় হইতে মালব ও কাশ্মীর হইতে গৌড় পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তরাপথে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন এবং বিখ্যাত কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়া উত্তরাপথে প্রবল হইয়া উঠেন। তৎপুত্র ধঙ্গদেব (৯৫৪-১০০০ খৃঃ) রাঢ় ও অঙ্গরাজ মহিষীদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করেন (খাজুরাহো লিপি)। কলচুরীরাজ যুবরাজ (১ম) ও তৎপুত্র লক্ষ্মণরাজ গৌড়, বাঙলা, কলিঙ্গ, কর্ণাট, লাট ও কাশ্মীরে অভিযান করেন (বিলহারী লিপি ও গোহরবা শাসন)। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত কান্তিদেব নামক এই সময়ের একজন বৌদ্ধ মহারাজাধিরাজের (ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত) একখানি অসমাপ্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি হরিকেল (বঙ্গ) ও বর্দ্ধমানভুক্তিতে রাজত্ব করিতেন এবং বর্দ্ধমানপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে শাসন প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এই শাসনে লিখিত আছে যে, তাঁহার স্ত্রী বিন্দুরতি রাজকন্যা ছিলেন। মনে হয় চট্টগ্রাম হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত নটেশ শিবমূর্ত্তির পাদপীঠ লিপি হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে কুমিল্লায় লডহ চন্দ্র নামে একজন রাজা অন্যূন ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই চন্দ্রবংশেরই রাজা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ (বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা ও সুন্দরবন) ও বিক্রমপুর রাজ্যের স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন ('শ্রীচন্দ্রদেবের ৪৪ রাজ্যাব্দে প্রদত্ত মদনপুরলিপি', ভারতবর্ষ, ১৩৫৩ সাল অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৫১৪)।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে তৎকালে পাল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্যই সূচিত হয়।

বরেন্দ্রের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার বাণপুরের নিকটবর্ত্তী রাজীবপুর গ্রামের একটি সদাশিব মূর্ত্তির পাদপীঠ লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ মূর্ত্তিটি পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপালদেবের রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে মন্ত্রী শ্রীপুরুষোত্তম কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

৯। বিগ্রহপাল (২য়) (৯৬০-৯৮৮ খৃঃ)

৯ (ক)। কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি (নয়পালদেব—১ম)

দ্বিতীয় গোপালের পর তৎপুত্র বিগ্রহপাল রাজা হন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য

নিষ্কণ্টক ছিল না। বাণগড়ের একটি শিবমন্দিরের প্রস্তরলিপি[১] হইতে জানা যায় যে, কুঞ্জরঘটাবর্ষে কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি কর্তৃক ঐ মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল।

এই কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের মতে ইর্দা শাসনের দাতা মহারাজাধিরাজ নয়পালদেবই[২] এই "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি"। এই ইর্দা শাসনখানি "ওঁ নমঃ শিবায় স্বস্তি" বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, নয়পালদেবের পিতা পরমসৌগত ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা নারায়ণপাল "বাসুদেবপাদাব্জ-পূজানিরত-মানসঃ" হইলেও নয়পাল স্বয়ং শৈব ছিলেন। উক্ত তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে যে, কাম্বোজবংশতিলক পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ রাজ্যপাল হইতে তৎপত্নী ভাগ্যদেবীর গর্ভে নারায়ণপাল ও নয়পাল জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ

১। "কাম্বোজান্বয়জে নগৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জর ঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥"

"কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" পদ দ্বারা গৌড়পতির উপাধি বুঝাইতে পারে। অথবা উহার অর্থ ৮৮৮ শকাব্দও (৯৬৫-৯৬৬ খৃঃ) হইতে পারে। অথবা উহা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে।

২। "... ... নয়পালদেবঃ লব্ধোদয়ো ভ্রাতুরনন্তরং যঃ শ্রীয়ম্ সমাসাদ্য দুরাসদোঽভূৎ অস্তাচলং চন্দ্রমসিপ্রপন্নে দিবং বিবস্বানিব গাহমানঃ॥ যেন দ্বিষাং ন গণিতানি মহাবলানি নাপেক্ষিণঃ পরিজনোঽপি সমীপে। একাকীনৈব ভুজমন্দর-মথ্যমানোলব্ধাঃ সমিৎজলধেঃ শতশো জয়শ্রীঃ॥ পরম সৌগতো রাজাধিরাজো পরমেশ্বর পরম ভট্টারক শ্রীরাজ্যপালদেব পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ নয়পালদেবঃকুশলী। শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতি দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলে" ইত্যাদি। অর্থাৎ যিনি ভ্রাতা নারায়ণপালের পর লব্ধোদয় হইয়া [রাজ্য] লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন এবং যিনি চন্দ্র অস্তাচলগামী হইলে সূর্য্য যেমন আকাশে উদিত হইয়া অনতিক্রম্য হইয়া উঠে সেইরূপ [অনতিক্রম্য] হইয়াছিলেন। যিনি শত্রুর মহাবলকে গণ্য করিতেন না এবং নিকটবর্ত্তী বন্ধুগণের [সাহায্যের] জন্যও অপেক্ষা করিতেন না, যিনি একাকী নিজ ভুজরূপ মন্দর পর্ব্বত দ্বারা সমরজলধি মন্থন করিয়া শত যুদ্ধে জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন, পরমসৌগত মহারাজা-ধিরাজ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক শ্রীরাজ্যপাল দেবের পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমান্ নয়পালদেব কুশলী ইত্যাদি।

'ক্ষিতিপঃ" নারায়ণপালের পর নয়পাল রাজশ্রী লাভ করেন। তদীয় রাজ্যের ১৩শ বর্ষে শ্রীরাজ্যপালদেব পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান নয়পালদেব প্রিয়ঙ্গু রাজধানী হইতে বর্দ্ধমান-ভুক্ত্যন্তঃপাতি দণ্ডভুক্তিমণ্ডলে বৃহচ্ছত্রা-বর্ণাগ্রাম বাৎস্যগোত্রজ অশ্বত্থ শর্ম্মাকে দান করেন। এই পরম সৌগত কাম্বোজ-কুলতিলক মহারাজাধিরাজ রাজ্যপালদেব কে ছিলেন? গৌড়েশ্বর নারায়ণপাল-দেবের পুত্র পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ রাজ্যপালদেব এবং এই রাজ্যপালদেব উভয়ের 'পাল' উপাধি, পরম সৌগত ও পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ বিশেষণ এবং উভয়ের স্ত্রীর নাম ভাগ্যদেবী দৃষ্টে এই অনুমান অনিবার্য্য হইয়া উঠে যে, উভয় রাজ্যপাল এক ব্যক্তি ছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে ইন্দ্রালিপিতে রাজ্য-পালকে "কাম্বোজ-কুল-তিলক" বলা হইয়াছে কেন? দেবপালের মুঙ্গেরলিপিতে জানা যায় যে, দেবপালের সৈন্যগণ কাম্বোজ দেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র জয়পাল তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। মনে হয় দেবপালের দিগ্বিজয়কালে তাঁহার আজ্ঞায় সেনাপতি জয়পাল কাম্বোজ দেশে[১] উপস্থিত হইলে

১। মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে (৪।৫) কাম্বোজগণের রাজধানীর নাম রাজপুর বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের দক্ষিণে যে রাজোরী গ্রাম আছে, কানিংহামের মতে তাহাই 'রাজপুর'। কাশ্মীর ও পঞ্জাবের মধ্যবর্ত্তী গিরিমালাবেষ্টিত চম্বা রাজ্য ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ লইয়াই বোধ হয় সেকালের কাম্বোজ রাজ্য ছিল। এই চম্বারাজ্যে প্রাপ্ত একখানি ক্ষোদিত লিপির পাঠ কিলহর্ণ সাহেব ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রিকার ১৭শ খণ্ডে (পৃঃ ৭১৩) মুদ্রিত করিয়াছেন। ঐ লিপিতে চম্বারাজ সাহিল্লদেবের (খৃঃ নবম শতক) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "কুরুক্ষেত্রে রাহুপরাগ সময় সমর্থিত—মদগন্ধলুব্ধ-মধুকর-কুলাকুল-কপোল-ফলক-করি-ঘটা-দার-প্রীতিপ্রসন্ন-মানস ভগবদ্ভাস্করাভিনন্দিত নিজান্বয় প্রভৃতি পরম্পরাসার করিবর্ষা-ভিধানাভুদস্ত" অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে মদগন্ধলোভী ভ্রমরকুল 'করিঘটা'র কপোলদেশে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল। সাহিল্লদেব সেই করিঘটার বিনাশ সাধন করায় ভগবান সূর্য্যদেব প্রসন্নচিত্ত হইয়া সাহিল্লদেবকে তদীয় বংশানুক্রমে "করি (ঘটা) বর্ষ" উপাধি দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

এই লিপি হইতে আরও জানা যায় যে, সাহিল্লদেবের বংশীয় শালবাহনদেবের পাদানুধ্যাত শ্রীসোমবর্ম্মদেব ও তৎপুত্র আসটদেব কাশ্মীররাজ অনন্ত (১০২৮-১০৬৩ খৃঃ) ও কলসের (১০৬৩-১০৮৯ খৃঃ) সমসাময়িক (রাজতরঙ্গিণী ৭।২১৮ ও ৫৮৭-৯০ শ্লোঃ)। সাহিল্লদেবের কন্যার সহিত হয়ত নারায়ণপালের বিবাহ হইয়াছিল।

তথায় তাঁহার পৌত্র নারায়ণপালের সহিত কাম্বোজরাজকন্যার বিবাহ হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কোন লিপিতে এই নারায়ণপালের মহিষীর নাম উল্লিখিত হয় নাই। আমাদের অনুমান সত্য হইলে নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের মাতামহকুলকে লক্ষ্য করিয়াই ইর্দা শাসনে রাজ্যপালকে "কাম্বোজকুলতিলক" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য হইলে ধরিতে হয় যে, রাজ্যপাল-দেবের তিন পুত্র ছিল, যথা—গোপাল (২য়), নারায়ণপাল ও নয়পাল (১ম)। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোপাল (২য়) সাম্রাজ্য সিংহাসন লাভ করেন এবং নারায়ণপাল (২য়) দণ্ডভুক্তি সামন্তরাজ পদ ও তাঁহার পর নয়পাল (১ম) ঐ পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ৯৬০ খৃঃ গোপালদেব (২য়)-এর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বিগ্রহপাল (২য়) গৌড়-সাম্রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু এই সময় নয়পাল (১ম) প্রবল হইয়া গৌড়দেশ (বরেন্দ্র ও রাঢ়) হইতে বিগ্রহপাল (২য়) -কে বিতাড়িত করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়পতি হন ও বাণগড়ে (বরেন্দ্রে) শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। বিতাড়িত বিগ্রহপাল (২য়) সম্ভবতঃ মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অঙ্গ, মগধ ও মিথিলা শাসন করিতে থাকেন। মগধের কুর্কিহারে স্থাপিত দ্বিতীয় বিগ্রহপালের ৩য় রাজ্যাব্দের একখানি, ও ১৯ রাজ্যাব্দের দুইখানি মূর্ত্তিলিপি পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপিতে তাঁহার পিতার কোন বীরকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। ঐ লিপিতে তাঁহাকে সূর্য্য হইতে চন্দ্ররূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য তাঁহাতে কলাময়ত্বের আরোপ করিয়া তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ইঙ্গিত করা অসম্ভব নয়। নয়পাল (১ম) রাঢ় ও বরেন্দ্র অধিকার করিবার পর বোধহয় দণ্ডভুক্তি বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সেই জন্যই তাম্রশাসনে দণ্ডভুক্তিকে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

১০। মহীপালদেব—১ম (৯৮৮-১০৩৮ খৃঃ)

মহীপালদেবের ৯ম রাজ্যাব্দে প্রদত্ত তাঁহার বাণগড় তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি রণক্ষেত্রে বাহুদর্প প্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষকে পরাস্ত করিয়া অনধিকারী দ্বারা বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য "অনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং" উদ্ধার করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন। এই অনধিকারী যে কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি নয়পাল-দেব (১ম) তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া গ্রামের একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠের লিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা মহীপালদেবের ৩য় সম্বৎসরে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং মহীপালদেব তাঁহার রাজ্যের তৃতীয় বর্ষ মধ্যেই বরেন্দ্র ও সম্ভবতঃ উত্তর রাঢ় অধিকার করিয়া সমতটের ঐ

অংশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত বাণগড় শাসন দ্বারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি কোটিবর্ষ বিষয়ে কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রী শ্রীবামনভট্ট ইহার দূতক ছিলেন।

১০২১ হইতে ১০২৩ খৃঃ মধ্যে (কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মধ্যবর্ত্তী) চোলদেশের রাজা রাজেন্দ্র চোলের সেনাপতি গঙ্গাজল আহরণের জন্য অভিযান করেন। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্গম ওড্রবিষয় ও মনোরম কোশল নাড়ু অধিকার করিবার পর ভীষণ যুদ্ধে রাজা ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ উদ্যানবিশিষ্ট দণ্ডভুক্তি, রাজা রণশূরকে[১] পরাজিত করিয়া সকল দিকে প্রসিদ্ধ দক্ষিণরাঢ়, রাজা গোবিন্দ চন্দ্র

১। প্রসিদ্ধ মৈথিল দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র আচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের 'বিধি বিবেক' নামক মীমাংসা গ্রন্থের 'ন্যায়কণিকা' টীকায় বাক্যের অর্থ বিচার প্রসঙ্গে উদাহরণ-স্বরূপ লিখিয়াছেন "নিজভুজবীর্য্যমাস্থায় শূরাণাদি শূরো জয়তি" (ন্যায়কণিকা, কাশী সংস্করণ, পৃঃ ২৯০)। অর্থাৎ নিজ বাহুবলে নির্ভর করিয়া আদিশূর শূরগণকে জয় করিতেছেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৭ ভাগ, ৬৮ পৃঃ)। বাচস্পতি মিশ্রের 'ন্যায় সূচী নিবন্ধে'র নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে, তিনি ৮৯৮ শকে (৯৭৭ খৃঃ) উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

"ন্যায়সূচী নিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে। শ্রীবাচস্পতি মিশ্রেণ বস্বঙ্ক বসুবৎসরে"॥ [সুধিগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীবাচস্পতি মিশ্র ৮৯৮ (শক) বৎসরে এই ন্যায়সূচী নিবন্ধরচনা করিয়াছেন]। অধ্যাপক পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মতে বাচস্পতি মিশ্র খৃষ্টীয় দশম শতকের লোক। সুতরাং ন্যায়সূচী নিবন্ধের রচনাকাল ৮৯৮ সম্বৎসর মিথিলা ও পূর্ব্বাঞ্চলে প্রচলিত শকাব্দ বটে। অতএব আদিশূরের আবির্ভাব ৯৭৭ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে হইয়াছিল। ইহা বিগ্রহপালদেবের (৯৬০-৯৮৮ খৃঃ) রাজ্যকাল। তীরুমলয় লিপির দক্ষিণ-রাঢ়পতি রণশূর সম্ভবতঃ আদিশূরের পৌত্র ছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম্ কাব্যে উল্লিখিত মন্দারাধিপতি (হুগলী জেলার আরামবাগ থানার গড়মান্দারণের রাজা) লক্ষ্মীশূরও সম্ভবতঃ এই বংশীয় ছিলেন।

কুলদোষ নামক একখানি প্রাচীন কুলগ্রন্থ বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে আদিশূর সম্বন্ধে এই শ্লোকটি আছে—"ক্ষত্রিয়বংশে সমুৎপন্ন মাধবোকুলসম্ভবঃ। বসুধর্ম্মাষ্টকে শাকে নৃপোঽভুচ্চাদিশূরকঃ॥" ইহাতে "বসুধর্ম্মাষ্টকে" অর্থ ৮৯৮ (১৩২১। মাঘ, সাহিত্য পত্রিকা পৃঃ ৭৫১)। বারাণসীতে

যুদ্ধকালে গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন সেই অবিরাম ঝড়-বৃষ্টি-পূর্ণ বঙ্গাল দেশ এবং কর্ণভূষণ, চর্ম্মপাদুকা ও বলয় বিভূষিত রাজা মহীপালকে যেখানে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়নে বাধ্য করিয়া তদীয় অদ্ভুত বলশালী করীসমূহ ও রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করা হইয়াছিল সেই সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন 'উত্তর রাঢ়' অধিকার করিয়া তিনি বালুকাময় তীর্থধৌত-কারিণী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দণ্ডভুক্তিপতি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপাল বোধহয় কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি (১ম) নয়পালদেবের বংশধর ছিলেন, এবং মহীপাল (১ম) কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিজের মূল রাজ্য দণ্ডভুক্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিদাম্বরমের নটরাজ মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে লিখিত আছে (Epi. Ind. Vol V, p. 105) যে রাজা রাজেন্দ্র চোল কাম্বোজগণের নিকট উক্ত শিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি (কাম্বোজান্বয়জ) উক্ত ধর্ম্মপালের নিকট হইতে বোধহয় উহা হস্তগত করিয়া থাকিবেন। দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা রণশূরও বোধহয় আদিশূরের বংশীয় ছিলেন।

১০২৬ খৃঃ (১০৮৩ সম্বৎ) সারনাথ লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, গৌড়েশ্বর মহীপালদেব বারাণসীধামে অনুজ স্থিরপাল ও বসন্তপাল দ্বারা ঈশান (শিব), চিত্রঘণ্টা (দুর্গা) প্রভৃতি শত মূর্ত্তিরত্ন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের ৪৮ রাজ্যাঙ্কের কতকগুলি পিত্তলমূর্ত্তি মিথিলায় (মজঃফরপুর জেলায়) আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার ১১ রাজ্যাঙ্কে নালন্দায় কতকগুলি ভগ্নমন্দিরের পুনঃনির্ম্মাণ ও সংস্কার সাধিত এবং বোধিগয়ায় দুইটি মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, ১০২৬ খৃঃ মধ্যে মহীপালের রাজ্য মগধ ও মিথিলা অতিক্রম করিয়া বরাণসী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১০২৬ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে কলচুরি গাঙ্গেয়দেব গৌড়পতি মহীপালের সহিত অঙ্গদেশে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন (গোহারবা তাম্রশাসন Epi. Ind. XI, p. 153, V.17)। বাইহাকি বলেন যে, নিয়ালতিগিন কর্ত্তৃক ১০৩৪ খৃঃ বারাণসী আক্রমণের সময় গাঙ্গেয়দেব (জানা রাজ্যকাল ১০৩৭ খৃঃ) বারাণসীর অধিপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ

প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন তাম্রশাসন ["স্বস্তি শম্ভুপুরাং অনেক সমর শত বিজয়ী শূরবংশললামভূতস্ত শ্রীমকোভগ্রহরাজনপ্তুঃ নিষ্ঠুর রাজসূণো হরিতুল্যগুণ বিক্রমধাম-নাম্নো হরিরাজস্ত] শূরবংশীয় মকোভ গ্রহরাজের পৌত্র নিষ্ঠুররাজের পুত্র হরিরাজ অর্থাৎ রাজা হরিশূরের নাম জানা যায় (১৩১০, কার্ত্তিক, ভারতবর্ষ পৃঃ ৪০৫)।

মহীপালদেবের রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার এই ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল।

দক্ষিণ রাঢ়ের ভূরীশ্রেষ্ঠী নিবাসী শ্রীধর ভট্টের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ন্যায়কন্দলী'র সমাপ্তি পুষ্পিকায় লিখিত আছে "ত্র্যধিকদশোত্তর নব শকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা। রাজশ্রী পাণ্ডুদাস কায়স্থ যাচিত ভট্ট শ্রীধরেণ সমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রকাশ ন্যায়কন্দলী টীকা।" ইহা হইতে জানা যায় উক্ত টীকার সমাপ্তিকাল ৯১৩ শক (৯৯১ খৃঃ)।

১১। নয়পালদেব (২য়) (১০৩৮-১০৫৫ খৃঃ)

মহীপালদেবের (১ম) মৃত্যুর পর তৎপুত্র নয়পালদেব (২য়) রাজা হন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম ঘটনা তীর্থিক ধর্ম্মাবলম্বী কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র লক্ষ্মীকর্ণের (সংক্ষেপে কর্ণ) সহিত নয়পালদেবের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ। অনুমান ১০৪১ খৃঃ গাঙ্গেয়দেবের মৃত্যুর পর কর্ণ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন এবং পিতার পন্থানুসরণ করিয়া তিনি মগধ আক্রমণ করেন। প্রথম দিকে কর্ণ জয়ী হন, কিন্তু নগরদুর্গ অধিকারে অসমর্থ হইয়া কতকগুলি বিহার ধ্বংস করেন। অতঃপর নয়পাল নূতন বল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কর্ণকে আক্রমণ করিলে কর্ণের সৈন্যগণ পলাইতে আরম্ভ করে। এই সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মগধে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয় এবং সন্ধিসূত্রে উভয় পক্ষ নিজ নিজ অধিকৃত ভূভাগ ও লুণ্ঠিত দ্রব্য পরস্পরকে প্রত্যর্পণ করেন।

এই সন্ধির পর ১০৪২ খৃষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতরাজ চান্-চুবের আমন্ত্রণক্রমে তিব্বতে গমন করেন।

পাগ্-সাম্-জোন্ জুঙ্ নামক তিব্বতীয় গ্রন্থের[১] মতে অতীশ দীপঙ্কর ৯৮০ খৃঃ গৌড়দেশের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অতীশের স্বপ্রণীত "বোধিমার্গ প্রদীপ পঞ্জিকায়" লিখিত আছে যে, তিনি বাঙলার বিক্রমণিপুরের রাজপরিবারে জন্মিয়াছিলেন। বিক্রমণিপুর বোধহয় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। তাঁহার পিতার নাম কমলশ্রী, মাতার নাম প্রভাবতী ও নিজের পূর্ব্ব নাম চন্দ্রগর্ভ। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে চন্দ্রগর্ভ জেতারি নামক গুরুর নিকট প্রেরিত হন। কথিত আছে জেতারির পিতা সনাতন নামক বরেন্দ্রের জনৈক সামন্ত রাজার সভাসদ ছিলেন। জেতারির

১। এই গ্রন্থের তিব্বতীয়-অনুবাদ "কংগুর" ও "তংগুর" নামক দুইখানি সংগ্রহ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কংগুরে ৭০০ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ আছে। তংগুরে কংগুরের অনেক গ্রন্থের টীকা ও দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যশাস্ত্র ও মন্ত্রের ও তন্ত্রের কয়েকশত গ্রন্থের অনুবাদ আছে।

স্বপ্রণীত একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থের মতে তাঁহার পিতার নাম গগন ঘোষ ও তিনি ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন। জেতারির পর কৃষ্ণগিরি বিহারের আচার্য্য রাহুল গুপ্ত তাঁহার আচার্য্য হন এবং অতীশকে সাধনমার্গে দীক্ষা দেন। উনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুরী বিহারের আচার্য্য শীলরক্ষিত অতীশকে ভিক্ষু ব্রতে দীক্ষা দেন। এই সময় অতীশ 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপনাম প্রাপ্ত হন। একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সুবর্ণ দ্বীপে (পেগুর সুধর্ম্মপুর, বর্ত্তমান থাটন) মহাচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির নিকট গমন করিয়া তথায় দ্বাদশ বৎসর অবস্থানের পর সিংহল ও কতিপয় বনময় দ্বীপ পরিদর্শনান্তে মগধে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় তিনি ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। বজ্রাসনে (বোধগয়া) বাসকালে তিনি তিনবার তার্কিকগণকে ধর্ম্মবিষয়ের বিচারে পরাস্ত করেন। গৌড়েশ্বর মহীপাল(১ম) ১০২৬ খৃষ্টাব্দের পর কোন সময়ে তাঁহাকে বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান আচার্য্য পদে বরণ করেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতরাজ লামা জে-সে-হোড্ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তুর্কিস্থানের মুসলমান রাজার সহিত যুদ্ধে জে-সে-হোড বন্দী হইয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবার চারি বৎসর পর ভ্রাতুষ্পুত্র চান্-চুব তিব্বতের রাজা হইয়া নাগ্‌ছো নামক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণপত্রসহ অতীশের নিকট দূত প্রেরণ করেন। নাগ্‌ছো তিন বৎসর মগধে থাকিয়া অতীশকে সম্মত করাইয়া ১০৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লইয়া তিব্বতে প্রত্যাগমন করেন। পথিমধ্যে নেপালরাজ অনন্তকীর্ত্তি তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। তিনি নেপাল হইতে গৌড়েশ্বর নয়পালকে উপদেশ দিয়া এক পত্র লেখেন। তাহার নাম "বিমলরত্ন লেখ"। তিব্বতের গু-জে প্রদেশে পৌছিলে তিব্বতরাজ চান্-চুবের প্রেরিত শ্বেত পরিচ্ছদ-ধারী একশত অশ্বারোহী কুড়িটি সাটিনের ছত্র ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহ "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে রাজার নামে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর তাঁহাকে গু-জে-র রাজধানী থে ডিং নগরে লইয়া যাওয়া হয়। পথিমধ্যে তিনি সাতদিন মানস সরোবরে অতিবাহিত করেন। গু-জে প্রদেশে নিরাভোগ বিহারে তিনি দুই বৎসর থাকিয়া "লোকাতীত সপ্তাঙ্গবিধি" নামক গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। অতঃপর তিনি মধ্যতিব্বতে লাসা নগরে গমন করেন। লাসা হইতে কোন এক বৌদ্ধ বিহারে গমন কালে পথিমধ্যে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতীশের সমাধি মন্দিরের নাম গ্রো-মো (Sgro-Mo)। তিব্বতে ঙ্গে-মঙে তিনি একটি বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন (The Land of Snow by David Mc Donald. P. 40)।

তিব্বত যাত্রার পূর্ব্বে কোন সময়ে অতীশ কিছুকাল বরেন্দ্রভূমির সোমপুর বিহারে[১] থাকিয়া ভাববিবেকের "মধ্যমক-রত্নপ্রদীপ" গ্রন্থখানির তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন (Catalogue of Temgur)। বজ্রযান ও কালচক্রযানের বহুসংখ্যক ও মহাযান সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তিব্বতের ক-দং-প (Jka gdams-pa) নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধ দেবতা তিন মস্তক, চারি হস্ত ও চারি পদ বিশিষ্ট হয়গ্রীব ধর্ম্মপালের মূর্ত্তি অতীশের প্রার্থনায় প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। তিব্বতীয়গণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে।

চক্রদত্ত প্রভৃতি চিকিৎসাগ্রন্থের প্রণেতা চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণদত্ত নয়পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ও তদগ্রজ ভানুদত্ত তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন (চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস সেনের টীকার সমাপ্তি শ্লোকঃ)।

বিগ্রহপাল (৩য়) (১০৫৫-১০৭২ খৃঃ)

তৃতীয় বিগ্রহপালের ১৭শ রাজ্যবর্ষে তিনি কাঞ্চনপুর জয়স্কন্দাবার হইতে তীরভুক্তির বসুকাগ্রামাংশ ক্রোড়ঞ্চ বিনির্গত ঘণ্টক শর্ম্মাকে দান করেন (প্রবাসী ১৩৫৮, ফাল্গুন) ও তাঁহার রাজ্যের ১১শ বর্ষে (বেলওয়া লিপি, সাঃ পঃ পত্রিকা, ৫৬ বর্ষ, পৃঃ ৬০) ও ১২শ বর্ষে (আমগাছি লিপি) পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির যথাক্রমে কালিত-বিথী বিষয়ে ও কোটিবর্ষ বিষয়ে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করেন।

নয়পালের সহিত সন্ধি করিয়া কলচূরী কর্ণ (১০৪১-১০৭৩ খৃঃ) নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি পরমার ও চন্দেল্লগণের প্রভাব ধ্বংস করিয়া মহানদীর উত্তর উপত্যকা পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তার এবং গৌড় ও বঙ্গ পুনরায় আক্রমণ করেন। কলচুরী ক্ষোদিত লিপিগুলিতে বলা হইয়াছে যে, কর্ণের ভয়ে বঙ্গ কম্পিত ও গৌড় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। বীরভূম জেলার পাইকড় গ্রামে কর্ণের একটি ক্ষোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি উত্তর রাঢ়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যায়। কিন্তু অবশেষে তিনি বিগ্রহপালের হস্তে পরাজিত হইয়া কন্যা যৌবনশ্রীকে বিগ্রহপালের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (রাম চরিতং ১।৯)।

১। সোমপুর মহাবিহারবাসী সামতটিক [সমতটদেশীয়] শ্রীবীর্য্যেন্দ্র ভদ্র বোধিগয়ায় একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপন করেন ও তাহার পাদপীঠে লিপি ক্ষোদিত করান (সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩২৩ সাল, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৯)।

দ্বিতীয় গোপালদেবের (৯৪০-৯৬০ খৃঃ) পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গের কতকাংশ (রোহিত গিরি বা কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের) চন্দ্রবংশীয়গণের হস্তে চলিয়া গিয়াছিল। শ্রীচন্দ্রের পাঁচখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্থ ধুল্লাশাসন শ্রীচন্দ্রের ৩৫ রাজ্যাব্দে ও পঞ্চম মদনপুর শাসন তাঁহার ৪৪ রাজ্যাব্দে (ভারতবর্ষ, ১৩৫৩, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৫১৪) বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্দাবার হইতে প্রদত্ত হয়। এই শাসনলিপি হইতে জানা যায় যে, রোহিতাগিরি-ভোগী ("রোহিতা গিরি ভুজাং") চন্দ্রদিগের বংশে পূর্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র সুবর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। তিনি হরিকেল-রাজ ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতাশ্রীর আধার ("হরিকেলরাজ ককুদ স্মিতাগাং শ্রীয়াং আধারঃ") ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীকাঞ্চনার গর্ভে পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত শ্রীচন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে (১০২১-২৩ খৃঃ) অপর একজন চন্দ্রবংশীয় রাজার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম গোবিন্দ-চন্দ্র। ইঁহাকে বঙ্গাল দেশের রাজা বলা হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের ১২ সম্বৎসরে ফরিদপুর জেলার কুলকুড়ি গ্রামে একটি প্রস্তরময় সূর্য্যমূর্ত্তি ও ২৩ সম্বৎসরে ঢাকা জেলার কেতকা (টঙ্গীবাড়ী) গ্রামে একটি প্রস্তরময় বাসুদেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয়ের পাদপীঠের লিপি হইতে ইহা জানা যায়।

শ্রীচন্দ্রই বোধহয় বিক্রমপুর অধিকার করিয়া বঙ্গাল দেশের স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাজা হইয়াছিলেন এবং বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। গোবিন্দচন্দ্র বোধহয় শ্রীচন্দ্রের বংশধর ছিলেন। কর্ণের পৌত্র গয়কর্ণের পত্নী অহ্লণা দেবীর ভেড়াঘাট লিপিতে লিখিত আছে যে, কর্ণের ভয়ে কলিঙ্গের সহিত বঙ্গরাজ কম্পিত থাকিতেন। কর্ণাটের চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের (১ম) কেলাবাড়ী শাসন (১০৫৩ খৃঃ) হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সেনাপতি (ভোগদেববর্ষ) বঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। এই সময়ের উড়িষ্যার সোম বংশীয় রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতির শোনপুর শাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি গৌড় দেশকে প্রবল আক্রমণ করিয়াছিলেন ও বঙ্গের নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এইরূপ গোলযোগের মধ্যে চেদি কর্ণ (১০৪১—১০৭০ খৃঃ) কলিঙ্গের সিংহপুরের[১] যদুবংশীয় রাজা

১। কোন কোন মতে হিউয়েন সঙ্গ বর্ণিত পঞ্জাবের অন্তর্গত Sang-ho-pu-lo এই সিংহপুর। লক্ষ মণ্ডল লেখ মতে জলন্ধর রাজমহিষী ঈশ্বরীর পিতা সিংহপুরের যদু বংশীয় রাজা ছিলেন। এই লিপিতে সিংহপুরের যাদব বংশীয় বর্ম্মা উপাধিধারী দ্বাদশজন রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু Sten Konow কলিঙ্গ

বজ্রবর্ম্মার পুত্র জাতবর্ম্মার সহিত নিজ কন্যা বীরশ্রীর বিবাহ দিয়া জামাতা জাতবর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া বিজয়াভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মার পৌত্র ভোজবর্ম্মার বেলাব শাসন লিপিতে লিখিত আছে, এই যদুবংশে বীরশ্রী ও হরি বহুবার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই হরির বান্ধব বর্ম্মণগণ সিংহপুরে রাজত্ব করিতেন "ভেজে সিংহপুরম্।" এই বংশের বজ্রবর্ম্মা যাদবচমূর "সমর-বিজয়যাত্রার মঙ্গলস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাতবর্ম্মা কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, অঙ্গের শ্রীকে প্রোথিত করিয়া, কামরূপের শ্রীকে পরাভূত করিয়া, দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে শ্রীদান করিয়া সার্ব্বভৌম শ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন।"[১] এই সময় অঙ্গদেশে সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট বংশীয় মহনদেব পালরাজদের সামন্তরাজ ছিলেন, কামরূপে রত্নপালের রাজত্ব চলিতেছিল[২], কৈবর্ত্ত নায়ক দিব্য গৌড়েশ্বর বিগ্রহপালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন (রামচরিতং ১।৩৮ শ্লোকের টীকা), ভবদেব ভট্টের পিতামহ আদিদেব (চন্দ্রবংশীয়) বঙ্গপতির বিশ্রামসচিব সান্ধিবিগ্রহিক ও মহাপাত্র এবং পিতা গোবর্দ্ধন বীরস্থলীতে ও রাজসভায় "বীরস্থলীষু চ সভাষু চ প্রসিদ্ধ" ছিলেন (ভবদেব ভট্টের শিলালিপি)। জাতবর্ম্মা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা যে বঙ্গরাজের সেনাপতি গোবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়াছিলেন সেই বঙ্গপতি বোধহয় গোবিন্দচন্দ্রের বংশধর ছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালের পঞ্চম রাজ্যাব্দের একখানি গয়া লিপিতে গয়ার রাজা [পরিতোষের পৌত্র ও শূদ্রকের পুত্র] বিশ্বরূপকে শত্রুহন্তা বলা হইয়াছে। বিশ্বরূপের পুত্র যক্ষপালের একখানি শিলালিপিতে রাজা শূদ্রক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি শত্রুগণকে অরণ্যে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এই লিপিতে আরও লিখিত হইয়াছে যে, "শ্রীশূদ্রকঃ স্বয়ম পূজয়ৎ ইন্দ্রকল্পো গৌড়েশ্বরোনৃপতিং তক্ষণ পূজায়াং" [ইন্দ্রতুল্য গৌড়েশ্বর নৃপতিকে তক্ষণ পূজায় শূদ্রক সম্মানিত করিয়াছিলেন]।

রাজ্যের অপর এক সিংহপুরের বর্ম্মা উপাধিধারী কলিঙ্গরাজগণের উল্লেখ করিয়াছেন। কলিঙ্গপতি মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মণ ও মহারাজ উমাবর্ম্মণ সিংহপুর হইতে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছেন (D. U. S., No. 11, 2, 3,)।

১। জাতবর্ম্মার তাম্রশাসন।

২। রত্নপালের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

বিগ্রহপাল (৩য়) ও জাতবর্ম্মা কর্ণের দুই কন্যা যৌবনশ্রী ও বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া যথাক্রমে গৌড়রাজ্য ও বঙ্গরাজ্যের অধিপতি থাকিয়া অনুমান ১০৭২ খৃঃ উভয়ে পরলোকগমন করেন (সাঃ পঃ পত্রিকা, ৫২ ভাগ, পৃঃ ১০৬)।

মহীপাল (২য়) (১০৭২-১০৭৫ খৃঃ)
শূরপাল (২য়) (১০৭৫-৭৭ খৃঃ)
রামপাল (১০৭৭-১১২০ খৃঃ)

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র ছিল—(১) মহীপাল ২য়, (২) শূরপাল ২য়, (৩) রামপাল। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীপাল রাজা হন। রাজা হইবার পর তাঁহাকে খল-স্বভাব ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিল, এই রামপাল ক্ষমতাশালী, সুযোগ্য ও সর্ব্বসম্মত, সুতরাং মহারাজের রাজ্য গ্রহণ করিবে। এই কথা শুনিয়া মহীপাল, রামপাল তাঁহাকে হত্যা করিবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, যে কনিষ্ঠ রামপাল বিপদকালে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত সেই রামপালকে বহুতর শঠতা প্রয়োগে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল (রামচরিতং ১।৩৭)। "সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী অনীতিক রাজা মহীপাল, রামপাল আমার লক্ষ্মী হরণ করিবে এইরূপ অলীক মায়ার মুগ্ধ হইয়া, রামপালকে ভূগর্ভস্থ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন" (রামচরিতং ১।৩৬)।

মহীপাল রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া [এই প্রকার] অনীতিক কার্য্যে রত হইলে অনন্ত সামন্ত চক্র বিদ্রোহী হইয়া রণচতুর চতুরঙ্গ সেনাদল লইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। তাহাদের সহিত সুশিক্ষিত মদমত্ত হস্তী, তুরঙ্গ, রণতরী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। ষড়গুণশালী মন্ত্রিগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার দ্রুতগামী সৈন্যদল হইতে কিছু সৈন্য লইয়া মহীপাল বিদ্রোহীগণের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অতিশয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে অস্ত্রচ্যুত, ভীত ও মুক্তকুন্তল অবস্থায় পলায়ন করিল। এইরূপে বলবিপর্য্যয় ঘটায় তিনি কষ্টকর সমর সাগরে ডুবিয়া গেলেন (রামচরিতং ১।৩১)। যুদ্ধের সময় শূরপাল ও রামপাল শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কারাগারে ছিলেন। যুদ্ধের পর দেখা গেল, রাজ্যপাল, কুমারপাল, মদনপাল ও বিত্তপাল—এই পুত্রগণসহ রামপাল মাতুল অঙ্গাধিপতি মহনদেবের আলয়ে রহিয়াছেন এবং শূরপাল রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ যুদ্ধের গোলযোগের সুযোগে তাঁহারা পলায়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনন্তর [পালরাজাদের] জনকভূমি চাষ-বাসে অলঙ্কৃতা কমনীয়া বরেন্দ্র ভূমি পালরাজলক্ষ্মীর অংশভোগী অতিশয় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ [মিত্রের] ছদ্মবেশধারী শত্রু দিব্যক কর্ত্তৃক গৃহীতা

হইল (রা, চ, ১৩৭)। এইরূপে গৃহীতা ভীতা বরেন্দ্রী ক্রমান্বয়ে দিব্যক [সম্ভবতঃ তদীয় ভ্রাতা রুদ্রক] ও রুদ্রকের পুত্র রন্তপ্রহারী, কর্ম্মদক্ষ ভীমের রক্ষণীয়া হইল (রা, চ, ১৩৯)। জনকভূ বরেন্দ্রী শত্রু কর্ত্তৃক গৃহীতা ও ভুজ্যমানা হওয়ায় [এবং সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শূরপালের মৃত্যু হওয়ায়] রামপালের নিকট তাঁহার মহামারক ভুজদ্বয় বিফল ও মাতৃবন্ধুগণকে প্রাপ্ত হইয়াও পুত্রগণসহ নিজ শৌর্য্য মিথ্যা মনে হইতে লাগিল (রা, চ, ১৪০)। অবশেষে তিনি অমাত্য এবং পুত্রগণসহ বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া রাজ্যোদ্ধারে লব্ধোত্থম হইলেন (রা, চ, ১৪২)। অনন্তর মিত্রকল্প সামন্তগণের সাহায্য লাভার্থে তাঁহাদের রাজ্যে ভ্রমণ করতঃ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক (রা, চ ১৪৫) প্রত্যন্তবাসী সামন্তগণকে তিনি বিপুল ভূমি ও ধন বিতরণে অনুকূলিত করিলেন (রা, চ ১৪৬)। প্রভু রামপালের আদেশে মাতুল মহনদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গ রাজ্যের মহাপ্রতীহার শিবরাজ স্বীয় বিখ্যাত গজ ও তুরঙ্গ সৈন্যসহ দুস্তর "মহাতটিনী" [গঙ্গা ?] উত্তীর্ণ হইয়া বরেন্দ্রীতে পদার্পণ করিলেন (রা, চ, ১৪৭)। তিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের সম্পত্তির কোন অনিষ্ট হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিলেন। বরেন্দ্রীর ভীম-ব্যূহ শিবরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইল এবং সর্ব্বত্র ভীমের রক্ষাসমূহ ভগ্ন হইল (রা, চ, ১৪৯)। অতঃপর শিবরাজ প্রভু রামপালের নিকট বরেন্দ্রীর অবস্থা গোপনে নিবেদন করিলেন (রা, চ, ১৫০)।

মাতুল অঙ্গাধিপ মহনদেব ও তাঁহার দুই পুত্র মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব ও ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজকে রামপাল তাঁহার উভয় ভুজদণ্ড-রূপে প্রাপ্ত হইলেন। কান্যকুব্জরাজের অশ্ববাহিনীর পরাভবকারী মগধ-পীঠিপতি [সম্ভবতঃ দেবরক্ষিতের উত্তরাধিকারী] বন্দনীয় ভীমযশঃ, নানারত্নশোভিত ভয়ঙ্কর কোটাটবীর (উড়িষ্যার সরকার কটকের অন্তর্গত কোট মহল) দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্ত্তী বীরগুণ, উৎকলের অধিরাজ কর্ণকেশরীর পরাভবকারী দণ্ডভুক্তিপতি জয়সিংহ, সন্নিহিত দিকচক্রবালসদৃশ বালবলভীর তরঙ্গবলয়স্থিত নৌবহর দ্বারা শত্রুকে গলহস্ত প্রদানে সমর্থ দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজ, সমস্ত অরণ্য সামন্তচক্র-চূড়ামণি অপরমন্দার-মধুসূদন [হুগলী জেলার গড় মন্দারণ] লক্ষ্মীশূর, করিগর্ব্ব-চূর্ণকারী কেশরীতুল্য প্রতিপক্ষ দর্পচূর্ণকারী কুজবটীপতি শূরপাল, বনবিধ্বংসী অনলবৎ পার্ব্বত্য রাজ্যাধিপগণের দর্পচূর্ণকারী তিলকম্প কল্পতরু রুদ্রশেখর, খরতর বারিধারায় ন্যায় বৈরীবাহিনীর রুধির দ্বারা লোহিতার্ণব সৃষ্টিকারী উচ্ছাল-পতি ময়গল সিংহ, প্রতিপক্ষের কক্ষনিহিত সৈন্য বিমর্দ্দনকারী দারুণগতি ও

ভয়ঙ্কর ঢক্কারবে ভ্রণ-বিভ্রংশী ঢেক্করীয়রাজ প্রতাপ সিংহ, কযলের মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জ্জুন, সঙ্কট গ্রামের চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবর্দ্ধন (গোবর্দ্ধন), পদুবন্ধা (পদুয়া পাবনা) মণ্ডলের একচ্ছত্রাধিপতি সোমপ্রমুখ সামন্তগণ রামপাল পক্ষে মিলিত হইলেন। রামপাল এই মহাসৈন্যদল চালিত করিতে করিতে নৈকামেলক দ্বারা "মহাবাহিনী" উত্তীর্ণ হইয়া "উত্তর কূলং" উত্তর পারের সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিলেন (রা, চ, ২।৫-৬)।

অতঃপর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বিড়ম্বনাবশতঃ গজপৃষ্ঠারূঢ় ভীম জীবিতাবস্থায় বলপূর্ব্বক ধৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ উৎসাহশীল রহিল (রা, চ, ২।১৭-২০)। অতঃপর ভীমের গজ-অশ্ব-মহিষ ও পদাতিক সেনা পরাভূত হইলে রামপাল ভীমকে নিজপুত্র বিত্তপালের নিকট প্রেরণ করিলেন (রা, চ, ৮২।৩৭)। ইতিমধ্যে ভীমের শক্তিশালী "অর্কভূঃ" (ভ্রাতুষ্পুত্র) হরি অমিতবলশালী ভীম-সৈন্য একত্রিত করিলেন (রা, চ, ২।৩৮)। কিন্তু কাহ্নুর দেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন (রা, চ, ৮২।৪৩-৪৪)। অতঃপর ভীম বধ্যভূমিতে নীত হইলেন (রা, চ, ২।৪৫-৪৬)। ভীমের সম্মুখে একে একে তাঁহার পরিবারবর্গের শিরশ্ছেদ করা হইল (রা, চ, ২।৪৭)। কৈবর্ত্তরাজ ("কা-রাজ" ভীম)-কে বাণসমূহে বিদ্ধ করিয়া বধ করা হইল (রা, চ, ২।৪৮)।

বহুকাল পর প্রিয়তমা বরেন্দ্রীর উদ্ধারসাধন করিয়া রামপাল ভীমের অপর্য্যাপ্ত ধনরাশির অধিকারী হইলেন (রা, চ, ৩।১)। এই বরেন্দ্রী হেম্বীশ্বর (ব্রহ্মা), চণ্ডেশ্বর নামক ক্ষেমেশ্বর (শিব), লোকেশ্বর, মহত্তারা, বিনায়ক, সক্ষেত্র দ্বাদশাদিত্য, দিক্‌পাল ও বসুগণ প্রভৃতি দেব প্রতিমা, অবিরত শাস্ত্রপাঠ-মন্দ্রিত জগদ্দল মহাবিহার[১], (মহাস্থানগড়ের নিকটস্থ) স্কন্দনগর, শোণিতপুর (প্রসিদ্ধ বাণগড়) ও একদিকে করতোয়া অপরদিকে গঙ্গা, মধ্যে অপুনর্ভবা (পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড়ের নিকটস্থ পুনর্ভবা নদী) তীর্থ দ্বারা পবিত্রীকৃতা। এই অপরিমিত পুণ্যভূমি সাঙ্গবেদে বিচক্ষণ ভগবদ্ভক্ত বিপ্রকুল ও সজ্জন অধিবাসীতে পূর্ণা। এই বরেন্দ্রী বিপুলতটা বলভী (বড়ল নদী) ও কৃশতরা কালী (যমুনা) নদীর উৎপত্তিস্থান, ও পলাশ ও অশোক বনে আবৃতা (রা, চ, ৩।২৩)। ইহা কলকণ্ঠ-কূজনমুখর কন্দ-লকুচ-শ্রীফল-লবলী (ডেহুয়া)-নাগরঙ্গা-কক্কন-পিয়াল-কানন, শ্রেষ্ঠ

১। কথিত আছে রামপালদেব জগদ্দল মহাবিহার স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ গরুড় স্তম্ভ হইতে ৩ মাইল দূরে জগদলা গ্রামে চিরি নদীর তীরে এই মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ধান্যক্ষেত্র, বেণুবন ও ইক্ষুক্ষেত্র দ্বারা শোভিতা (রা, চ, ৩।১৬-১৭)। এখানে ধাত্রী, প্রিয়ঙ্গু (পিপুল), এলা লতা, ধান্য গোলা, আদ্রক, পুগ (গুবাক) ও নারিকেল কুঞ্জ (রা, চ, ৩।১৮-১৯), মালতা, নাগকেশর, কেশর (বকুল), মধু (অশোক), পারিজাত, লবঙ্গলতা, কনক (চম্পক), কেতক আছে (৩।২০-২১)। অরবিন্দেন্দীবরসুরভিশীতল সলিলময় এই স্থান (৩।২২)। যেখানে ধবলধাম ও লক্ষ্মীভারে অভিরাম পুরসমূহ ও কনক-কলস-মেলকার পীবর জলধরসমূহ বর্ত্তমান (৩।২৩), যাহার শিল্পকলা কুন্তলদেশের খ্যাতিকে ম্লান, যাহা লাটদেশের কান্তিকে আবিল, অঙ্গদেশকে বশীভূত, কর্ণাটের ক্রূর দৃষ্টিকে অবনমিত, মধ্যদেশের (কান্যকুব্জ) তনিমাকে ধৃত (সীমাবদ্ধ) করিয়াছে (৩।২৪), দেবী উমার পূজোৎসবে ধূমায়িতা, অখণ্ডিত রাজবংশের ধাত্রী, অতি বিপুল উচ্চতা ও বিস্তৃতিসম্পন্না এই বরেন্দ্রী (৩।২৫)। এখানে বিশালা পুষ্করিণী, প্রিয়-গতি বৃহৎ-জলবর্ষী মেঘমালা দৃষ্ট হয়, এখানে রাজগণ আহত আর্ত্তগণকে উৎসব দান করে ও কটাক্ষ দ্বারা ভূমণ্ডল জয় করে (৩।২৬)। অরিরিক্ত করভাবে পীড়িত প্রজাগণের কর লাঘব, শত্রু কর্ত্তৃক হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিপ্রদানজনিত কষ্ট অপনয়ন ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষতা দ্বারা [এই রাজা রামপালের সময়] বরেন্দ্রী সুখী হইয়াছিল (৩।২৭), স্বদেশের সজ্জনগণ অচিরে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিল (৩।২৮)। [রামপাল] পুণ্যজনের বাসভূমি, অষ্টাদশ বিবাদশূন্যা, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণ দ্বারা অভয়প্রাপ্তা, উচ্চ দেবমন্দিরসমূহ সমন্বিতা, অমরাবতীতুল্য মুরজধ্বনি মুখরিতা, অবাধ বিদ্যা ও অর্থশালী রামাবতী নগরী নির্ম্মিত করিয়াছিলেন (৩।২৮-২৯) এবং তথায় হরিহর ["হরীশ"] মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও মেরু-শিখরতুল্য কনকময় প্রাসাদশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (৩।৩২)। এখানে শিল্পীগণ নির্ম্মিত কাঞ্চনখচিত মন্দিরে রহঃ-সঙ্গত অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয় অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল (৩।৩৯-৪০)। রাজা রামপাল তথায় অম্বুধিতুল্য তল ও বিশাল শৈলমালা সমন্বিত পুষ্করিণী খনন ও শৈলোপরি পণ্ডিতগণের জন্য তিনটি শিব মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন (৩।৪২)। তিনি নাগরাজ্য[১] অধিকার করিয়াছিলেন (৩,৪৩)। পূর্ব্বদেশীয় (বঙ্গের) বর্ম্মণ নৃপতি [হরিবর্ম্মা (১০৭২-১১১৯ খৃঃ)] আত্ম পরিত্রাণের জন্য নিজ শ্রেষ্ঠ গজ ও রথ দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিলেন (৩।৪৪)। তিনি পরাজিত উৎকলপতি ভবভূষণ সন্ততি (চন্দ্র বংশীয়) কেশরীরাজ কর্ণকেশরীর বংশধর সুবর্ণ-

---

১। মধ্য প্রদেশের বস্তার রাজ্যে খৃঃ একাদশ শতকে একটি নাগবংশ রাজত্ব করিত। "নাগ বংশোদ্ভব ভোগপুর বরেশ্বর।"

কেশরী[১]-কে অনুগ্রহ, কলিঙ্গের নিশাচর (চোড় বা চৌর)-ভীতি বিনষ্ট[২] ও সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশঙ্ক করিয়াছিলেন (৩।৪৪)। [তৎপ্রেরিত সেনাপতি অথবা সামন্ত রাজা] কামরূপাদি[৩] বিষয় জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন (৩।৪৭)। অতঃপর (বরেন্দ্রীর) রাজ-রাজভোগ্যা *অলকাসদৃশ সমৃদ্ধা সুরক্ষিতা রামাবতী নগরীতে* গমন করিয়াছিলেন (৩।৪৮)।

বৈদ্যদেবের (কমৌলী) শাসনলিপি হইতে জানা যায় যে, বৈদ্যদেবের পিতা বোধিদেব রামপালের মন্ত্রী ছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা প্রজাপতি নন্দী তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। রামপাল বিষয়সমূহের সুব্যবস্থা করিয়া পুত্র রাজ্যপাল ও তৎ কনিষ্ঠের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সস্ত্রীক রামাবতী নগরে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন (৪।৬)। চণ্ডীমৌ মূর্ত্তিলিপি তাঁহার রাজত্বের ৪২ বৎসরে ক্ষোদিত হইয়াছিল।

যথাকালে মাতুল মহনদেব গঙ্গাজলে দেহ রক্ষা করিলেন। রামপাল সেই সময় মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গের) অবস্থান করিতেছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট ঐ সংবাদ শুনিয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে গঙ্গাতীরে যাইয়া বহু ধন বিতরণ করিয়া তিনি গঙ্গায় অবগাহন করতঃ দেহত্যাগ করিলেন (৪।৯-১৯)।

১। মাদলাপঞ্জীর মতে চোড়গঙ্গ ১১৩৫ খৃঃ কেশরী বংশীয় শেষ রাজা সুবর্ণকেশরীকে পরাস্ত করেন।

২। চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গী (১০৭০-১১১৮ খৃঃ) তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে (দ্রাক্ষারাম লিপি—E. I., XII p. 138) কলিঙ্গ রাজ্য ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। রামপাল বোধহয় এই চোলরাজকে সংযত করিয়াছিলেন।

৩। এই সামন্ত বা সেনাপতিই বোধ হয় কমৌলী লিপির উল্লিখিত কামরূপ রাজ তিগ্ম্যদেব। রামপাল বোধ হয় ইঁহাকেই কামরূপ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। কর্ণাটরাজ [চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য (ষষ্ঠ)] এই সময় গৌড়দেশের প্রতি ক্রূর দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এবং কর্ণাটক সেনবংশ গৌড়ে ও কর্ণাটক নান্যদেব মিথিলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ১১০৯ খৃষ্টাব্দের রাহন শাসন হইতে জানা যায় যে, গহড় বালমদনপালের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র গৌড়রাজ (রামপালের) সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে কামরূপে ধর্ম্মপাল অথবা তৎপুত্র (জয়পাল) রাজত্ব করিতেছিলেন। তিগ্ম্যদেব তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সিলিমপুর প্রস্তরলিপিতে কামরূপরাজ জয়পালের উল্লেখ আছে।

কুমার পালদেব (১১২০-১১৩৯ খৃঃ)

রামপালদেবের সুদীর্ঘ রাজ্যকালের পর তৎপুত্র কুমারপাল রাজা হন। তাঁহার অপর দুই পুত্র রাজ্যপাল ও বিত্তপাল বোধহয় তাঁহার জীবনকালেই পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কমৌলী লিপি হইতে জানা যায় যে, বৈদ্যদেব দক্ষিণ বঙ্গের জলযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং কামরূপের সামন্তরাজ তিগ্ম্যদেবের বিদ্রোহ দমন করিয়া কুমারপালের আদেশে প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তি ও কামরূপমণ্ডলের সামন্তরাজপদ লাভ করিয়াছিলেন।

১১৩৫ খৃষ্টাব্দের শ্রীকূর্ম্মম্‌লিপি (S. H. V. No. 1335) হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্ম্মণ চোড়গঙ্গ পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব্ব দেশসমূহ জয় করিয়া গঙ্গা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বশীভূত করিয়াছিলেন। কেন্দুপত্র শাসনলিপি হইতে জানা যায় যে, চোড়গঙ্গ মন্দার রাজের রাজধানী ভগ্ন করেন[1]। রামচরিতং হইতে জানা যায় যে, মন্দার রাজ্যের রাজা লক্ষ্মীশূর বরেন্দ্রীযুদ্ধে রামপালের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। হুগলী জেলার আরামবাগ থানার গড়মন্দারণ এই মন্দার রাজ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। মনে হয় কমৌলীলিপি বর্ণিত দক্ষিণ বঙ্গের জলযুদ্ধ অনন্তবর্ম্মণ চোড়গঙ্গের সহিত হইয়াছিল। [সামন্তরাজ] মন্দারপতি যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর বোধহয় বৈদ্যদেব গৌড়েশ্বরের নৌবাহিনী লইয়া চোড়গঙ্গকে (১০৭৮-১১৪২ খৃঃ) আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে জলযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেবের কমৌলী লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি বৈশাখ মাসে বিষুব সংক্রান্তি একাদশী তিথিতে তাঁহার রাজ্যের ৪র্থ বর্ষে প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তির কামরূপমণ্ডলে বরেন্দ্রবাসী কৌশিক গোত্র শ্রীধর নামক ব্রাহ্মণকে হংসাকোঞ্চী জয়স্কন্দাবার হইতে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন। জ্যোতিষিক গণনা

১। "আরম্যনগরাৎ কলিঙ্গজবলপ্রত্যুগ্র-ভগ্নাবৃতি
প্রাকারায়ত তোরণ প্রভৃতিতো গঙ্গাতটস্থাত্ততঃ।
পার্থাস্ত্রৈর্যুধি জর্জ্জরীকৃত নমদ্রাধেয়গাত্রাকৃতি
মন্দরাধিপতির্গতো রণভূবো গঙ্গেশ্বরাদ্দ্রুতঃ॥"

[প্রত্যুগ্র কলিঙ্গ সৈন্য দ্বারা বৃতি, প্রাকার, আয়তন, তোরণ প্রভৃতি ভগ্ন হইলে গঙ্গরাজ (চোড়গঙ্গ) দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পার্থাস্ত্র দ্বারা জর্জ্জরীকৃত কর্ণের ন্যায় মন্দারপতি (লক্ষ্মীশূর?) গঙ্গাতটস্থ আরম্য নগরের বনভূমি হইতে অবনত গাত্রে পলায়ন করিয়াছিলেন।]

দ্বারা জানা যায় যে, ১০৭৭, ১০৯৬, ১১২৩, ১১৪১ ও ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে একাদশী তিথিতে বিষুব সংক্রান্তি ঘটিয়াছিল। উক্ত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী ভিনিস সাহেব ঐ কয়েকটি তারিখের মধ্যে ১১৪১ খৃষ্টাব্দকেই তাম্রশাসন দানের সময় বলিয়া মনে করেন (Epi-Ind. Vol II, p. 359)। সম্ভবতঃ ১১৩৯ খৃঃ কুমারপালের মৃত্যুর পর বৈদ্যদেব স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার রাজ্যের ৪র্থ বৎসরে ভূমিদান করিয়াছিলেন। কারণ তাম্রশাসনে বৈদ্যদেব নিজেকে "পরম মাহেশ্বর পরম বৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কামরূপ জেলার (বেটনার নিকট) বৈদরগড় নামে একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ইহাকে বৈদ্যদেবের গড় বলিয়া মনে করেন।

গোপালদেব (৩য়) (১১৩৯-১১৪৪ খৃঃ)

গোপালদেব সম্বন্ধে রামচরিতম্ (৪।১২)-এ বলা হইয়াছে, "কুমারপালের পুত্র গোপাল শত্রুপক্ষ দ্বারা নিহত হন। এই দুর্বিনীত হন্তা হস্ত্যধ্যক্ষের মৃত্যুও সেই সময়ে হইয়াছিল"[১]। মদনপালের মন্‌হলি লিপিতে এই গোপালদেব সম্বন্ধে লিখিত আছে, "সেই কুমারপাল গোপাল নামক রাজার জনক ছিলেন। শৈশবে ধাত্রী ক্রোড়ে পালিত হইবার সময় জৃম্ভমান মহিমাবিশিষ্ট কীর্ত্তিময় যে রাজা কর্পূররূপ ধূলি নিক্ষেপ দ্বারা নিজ ক্রীড়া বিস্তার করিয়াছিলেন"। বিবরণ হইতে মনে হয় গোপাল (৩য়) রাজা হইয়া শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার হন্তা ছিল হস্ত্যধ্যক্ষ।

রাজসাহী জেলার মান্দা নামক গ্রামে প্রাপ্ত গোপালদেবের (৩য়) নাম সংযুক্ত শিলালিপির মর্ম্ম কতকটা এইরূপ—

["শ্রীগোপালদেব স্বেচ্ছয়া ত্যক্তকায়ঃ"] শ্রীগোপালদেব স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে পুরসেনের "পুরসেনস্য" নিশিত শরশত দ্বারা কৃতজ্ঞ

১। "অপি শত্রুঘ্নোপায়াদ্গোপালঃ স্বর্জ্জগাম তৎ সূনুঃ।
হন্তঃ কুম্ভীনস্যাস্তনয়স্যতস্য সাময়িকমেতৎ ॥ (৪।১২)

অর্থাৎ তৎসূনুঃ তস্য কুমারপালস্য নন্দনঃ গোপালঃ শত্রুঘ্নোপায়াৎ শত্রু নিপাতনোপায়াৎ স্বর্জ্জগাম অমিত্রোপায়োবলম্বনং তস্য মৃত্যুহেতুঃ আসীৎ। এতস্য অস্তনয়স্য দুর্বিনীতস্য হন্তঃ মারকস্য কুম্ভীনস্য [কুম্ভী (হস্তী)+ইন (পতি) তস্য] হস্ত্যধ্যক্ষস্য এতৎ মরণং অপি সাময়িকং তৎসাময়িকং।

রাজা শুভদেবের পুত্র রাজা ঐড়দেব হত হইয়া স্বর্গে গমন করতঃ দেবতা হইয়া সুরসুন্দরীগণের কটাক্ষের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তারপর ঐড়দেবের অনুগত জনেরা, যাঁহার প্রশংসা করেন সেই দানবীর শ্রীমান ভাবক দাস জয়যুক্ত হউক। যে শরসন্ধান স্থানে সে দগ্ধ হইয়াছিল তথায় ভাবক দাস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ এই শিলালিপি শোভা পাইতেছে "রাতোক ইহার লেখক।" (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১৫৫-৫৬)।

এই শিলালিপির ভাষা এত অশুদ্ধ যে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। মনে হয়, রাজা শুভদেবের পুত্র রাজা ঐড়দেব কর্ত্তৃক শ্রীগোপালদেব নিহত হইলে পুরসেন ("পুরসেনস্য") নামক কোন ব্যক্তির শর দ্বারা ঐড়দেব হত হন। ঐড়দেবের অনুগত ভাবক দাস ঐড়দেবের স্মরণার্থে এই লিপি স্থাপন করেন। এই ঐড়দেবই বোধহয় পালরাজার হস্ত্যধ্যক্ষ ছিলেন।

মদনপালদেব (১১৪৪-১১৬২ খৃঃ)
পট্টমহিষী চিত্রমতিকা দেবী

তৃতীয় গোপলদেবের পর রামপালের মদনদেবী নাম্নী মহিষীর গর্ভজাত অপর পুত্র মদনপালদেব রাজা হন (রা, ৮৪।১৩)। ১০৮৩ শকাব্দের (১১৬১ খৃঃ) ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মদনপালদেবের ১৮শ রাজ্য সম্বৎসরের একখানি শিলালিপি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশনের নিকট আবিষ্কার করিয়া তৎসম্বন্ধে ১৩৫৭ সালের আষাঢ় সংখ্যার ভারতবর্ষ পত্রিকায় ৪৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেন। ইহা হইতে প্রমাণিত-হয় যে, মদনপালদেব ১১৪৪ খৃঃ রাজা হইয়াছিলেন এবং অন্ততঃ ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। মদনপালের অষ্টম রাজ্যাব্দের মনুহলি শাসন রামাবতী জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, ভীমদেব মদনপালের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। বঙ্গপতি শ্যামলবর্ম্মার (১১১৮-৫৩ খৃঃ) বজ্রযোগিনী তাম্রশাসনেও এই ভীমদেবের উল্লেখ আছে। ইহাতে জানা যায় যে, সান্ধিবিগ্রহকারক শ্রীভীমদেবকৃত প্রজ্ঞাপারমিতা [মন্দিরের] জন্য রাজা শ্যামলবর্ম্মা কিছু ভূমি তাম্রশাসনের দ্বারা দান করেন।[১] এই তাম্রশাসনের ৫ম শ্লোকে একটি

১। "[সান্ধিবিগ্রহ] কারক শ্রীভীমদেব কারিত * * প্রজ্ঞাপারমিতা ভট্টারিকা * * শ্রীশ্যামলবর্ম্মদেবেন পুণ্যে অহনি বিধিবদুদক পূর্ব্বক কৃত্বা * * ভূমিছিদ্রন্যায়েন * * [তাম্রশাসনীকৃত্বা প্রদত্তা]" (১৩৪০ সালের ভারতবর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা)।

যুদ্ধের কথা আছে। 'যদ্বাঙ্গ' কথা থাকায় উক্ত শাসনের পাঠোদ্ধারকারী ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় মনে করেন যে, যুদ্ধ বঙ্গেই হইয়াছিল। এই শাসনের প্রমাণে তিনি আরও মনে করেন যে, হরিবর্ম্মা (১১৭২-১২১৮ খৃঃ) ও শ্যামলবর্ম্মা উভয়েই জাতবর্ম্মার পুত্র ছিলেন।

বারানসীর নিকটে প্রাপ্ত এই ভীমদেবের একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, "গৌড়রাজের যশোদেব নামে একজন সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তাঁহার পুত্র বঙ্গদেব গৌড়েশ্বরে রাণক পদ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র ভীমদেব গৌড়েশ্বরের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তিনি বারানসীতে একটি শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। ভীমদেব কামরূপরাজ রায়ারি বংশীয় নৃপতি ও কলিঙ্গ রাজের আক্রমণজনিত আসন্ন ধ্বংস হইতে গৌড় বরেন্দ্র রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন"।১

১১০৭ শকাব্দে (১১৮৫ খৃঃ) প্রদত্ত বল্লভদেবের তেজপুর তাম্রশাসনে (Epi. Ind. Vol. V, p. 183-95) দৃষ্ট হয় যে, চন্দ্রবংশীয় বল্লভদেবের প্রপিতামহের নাম ভাস্করদেব, পিতামহের নাম রায়ারিদেব ত্রৈলোক্য সিংহ, পিতার নাম উদয়কর্ণ নিঃশঙ্ক সিংহ। রায়ারিদেব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "রাজা রায়ারিদেব বঙ্গাগত গজেন্দ্রসমূহের সমাগমে আড়ম্বরযুক্ত যুদ্ধোৎসবে রণস্থলে শত্রুগণকে সম্পূর্ণভাবে অস্ত্র পরিচালনে নিরস্ত করিয়াছিলেন২। তিনি স্বয়ং স্বকার্য্যপ্রভাবে ত্রৈলোক্য সিংহ নাম সফলিত করিয়াছিলেন।"

পূর্ব্বোক্ত 'রায়ারিবংশনরনাথ' সম্ভবতঃ রায়ারিদেবের পুত্র উদয়কর্ণ [১'৫০ খৃঃ] ও কলিঙ্গরাজ বোধহয় অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪২ খৃঃ)। এই যুদ্ধ বোধহয় বঙ্গে হইয়াছিল এবং বঙ্গের সামন্তরাজ শ্যামলবর্ম্মা বোধহয় ইহাতে লিপ্ত হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর মদনপালদেবের সান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেবের মন্ত্রণাবলে বোধহয় এই যুদ্ধে গৌড়েশ্বরের পক্ষ জয়ী হইয়াছিল। রামচরিতং [৪।২৩]-এ লিখিত আছে, মদনপাল 'আকুল গ্রাম' [আক্রান্ত জনপদ] হইয়া দেবতুল্য

১। "রায়ারি বংশ নরনাথ-কলিঙ্গরাজ-মৃগ্যরিবীরবলবারিধি মধ্যগুপ্তং।
যেনোদধারি গুরুগৌড় বারেন্দ্র রাজ্যং মজ্জৎ পুরাতন বহিত্র
চরিত্রচারিণা॥"

২। "যেনাপাস্ত-সমস্ত শস্ত্র-সমরঃ সংগ্রামভূমৌ রিপু-
শ্চক্রে বঙ্গকরীন্দ্রসঙ্গবিষমে সাটোপযুদ্ধোৎসবে।
যেনাত্যর্থময়ং স্বয়ং সফলিতঃ ত্রৈলোক্যসিংহ বিধিঃ
সোঽভূদ্ভাস্করবংশ-রাজতিলকঃ রায়ারিদেবো নৃপঃ॥"

একজন রাজার সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই রাজা বোধহয় শ্যামলবর্ম্মা।

মদনপাল কালিন্দী [মালদহ সহরের উত্তর-পশ্চিম] তীরে শত্রু সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন (রা, চ, ৪।২৭)। এই শত্রু মিথিলাপতি নান্যদেব [১০৯৭-১১৪৭ খৃঃ][১] মদনপাল গোবর্দ্ধন নামক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন (রা, চ, ৪।৪৮)। এই গোবর্দ্ধন বোধহয় কৌশাম্বীপতি গোবর্দ্ধন[২]। বিজয়সেনের দেবপাড়া-শিলালিপি হইতে জানা যায়, তিনি "গৌড়েন্দ্র মদ্রবং" গৌড়েন্দ্রকে পলায়িত করিয়াছিলেন। এই গৌড়েন্দ্র মদনপাল স্বয়ং। তিনি পলায়ন করিয়া বোধহয় মগধে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১১৫২ খৃষ্টাব্দের সমকালে মদনপাল বিজয়সেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়দেশ ত্যাগ করেন।

১১২৪ খৃষ্টাব্দের মানের শাসন হইতে জানা যায়, ঐ সময়ে গহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্র পাটনা জেলায় প্রবেশ করিয়াছেন। ১১৪৬ খৃষ্টাব্দের লার শাসন হইতে জানা যায় যে, ঐ সময় গহড়বালরাজ জয়চন্দ্র মুঙ্গের জেলাধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মদনপালের ১৪ রাজ্যাব্দের মুঙ্গের জেলার জয়নগরের মূর্ত্তিলিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ১১৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মদনপাল মুঙ্গের পুনরধিকার করিয়াছিলেন। গহড়বালদের সহিত এই যুদ্ধে মহনদেবের পৌত্র ও সুবর্ণদেবের পুত্র চন্দ্রদেব মদনপালের সহায়তা করিয়াছিলেন [I. H. Q. Vol V, p. 35 ও রামচরিতং (১।১৬-২১)]।

গোবিন্দপাল (১১৬২-১১৭৫)

১২৩২ বিক্রমাব্দের আশ্বিন মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে (১১৭৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর) গয়ায় উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে জানা জানা যায় যে, উহা গোবিন্দপালের ১৪শ গত রাজ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল (J. R. A. S. New Series Vol VIII 1876 p. 3) "শ্রীগোবিন্দপালদেব গত রাজ্যে চতুর্দ্দশ সম্বৎসরে"। ১১৭৫ খৃঃ হইতে ১৪ বৎসর পূর্ব্বে ১১৬২ খৃঃ পাওয়া যায়। ঐ সময়ে মদনপালের রাজ্য শেষ হওয়ায় ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, গোবিন্দপাল ঐ

১। নান্যদেবকৃত ভরত নাট্যশাস্ত্রের টীকার সমাপ্তি স্থলে বলা হইয়াছে যে, নান্যদেব গৌড় ও বঙ্গের শক্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

২। টীকাকার (৩৬) শ্লোকের টীকায় কৌশাম্বীপতি 'বর্দ্ধন'কে 'দ্বোরপবর্দ্ধন' বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা নকলকারের ভুল বলিয়া বোধ হয়। ইহা সম্ভবতঃ 'গোবর্দ্ধন' হইবে।

বৎসরেই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। নালন্দায় লিখিত একখানি অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির পুষ্পিকায় লিখিত আছে, "পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ গোবিন্দপাল দেবস্য বিজয়রাজ্যে সম্বৎসরে ৪।" গোবিন্দপালের ৩৮ সম্বৎসরের লিখিত একখানি গ্রন্থের পুষ্পিকায় গোবিন্দপালকে গৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে। অপর গ্রন্থপুষ্পিকায় "শ্রীমৎ গোবিন্দপাল দেবস্যাতীত সম্বৎসর ১৮" "শ্রীমৎ গোবিন্দপাল দেবানাং বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ সম্বৎসরে" "শ্রীগোবিন্দপাল সম্বৎ ২৪" "গোবিন্দপাল দেবানাং সং ৩৭" "শ্রীগোবিন্দপাল দেবানাং সং ৩৯ সম্বৎসরে" "শ্রীগোবিন্দপাল সম্বৎ ২৪" "গোবিন্দপাল দেবানাং সং ৩৭" "শ্রীগোবিন্দপালদেবানাং সং ৩৯" লিখিত দৃষ্ট হয়। গোবিন্দপালের নাম-সংযুক্ত অপর একখানি শিলালিপির ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত হইয়াছিল (A. S. C. XV. 155)। মনে হয়, ১১৬৫ খৃঃ পরে ও ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে গোবিন্দপাল রাজ্যচ্যুত হন। তাঁহার রাজ্য শেষ পর্য্যন্ত বোধহয় গয়া জেলার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার পরও বৌদ্ধগণ তাঁহার রাজ্যাব্দই ব্যবহার করিতেছিলেন। গোবিন্দপালদেবের পর পলপাল নামক (১১৬৫খৃঃ) একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি বোধহয় মুঙ্গের অঞ্চলে রাজা ছিলেন।

পালরাজগণের জাতি ও রাজধানী

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ এইজন্য তাঁহাদের তাম্রশাসনাদিতে কি কোথাও তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নাই। বরেন্দ্র ভূমি যে তাঁহাদের "জনকভূ" বা পিতৃভূমি তাহা রামপালদেবের সান্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম্ কাব্য হইতে জানা যায়। লামা তারানাথও লিখিয়াছেন যে, পালবংশের প্রথম রাজা গোপালদেব বরেন্দ্রের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে একটি ক্ষত্রিয় রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃঃ একাদশ শতকের গুজরাটের কবি সোঢ়ল স্বরচিত 'উদয় সুন্দরী কথা' নামক চম্পূ কাব্যে ধর্ম্মপালকে সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতার বংশজাত বলিয়াছেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীও 'রামচরিতম্' কাব্যে লিখিয়াছেন—

"বদনগত ভারতীক কমলাসনাতাং দধৎ প্রজানাথঃ।
বিধিরিব ধাতা জাগতো যঃ শ্রীপতি নাভিসম্ভূতঃ॥ (১।১৭)।

টীকা। কমলায়াঃ শ্রিয়ঃ আসনং আশ্রয়ঃ। শ্রীপতিঃ পার্থিবঃ যো নাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ তস্মাৎ সম্ভূতঃ। বিধিরিবেতি শ্লেষোপমা। অত্র শ্রীপতে বাসুদেবস্য

নাভিতোঽবয়বাৎ উদ্ভূতঃ। শেষং সুগমং। উভয়ত্রাপি সমং।

এই শ্লোকে রামচন্দ্র ও রামপাল উভয়কে ব্রহ্মার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তিন জনেরই মুখে সরস্বতী বাস করেন "বদনগত ভারতীকঃ"। তিনজনই লক্ষ্মীর আশ্রয় "কমলাসনতাং দধৎ", প্রজানাথ ও জগতের ধাতা। "শ্রীপতি নাভিসম্ভূতঃ" বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মার সহিত শ্লেষোপমা হইয়াছে। ঐ বিশ্লেষণের অর্থ ব্রহ্মা পক্ষে শ্রীপতি অর্থাৎ বাসুদেবের নাভিতে ইহার জন্ম। রামচন্দ্র ও রামপাল পক্ষে "শ্রীপতিঃ পার্থিবঃ যঃ নাভিঃ ক্ষত্রিয়" ক্ষত্রিয় হইতেই ইহাদের জন্ম।

কুমারপালদেবের মন্ত্রী বৈদ্যদেব তাঁহার তাম্রশাসনে (কমৌলী লিপি) লিখিয়াছেন—"এতস্য (হরেঃ) দক্ষিণ-দৃশো বংশে জাতবান পূর্ব্বং"।

বিগ্রহপালো নৃপতিঃ সর্ব্বাকারারার্দ্ধি সংসিদ্ধঃ॥" ॥২॥

অর্থাৎ সেই হরির দক্ষিণ-নয়নরূপী সূর্য্যদেবের বংশে পুরাকালে সকল গুণ গরিষ্ঠ বিগ্রহপাল নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সকল প্রমাণে পাল গৌড়েশ্বরগণ যে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহাই সিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ তাঁহারা রাষ্ট্রকূট, কলচুরী প্রভৃতি ক্ষত্রিয়কুলের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বই সূচিত হইতেছে।

'রামচরিতম্'-এর আর একটি শ্লোক এইরূপ, যথা—

"তৎকুল প্রদীপোনৃপতিরভূৎ ধর্ম্মধামবানিবেক্ষাকুঃ।
যস্যাব্ধিং তীর্ণা গ্রাবনৌ ররাজাপি কীর্ত্তিরবদাতা॥ (১।৪)

এস্থলে ধর্ম্মপালপক্ষে টীকাকার লিখিয়াছেন—

"সমুদ্রকুল দীপঃ ধর্ম্মঃ ধর্ম্মনামা ধর্ম্মপালঃ ইতিযাবৎ। নৃপতিরভূৎ। ধামবান্ তেজস্বী, ইব যথা ইক্ষাকুঃ কটুতুম্বী-উৎপ্লবতে তথা যস্য গ্রাবনৌ শিলানৌকা অব্ধিং তীর্ণা সমুদ্র প্রাসাদাৎ কীর্ত্তিরপি সমুদ্রং তীর্ণা ররাজ।"

এই শ্লোকের টীকার 'সমুদ্র কুলদীপ' বাক্যের 'কুল' শব্দের অর্থ 'বংশ' মনে করিয়া কেহ কেহ ধর্ম্মপালকে সমুদ্র বংশ সম্ভূত বলিতে চান। কিন্তু টীকার সমগ্র অংশ বিবেচনা করিলে এখানে কুল শব্দের অর্থ 'বংশ' না ধরিয়া 'কুল' শব্দের অপর অর্থ "গৃহ" ধরিতে হইবে। যথা—'কুলং গৃহং' ইতি মেদিনী। টীকাকারও "অব্ধিং তীর্ণা" কথার অর্থ প্রসঙ্গে "সমুদ্র প্রাসাদাৎ তীর্ণবতী" অর্থ করিয়া 'কুল' শব্দের অর্থ যে এখানে 'প্রাসাদ' তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। অন্যথা পূর্ব্বে কোন প্রসঙ্গ না থাকিলেও হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে 'সমুদ্র প্রাসাদ' কথার অবতারণা করিবার আর কোন কারণ দেখা যায় না। 'কুল' শব্দের এই অর্থ ধরিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিলে তাহা এইরূপ হইবে: সমুদ্র প্রাসাদের প্রদীপস্বরূপ ধর্ম্মপাল নামক

তেজস্বী নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সমুদ্র প্রাসাদ হইতে তাঁহার কটুতুম্বীর ন্যায় ভাসমান শিলা-নৌকা আকাশের ন্যায় সমুদ্র পার হইয়া অপর পার পর্য্যন্ত বিরাজ করিত। তাঁহার শুভ্র কীর্ত্তিও সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বিরাজ করিত।

সমসাময়িক লিখিত প্রমাণে পালরাজবংশ যে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত ছিলেন তাহাই প্রমাণিত হয়[১]।

কবি সন্ধ্যাকর তাঁহার কুলস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

"বসুধাশিরো বরেন্দ্রী মণ্ডল চূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ"।

(রামচরিতম্)

পদান্বয়ঃ—[সন্ধ্যাকরস্য] কুলস্থানং বসুধাশিরো বরেন্দ্রী মণ্ডলচূড়া [প্রতিবদ্ধঃ] মণিঃ [ইব আসীৎ] শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনপুর প্রতিবদ্ধঃ বৃহদ্বটুঃ পুণ্যভূশ [আসীৎ]। বৃহদ্বটুঃ – বৃহন্তঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) বটবঃ (দ্বিজাঃ) যত্রসা।

অর্থাৎ—সন্ধ্যাকর নন্দীর কুলস্থান—বসুধার শীর্ষস্বরূপ বরেন্দ্রী মণ্ডলের চূড়া শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরে প্রতিবদ্ধ অর্থাৎ স্থাপিত ছিল। তাহা শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ দ্বারা অধ্যুষিত পুণ্যভূমিও ছিল।

এখানে পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরকে বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়া বলা হইয়াছে ও বরেন্দ্রীকে পৃথিবীর শীর্ষস্থান বলা হইয়াছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরে পাল রাজগণের রাজধানী থাকার জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বরেন্দ্রী উদ্ধারের পর রাজধানী এখান হইতে রামাবতীতে স্থানান্তরিত হয়। এতদ্ব্যতীত পাটলীপুত্র প্রভৃতি নানাস্থানে পালরাজাদের জয়স্কন্দাবার ছিল।

১। লামা তারানাথ লিখিয়াছেন, পালবংশের প্রথম রাজ গোপালদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধনের একটি ক্ষত্রিয় রমণীর গর্ভে বৃক্ষদেবতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। গোপালদেব ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তৎপুত্র দেবপাল ৪৮ বৎসর, তৎপর তৎপুত্র রামপাল ১২ বৎসর, তৎপর তৎপুত্র ধর্ম্মপাল ৬৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, গোপালদেবের পুত্র না থাকায় তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে সাগরপতি সাগরপালের ঔরসে তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র জন্মে।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে, ধর্ম্মপাল অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বল্লভা দেবীর গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র জন্মে। এই সকল মিথ্যা প্রবাদ মাত্র। সমসাময়িক লিপির প্রমাণে উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

গুপ্ত ও পালসম্রাটগণের আদি নিবাস ছিল গৌড়দেশের অন্তর্গত বরেন্দ্র-ভূমিতে। কিন্তু সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট দেশ হইতে আগত। এ পর্য্যন্ত সামন্তসেনের একখানি তাম্রশাসন, বিজয়সেনের একখানি শিলালিপি ও তাম্রশাসন ও একখানি মূর্ত্তিলিপি, বল্লালসেনের একখানি তাম্রশাসন, লক্ষ্মণসেনের আটখানি তাম্রশাসন, বিশ্বরূপসেনের একখানি তাম্রশাসন ও কেশবসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে[১]। এই সকল তাম্রশাসন ও বল্লালসেনকৃত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক দুইখানি গ্রন্থ হইতে সেনরাজগণের বিষয় আমরা জানিতে পারি।

বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপিতে প্রথমে শিবকে নমস্কার করিয়া "সুধা-দীধিতি" চন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিয়া লিখিত হইয়াছে, চন্দ্রবংশে দাক্ষিণাত্যে কীর্ত্তিমন্ত বীরসেন প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাশরতনয় বেদব্যাস তাঁহাদের চরিত্র অনুধ্যান করিয়া বিশ্ববাসীর শ্রবণতৃপ্তিকর মধুর বিবরণ প্রণয়ন করিয়াছেন (৪ শ্লোঃ)। সেই সেনবংশে প্রতিপক্ষের শত শত সুশিক্ষিত সৈন্যবিনাশে সিদ্ধহস্ত ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলের শিরোভূষণ ব্রহ্মবাদী সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। সঞ্চালিত বারিধি-উচ্ছ্বাস দ্বারা সুশীতল সেতুবন্ধের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অপ্সরাগণ

১। সামন্তসেনের তাম্রশাসনখানি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ইতিহাস শাখার অধিবেশনে শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ও উহার পাঠসহ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। ঐ পাঠ ও প্রবন্ধ 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার ১৪শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যায় ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ৩৮১-৩৮৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

সামন্তসেনের লিপির পাঠ এইরূপ—

* * শাণ্ডিল্যগোত্রঃ দ্বিজ সুরেশ্বরো * * পুণ্যহেতো দানং * * ষষ্ঠগ্রামা * ধনো * ধর্ম্ম * ইষাস্ত শুক্ল প্রতি [পদদি] বসে [বিক্রমা] দিত্য নৃপাদ্ব্যতীতে ষষ্ঠাশী [গীতি পূর্ণ] সহস্রে * য় মহিমাংশু চন্দ্রমসঃ * [দ্বয়ে ক্ষৌণী) দ্রৈন্দ্র বীরসেন তস্মিন্বয়ে প্রবল প্রতাপ [বী] রাগ্র [গণ্য নৃ] প শ্রী [সা] মন্তসেন বিশ্বসেন সু [তঃ ধ] র্ম [কৃ] তাসু।

দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার (সামন্তসেনের) যুদ্ধগাথা উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া থাকে (৫ শ্লোঃ)। এই রাজা অরাতিবেষ্টিত কর্ণাটের লক্ষ্মীলুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে এত অধিক যোদ্ধা হত হইয়াছিল যে, অযাচিতভাবে তাহাদের বসা-মাংস-মেদ প্রাপ্ত হইয়া যমরাজ অদ্যাপি সেই রণস্থল ত্যাগ করেন নাই (৮ শ্লোঃ)। এই রাজা (সামন্তসেন) শেষ বয়সে ভবভয়াক্রান্ত পরিব্রাজকাচার্য্যগণপূর্ণ গঙ্গাপুলিনের বিস্তৃতারণ্যমধ্যস্থিত পুণ্যাশ্রমসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল আশ্রম যজ্ঞীয় ঘৃতের ধূমসৌরভে আমোদিত, প্রফুল্ল কৃষ্ণসার মৃগশিশুগণের ও স্তন্যদুগ্ধবতী বৈখানস রমণিগণের আবাসস্থল এবং শুকপক্ষীগণেরও সুপরিচিত ব্রহ্মবিষয়ক গ্রন্থের নিয়মিত পাঠ দ্বারা পবিত্রীকৃত ছিল (৯ শ্লোঃ)। এই সামন্তসেন হইতে হেমন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মারাঙ্কবীর ছিলেন অর্থাৎ অরাতি-ধ্বংসবিদ্যা তিনি অঙ্কে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি সত্যবাদী ও চন্দ্রশেখরের উপাসক ছিলেন (১০-১১ শ্লোঃ)। হেমন্তসেনের যশোদেবী নাম্নী রাজ্ঞী ছিলেন। সেই রাজ্ঞীর গর্ভে পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন (১৪-১৫ শ্লোঃ)।

বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসনেও সামন্তসেনকে ক্ষত্রিয়গণের শিরোভূষণ "উত্তংশ ক্ষত্রিয়াণাং" বলা হইয়াছে। বিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসনেও লিখিত আছে, "শ্রীকণ্ঠশিরোমণি চন্দ্রদেবের বংশে সেই রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহারা সদাচার চর্চ্চার খ্যাতিতে ও অগণিত অনুগ্রহে প্রাচীন রাঢ়দেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশে সামন্তসেন নামে রাজা ছিলেন (৪ শ্লোঃ)। তাঁহা হইতে হেমন্তসেন ও হেমন্তসেন হইতে অখিলপার্থিব চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন (৫-৭ শ্লোঃ)।" লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনেও উক্ত হইয়াছে, পুরাণপ্রসিদ্ধ "পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতঃ" চন্দ্রবংশীয় বীরসেনের বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়গণের কুলশিরোদাম "কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদামঃ" সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ শাসনের অন্যত্র সামন্তসেনকে "পরমব্রহ্ম ক্ষত্রিয় সুমেরু" বলা হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশীয় বেদব্যাসবর্ণিত বীরসেনের বংশে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশের ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের মতে এই বীরসেন বেদব্যাস কর্তৃক মহাভারতে (বনপর্ব ৫২-৭৯ অঃ নলোপাখ্যান-পর্ব্বাধ্যায়) কীর্ত্তিত নিষধপতি রাজা নলের পিতা বীরসেন। সামন্তসেন কর্ণাটলুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণের সহিত (রামেশ্বর) সেতুবন্ধের

নিকটে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে রাঢ়দেশের গঙ্গাপুলিনের আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নৈহাটি তাম্রশাসন অনুসারে এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশের বহু সদাচারী রাজপুত্র রাঢ়দেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশে সামন্তসেনের জন্ম। সামন্তসেনের তাম্রশাসন যদি অকৃত্রিম হয় তাহা হইলে তাঁহার পিতা বিশ্বসেন ১০২৯ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। দেবপাল হইতে আরম্ভ করিয়া মদনপাল পর্য্যন্ত পালরাজগণের তাম্রশাসনসমূহে উল্লিখিত (অন্যান্য সহ) "গৌড়-মালব খশ-হূন-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাট-ভাট সেবকাদিন্ * * আজ্ঞাপয়তি", কথাগুলি হইতে মনে হয় কর্ণাটগণ বহুকাল হইতে গৌড়দেশে উপনিবিষ্ট হইতেছিল। কর্ণাটরাজ বিক্রমাদিত্য যুবরাজ অবস্থায় ১০৬৮ খৃঃ বঙ্গ ও কামরূপ অভিযান করিয়াছিলেন। ১১২১ ও ১১২৪ খৃষ্টাব্দের কতকগুলি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কর্ণাটরাজ বিক্রমাদিত্য অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড়, মগধ ও নেপাল আক্রমণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সমস্ত অভিযানে আগত কর্ণাট-সেনাপতিগণের কেহ রাঢ়দেশে রহিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বংশে সামন্তসেনের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু নৈহাটি শাসনের বিবরণের সহিত ইহার সামঞ্জস্য করা কঠিন। ইহা অসম্ভব নহে যে, খৃষ্টীয় দশম শতকে কি তৎপূর্বে যে সকল কর্ণাটসৈন্য রাঢ়ের গঙ্গাতীরে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু কর্ণাটদেশের সহিত একেবারে সংস্রবশূন্য ছিল না এইরূপ একটি ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে যে, সামন্তসেন রাঢ়দেশবাসী হইয়াও কর্ণাটদেশে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ের যে স্থানে সেনবংশের আদি উপনিবেশ ছিল তাহার কিছু-কিছু পরিচয় লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর 'পবনদূতে' পাওয়া যায়। কবি পবনকে শ্রীখণ্ড পর্ব্বত (মলয় পর্ব্বত অর্থাৎ পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের দক্ষিণ প্রান্ত) হইতে পাণ্ড্যদেশের রাজধানী উরগপুরী (Korkai), তথা হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, তথা হইতে (চোড় রাজধানী) সুবলা নদী (পলাব নদী)-তীরস্থ কাঞ্চিপুর, তথা হইতে কাবেরী বহিয়া মাল্যবান্ পর্ব্বত ও পঞ্চাপ্সর সরোবর, তথা হইতে ঘুরিয়া গোদাবরীসিক্ত অন্ধ্রদেশ, তথা হইতে কলিঙ্গনগরী (গঙ্গরাজাদের রাজধানী গঞ্জাম জেলার মুখলিঙ্গম্), তথা হইতে বিন্ধ্যপাদস্থ রেবানদী, তথা হইতে যযাতি নগরী (মহাশিবগুপ্ত যযাতির রাজধানী বিনীতপুরা), তথা হইতে সুহ্ম দেশের (রাঢ়) যে স্থানে সেনরাজাদের কীর্ত্তিকলাপ আছে তথায়, ও তথা হইতে সুহ্মের অপর প্রসিদ্ধ স্থান হুগলী জেলার ত্রিবেণী হইয়া গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুরে লইয়া গিয়াছেন (৩৬ শ্লোঃ)।

কবি সুহ্মদেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই সুহ্ম দেশের ভূমি আর্দ্র, ইহার প্রান্তসীমা

গঙ্গাতরঙ্গ দ্বারা বিধৌত, সৌধমালা বিভূষিত ও তালীবনাচ্ছাদিত। এখানে 'সেনান্বয় নৃপতি' (লক্ষ্মণসেন?) দ্বারা 'কমলাকেলীকারঃ' মুরারী দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এখানে 'চারুচন্দ্রার্দ্ধমৌলি' শিবের নগর কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শ্বেত সৌধমালা দ্বারা শোভিত। এখানে 'রঘুকুলগুরু' সূর্য্যের মূর্ত্তি ও মহাদেবের 'গিরিসুতা সংবিভক্তাঙ্গ' অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি আছে। সেই দেবক্ষেত্র হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত শ্রীবল্লালসেন নৃপতি (গঙ্গাস্নানের জন্য) একটি সেতুবন্ধ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেই সেতুতে আরূঢ় গঙ্গাস্নানার্থী জনগণের নিকট সেই দেবক্ষেত্র দ্বিধাবিভক্ত অমর নগরী বলিয়া মনে হয়। এখানে 'প্রেমলোলা প্রেয়সী' গঙ্গাবীচিরূপ হস্তে ফেণস্তবকরূপ মুকুর বহন করিয়া কিয়দ্দূর বাঁকিয়া (অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দেখিয়া) যেন রুষ্টা ('উদ্ধত') হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সাগরসঙ্গমে চলিয়াছে।' (২৭-৩২শ্লোঃ)।

এই বর্ণনা হইতে মনে হয় এই স্থানটি হাবড়া জেলার প্রসিদ্ধ স্থান 'শিবপুর' হইতে পারে। এই শিবপুরের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বেতড্ড (বর্ত্তমান বেতড়) গ্রাম রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় সম্বৎসরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে তাম্রশাসন দ্বারা দান করিয়াছিলেন (গোবিন্দপুর শাসন দ্রষ্টব্য)। উক্ত তাম্রশাসনে বেতড্ড গ্রামের এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :

"শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতী পশ্চিমখাটিকায়াং বেতড্ড চতুরকে পূর্ব্বে জাহ্নবী প্রবন্তী অর্দ্ধসীমা, দক্ষিণে লিঙ্গদেবমণ্ডপী সীমা, পশ্চিমে ডালিম্ব ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে ধর্ম্মনগর সীমা"। বিপ্রদাসের (১৪৫৯ খৃঃ) মনসামঙ্গলে বেতড় ও বেতাইচণ্ডীর উল্লেখ আছে। (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের) রেনেলের ম্যাপে বেতড় আদিগঙ্গার মুখের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। বেতড় এক্ষণে হাওড়া সহরের অন্তর্ভুক্ত। বেতড়ের নিকটে গঙ্গা পশ্চিমমুখী হইয়া পরে দক্ষিণমুখী হইয়াছে। শালিমার হইতে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ পর্য্যন্ত প্রাচীন বেতড় অবস্থিত ছিল। অন্নদাপ্রসাদের 'শিবপুর-কাহিনী'তে লিখিত হইয়াছে যে, বেতড়ের জগন্মাতা বেত্রচণ্ডিকার পুরী "আজ সদাশিবের পুরী প্রাকারে সংযুক্ত হইয়া হরগৌরীর শুভ মিলনক্ষেত্র পুণ্যভূমি কৈলাসের ঐতিহ্য উদ্দীপন করিয়া দিতেছে। আর তাহারই পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া জাহ্নবী পুণ্যতীর্থ কপিলাশ্রম বিধৌত করতঃ মহাসাগরে সম্মিলিত হইয়াছে"। সেনবংশের আদিপুরুষ সম্ভবতঃ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ এই শিবপুর অঞ্চলেই -ই উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

অতঃপর কবি স্কন্ধের অপর প্রসিদ্ধ স্থান সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই স্থানে ভাগীরথী হইতে তপনতনয়া যমুনা নির্গত হইয়াছে (ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি

দেবী) এবং এই স্থান জগতীপাবন"। ইহা যে হুগলী জেলার ত্রিবেণী তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। টীকাকারও লিখিয়াছেন, "জগতীপাবনং তং দেশং ত্রিবেণীতি"।

বিজয়সেনের শিলালিপি ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, সেনরাজগণ জাতিতে ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বোম্বাই গেজেটিয়ারে এ-জাতির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে[১]। কর্ণাট, সিন্ধু, গুজরাট, কচ্ছ প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ ইহাদের বাস।

বোম্বাই গেজেটিয়ারে ইহাদিগকে লেখক জাতির অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে।

১। "Of writers there are two small classes, Brahma Kshatris and Kayasthas. Brahma Kshatris came into the province from the north, through Kutch. They claim to have escaped from the north of Hindusthan at the time of Parashuram's Persecution. They are mostly found in Junagarh * * Their family priest is Sarshwat Brahman." (Bombay Gazetteer, Guzrat, 1885, Vol VIII, p. 146-167)

"Under writers come three classes, Brahma-Kshatris 2500, Kayasthas 2607 and Prabhus 3891. * * Brahma-Kshatris are chiefly found in Broach, Ahmedabad, Surat and a few in Junagarh, Kathiabar and Kutch. * * They are said to be descendants of Kshatriya women who at the time of Parashuram's massacre were saved by passing as Brahmin women. Some of them went as far as Hydarabad in Dakhin where a few families still marry with Guzrat Brahma-Kshatris * * they wear sacred thread." (Bombay Gazetteer Vol. IX part 1, Guzart p. 55-59.)

"Writers include two classes, Kayastha Prabhus and Thakurs ; Thakurs properly called Brahma Kshatri Thakurs. They are found in Nasik and Teela. They are generally fair and wear sacred thread." (Bom. G. Vol. XVI. p. 43. Nasik)

"Brahma Kshatris are returned as numbering 53 in Poona city. They are also called Thakurs or Lords, a name

তাঁহাদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে, যে সকল (গর্ভবতী) ক্ষত্রিয় রমণী পরশু-রামের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাদের সন্তানগণই ব্রহ্মক্ষত্রিয়।

১। বিজয়সেন (১০৯৫-১১৫৯ খৃঃ)

মহাদেবী (শূরবংশীয়া) বিলাসদেবী

সামন্তসেনের ১০২৯ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম ছিল বিশ্বসেন। ইঁহারা কর্ণাটের (মহীশূর ও হায়দরাবাদ অঞ্চল) ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরাণপ্রসিদ্ধ বীরসেন ইঁহাদের আদিপুরুষ। ইঁহাদের কোন এক পূর্ব্বপুরুষ রাঢ়ের গঙ্গাতীরে উপনিবিষ্ট হন। এই বংশের বহু রাজপুরুষ সদাচার চর্চ্চায় প্রাচীন রাঢ়দেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সামন্তসেন কর্ণাটলক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণের সহিত রামেশ্বরের নিকটে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে রাঢ়ে গঙ্গাতীরের আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই স্থানের চতুষ্পার্শ্বের ভূভাগ লইয়া ইঁহাদের বোধ হয় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ভীষ্মের ন্যায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সেই সামন্তসেন হইতে মহারাজ হেমন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মহারাজ্ঞী যশোদেবীর গর্ভে মহারাজাধিরাজ বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজয়সেন শূরবংশীয়া বিলাসদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (বিজয়সেনের শিলালিপি ও তাম্রশাসন)। বিলাসদেবী বোধহয় দক্ষিণ রাঢ়ের হুগলী জেলার মন্দার রাজ্যের (গড়মন্দারণ) সামন্তরাজ লক্ষ্মীশূরের বংশীয়া ছিলেন। 'রামচরিতে' লক্ষ্মীশূরকে মন্দারাধিপতি বলা হইয়াছে। তিনি বরেন্দ্র উদ্ধারের যুদ্ধে রাজা রামপালের সহকারী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে রামপালের অপর একজন সহকারী ছিলেন নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজ। নিদ্রাবলী বাৎস্যগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটি গাঞী। সুতরাং ইহা বরেন্দ্র দেশে অবস্থিত। রাজসাহী জেলার প্রধান নগর রামপুর বোয়ালিয়াই এই নিদ্রাবলী গ্রাম। নিদ্রাবলী নামের 'বলী' অংশের অপভ্রংশে 'বলিয়া' ও তাহা হইতে 'বোয়ালিয়া' হইয়াছে। বোধ হয় 'রামপালে'র নামের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা

which in the Deccan is applied to several classes who have or claim to have a strain of Kshatriya blood. * * They worship chiefly Mahadeb." (Bom. G. Vol XVIII, part I. p. 266-67. Poona.)

রামপুর বোয়ালিয়া' হইয়াছে। নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজ ও বরেন্দ্রের অপর দুইজন সামন্ত কৌশাম্বীপতি গোবর্দ্ধন ও পদুবন্বার (পদুয়া পাবনা) সামন্ত সোম রামপালের সহিত যোগদান করায় রামপালের পক্ষে গঙ্গা উত্তীর্ণ হওয়া সহজসাধ্য হইয়াছিল। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপির ১৮।১৯।২০।২১।২২ শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থকভাবে রচিত হইয়াছে। উহাদের একটি অর্থে তিনি যে-সকল রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। ১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, বিজয়সেন নিজে শত্রুগণকে সংহার করিয়া নিজ রাজ্যের পুষ্টিসাধন ও দিব্য প্রজার সৃজন করিয়াছিলেন। ১৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে, এই রাজা নিজের রাজ্যবৃদ্ধি ও দিব্য ভূমি তাঁহার প্রতিপক্ষগণকে দিয়াছিলেন।[১] এখানে দিব্য শব্দে 'কৈবর্ত্ত-পতি দিব্যক' ধরিয়া অর্থ করিলে ১৮ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রের সামন্তগণ বিদ্রোহী হইলে বিজয়সেন সেই বিদ্রোহে যোগ দিয়া নিজ রাজ্যের পুষ্টিসাধন ও বিদ্রোহ-নেতা দিব্যকের প্রজা (দিব্যপ্রজা) সৃষ্টি করিয়াছিলেন অর্থাৎ বরেন্দ্রের প্রজাগণকে দিব্যকের প্রজা করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯ শ্লোকের অর্থও এইরূপ হইতে পারে যে, বিজয়সেন পরে রামপালের সহিত যোগ দিয়া দিব্যকের প্রতিপক্ষ রামপাল ও তাঁহার সামন্তরাজগণকে "দিব্যভুবঃ" অর্থাৎ দিব্যকের ভূমি (বরেন্দ্রের ভূমি)-র

১। "দেবোঽয়ং তু গুণৈঃ কৃতো বহুতিথৈর্ধীমান্ জঘান দ্বিষো
বৃত্তস্থান পুষচ্চকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ" ॥ ১৮ ॥
"দত্তা দিব্যভুবঃ প্রতিতিক্ষিভৃতা মুর্ব্বীমুরী কুর্ব্বতা" ॥ ১৯ ॥

এই সময়ের অন্যান্য লিপিতেও কৈবর্ত্তপতি দিব্যের প্রসঙ্গ দেখা যায়, যথা—

"তস্যাপি সহোদরো নরপতি দিব্য প্রজা-নির্ভর
ক্ষোভাহূত-বিধুতিঃ বাসবধৃতিঃ শ্রীরামপালোভবৎ ॥ ১৬ ॥

[দিব্য নামক কৈবর্ত্তপতির প্রজাগণের বিক্ষোভ দ্বারা আহূত ও আন্দোলিত চিত্ত হইয়াও তাঁহার (শূরপালের) সহোদর নৃপতি রামপাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন।] (মনহলি লিপি)

নিন্দন্দিব্য ভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং।
কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়স্যাং শ্রিয়াং বিততবান্ স্বাং সার্ব্বভৌম শ্রিয়ং" ॥ (৪)

—(বেলাব লিপি)

[দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া শ্রোত্রিয়-গণকে শ্রী (ধন) দান করিয়া নিজের সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন।]

অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন।[১] এই অর্থ গ্রহণযোগ্য হইলে নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজকে বিজয়সেন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিজয়সেন (১০৯৫-১১৫৮ খৃঃ) ও রামপাল (১০৭৭-১১২০ খৃঃ) সমসাময়িক হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত একেবারে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। দিব্যকের নেতৃত্বে বরেন্দ্রের সামন্তবর্গের বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া বিজয়সেন প্রথমতঃ দিব্যকের সহিত যোগ দিয়া নিদ্রাবলী রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। পরে বরেন্দ্র-উদ্ধারের যুদ্ধে রামপালের সহিত যোগ দিয়া তাঁহার রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে শত মাইল দূরে দেওপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি যুদ্ধে বহু বীরগণকে নিহত করিয়াছিলেন। তিনি যখন কৃপাণ ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন তখন তাঁহার সেই শোণিতরঞ্জিত কৃপাণ দেখিয়া বসুমতীর ভোগ লইয়া বিবাদপরায়ণ তাঁহার শত্রুগণ রণে ভঙ্গ দিতেন।[২] অতঃপর ২০।২১ শ্লোকে বলা হইয়াছে[৩]—বিজয়সেন নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধনকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ, গৌড়পতিকে বিতাড়িত ও কামরূপরাজকে দূরীভূত ও

১। রামচরিতমে "দিব্য বিষয়"-এর উল্লেখ আছে :

অমুনা সতী বরেন্দ্রী যাতা দিব্য বিষয়োপভোগসুখং।
কচিদপি কদাপি দুর্জন-দূষিত-চর্যা ন সা সেহে ॥ (১।২)

টীকা।—দিবস্য কৈবর্ত নায়কস্য যে বিষয়া দেশাঃ তেষাং উপভোগ সুখং যাতা প্রাপ্তা সতী সা বরেন্দ্রী কচিৎ অপি কদাপি দুর্জন-দূষিতচর্যা অমুনা রামপালেন ন সেহে ন ক্ষমিতা।

২। "বীরা স্বগ্‌লিপি লাঞ্ছিতো, শিরমূল প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতী ভোগে বিবাদোন্মুখী
তত্রা কৃষ্টকৃপাণধারিণিগতা ভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততি" ॥ ১৯

৩। "ত্বং নান্য বীর বিজয়ীতি গিরঃ কবিনাং
শ্রুত্বান্যথা মনন-রুঢ়-নিগূঢ় রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি স্তরসা জিগায় ॥ ২০
শূরম্মন্য ইবাসি নান্য, কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে,
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধনমুঞ্চ, বীর বিরতোনাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশ প্রণয়িভি কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎ কারাগৃহ যামিকে নিয়মিতো নিদ্রাপনোদক্রমঃ" ॥ ২১

কলিঙ্গপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী ২২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, বিজয়সেনের নৌবিতান পাশ্চাত্ত্য চক্র জয় করিবার জন্য গঙ্গাপ্রবাহের অনুধাবন করিয়াছিল। ২৩।২৪।২৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, তিনি বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন ও শ্রোত্রিয়দিগকে বহু ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন। তিনি আহত শত্রুব্যাপ্ত মেরু হইতে দেবগণকে আনিয়া মর্ত্ত্যে ও মানবগণকে স্বর্গে বসতি করাইয়াছিলেন[১]। তিনি প্রদ্যুম্নেশ্বরের অত্যুচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সেই মন্দিরে হরিহর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন (৩০ শ্লো) এবং সেই দেবপুরীতে একটি সুন্দর সরোবর খনন করাইয়াছিলেন (২৯ শ্লো)।

বিজয়সেন কর্ত্তৃক পরাজিত "নান্য"—মিথিলাপতি নান্যদেব (১০৯৭-১১৪৭ খৃঃ) "বীর" কোটাটবীরাজবীরগুণ, "রাঘব"—কলিঙ্গপতি চোড়গঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র রাঘব (১১৫২ খৃঃ), "বর্দ্ধন" কৌশাম্বাপতি গোবর্দ্ধন, "গৌড়পতি" মদনপালদেব (১১৪৪-১১৬২ খৃঃ), কামরূপপতি সম্ভবতঃ বৈদ্যদেব (১১৩৯ খৃঃ হইতে * *)। দক্ষিণরাঢ়ের শূর বংশীয় রাজকুলে বিবাহ করিয়া বিজয়সেন দক্ষিণরাঢ়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বীরভূম জেলার পাইকড় গ্রামে একটি মনসা মূর্ত্তিযুক্ত শিলাস্তম্ভে "রাজেন শ্রীবিজয়সে (নস)" কথাগুলি ক্ষোদিত আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, উত্তর রাঢ় বিজয়সেনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

দেওপাড়া শিলালিপিতে বঙ্গপতি ভোজবর্ম্মার (১১৫৩-৫৮ খৃঃ) সহিত বিজয়সেনের কোন যুদ্ধ হওয়ার, কি বিজয়সেন কর্ত্তৃক বঙ্গ অধিকারের কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে মনে হয় দেওপাড়া লিপির সময় পর্য্যন্ত বিজয়সেন বঙ্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। ঐ লিপিতে উল্লিখিত কলিঙ্গপতি রাঘব ১১৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন (Epi. Ind. Vol. V, Appendix

১। "মেরোরাহত-বৈরিসঙ্কুলতটা দাহূয় যজ্জামরান্
ব্যাত্যাসং পুরবাসিমকৃত যঃ স্বর্গস্থ মর্ত্ত্যস্থ চ"। (২৫ শ্লো)

(সেই যজ্জা অর্থাৎ যজ্ঞে ব্রতী নিহত শত্রু ব্যাপ্ত মেরুতট হইতে দেবগণকে আহ্বান করিয়া মানবগণকে স্বর্গে ও দেবগণকে মর্ত্ত্যে বসতি করাইয়াছিলেন)।

রাজসাহী জেলার প্রধান নগর রামপুর বোয়ালিয়া হইতে ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোদাগাড়ী থানা এলাকায় বড়গঙ্গা (পদ্মা)-র পুরাতন খাতের পূর্ব্বতীরে বিজয়নগরের সন্নিহিত দেবপাড়া নামক স্থানে পদ্মুমসরে বিজয়সেনের এই শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়।

p. 51-62)। সুতরাং ১১৫২ খৃষ্টাব্দের পর উক্ত লিপি রচিত হইয়াছিল। ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়সেনের রাজত্ব শেষ হয়। বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসন তাঁহার রাজত্বের ৬২ বৎসরে ৭ই বৈশাখ তারিখে বিক্রমপুর জয়স্কন্দাবার হইতে চন্দ্রগ্রহণকালে "শূরকুলাম্বোধি কৌমুদী" মহাদেবী বিলাসদেবীর সুবর্ণতুলাপুরুষ মহাদান উপলক্ষে বিক্রমপুরোপকারিক্য মধ্যে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির খাড়ি বিষয়ে ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই শাসনে বিজয়সেনের বৃষভশঙ্কর উপাধি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বঙ্গপতি ভোজবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া বিজয়সেন বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্দাবার হইতে রাজা ভোজবর্ম্মার রাজ্যের ৫ম বর্ষে ১৪ই শ্রাবণে প্রদত্ত ভোজবর্ম্মার বেলাব লিপিতে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়—

"হা ধিক্কষ্টমবীরমত্ত ভুবনং ভূয়োপি কিং রক্ষসা
মুৎপাতোয় মুপস্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কা স্বলঙ্কাধিপঃ" ॥

[হা ধিক, কষ্টের বিষয়, অদ্য ভুবন (রামের তুল্য) বীরশূন্য হইয়াছে। (তজ্জন্যই) পুনরায় কি রাক্ষসের উৎপাত উপস্থিত! এই শঙ্কাকুল অবস্থায় অলঙ্কাধিপ (রামপালাধিপ) ভোজবর্ম্মদেব কুশলী হউন।]

এই শ্লোক দ্বারা সূচিত হইতেছে যে এই শাসনদানের সময় রাজা ভোজবর্ম্মার মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। শত্রু দ্বারা তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে আবশ্যকীয় শান্তিকার্য্য করিতে হইয়াছিল। সেই শান্তিকর্ম্মের দক্ষিণাস্বরূপ ভোজবর্ম্মা তাঁহার "শান্তিগৃহাধিকৃত" (শান্তিগৃহের অধ্যক্ষ) রামদেব শর্ম্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।

বঙ্গপতি ভোজবর্ম্মার এই বিপদ কি? এই ভূমিদানের তারিখ (১১৫৭ খৃঃ ১৪ই শ্রাবণ)-এর পর ও বিজয়সেনের বিক্রমপুর জয়স্কন্দাবার হইতে ভূমিদানের তারিখ (১১৫৮ খৃঃ ৭ই বৈশাখ)-এর মধ্যে কোন সময়ে বিজয়সেন ভোজবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া বিক্রমপুর অধিকার করিয়াছিলেন।

বিজয়সেনের নৌবিতান বোধ হয় রাজমহলের পার্শ্ব দিয়া কাশীরাজ গহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল। খৃঃ একাদশ শতকের শেষভাগে গহড়বাল চন্দ্রদেব কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া কাশীতে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১১০৯ খৃষ্টাব্দের রহিন শাসন হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রদেবের পুত্র গহড়বালরাজ মদনচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র গৌড়পতির বিশালকায় হস্তীসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্র অঙ্গাধিপ মহনদেবের দৌহিত্রী পীঠির রাজকুমারী কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহ সত্ত্বেও গোবিন্দচন্দ্র

১১৪৬ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গের দখল করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের পর গহড়বাল বিজয়চন্দ্র (১১৬৯ খৃঃ) ও তৎপরে গহড়বাল জয়চন্দ্র (১১৭৫ খৃঃ) রাজা হন।

বিজয়সেন যজ্ঞে ব্রতী হইয়া আহত শক্র ধ্যাপ্ত 'মেরু' হইতে দেবগণকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন (দেওপাড়ালিপি ২৫ শ্লোঃ)। এই মেরু বোধ হয় চেদিরাজকর্ণ (১০২৯-১০৮৯) কর্ত্তৃক কাশীধামে স্থাপিত "কর্ণমেরু"। কর্ণের পুত্র যশঃ কর্ণের জব্বলপুর তাম্রশাসন লিপিতে আছে, "কি আর অধিক কীর্ত্তন করিব ? দুগ্ধাব্ধির তরঙ্গবলয়ের ন্যায় এই কাশীধামে যাঁহার (কর্ণদেবের) বিশালকীর্ত্তি কর্ণমেরু, যাহার কনকশিখরে বাতান্দোলিত বৈজয়ন্তী গগনমণ্ডলে ক্রীড়াশীলা খেচরীগণের শ্রান্তিখেদ নিবারণ করে। শ্রেয়ঃধামের অগ্রগণ্য, বেদবিদ্যাবল্লরীর কন্দস্বরূপ, স্বর্গতরঙ্গিণীর কিরীট, ব্রহ্মার স্তম্ভ ও পৃথিবীর ব্রহ্মলোকস্বরূপ কর্ণাবতী (সমাজ) যিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[১]।" এই কর্ণাবতী সমাজ পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রসিদ্ধ সমাজ ছিল। বিজয়সেন যজ্ঞে ব্রতী হইয়া কর্ণমেরুর এই কর্ণাবতী সমাজ হইতে দেবগণকে অর্থাৎ ভূদেব (ব্রাহ্মণ)-গণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার নৌবিতান কাশী অভিমুখে অভিযান করিয়াছিল। কাশীস্থ "মেরু" (কর্ণমেরু)-কে "আহত শক্রব্যাপ্ত" বলায় বোধ হইতেছে কাশীতে একটা যুদ্ধও হইয়াছিল।

মদনপাল গৌড় ত্যাগ করিয়া অঙ্গে ও মগধে গমন করিলে গৌড়দেশ বোধ হয় বিজয়সেনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং নান্যদেব যুদ্ধে বন্দী হইবার পর মিথিলাও বোধ হয় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

২। বল্লালসেন অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর (১১৫৯-১১৭৯ খৃঃ) মহাদেবী রামদেবী

বিজয়সেনের বারাকপুর শাসনে (৬-৮ শ্লোঃ) লিখিত আছে যে, শূরকুলাম্ভোধিকৌমুদী বিলাস দেবীর গর্ভে বিজয়সেনের ঔরসে বল্লালসেনের জন্ম হয়। বিজয়সেনের মৃত্যুর পর বল্লালসেন রাজা হন। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন

১। "কনকশিখরবেল্লদ্বৈজয়ন্তী সমীর গ্রপিত গগনখেলৎ খেচরচক্রখেদঃ।
কিমপরমিহ কাশ্যাং যস্য দুগ্ধাব্ধিবীচিবলয় বহলকীর্ত্তেঃ কীর্ত্তনং কর্ণমেরু।
অগ্রং ধামশ্রেয়সো বেদবিদ্যাবল্লীকন্দঃ স্বঃ শ্রবন্ত্যাঃ কিরীটং।
ব্রহ্মাস্তম্ভঃ যেন কর্ণাবতীতি প্রত্যষ্ঠাপি ক্ষিতিতল ব্রহ্মলোকঃ"॥
(যশঃ কর্ণদেবের জব্বলপুর তাম্রলেখ, ১৩-১৪ শ্লোঃ। Epi. Ind. Vol. II. p. 4)

হইতে জানা যায়[১] যে চালুক্যরাজকন্যা রামদেবী বল্লালসেনের মহিষী ছিলেন। এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন যে কেবল রাজগণেরই চক্রবর্ত্তী ছিলেন তাহা নহে, পণ্ডিতগণেরও চক্রবর্ত্তী ছিলেন। রামদেবীর পিতা সম্ভবতঃ কল্যাণের চালুক্যরাজ কর্ণাটেন্দু সোমেশ্বরের বংশধর জগদেকমল্ল (২য়)। 'দানসাগর' নামক স্মৃতিনিবন্ধ ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক জ্যোতিষিক নিবন্ধ বল্লালসেনের রচিত। এতদ্ব্যতীত 'প্রতিষ্ঠাসাগর' ও 'আচারসাগর' নামক গ্রন্থদ্বয়ও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃঃ) 'শশিনব দশমিতে শাকে' দানসাগর রচনা করেন। অদ্ভুতসাগরের রচনা ১০৮৯ শকে (১১৬৭ খৃঃ) আরম্ভ হয় কিন্তু বল্লালসেন তাহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন তাহা সমাপ্ত করেন[২]। 'অদ্ভুতসাগর' হইতে আরও জানা যায় যে, "ভূ-র্বসু-দশমিতে শাকে বল্লালসেন রাজ্যাদৌ" অর্থাৎ ১০৮১ শক (১১৫৯-৬০ খৃঃ) বল্লালের রাজ্যের আদি বৎসর।

'অদ্ভুতসাগরে' বল্লালসেনের বাহুকে "গৌড়েন্দ্ররূপ কুঞ্জরের আলানস্তম্ভ" বলা হইয়াছে। এই গৌড়েন্দ্র পালরাজ মদনপাল। সম্ভবতঃ তিনি ১০৬১ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় দানসাগরে বল্লালসেনকে গৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে। বল্লালসেনের রাজত্বের নবম বর্ষে (১১৬৬ খৃঃ) ভাগলপুর জেলার কহলগাঁও (বিহার) হইতে ১০ মাইল দূরে সনোখার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত

১। "তস্মাৎ (বিজয়সেন দেবাৎ) অশেষভুবনোৎসবকারণেন্দু বল্লালসেন-জগতীপতিরুজ্জগাম। যঃ কেবলং ন খলু সর্ব্বনরেশ্বরাণামেকঃ সমগ্র বিবুধনামপি চক্রবর্ত্তী ॥৮॥ ধরাধরান্তঃপুরমৌলিরত্ন চালুক্যকুলেন্দুলেখা তস্য প্রিয়াভুদ্বহমানভূমির্লক্ষ্মী পৃথিব্যোরপি রামদেবী" ॥৯॥ লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন (৮-৯ শ্লোঃ)

২। "শাকে নবাষ্ট খেন্দ্বব্দে আরেভেহদ্ভুতসাগরম্।
গৌড়েন্দ্র কুঞ্জরালানস্তম্ভ বাহুর্মহীপতিঃ ॥
গ্রন্থেহস্মিন্ন সমাপ্ত এব তনয়ে সাম্রাজ্য রক্ষামহা।
দীক্ষাপর্ব্বনি দক্ষিণে নিজকৃতে নিষ্পত্তি মস্থাপয়ৎ ॥
নানাদানতিলাম্বু সংকলনতঃ সূর্য্যাত্মজা সঙ্গমং।
গঙ্গায়ং বিরচর্য্যনির্জরপুরং ভার্যানুযাতোগতঃ ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপতি রতি শ্লাঘ্যো যদুদ্যোগতঃ।
নিষ্পন্নোহদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমিভুজঃ ॥

(অদ্ভুতসাগর প্রস্তাবনা)

সূর্য্যমন্দিরে ক্ষোদিত লিপিযুক্ত তাম্রপাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল (১৩৬১ ভাদ্রের প্রবাসী পৃঃ ৫৬৫)। তাঁহার রাজ্যের ১১শ বর্ষে রাজমাতা শূরবংশীয়া বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে হেমাশ্ব মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তর রাঢ়মণ্ডলে ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী শ্রীবাসুদেব শর্ম্মাকে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন। হরিঘোষ তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।

অদ্ভুতসাগরের মতে তিনি পুত্র লক্ষ্মণসেনের অনুকূলে সাম্রাজ্যরক্ষা দীক্ষাপর্ব্বের নিষ্পত্তি করিয়া নানাদানজন্যতিলাম্বুযোগে গঙ্গায় যমুনাসঙ্গম রচনা করতঃ ভার্য্যানুযাত হইয়া নির্জ্জরপুরে (দেবপুরে) গমন করিয়াছিলেন। "ভার্য্যানুযাত" কথা দ্বারা মনে হয়, বল্লালসেনের স্ত্রী রামদেবী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের নিকটস্থ গঙ্গার পূর্ব্বতীরে তিনি যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ তথায় তিনি দেহত্যাগ করেন।[১]

কথিত আছে রাজা বল্লালসেন দেবীর বরে দ্বিপ্রহর মধ্যে সপ্তশত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বাঙলার বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণ মধ্যে তান্ত্রিক কুলাচারের ভিত্তিতে কুলমর্য্যাদা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বল্লালের পৌত্র কেশবসেনের সভাস্থ কুলশাস্ত্রবিদ্ এড়ুমিশ্রের কারিকায় ইহার সমর্থন পাওয়া যায়[২]। এই কারিকায় লিখিত হইয়াছে যে, রাজা আদিশূর "সভা শোভার" জন্য কান্যকুব্জান্তর্গত কোলঞ্চ হইতে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরী নামক পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করতঃ তাঁহাদিগকে কামটি, ব্রহ্মপুরী হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম নামক পাঁচখানি গ্রাম দান করেন

১। "On the other side of the river there is a large mound still called after Ballal Sen. * There is also a dighi called Ballal dighi. It is on the east side of the Bhagirathi and west of the Jalangi *. Lakshan Sen built a Palace of which the ruins are still extant. It was on the south bank of a Tank called Bilpukur on the east of the Bhagirathi and west of the Jalangi and on the north of Samudragarh." (Statistical Account of Nadia)

২। ভো রাজনবধেহি সম্প্রতি কুলব্যাখ্যানমাকর্ণ্যতাম্।
আস্তে পশ্চিম দিগ্বিশেষে বিষয়ো শ্রীকান্যকুব্জাহ্বয়ঃ॥
তন্মধ্যেঽস্তি বিশিষ্ট বিপ্রনিলয়ঃ কোলাঞ্চ দেশঃ শুভঃ

(১৫-২৯ শ্লোঃ)। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বহু পুত্র পৌত্রাদি হয়। তৎপর রাজা বল্লালসেন জন্ম গ্রহণ করেন। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণ সেন বিধিবশাৎ দীর্ঘকাল কষ্টে পতিত হন। তৎপুত্র কেশবসেন তুরস্কের ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পিতামহ কৃত বিপ্রগণ সঙ্গে বঙ্গের রাজা দনুজমাধবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় কুলশাস্ত্র-বিদ্ এড়ুমিশ্র দনুজমাধবের সভায় কুলব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই কুলব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

তস্মাদানয়দাদিশূরঃ নৃপতিঃ পূর্ব্বস্ত পঞ্চদ্বিজান্ ॥

*   *   ততঃক্ষিতীশাহ্বয়ঃ।

শ্রীমেধাতিথি বীতরাগ সহিতো গৌড়াবনীং প্রস্থিতো

দ্বাবস্তৌ চ সুধানিধি শুদপরঃ শ্রী সৌভরিশ্চাগতৌ ॥

*   *   *

তৎশ্রুত্বা নৃপতিঃ প্রহৃষ্ট হৃদয়স্তে ভ্যো দদৌ কামকোটিং দিব্যাং ব্রহ্মাপুরীং তথৈবচ হরিকোটিং পুরমাদরাৎ। কঙ্কগ্রামমথ প্রসিদ্ধ মদাৎ নাম্না বটগ্রামকং গ্রামেষ্বেষু চ পঞ্চ সু ক্ষিতিসুরাঃ চক্রু নবা বা সাদিকং ॥

*   *   *

*   *   কালে গতে ভূপতিঃ

বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলৈকতিলকো বল্লালসেনোঽভবৎ ॥

তৎপুত্রো রঘুবীর লক্ষ্মণসমঃ খ্যাতোঽভবৎ লক্ষণঃ।

তস্মাভূত্তনয়ঃ প্রচণ্ডবিনয়ঃ কেশবাখ্য স্বয়ং ॥ ৩১

তস্যাভূৎ বিধিবশেন সুচিরং দুর্লক্ষণং কিঞ্চন্।

দেশঞ্চাপি বিহায় বঙ্গ মগমৎ ভীতঃ তুরস্কাৎ ততঃ ॥

তত্রাসীৎ দনুজারিমাধব নৃপস্তং কেশবভূপতিঃ।

সন্যৈঃ বিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতৈরন্যৈশ্চ যুক্তোগতঃ ॥

*   *   *

কালে ভূরিতিথৌ গতেঽথ সমভূৎ বল্লালসেন সুধীঃ।

সাম্প্রতং প্রত্যর্পণদিৎসয়া দ্বিজগণান্তানানিনায়াস্তিকং ॥

দানাদান পরান্মুখা ক্ষিতিপতিং প্রাচুঃ বয়ং যাজ্ঞিকাঃ।

তদ্বিজ্ঞায় চুকোপ ভূপতিরসৌ বল্লালসেনো মহান্ ॥

চণ্ডীমেব সমাররাধ সুচিরং ভূরি প্রয়োগাদিভিঃ।

প্রত্যক্ষমজনি সা নিশার্দ্ধসময়ে দুর্গাপবর্গদা ॥

রাজানং তমুবাচ বাঞ্ছিত বরং যাচস্ব দাস্যাম্যহং।

এড়ুমিশ্র বলিলেন, একদা রাজা বল্লালসেন দানেচ্ছু হইয়া দ্বিজগণকে নিকটে আনয়ন করিলে সেই যাজ্ঞিক দ্বিজগণ রাজাকে বলিলেন তাঁহারা দান গ্রহণ করেন না। রাজা ইহা শুনিয়া কুপিত হইয়া চণ্ডীদেবীর আরাধনা করিয়া দেবীর বরে দ্বিপ্রহর মধ্যে সপ্তশত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহারা রাজার নিকট বহু মহাদান গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সেই যাজ্ঞিক দ্বিজগণ রাজাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে রাজা তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধান জন্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে উত্তম,

রাজা সো'হথ ববার তং দ্বিজগণ নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যহং ॥
তুষ্টা সা জগদীশ্বরী নৃপমুবাচামুং বরোহয়ং মহান্।
কিন্তুত্বং প্রহরদ্বয়ং কুরু নববিপ্রং সমাপ্তং ॥
দত্ত্বিমন্তু বরং নৃপায় সহসৈবান্তহিতা পার্ব্বতী।
রাজা সপ্তশত দ্বিজানথ তথৈবাজ্ঞয়া নির্ম্মমে ॥
তন্নির্ম্মায় নৃপঃ সুবিস্তরং মহাদানাদি তেভ্যো দদৌ।

* * *

তৎশ্রুত্বা নৃপতিং সমেত্য চুকুপুঃ পূর্ব্বদ্বিজাঃ যাজ্ঞিকাঃ
বংশধ্বংসকৃতে নৃপস্য সহসা শপ্তুং সমারেভিরে ॥
ভীতোহভূন্নৃপতিস্ততো দ্বিজগণান সন্তোষৎ সেবাদিভিঃ।
তানাহোত্তমমধ্যমাধমতয়া ভূয়ঃ করিষ্যে দ্বিজান্ ॥
তৎশ্রুত্বাথ কথঞ্চিদেব নৃপতিং শপ্তুং নিবৃত্তাঃ দ্বিজাঃ।
রাজাচাপি তথা করোৎ কুলবিধি গ্রন্থং দ্বিজানাং ততঃ।
বংশাংশ্যাদি কুলাকুলাদি বচনং গ্রন্থস্য বিস্তারকৃৎ।
জাতোহহং নৃপতৌ গতে সুরপুরং বল্লালসেনে ততঃ ॥”

[কুলশাস্ত্রাভিজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ উপরোক্ত এড়ুমিশ্রের কারিকার ১-৪৩ শ্লোঃ পর্য্যন্ত খণ্ডিতাংশ প্রাপ্ত হইয়া উহার ১৫-৪৩ শ্লোক ১৩৪৭ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ঐ কারিকার ১-১৪ শ্লোঃ আমি দীনেশবাবুর সংগৃহীত পুঁথি হইতে নকল করিয়া লইয়া ১৩৬৩ সালের প্রবর্ত্তক পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় মল্লিখিত আদিশূর প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি। এড়ুমিশ্রের কারিকা ব্যতীত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের (খৃঃ ১৬শ শতক) সমীকরণ সার ও মহাবংশাবলী নামক দুইখানি কারিকা (একত্র “মিশ্র কারিকা”) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। ইহাতে রাজা লক্ষ্মণসেন ও দনৌজামাধবের কৃত সমীকরণের উল্লেখ আছে।]

মধ্যম, ও অধম এই তিন প্রকার ভেদ করিয়া কুলবিধি গ্রন্থ রচনা করিলেন ; বল্লালসেনের মৃত্যুর পর এডুমিশ্র সেই কুল গ্রন্থের বংশাংশাদি কুলাকুলাদি বচনের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। (৩০-৪৩ শ্লোঃ)।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকার ঐতিহাসিক অংশ "আদিশূর রাজার ব্যাখ্যা" নামে পরিচিত। তাহাতে লিখিত আছে, "আদিশূর রাজা পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন। এই পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণ। কিছু কালান্তর তন্ত [বংশে ?] দৌহিত্র কুলেও উদ্ভব হইলেন বল্লালসেন। [অতঃপর বল্লাল কর্ত্তৃক কুলমর্য্যাদা স্থাপন ও রাঢ়ী-বারেন্দ্র বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে।] ইত্যবকাশে অন্যান্য দেশীয় রাজাসকল ব্রাহ্মণহীন দেশ বিবেচনা করিয়া বল্লালসেনের নিকট ব্রাহ্মণ যাচিঞা করিয়া কহিলেন, শুনহে বল্লালসেন, তোমার মাতামহ কুলোদ্ভব আদিশূর পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড়মণ্ডল পবিত্র করিয়াছেন…।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের এই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থের বিবরণ হইতে রাজা বল্লালসেনের সমাজ সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়[১]।

গুপ্ত ও পালরাজাদের আদিনিবাস ছিল গৌড়দেশে। আর বঙ্গের প্রকৃতিগণ নিজেরাই পাল বংশের আদি রাজা গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনরাজারা ছিলেন বিদেশী। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশে। সুতরাং গৌড় দেশে নিজেদের শাসন দৃঢ় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এদেশের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতি প্রধান জাতিগুলিকে গ্রাম, মর্য্যাদা ও পদদান করিয়া বশীভূত করিতে হইয়াছিল।

'দান সাগরে' লিখিত আছে দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতির ন্যায় অনিরুদ্ধভট্ট বল্লালসেনের গুরু ছিলেন। এই অনিরুদ্ধভট্ট বরেন্দ্রীতে বেদার্থ স্মৃতিসঙ্কলনের প্রশংসনীয় আদিপুরুষ ছিলেন। সারস্বত ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনায় তাঁহার নেত্র তন্দ্রাহীন উজ্জ্বলধীবিলাসযুক্ত ছিল। তিনি ষট্‌কর্ম্মান্বিত, আর্য্যশীলের মলয়স্বরূপ ও প্রখ্যাত সত্যব্রত ছিলেন[২]।

১। কোন কোন ঐতিহাসিক এই কুলপঞ্জিকাগুলির বিবরণকে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু পুরুষানুক্রমিক প্রচলিত সামাজিক নিয়মগুলির এই ঐতিহ্য উড়াইয়া দেওয়া কঠিন।

২। "বেদার্থ-স্মৃতিসঙ্কলনাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলধীবিলাসনয়নঃ সারস্বত-ব্রহ্মণি।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত অনিরুদ্ধভট্টকৃত 'হারলতা' নামক স্মৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তিনি চাম্পাহিট্টি গ্রামীন্ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও ভট্ট নয়ার্থবিদ্ ছিলেন। সামবেদীয় সন্ধ্যাশ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি সম্বন্ধীয় 'পিতৃদয়িতা' ও 'কর্ম্মোপদেশিনি পদ্ধতি' নামক তাঁহার অপর দুইখানি গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তৎকৃত সাংখ্য দর্শনের একখানি টীকা আছে। পরম সৌগত রাজা মদন পালদেব তাঁহার রাজ্যের অষ্টম বর্ষে মহারানী চিত্রমতিকা দেবীকে মহাভারত শুনাইবার দক্ষিণা স্বরূপ চাম্পাহিট্টি গ্রামবাসী বটেশ্বর স্বামীকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে কোটিবর্ষ বিষয়ে হলাবর্ত্তমণ্ডলে কোষ্টগিরি গ্রামে ভূমিদান করিয়াছিলেন। চাম্পাহিট্টি গ্রামীন্ অনিরুদ্ধভট্ট এই চাম্পাহিট্টি গ্রামবাসী বটেশ্বর স্বামীর বংশীয় হওয়া অসম্ভব নহে।

৩। লক্ষ্মণসেন দেব [অবিরাজ মদন শঙ্কর] (১১৭৯-১২০৫ খৃঃ)। মহাদেবী তাড়াদেবী (চান্দ্রাদেবী ?)।

মহারাজা বল্লালসেনের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন রাজা হন। লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত সাতখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাধাইনগর শাসনখানি সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে তাঁহার মূলাভিষেকের সময় ধার্যগ্রাম জয়স্কন্ধাবার হইতে ২৭শে শ্রাবণ তারিখে তাঁহার শান্ত্যাগারিক কৌশিকগোত্র গোবিন্দদেব শর্ম্মাকে ঐন্দ্রি মহাশান্তি যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ প্রদত্ত হয়। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির বরেন্দ্রে রাবণহ্রদের (চলনবিলের) নিকটে ছিল। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে ২৭শে ভাদ্র (তর্পণদীঘি শাসন) রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্রের বেলাহিষ্টি গ্রাম আচার্য্য ভরদ্বাজগোত্র ঈশ্বরদেবশর্ম্মাকে প্রদান করেন। ঐ বর্ষে রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে গোবিন্দপুর শাসন নামক অপর একখানি তাম্রশাসন দ্বারা বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী জাহ্নবীর পশ্চিম তীরে বিড্ডর গ্রাম (বেতুড়) বাৎস্যগোত্র উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্ম্মাকে দান করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রাজত্বের ৩য় বর্ষে আনুলিয়া ও সুন্দরবন শাসন, ৬ষ্ঠ বর্ষে শক্তিপুর শাসন ও ২৭

ষট্‌কর্ম্মাভ্যাসার্য্যশীলালয়ঃ প্রখ্যাত সত্যব্রতঃ
বৃত্রারেরিব গীষ্পতি নরপতেরস্যানিরুদ্ধগুরুঃ ॥"

(দান সাগর)

বর্ষে ভাওয়াল শাসন (H. Q. Vol. III) প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের একখানি মূর্ত্তিলিপিও ঢাকায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার ঐসকল শাসন হইতে জানা যায়, তিনি "অরিরাজ মদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর পরম বৈষ্ণব পরম নারসিংহ" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কুমারকালে তিনি পাল গৌড়েশ্বরের রাজলক্ষ্মীকে হরণ ও কলিঙ্গাঙ্গনাগণসহ কেলী করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে কাশীরাজকে জয় করিয়াছিলেন।[১]

তাঁহার বাহুযুগল করিশুণ্ডসদৃশ, বক্ষঃ শিলাসদৃশ, তীরসমূহ শত্রুর মদমত্ত করিসমূহের প্রাণান্তকারী ছিল। * * তিনি বলদেব-গদাধরের বেদীসন্নিহিত দক্ষিণ সমুদ্রবেলায় (জগন্নাথ ক্ষেত্রে), বরণা ও অসির সঙ্গমস্থলে গঙ্গাতরঙ্গভোগী বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে, বৈদিক যজ্ঞপূত ত্রিবেণী তীরে (প্রয়াগে) যজ্ঞযূপসহ উচ্চ বিজয়স্তম্ভসমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ধরাতলে চন্দ্র, দেবরাজ ও কল্পবৃক্ষসদৃশ ছিলেন [বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসন]। লক্ষ্মণসেন ও কাশীরাজ জয়চন্দ্র (১১৭৫-১১৮৩ খৃঃ) সমসাময়িক ছিলেন।

বল্লালসেন পর্য্যন্ত সেনরাজগণ শৈব ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণবমতাবলম্বী হইয়া ছিলেন। বৈষ্ণব কবি জয়দেব, কবি শরণ, ধোয়ী, গোবর্দ্ধন ও উমাপতিধর তাঁহার সভাকবি ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরগণের অনেকে কবিতা রচনা করিয়াছেন। মহাসামন্তচূড়ামণি বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থে তাঁহাদের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ মন্ত্রী হলায়ুধ 'মীমাসা সর্ব্বস্ব', 'বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব', 'শৈব সর্ব্বস্ব', 'পুরাণ সর্ব্বস্ব', 'খণ্ডিত সর্ব্বস্ব', 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' ও 'মাৎস্যসূক্ত', হলায়ুধের ভ্রাতা ঈশান 'আহ্নিক পদ্ধতি' ও অপর ভ্রাতা মন্ত্রী পশুপতি 'সংস্কার পদ্ধতি' রচনা করিয়া বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন। হলায়ুধ তাঁহার 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' রচনার প্রয়োজন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই কলিকালে আয়ু, প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও শ্রদ্ধা অল্প। তজ্জন্য কেবল পাশ্চাত্ত্যাদি ব্রাহ্মণেরাই বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া কেবল বেদার্থের কিয়দংশের কল্প মীমাংসানুসারে ইতিকর্ত্তব্য বিচার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বেদমন্ত্রের অর্থজ্ঞান হয় না। অথচ মন্ত্রার্থ জ্ঞানেরই প্রয়োজন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা কেবল অনুচিতাচারই করিতেছেন। ইহাদের মন্ত্রার্থরূপ বেদজ্ঞান নাই। বেদের অপর

১। "আসীৎ গৌড়েশ্বরশ্রী-হটহরণ-কলা যস্য কৌমার কেলিঃ কলিঙ্গাঙ্গনয়া যস্য পূর্ব্বং। যেনা সৌ কাশীরাজঃ সমরভুবিজিতঃ।" (মাধাইনগর তাম্রশাসন)।

নাম বৃষলঃ। যে ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞান নাই সে বৃষল। কেবল শূদ্রই বৃষল নহে।"[১]

হলায়ুধের উপরোক্ত মন্তব্য হইতে মনে হয় যে, লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্ব হইতেই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বেদজ্ঞান না থাকায় তাঁহারা বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইজন্যই বোধ হয় বিজয়সেনকে কাশীস্থ কর্ণমেরুর কর্ণাবতী সমাজ হইতে পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ করিতে হইয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাবই বোধ হয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের এই বেদাজ্ঞতার হেতু।

লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিতগণ যখন শাস্ত্ররচনায় ও কাব্যালোচনায় রত, তখন সমগ্র উত্তরাপথে তুরস্কজাতীয় মুসলমান বহিঃশত্রুগণ নিত্য নূতন নূতন হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিতেছিল। খাইবার গিরিপথের সন্নিহিত উদ্ভাণ্ডপুরের হিন্দুসাহীরাজগণ খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে হিন্দুস্থানের দ্বাররক্ষক বলিয়া গণ্য হইতেন। সেই সাহীরাজ্য ধ্বংস করিয়া সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশে গজনি উপত্যকার সবুক্তিগিণের বংশধরগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সবুক্তিগিণের পৌত্র গজনবী সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর তাঁহার দুর্ব্বল বংশধরগণের হস্ত হইতে তাঁহার হিন্দুস্থান-লুণ্ঠনলব্ধ অতুল ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিয়া ঘোর উপত্যকার পার্ব্বত্য অধিবাসীগণ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিল। তাহারা সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বে সমগ্র আফগানিস্থান ও ক্রমশঃ পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল। এই মুসলমান বিজেতাগণও তুর্কজাতীয় ছিল। ইহাদের অধিকৃত রাজ্যের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমান্তের পর হইতে দিল্লীর তোমরবংশীয় রাজপুত রাজগণের অধিকার ছিল। ঘোররাজগণ তোমররাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিবার পর তোমরগণের সহিত তাহাদের বিবাদ আরম্ভ হইল। ক্রমে তোমরগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তাহাদের রাজ্য চাহমান বা চৌহান রাজগণের হস্তগত হইল।[২] সম্ভবতঃ দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে দিল্লীরাজ্য আজমীঢ়ের

১। "অত্র কলৌ আয়ুঃ প্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ তৎ কেবল পাশ্চাত্যাদিভিঃ বেদাধ্যয়নং মাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয় বারেন্দ্রস্তু অধ্যয়নং বিনা কিয়দেব বেদার্থস্য কর্ম্ম মীমাংসাদ্বারেণ যশ্চেতি কর্ত্তব্যবিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রার্থক বেদার্থজ্ঞানং। মন্ত্রার্থ বিজ্ঞানস্তৈব চ প্রয়োজনম্। এতৈস্তু রাঢ়ীয় বারেন্দ্রৈরনুচিতাচার এব কেবলং ক্রিয়তে। এবং চোভয়রপি মন্ত্রার্থ বেদজ্ঞান নাস্তেব। তথাচ যমঃ—"ন শূদ্রো বৃষলঃ নাম বেদ বৈ বৃষ উচ্যতে। যস্য বিপ্রস্য তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে॥" (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

২। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময় ১৩৩৬ বিক্রমাব্দে স্থাপিত (১২৮০

চাহমান বিশালদেব[১] তোমরগণের হস্ত হইতে অধিকার করিয়া লন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় পৃথ্বীরাজ মহোবার (মধ্যপ্রদেশ) চন্দেল্লবংশীয় পরমার্দিদেবকে পরাস্ত করিয়া মহোবা দুর্গ অধিকার করিয়া লন। ১১৯২ খৃঃ ঘোররাজ মহম্মদ বিন্ সাম (মহম্মদ ঘোরী) পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিতে আসিয়া পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু পরবৎসর (১১৯৩ খৃঃ) পানিপথের নিকটবর্ত্তী তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ স্বয়ং মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হেমরাজ আমরণ দিল্লী রক্ষা করিয়াছিলেন (Elliot's History of India Vol II, p. 25)। দিল্লী অধিকারের পর মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবক আজমীঢ় অধিকার করেন, এবং ৫৯০ হিঃ (১১৯৪ খৃঃ) যমুনা পার হইয়া গহড়বাল জয়চন্দ্রের রাজধানী কাশী অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। পথিমধ্যে গজনী হইতে মহম্মদ ঘোরী নূতন সৈন্যদল লইয়া কুতুবুদ্দিনের সহিত মিলিত হন। উভয় সৈন্য মিলিত হইলে দেখা গেল ৫০ সহস্র বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সৈন্য একত্রিত হইয়াছে। এই সৈন্য লইয়া তাঁহারা কাশীরাজ জয়চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুদ্ধে কাশীরাজ হস্তীপৃষ্ঠে নিহত হইলেন ও তাঁহার ছিন্নমুণ্ড শূলবিদ্ধ অবস্থায় মহম্মদ ঘোরীর শিবিরে নীত হইল। (Elliot's History of India Vol II p. 223. ধৃত তাজ-উল-মাসিরের বিবরণ)।[২]

খৃঃ) পঞ্জাবের পালাম বাওলী নামক স্থানের একখানি শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে উক্ত ভূভাগ তোমরগণের অধিকারভুক্ত ছিল। পরে উহা চাহমানগণের অধিকারভুক্ত হয়। (I. A. S. Bengal, Vol XIII p. 108)।

১। ১২২০ সংবৎ (১১৬৪ খৃঃ)-এর বিশালদেবের শিবালিক প্রস্তরলিপি দ্রষ্টব্য।

২। কাশীর বরুণা সঙ্গমের নিকটস্থ কমৌলি গ্রামে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, ১২৩২ বিক্রমাব্দে ভাদ্র বদি অষ্টমী রবিবারে রাজপুত্র হরিশ্চন্দ্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে জয়চন্দ্র তাঁহার পুরোহিতকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কিলহোর্ণ গণনা করিয়া হরিশ্চন্দ্রের জন্মতারিখ ১১৭৫ খৃঃ ১০ই আগষ্ট স্থির করিয়াছেন। সুতরাং জয়চন্দ্রের মৃত্যুকালে হরিশ্চন্দ্রের বয়স ছিল ১৯ বৎসর। হরিশ্চন্দ্র ১২৫৭ বিক্রমাব্দে (১২০০ খৃঃ) একখানি তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর এই ছয় বৎসর হরিশ্চন্দ্র কনোজেই ছিলেন। কনোজ তখনও তাঁহার অধিকারে ছিল। ১২১১ খৃষ্টাব্দের পর সমসউদ্দিন ইলতুতমিসের সময় কনোজ তুর্কীদের অধিকারে চলিয়া যায়।

জয়চন্দ্রের একখানি তাম্রশাসনে দেখা যায় তিনি ১১৭৫খৃঃ পাটনা জেলায় ভূমিদান করিয়াছিলেন। গোবিন্দপালের চতুর্দ্দশ বর্ষ রাজত্বকালে ১১৭৫ খৃঃ গয়ায় একখানি শিলালিপি স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ ১১৭৫ খৃষ্টাব্দেই গহড়বাল জয়চন্দ্রই গোবিন্দপালকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১১৪৬ খৃঃ গহড়বাল গোবিন্দচন্দ্র মুঙ্গের অধিকার করিবার পর হইতেই মগধের অধিকার লইয়া গহড়বাল, পাল ও সেন রাজাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। ১১৭৫ খৃঃ গহড়বাল জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক মগধের শেষ পালনৃপতি গোবিন্দপাল রাজ্যচ্যুত হইলে জয়চন্দ্র ও সেন-গৌড়েশ্বরের মধ্যে সীমান্তবিরোধ প্রবল হইল। ১২৪০ বিক্রমাব্দ (১১৮৪ খৃঃ) হইতে ১২৪৯ বিক্রমাব্দের (১১৯৩ খৃঃ) মধ্যে জয়চন্দ্র বোধগয়ায় একটি শিলালিপি স্থাপন করেন (I. H. Q. V.14)। ইহার পর ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে জয়চন্দ্র নিহত হইলে লক্ষ্মণসেন বোধ হয় মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। কারণ খৃঃ ত্রয়োদশ শতকের গয়াপ্রদেশের কতকগুলি শিলালিপিতে লক্ষ্মণসেনের অতীত রাজ্যাব্দের উল্লেখ আছে। মনে হয় ১১৯৯ খৃঃ মগধরাজ্য লক্ষ্মণসেনের হস্তচ্যুত হইলে ঐ প্রদেশের লিপিগুলিতে লক্ষ্মণসেনের বিজয়রাজ্যের পরিবর্ত্তে অতীত রাজ্যাব্দের ব্যবহার চলিতেছিল।[১] এই অতীত রাজ্যাব্দও সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্যলাভের পর হইতেই গণিত হইত।

১। সপাদলক্ষগিরি (শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণী)-র মধ্যগত খসদেশাধিপতি অশোক চল্ল কর্ত্তৃক বুদ্ধগয়ায় একটি বৌদ্ধমন্দির "শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেনস্য অতীত রাজ্যে সং ৫১ ভাদ্র দিনে ২৯" তারিখে, অশোক চল্লের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমাপতি কুমার দশরথদেবের ক্ষত্রিয়জাতীয় কর্ম্মচারী সহণপাল কর্ত্তৃক বুদ্ধগয়ায় একটি বৌদ্ধমন্দির শ্রীলক্ষ্মণসেন দেবপাদানাং অতীত রাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ" তারিখে (সা. প. প. ১৩১৭ পৃ. ২১৩-১৮); পীঠিপতি বুদ্ধসেনের পুত্র জয়সেন কর্ত্তৃক বুদ্ধগয়া হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী জানিবিঘাগ্রামে একটি শিলালিপি "লক্ষ্মণসেনস্য অতীত রাজ্যে সং ৮৩" তারিখে (I. A. XLVIII, 47) প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধসেনের একটি শিলালিপিতে অশোকচল্ল দেবের গুরু ধর্ম্মরক্ষিতের প্রসঙ্গ আছে (I. A. XLVIII PWI)। গয়ার একটি সূর্য্যমন্দির কমা (কমায়ন) রাজ-পুরুষোত্তম সিংহ তাঁহার অধিরাজ অশোকচল্ল দেবের ও চিন্দারাজের সাহায্যে ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দে (১২৭০ খৃঃ) নির্ম্মিত হইয়াছিল (সা. প. প. ১৩১৭, পৃ ২ ৮)। শেষোক্ত লিপি হইতে জানা যায় যে, অশোকচল্ল দেব ১২৭০ খৃঃ বর্ত্তমান ছিলেন। নির্ব্বাণাব্দ ৫৪৩ খৃঃ পূঃ (সিংহলীয় মতে)।

তবকাৎ-ই-নাসেরীতে (পৃঃ ৬২৮-২৯) দৃষ্ট হয়, কুতুবুদ্দিনের জামাতা সমসউদ্দিন ইলতুৎমিসের রাজ্যকালে (১২১১-৩৬ খৃঃ) লক্ষাধিক মুসলমানের নিহন্তা অযোধ্যার বর্ত্তু নামক একজন হিন্দু পরাজিত ও নিহত হয় এবং গহড়বালদের অন্যতম রাজধানী কনৌজ মুসলমানদের অধিকৃত হয়। তবকাৎ-ই-নাসেরী হইতে আরও জানা যায়, বক্তিয়ারখিলজি নামক এক তুর্কী ঘোর (গোর) উপত্যকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভারতে আসিয়া অযোধ্যার নূতন জায়গীরদার মালিক ইসামউদ্দিন আগলবকের সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হন এবং মীর্জাপুর জেলায় জায়গীর প্রাপ্ত হন (১১৯৩ খৃঃ)। তিনি তথায় নিজ দলবল সংগ্রহ করিয়া বিহারের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত লুণ্ঠনকার্য্য চালাইতে থাকেন। দুই বৎসরকাল লুণ্ঠন চালাইয়া যথেষ্ট অর্থ ও সৈন্য সংগৃহীত হইলে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার দুই সহস্র বর্ম্মধারী অশ্বারোহী লইয়া উদন্দপুরের গিরিশীর্ষে অবস্থিত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামকে বিহারদুর্গ ("কিল্লাবিহার") মনে করিয়া তাহাতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করতঃ সঙ্ঘারামের মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুগণকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়া সঙ্ঘারামের প্রভূত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন এবং সমগ্র বিহারটি বহুমূল্য দুর্লভ গ্রহরাজিসহ ভস্মীভূত করেন (তবকাৎ পৃঃ ৫৫২)। অতঃপর সেই লুণ্ঠনলব্ধ মূল্যবান উপঢৌকনসহ দিল্লীতে কুতুবুদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কুতুবুদ্দিন তাঁহাকে উপযুক্তভাবে সম্মানিত করেন। দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিহার প্রদেশের অবশিষ্ট অংশ অধিকার করেন (১১৯৯ অক্টোবর-১২০১ খৃঃ জানুয়ারী)। অতঃপর তিনি গৌড়দেশ লুণ্ঠন করিতে উদ্যোগী হন এবং ঐ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই "সহরনুদিয়া" লুণ্ঠন করেন।

মিনহাজ নুদিয়া-বিজয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যখন মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বিহার "ফতে" হওয়ার সংবাদ রায় লছমনিয়ার নিকট পৌছিল, তখন একদল জ্যোতির্ব্বিদ-ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাজাকে বলিল যে, শাস্ত্রে লেখা আছে, এই দেশ আজানুলম্বিত বাহুবিশিষ্ট একজন তুরস্ক দখল করিবে এবং সেই শাস্ত্রবচন সফল হইবার সময় আসিয়াছে। অতএব সকলেরই এ দেশ হইতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য। বিশ্বাসী চর পাঠাইয়া রাজা জানিতে পারিলেন যে, বক্তিয়ারের বাহু আজানুলম্বিত। যখন এই সংবাদ নুদিয়ায় প্রচারিত হইল, তখন ঐ "মৌজার" ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ীগণ সঙ্কনটে (সিলেট), বঙ্গে ও কামরূপে চলিয়া গেল। কিন্তু রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া রায় লছমনিয়ার পছন্দ হইল না! যাঁহার 'খান্দান'কে (বংশকে) হিন্দের রাজগণ 'বুজুর্গ' (অভিজাত) মনে করিত এবং হিন্দের 'খলিফা' বলিয়া স্বীকার করিত এবং যাঁহার 'ফরজন্দান্' (বংশধরগণ) এখন

(১২৫৫ খৃঃ) পর্য্যন্ত[১] বঙ্গ শাসন করিতেছেন সেই রায় লছমনিয়া একটি বৎসর জনপূর্ণ নুদিয়ায় পড়িয়া রহিলেন। 'দোয়েম সাল' (পরবৎসর) মহম্মদ-ই বক্তিয়ার লস্কর প্রস্তুত করিয়া বিহার হইতে বাহির হইলেন এবং সহসা নুদিয়া সহরের নিকট এত দ্রুত উপস্থিত হইলেন যে ১৮ জনের বেশী 'সওয়ার' তাঁহার সঙ্গে ছিল না। 'দিগর লস্কর' পশ্চাতে আসিতেছিল। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার সহরের দরজায় উপস্থিত হইয়া, কাহাকেও আঘাত না করিয়া ধীরভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কেহ জানিতে পারিল না ইনিই মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার। লোকে মনে করিল একদল সওদাগর বিক্রয় করিবার জন্য ঘোড়া আনিয়াছে। যখন সমস্ত সেনা নগরে পৌছিল তখন বক্তিয়ার রায় লছমনিয়ার 'সরাইয়ের' (বাড়ীর) দরজায় পৌছিয়া তলোয়ার খুলিয়া অবিশ্বাসী (কাফের) দিগকে বধ করিলেন। তখন রায় লছমনয়া আহারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট প্রকৃত খবর পৌছিবার পূর্ব্বেই বক্তিয়ার বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া মহিলামহলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন [অশীতিপর] বৃদ্ধ রাজা নগ্নপদে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সকনটে (সিলেটে) ও বঙ্গে প্রস্থান করিলেন। তথায় অল্পকাল পরে তাঁহার রাজত্ব শেষ হইয়াছিল। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার (রায় লছমনিয়ার) সকল মূলক ('মমলকৎ') দখল ('জব্দ') করিয়া সহর নুদিয়াকে 'খরাব' করিলেন ও লখনাবতী মৌজায় রাজধানী ('দার-উল্-মুলক') স্থাপন করিলেন। (নাসেরী মূল ১৫০-৫৫ পৃঃ। Raverty-র ইংরেজী অনুবাদ ৫৫৪-৬৯ পৃঃ)।

১। লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক মহাসামন্ত চূড়ামণি বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থের সমাপ্তিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয়—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশ শত সারদং
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্য রসৈক বিংশাব্দে।
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরমার্থ হেতুতবে কুকাৎ
শ্রীধর দাসেনেদং সদুক্তি কর্ণামৃতং চক্রে" ॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ লক্ষ্মণসেন নৃপতির ২৭ রাজ্যাব্দে ১১২৭ শাকে সৌর ২০ ফাল্গুনে পরমার্থ হেতু কৌতূহল বশতঃ শ্রীধর দাস এই সদুক্তি "কর্ণামৃত" সংকলন করিয়াছিলেন। (I. H. Q. Vol III p. 186-89)।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে ১১২৭ শাকে (১২০৬ খৃঃ) লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ২৭ বৎসর চলিতেছিল। সুতরাং ১১৭৯ খৃঃ তিনি রাজা হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের গণনারও সমর্থন মিলিতেছে।

১২৪৩ খৃষ্টাব্দে মিনহাজউদ্দিন যখন 'লখনাবতী' নগরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন বিহার-কিল্লা অধিকারে লিপ্ত সামসুদ্দিন নামক একজন বৃদ্ধ সৈনিকের মুখে শুনিয়া তিনি বিহার দখলের বিবরণ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার 'নোদীয়া' জয় কাহিনীকে কেবলমাত্র বিশ্বাসী লোকের উক্তি (সেকাৎ রোয়াৎ) বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি সেই বিশ্বাসী লোকের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। মিনহাজ যখন 'তবকাত-ই-নাসেরী' রচনা করেন, তখন পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণের প্রবর্ত্তিত আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্মত প্রমাণ-পরীক্ষা রীতি অবিদিত ছিল। অতএব মিনহাজ ঘটনার প্রায় ৪৩ বৎসর পরে নামহীন 'বিশ্বাসী লোকের' মুখে শুনিয়া নোদীয়া জয়ের যে অদ্ভুত কাহিনী লিখিয়াছেন তাহা বিচার করিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

মিনহাজ 'বিশ্বাসী লোকে'র মুখে রাজা লক্ষ্মণসেনের যে অদ্ভুত জন্ম কাহিনী[১], জন্মমাত্র রাজ্যাভিষেক ও সুদীর্ঘ ৮০ বৎসর ধরিয়া রাজ্য শাসন, আজানুলম্বিতবাহু বিশিষ্ট তুরস্ক কর্ত্তৃক গৌড় বিজয়ের ভবিষ্যৎবাণী-সম্বলিত হিন্দুশাস্ত্রের গল্প শুনিয়াছিলেন, তাহা একান্তই কাল্পনিক। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর শাসনে লিখিত আছে (৮-১০ শ্লোঃ) যে বল্লাল সেন চালুক্য রাজকুমারী রামদেবীকে বিবাহ করেন। এই রামদেবীর গর্ভে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়। এখানে মিনহাজ বর্ণিত লক্ষ্মণসেনের অদ্ভুত জন্ম কাহিনীর কোনই আভাস প্রদত্ত হয় নাই, এবং অদ্ভুত সাগরে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন লক্ষ্মণসেনকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করতঃ স্বর্গে গমন করেন এবং তাঁহার ভার্য্যা (রামদেবী) সহমৃতা হন—"নির্জ্জর পুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ"। এতদ্বারাও জানা যাইতেছে লক্ষ্মণসেনের মাতা লক্ষ্মণকে প্রসব করিবার সময় পরলোকগমন করেন নাই। লক্ষ্মণ

মিনহাজ লিখিয়াছেন তিনি ৬৪০-৪৩ হিঃ (১২৪২-৪৫ খৃঃ) লখ্নাবতীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১২৫৯ খৃঃ পর্যান্ত কালের ঘটনাবলী লিখিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

১। লক্ষ্মণসেনের জন্ম সম্বন্ধে 'নাসেরীতে' লিখিত আছে যে, তাঁহার মাতার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে জ্যোতিষীরা বলিল যে এই লগ্নটি অত্যন্ত অশুভ, কয়েক দণ্ড পর যে লগ্ন আছে তাহাতে জন্ম হইলে জাতক রাজচক্রবর্ত্তী হইবে। তখন রাজমাতা বলিলেন তাঁহার পদদ্বয় উর্দ্ধমুখে বাঁধিয়া শুভলগ্ন পর্য্যন্ত প্রসব বন্ধ করান হউক। তদনুসারে শুভ লগ্ন পর্য্যন্ত প্রসব বন্ধ করা হইল। ইহাতে শুভ লগ্নে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইল। কিন্তু রাজমাতার মৃত্যু হইল।

সেন যে জন্মমাত্রই রাজা হন নাই কি ৮০ বৎসর রাজত্ব করেন নাই তাহা দানসাগর, অদ্ভুত সাগর, সদুক্তি কর্ণামৃত ও তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। লক্ষ্মণ সেনের ভাওয়াল শাসন তাঁহার রাজ্যের ২৭ সম্বৎসরে প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। সুতরাং ১২০০ খৃঃ বক্তিয়ার খিলজি কর্ত্তৃক নদীয়া লুণ্ঠনের সময় তাঁহার রাজত্বের ২২ বৎসর চলিতেছিল। আজানুলম্বিত বাহু তুরস্ক কর্ত্তৃক গৌড় অধিকারের ভবিষ্যৎ বাণী কোন হিন্দুশাস্ত্রে নাই। লক্ষ্মণ সেন যাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিতপদ, যৌবনে প্রধান মন্ত্রিপদ ও প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাধিকারীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন সেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হলায়ুধ ও অন্যান্য বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যাঁহার সভায় ছিলেন এবং যিনি স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, সেই লক্ষ্মণসেনকে কাল্পনিক শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়া কেহ বিভ্রান্ত করিবে ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় মিনহাজের বিশ্বাসী লোকের বর্ণিত লক্ষ্মণসেনের নদীয়ায় উপস্থিতি ও তথা হইতে পলায়নের কাহিনীকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

মিনহাজ লিখিয়াছেন রায় লখমনিয়ার নিকট খবর পৌঁছিবার পূর্ব্বে বক্তিয়ার রাজবাড়ীর মহিলামহলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় আশি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের পক্ষে কিরূপে বক্তিয়ারের ও তাঁহার সেনাগণের দৃষ্টি এড়াইয়া তাহাদের কবল হইতে পলায়ন করা সম্ভব হইল তাহাও বোধগম্য নহে। বরং ইহাই খুব সম্ভব যে যখন লক্ষ্মণসেন দেখিলেন যে বিহার প্রদেশ রক্ষা করা সম্ভব হইল না তখন তিনি মনে করিলেন যে তাঁহার পক্ষে লক্ষ্মণাবতীতে অবস্থান করা নিরাপদ নহে, বরং নদী-বহুল বঙ্গে গমন করিয়া তুরস্ক অশ্বারোহী সৈন্যকে বাধা দেওয়া সহজসাধ্য। লক্ষ্মণসেন একজন বিচক্ষণ যোদ্ধা ছিলেন, তাহা তাঁহার ও তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের তাম্রশাসন লিপি হইতে জানা যায়। সেই সমরবিজ্ঞায় পক্ককেশ লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার অমাত্য সেনাপতিগণ রণনীতির বিচারে সম্ভবতঃ ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করিয়া সদলবলে বঙ্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাহার সহিত ব্রাহ্মণগণ, রাজপাদোপজীবীগণ ও ব্যবসায়ীগণও বঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল, ইহাই স্বাভাবিক। মিনহাজ লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি এক বৎসর পূর্ব্বে চলিয়া গেল। কেবল লক্ষ্মণসেন একাকী নদীয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন"; মিনহাজের এই উক্তি একেবারেই অস্বাভাবিক। নদীয়া সেন রাজগণের রাজধানী ছিল না। সেখানে গঙ্গাবাসের জন্য বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের এক একটি প্রাসাদ ছিল এবং তদুপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ সজ্জন ও ব্যবসায়ী তথায় বাস করিতেন। গৌড় দেশে বিজয়পুর বা

বিজয়নগরে বিজয়সেনের সময়েই সেন রাজাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; পরে পালরাজাদের রাজধানী রামাবতী অধিকৃত হইলে তাহার নিকটে বল্লালসেন (বর্ত্তমান মালদহ জেলায়) বল্লালবাড়ী নামক স্থানে ও লক্ষ্মণসেন উহার নিকটে লক্ষ্মণাবতী নগরে নূতন রাজধানী করিয়াছিলেন। মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণি' গ্রন্থেও 'লক্ষ্মণাবতী'কে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বলা হইয়াছে। নোদিয়াকে মিনহাজও কেবলমাত্র 'সহর নোদিয়াই' বলিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা সম্ভবতঃ এই যে, বক্তিয়ারের নদীয়া অভিযানের সময় লক্ষ্মণ সেন কি তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণ নদীয়ায় কি লক্ষ্মণাবতীতে উপস্থিত ছিলেন না। এক বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহারা বঙ্গে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য প্রধানগণ নদীয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন নদীয়ায় উপস্থিত থাকিলে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাহসেরই পরিচয় দিতেন। পরিজনবর্গ ও দাসদাসীকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিতেন না। নোদিয়া ও লক্ষ্মণাবতী বক্তিয়ারের হস্তগত হইবার পরেও লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল শাসন প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের শাসন লিপিতে, কি সমসাময়িক কোন হিন্দু গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের পলায়নের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না ; বরং সদুক্তি কর্ণামৃত-ধৃত সারণর একটি কবিতায় লক্ষ্মণসেনকে ম্লেচ্ছ বিজয়ী বলা হইয়াছে[১]। তিনি বিক্রমপুরে চলিয়া যাইবার পর তাঁহার সৈন্যদলের সহিত তুরস্ক সৈন্যদের সম্ভবতঃ কোন যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতে লক্ষ্মণসেনের পক্ষে জয়লাভ হইয়াছিল। বক্তিয়ার নদীয়া-লুণ্ঠনে আসিয়া, তথায় লক্ষ্মণসেন উপস্থিত ছিলেন না ইহা জানিয়াই তাঁহার অনুচরদের নিকট নিজ বাহাদুরী দেখাইবার জন্য লক্ষ্মণসেনের মিথ্যা পলায়ন কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, অথবা অজ্ঞ লোকের কল্পনাপ্রসূত অমূলক কাহিনী শুনিয়া মিনহাজ তাহাই গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন। শতবর্ষ পরে লিখিত 'ফতু-উস-

---

১। লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত কবি সারণ ও উমাপতিধরের কবিতা সদুক্তি কর্ণামৃতে সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে সারণের কবিতায় একজন রাজা কর্তৃক গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ, কাশী ও মগধ অধিকারের ও একজন চেদিপতি ও একজন ম্লেচ্ছ শাসকের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের কথা আছে, ও উমাপতিধরের কবিতায় প্রাগজ্যোতিষ ও কাশীর যুদ্ধে জয়লাভের কথা আছে (I A. S. B. New Series, II p 174, 161)। লক্ষ্মণসেনের ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের শাসন হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেন ঐ সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং লক্ষ্মণসেনকে ঐ কবিতাগুলির নায়ক মনে করা যাইতে পারে।

সালাতিনে'র লেখক ইসামি বক্তিয়ারের নদীয়া জয়ের অনুরূপ কাহিনী লিখিয়াছেন। একদল বণিকের নেতার ছদ্মবেশে বক্তিয়ার অশ্ব ও চীনামাটির দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ভাণ করিয়া নদীয়ায় উপস্থিত হন। রাজা লক্ষ্মণসেন বিক্রয়স্থলে উপস্থিত হইলে বক্তিয়ার তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সঙ্কেত অনুসারে খিলিজী যোদ্ধাগণ রাজার রক্ষীগণকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া রাজাকে বন্দী করেন (I. H. Q. XVII p. 95-96)। বলা বাহুল্য মিনহাজ ও ইসামির উক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ ও বিশ্বাসের অযোগ্য।

বক্তিয়ার কোন্ পথে নদীয়া লুণ্ঠনে আসিয়াছিলেন মিনহাজ তাহা লেখা আবশ্যক বোধ করেন নাই। সেকালে ঝাড়খণ্ডের নিবিড় অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথ অল্প সংখ্যক সৈন্যের পক্ষেও দুর্গম ছিল। তিনি যদি রাজমহলের পথ ধরিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজধানী লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে বক্তিয়ার কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী অধিকারের ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন। ইহা হয়ত অসম্ভব নহে যে রাজা লক্ষ্মণসেন সদলবলে বঙ্গে গমন করিলে, বক্তিয়ার গুপ্তচর মারফত সেই ঘটনা অবগত হইয়া সেই সুযোগে রাজমহলের পথে আসিয়া প্রথমে পরিত্যক্ত রাজধানী লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন এবং তথা হইতে সহসা নদীয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হন এবং লুণ্ঠন কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় লক্ষ্মণাবতীতে প্রস্থান করেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব্বদিক হইতে দুইজন সামন্ত রাজা বিদ্রোহী হয়। পূর্ব্ব খাটিকায় (পূর্ব্ব সুন্দরবন) শ্রীমদ্দমন পাল নামক একজন সামন্ত বোধ হয় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তিনি ১১৯৬ খৃঃ (১১১৮ শক, ১ বৈশাখ) তাম্রশাসন দ্বারা ঐ অঞ্চলে ভূমিদান করিয়াছিলেন[১]। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা অযোধ্যাবাসী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইনি ধবল বংশীয় ছিলেন। কারণ তাম্রশাসনে ইঁহাকে 'ধবল সামন্তরাজ' বলা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইনি বিহারের তারাচণ্ডী গিরিলিপির প্রতিষ্ঠাতা জাপিলের রাজা মহানায়ক প্রতাপধবলের (১২১৪-২৫ সংবং = ১১৫৭-৬৮ খৃঃ) বংশীয় ছিলেন। এই

১। "পরম মাহেশ্বর-সামন্ত-সুপ্রশস্তোপেত-মহামাণ্ডলিক-শ্রীশ্রীপালদেবানুধ্যাতঃ-মহাসামন্তাধিপতি-মহারাজাধিরাজ-বিপক্ষসামন্তঃ ভগবান্নারায়ণ-নির্দ্রোহঃ ধবল সামন্তরাজ শ্রীমদ্দমন পালদেব কুশলী। অযোধ্যা বিনিসৃত পালান্বয়োপার্জ্জিত-পূর্ব্বখাটিকান্তঃপাতি * * শকাব্দা ১১১৮ সং বৈশাখে দিনে ১।" (Indian Historical Quarterly X 321)।

শিলালিপিতে গহড়বাল বিজয়চন্দ্রের উল্লেখ থাকায় মনে হয় প্রতাপধবল গহড়বাল বিজয়চন্দ্রের সামন্ত ছিলেন।

এই সময়ের কিছু পুর্ব্বে ১২০২ খৃঃ হইতে ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজা হরিকালদেব রাজত্ব করিতেন। ১১৪২ শকাব্দায় (১২১৯ খৃঃ) রাজা রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেবের ১৭ রাজ্যাব্দে পট্টিকেরা নগর হইতে রাজার 'অশ্বনিবন্ধিক' মন্ত্রী শ্রীধদি-এর "দুর্গোত্তরাতারাদেবীর" বিহারের জন্য তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলার পাটিকেরা পরগণায় লালমাই ও ময়নামতী পাহাড়ের মধ্যে কোন স্থলে বোধহয় পাটিকেরা রাজধানী অবস্থিত ছিল। (বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ৫নং মনোগ্রাফে এই শাসনখানি সানুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।) অতঃপর দেব বংশীয় ("দেবান্বয়") পুরুষোত্তমদেবের পুত্র রাজা মধুমথনদেব ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তৎপুত্র রাজা বাসুদেব। তৎপুত্র অরিরাজ চানুরমাধব শ্রীদামোদর দেব তাঁহার রাজত্বের ৪র্থ বর্ষে ১১৫৬ শকে (১২৩৪ খৃঃ) 'মেহের শাসন' ও ১১৬৫ শকে (১২৪৩ খৃঃ) 'চট্টগ্রাম শাসন' দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনে তিনি নিজেকে "সকল ভূপতি চক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই দুইটি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও নওয়াখালি অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। ইঁহার পুত্র "দেবান্বয়-কমল-বিকাশ-ভাস্কর অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীদশরথদেব" শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্দাবার হইতে তদীয় রাজ্যের তৃতীয় বর্ষে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই শাসন-লিপিতে তিনি নিজেকে "পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে তিনি "শ্রীনারায়ণে"র কৃপায় গৌড় রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এই শাসনখানি 'আদাবাড়ী শাসন' নামে পরিচিত (Inscriptions of Bengal Part III)। মিনহাজ তাঁহার গ্রন্থে ১২৫৯-৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত কালের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার গ্রন্থ রচনার সময় পর্য্যন্ত লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে লক্ষ্মণপুত্র কেশব সেন রাজত্ব করিতেছিলেন। অতঃপর সেনবংশের রাজত্ব লোপ পায় এবং নারায়ণের কৃপায় তাহা দেববংশীয় দনৌজামাধব শ্রীদশরথ দেবের হস্তগত হয়।

অনুমান ১২০৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু হয়। লক্ষ্মণপুত্র বিশ্বরূপ সেনের ১৪শ রাজ্যাব্দের একখানি ও কিছু পরবর্ত্তীকালের অপর একখানি ও লক্ষ্মণের অপর পুত্র কেশব সেনের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া

গিয়াছে (Inscriptions of Bengal Part III)। এই তাম্রশাসনগুলিতে বিশ্বরূপের "অরিরাজ-বৃষভাঙ্ক-শঙ্কর গৌড়েশ্বর" ও কেশবের "অরিরাজ-অসহ্যশঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধি দৃষ্ট হয় এবং উভয়কেই "সৌর" ও "গর্গযবনান্বয় প্রলয়কালরুদ্র" বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ রাজ্যপ্রাপ্তির সময় বিশ্বরূপ ও কেশব বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপের শাসনে 'কুমার সূর্য্যসেন' ও 'কুমার পুরুষোত্তম সেনে'র নাম দৃষ্ট হয়। ইহারা বোধহয় বিশ্বরূপের পুত্র ছিলেন না। কারণ পুত্র থাকিলে ভ্রাতা কেশব সেন রাজা হইলেন কেন? তাহা জানা যায় না। মাধব সেন নামক অপর একজন সেন বংশধরের কবিতা সদুক্তি কর্ণামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আলমোরার অদূরে অবস্থিত যোগেশ্বর মন্দিরের শিলালিপিতে (১১২৩ খৃঃ) মাধব সেনের নাম দৃষ্ট হয়। (Atkinson's Notes on the History of the Himalayas on the N. W. P. of India Ch. III p. 50, IV p. 15)।

পঞ্জাবের সুখেত, মণ্ডী, কাষ্টওয়ার ও কেওস্থলের রাজগণ নিজদিগকে গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের বংশীয় সুরসেনের বংশধর বলিয়া পরিচিত করেন। তাঁহারের মতে সুরসেন (সূর্য্যসেন ?) ১২৫৯ বিক্রমাব্দে (ইং ১২০২ খৃঃ) তুরস্কের ভয়ে প্রয়াগে গমন করেন। তৎপর সুরসেনের পুত্র রূপসেন রাজ্য স্থাপন করেন (পঞ্জাব গেজেটিয়র)।

মহামহোপাধ্যায় ৺ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত 'পঞ্চরক্ষা' নামক একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের পাদটীকায় মধুসেনদেব (১২৮৯ খৃঃ) নামক একজন রাজার উল্লেখ আছে। তাঁহাকে গৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে। যথা—"পরমেশ্বর পরম-সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌গৌড়েশ্বর মধুসেনদেবকানাং প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতেঃ শকাব্দা ১২১১ ভাদ্র দি ৩॥" এতদ্বারা জানা যায় যে, মধুসেনদেব ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। দনৌজামাধবদেব ১২৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহা জিয়াউদ্দিন বার্ণির বিবরণ হইতে জানা যায়। সুতরাং মধুসেনদেব দনুজমাধবদেবের বংশধর হইতে পারেন।

সপ্তম খৃষ্টাব্দে শক্তি নামক একজন গৌড়বাসী পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যে পার্ব্বত্য অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। বরেন্দ্রবাসী গদাধর নামক এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় দশম শতকে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের অধীনে মাদ্রাজের বেলারী জেলায় কোলগল্লু গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেন। ১২০০ খৃঃ গারওয়াল অঞ্চলে অনেকমল্ল নামক একজন গৌড়ীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, সাহসী বাঙালীরা সময় সময় বাঙলার বাহিরেও রাজ্য স্থাপন করিতেন।

প্রাচীন বাঙলার ভাষা, সাহিত্য ও বাঙালী লেখক।

পাঁচকোটির অধিক সংখ্যক লোক বাঙলা ভাষায় কথা বলে। বাঙলা ভাষার শতকরা ৫১.৪৫টি শব্দ প্রাকৃত, ৪৪টি শব্দ দেশজ ও ৪.৫৫টি শব্দ বিদেশী অর্থাৎ তুর্কী, আরবী ও পার্শী চীনা, মালয়ী, পর্ত্তুগীজ, ইংরাজী, ফরাসী, গ্রীক ও ইটালীয়।

ভারতের মধ্যদেশে যে আর্য্যভাষা, আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য আচার জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কালক্রমে একদল প্রগতিশীল আর্য্য সেই আর্য্য সংস্কৃতিকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ও ক্রমে তাহারও বাহিরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। গৌড় বঙ্গে যাহারা প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা আদিবাসীদের সহিত মিশিয়া যে ভাষার সৃষ্টি করিল তাহাই বর্ত্তমান বাঙলা ভাসার রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

মোটামুটি বেদের ভাষাই ছিল আর্য্যগণের কথ্য ভাষা সম্ভবতঃ এই ভাষায় তাঁহারা কথা বলিতেন ও সুক্তাদি রচনা করিতেন। লিপি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের রচিত সেই সুক্তগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। লোক মুখে উচ্চারিত হইতে হইতে ক্রমশঃ এই বৈদিক ভাষা সরল সহজ হইয়া আসিল। দেশজ শব্দের সহিত মিশিয়া প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হইল।

লিখন প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পর বৈদিক রচনাবলী লিখিত হইয়া তাহার ভাষা অনেকটা স্থায়িত্ব লাভ করিল। কিন্তু প্রাকৃত ভাষা বিভিন্ন দেশে মুখে মুখে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল। মহারাষ্ট্রে ইহার নাম হইল মহারাষ্ট্রী। বিধর্ভে নাম হইল বৈধর্ভী, শূরসেনে (মথুরা) নাম হইল শৌরসেনী, মগধে, অঙ্গে ও গৌড়-বঙ্গে নাম হইল মাগধী প্রাকৃত[১] ইতিমধ্যে ভাসাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভাষাকে একটা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য ব্যাকরণ রচনা করিলেন এবং সেই ব্যাকরণকে অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাহিত্য রচনা করিতে লাগিলেন। স্থায়ী নিয়মে বাঁধা এই ভাষার নাম হইল 'সংস্কৃত ভাষা'। এই সংস্কৃত ভাষা হইল পণ্ডিতের ও সাহিত্যের ভাষা। কাল ক্রমে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রাকৃত

১। বররুচীর "প্রাকৃত প্রকাশে"র মতে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী এই চারি প্রকার প্রাকৃত ভাষা।

প্রাকৃত ভাষা ত্রিবিধ—তৎসম (সংস্কৃত), তদ্ভব, (সংস্কৃতের বিকৃতি) দেশজ। মাগধী প্রাকৃতকে পালি বলা হয়। এই ভাষা পাটলী পুত্রে কথিত কথিতহইত। পাটলী = পালি।

ভাষা রূপান্তরিত হইলেও সংস্কৃত ভাষা অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া অদ্যাপি নূতন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া তাহার আভিজাত্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

এইরূপে যদিও পণ্ডিত সমাজ প্রাকৃত ভাষাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় বুদ্ধদেবের ন্যায় শক্তিশালী ধর্ম্মাচার্য্যগণ প্রাকৃত ভাষাতেই তাঁহাদের উপদেশ সমূহ প্রচার করিতে লাগিলেন। পাটলীপুত্রে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতে অর্থাৎ পালি প্রাকৃতে সমস্ত উপদেশবাণী প্রচারিত ও ত্রিপিটক প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ হওয়ায় মাগধী প্রাকৃত বা পালি ভাষা শক্তিশালী সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইল। জৈনাচার্য্যেরাও এই প্রাকৃত ভাষার সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার ও গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত রাজারাও নিজের আদেশ প্রচারের জন্য রাস্তার ধারে প্রোথিত পাথরের স্তম্ভে ও পাহাড়ের গায়ে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী প্রভৃতি অক্ষরে ক্ষোদিত করাইতে লাগিলেন। অশোকের শিলালিপিসমূহ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এইরূপ একখানি শিলালিপি উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা রাজা অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের শাসনকালের লিপি বলিয়া অনুমিত হয়।

যাহা হউক, সময়ের পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে এই মাগধী প্রাকৃতেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ মনে করেন খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের পর হইতেই গৌড় বঙ্গে এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং দশম একাদশ শতক পর্য্যন্ত ইহা চলিতে থাকে। এই পরিবর্ত্তিত ভাষাকে মাগধী অপভ্রংশ বলা হয়[১]। বাঙলার নবম দশম একাদশ খৃষ্টাব্দের বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের মন্ত্রের ভাষা ও গানের ভাষার মধ্যে এই মাগধী অপভ্রংশের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ১৯২২ খৃঃ নেপাল রাজ লাইব্রেরী হইতে আনীত ও সম্পাদিত "হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামক গ্রন্থে এই মাগধী অপভ্রংশের পরিচয় আছে। প্রায় পঞ্চাশটি গান এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাতে সরোহ, লুই, ভুসুকু বা রাউত, কৃষ্ণাচার্য্য প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যগণের চর্য্যাপদ আছে। একটি উদাহরণ দেওয়া হইল—

১। প্রাকৃত ভাষা প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মের বাহিরে চলিয়া গেলে প্রাকৃত ভাষা অপভ্রংশে পরিণত হয়।

"কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস॥
আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি॥
তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী॥
হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো॥
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ পইসঈ॥

—['চর্য্যাগীতি-পদাবলী' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রদত্ত পাঠ]

রে (ওরে) অচ্ছহু (আমি আছি) কাহে (কাহাকে) ঘিনি (ঘিরিয়া লইয়া) [কাহাকে] মেলি (ছাড়িয়া) কীস (কিসে)। চৌদীস (চারিদিক) বেঢ়িল (বেষ্টন করিল), হাক (শিকারিদের হাকডাক) পড়অ (পড়িয়া গেল)। হরিণা (হরিণ) আপণা মাংসেঁ (আপনার মাংসের জন্য) [শিকারীর] বৈরী (শত্রু হইল)। ভুসুকু (সিদ্ধাচার্য্য ভুসুকু) অহেরি (ব্যাধ, শিকারী) খনহ ন ছাড়অ (ক্ষণকালের জন্যও ছাড়ে না)। হরিণা (হরিণ) তিণ (তৃণ) ন চ্ছুপই (ছোঁয় না) পানী (জল) পিবই ন (পান করেনা)। হরিণা (হরিণ) হরিণীর (স্ত্রী-হরিণের) নিলঅ (বাসস্থান) ণ জানি (জানে না)। হরিণী বোলঅ (বলে) হরিণা (হরিণকে) সুন তো (শোন), হরিআ (রে হরিণ) এ বণ চ্ছাড়ি (এ বন ছাড়িয়া) হোহু (হও) ভান্তো (ভ্রান্ত, পলায়িত, দূরগত)। তরঙ্গতে (দ্রুত গমন করায়) হরিণার (হরিণের) খুর (পায়ের খুর) ন দীসঅ (দেখা যায় না)। ভুসুকু (বৌদ্ধচার্য্যের নাম)[১] ভণই (বলেন)

১। ভুসুকুর প্রকৃত নাম শান্তিদেব। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র ও নালন্দা মহাবিহার। তিনি (ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ সুপ্তোপি প্রভাস্বরঃ কুটিংগতোপি প্রভাস্বরঃ) যখন ভোজন করিতেন তখন তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন সুপ্ত থাকিতেন তখনও তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন কুটিরে গমন করিতেন তখনও তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, এইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল "ভুসুকু"। যখন তিনি মগধের রাজধানীতে থাকিতেন তখন তিনি "রাউত" অর্থাৎ সেনাপতির কাজ করিতেন। কতকগুলি গানের ভণিতায় লেখা আছে "রাউতু ভণই কট, ভুসুকু ভণই কট"। শান্তিদেবের তিনখানি গ্রন্থের নাম জানা যায়—(১) সূত্র সমুচ্চয়, (২) শিক্ষা সমুচ্চয়, (৩) বোধিচর্য্যাবতার।

মূঢ়া হি অহি (মূর্খের হৃদয়ে) ন পইসই (ইহার অর্থ প্রবেশ করিবে না)।”

এই গানটির ও বৌদ্ধ গান ও দোহার অন্যান্য গানগুলির মধ্যে উপরোক্ত সহজ অর্থ ছাড়াও ইহাদের মধ্যে আর একটি সাধন-কৌশল সূচক গূঢ় সাঙ্কেতিক অর্থ আছে বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ সেই গোপন অর্থ বৌদ্ধগুরুগণ শিষ্যদের নিকটই প্রকাশ করিতেন, অন্যের পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্যই থাকিত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতক হইতে দশম শতক পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গে শক্তিশালী পাল রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। ইহারা মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইহাদের অনেকে উত্তরাপথের অনেকাংশ জুড়িয়া রাজ্য বিস্তার করিলেও ইহারা খাটি গৌড়বাসী ছিলেন। উত্তর বঙ্গ বা বরেন্দ্রী ইহাদের পিতৃভূমি ছিল। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত হইলেও এদেশীয় বৈদিক ও লৌকিক ধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ ছিল না। দিনাজপুর জেলায় স্থাপিত গরুড়স্তম্ভলিপি পাঠে জানা যায় যে, বৈদিক-যাগযজ্ঞপরায়ণ একটি ব্রাহ্মণবংশ পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের মন্ত্রী ছিলেন। এই রাজারা বেদপন্থীগণের দেবতার জন্য ভূমিদান করিতেন ও যজ্ঞের শান্তিবারি গ্রহণ করিতেন। অনুমান করা যাইতে পারে এই সময় বৌদ্ধাচার্য্যগণের অবলম্বিত লৌকিক ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের কৌশল ক্রমশঃ বেদপন্থী ও অন্যান্য পন্থার ধর্ম্মাচার্য্যগণও অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং লৌকিক ভাষায় রচিত গান ও কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহাদের দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নতুবা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যে সকল পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহা ঐতিহ্যহীন হইয়া পড়ে। সেই সকল গান ও কবিতা কালের

এই বইগুলি মহাযান মতের বই। ভুসুকুর আরও একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে —যাহা হয় বজ্রযানের, নয় সহজযানের শিক্ষা সমুচ্চয় সংস্কৃত ছাড়া আরও এক দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লেখা আছে। ইহাতে তান্ত্রিক ধর্ম্মেরও অনেক কথা আছে। শেষ অর্থাৎ চতুর্থ পুস্তকখানিতে কতক সংস্কৃত, কতক বাঙলা ভাষা আছে। মহাযান মত হইতেই বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযানের উৎপত্তি।

“চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে” ভুসুকুর একটি গান আছে—

বাজনাব পাড়ি পঁউয়া খালেঁ বাহিউ।
অদয় বঙ্গালে ক্লেশ লুড়ি উ ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিজ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥

কবল হইতে রক্ষা পায় নাই বটে, কিন্তু সেই মূল উপাদানগুলি না থাকিলে খৃঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বড়বড় মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হওয়া সম্ভব হইত না।

পাল রাজবংশের গোপালদেব (১ম) হইতে মদনপাল (অনুমান ৭৫০ খৃঃ হইতে ১১৬২ খৃঃ) পর্য্যন্ত রাজাগণ একাধিপত্য করিয়া যান। তৎপর সেন বংশের বিজয়সেন হইতে কেশব সেন (অনুমান ১০৯৬ হইতে ১২৪৫ খৃঃ) পর্য্যন্ত সেন রাজগণ এখানে রাজত্ব করেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা এদেশের বৈদিক ও লৌকিক ধর্ম্মাবলম্বীগণের বিরোধিতা না করিলেও তৎকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রচারকার্য্য অবাধগতিতে চলিতেছিল। গৌড় বঙ্গের লোকেরাও এই ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন আচার ও প্রাচীন বিশিষ্ট মতবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহারা বৈদিক ধর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল না।

বৈদিক ধর্ম্মের উৎপত্তি মধ্য দেশে। কিন্তু এই সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি প্রগতিশীল আর্য্যগণের দেশে—মগধ, মিথিলা ও গৌড়-বঙ্গের অধিকারের মধ্যে। বেদের ধর্ম্ম অনেকটা গৃহস্থের ধর্ম্ম। আর এই সকল ধর্ম্ম বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। ইহারা বলে গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম, জরা, মরণের নাশ হয় তাহার ব্যবস্থা কর। সাংখ্যমত এই সকল মতের আদি। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে। কপিল ঋষির আশ্রম কপিলাবাস্তু বুদ্ধদেবের জন্মস্থান এবং

বজ্র নৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মাখালে বাহিলাম। অদ্বয় বঙ্গাল [দেশে] আসিয়া ক্লেশকে লুটাইয়া দিলাম। রে ভুসু, আজ তুই বঙ্গালী হইলি। চণ্ডালীকে নিজ ঘরণী করিয়া লইলি।

ইহার আর একটি গূঢ়ার্থ আছে। সহজিয়া মতে সাধনপথ তিনটি। অবধূতী, চণ্ডালী ও বঙ্গালী। অবধূতীতে দ্বৈতজ্ঞান, চণ্ডালীতে দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান, বঙ্গালীতে কেবল অদ্বৈত জ্ঞান থাকে।

বজ্র নৌকার গূঢ় অর্থ বজ্রযান মার্গ। পদ্মার খালের গূঢ় অর্থ ষটপদ্ম বা ষট্‌চক্র। সুতরাং উপরোক্ত চর্য্যাপদটির গূঢ় অর্থ সম্ভবত এইরূপ হইবে। "রে ভুসুকু, বজ্রযান মত অবলম্বন করিয়া তুই ষটপদ্মের ছিদ্রপথে প্রবেশ করিলি। ক্রমে অবধূত মার্গ (দ্বৈত জ্ঞান) হইতে চণ্ডালী অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞানকে নিজ সঙ্গিনী করিয়া লইয়া বঙ্গালী অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞানে পৌঁছিলি এবং তোর সমস্ত ক্লেশ দূর হইল।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন ভুসুকু বা শান্তিদেব বাঙালী ছিলেন।

ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি জনক মিথিলার রাজা ছিলেন।

পালরাজ বংশের প্রথম রাজা গোপালদেব স্বয়ং মহাযান সম্প্রদায়ের চুন্দাদেবীর উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার আদেশে অবলোকিতেশ্বর খসর্পণের আরাধনা করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন [১]।

খৃঃ পূঃ

১। ৪৮৩ ~~খৃষ্টাব্দে~~ কুশীনগরের শালবনে গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। অতঃপর রাজগৃহে ভিক্ষুগণের প্রথম সম্মেলনে অভিধর্ম্ম, বিনয় ও সূত্রপিটক সঙ্কলিত হয়। ইহার শত বর্ষ পরে মতভেদ হেতু বৈশালীতে একদল ভিক্ষু সমবেত হন। তাঁহারা স্থবিরবাদী বা থেরাবাদী নামে পরিচিত হন। অপর দল কৌশাম্বীতে মিলিত হন। ইঁহাদের নাম হইল মহাসাঙ্ঘিক। তাঁহারা বুদ্ধদেবের কঠোর শীল-ধর্ম্ম পালনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ইঁহারা যে নূতন বিনয় পিটক রচনা করেন তাহার নাম মহাবস্তু অবদান। কনিষ্কের সময় কাশ্মীরে একদল ভিক্ষু বসুমিত্র ও অশ্বঘোষের নেতৃত্বে মিলিত হইয়া বৈভাষিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃঃ দ্বিতীয় শতকে সিদ্ধ নাগার্জ্জুন প্রজ্ঞাপারমিতা ও মাধ্যমিক কারিকা ও তাঁহার শিষ্য আর্য্যদেব চিত্তশুদ্ধি প্রকরণ ও চতুঃষষ্ঠীক রচনা করিয়া মহাসাঙ্ঘিকগণকে এক নূতন পথে চালিত করেন। তাহার নাম বোধিসত্ত্বযান হয়। এই বোধিসত্ত্বযানবাদীগণই মাধ্যমিক বা মহাযানবাদী ও থেরাবাদীগণ হীনযানবাদী আখ্যা লাভ করেন। হীনযানীগণ কেবল গৌতম বুদ্ধ ব্যতীত লোকোত্তর বুদ্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মহাযানীদের মতে লোকোত্তর বুদ্ধই আদি বুদ্ধ এবং প্রজ্ঞাপারমিতা তাঁহার শক্তি। এই আদিবুদ্ধ ও প্রজ্ঞাপারমিতাই জগতের মূল। ইঁহারা নির্ব্বাণলোকে বাস করেন। এই আদি বুদ্ধও প্রজ্ঞাপারমিতা হইতে (১) বৈরোচন (শক্তি, আর্য্যতারিকা-বজ্রধাতেশ্বরী), (২) অক্ষোভ্য (শক্তি, রোচনা), (৩) রত্ন সম্ভব (শক্তি, মামকী), (৪) অমিতাভ (শক্তি, পাণ্ডরা) ও (৫) অমোঘ সিদ্ধি (শক্তি, তারা) এই সশক্তি পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের উদ্ভব হয়। অতঃপর এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ও তাঁহাদের শক্তি হইতে (১) সামন্তভদ্র (২) বজ্রপাণি (৩) রত্নপাণি (৪) পদ্মপাণি ও (৫) বিশ্বপাণি এই পঞ্চ বোধিসত্ত্ব ও তাঁহাদের শক্তিসমূহের উদ্ভব হয়। আদি বুদ্ধই আবার লোক হিতার্থ মানুষ বুদ্ধ রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ইহা অনেকটা পৌরাণিক যুগের বিষ্ণুর অবতারবাদের ন্যায়। এইরূপ মতবাদের ফলে মহাযানী বৌদ্ধগণ ধ্যানী বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও তাঁহাদের শক্তিগণের উপাসক হইয়া উঠিলেন। বহুবিধ বোধিসত্ত্বগণের ও তারা, কালী, সরস্বতী, চুন্দা প্রভৃতি শক্তিগণের ভাবময়ী মূর্ত্তি গঠিত হইয়া তাহাদের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার

ভুসুকু, কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নপাদ, লুই বা মৎস্যান্ত্রাদ ও লুইএর বংশীয় তিলপাদ নামক সিদ্ধাচার্য্যগণ সকলেই সহজিয়া ছিলেন। ইহারা সকলেই বাঙ্গালী। ইহারা সকলেই সহজিয়া গান লিখিয়াছেন। সহজযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ইহারা সকলেই মহাযানের পরিণতি ১।

পূর্ব্ব হইতেই বেদপন্থী ও বৌদ্ধ মতের মধ্যে একটা সমন্বয় আরম্ভ হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের ফলে যে মতবাদের সৃষ্টি হইল তাহারই এক ধারা বর্ত্তমান বৈষ্ণব মতের ও অপর ধারা আধুনিক শৈব ও শাক্তমতের মূল। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার মধ্যে এই সমন্বয়কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্যানী বুদ্ধগণের শক্তিগণের মধ্যে তারা দশমহাবিদ্যা মধ্যে এবং মামকী ও পাণ্ডরার পূজা দুর্গা পূজার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান পূজা পদ্ধতিও এই সমন্বয়েরই ফল।

১। এই সময় যোগাচার ও মাধ্যমিক মতবাদ কেবলমাত্র পণ্ডিতেরাই আলোচনা করিতেন। সর্ব্বাস্তিবাদ ও মহাসাঙ্ঘিকবাদও নামে মাত্র প্রচলিত ছিল। মহাযানমার্গ বলিলে কেবলমাত্র বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযানই বুঝাইত। বজ্রযানে মন্ত্র, আচার ও মুদ্রা প্রধান ছিল। সহজযানে আচার ও মন্ত্রের স্থান গৌণ। 'বজ্র' শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা। ইহাই তান্ত্রিকগণের শক্তি। ইহার সাধনের জন্য গুরুর প্রয়োজন। এই সাধন প্রণালী ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও বাঙ্গালী এই পঞ্চ "কুলে" বিভক্ত। এই পাঁচটি "কুল" প্রজ্ঞার পাঁচটি ভাব। ইহার সাধন মার্গের নাম যোগ। এই শক্তি যখন মূলাধারে নিদ্রামগ্ন থাকে তখন তাহাকে "কুলকুণ্ডলিনী" বলে। ইহা যতই চক্রে চক্রে উর্দ্ধে উত্থিত হয় ততই বোধিচিত্তের বা প্রজ্ঞার বিকাশ হয়। উক্ত পাঁচ প্রকার কুলে পঞ্চ তথাগত অধিষ্ঠিত। এই কুলাচারীগণের শাস্ত্রের নাম কুলাগম, এবং কুলমার্গের সিদ্ধগণকে "কুলীন" বলা হয়। গৌড়ীয় শাক্তগণের মতে কুল অর্থ শক্তি ও অকুল অর্থ শিব। ষট্‌চক্রভেদ' করিয়া নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারস্থিত পরম শিবের সহিত যুক্ত করাই শাক্তগণের গুহ্য সাধনা। কালচক্রযানের প্রধান গুরু অভয়াকর গুপ্ত। তিনি গৌড়েশ্বর রামপালের সময় বর্ত্তমান ছিলেন এবং কালচক্রযান সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কালচক্রযানেও যোগের উপযোগিতা স্বীকার করা হয়। এই মতের বিশেষত্ব এই যে এই মতবাদীগণ কাল অর্থাৎ মুহূর্ত্ত, তিথি, রাশিচক্র প্রভৃতি জ্যোতিষীক গণনার উপর নির্ভর করিয়া ক্রিয়া করেন।

সহজযান, বজ্রযান, কালচক্রযান এই তিন মতের কিছু কিছু বিশেষত্ব থাকিলেও সকলেরই অন্তিম লক্ষ্য "মহাসুখ" (পরমানন্দ) লাভ করা। নাথ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে মীননাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথ ওরফে সিদ্ধাচার্য্য লুই পাদ), গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ প্রধান। ইহারা যোগসিদ্ধি দ্বারা অলৌকিক শক্তিলাভের পক্ষপাতী।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দ্বাদশ ধূতাঙ্গ—অর্থাৎ ভিক্ষান্নগ্রহণ, তরুতলে বাস, ছিন্নমলিন বস্ত্র পরিধান প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অবধূতগণ এই পন্থাবলম্বী। অদ্বয় বজ্রের অপর নাম ছিল অবধূতীপাদ। যোগসিদ্ধি লাভ করা ইহাদেরও লক্ষ্য।

সহজিয়া মত প্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণবগণ মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই মত দ্বারা জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, চৈতন্যদেব যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

কতকগুলি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বাউলদের মতবাদ জানা যায়। ইহারা বৌদ্ধ সহজযানেরই অনুবর্ত্তী। বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণবাদ পরিহার করিয়া চলিলেও ইহারা মহাসুখবাদী ও যোগপন্থী।

বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মঠাকুরের পূজার উদ্ভব হইলেও ইহা আর বর্ত্তমান নাই। ধর্ম্মপূজাবিধি, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ হইতে ইহার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। উপরোক্ত সমস্ত সাধনমার্গ এক্ষণে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

এখনকার কীর্ত্তন গানকে 'পদ' বলে। সহজযানের গানগুলির নাম চর্য্যাপদ। এই সময় নাথেরাও অনেক বাঙলা পদ্যে বই লিখিয়াছেন। গোরক্ষনাথ তাঁহাদের অগ্রণী। গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল রমণ বজ্র। তারানাথের মতে গোরক্ষনাথের নাম অনঙ্গবজ্র ছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথের নামও বিখ্যাত। সহজযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, যামল, ডামর, ডাকপন্থ, নাথপন্থ প্রভৃতি সমস্ত লোকায়ত ধর্ম্মকেই 'তন্ত্র' বলা হয়। ইহারা সকলেই গুরুবাদী। সরোহ পাদের দোঁহাকোষে ও অদ্বয়বজ্রের টীকায় ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ (জৈন), বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাংখ্য মতবাদীগণের মতের আলোচনা আছে। ব্রহ্মবাদীগণের বেদ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞান ও জাতিভেদকে তিনি উপহাস করিয়াছেন। তিনি বলেন ব্রহ্মবাদীগণের মতে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তো অন্য লোকেরা যেরূপে জন্মে, ব্রাহ্মণও সেই রূপেই জন্মে। সুতরাং ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব থাকিল কোথায়? যদি বল সংস্কার দ্বারা ও বেদপাঠ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তবে সকলকেই সংস্কার দাও ও বেদ পড়াও—তাহারাও ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে। আগুনে ঘি দিলে মুক্তি হয়, ইহা মিথ্যা কথা। ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় মাত্র। যাহারা ঈশ্বরবাদী তাহাদের নেতারা জটাধারণ করিয়া ভস্ম মাখিয়া

তন্ত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া লোককে ধাঁধা দেয়। ঈশ্বর তো বস্তু বিশেষ। যখন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই—তখন ঈশ্বর থাকিবেন কি করিয়া।

অর্হৎ অর্থাৎ নির্গ্রন্থ জৈনদের সম্বন্ধে সরোহ বজ্র বলেন যে, ইহারা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকায়। ইহারা নিজ শরীরকে কষ্ট দেয়, নগ্ন হইয়া থাকে ও নিজের কেশোৎপাটন করে ও ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করে। যদি নগ্ন থাকিলে মুক্তি হয়, তবে ছাগল কুকুরের মুক্তি আগে হইবে। যদি কেশোৎপাটনে মুক্তি হয়, তবে লোমহীন জন্তুদের মুক্তি আগে হইবে। ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তবে হাতী ঘোড়াকে লোকে ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজায়, তাহাদের মুক্তি আগে হইবে। তাহারা বলে ব্রহ্মাণ্ডের উপর মোক্ষ ছিয়াশী যোজন ব্যাপিয়া ছত্রাকারে আছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডই যখন অনিত্য তখন ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইলে মোক্ষও লোপ পাইবে।

বৌদ্ধ শ্রমণদের সম্বন্ধে সরোহ বলেন হীনযানী স্থবিরদের কাহারও দশ, কাহারও কোটি শিষ্য। সকলেই গেরুয়া পরে ও লোক ঠকাইয়া খায়। তাহাদের যদি শীলভঙ্গ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহারা নরকে যায়। মহাযানীদেরও মোক্ষ হয় না। তিনি আরও বলেন—লোকায়ত ও সাংখ্য মতেও মুক্তি হয় না। সহজ মতে না আসিলে মুক্তির কোন পথ নাই। শেষে সকলকেই সহজ পথে আসিতেই হইবে। ভাবও নাই অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ—ভব ও নির্ব্বাণে কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং সহজবাদীরা অদ্বয়বাদী। মানুষের স্ব-ভাবই এই—সে চির মুক্ত। সরোহ পাদের শেষ দুইটি দোঁহা এই—

পর অপ্পান ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এ হু সো নিম্মল পরম পাউ চিত্ত স্বভাবে শুদ্ধ॥
অদ্বয় চিত্ত তরুঅর হরউ তিহু অনে বিস্থার
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই নামে পর উ আর॥

আপন ও পর, এ ভ্রান্তি করিও না (দুই-ই এক)। সকলই নিরন্তর বুদ্ধ। এই সেই নির্ম্মল পরম পদ্ম [স্বরূপ] চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ। অদ্বয় চিত্ত তরুর অবস্থা ত্রিভুবন হরণ করে, তখন করুণার ফুল ফোটে ও পর উপকার [রূপ] ফল ধরে।

তাঁহার আর একটি দোঁহার একাংশ এই—

অপনে রচি রচি ভব নির্ব্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা॥

লোক মিথ্যা ভব ও নির্ব্বাণ রচনা করিয়া আপনাকে বদ্ধ করে।

সরোহপাদের দোঁহাকোষের টীকাকার অদ্বয় বজ্রের গ্রন্থ হইতে অভয়াকর গুপ্ত অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই অভয়াকরগুপ্ত রাজা রামপালের রাজত্বের পঁচিশ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সুতরাং সরোহপাদ রাজা রামপালের (১০৭৮-১১২৪ খৃঃ) সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সরোহপাদ ও অদ্বয় বজ্রের অনেকগুলি গ্রন্থের তেঙ্গুরে অনুবাদ দেওয়া আছে।

বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময় বাঙলায় বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অব্রাহ্মণ ধর্ম্মের প্রভাব বাড়িয়া গিয়াছিল। সেন রাজাদের সময় ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি আবার প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজয়সেন কাশী হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন। বল্লালসেন সাত শত নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলাচারী ব্রাহ্মণ ও কুলাচারী বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ দলে টানিয়া লইলেন। ইহাদের চেষ্টায় বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযানভুক্ত বৌদ্ধগণ ও নাথপন্থী প্রভৃতি অবৈদিক সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় বাহ্মণ্য ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে মিশিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় এই সময়েই নাথপন্থীগণ 'গোপীচন্দ্রের গীত', 'গোরক্ষ বিজয়', 'মীনচেতন', 'ময়নামতির গীত' প্রভৃতি কাব্য বাঙলা ভাষায় রচনা করিয়া পালা করিয়া গান করিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ ও তাহার শিষ্য হাড়িপা ও প্রশিষ্য কানিপার অলৌকিক যোগবল প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া এই গানগুলি রচিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত রচনাগুলি ছাড়া পাল ও সেন রাজাদের সময়ে ও তাহারও অনেক পূর্ব্ব হইতে বাঙালীরা প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে ঐ সকল গ্রন্থের ও রচয়িতাদের পরিচয় দেওয়া হইল :—

১। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের পালকাপ্য নামক কাশ্যপ গোত্রীয় এক ঋষি হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ নামক হস্তীচিকিৎসা সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে তথায় তাঁহার বাস ছিল বলিয়া তিনি গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন। এই স্থান বাঙলাদেশের উত্তর-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

২। কল্পসূত্র।

জৈনদের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত হয়। এই গ্রন্থের রচয়িতা ভদ্রবাহু একজন বাঙালী ছিলেন। রত্ননন্দী এই ভদ্রবাহুর একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন। রত্ননন্দী সম্ভবতঃ পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকের

লোক। দিগম্বর পট্টাবলীর মতে কুন্দাচার্য্য প্রথম খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন—তাঁহার গুরু ভদ্রবাহু। রত্ননন্দীর ভদ্রচরিতে লিখিত আছে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের কোট্টপুর নগরে মাতা সোমশ্রীর গর্ভে ভদ্রবাহুর জন্ম হয়। ভদ্রবাহুর পিতা সোমশর্ম্মা পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজা পদ্মধরের পুরোহিত ছিলেন। জৈনাচার্য্য গোবর্দ্ধনাচার্য্য ভদ্রবাহুর গুরু ছিলেন। জৈনদের ২৪ জন তীর্থঙ্করের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যক্রমে তিনজন ছিলেন কেবলী (পূর্ণজ্ঞানী)। তাঁহাদের পরে ক্রমে পাঁচজন ছিলেন "শ্রুত কেবলী"। এই শ্রুত কেবলীদের শেষ জন ভদ্রবাহু।

৩। চন্দ্রগোমী ও চান্দ্রব্যাকরণ

তিব্বতীয় তারানাথ ও সুম্পার মতে চন্দ্রগোমী বারেন্দ্র দেশে ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চান্দ্র ব্যাকরণ রচনা করেন। পাণিনি যে সকল 'সূত্র' করেন নাই, চান্দ্র ব্যাকরণে তাহা রচিত হইয়াছে। বি লাইবিচ (B. Liebich) বৃত্তিসহ এই ব্যাকরণ ছাপাইয়াছেন। তাঁহার মতে ৪৬৫ খৃঃ হইতে ৫৪৪ খৃঃ-এর মধ্যে এই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। জয়াদিত্য ও বামন রচিত "কাশিকা" ভাষ্যে চান্দ্র ব্যাকরণের ৩০টি সূত্র গৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রগোমী তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে সর্ব্বজ্ঞের (বুদ্ধদেবের) বন্দনা করায় তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহাই সূচিত হইতেছে।

৪। গৌড়পাদ

ইনি একখানি কারিকা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার নাম "গৌড়পাদ কারিকা"। ইনি ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার টীকাও রচনা করেন। ইনি অনুমান সপ্তম খৃষ্টাব্দের লোক এবং গৌড়বাসী ছিলেন।

৫। গৌড়অভিনন্দ

শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে ইহার অনেকগুলি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬। শীলভদ্র

চীনা পরিব্রাজক য়ুয়াংচুয়াং (হিউয়েন সঙ্গ) বৌদ্ধধর্ম্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি আশাতিরিক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শীলভদ্র। শীলভদ্র সমতটের রাজপুত্র ছিলেন। য়ুয়াং চুয়াং যখন ভারতে আসেন (৬৩৭ খৃঃ) তখন শীলভদ্র প্রসিদ্ধ নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ। বড় বড় রাজারা এমনকি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত তাঁহাকে সসম্মানের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার নিকট শ্রদ্ধায় অবনত হইতেন। য়ুয়াং চুয়াং

লিখিয়াছেন, নানাদেশের গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার যে সকল সন্দেহ মিটে নাই, আচার্য্য শীলভদ্রের উপদেশে সে সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। শীলভদ্র মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন। সমস্ত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। নানা দেশে নানা শাস্ত্র শিখিয়া তিনি যখন নালন্দায় আসেন তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। তখন বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ। এই সময় দক্ষিণ দেশ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধরাজের নিকট আসিয়া ধর্ম্মপালের সহিত বিচার প্রার্থী হন। ধর্ম্মপাল বিচারের জন্য যাইতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু শীলভদ্র বলিলেন, "আমি থাকিতে আপনি যাইবেন কেন?" এই বলিয়া তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সহজেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র কাষায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বয়ং দান গ্রহণ না করিয়া ঐ নগরের রাজস্ব দ্বারা একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। য়ুয়াং চুয়াং লিখিয়াছেন যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে শীলভদ্র প্রাচীন বৌদ্ধাচার্য্যগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। "আর্য্যবুদ্ধভূমিব্যাখ্যা" নামক তাঁহার মাত্র একখানি গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৭। শান্তিরক্ষিত

তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে আচার্য্য শান্তিরক্ষিত নালন্দার একটি মঠের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার নিবাস গৌড় দেশে ছিল। তিব্বতরাজ স্রং-সাং-গাম্পোর বংশধর খ্রী-স্রং-ইতে-সান শান্তিরক্ষিতকে তিব্বতে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। শান্তিরক্ষিতের চেষ্টায় ওদন্তপুরী বিহারের ন্যায় তিব্বতে সাম-আ (BSam-ya) বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ পাওয়া যায়। তিনি তিব্বতে লামা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ইনি 'তত্ত্ব সংগ্রহ' গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থও তাঁহার শিষ্য কমলশীলের (৭১৩ খৃঃ) 'পঞ্জিকা টীকা'—'গায়োকবাড়' গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে। শান্তিরক্ষিত শুভগুপ্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৮। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

দীপঙ্কর বিক্রমপুরের এক রাজ পরিবারে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ঐ সময় চন্দ্রগর্ভ ছিল। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। তিনি প্রথম জীবনে জেতারী পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করেন।

বোম্বাই প্রদেশের কৃষ্ণগিরি (কানহেরি) মঠের আচার্য্য রাহুলগুপ্ত তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের গুহ্যমতে দীক্ষিত করেন এবং গুহ্যজ্ঞান বজ্র উপাধি প্রদান করেন। উনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাজ্ঞিক আচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হন। একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি আচার্য্য ধর্ম্মরক্ষিতের নিকট ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। তিনি সুবর্ণ দ্বীপে (সুমাত্রা) গমন করিয়া মহাস্থবির চন্দ্রকীর্ত্তির নিকট দ্বাদশ বৎসর শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তথা হইতে সিংহলদ্বীপ হইয়া মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাজা মহীপাল তাঁহাকে বিক্রমশীল মহাবিহারে আহ্বান করিয়া আনেন। এই সময় স্থবির রত্নাকর ঐ বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। মহীপালের পুত্র রাজা নয়পাল তাঁহাকে বিক্রমশীলা মঠের আচার্য্য নিযুক্ত করেন। তিনি ৭০ বৎসর বয়সে তিব্বত রাজের নিমন্ত্রণে তিব্বতে গমন করিয়া তথায় মহাযান মত ব্যাখ্যা করেন। তিব্বতের লোকেরা তথায় দৈত্য দানবের পূজা করিত। তাই তিনি তাহাদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ মহাযান ধর্ম্ম প্রচার না করিয়া ইহাদের শিক্ষার জন্য বজ্রযান ও কালচক্রযানের বহু গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ করেন ও অনেক পূজা পদ্ধতি স্তোত্রাদি রচনা করেন। তিব্বতীগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করে। তিব্বতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

৯। ভাগবৃত্তিকার বিমলমতি

বাঙলা দেশে মহাভাষ্যের অনুযায়ী ব্যাকরণ ব্যাখ্যাতা হইলেন "ভাগবৃত্তিকার"। শ্রীপতি দত্তের কাতন্ত্র পরিশিষ্টের মতে ভাগবৃত্তিকারের নাম বিমল মতি (১/১৪২) "ভাগবৃত্তিকৃতা বিমল মতিনা"। নবম কি দশম খৃষ্টাব্দে ভাগবৃত্তি রচিত। পদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড ১৮৯।২-৭) গৌড় রাজ নরসিংহের উল্লেখ আছে। তাঁহার সময়ে ফণীশ্বর মহাভাষ্যকে পুনরুজ্জ্বল করেন। ক্ষিতিমোহন সেন মনে করেন বিমলমতি জৈন মুনীশ্বর ছিলেন (চিন্ময় বঙ্গ পৃঃ ২৯ ও ৯১)।

কৃপালুর্নরসিংহোভুন্নাম্না গৌড়েষু ভূপতিঃ ॥ ২

পুনরুজ্জ্বলয়াঞ্চক্রে মহাভাষ্যং ফণিশ্বরঃ ॥ (পদ্ম, উত্তর, ১৮৯)

১০। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম্

সন্ধ্যাকর নন্দী বারেন্দ্র কায়স্থ ছিলেন। মহাস্থানগড়ে নন্দীবংশের প্রশস্তি যুক্ত একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (সাঃ পঃ পত্রিকা) সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা প্রজাপতি নন্দী রাজা রামপালের সময় সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন ও তিনি "করণ্যনামগ্রণী" [করণগণের অগ্রণী] বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সন্ধ্যাকর

রামপালের পুত্র মদন পালের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। "রামচরিতম্" কাব্যে পাল বংশের মোটামুটি ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। রামপাল কর্ত্তৃক বরেন্দ্র উদ্ধার এই কাব্যের বিষয়বস্তু। বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি টীকা সহ এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছে।

১১। শ্রীধর ভট্টের "ন্যায়কন্দলী"

শ্রীধর ভট্ট দক্ষিণ রাঢ়ের ভুরিশ্রেষ্ঠী গ্রামবাসী ছিলেন। তিনি ৯১৩ শকে (৯৯১ খৃঃ) ঐ গ্রামের কায়স্থ রাজা পাণ্ডুদাসের অনুরোধে প্রশস্তপাদের "পদার্থ ধর্ম্ম সংগ্রহভাষ্য" নামক বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যের "ন্যায় কন্দলী" নামক টীকা ও আরও কয়েকখানি অপ্রাপ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

১২। জিনেন্দ্রবুদ্ধি ও মৈত্রেয়রক্ষিত

জিনেন্দ্র বুদ্ধির কাশিকা বিবরণ পঞ্জিকা বা ন্যাস নামক টীকা ও মৈত্রেয়রক্ষিত 'ধাতু প্রদীপ' রচনা করেন। উভয় গ্রন্থ বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থদ্বয়ের সম্পাদক শ্রীশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহাদিগকে বাঙালী বলিয়া মনে করেন। কারণ ইঁহাদের গ্রন্থের সমস্ত টীকাকারই বাঙালী।

১৩। বৈদ্যক শাস্ত্র প্রণেতা মাধব কর, চক্রপাণি দত্ত (১০৬০ খৃঃ), সুরেশ্বর ও বঙ্গসেন।

ইন্দুকরের পুত্র মাধব কর 'রোগবিনিশ্চয়' বা 'নিদান' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই নিদান অষ্টম খৃষ্টাব্দে হারুন-অল-রসিদ অনুবাদ করেন। চক্রপাণি দত্তের চরক ও সুশ্রুতের টীকা এবং চিকিৎসা সংগ্রহ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। চক্রপাণি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা নারায়ণ দত্ত গৌড় পতির পাত্র ও রন্ধনশালার অধ্যক্ষ। ভ্রাতা ভানু দত্ত উক্ত রাজার অন্তরঙ্গ (বিদ্যা-কুলসম্পন্ন ভিষক্) ও তাঁহারা লোধ্রবলী কুলীন ছিলেন। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের টীকাকার শিবদাস সেন বলেন ঐ গৌড়পতির নাম নয়পালদেব। চক্রদত্তের সমাপ্তিতে "গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারী পাত্র নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োন্তরঙ্গাৎ। ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী॥" শ্লোকটি আছে।

সুরেশ্বর রচিত "শব্দপ্রদীপ" একখানি ভৈষজ্য কোষ। এই গ্রন্থে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহারা "করণান্বয়জ" (কায়স্থ) ছিলেন। তাঁহার পিতামহদেবগণ রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের (১০২৪ খৃঃ) বৈদ্যগণাগ্রণী ছিলেন। পিতা ভদ্রেশ্বর সকল বৈদ্যশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন ও বঙ্গপতি

রামপালের রাজ্য অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন (১০৭৮-১১২০ খৃঃ)। ভদ্রেশ্বর স্বয়ং পাদীশ্বর (বাদীশ্বর বা বাদায়ুণপতি ?) শ্রীভীমপাল নৃপতির (১১৩০-৪০ খৃঃ) অন্তরঙ্গ ভিষক্‌ ছিলেন (India Office Catalogue No. 2739 Vol. V)। তিনি বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ ও লোহপদ্ধতি নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বঙ্গসেন 'চিকিৎসাসার সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার পিতা গদাধর কাঞ্জিকগ্রামবাসী ছিলেন। বঙ্গসেন মাধবকরের "রোগবিনিশ্চয়" হইতে অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপর পক্ষে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের হেমাদ্রি তদীয় "আয়ুর্ব্বেদ রসায়ণে" বঙ্গসেনের গ্রন্থ হইতে অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৪। ধর্ম্মশাস্ত্র লেখক ভবদেব ভট্ট, জিতেন্দ্রীয়, বালক, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ ভট্ট, বল্লালসেন, হলায়ুধ, ঈশান।

ভুবনেশ্বর প্রস্তর লিপি হইতে জানা যায় যে, ভবদেব বঙ্গপতি হরিবর্ম্মদেবের (১০৭২-১১১২ খৃঃ) মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সাবর্ণ গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতামহ আদিদেবও অন্য একজন বঙ্গপতির মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তাঁহার পিতা গোবর্দ্ধন ও মাতা সাঙ্গোকা। তাঁহার মাতামহ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় ছিলেন। তিনি তৌতালিক বা কুমারিল ভট্টের তন্ত্রবার্ত্তিকের উপর 'তৌতালিক মত তিলক' নামক মীমাংসাদর্শনের নিবন্ধ, 'ব্যবহার তিলক', 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ', 'ছান্দোগ্যকর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি' বা 'দশকর্ম্মপদ্ধতি' এবং 'হোরা শাস্ত্র' রচনা করেন।

জীমূতবাহন নিজেকে "পরিভদ্রীয়" অর্থাৎ পাড়িহাল গাঁই বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ ১০১৪ শকে (১০৯২ খৃঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে ঐ শকের উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মরত্ন (ব্যবহার মাতৃকা, কালবিবেক ও দায়ভাগ) নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। জীমূত-বাহন তাঁহার গ্রন্থে জিকন, শ্রীকর প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধকার ও জোগ্লোক, অন্ধুকভট্ট, প্রভৃতি জ্যোতিষ নিবন্ধকারের নাম করিয়াছেন। জীমূতবাহনের গ্রন্থগুলিতে জিতেন্দ্রিয়ের ও বালকের অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১০৮১ শকে (১১৫৯ খৃঃ) বন্দ্যঘটিয় আর্ত্তিহরের পুত্র সর্ব্বানন্দ 'টীকাসর্ব্বস্ব' নামক অমরকোষের একখানি ব্যাখ্যাটীকা প্রণয়ন করেন (১।৪।২১)। ত্রিশতাধিক সংস্কৃত শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ ইহাতে আছে। গ্রন্থারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন "অথ টীকাসর্ব্বস্বং দশটীকাবিৎ কারত্যমরকোষে শ্রীমৎ সর্ব্বানন্দো বন্দ্যঘটীয়ার্ত্তিহর পুত্রঃ"। (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ ১৯১৪ খৃঃ)।

অনিরুদ্ধ ভট্ট মহারাজ বল্লালসেনের (১১৫৯-৭৮ খৃঃ) গুরু ছিলেন। দান-

সাগরের উপক্রমে বল্লালসেন লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতির ন্যায় অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁহার গুরু ছিলেন এবং বরেন্দ্রীতে তিনি বেদার্থ ও স্মৃতি সঙ্কলনের আদি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার 'হারলতা' নামক স্মৃতি সংগ্রহ হইতে জানা যায় যে তিনি চম্পাহট্ট গ্রামীণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বিহার গ্রামে [বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিহার গ্রাম] তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার সামবেদীয় সন্ধ্যা শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধীয় 'পিতৃদয়িতা' ও 'কর্ম্মোপদেশীনি পদ্ধতি' নামক স্মৃতিগ্রন্থ ও সাংখ্য দর্শনের টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। [মৎপ্রণীত বগুড়ার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৫৯-৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য]। হারলতা অনুসারে মহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ ভট্ট বল্লালসেনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও 'ভট্টনয়ার্থবিদ্‌ ছিলেন।

বল্লালসেন স্বয়ং দানসাগর, অদ্ভুতসাগব, আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনের (১১৭৮-১২০৫ খৃঃ) ধর্ম্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' ও 'মাৎস্য সূক্ত', হলায়ুধের ভ্রাতা ঈশান 'আহ্নিক পদ্ধতি' এবং লক্ষ্মণসেনের অপর মন্ত্রী পশুপতি 'সংস্কার পদ্ধতি' রচনা করেন।

১৫। সংস্কৃতকাব্য

সেনরাজগণের সময় অনেকগুলি বাঙালী কবির আবির্ভাব ঘটে। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্তচূড়ামণি বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস ১১২৭ শকের ২০শে ফাল্গুন (১২০৬ খৃঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী) তারিখে তাঁহার 'সদুক্তি কর্ণামৃত' রচনা করেন। এই সংগ্রহ গ্রন্থে বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন ও মাধবসেনের এবং ধোয়ী, উমাপতি-ধর, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব প্রভৃতি ৫৮৫ জন কবির ২৩৭০টি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই সংস্কৃতে কাব্য ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে বাঙালী ছিলেন। ধোয়ী (২৯।২)র একটি কবিতায় লক্ষ্মণসেনকে গৌড়ের বিক্রমাদিত্য বলা হইয়াছে। গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতিধর, কবিরাজ (ধোয়ী) এই পাঁচজন লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্ন ছিলেন। জয়দেব গোবর্দ্ধনাচার্য্যের নাম করিয়াছেন। ইহার আর্য্যা সপ্তশতী নামক কাব্যের নাম জানা যায়। শরণ দেবের একটি কবিতা সদুক্তিকর্ণামৃতে (৩।৫৪।৫) উদ্ধৃত হইয়াছে। "দুর্ঘটবৃত্তি" নামক ব্যাকরণ ইনি ১০৯৫ শকে (১১৭৩ খৃঃ) রচনা করিয়াছেন। উমাপতি ধরের প্রায় ৯০টি কবিতা সদুক্তিকর্ণামৃত উদ্ধৃত হইয়াছে ও তাঁহার চন্দ্রচূড় চরিত নামক কাব্যের উল্লেখ আছে। বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর (হরিহর) মন্দিরের প্রস্তর প্রশস্তি উমাপতির রচনা। ধোয়ী কবিরাজের

(কবিক্ষ্মাপতি) "পবন দূত" কাব্যে কুবলয়বতী নামক গন্ধর্ব্ব কন্যা মলয় পর্ব্বত হইতে পবনকে দূত করিয়া তাহার বিরহ সংবাদ রাজা লক্ষ্মণসেনকে তাঁহার বিজয়নগর রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের মাধাই নগরের তাম্রশাসন বোধহয় উমাপতির রচনা।

কিন্তু কবি জয়দেবই বোধ হয় এই সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি[১]। জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' কাব্যে একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভ শুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে। শৃঙ্গারোত্তর সৎ-প্রেমেয়বচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধনঃ স্পর্দ্ধীকো পিনবিশ্রুতাঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥ অর্থাৎ উমাপতিধর বাক্যের বিস্তার সাধন করিতে পারেন, কবি জয়দেবের কাব্য কাব্যাঙ্গভঙ্গরূপ কোন দোষে দুষিত নয়। শরণ তাঁহার কবিতা মধ্যে অনেক দুর্ব্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেন। শৃঙ্গার রসবর্ণনে গোবর্দ্ধনাচার্য্যের তুল্য কেহ নাই। কবিরাজ ধোয়ী শ্রুতিধর। অন্য একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—

যদি হরি স্মরণে সরসং মনঃ যদি বিলাসকলাসু কুতুহলং।
মধুর কোমল কান্তপদাবলীং শৃনুতদা জয়দেব সরস্বতীং (১।৩)॥

অর্থাৎ যদি শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় মনকে স্নিগ্ধ করিতে চাও, রাস কুঞ্জ লীলা কলাদিতে যদি কৌতুহল থাকে, তবে কবি জয়দেব গ্রথিত মধুর সুকোমল কমনীয় কবিতাবলী শ্রবণ কর।

আচার্য্য শূলপাণি স্বকৃত শ্রাদ্ধবিবেক, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক গ্রন্থের সমাপ্তিতে আপনাকে সাহুড়িয়ান গাঁই বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

"শূলপানি পাদৈঃ" বলাতে বুঝা যায় শ্রীনাথাচার্য্যচূড়ামণি শূলপাণির শিষ্য

১। গীতগোবিন্দে (৩।৮) জয়দেবকে "কেন্দুবিল্ব সমুদ্র সম্ভব রোহিনীরমণ" ও "শ্রীভোজদেব প্রভবান রামদেবী সুত" (১২।৮) বলা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম রামদেবী এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম (সম্ভবতঃ) রোহিনী ছিল। পুরীগোবর্দ্ধন মঠে রক্ষিত (শক ১৫ * *) একখানি পঞ্চদশ শতকে লিখিত পুঁথির দ্বাদশ সর্গের শেষে এইরূপ লিখিত আছে "ইতি শ্রী বারেন্দ্র কেন্দ্র হরিচরণ শরণ মহাকবিরাজ শ্রী জয়দেব কৃতং শ্রী গীত গোবিন্দাভিধানং কাব্যং সমাপ্তং॥" (পঞ্চপুষ্প ১৩৩৯ মাঘ)। ইহা হইতে জানা যায় তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের মেলা হয়। বগুড়া জেলাতেও এক কেন্দুবিল্ব গ্রাম আছে।

ছিলেন। শ্রীনাথাচার্য্যের কৃত্যতত্ত্বার্ণব, দুর্গোৎসব বিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকরাচার্য্য। এই শ্রীনাথাচার্য্য রঘুনন্দনের (১৫৬০ খৃঃ) গুরু ছিলেন।

মহাভারতের টীকাকার অর্জ্জুন মিশ্র চাম্পাহিট্টিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়দাতা ছিলেন সত্য খান। গোবর্দ্ধন পাঠক রচিত "পুরাণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থের পুষ্পিকায় সত্য খানের পরিচয় আছে "শ্রীমদ্‌গৌড়পতিপ্রাপ্ত প্রসাদোদয়ঃ।" শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের মতে সত্য খানের সময় ১২৮৩-৯১ খৃঃ। (ইণ্ডিয়ান কালচার পত্রিকা, ১৯৩৬। জানুয়ারী সংখ্যা)।

কৃষ্ণ মিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক প্রসিদ্ধ নাটকের রচয়িতা। তাঁহার নিবাস ছিল রাঢ়দেশের ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামে। (প্রবোধচন্দ্রোদয় ২। ৭)।

ভাগবতের টীকা "দীপিকা"র রচয়িতা শ্রীধর স্বামী বন্দ্যঘাটি বাঙালী ব্রাহ্মণ ছিলেন (ভারতবর্ষ, ১৩৫১। কার্ত্তিক পৃঃ ৩২১)।

নৈষধচরিত ও খণ্ডনখাদ্য প্রণেতা কবি শ্রীহর্ষও বাঙালী ছিলেন। বিদ্যাপতি তাঁহার পুরুষপরীক্ষায় বলিয়াছেন "বভুব গৌড় বিষয়ে শ্রীহর্ষ নাম কবিঃ পণ্ডিতঃ"। শ্রীহর্ষ বোধহয় দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

বঙ্গলিপি

মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মীলিপি ও অশোকের শিলালিপিতে যে ব্রাহ্মী অক্ষরের পরিচয় পাওয়া যায় সম্ভবতঃ সেই অক্ষরের ক্রমপরিণতিতে বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। গুপ্ত রাজ্যকালে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বঙ্গলিপির আদি প্রকাশ হয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। মহীপালদেবের বাণগড় লিপিতে বঙ্গলিপির আভাষ পাওয়া যায়। ইহার এক শতাব্দীর মধ্যেই বাঙলালিপির প্রায় পূর্ণরূপ গড়িয়া উঠে ও খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহা পূর্ণতা লাভ করে।
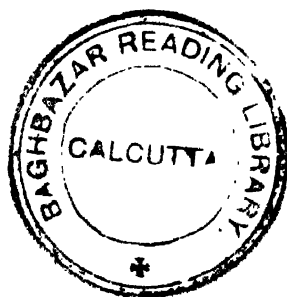
বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং কবি ও মহাশিল্পী। তাঁহার সৃষ্ট মানুষের মধ্যেও সেই কবি ও শিল্পী প্রতিভা বিরাজিত। বাঙালীর মধ্যেও এই প্রতিভার বিকাশ অতি প্রাচীন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেই সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ী-রীতি স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি বাণভট্ট হর্ষচরিতের প্রারম্ভে 'গৌড়াঃ অক্ষর-ডম্বরাঃ' বলিয়া গৌড়ী রীতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভামহ ও দণ্ডীও গৌড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যেও যে গৌড়ী রীতি অতি প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গৌড়বঙ্গের বহু স্থান হইতে আবিষ্কৃত বহু সংখ্যক বৌদ্ধ, নিগ্রর্ন্থ, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও শৈব দেব-দেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি ও বিহার ও দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষসমূহ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাহাড়পুরের তাম্রশাসনে (৪৭৮-৭৯ খৃঃ) বারাণসীর পঞ্চস্তূপ শাসনভুক্ত নিগ্রর্ন্থনাথ আচার্য্য গুহনন্দীর শিষ্যানুশিষ্যক্রমে অধিকৃত পাহাড়পুরের বট গোহালীস্থিত জৈন বিহারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গুপ্ত রাজগণের সময় পর্য্যন্ত জৈন সম্প্রদায় নিগ্রর্ন্থ নামে পরিচিত ছিল। জৈনাচার্য্য ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস কর্তৃক তাম্রলিপ্তিক, কোটিবর্ষীয়, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয় ও দাসী কর্ব্বটীয় নামক শাখা সমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ প্রথমটি রাঢ়ে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। হিউয়েনসঙ্গের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, খৃঃ সপ্তম শতকে বরেন্দ্রে, রাঢ়ে ও সমতটে দিগম্বর নিগ্রর্ন্থ সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক লোক বাস করিত। বিনয়পিটকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে আর্য্যা-বর্ত্তের পূর্ব্বসীমা বলা হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন [পুন্ন বর্ধন] হইতে আগত দুই জন গৌড়বাসী সাঁচিতে স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খৃঃ পঞ্চম শতকে ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তিতে ২২টি বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সময় (১৮৮ গুপ্তাব্দ) মহাযান সম্প্রদায়ের অবৈবর্ত্তিক সঙ্ঘকে কুমিল্লায় ভূমিদান করা হয় (I. H. Q. VI p. 572)। রুদ্রদত্ত প্রতিষ্ঠিত অবলোকি তেশ্বরের আশ্রম-বিহারে এই সঙ্ঘের লোকেরা অবস্থান করিতেন। হিউয়েনসঙ্গ পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটে একটি বৌদ্ধস্তূপ ও ভাসুবিহারের সঙ্ঘারামে ৭০০ বৌদ্ধ শ্রমণ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে ২০টি বৌদ্ধ বিহারে হীনযান ও মহাযানভুক্ত ৩০০০ শ্রমণ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের নিকটে একটি অবলোকিতেশ্বরের মন্দির দেখিয়াছিলেন। তিনি সমতটে বৌদ্ধস্থবির সম্প্রদায়ের ৩০টি বিহারে ২০০০ ভিক্ষু, কর্ণসুবর্ণে সম্মতীয় বৌদ্ধ

সম্প্রদায়ের দশটি বিহারে প্রায় দুই হাজার শ্রমণ ও তাম্রলিপ্তিতে দশটি বিহারে প্রায় এক হাজার শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। তাও লিন (Tao-Lien) নামক একজন চীনা পরিব্রাজক তাম্রলিপ্তিতে সর্ব্বাস্তিবাদের গ্রন্থে শিক্ষালাভ করেন। সেংচি (৭ম খৃঃ) নামক চীনা পরিব্রাজকের সময় রাজভট্ট নামক এক বৌদ্ধ রাজা সমতটে রাজত্ব করিতেন। তিনি ত্রিরত্নের উপাসক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন বুদ্ধদেবের এক লক্ষ মৃন্ময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইতেন ও মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের এক লক্ষ শ্লোক পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিসহ শোভাযাত্রা করিতেন। বৌদ্ধ মতাবলম্বী পাল গৌড়েশ্বরগণের সময় রাঢ়ে ত্রৈকুটক বিহার, বরেন্দ্রে সোমপুর, দেবকোটে জগদ্দল বিহার, চট্টগ্রামে পণ্ডিত বিহার, কুমিল্লায় পট্টিকেরা বিহার ও বিক্রমপুরে বিক্রমপুর বিহার প্রসিদ্ধ ছিল। জগদ্দলে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ঐ সময় চীনা পরিব্রাজকগণ গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্র বহু দেবালয়ও দেখিয়াছিলেন। সেনবংশীয় মহারাজ বিজয়সেন তাঁহার রাজধানী বিজয়নগরের নিকটে যে প্রদ্যুম্নেশ্বরের অদ্ভুত মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাতে লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী মূর্ত্তিসহ হরিহর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার বিবরণ তাঁহার দেওপাড়া প্রস্তর লিপিতে ক্ষোদিত আছে। বারেন্দ্র শিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি রাণক শূলপাণি এই লিপিটি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বরেন্দ্রে একটি শিল্পীগোষ্ঠী বর্ত্তমান ছিল। তারানাথের ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসে লিখিত আছে যে মহারাজ ধর্মপাল ও দেবপালের সময় পূর্ব্বভারতে যে শিল্পীগোষ্ঠী ছিল (Eastern School of Arts) বরেন্দ্র নিবাসী ধীমান ও তৎপুত্র বীতপাল তাহার নেতৃস্থানীয় ছিল। ফুসের গ্রন্থে বরেন্দ্রের মৃগস্থাপন স্তূপ ও তুলাক্ষেত্রস্থ বর্দ্ধমান স্তূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। রাজশাহীর পাহাড়পুরের ও বাঁকুড়া জেলার বহু ধ্বংসাবশেষ খননের ফলে স্তূপের মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরে যে একটি বিপুল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে "সর্ব্বতোভদ্র" রীতির মন্দির বলিয়া বলা হইয়াছে। বরেন্দ্রের রঙ্গপুর জেলার রাজাবিরাট নামক স্থানে ঐরূপ রীতির অন্য একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। উত্তরকালে ঐরূপ মন্দিরের অনুকরণে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও হিন্দুচীনে মন্দিরসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গৌড়বঙ্গের ঐ সকল স্তূপ, বিহার, ও দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে নানা প্রকার বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর সম্প্রদায়ের বহু দেব দেবীর

মূর্ত্তিসমূহ সংগৃহীত হইয়া বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ঢাকা মিউজিয়াম, কলিকাত মিউজিয়াম, ও আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

সমগ্র বাঙলাদেশে অদ্যাপি দশভুজার দুর্গামূর্ত্তি পূজা হইয়া থাকে। এই দশভুজা দুর্গামূর্ত্তিতে দুর্গা পূজা কবে প্রচলিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। খৃঃ সপ্তম শতকের পিত্তল-নির্ম্মিত একটি দেবী মূর্ত্তি দেউলবাড়ী (ত্রিপুরা) হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেবী অষ্টভুজা একটি উপবিষ্ট সিংহ পৃষ্ঠ সমপাদস্থাপক মুদ্রায় দণ্ডায়মানা। হস্তে শঙ্খ, বাণ, অসি, চক্র, ঢাল, ত্রিশূল, ঘণ্টা ও পদ্ম বিদ্যমান। যদিও পাদপীঠে ক্ষোদিত লিপিতে ইহার 'সর্ব্বাণী' নাম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সারদাতিলকতন্ত্রে এইরূপ মূর্ত্তিকে ভদ্রদুর্গা, ভদ্রকালী, অম্বিকা, ক্ষেমঙ্করী ও বেদগর্ভাও বলা হইয়াছে। মঙ্গলবাড়ী (দিনাজপুর) হইতে প্রাপ্ত একটি সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা দেবী মূর্ত্তির সম্মুখের দুই বাহু ভগ্ন। কিন্তু পশ্চাতের বাহুদ্বয়ে ত্রিশূল ও অঙ্কুশ আছে। এই মূর্ত্তিটি পাল রাজগণের সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত খৃঃ দ্বাদশ শতকের একটি চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ইণ্ডিয়া মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইহার এক হস্তে পদ্ম ও অন্য একটি হস্তে দর্পণ এবং দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশ ও বামে পদ্ম হস্তা একটি স্ত্রীমূর্ত্তি এবং পাদপীঠে একটি গোধিকা মূর্ত্তি আছে। ঐ মিউজিয়মে দক্ষিণ মহম্মদপুর (ত্রিপুরা) হইতে আনীত পঞ্চরথ পাদপীঠে বিশ্ব পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা একটি দ্বিভুজা দুর্গামূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মূর্ত্তিটি একাদশ শতকের শেষ অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদের বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা ও বাম হস্তে নীল পদ্ম। চালচিত্রে গণপতি, ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু ও কার্ত্তিকের মূর্ত্তি অঙ্কিত।

খৃঃ একাদশ শতকের একটি চণ্ডী বা গৌরী পার্ব্বতী মূর্ত্তি মন্দইল (রাজসাহী) হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই দণ্ডায়মানা চতুর্ভুজা মূর্ত্তিটির উপরের দক্ষিণ হস্তে অক্ষ মাল্যভূষিত লিঙ্গ ও বাম হস্তে ত্রিশূল এবং নিম্ন দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা ও বাম হস্তে পানপাত্র এবং দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহদ্বয়ের উপরে কার্ত্তিকেয় ও বাম পার্শ্বে মৃগদ্বয়ের উপরে গণেশ মূর্ত্তি ও উভয় পার্শ্বে ধান্যবৃক্ষ ও নবগ্রহ মূর্ত্তি সহ দানপতির মূর্ত্তি অবস্থিত। মহেশ্বরপাশা (খুলনা) হইতে প্রাপ্ত ঐরূপ অপর একটি দেবী মূর্ত্তিতে কার্ত্তিক ও গণেশের পরিবর্ত্তে নবগ্রহের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্টা লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি, চালের উপরে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু এই ত্রিমূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহাতে ধান্যবৃক্ষ নাই। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যের ৩য় সম্বৎসরের একটি চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি ঢাকায় পাওয়া গিয়াছে। হস্তচতুষ্টয়ে বর, শঙ্খ, পদ্ম ও কমণ্ডলু বর্ত্তমান। ইহাকে ভট্টশালী মহাশয় ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি বলিয়া

অনুমান করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিকে দুইটি হস্তী দুই দিক হইতে শুণ্ড দ্বারা স্নান করাইতেছে।

মহাস্থানগড়ের বাহিরে গোবিন্দ ভিটা খননের ফলে একটি বিরাট মন্দির ও একটি দণ্ডায়মানা চণ্ডীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূল মূর্ত্তিটির অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার পদদ্বয় বিকশিত পদ্মোপরি স্থাপিত ও দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা। অপর হস্ত তিনটি ভগ্ন। দক্ষিণ পার্শ্বে কার্ত্তিক, কার্ত্তিকের নীচে ক্ষুদ্র একটি ময়ূর অথবা কুক্কুট এবং বামপদের পার্শ্বে উপবিষ্ট সিংহ। মূর্ত্তিটির বামে নীচে একটি ইন্দুর দৃষ্ট হয়। কিন্তু গণেশ মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ। পাদপীঠে মধ্যে একটি গোধিকা মূর্ত্তি ও তাহার দুইদিকে দুইটি অঞ্জলীবদ্ধ মূর্ত্তি।

একটি দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি মানভূম জেলা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই মূর্ত্তিটির একটি পদ সিংহোপরি ও অপরটি মহিষের উপর প্রত্যালীঢ় মুদ্রায় অবস্থিত। ইহার দশভুজে যথাক্রমে [অসুরের বক্ষোপরি স্থাপিত] ত্রিশূল, খেটক, টঙ্ক, শর, খড়্গ, ধনু, পরশু, অঙ্কুশ, পাশ ও শুচিমুদ্রা। ঢাকা জেলার শক্ত গ্রাম হইতে অনুরূপ একটি দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পাদপীঠে খৃঃ দ্বাদশ শতকের অক্ষরে "শ্রী মাসিক চণ্ডী" কথাটি ক্ষোদিত আছে। পোরসা (দিনাজপুর) গ্রাম হইতে নবদুর্গা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। একসঙ্গে নয়টি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি,—তন্মধ্যে মধ্যস্থলে অবস্থিত মূর্ত্তি অষ্টাদশভুজা ও অপর মূর্ত্তিগুলি ষোড়শভুজা। বেতনা (দিনাজপুর) গ্রামে দ্বাত্রিংশভুজা, অসুর নিধনে রত দেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার চালে সূর্য্য, ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু ও গণপতি মূর্ত্তি ক্ষোদিত। এই সকল মূর্ত্তিতে মহাযানী মঞ্জুশ্রীর প্রভাব বর্ত্তমান।

বগুড়া হইতে প্রাপ্ত ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত ললিতাসনে উপবিষ্টা চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তির দক্ষিণ পদ পদ্মাসন হইতে লম্বিত হইয়া নিম্নে অবস্থিত সিংহের উপর স্থাপিত আছে। নওগাঁ (রাজসাহী) হইতে প্রাপ্ত প্রায় অনুরূপ অপর একটি উপবিষ্টা চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তির একপার্শ্বে গণেশ ও অপর পার্শ্বে কার্ত্তিকের মূর্ত্তি বর্ত্তমান। এই মূর্ত্তিটি সর্ব্বমঙ্গলা নামে পরিচিতা।

আধুনিক কালে বাঙলার সর্ব্বত্র কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সংযুক্তা যে সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী দুর্গাদেবীর পূজা প্রতি বৎসর শরৎকালে বহু সংখ্যায় ও বহু আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়, এই মূর্ত্তির প্রচলন কবে হইয়াছে তাহা ঠিক জানা যায় না। খৃঃ ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে

কালকেতু ব্যাধের প্রসঙ্গে বর্ত্তমান কালের দুর্গাপ্রতিমার অনুরূপ মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। কালকেতুর গৃহে দেবী গোধিকারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। কিন্তু কালকেতুর অনুরোধে—

"মহিষমর্দ্দিনীরূপ ধরেন চণ্ডিকা।
অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট নায়িকা॥
সিংহ পৃষ্ঠে আরোপেন দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপন॥
বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল।
ডানি করে তার বুকে আঘাতিল শূল॥

* * * *

বামে শিখি বাহন দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃষ আরোহনে শিব মস্তক উপর॥
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী।
আনন্দে পুলকে দেবগণ করে স্তুতি॥"

সুতরাং দুর্গার প্রচলিত প্রতিমা যে খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্তী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পতিপুত্র কন্যা সমন্বিতা দুর্গা প্রতিমার মধ্যে তৎকালে দেবীর যে গার্হস্থ্যরূপ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে আগমনী গানের মধ্য দিয়া বাঙালীর কন্যারূপে দেবী দুর্গা বাঙালীর গৃহে গৃহে বৎসরান্তে বরণীয়া হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব শক্তি পূজা হইলেও ইহাতে তান্ত্রিক আচারের পরিবর্ত্তে বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের আচার ব্যবহারই প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। তাই দুর্গাপূজার ন্যায় আর কোন উৎসবেই বাঙালী এত ব্যাপক ভাবে সাড়া দেয় না। মধ্যযুগে বাঙলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তিমার্গের মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণপর নিষ্কাম ধর্ম্ম ও মোক্ষমার্গের যতই প্রচার হউক না কেন, বাঙালীর দুর্গাপূজা তাহার সম্মুখেই সকামধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়াছে। দেবী দুর্গার নিকট বাঙালী চাহিয়াছে—

"দেহি সৌভাগ্য মারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখং।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যানুসারিনীং।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহিঃ॥"

দুর্গাপূজা প্রত্যক্ষ জীবনাচরণের ব্যবহারিক ক্ষেত্র হইতে শক্তি লাভ করায় বর্ত্তমান ধর্ম্ম-শৈথিল্যের যুগেও ইহার প্রচার বৃদ্ধিই পাইতেছে।

দুর্গামূর্ত্তি ব্যতীত একখানি প্রস্তরে সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তিও বাঙলার নানাস্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও চামুণ্ডা এই সপ্তমাতৃকা। এই সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তির একপার্শ্বে বীরভদ্র ও অন্যপার্শ্বে গণেশের মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকে। ঢাকা মিউজিয়মে দ্বাদশভুজা একটি চামুণ্ডা মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। রাজসাহী মিউজিয়মে পিসিতাসনা গর্দ্দভ-বাহিনী উপবিষ্টা একটি চামুণ্ডা মূর্ত্তি আছে। করালবদনা মুক্তকেশী, মুণ্ডমালা বিভূষিতা শ্যামা দিগম্বরা শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি দণ্ডায়মানা নরমুণ্ড, খড়্গ ও বরাভয় মুদ্রাধারিণী চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা দক্ষিণা কালী মূর্ত্তির পূজা অতি প্রাচীন কাল হইতে বাঙালীরা পূজা করিয়া আসিতেছে। পৃথকভাবে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা, যমুনা মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে।

দেব মূর্ত্তির মধ্যে অনেকগুলি শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত আছে। শঙ্খচক্র গদাপদ্মের বিভিন্ন সংস্থান দ্বারা বিষ্ণু মূর্ত্তির চতুর্ব্বিংশতি প্রকার নাম দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও হেমাদ্রিধৃত সিদ্ধার্থসংহিতায় এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মূর্ত্তির পরিচয় দেওয়া আছে। তন্মধ্যে বিষ্ণুর বাসুদেব মূর্ত্তিতে দক্ষিণ অধঃ হস্তে গদা, দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বাম অধঃ হস্তে পদ্ম ও বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র ধৃত আছে। দশ অবতারের মূর্ত্তিতে বিষ্ণুর উপাসনা খৃঃ একাদশ শতকে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে ও শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে বৈষ্ণব প্রধান উড়িষ্যা ও দ্রাবিড় দেশে গমন করেন (১৫১৫ খৃঃ)। তৎকালে রেমুনায় (উড়িষ্যায়) ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ মূর্ত্তি চতুর্ভুজ হইলেও উপরের দুইভুজে শঙ্খ ও চক্র কিন্তু নীচের দুই বাহু বংশীধারী। চতুর্ভুজ বাসুদেব তখনও পুরাপুরি ভাগবতের দ্বিভুজ মুরলীধারী হইয়া উঠেন নাই। সত্যবাদীর (উড়িষ্যা) সাক্ষীগোপালই বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম দ্বিভুজ মুরলীধারী। কিন্তু তখনও দ্বিভুজ মুরলীধারী কৃষ্ণ মূর্ত্তির বামে রাধা মূর্ত্তির কল্পনা হয় নাই। শ্রীচৈতন্য ৩০ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে যান। ইহার সম্ভবতঃ ২।৩ বৎসর পর রূপগোস্বামী গোবিন্দ বিগ্রহ ও সনাতন গোস্বামী মদনমোহন বিগ্রহ ও মধুপণ্ডিত গোপীনাথ বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে এই তিন বিগ্রহেরই উল্লেখ আছে। কিন্তু এই তিনটির কোনটির সহিতই রাধা মূর্ত্তি ছিল না। পুরীধামে এই মূর্ত্তিত্রয়ের আবিষ্কার বার্ত্তা পৌঁছিলে রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম দেব তিনটি রাধা মূর্ত্তি বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। তাহাদের একটি গোবিন্দের রাধারূপে, একটি মদনমোহনের রাধারূপে ও তৃতীয়টি গোবিন্দের অপর পার্শ্বে ললিতা সখী নামে

প্রতিষ্ঠিতা হয়। গোপীনাথের রাধা নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবী দান করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে রাধা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা সমগ্র ভারতে বোধ হয় এই প্রথম। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধুময় লেখনীর প্রভাবে রাধাকৃষ্ণরূপী বাসুদেব তত্ত্বের ব্রজলীলা ধীরে ধীরে লোকের মন জয় করিতেছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি এইরূপে বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের বহু পরে যখন শ্রী জীব গোস্বামীর আদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ দাস বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি লইয়া গৌড় মণ্ডলে আগমন করেন, সেই সময় হইতেই গৌড় দেশে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। এই সময় বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির রাধা সমন্বিত দ্বিভুজ মুরলীধারী কালাচাঁদ ও মদনমোহন বিগ্রহ স্থাপন করেন। পদ্মাতীরে খেতুরীতে নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্ত বৈষ্ণব মহাধিবেশন আহ্বান করিয়া একদিনেই পাঁচটি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ঐ সময়েই খড়দহে শ্যামসুন্দর ও মাহেশে বল্লভজী প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সপ্তগ্রামে, বরাহনগরে, আড়িয়াদহে, কাঁচড়াপাড়ায় এবং গৌড়বঙ্গের বহুস্থানে চৈতন্য ভক্তগণ কর্তৃক বাসুদেব মূর্ত্তিতে কৃষ্ণপূজা লোপ পাইয়া রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহে বিষ্ণুপূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়।

বিষ্ণুর মৎস্যাদি দশ অবতারের প্রাচ ন মূর্ত্তিও পাওয়া যায়।

শিবের লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ গৌড়বঙ্গের বহুস্থান হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গমূর্ত্তি সমূহ হইতে পাওয়া গিয়াছে। বাঙলায় একটি চতুর্ম্মুখ মুখলিঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তি পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইলেও একমুখ শিবলিঙ্গই প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত শিবের উপাসনা, উমা-মহেশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর, হরিহর ও ভৈরব মূর্ত্তিতে করিবার প্রথা দৃষ্ট হয়। পাহাড়পুরে সাধারণ লিঙ্গ ও চতুর্ম্মুখ লিঙ্গ (মুখ লিঙ্গ) পাওয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখর, নটরাজ, সদাশিব ও কল্যাণসুন্দর (শিব বিবাহ) মূর্ত্তিতে শিবমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল। অনেক মূর্ত্তিতে শিববাহন নন্দী (বৃষ)-র মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। শিবের দ্বিভুজ অক্ষ মালাধারী একটি ঈশান মূর্ত্তি রাজসাহী হইতে ও অপর একটি অনুরূপ ঈশান মূর্ত্তি গণেশপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটি কলিকাতা মিউজিয়মে, দ্বিতীয়টি রাজসাহী মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। বরিশালের নিকটে কাশীপুর গ্রামে বিরূপাক্ষ নামে পূজিত মূর্ত্তিকে ভট্টশালী মহাশয় নীলকণ্ঠ শিব বলিয়া মনে করেন। এই চতুর্ভুজ নীলকণ্ঠ মূর্ত্তির চারিভুজে অক্ষমাল্য, ত্রিশূল, খট্টাঙ্গ ও কপাল আছে। প্রভাবলীর উপরে দক্ষিণে গণেশ ও বামে কার্ত্তিক ও দক্ষিণে পদ্মহস্তা মকর-

বাহিনী গঙ্গা ও বামে সিংহবাহিনী পার্ব্বতী ও নিম্নে নন্দী বর্ত্তমান। দশ ও দ্বাদশভুজ নটরাজ শিব মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। সদাশিব মূর্ত্তি সেনরাজগণের তাম্রশাসনে ও নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গণপতি ও কার্ত্তিকের মূর্ত্তিও অনেক পাওয়া গিয়াছে এবং বাঙালীর মিউজিয়ম সমূহে রক্ষিত আছে।

কুমারপুর ও নিয়ামতপুর (রাজসাহী) হইতে কুশাণ যুগের পরিচ্ছদধারী গুপ্তযুগের দুইটি সূর্য্যমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কুমারপুরের মূর্ত্তি দুই হস্তে দুইটি মৃণাল ধারণ করিয়া সপ্তাশ্বযুক্ত উচ্চ পাদপীঠে দণ্ডায়মান। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দণ্ডী ও পিঙ্গল মূর্ত্তি অবস্থিত। নিয়ামতপুরের মূর্ত্তি কুমারপুরের মূর্ত্তির অনুরূপ। কেবল রথটি নাই। বগুড়া জেলার দেওড়াগ্রাম হইতে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তিতে রথের সারথী অরুণের উভয় পার্শ্বে পার্শ্বচর দণ্ডী ও পিঙ্গল এবং বাণ নিক্ষেপকারী উষা ও প্রত্যূষার মূর্ত্তি অবস্থিত। মূর্ত্তিটির কেশরাশি কুঞ্চিত, গলায় ত্রিবলী, গোলাকার প্রভামণ্ডল, বামপার্শ্বে বিলম্বিত কোষবদ্ধ দীর্ঘ তরবারি গুপ্তযুগের সুন্দর শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দেয়। কাশীপুরে (২৪ পরগণা) প্রাপ্ত দণ্ডায়মান অনুরূপ সূর্য্যমূর্ত্তি আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। মান্দা (রাজসাহী) হইতে ত্রিপণ্ড দশভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি (খৃঃ দ্বাদশ শতক) পাওয়া গিয়াছে। এরূপ মূর্ত্তি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সারদাতিলকতন্ত্রে (১৪ পটল)-র অষ্টভুজ চতুর্ম্মুখ মার্ত্তণ্ড ভৈরব মূর্ত্তির বিবরণের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যমূর্ত্তিগুলি উপানৎযুক্ত পাদ বিশিষ্ট, কেবল নিয়ামতপুরের মূর্ত্তি নগ্নপাদ।

সূর্য্যপুত্র রেবন্ত ও নবগ্রহ মূর্ত্তিও অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য দেবতা সূর্য্যের সহিত বৌদ্ধ দেবতা মারিচীর সাদৃশ্য আছে। ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামে প্রাপ্ত এইরূপ একটি মারীচি মূর্ত্তি ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্ত্তি কোন কোন অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে দৃষ্ট হয়। জ্ঞানের গভীর শান্তিতে নিমগ্না পদ্মাসনা এই দেবীর দক্ষিণ করে ব্যাখ্যান মুদ্রা এবং বামকরে জ্ঞান মুদ্রা। বামকরে অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ ধারণ করিয়া আছে। উভয় কর বক্ষোপরি স্থাপিত। অমোঘসিদ্ধি হইতে খদিরবণী তারা, রত্নসম্ভব হইতে বজ্রতারা, অমিতাভ হইতে ভৃকুটি তারা সম্ভূত হইয়াছে। খদিরবণী তারাকে শ্যামা তারাও বলা হয়। ইঁহার হস্তে নীলোৎপল ও অশোক কাণ্ড (মারিচী) ও একজটা ইঁহার সহচরী। এইরূপ একটি তারা মূর্ত্তি (খৃঃ দ্বাদশ শতক) ঢাকা মিউজিয়মে আছে। এই মূর্ত্তিটির প্রভাবলীতে ক্ষুদ্রাকারে পূর্ব্বোক্ত অষ্টতারা মূর্ত্তি ও পাদপীঠের দক্ষিণ প্রান্তে বজ্রসত্ত্ব মূর্ত্তি অবস্থিত। মাঝবাড়ী (ফরিদপুর) হইতে প্রাপ্ত একটি ধাতুনির্ম্মিত পীতবর্ণা

বজ্রতারা মূর্ত্তি ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ভবানীপুর (ঢাকা) হইতে প্রাপ্ত ও ঢাকা সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একটি ত্রিশিরা অষ্টভুজা বীরাসনে উপবিষ্টা মূর্ত্তির মুকুটে অমিতাভ মূর্ত্তি ও পাদপীঠে ক্ষোদিত গণেশ মূর্ত্তি আছে। ভট্টশালী ইহাকে ভৃকুটি তারা মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত প্রায় এইরূপ একটি মূর্ত্তিকে পঞ্চরক্ষা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত মহাপ্রতিসরা মূর্ত্তি বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত অপর একটি সুন্দর কারুকার্য্য সম্পন্ন ধাতু নির্ম্মিত অষ্টভুজা মূর্ত্তিকে শীতাতপা মূর্ত্তি বলিয়া মনে করা হয়। একটি অষ্টাদশ ভুজা চুন্দা মূর্ত্তি রাজসাহী জেলার নিয়ামতপুর হইতে সংগৃহীত হইয়া রাজসাহী মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। দুইটি ত্রিশিরা ষড়ভুজা পর্ণপরিচ্ছদধারী পর্ণশবরী মূর্ত্তি বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাদের দক্ষিণ তিন হস্তে বজ্র, পরশু ও শর এবং বাম তিন হস্তে তর্জ্জনী, ধনু ও পর্ণপিচ্ছিকা এবং প্রভাবলীতে অমোঘসিদ্ধির মূর্ত্তি আছে। বজ্রযানভুক্ত বাগীশ্বরী দেবীর মূর্ত্তিও বাঙলার বহুস্থানে পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিগুলির প্রায় সমস্তই পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের সমসাময়িক প্রস্তর মূর্ত্তি।

রাজসাহী মিউজিয়মে রক্ষিত ঘাটনগর (দিনাজপুর) হইতে প্রাপ্ত রেবন্ত মূর্ত্তিটি অশ্বারোহী, উপানৎপাদ ও দ্বিভুজ। ইহার দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বাম হস্তে বল্গা। একটি অনুচর মূর্ত্তিটির মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া আছে। এই ছত্রধারীটি দুইজন দস্যুর মধ্যে দণ্ডায়মান। একটি দস্যু তাহাকে সম্মুখ হইতে আক্রমণে উদ্যত, অপর দস্যুটি বৃক্ষাগ্র হইতে তাহাকে পশ্চাৎভাগ হইতে আক্রমণ করিতেছে। অনেক মকরবাহিনী গঙ্গা ও কূর্ম্মবাহিনী যমুনা মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিবেণী (হুগলী) হইতে একটি প্রাচীন চতুর্ভুজা গঙ্গা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরে একটি ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। দশ দিক্‌পাল মধ্যে যম, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও কুবের মূর্ত্তি বিশেষ পরিস্ফুট।

চতুর্ব্বিংশ জৈন তীর্থঙ্কর মধ্যে সুরোহর গ্রামে (দিনাজপুর) প্রাপ্ত ঋষভ দেবের মূর্ত্তি (খৃঃ দশম শতক) ও ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি যুক্ত প্রতিমূর্ত্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা বজ্রসত্ত্ব ধ্যানীবুদ্ধ এবং বৈরোচণ, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি এই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ (তথাগত) মধ্যে অমিতাভের যুগে বাস করিতেছি। এই যুগের বোধিসত্ত্বের নাম অবলোকিতেশ্বর (লোকনাথ) ও বুদ্ধের নাম গৌতম। সুখবাসপুর (ঢাকা) হইতে খৃঃ দশম শতকের একটি বজ্রসত্ত্ব মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই সময় অথবা তাহার কিছু পূর্ব্ব

হইতে ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব বাঙলায় স্থানলাভ করিয়াছে। বজ্রসত্ত্বের অপর নাম বজ্রধর। এই ধ্যানীবুদ্ধ বীরাসনে উপবিষ্ট। ইহার দক্ষিণ হস্তে বজ্র ও বামহস্তে ঘণ্টা। খৃঃ একাদশ শতকের একটি খসর্পণ অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি মহাকালীগ্রাম (ঢাকা) হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা ললিতাসনে উপবিষ্ট, বামহস্তে মৃণাল (দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন), দৃষ্টিতে পরম করুণা। দক্ষিণে সুধাকুমার ও তারা, বামে হয়গ্রীব ও ভৃকুটি উর্দ্ধে, প্রভাবলীর উপরে পঞ্চ তথাগত মূর্ত্তি অবস্থিত। মহাস্থানগড়ের নিকটবর্ত্তী বলাইধাপে প্রাপ্ত সোনার পাতে মোড়া বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি ও মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি রাজসাহী মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তিটি গুপ্তযুগের (খৃঃ ষষ্ঠ শতক) বলিয়া অনুমিত হয়। মঞ্জুশ্রী জ্ঞানের দেবতা। ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য হইতে ইহার উৎপত্তি। ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত এই মূর্ত্তিটি দ্বিভঙ্গভাবে দণ্ডায়মান। ইহার দক্ষিণ বাহুটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বামভুজ ব্যাখ্যান বা বিতর্ক মুদ্রায় অবস্থিত। শরীরের উর্দ্ধাংশে উপবীতের আকারে একটি উত্তরীয় ও পরিধানে ধুতি আছে। উপবীত, উর্ণা কুণ্ডল ও ত্রিবলী চিহ্ন পরিষ্কারভাবে দৃষ্ট হয়। ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি মস্তকের জটাজালের মধ্যে অবস্থিত।

শিববাটীতে (খুলনা) একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রস্তর মূর্ত্তিটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট। এই মুদ্রায় উপবিষ্ট থাকিয়া বুদ্ধদেব বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির সহিত বুদ্ধের লুম্বিনী উদ্যানে জন্ম, সারনাথে ধর্ম্মচক্র প্রচার, কুশীনগরে মহাপরিনির্ব্বাণ, রাজগৃহে নালাগিরি নামক হস্তীকে বশীকরণ, ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে শাঙ্কাশ্য নগরে অবতরণ, শ্রাবস্তীতে অলৌকিক কার্য্য সাধন, বৈশালীতে বানর কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবকে মধু প্রদানের দৃশ্যগুলি প্রভাবলীতে অঙ্কিত আছে। রাজসাহী মিউজিয়মেও প্রায় ঐরূপ দৃশ্যগুলি সম্বলিত মূর্ত্তি সংগৃহীত আছে। উজানী (ফরিদপুর) হইতে প্রাপ্ত একটি বজ্রাসন বুদ্ধ মূর্ত্তি ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

বজ্রযান মতের 'জম্ভল' নামক দেবমূর্ত্তি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য ও হেরুকের মূর্ত্তির সহিত দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ্য দেবতা কুবেরের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এই কুবের ও তাহার শক্তি হারিতী ধনের দেবতা বলিয়া পরিচিত। খৃঃ দ্বাদশ শতকের একটি কুবের ও হারিতী মূর্ত্তি ও জম্ভল মূর্ত্তি রাজসাহী মিউজিয়মে আছে। হেরুকের একটি প্রস্তর মূর্ত্তি ঢাকা মিউজিয়মে আছে। মুণ্ডমালা ভূষিতা নৃত্য পরায়ণা এই মূর্ত্তিটির (১১ শতক) বাম হস্তে নর-কপাল ও দক্ষিণ হস্তে বজ্র এবং প্রজ্জলিত জটাজাল মধ্যে অক্ষোভ্য মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কলিকাতা মিউজিয়মে উত্তর

বঙ্গ হইতে প্রাপ্ত অন্য একটি হেরুকের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। পাহাড়পুরে নর কপালের কিরিট ভূষিত অষ্ট মস্তক ও ষোড়শ হস্ত একটি হেবজ্র মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন প্রকারের তারা—যথা প্রজ্ঞাপারমিতা, মারিচী, পর্ণশাবরী, চুন্দা, হারিতী, প্রভৃতির মূর্ত্তি বাঙলার মিউজিয়ম সমূহে সংগৃহীত হইয়াছে। মারিচী দেবী ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচণ হইতে উদ্ভূত। ইহার মুখ তিনটি, তন্মধ্যে বাম মুখ শুকরীর মুখতুল্য। তাহার আটটি হাতে বজ্র, অঙ্কুশ, শর, অশোক পত্র, সূচী, ধনু, পাশ ও তর্জ্জনী মুদ্রা আছে। মস্তকের কিরিটীর মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচণের মূর্ত্তি। ইনি প্রত্যালীঢ় ভঙ্গীতে সপ্ত-শূকর-বাহিত ও সারথি-রাহু-চালিত রথে আরূঢ়া। ইহার সহচরী দেবীগণের নাম বরত্তালী, বদালী, বরালী ও বরাহমুখী। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেহের আভরণকে চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—(১) আবেধ্য—কুণ্ডল ডালিপত্র, কর্ণিকা, কর্ণাভরণ প্রভৃতি (২) বন্ধনীয়—কোটি সূত্র অঙ্গদ বলয় প্রভৃতি। (৩) ক্ষেপ্য—নূপুর বলয় বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি, (৪) আরোপ্য—মুক্তাবলী, স্বর্ণসূত্র, হর্ষক (হার) চূড়ামণি, মুকুট, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি।

গোভিল গৃহ্য সূত্র—(২ প্র। ১০। ৮ সূ)

"ক্ষৌম-শাণ-কাপাসৌর্ণান্যেষাং বসনানি॥"

ক্ষৌম, শাণ, কার্পাস ও উর্ণ এই বস্ত্র।

হেমচন্দ্রের মতে 'ত্বক্-ফল-কৃমি-রোমেভ্যঃ

পাট ও শোণ—সম্ভবত্বাচ্চতুর্ব্বিধং [বস্ত্র ২] ক্ষুমা বা অতসী প্রভৃতি গাছের ছালের সূত্র দ্বারা ক্ষৌম বস্ত্র।

ক্ষৌম বস্ত্রের অপর নাম দুকুল (হেমচন্দ্র)

কৌশিকং কোশ প্রভবং তসরী পট্টাদি

(বিজ্ঞানেশ্বর)

কৌশিক বা রেসম বস্ত্রকে তসর ও পট্ট বস্ত্র বলে। মেষলোমজাত বস্ত্রের নাম উর্ণ বা আবিক।

কাপাসের তুলা দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রকে কার্পাস বা বাদর বলে।

মৃগরোম জাত বস্ত্রকে রাঙ্কব বলে।

"কুডপঃ পার্ব্বত্রীয় ছাগরোম নির্ম্মিতঃ কম্বলঃ।"

(বিজ্ঞানেশ্বর)

অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা (প্রথম মহীপালদেবের সময়ের) গ্রন্থের:

হস্তলিখিত দুইখানি পুঁথির একখানি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অপরখানি বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। নয়পালদেবের ১৪শ রাজ্যাব্দে লিখিত একখানি পঞ্চরক্ষা পুঁথি ক্যাম্ব্রিজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। এই সমস্ত ও আরও কতকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির তালপত্রে নানা মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। তাহা হইতে এদেশের চিত্রাঙ্কন প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। এদেশে যে চিত্রাঙ্কন বিদ্যার বহুল প্রচার ছিল তাহা ফা-হিয়ানের গ্রন্থে লিখিত আছে।

প্রাচীনকালের বাঙালীরা সাধারণতঃ ধুতি ও উত্তরীয় মাত্র ব্যবহার করিত। সধবা স্ত্রী লোকেরা অঙ্গুরীয়, কুণ্ডল, হার, কেয়ুর, বলয় ও শাঁখায় সজ্জিতা হইত ও নানাপ্রকার সাড়ী পরিধান করিত। পাহাড়পুরের সংগ্রহ লক্ষ্য করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। নৃত্যগীত, নাট্যাভিনয় ও বীণা প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্র প্রচলিত থাকার নিদর্শনও পাওয়া যায়। ছত্র, উপানৎ, পাদুকা নির্ম্মাণ ও ব্যবহারের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২।১১) "পৌণ্ড্রকা পত্রোর্ণা" "পৌণ্ড্রকদুকুলং শ্যামমণি স্নিগ্ধং" "পৌণ্ড্রকং চ ক্ষৌমং" বলিয়া পুণ্ড্র দেশের পত্রোর্ণা (রেশম বস্ত্র), দুকুল (পট্ট বস্ত্র) ও ক্ষৌম (উৎকৃষ্ট বস্ত্র) বস্ত্রের ও "বাঙ্গকং' (বঙ্গে উৎপন্ন সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রে)-এর উল্লেখ আছে।

মহাস্থানগড় খননের ফলে তথায় প্রাথমিক গুপ্তযুগ, পরবর্ত্তী গুপ্তযুগ, প্রাথমিক পালযুগ ও পরবর্ত্তী পালযুগের স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তথায় গুপ্তযুগের কয়েকটি কারুকার্য্য ক্ষোদিত শিলাস্তম্ভও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বাঙলার নানাস্থানে খননের ফলে প্রাচীনকালের বহু সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র ও পোড়ামাটির বহু মূর্ত্তি (terra cotta) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকাল হইতে বাঙালীরা স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য শিল্পে, মৃন্ময় ও শিলা মূর্ত্তি ও পাত্র নির্ম্মাণে কার্পাস ও বাদর বস্ত্র বয়ন ও অন্যান্য শিল্পে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল।

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন ভারতের ব্রাহ্মণেরা ধুতি ও চাদর পরিতেন।

প্রাচীন বাঙলার শাসন ব্যবস্থা

রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সম্বন্ধ দ্বারা দেশের ও জনসাধারণের উন্নতি ও অবনতির গতি নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাচীন কালে রাজা ও জনসাধারণের মধ্যে নানা-স্তরের সামন্ত শাসন প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, "রাজা প্রত্যেক গ্রামে একজন গ্রামিক বা গ্রামপতি, প্রতি দশ গ্রামে দাশগ্রামিক, বিংশ গ্রামে বিংশতীশ, শত গ্রামে শতেশ ও সহস্র গ্রামে সহস্রপতি নিযুক্ত করিবে। গ্রামে কোন দোষ উপস্থিত হইলে গ্রামিক [স্বয়ং তাহার প্রতি-বিধানে অসমর্থ হইলে] দশ গ্রামপতিকে জানাইবেন। তিনিও অসমর্থ হইলে বিংশ গ্রামপতিকে জানাইবেন। এইরূপ বিংশ গ্রামপতি শতেশকে ও শতেশ সহস্রেশকে জানাইবেন। গ্রামবাসী কর্ত্তৃক অন্ন পানীয় ও ইন্ধনাদি যাহা প্রত্যহ রাজাকে দেয়, তাহা গ্রামিক বা গ্রামপতি পাইবে। কুল অর্থাৎ ষড়গবাকৃষ্টহলদ্বয়ে কর্ষণযোগ্য ভূমি দাশগ্রামিকের বৃত্তি। বিংশ গ্রামপতির বৃত্তি তাহার পাঁচ গুণ হইবে। শতাধিপের এক খানি গ্রাম সহস্রাধিপের একটি নগর প্রাপ্য হইবে[১]।"

১। গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাং দশ গ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ ॥ ১১৫
গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈ স্বয়ং।
শংসেদ গ্রামদশেশায় দশেশ বিংশতীশিনে ॥ ১১৬
বিংশতীশস্তু তৎ সর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্ গ্রামশতেস্তু সহস্র পতয়ে স্বয়ং ॥ ১১৭
যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদিনি গ্রামিক স্তান্যবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৮
দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরং ॥ ১১৯

কুল্লুকভট্ট "কুলং" শব্দের ব্যাখ্যায় হারীত স্মরণাৎ ষড়গবাকর্ষ মধ্যম হলং। তথা বিধ হলদ্বয়েন যাবতী ভূমি বাহ্যতে তৎ কুলমিতি বদতি। এই 'কুল' শব্দের অপভ্রংশে বোধ হয় 'কুড়া' (বিঘা) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তর বঙ্গে এই 'কুড়া' শব্দ প্রচলিত আছে।

মনুসংহিতার এই বিবরণ হইতে প্রাচীনকালের সামন্ত প্রথার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীক ও রোম্যান লেখকগনের বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে যে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে গৌড়গণ (Gandaridoi) উগ্রসেন (Xandramis) বা (Agramis) বা নন্দ মহাপদ্মের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ দৃষ্টে টলেমি লিখিয়াছেন ৬০ হাজার পদাতিক, ১০ হাজার অশ্বারোহী, ও ৭০০ হস্তী "গৌড়-কলিঙ্গ" রাজের দেহরক্ষা করিত। সুতরাং নন্দ বংশের সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও গৌড়রাজ্য ও গৌড়পতির পৃথক অস্তিত্ব ছিল এবং গৌড়পতি নন্দরাজের সামন্ত রূপেই দেশ শাসন করিতেন। মৌর্য্য যুগের, সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের শাসন-কালের যে প্রস্তরলিপি মহাস্থানগড় (পুণ্ড্রনগর) হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে তৎকালে এই পুণ্ড্রনগরে এক বা একাধিক মহামাত্র নিযুক্ত থাকিয়া রাজ্যের শাসন ও জনহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিত।

গুপ্ত, পাল ও সেন রাজগণের যে সকল তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে অনুমিত হয় যে ঐ রাজাদের অধীনে মহাসামন্তাধিপতি, মহাসামন্ত এবং সামন্তগণ বর্ত্তমান ছিল। রোটাসগড়ের শিলালিপি হইতে জানা যায় গৌড়পতি শশাঙ্ক প্রথম জীবনে মহাসামন্ত ছিলেন। বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনে মহারাজা মহাসামন্ত বিজয় সেনের উল্লেখ আছে। মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরলিপি দ্বারা মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্ম্মাকে শ্রী পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটি মণ্ডলভুক্ত[১] মহন্তা প্রকাশ বিষয়ে স্থালীক্কট বিষয়ের অধীন তাম্রষণ্ডিকা ও ওড্র্গ্রাম মণ্ডলে গ্রাম দান করা হইয়াছিল। তৎকালে সমগ্র দেশ কয়েকটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল।

"রামচরিতম্" কাব্যের প্রথম পরিচ্ছেদের ৩১ শ্লোকের টীকায় তদীয় সামন্ত চক্রদ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজা মহীপাল (২য়) কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই সামন্তচক্রকে 'অনন্ত সামন্তচক্র' বলা হইয়াছে। ইহা

১। কল্যাণ বর্ম্মা কৃত সারাবলী নামক একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২৮ খৃঃ)। আলবেরুণী ভট্ট উৎপল ও মল্লীনাথ এই গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে গ্রন্থকার নিজেকে ব্যাঘ্রতটীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসন দ্বারা পৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলে ভূমিদান করা হইয়াছে। বাগড়ীকে কেহ কেহ ব্যাঘ্রতটী বলিয়া মনে করেন। দেবপালদেবের নালন্দা শাসনের দূতক ছিলেন ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলাধিপতি শ্রীবল বর্ম্মা।

হইতে জানা যায় যে তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত "বারেন্দ্র মণ্ডলে"ই অসংখ্য সামন্ত ছিল। এই সামন্তদের "বহুল-মদকল-করি-তুরগ-তরণি-চরণচারভট" সমন্বিত "চতুর-চতুরঙ্গ সৈন্যদল ছিল।

আবার উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫ম শ্লোকের টীকায় বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারের যুদ্ধে রামপালের সাহায্যকারী চতুর্দ্দশজন প্রধান সামন্ত রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে সে যুগের সামন্ততন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

গুপ্ত যুগের শাসনে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ও তদন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের ও পরবর্ত্তী শাসনসমূহে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বর্দ্ধমানভুক্তির উল্লেখ আছে। আরও পরবর্ত্তীকালে বর্দ্ধমানভুক্তি হইতে উত্তরে কঙ্কগ্রামভুক্তি ও দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি নামক দুইটি ভুক্তি সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ভুক্তিগুলি বিষয়ে, বিষয়গুলি বিথীতে, বিথীগুলি গ্রাম মণ্ডলে ও মণ্ডলগুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল। ভুক্তিগুলি সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত উপরিক কর্ত্তৃক শাসিত হইত। উপরিকের উপাধি সাধারণতঃ মহারাজা ছিল। বিষয়গুলিতে সাধারণতঃ উপরিক কর্ত্তৃক ও কখন কখন স্বয়ং সম্রাট কর্ত্তৃক বিষয়পতি নিযুক্ত হইত। প্রত্যেক ভুক্তি, বিষয় ও বিথীতে এক একটি অধিষ্ঠান (শাসনকেন্দ্র) ও ঐ সকল অধিষ্ঠানে এক একটি অধিকরণ (কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি) ছিল। দামোদরপুরে ও পাহাড়-পুরে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের (৪৪৪ খৃঃ-৫২০ খৃঃ) তাম্রশাসনগুলিতে এই যুগের অধিষ্ঠান ও অধিকরণ গুলির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অধিষ্ঠান ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে (মহাস্থান গড়ে)। ভুক্তির শাসনকর্ত্তাকে সাধারণতঃ উপরিক বলা হইত। অধিকরণে একজন আযুক্তকর বা প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। এতদ্ব্যতীত অধিকরণের সমিতিতে নগর শ্রেষ্ঠী (Chief Banker), স্বার্থবাহ (বণিকদের প্রতিনিধি), প্রথম কুলিক (শিল্পীদের প্রধান), প্রথম কায়স্থ (লেখকদের প্রধান) ও কয়েকজন পুস্তপাল (Record keeper) থাকিত। বিষয়গুলিরও অধিষ্ঠান ছিল। বিষয়ের শাসনকর্ত্তাকে বিষয়পতি বলা হইত। বিষয়ের অধিকরণেও নগরশ্রেষ্ঠী, স্বার্থবাহ, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ ও প্রথম পুস্তপাল দ্বারা পরিচালিত হইত। গ্রামাধিকরণগুলি মহত্তরগণ, অষ্টকুলাধিকরণ, গ্রামিক ও কুটুম্বিগণ দ্বারা পরিচালিত হইত[১]। গ্রামিক শব্দের অর্থ গ্রামপতি বুঝায়।

১। মহত্তর বোধহয় গ্রামপ্রধান। উহার অপভ্রংশে বোধহয় মাতব্বর শব্দ

কুটুম্বী শব্দের অর্থ গৃহস্থ। এখানে কুটুম্বী শব্দে বোধহয় গৃহস্থগণের প্রতিনিধি। মল্লসারুক শাসনে বীথি অধিকরণের উল্লেখ আছে। তাহা মহত্তর, অগ্রহারী, খড়্গী ও বহনায়কগণ পরিচালনা করিত।

কাহারও প্রার্থনাক্রমে অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজা কাহাকেও ভূমিদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া "মতমস্তু ভবতাম"[১] বলিয়া তাহাদের সম্মতি প্রার্থনা করিতে হইত। কোন গ্রামে কাহারা বাস করিবে, ভূমি কর্ষণ করিবে, গ্রামের কে কে উৎপন্ন ফসলের ভোগাধিকারী হইবে তাহার সহিত প্রথম অবস্থায় রাজা বা সামন্তগণের বোধহয় কোন সম্পর্ক ছিল না। গ্রামবাসীগণই বোধহয় তাহার নিয়ামক ছিল এবং গ্রামবাসীগণই বোধহয় জমির মালিক ছিল। ক্রমে ভূমিতে রাজার অধিকার স্বীকৃত হইলেও অনেকদিন পর্য্যন্ত যাহাকে তাহাকে গ্রামের ভূমি হস্তান্তর করিবার উপায় ছিল না। প্রাচীন প্রথার

প্রচলিত হইয়াছে। ষড়গবাকৃষ্ট হলদ্বয়ে কর্ষণযোগ্য ভূমিকে 'কুল' বলা হইত। তাম্রশাসনে 'কুলবাপ্য' পরিমিত ভূমির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 'কুল' শব্দের অপভ্রংশে বোধহয় উত্তর বঙ্গে প্রচলিত 'কুড়া' (বিঘা) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অষ্ট কুলাধিকরণ অর্থ বোধ হয় অষ্ট কুল পরিমিত ভূমির অধিকারী।

১। রাজা ধর্ম্মপালের খালিমপুর শাসন হইতে সেনরাজগণের সময় পর্য্যন্ত বহু তাম্র শাসনে এইরূপ বাক্যাংশ দৃষ্ট হয়।

রাজা লক্ষ্মণসেনের তাম্র শাসনে (শক্তিপুর শাসন) ভূমিদান প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে "স খলু শ্রী বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্দাবারাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রী বল্লালসেনদেব পদানুধ্যাত-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ শ্রীলক্ষ্মণসেনদেব কুশলী। সমুপাগতাশেষ রাজ-রাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য- মহাপুরোহিত- মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ- মহাসান্ধিবিগ্রহিক- মহাসেনাপতি- মহা-মুদ্রাধিকৃত- অন্তরঙ্গ- বৃহদুপরিক- মহাক্ষপটলিক- মহাপ্রতীহার- মহাভোগিক-মহা পীলুপতি- মহাগণস্থ- দৌসাধিক- চৌরোদ্ধরণিক- নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিক-দিব্যপৃতক-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদীন অন্যাংশ্চ সকল রাজ-পাদোপজীবোধ্যক্ষ প্রচারোক্তানিহা কীর্ত্তিতান্ চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ ক্ষেত্রপরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণেতরান্ যথাইয়ং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতান্ যথা ইত্যাদি।

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥ (শুক্রনীতি)

মর্য্যাদা রক্ষার্থে ভূমিদান করিবার সময় রাজাকেও গ্রামবাসীগণের সম্মতি লইতে হইত। গ্রামের আভ্যন্তরীণ শাসন গ্রামবাসীগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল এবং রাজভাগ ব্যতীত গ্রামের সমস্ত উপস্বত্ব গ্রামবাসীগণই ভোগ করিত।

সাধারণতঃ রাজতন্ত্র শাসন প্রচলিত ছিল। রাজার প্রথম পুত্র 'যুবরাজ' বলিয়া গণ্য হইতেন এবং রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজই রাজ্যাধিকারী হইতেন। বাদাল স্তম্ভ লিপি ও বৈদ্যদেবের শাসনলিপি হইতে জানা যায় যে অনেক স্থলে রাজপদের ন্যায় মন্ত্রীপদও পুরুষানুক্রমিক চলিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে রাজ্য শাসনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ ছিল ও প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন অধ্যক্ষ থাকিত। পাল রাজগণের শাসনসমূহে প্রায় ঐরূপ বিভাগই দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ মৌর্য্যগণের সময়ে যেরূপ শাসন প্রথা ছিল—পরবর্ত্তী গুপ্ত, পাল, ও সেন রাজগণের সময়ে প্রায় ঐরূপ প্রণালীই অনুসৃত হইত। কেন্দ্রে স্বয়ং রাজার পর্য্যবেক্ষণাধীনে মন্ত্রীসভা ছিল। এই মন্ত্রীসভায় সাধারণতঃ রাজপুত্র, মহামন্ত্রী, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, রাজামাত্য, মহাকুমারামাত্য, দূত ও অমাত্যগণ থাকিত। অঙ্গরক্ষক নামক একজন কর্ম্মচারীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইনি বোধ হয় রাজার দেহ রক্ষক ছিলেন। রাজস্থানীয় নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে। ইনি বোধহয় রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) ছিলেন। খালিমপুর শাসনে 'হস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ ও নাবাধ্যক্ষের উল্লেখ আছে।

রাজস্ববিভাগ।

কৃষিকর গ্রামিক, দাশগ্রামিক, বিষয়পতি ও উপরিকের যোগে আদায় হইত। নানাপ্রকার কর প্রচলিত ছিল যথা, ভাগ (ভূমি রাজস্ব), ভোগ (ফলকর, জলকর, ইন্ধন, পুষ্প প্রভৃতির জন্য কর, হিরণ্য ও উপকর প্রভৃতি। ষষ্ঠাধিকৃত, (রাজপ্রাপ্য ষষ্ঠাংশের আদায়কারী), ভোগাধিকৃত, চৌরদ্ধরণিক, (চৌর প্রভৃতির হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য গ্রামবাসীগণের দ্বারা প্রদত্ত কর আদায়কারী), শৌল্কিক (শুল্ক আদায়কারী), দাশাপরাধিক (দণ্ড আদায়কারী) প্রভৃতি নানা কর্ম্মচারীগণের উল্লেখ পাল ও সেন রাজগণের শাসনে উল্লিখিত আছে।

হিসাব বিভাগ।

আয় ব্যয়ের হিসাব ও মহাফেজখানার তত্ত্বাবধানকারী ছিল মহাক্ষিপটশিক ও প্রধান পুস্তপাল। জ্যেষ্ঠ কায়স্থ (লেখ্য বিভাগের) অধ্যক্ষ ছিল। নানা মাপের নল দ্বারা ভূমির মাপ করা হইত। দ্রব্যাদি মাপের নানা প্রণালী ছিল।

বিচার বিভাগটি মহাদণ্ডনায়ক বা ধর্ম্মাধিকারের রক্ষণাধীনে ছিল। পুলিস

বিভাগ, মহাপ্রতিহার, দণ্ডিক, দণ্ডপাশিক ও দণ্ডশক্তি নামক কর্ম্মচারীগণের পরিচালনাধীন ছিল। খোল নামক কর্ম্মচারী বোধহয় গোয়েন্দাবিভাগের কর্ম্মচারী ছিল।

যুদ্ধ বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন সেনাপতি, মহাসেনাপতি ও কোট্টপাল বা দুর্গাধ্যক্ষ। সীমান্তরক্ষীর নাম ছিল প্রান্তপাল। সেনাপতি ও মহাসেনাপতির অধীনে পদাতিক, অশ্বারোহী, রণহস্তী ও রণতরীসমূহের নেতাগণ ছিলেন। পালরাজারা সেনাবাহিনীতে গৌড়, মালব, কর্ণাট, খশ, কুলিক ও হূণ সৈন্য নিযুক্ত করিতেন। (পাল ও সেনরাজাদের শাসনাবলী দ্রষ্টব্য)।
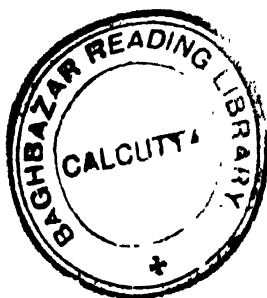
মধ্য যুগ

(১২০১-১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ)

সুলতানী আমল

১। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি (১২০১-১২০৬ খৃঃ)।

বক্তিয়ার ১২০২ খৃঃ দিনাজপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও লক্ষ্মণাবতীর ৭০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত দেবকোট অধিকার করিয়া তথায় তাঁহার বিজিত ভূখণ্ডের শাসন-কেন্দ্র স্থাপন করিলেন, এবং সেই অধিকৃত ভূখণ্ড তাঁহার সেনানী-গণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। মহম্মদ সেরান মসিদা ও সন্তোষ পরগণা (সরকার বার্ব্বকাবাদ) আলিমর্দ্দান বরশাল (পরগণা শিকসহব সরকার ঘোড়াঘাট), হাসাম উদ্দিন গাজুবী পরগণা (পং খাঙ্গইর সরকার ঘোড়াঘাট) জায়গীর স্বরূপ পাইলেন। এই রূপে চারিবৎসর দেবকোটে কাটাইয়া বক্তিয়ার বহু অর্থ ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া তিব্বতে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরিশেষে ১২০৬ খৃঃ শীতের শেষে ১০০০০ বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিব্বতের পথে যাত্রা করিলেন। রেনেলের ৫নং মানচিত্রে অনেক গুলি রাজপথ অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি রাজপথ দেবকোট হইতে লক্ষ্মণাবতী, তথা হইতে নিশানপুর হইয়া দক্ষিণে মহাস্থান গড়ের দুই মাইল উত্তরে শিবগঞ্জের নিকট করতোয়া পার হইয়া এক দিকে গোবিন্দগঞ্জ অন্য দিকে বর্দ্ধনকুটি রাখিয়া কুড়িগ্রাম ও দিনহাটার উপর দিয়া আসামের গোয়ালপাড়া জেলার "রাঙ্গামাটি" পর্য্যন্ত গিয়াছে।

মিনহাজের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, বক্তিয়ার তিব্বত অভিযানে বাহির হইয়া বর্দ্ধনকোট নামে প্রসিদ্ধ স্থানের নিকট দিয়া গমন করেন[১]। তাহা হইলে বক্তিয়ার

১। মিনহাজ লিখিয়াছেন—"আলিমেচ নামক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত এক জন মেচ সর্দ্দার মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারকে পথ দেখাইয়া বর্দ্ধন (কোট) সহরের নিকট লইয়া গেল। কথিত আছে প্রাচীনকালে সাহ গুষ্টাসেপ চীন হইতে কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন এবং এই পথে হিন্দুস্থানে পৌছিয়া এই সহর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার সম্মুখে বেগমতী বা বাঙ্গমাটি নামক সুবৃহৎ নদী প্রবাহিত ছিল। ইহা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়া 'সমুন্দ' (সমুদ্র) নাম গ্রহণ করে। আয়তনে ও গভীরতায় ইহা গঙ্গানদীর তিন গুণ। বক্তিয়ার এই নদীতীরে আসিলে আলিমেচ

লক্ষ্মণাবতী হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বোক্ত রাস্তা দিয়া মহাস্থানগড়ের উত্তরে শিব গঞ্জের নিকট করতোয়া পার হইয়া বর্দ্ধনকুটির নিকট দিয়া ও কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়া আসামের গোয়ালপাড়া জেলার পূর্ব্বোক্ত রাঙ্গামাটি নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ সেকালে এই রাঙ্গামাটিই ছিল আসামের প্রবেশদ্বার। এই রাঙ্গামাটি সহরের সম্মুখেই গঙ্গার তিন গুণ প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদ। অতঃপর মিনহাজের বর্ণনা এইরূপ—"মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার এই নদীতীরে পৌছিলে আলিমেচ

ইসলামের বাহিনীর সহিত যোগ দিল।" এই বর্ণনায় আলিমেচের যোগদানের স্থান সম্বন্ধে দুই প্রকারের দুইটি উক্তি করা হইয়াছে। ইহা এবং বর্দ্ধনকোটের নিকট বেগমতী বা বাঙ্গমাটি নামক গঙ্গার তিনগুণ বিস্তার বিশিষ্ট নদীর উল্লেখ বিভ্রান্তিকর। কারণ বর্দ্ধনকোট বা মহাস্থানগড়ের সম্মুখে কেবল মাত্র করতোয়া নদী অবস্থিত এবং তাহা কখনও অর্দ্ধমাইল বিস্তৃত ছিল কিনা সন্দেহ। ভনডেন ব্রুকের মানচিত্রে (১৬৬০ খৃঃ) ইহাকে স্বল্পপ্রশস্ত রূপে দেখান হইয়াছে। করতোয়া নামের সহিত বেগমতী বা বাঙ্গমাটি নামের কোন সাদৃশ্য নাই। ৺নলিনী কান্ত ভট্টশালী মহাশয় মনে করেন, সাত শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি তবকাৎ-ই-নাশিরীর শত শত নকলের ফলে বেগমতী বা বাঙ্গমাটি ও উহার পরিচয় ও গ্রন্থের এ স্থানের বর্ণনায় স্থানের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত নকলকারকগণ নানা প্রকার ভুল করিয়াছে। "বর্দ্ধনকোটের সম্মুখে বেগমতী বা বাঙ্গমাটি নামক সুবৃহৎ নদী প্রবাহিত ছিল"—এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে "বর্দ্ধনকোট হইতে বক্তিয়ার রাঙ্গামাটি আসিলেন, যাহার সম্মুখে একটি সুবৃহৎ নদী প্রবাহিত ছিল"—এইরূপ বাক্য থাকাই সম্ভব। সম্ভবতঃ এই রাঙ্গামাটি নামটিই বাঙ্গমাটি, অবশেষে 'বেগমতী'তে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গ হইতে কামরূপগামী সমস্ত রাস্তাই কামরূপের প্রবেশদ্বার-স্বরূপ এই রাঙ্গামাটিতেই মিলিয়াছে। এই জন্য সেকালে সামরিক দিক হইতে রাঙ্গামাটির খুব গুরুত্ব ছিল। মার্টিনের ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার তৃতীয় খণ্ডের ৪৭২ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ দেওয়া আছে। তাহাতে দেখা যায়, তথায় একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। বিংশতটির অধিক খিলানযুক্ত সেতু যাহা স্থানীয় লোকের নিকট "শিলহাকো" নামে পরিচিত ছিল, তাহার বিবরণ ১৮৫১ খৃঃ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ৪র্থ খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় মেজর হেনে নামক একজন সামরিক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "এই সুপ্রাচীন প্রস্তর সেতুটি গৌহাটির ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। পশ্চিম কামরূপ হইতে প্রাচীন গৌহাটির দিকে যাইবার যে প্রধান রাস্তা ছিল এই সেতুটি তাহার উপরে

মুসলমান বাহিনীর সহিত যোগ দিল। সে দশদিন পর্য্যন্ত ঐ সেনাবাহিনীকে নদী তীর ধরিয়া পার্ব্বত্য পথের ভিতর দিয়া এমন একস্থানে লইয়া আসিল যেখানে পুরাকাল হইতে বিংশতিটির অধিক খিলান যুক্ত এক প্রস্তর সেতু বিদ্যমান ছিল। এই সেতু পার হইয়া বক্তিয়ার সেতু রক্ষার্থ সেতুমুখে উপযুক্ত সৈন্যসহ একজন খলজ জাতীয় ও একজন তুর্কী জাতীয় আমিরকে স্থাপিত করিয়া বাকী সৈন্যসহ তিব্বতের পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হইলেন। কামরূদের রাজার দূত এখন তিব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশের উপযুক্ত সময় নহে বলিয়া নিবারণ করিলেও বক্তিয়ার ঐ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। সেই দুর্গম পার্ব্বত্য পথের ও গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া ১৫ দিন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া বক্তিয়ার সমতল দেশ প্রাপ্ত হইলেন। এইখানে একটি দুর্গ ছিল। এই দুর্গের নিকট শত্রু সৈন্যের সহিত সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধে বক্তিয়ারের বহু সৈন্য হত হইল। বন্দী শত্রুসৈন্যের নিকট তিনি জানিতে পারিলেন

অবস্থিত। যে নদীটির উপর ইহা নির্ম্মিত তাহা এক সময় একটি বড় নদী ছিল। ** সেতুটির গাঁথুনি অতি দৃঢ়। ইহার ছাদ ৪০ ফিট দীর্ঘ। ৬′–৯″×৮′–১০″ মাপের পাঁচখানি করিয়া পাথরের তক্তা ইহাতে বসানো আছে। তিনটি করিয়া পাশাপাশি অবস্থিত স্তম্ভের কতকগুলি সারির উপর এই ছাদটি নির্ম্মিত। ** এইরূপ তিনটি করিয়া স্তম্ভের ষোলটি সারি, তিনটি বিরাট পিণ্ড, এবং আরম্ভে ও শেষে দুইটি অর্দ্ধ পিণ্ডের উপর সম্পূর্ণ সেতুটি স্থাপিত। সেতুর নীচে জল নির্গমনের জন্য একুশটি ফাঁক আছে। *** যদি ধরা যায় যে ১২০৫-০৬ খৃঃ মুসলমান অভিযান রাঙ্গামাটিতে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, এবং তৎপর উত্তর কামরূপের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা হইলে ইহা অসম্ভব নহে যে বক্তিয়ার খিলজি ও তাহার তাতারী অশ্বারোহীরদল এই সেতুর উপর দিয়াই প্রাচীন গৌহাটি সহরের অনতিদূরে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ** সেতুর ছাদের তক্তাগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে এইগুলি একবার খুলিয়া পরে আবার বিশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত হইয়াছে।"

উত্তর গৌহাটি হইতে প্রায় ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী পুষ্পভদ্রার উপরে প্রস্তুত এই সেতুটি অবস্থিত ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। (Indian H. Q. Vol. IX p. 49-62, "Mahommad Baktyari Expedition to Tibet" by N. K. Bhattasali)।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ প্রায় সর্ব্বত্রই 'কামরূপ'কে 'কামরূদ' নামে উল্লেখ করিয়াছে।

যে, করা পত্তন (ভূটানের কারু গুজা ?) নামক এক অদূরবর্ত্তী নগরে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সমবেত হইয়াছে। তাহারা রাত্রি শেষে আসিয়া মুসলমান বাহিনীকে আক্রমণ করিবে। এই সংবাদে ভীত হইয়া বক্তিয়ার তাঁহার বাহিনীকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে দেখা গেল পথের সর্ব্বত্র জনশূন্য। মনুষ্য বা পশুর খাদ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। দুর্ব্বিষহ কষ্ট ও অনশন সহ্য করিয়া সেই বাহিনী সেই প্রস্তর সেতুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তথায় যে দুইজন আমিরকে পাহারায় রাখা হইয়াছিল, তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া সেতু ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কামরূপের সৈন্যরা সেতুটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। নদী পার হইবার আর উপায় না দেখিয়া মুসলমান সৈন্যদল নিকটবর্ত্তী এক বৃহৎ প্রস্তর মন্দিরে (সম্ভবতঃ হাজোর মন্দির) আশ্রয় লইল। কামরূপের সৈন্যগণ আসিয়া দূর হইতে বাঁশ দিয়া ঘিরিয়া সেই মন্দিরের চারিদিকে এক শক্ত বেড়া দিতে লাগিল। কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত বক্তিয়ার ও তাঁহার অনুচরেরা এই বেড়া ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া নদী তীরে আসিল। এমন সময় এক মিথ্যা রব উঠিল যে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় এমন স্বল্প জল বিশিষ্ট স্থান নদীতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া সেই সেনাদল নদীর অগাধ জলে নামিয়া পড়িল। কামরূপের সেনাদল নদীতট হইতে তাহাদের উপর অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। ফলে বক্তিয়ারের প্রায় সমস্ত বাহিনীই জলে ডুবিয়া মরিল (১২০৬ খৃঃ ৭ই মার্চ্চ)। মাত্র ১০০ অনুচর সহ বক্তিয়ার নদী উত্তীর্ণ হইয়া দেবকোটে পৌছিতে সমর্থ হইলেন। দেবকোটে আসিয়া বক্তিয়ার পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং তিনমাস পর ৬০২ হিজরিতে ভগ্ন হৃদয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। কথিত আছে তাঁহার অনুচর আলিমর্দ্দান খিলিজি তাঁহাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। প্রায় এই সময় সুলতান মইজউদ্দিন মহম্মদ বিন সাম ঘোরী ঝিলাম নদীতীরে দুর্দ্ধর্ষ গক্করগণ কর্ত্তৃক স্বশিবিরে নিহত হইয়াছিলেন (৬০২ হিঃ, সাবন ১,—১২০৬ খৃঃ ১৩ই মার্চ্চ)।

গৌহাটি সহরের অদূরে "কানাই বড়শীবাওয়া" নামক স্থানে তুর্কীগণের পরাজয় সম্বন্ধে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। ঐ লিপিটি এইরূপ—"শাকে তুরগ যুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে। কামরূপং সমাগত্য তুরস্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ" (কামরূপ লেখমালা)। অর্থাৎ ১১২৭ শকাব্দের ১৩ই চৈত্রে (১২০৬ খৃঃ ৭ই মার্চ্চ) কামরূপে সমাগত হইয়া তুরস্কগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শিলালিপি যে বক্তিয়ারের তিব্বত-অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে পূর্ব্বোক্ত শিলহাকোর নিকটে তাঁহার বাহিনীর শোচনীয় ধ্বংসেরই স্মারকলিপি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শিলালিপির পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী "শিলহাকো" হইতে একটি রাস্তা আজিও

সোজা উত্তরে যাইয়া ভূটানে পৌছিয়াছে।

২। **মহম্মদ সেরান** (১২০৬-১২০৮ খৃঃ)।

৩। **আলিমর্দ্দান** (১২০৮-১১ খৃঃ)

৪। **গিয়াস উদ্দিন ইউয়জ** (১২১১-১২২৬ খৃঃ)

বক্তিয়ার লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের যে অংশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহার শাসন-কেন্দ্র লক্ষ্মণাবতীতে ছিল না, দেবকোটে ছিল। বক্তিয়ারের পরবর্ত্তী খিলিজি মালিক মহম্মদ সেরান ও আলিমর্দ্দান দেবকোট হইতেই অধিকৃত রাজ্য শাসন করিতেন। অতঃপর হাসাম উদ্দিন ইউয়জ (১২১১-১২২৬ খৃঃ) দেবকোট অধিকার করিয়া গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ নামে সুলতান হন এবং ১২১৯-২০ খৃষ্টাব্দে দেবকোট হইতে লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া নূতন নগর ও বসনকোট নামে একটি আবরণ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। মিনহাজ বলেন, লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের একভাগ গঙ্গার পূর্ব্বতীর, অপর ভাগ পশ্চিম তীর অবস্থিত ছিল। পূর্ব্ব ভাগের নাম বরিন্দ (বরেন্দ্র) ও পশ্চিম ভাগের নাম রাঢ়। গিয়াসউদ্দিন পূর্ব্ব ভাগের রাজধানী দেবকোট হইতে লক্ষ্মণাবতীর মধ্য দিয়া পশ্চিম ভাগের রাজধানী বীরভূম জেলার লখনোর (নগর) পর্য্যন্ত ১৫০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা উচ্চ করিয়া বাঁধিয়া দেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলার কতকাংশ লইয়া বর্ত্তমান মালদহ জেলা গঠিত হয়। এই জেলার সীমামধ্যে পাল রাজধানী রামাবতী ও সেন রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। আমরা এই মালদহ জেলার যে অংশকে গৌড় বলি তাহা বক্তিয়ার খিলজির দেওয়া নাম। প্রাচীন গৌড়পুর বোধ হয় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। জাওাড ব্যারোসের (১৫৫০ খৃঃ) নক্সার 'Goris' ও গ্যাস্‌ট্যাল্ডীর (১৫৬১ খৃঃ) নক্সার Gaur বোধ হয় ঐ গৌড়পুর। তাহা ঐ নক্সাদ্বয়ে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রাঢ় দেশের মধ্যেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা এক্ষণে ভাগীরথীর গর্ভে।

১২১৪ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যারাজ তৃতীয় অনঙ্গ ভীমদেবের (১২১১-৩৮ খৃঃ) সামন্ত জাজনগরের শাসনকর্ত্তা বিষ্ণুদেব রাঢ় আক্রমণ করিয়া রাজধানী "নগর" অধিকার করে। কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই গিয়াসউদ্দিন উহাকে পুনরুদ্ধার করেন। অতঃপর গিয়াসউদ্দিন "সুলতান" উপাধি ধারণ করিয়া নিজ নামে "খুদবা" প্রচলন ও লক্ষ্মণাবতী টাকশাল হইতে মুদ্রা মুদ্রিত (৬১৬ হিঃ) করেন এবং বোগদাদের আব্বাছ বংশীয় খলিফা অল্-নাশিরের নিকট হইতে ফার্ম্মান সংগ্রহ করেন (৬২০ হিঃ)। ৬২৪ হিঃ (১২২৭ খৃঃ) জানুয়ারী মাসে গিয়াসউদ্দিন

তাঁহার স্বনির্ম্মিত রণপোত ও সৈন্য লইয়া বঙ্গ আক্রমণ করেন। এই সময়ে বোধহয় বিশ্বরূপসেন বঙ্গপতি ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন যখন জানিতে পারিলেন যে দিল্লীর সুলতান ইলতুমিসের পুত্র নাসিরুদ্দিন[১] অযোধ্যা হইতে সসৈন্যে লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন গিয়াসউদ্দিন দ্রুতগতি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শত্রুগণ লক্ষ্মণাবতীতে প্রবেশ করিয়া বসনকোট দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। গিয়াসউদ্দিন তাঁহার অনুগামী সৈন্যগণ লইয়া বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার আমীরগণ পরাজিত ও বন্দী হইলেন ও তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করা হইল (হিঃ ৬২৪ ; ১২২৭ মার্চ্চ)।

৫। নাসির উদ্দিন মহম্মদ (১২২৬-১২২৯ খৃঃ)।

৬। ইক্তার উদ্দিন বলকা (১২২৯-১২৩০ খৃঃ)।

৭। আলাউ দ্দন জানি (১২৩০-১২৩১ খৃঃ)।

৮। মালিক সৈফুদ্দিন আইবক্ (১২৩১-১২৩৬ খৃঃ)।

৯। আওর খাঁ আইবক্ (১২৩৬ খৃঃ)।

অতঃপর নাসিরউদ্দিন মহম্মদ অযোধ্যা, বিহার ও লক্ষ্মণাবতী লইয়া একটি যুক্তরাজ্য গঠন করিলেন এবং লক্ষ্মণাবতীতে বাস করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বর সমস উদ্দিন ইলতুমিস তাঁহাকে মালিক-ই-সর্ক (পূর্ব্বদিকের মালিক) উপাধি দিলেন। কিন্তু উপাধি তাঁহার নিকট পৌছিবার পূর্ব্বেই ১২২৯ খৃঃ মে মাসে তিনি পরলোকগত হুন। তখন গিয়াসুদ্দিন খিলজীর দলভুক্ত মালিক ইক্তার উদ্দিন বলকা নামক একজন খিলজী-মালিক লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া আঠার মাস রাজত্ব করেন। কিন্তু ৬২৮ হিঃ (১২৩০ খৃঃ নভেম্বর) সুলতান ইলতুমিস তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। অতঃপর তিনি আলাউদ্দিন জানিকে লক্ষ্মণাবতীর ও মালিক সৈফ উদ্দিন আইবককে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ৬২৮ হিঃ (১২৩১ খৃঃ মে)-তে দিল্লী ফিরিয়া যান। ইহার বৎসরাধিক কালের মধ্যে তিনি আলাউদ্দিন জানিকে লক্ষ্মণাবতী হইতে সরাইয়া

১। কুতুবউদ্দিন (১২০৬-১০ খৃঃ), তৎপুত্র আরাম সাহ (১২১০-১১ খৃঃ), কুতুবউদ্দিনের জামাতা সমস উদ্দিন ইলতুমিস (১২১১-৩৬ খৃঃ), তৎপুত্র ফিরোজ সাহ (১২৩৬ খৃঃ), ইলতুমিসের কন্যা রিজিয়া (১২৩৬-৭০ খৃঃ), রিজিয়ার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বাহরাম ও মাসুদ (১২৪০-৪৬ খৃঃ), ইলতুমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন (১২৪৬-৬৬ খৃঃ), যথাক্রমে দিল্লীর সুলতান হন।

তথায় মালিক সৈফউদ্দিন আইবক্‌কে ও তুঘ্রল তুঘান খাঁকে বদায়ুন হইতে সরাইয়া বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর ৬৩৩ হিঃ (১২৩৬ খৃঃ, ২০শে এপ্রিল) সুলতান ইলতুমিস পরলোকগমন করেন এবং প্রায় এই সময় সৈফউদ্দিন আইবকেরও মৃত্যু হয়।

অতঃপর আওর খাঁ আইবক্‌ বলপূর্ব্বক লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন।

১০। তুঘ্রল খাঁ (১২৩৬-৪০ খৃঃ)।

১১। মালিক তমুর খাঁ (১২৪৫-৪৭ খৃঃ)।

১২৩৬ খৃঃ তুঘ্রল তুঘান খাঁ সুলতানা রিজিয়ার নিকট হইতে বিহার ও লক্ষ্মণাবতীর শাসন কর্ত্তার পদের ফার্ম্মান প্রাপ্ত হইয়া বিহারে আগমন করেন। তৎপর লক্ষ্মণাবতী নগরের সীমার মধ্যে আওর খাঁর সহিত তুঘ্রলের যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে আওর খাঁ নিহত হন ও তুঘ্রল লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের মালিক হন। ১২৪২ খৃঃ ২০শে জুন রিজিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন মাসুদ দিল্লীর সুলতান হইবার পর তুঘ্রল অযোধ্যা ও কড়ামানিকপুর অধিকার করেন। এই সময় অযোধ্যায় তবকাৎ-ই-নাশিরী প্রণেতা মিনহাজ-উল-সিরাজ তুঘ্রল খাঁর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার সহিত লক্ষ্মণাবতীতে আগমন করেন (১২৪৩ খৃঃ জুন)। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে উড়িষ্যার রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের পুত্র রাজা নরসিংহদেব (১ম) রাঢ়ে অভিযান করিয়া 'নগর' পর্য্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু তুঘ্রল 'নগরে' (লখনোরে) উপস্থিত হইলে তিনি সীমান্ত দুর্গ কটাসিনে পশ্চাৎপদ হন। রেনেলের ৭নং সিটে বর্দ্ধমানের ২৫ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে কিষ্টনগর (Kistnagar) নামক স্থান দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ইহাকে অথবা বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের সীমান্তে দামোদর নদের ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'কঠ সঙ্গ' হইতে ১ মাইল দূরবর্ত্তী 'কড়া সুর' গড়কে কটাসিন বলিয়া মনে করেন। ১২৪৪ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল তারিখে তুর্কীরা এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ভীষণ যুদ্ধে দুইটি পরিখা অধিকার করিলে হিন্দুরা পলায়ন করে। এই সময় মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হওয়ায় তুঘ্রল খাঁর সৈন্যগণ আহারে ব্যস্ত হইলে একদল হিন্দু সৈন্য দুর্গের দিক হইতে এবং অপর একদল হিন্দু সৈন্য পশ্চাতের বেতস বন হইতে তুর্কীগণকে আক্রমণ করে। ভীতি-বিহ্বল হইয়া তুঘ্রলের সৈন্য পলাইতে আরম্ভ করিল ও হিন্দু সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইল। তুর্কীরা অবশেষে কটাসিনের ৭৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নিজেদের 'নগর' (লখনোর) দুর্গও ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মিনহাজ বলেন, সমগ্র হিন্দুস্থানের আর কোথাও তুর্কীগণের এতবড় বিপর্য্যয়

ঘটে নাই। এই যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুসলমান সৈন্য নিহত হয়।

অতঃপর উড়িয়া সৈন্যগণ 'নগরে'র শাসনকর্ত্তা করিম উদ্দিন লাংড়ী ও তাঁহার বহু সৈন্য নিহত করিয়া নগর অধিকার করিল এবং পর বৎসর বরেন্দ্র আক্রমণ করিল। ৬৪২ হিঃ ১০ই সওয়াল (১২৪৫ খৃঃ ১৪ই মার্চ্চ) লক্ষ্মণাবতী আক্রান্ত হইলে তুঘ্রল খাঁ দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং দিল্লীর সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। দিল্লীর সৈন্যগণ অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা মালিক তমুর খাঁর অধীনে রাজমহল পর্ব্বতমালার নিকটে আসিয়া পড়িলে উড়িয়াগণ লক্ষ্মণাবতীর নিকট হইতে সরিয়া গেল। কিন্তু তমুর খাঁ লক্ষ্মণাবতী নিজ হস্তে লইবার চেষ্টা করায় তুঘ্রলের সহিত তাঁহার খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে মিনহাজ উদ্দিনের চেষ্টায় সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির ফলে তুঘ্রল তাঁহার ধনসম্পত্তি, পরিবারবর্গ ও অনুচরগণসহ লক্ষ্মণাবতী হইতে অক্ষত দেহে চলিয়া যাইতে সমর্থ হইলেন এবং মালিক তমুর খাঁ বিহার ও লক্ষ্মণাবতী প্রদেশের মালিক হইলেন। মিনহাজ উদ্দিন স্বয়ং তুঘ্রলের সহগামী হইলেন এবং ৬৪৩ হিঃ ১৪ সফর সোমবার (১২৪৫ খৃঃ ১১ই জুলাই) তাঁহারা দিল্লীর দরবারে পৌঁছিলেন। ৬৪৪ হিঃ ২৩ মহরম (১২৪৬ খৃঃ ১০ই জুন) সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদের মৃত্যুর পর ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন মহম্মদ দিল্লীর সুলতান হন। তিনি মালিক তমুর খাঁর শাসিত অযোধ্যা প্রদেশ তুঘ্রল খাঁকে প্রদান করেন, কিন্তু তুঘ্রল অযোধ্যায় প্রবেশ করিবার কিছুদিন পরেই ১২৪৭, ৯ই মার্চ্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ দিন রাত্রিতে মালিক তমুর খাঁও লক্ষ্মণাবতীতে প্রাণত্যাগ করেন।

১২। মালিক জালাল উদ্দিন মাসুদ জানি (১২৪৭-৫১খৃঃ)

অতঃপর লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার মালিক আলাউদ্দিন জানির পুত্র মালিক জালালউদ্দিন মাসুদ জানির উপর অর্পিত হয়। ১২৪৭ খৃঃ মে হইতে ১২৫১ খৃঃ মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিনি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দেবকোটের নিকটবর্ত্তী গঙ্গারামপুরের একটি মসজিদের লিপিতে তাঁহার নাম উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়।

১৩। মালিক ইক্তার উদ্দিন উজবেক্ (১২৫১-৫৭ খৃঃ)।

অতঃপর অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা মালিক ইক্তার উদ্দিন উজবেক ৬৫০ হিজরীতে বিহার ও লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি বরেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রাঢ় আক্রমণ করিলেন (হিঃ ৬৫১, ১২৫৩ নভেম্বর-ডিসেম্বর)। উড়িষ্যারাজ নরসিংহদেব (১ম) তাঁহার জামাতাকে হুগলী জেলার মান্দারণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া

রাঢ় দেশ শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে মালিক উজবেক্ শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হইয়া দিল্লীর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু দিল্লী হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া মালিক ইখ্‌তার-উদ্দিন উজবেক্ নিজের চেষ্টায় সৈন্য সংগ্রহ করতঃ দুই বৎসর পর (১২৫৫ খৃঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর) পুনরায় রাঢ় আক্রমণ করিলেন এবং অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে উড়িষ্যার পরাক্রান্ত গজসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া মান্দারণ অধিকার করিলেন এবং নদীয়া অধিকার করিয়া সমস্ত গৌড়দেশে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। অতঃপর লক্ষ্মণাবতীর টাকশাল হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার ও সুলতান উপাধি ধারণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল "সুলতান মুখিস অল দুনিয়া ওয়ালাদিন আবুল মুজাফর উজবেক্"। এই সময় দিল্লীর দরবারে পুনরায় বলবনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুলতান উজবেক্ অযোধ্যা প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন (১২৫৬ খৃঃ জুলাই-আগষ্ট) এবং অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিয়া নিজনামে খুদবা পাঠ করাইলেন। অতঃপর অযোধ্যা বিহার ও লক্ষ্মণাবতীতে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি কামরূপ আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন (১২৫৭ খৃঃ)। এই সময় কামরূপে কোন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। কোচবিহার, গোয়ালপাড়া ও কামরূপে ভুঁইয়ারা রাজত্ব করিতেন, এবং তাহার পূর্ব্বে আহম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুখাপার (১২২৮-৬৮ খৃঃ) রাজত্ব চলিতেছিল। মুখিস উদ্দিন গোয়ালপাড়া জেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর ধরিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কামরূপের রাজা রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মুখিস উদ্দিন বর্ষাকালে কামরূপের রাজধানীতে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কামরূপরাজ সমস্ত শস্য ধ্বংস করিয়া এবং বাঁধ দিয়া পার্ব্বত্য নদীর জল আটকাইয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলে লুকাইয়া রহিলেন। প্রবল বর্ষা আরম্ভ হইলে খাদ্যাভাবে মুখিস উদ্দিনের সৈন্যগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় চারিদিক হইতে আসাম সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মুখিস উদ্দিনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় নদীর জলে ও বর্ষার প্লাবনে চারিদিক জলময় হইয়া উঠিল। অগত্যা সুলতান মুখিস উদ্দিন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া পশ্চাৎ পদ হইতে লাগিলেন। কিন্তু হিন্দু সৈন্যেরা চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। একটি তীর আসিয়া তাঁহাকে সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত করিল। অবশেষে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গ, সৈন্যসামন্তসহ কামরূপরাজের হস্তে বন্দী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন (১২৫৭ খৃঃ জুলাই)।

১৪। মালিক ইয়ুজ উদ্দিন বলবন-ই উজবেগী (১২৫৭-৫৯ খৃঃ)

অতঃপর মালিক ইয়ুজ উদ্দিন বলবন-ই-উজবেগী লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা হইলেন। ইনি মাসুদ জানির জামাতা ছিলেন এবং ১২৫৪ খৃঃ (৬৫২ হিঃ) দিল্লী দরবারে নায়েব আমীর-ই-মজলিস পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি ৬৫৭ হিঃ (১২৫৯ খৃঃ)তে বঙ্গ আক্রমণ করেন। এই সময় সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবসেন বঙ্গের (পূর্ব্ব ও দক্ষিণ) রাজা ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ৬২৪ হিঃ (১২২৭ খৃঃ)তে সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইউয়জ খিলজী লক্ষ্মণসেনের আর এক পুত্র বিশ্বরূপসেনের[১] সময় বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেবার সুলতান গিয়াস উদ্দিনকে যেরূপ লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিয়া মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল, এবারে ইয়ুজ উদ্দিন উজবেগীকেও বিফলমনোরথ হইয়া লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কারণ তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে দিল্লীর সুলতান সামস উদ্দিন ইলতুমিসের ক্রীতদাস মালিক তমিজ উদ্দিন আর্সলান খাঁ খরর-ই-চগতে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লন এবং এই সংবাদ পাইয়া ইয়ুজ উদ্দিন উজবেগী লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিয়া তমিজ উদ্দিন আর্সলনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১২৫৮ খৃঃ ডিসেম্বর)। এই স্থানে তবকাৎ-ই-নাশিরী শেষ হইয়াছে।

১৫। তমিজ উদ্দিন আর্সলান (১২৫৯-৬৫ খৃঃ)

এই তমিজ উদ্দিন দিল্লীশ্বর উলুখ খাঁ বলবনের সাহায্যে ৬৫৭ হিঃ (১২৫৯ খৃঃ) ১ম ভাগে কড়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণাবতী অধিকারের পর বিহার ও লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা হন, এবং সুলতান উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে ১২৬৫ খৃঃ ৮ই মার্চ্চ হিঃ ৬৬৩ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোকগমন করেন। (বারদ্বারি শিলালিপি। Epi. Indo-Moslemick, 1913-14 p. 24 ।

১। বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন নিজ নিজ তাম্রশাসনে নিজেকে "গর্গ-যবনান্বয়-প্রলয় কালরুদ্রঃ" বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। হরিবংশের মতে (হরিবংশ পর্ব্ব ৩৫ অধ্যায় ১৩-১৬ শ্লোক) গার্গ্যের ঔরসে গোপস্ত্রী বেশধারিণী অপ্সরা গোপালীর গর্ভে কালযবনের জন্ম হয়। "গোপালীত্বপ্সরা তস্য গোপস্ত্রী বেশধারিণী ॥১৪॥ ধারয়ামাস গার্গ্যস্য গর্ভং দুর্দ্ধর মচ্যুতম্। ১৫। স কাল যবনো নাম জজ্ঞে রাজা মহাবলঃ। ১৬।" এইজন্য বোধহয় তুরুস্কগণকে "গর্গ-যবনান্বয়" বলা হইয়াছে।

১৬। তাতার খাঁ (১২৬৫-৬৮ খৃঃ)।

অতঃপর তাঁহার পুত্র তাতার খাঁ লক্ষ্মণাবতীতে স্বাধীন সুলতান হন। তাঁহার রাজত্বকালে হিঃ ৬৬৪ (১২৬৬ খৃঃ) দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু হয় এবং সেই বৎসরেই তাতার খাঁ দিল্লীর পরবর্ত্তী সুলতান উলুখ খাঁ গিয়াসুদ্দিন বলবনকে (১২৬৬-১২৮৭ খৃঃ) বহু মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। (তওয়ারিখ-ই-ফিরোজসাহী, মূল পৃঃ ৫৩)। অনুমান ১২৬৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৭। শের খাঁ (১২৬৮-৭২ খৃঃ)।

তৎপর তাতার বংশীয় শের খাঁ সুলতান হন। তাঁহার মুদ্রায় নিজ নামের সহিত বলবনের নাম অঙ্কিত দৃষ্ট হয় (হিঃ ৬৬৭)। শের খাঁ প্রায় ৪ বৎসর (৬৬৬-৬৭০ হিঃ, ১২৬৮-১২৭২ খৃঃ) রাজত্ব করিয়া মৃত হন।

১৮। আমিন খাঁ (১২৭১-৭৬ খৃঃ)।

অতঃপর দিল্লীশ্বর বলবন অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা আমিন খাঁকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা ও তোঘ্রল খাঁকে তাঁহার নায়েব নিযুক্ত করেন। বিহারের জন্যও পৃথক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইল। কিন্তু ৬৭৪ হিঃ (১২৭৬ খৃঃ)-তে তোঘ্রল আমিন খাঁকে পরাজিত করিয়া লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন।

১৯। তোঘ্রল খাঁ (১২৭৬-৮২ খৃঃ)।

তোঘ্রল এইরূপে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছুদিন পর কামরূপ আক্রমণ করিয়া ঐ রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিলেন। ১২৭৯ খৃঃ (৬৭৮ হিঃ) তিনি জাজনগরের (উড়িষ্যা) রাজাকে পরাস্ত করিয়া বহু হস্তী ও অর্থ লাভ করেন এবং রাঢ়ে আধিপত্য স্থাপন করেন। জিয়াউদ্দিন বার্ণির বিবরণ হইতে আরও জানা যায় তোঘ্রল বঙ্গেও একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে "নারিকোল" নামক স্থানে তোঘ্রলের এই দুর্ভেদ্য দুর্গ অবস্থিত ছিল। তোঘ্রল সম্ভবতঃ পদ্মার উভয় তীরে আধিপত্য রক্ষার জন্য এই নারিকোল দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সময় মহারাজাধিরাজ "অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীদশরথ দেব" বিক্রমপুর ভাগে সুবর্ণ গ্রামে রাজত্ব করিতেন[১]। তাঁহার পিতা

১। প্রাচীন বঙ্গজ কায়স্থ কুলকারিকায় কুলীন পুরবসুর তিন কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

অরিরাজ চানুরমাধব শ্রীদামোদর দেবের শাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাধীন রাজা ছিলেন। মহারাজাধিরাজ দনুজমাধব দশরথদেব বোধহয় ১২৪৩ খৃষ্টাব্দের পর ও ১২৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার পিতার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে বিক্রমপুর জয়স্কন্দাবার হইতে তিনি তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত আদাবাড়ী গ্রাম হইতে ঐ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে (Inscription of Bengal Part III p. 181-2)। এই তাম্রশাসনে, দশরথদেব "পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীদশরথদেব" (৬ পঙক্তি) ও "অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ ত্রয়াধিপতি, সোমবংশ প্রদীপ, প্রতিপন্ন কর্ণ তাব্রং গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর" (৪,৫ পঙক্তি) বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে আরও লিখিত আছে যে, দশরথদেব "নারায়ণের কৃপায়" গৌড় রাজ্য লাভ করিয়াছেন (৪ পঙক্তি)। এই শাসন দ্বারা (১) সন্ধ্যাকর শ্রী মাক্রী (দিন্দি গাঁই) (২) শ্রীশক্তি—শ্রীসুগন্ধ (পালি গাঁই) (৩) শ্রী সোম (শিউ গাঁই) (৪) শ্রী বাস্থ (পালি গাঁই) (৫) শ্রী পণ্ডিত (মাস চটক) (৬) শ্রী মাণ্ডি (মূল) (৭) শ্রী রাম (দিগ্ৰী) (৮) শ্রী লেধু (সেহগুায়ী) (৯) শ্রী দক্ষ (পুতি) (১০) শ্রী ভট্ট (সেউ) (১১) শ্রী বালি (মহাণ্ডিয়াড়া) (১২) শ্রী বাসুদেব (করঞ্জুগ্রামী) (১৩) শ্রী মিকো (মহাসচড়ক) নামক ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করা হইয়াছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ৫৬ গাঞীর কতকগুলি গাঞীর উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যাইতেছে।

এড়ুমিশ্রের কারিকা ও ধ্রুবানন্দ মিশ্রের সমীকরণসার ও মহাবংশাবলী (একত্র মিশ্র গ্রন্থ) নামক প্রামাণিক কুলগ্রন্থদ্বয়ে 'দনুজমাধব দেবের' উল্লেখ আছে। পঞ্চম সমীকরণে রাজা দনুজমাধব কর্তৃক মুখ বংশীয় মহাদেব সম্মানিত

"সত্যায় কার্ণ্য ঘোষায় পশ্চাৎ ভীম গুহায় চ।
মহদ্ রাজ্ঞে দনুজায় মাধবায় বিশেষতঃ॥"

অর্থাৎ পুরবসু তাঁহার প্রথমা কন্যাকে কার্ণ্যঘোষের সহিত, দ্বিতীয়া কন্যাকে ভীম গুহের সহিত ও তৃতীয়া কন্যাকে মহারাজ দনুজমাধবের সহিত বিবাহ দেন। পরবর্তীকালে চন্দ্র দ্বীপে মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেব, বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুরে রাজা কেদার রায় ও চাঁদ রায় ও ফতেহাবাদে (ফরিদপুরে) রাজা মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র শত্রুজিৎ রায়ের অভ্যুদয় ঘটে। ইহারা সকলেই দেব বংশীয় ছিলেন।

হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে মহাবংশাবলীতে লিখিত আছে 'দনুজমাধবে নাসৌ রাজা পূর্ব্বং পুবস্থতঃ' (পৃঃ ৫)। মহাদেব ছিলেন উৎসাহের তৃতীয় পুত্র। উৎসাহের প্রথম পুত্র আযিত লক্ষ্মণসেনের অভিষেক কালে সংঘটিত প্রথম সমীকরণের প্রথম কুলীন ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে একবার মাত্র লক্ষ্মণসেনের নাম দৃষ্ট হয়। তুরস্কের ভয়ে কেশবসেন দনুজ মাধবের আশ্রয়ে গমন করিয়াছিলেন[১]। সমসাময়িক এডুমিশ্রের কারিকার এই উক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটিত করিতেছে। সম্ভবতঃ ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণবতীর সুলতান ইজ্জউদ্দিন বলবন উজবেগী কেশবসেনের বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিলে কেশবসেন রাজ্য ত্যাগ করিয়া দনুজমাধবের রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু উজবেগীর অনুপস্থিতির সুযোগে তাজউদ্দিন আর্সলান লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া লইলে, উজবেগী লক্ষ্মণাবতী উদ্ধারার্থ লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া গিয়া উজবেগীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে, দনুজমাধব বোধহয় সেই সুযোগে বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়া সোনার গাঁয়ে রাজধানী করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই বোধহয় বিক্রমপুরের জয়স্কন্দাবার হইতে প্রদত্ত তাঁহার আদাবাড়ী শাসনে লিখিয়াছেন যে, তিনি নারায়ণের কৃপায় গৌড়রাজ্য লাভ করিয়াছেন।

১২৬৬ খৃঃ উলুঘ খাঁ বলবন সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন নামধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান হইলেন। কিন্তু মধ্য এশিয়ার মরুবাসী মুঘলগণ বারবার পঞ্জাব আক্রমণ করায় তিনি ব্যতিব্যস্ত থাকায় গৌড়-বঙ্গের ঘটনাবলীর উপর উপযুক্ত নজর রাখিতে পারেন নাই। এই সুযোগে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা তোগ্রল খাঁ বিদ্রোহী হইয়া নিজ নামে খুদবা প্রচার ও মুদ্রা প্রচলন করতঃ সুলতান মুঘিস্ উদ্দিন তোগ্রল খাঁ উপাধি লইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন।

বার্নির গ্রন্থানুসারে বলবনের রাজ্যের পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতী প্রদেশ শান্ত ছিল। বোধহয় ৬৭৯-৮০ হিঃ ১২৮০ খৃষ্টাব্দের পর কোন সময়ে তোগ্রল বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তোগ্রলের বিদ্রোহের সংবাদে বলবন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কারণ ক্রীতদাসদের মধ্যে তোগ্রল তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

তস্মাভূৎতনয়ঃ প্রচণ্ড বিনয়ঃ শ্রীকেশবাখ্যঃ স্বয়ং।
দেশঞ্চাপি বিহায় বঙ্গমগমৎ ভীতস্তুরস্কাৎ ততঃ ॥
তত্রাসীৎ দনুজারিমাধবঃ নৃপঃতং কেশব ভূপতি।
সৈন্যৈঃ বিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতেন রণৈশ্চ যুক্তে গতঃ ॥

জাজ নগরের যুদ্ধে তোঘ্রল অনেক হস্তী ও অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তিনি দিল্লীতে প্রেরণ করেন নাই। সেই অর্থদ্বারা তোঘ্রল বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বলবন অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা তুরমতি খাঁকে সসৈন্যে তোঘ্রলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সহিত তুমর খাঁ ও মালিক তাজউদ্দিন সসৈন্যে যোগ দিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তোঘ্রল বিজয়ী হইলেন। বার্নি বলেন, পর বৎসর তোঘ্রলের বিরুদ্ধে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু তাহারাও পরাজিত হইল।

অতঃপর ১২৮০ খৃঃ জানুয়ারীতে বলবন স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুলতানের শাসনকর্তা মহম্মদের উপর সম্ভাব্য মুঘল আক্রমণ-প্রতিরোধের ভার অর্পিত হইল। দিল্লীর কোটাল মালিক-উল-উমারের উপর দিল্লীর শাসনভার প্রদত্ত হইল। বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র বগরা খাঁ তাঁহার পশ্চাৎ ভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি যুদ্ধ যাত্রা করিয়া ১২৮০ খৃঃ মার্চ্চ মাসে অযোধ্যায় পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে সর্ব্বপ্রকারে প্রায় তিন লক্ষ লোক ও একটি বৃহৎ নৌবহর লইয়া তোঘ্রলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

বার্নি বলেন, "তোঘ্রল সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া লক্ষ্মণাবতী হইতে জাজনগরের পথে একদিন গমন করিয়া বিশ্রাম লইলেন। কিন্তু বলবনের সৈন্যগণ লক্ষ্মণাবতীর ৩০।৪০ মাইলের মধ্যে আসিলে তোঘ্রল পুনরায় জাজনগরের দিকে চলিতে লাগিলেন। এদিকে বলবন লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া তথায় সেপ্টেম্বর পর্যান্ত বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন। বার্নির মাতামহ সিপাহসালার হিসামুদ্দিন লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

বার্নির বিবরণে জানা যায়, ১২৮১ খৃঃ বর্ষার পর বলবন তোঘ্রলের বিরুদ্ধে জাজনগরের দিকে অভিযান করেন। কিন্তু তোঘ্রলের সন্ধান না পাইয়া লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া যান। ১২৮২ খৃঃ তিনি পুনরায় অভিযান আরম্ভ করিয়া সোনার গাঁয়ের নিকটে "কিল্লা তোঘ্রলে"র অনতিদূরে বর্ষা কাল যাপন করেন। এই সময় তিনি সোনার গাঁয়ের রাজা দনুজরায়কে (দনৌজমাধবদেব) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন। দনুজরায় এই নিয়মে বলবনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন যে দনুজরায় তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া দনুজরায়কে অভ্যর্থনা করিবেন। উক্ত নিয়মে স্বীকৃত হইবার পর দনুজরায় বলবনের শিবিরে উপস্থিত হন ও বলবনও দণ্ডায়মান হইয়া রাজা দনুজরায়কে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে আলোচনার দ্বারা স্থির হয় যে, দনুজরায়

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের সমুদয় জলপথ দিয়া তোগ্রলের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবেন।

বার্নি বলেন, তোগ্রল এই সংবাদ অবগত হইয়া পরিবার, অনুচরগণ, ধনরত্ন ও সৈন্যদলসহ নারিকোল কিল্লা ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে জাজনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে বলবনও ৭ হাজার সৈন্যসহ মালিক বেকতুরস্‌কে তোগ্রলের সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। মালিক বেকতুরসের গোয়েন্দাগণ প্রায় দশ ক্রোশ অগ্রসর হইলে কতকগুলি বণিকের সাক্ষাৎ পাইল। এই বণিকগণ তোগ্রলের শিবির হইতে আসিতেছে সন্দেহ করিয়া গোয়েন্দা সর্দ্দার মালিক শের আন্দাজ ঐ বণিকগণকে ধৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের দুই জনের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন অবশিষ্ট বণিকগণ ভীত হইয়া তোগ্রলের অবস্থানের সংবাদ বলিয়া দিল। তোগ্রল তৎকালে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটি নদীর তীরদেশে সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিল। মালিক শের আন্দাজ তাঁহার সৈন্যদল লইয়া মুক্ত তরবারি হস্তে অতর্কিতে দ্রুতবেগে তোগ্রলের শিবিরের উপর পতিত হইলেন। তোগ্রল মনে করিলেন যে বলবনের সমগ্র বাহিনী তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। তোগ্রল সাঁতার দিয়া সম্মুখস্থ নদী পার হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিপক্ষের একটি তীর তাঁহাকে বিদ্ধ করিল ও আর একজন বিপক্ষ সৈন্য তাঁহার মস্তক কাটিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে বলবনের সৈন্যদলও আসিয়া পৌঁছিল এবং তোগ্রলের সমগ্র লোকজন ও পরিবারবর্গ বন্দী হইল। মহা আড়ম্বরে বলবন সমস্ত বন্দীগণ সহ লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিলেন। লক্ষ্মণাবতীর একক্রোশব্যাপী বাজারে অসংখ্য ফাঁসীকাষ্ঠ স্থাপিত হইল। তাহাতে তোগ্রলের পুত্রগণ, জামাতাগণ, মন্ত্রীগণ, সুঘলদারগণ (উচ্চ কর্ম্মচারী), মামলুকগণ (গোলাম), সরলস্করগণ (সেনা বিভাগের কর্ম্মচারী), জানদারগণ (দেহরক্ষী), শিলাদারগণ (অস্ত্র বাহী) এবং প্রধান প্রধান পাইকগণকে (পদাতিক) ফাঁসী দেওয়া হইল। দিল্লীর সৈন্যগণ মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তোগ্রলের সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিল তাহাদিগকে দিল্লীতে লইয়া অনুরূপ শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইল।

পূর্ব্বোক্ত আলাউদ্দিন জানি হইতে তোগ্রল খাঁ পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর শাসকগণ সকলেই "মামলুক" বা ক্রীতদাস ছিলেন। মামলুকগণ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন তুর্কীগোষ্ঠীর লোক ছিলেন এবং দিল্লীর মামলুক সুলতানগণের দরবারে নানাপদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে নানা প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইতেন।

২০। বগরা খাঁ (১২৮২-৯১ খৃঃ)।

বলবন কিছুদিন লক্ষ্মণাবতীতে থাকিয়া সেই রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিলেন। তৎপর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বগরা খাঁকে তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন (১২৮২ খৃঃ) এবং প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে এইরূপ শপথ করাইলেন যে তিনি যেন দিয়ারা-ই-বাঙ্গলা (সোনার গাঁ) অধিকারের চেষ্টা করেন এবং মদ্যপানাদি বিলাস ব্যসন হইতে বিরত থাকেন। অতঃপর ১২৮২ খৃঃ এপ্রিল মাসে বলবন লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যা ও বদায়ূনের মধ্য দিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন।

বগরা খাঁ প্রায় ছয় বৎসর দিল্লীর অধীনে লক্ষ্মণাবতী রাজ্য শাসন করেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য বলবন দুইজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী রাখিয়া যান।

৬৮৬ হিঃ (১২৮৭ খৃঃ জুলাই) সম্রাট বলবনের মৃত্যু হইলে বগরা খাঁ নাসির উদ্দিন মহম্মদ বগরা খাঁ নামে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের স্বাধীন সুলতান হন (১২৮৭ খৃঃ সেপ্টেম্বর)[১]।

২১। রুকন উদ্দিন কৈকায়ুস (১২৯১-৯৯ খৃঃ)।

৬৯১ হিঃ (১২৯১ খৃঃ) নাসির উদ্দিন মহম্মদ বগরা খাঁর মৃত্যু হয়। উক্ত বর্ষে তাঁহার মধ্যম পুত্র রুকন উদ্দিন কৈকায়ুস লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রচার করেন। (Thomas—Initial Coinage of Bengal p. 46)। তাঁহার রাজত্বকালে ৬৯৭ হিঃ মহরম্ মাসে ১ম দিনে (১২৯৭ খৃঃ ১৯শে অক্টোবর) লক্ষ্মণাবতীর উত্তরে গঙ্গারামপুরে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১। সম্রাট বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতান পূর্ব্বেই মুঘল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। বগরা খাঁ দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণে অনিচ্ছুক হওয়ায় বগরা খাঁর পুত্র কৈকোবাদ দিল্লীর সুলতান হন (১২৮৭ খৃঃ জুলাই)। ৬৮৯ হিঃ (১২৯০ খৃঃ) কৈকোবাদ খিলজিগণের হস্তে নিহত হইলে তৎপুত্র কইমুস সুলতান সমস উদ্দিন নামে সুলতান হন। কিন্তু তিন মাস রাজত্বের পর তিনি জালালুদ্দিন খিলজির পুত্র তাবকালির হস্তে নিহত হন। ৬৮৯ হিঃ (১২৯০ খৃঃ এপ্রিল) জালালউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার দুই মাস পর বগরা খাঁ লক্ষ্মণবতীতে বসিয়া তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জানিতে পারিলেন।

(I. A. S. B. old series Vol LXI 1872 part I p. 103)। উক্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাতা উলুঘ-ই-আজম-জফর খাঁ-বহরাম ইৎগিণ কৈকায়ুসের রাজ্যের মধ্যভাগে দক্ষিণ রাঢ়ের সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন (J. and P. of H. S. B. new series Vol V. p. 248) এইখানে একটি মস্‌জিদের খিলানে আরবী ভাষায় লিখিত আছে যে উক্ত জাফর খাঁ ৬৯৮ হিঃ (১২৯৮ খৃঃ) হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া মুসলমানদিগকে ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১২। সমস উদ্দিন ফিরোজ সাহ (১২৯৯-১৩২২ খৃঃ)।

১২৯৯ খৃঃ হইতে ১৩০২ খৃঃ মধ্যে কৈকায়ুসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমস উদ্দিন ফিরোজ সাহ লক্ষ্মণাবতীতে রাজা হইয়া ৭০২ হিঃ (১৩০২ খৃঃ) নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন (Thomas—I. C. B.)। ফিরোজ সাহের পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাহাবুদ্দিন বগদা সাহ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়া ৭১৮ হিঃ (১৩১৮ খৃঃ) লক্ষ্মণাবতী হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর সাহও পিতার জীবিতকালে বিদ্রোহী হইয়া লক্ষ্মণাবতী হইতে ৭১১-৭১২ হিঃ (১৩১১-১২ খৃঃ) নিজনামে মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন (Thomas—Initial Coins)। ইনি ৭০৫ হিঃ (১৩০৫খৃঃ)-তে সুবর্ণ গ্রাম জয় করিয়া তথা হইতেও নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত করেন[১]। তৃতীয় পুত্র নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম পিতার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। চতুর্থ পুত্র হাতিম খাঁ ৭০৯-৭১৫ হিঃ (১৩০৯-১৩১৫ খৃঃ) বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পঞ্চম পুত্র কৎলু খাঁ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ ৭২২ হিজরায় (১৩২২ খৃঃ) ফিরোজ সাহের মৃত্যু হইয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে বোধহয় ফিরোজ সাহ লক্ষ্মণাবতী উদ্ধার করিয়াছিলেন। কারণ ১৩২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একটি রজত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে (Thomas—Initial Coinage)।

১। তৎপূর্ব্বে সুলতান সমস উদ্দিন ফিরোজ সাহের আদেশে সেকেন্দার খাঁ গাজি শ্রী হট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করিয়া শ্রীহট্ট অধিকার করেন (৭০৩ হিঃ)। (সাহ জালালের কবরে খোদিত লিপি—ঢাকা যাদুঘর।)

২৩। নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম (১৩২২-২৫ খৃঃ)

এদিকে ১২৯০ খৃঃ দিল্লীতে জালাল উদ্দিন খিলজী সত্তর বৎসর বয়সে সুলতান হইলেন। কিন্তু ১২৯৬ খৃঃ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন খিলজী তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া সুলতান হন। তাঁহার সেনাপতি মালিক কাফুর ১৩০২-১১ খৃঃ মধ্যে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া দেবগিরির যাদব বংশীয়, দ্বার সমুদ্রের (মহীশূর) হয়শালবংশীয়, মাদুরার পাণ্ডুবংশীয় হিন্দুরাজগণকে পরাজিত করেন। তিনি স্বয়ং গুজরাট, রণথম্ভর ও চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনকালেই গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল ও রাজপুতেরা চিতোর পুনরধিকার করিয়াছিল। অবশেষে ১৩১৬ খৃঃ জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মালিক কাফুর আলাউদ্দিনের এক শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং ক্ষমতা পরিচালিত করিতে থাকেন। পরে আলাউদ্দিনের বংশের অধিকাংশকে তিনি নির্ম্মমভাবে হত্যা করেন, কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই কাফুর স্বয়ং তাঁহার শরীররক্ষী ক্রীতদাসগণের হস্তে নিহত হন। আলাউদ্দিনের মোবারক নামক সপ্তদশ বর্ষীয় একটি পুত্র তখনও জীবিত ছিল। তাঁহাকে ১৩১৬ খৃঃ সিংহাসনে বসানো হয়, কিন্তু তাঁহার প্রিয়পাত্র খসরু ১৩২০ খৃঃ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সুলতান নাসিরুদ্দিন নামে সুলতান হন। তিনি হিন্দুদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন।

কিন্তু কতিপয় মাস মধ্যেই ১৩২০ খৃঃ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গাজী খাঁ তুঘলক নসিরুদ্দিন খাঁর শিরশ্ছেদ করিয়া গিয়াসুদ্দিন তোঘলক নামে সুলতান হন। খসরুর পিতা বলবনের তুর্কী ক্রীতদাস ও মাতা জাঠ জাতীয় হিন্দু ছিলেন।

এই সময় লক্ষ্মণাবতীতে ফিরোজ শাহের পুত্র নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম স্বাধীন সুলতান ছিলেন। তাঁহার অপর পুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর সাহ সোনার গাঁর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তার নাম জানা যায় না। জিয়াউদ্দিন বার্নি রচিত তারিখ-ই-ফিরোজসাহীতে লিখিত আছে যে গিয়াসউদ্দিন তোঘলক ১৩২৪ খৃঃ সোনার গাঁয়ের শাসনকর্ত্তা গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর সাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনি তীরভুক্তিতে[১] পৌছিলে লক্ষ্মণাবতীর সুলতান নাসিরুদ্দিন

১। এই সময় বোধহয় কর্ণাটক নান্য দেব বংশীয় মিথিলা রাজ হরসিংহ দেব সর্ব্ব প্রথম দিল্লীশ্বরকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কবিশেখরাচার্য্যের রচিত ‘ধূর্ত্ত সমাগম’ নাটকে লিখিত আছে যে মিথিলারাজ হরসিংহ দেবের সহিত

ইব্রাহিম তাঁহার সহিত তথায় সাক্ষাৎ করিয়া সোনার গাঁয়ের শাসনকর্ত্তা গিয়াস উদ্দিন বাহাদুরকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য একটি সৈন্য বাহিনী প্রার্থনা করেন। গিয়াসউদ্দিন তোঘলক তাঁহার সেনাপতি বাহরাম খাঁ ও তাতার খাঁকে নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিমের সহিত একদল সেনাসহ প্রেরণ করিলেন। বাহাদুর গিয়াশপুর (ময়মনসিংহ জেলা) নামক স্থানে নূতন নগর স্থাপন করিয়া তথায় সসৈন্য বাস করিতেছিলেন। তাতার খাঁর অভিযান আরম্ভ হইলে বাহাদুর তথা হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। তাতার খাঁর আদেশে তাঁহার সহকারী হৈবতুল্লা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বাহাদুরকে বন্দী করতঃ লক্ষ্মণাবতীতে দিল্লীশ্বরের সমীপে উপস্থিত করিলেন। দিল্লীশ্বর প্রায় দুইমাস অবস্থান করিয়া নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিমকে লক্ষ্মণাবতীর শাসন কর্ত্তার পদে স্থায়ী করিলেন এবং বাহরাম খাঁকে সোনার গাঁয়ের ও তাতার খাঁকে সাতগাঁর শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গিয়াস উদ্দিন তোঘলকের পুত্র জুনা খাঁ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হয় (৭২৫ হিঃ= ১৩২৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারী)।

২৪। মালিক পিণ্ডর খিলজি ওরফে কদর খাঁ (১৩২৫-৩৯ খৃঃ)।

গিয়াস উদ্দিন তোঘলকের পর তৎপুত্র জুনা খাঁ মহম্মদ বিন তোঘলক নামে দিল্লীশ্বর (১৩২৫-৫১ খৃঃ) হইয়া বাহাদুরকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁহাকে বাহরাম খাঁর

মুসলমান সেনার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে তীরভুক্তির রায় ও রাণাগণ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। নেপালরাজ জয়প্রতাপ মল্লের শিলালিপিতে মিথিলার কর্ণাটক রাজবংশের যে বংশলতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে আদিরাজা (১) নান্য দেব (রাজত্বকাল ৫০ বৎসর) (২) তৎপুত্র গঙ্গদেব (৪১ বৎসর), (৩) তৎপুত্র নৃসিংহ দেব (৩৯ বর্ষ), (৪) তৎপুত্র রামসিংহ (৫৮ বর্ষ),• (৫) তৎপুত্র শক্তি সিংহ, (৬) তৎপুত্র ভূপাল সিংহ, (৭) তৎপুত্র হরসিংহ (রাজ্যকাল ২৮ বর্ষ)। চণ্ডেশ্বর প্রণীত 'কৃত্য রত্নাকর' গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি স্বয়ং তাঁহার পিতা বীরেশ্বর ও পিতামহ দেবাদিত্য পুরুষানুক্রমে হরসিংহ দেবের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। হরসিংহ দেবের নেপাল জয়ের পর চণ্ডেশ্বর ১২৩৬ শকাব্দের (১৩১৪ খৃঃ) অগ্রহায়ণ মাসে নেপালের বাগমতী তীরে তুলাপুরুষ দান করেন।

সহিত যুক্তভাবে সোনার গাঁর শাসন কর্ত্তা, মালিক পিণ্ডর খিলজি ওরফে কদর খাঁকে লক্ষ্মণাবতীর ও ইয়্জউদ্দিন জুহিয়াকে সাত গাঁয়ের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ৭২৯ হিঃ (১৩২৮ খৃঃ) বাহাদুর পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া নিজ নামে মুদ্রাপ্রচার করিলেন, কিন্তু দিল্লী হইতে প্রেরিত সৈন্যদলের সাহায্যে তাঁহার সহকারী বাহরাম খাঁ বাহাদুরকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া দিল্লীশ্বরের আদেশে তাঁহার গাত্রচর্ম্ম উঠাইয়া লইয়া তাঁহাকে বধ করিলেন ও সেই চামড়া দ্বারা একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। দিল্লীর রাজপথে সেই মূর্ত্তি ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। ১৩৩৭-৩৮ খৃঃ বাহরাম খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার অস্ত্রবাহী ফকর উদ্দিন নিজেকে সোনার গাঁর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফকর উদ্দিন মোবারক সাহ নাম গ্রহণ করতঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

এই সংবাদে লক্ষ্মণাবতী ও সাত গাঁর শাসন কর্ত্তাদ্বয় মিলিত হইয়া ফকর উদ্দিনকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে ফকর উদ্দিন পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন সাত গাঁর শাসনকর্ত্তা সাত গাঁয়ে চলিয়া গেলেন। কিন্তু লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কদর খাঁ সোনার গাঁ অধিকার করিয়া রহিলেন। বর্ষাকালে চতুর্দ্দিক জলপ্লাবিত হইলে ফকর উদ্দিন তাঁহার নৌবাহিনী লইয়া কদর খাঁকে সোনার গাঁয়ে অবরুদ্ধ করিয়া রহিলেন। খাদ্যাভাবে কদর খাঁর সৈন্য ও লোকজন কদর খাঁকে হত্যা করিলে (১৩৩৯ খৃঃ) ফকর উদ্দিন পুনরায় সোনার গাঁর শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

২৫। আলাউদ্দিন আলি সাহ (১৩৩৯-৪২ খৃঃ)।

কদর খাঁর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাঁহার সেনাপতি আলি মোবারক কদর খাঁর নায়েবকে হত্যা করিয়া আলাউদ্দিন আলি সাহ নাম ধারণ করতঃ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা হইলেন (১৩৩৯ খৃঃ)। এই সময় দিল্লী হইতে প্রেরিত ইলিয়াস লক্ষ্মণাবতীতে সুবিধা করিতে না পারিয়া সাত গাঁ অধিকার করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা হইয়া বসিলেন। এই সময় ফকর উদ্দিন চাটি গাঁ অধিকার করেন। ৭৫০ হিঃ (১৩৪৯ খৃঃ) ফকর উদ্দিনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইক্তারউদ্দিন গাজী সাহ সোনার গাঁয়ের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

ফকর উদ্দিনের শাসনকালে ১৩৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মুর পর্য্যটক ইবন বতুতা বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু গিয়াস-পুরের বিখ্যাত আউলিয়া নিজামুদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীহট্টে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইবন বতুতা শ্রীহট্টে যান এবং তথা হইতে

জলপথে নৌকাযোগে সোনার গাঁয়ে উপস্থিত হন।

২৬। সুলতান হাজি সমস উদ্দিন ইলিয়াস্ সাহভাঙ্গড়া
(৭৪৩-৫৮ হিঃ, ১৩৪২-৫৭ খৃঃ)।

আলাউদ্দিন আলিসাহের মৃত্যুর পর ৭৪৩ হিঃ (১৩৪২ খৃঃ) ইলিয়াস্ লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। এই সময় মহম্মদ তোঘলকের অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে সমগ্র ভারতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে ইলিয়াস মিথিলা আক্রমণ করেন। এই সময় মিথিলা রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। হরসিংহ দেবের পৌত্র শক্তি সিংহ সিমরাঁও-এ ও গিয়াস উদ্দিন তোঘলকের পৃষ্টপোষিত রাজা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কামেশ্বর সিংহ দ্বারভাঙ্গা জেলার সুগাঁও নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। মিথিলা সহজেই অধিকার করিয়া ইলিয়াস ১৩৪৬ খৃঃ নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং কাটমুণ্ড, স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া আসেন। এই সময় নেপালে জয়রাজ দেব রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি রাজ্যরক্ষার্থ কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। অতঃপর ইলিয়াস্ চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশী পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করেন। ইহার পর তিনি ১৩৫৩ খৃঃ ফকর উদ্দিন মোবারক সাহের পুত্র ইক্তার উদ্দিন গাজিসাহকে পরাস্ত ও সপরিবারে হত্যা করিয়া সোনার গাঁ অধিকার করেন। ১৩৫১ খৃঃ দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোঘলকের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র ফিরোজ সাহ তোঘলক দিল্লীর সুলতান হন এবং দৃঢ়হস্তে সাম্রাজ্য শাসনে মনোযোগী হন। ১৩৫৩ খৃঃ নভেম্বরে ৯০,০০০ অশ্বারোহী, বহুসংখ্যক পদাতিক, ও ১০০০ রণতরী লইয়া তিনি সমস উদ্দিন ইলিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। ইলিয়াসও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সৈন্যদল ও নৌবহর লইয়া অযোধ্যা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ঘর্ঘরা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে উভয় সৈন্যদলে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কিন্তু ইলিয়াসের সৈন্যদল দিল্লী বাহিনীর সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া গণ্ডক ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে হটিয়া আসিল। সেখানেও সুবিধা করিতে না পারিয়া কুশী নদীর তীরদেশে হটিয়া আসিল। কিন্তু দিল্লীর সেনাদল নেপাল সীমান্তে জিরান নামক স্থানে কুশী পার হইয়া ইলিয়াসের বাহিনীর পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণের চেষ্টা করিলে ইলিয়াস গঙ্গাতীর ধরিয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। এদিকে দিল্লীর সৈন্যদল কুশী নদী পার হইয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের রাজধানী মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গমস্থলের ৬ মাইল দূরে অবস্থিত পাণ্ডুয়া (ফিরোজাবাদ) অধিকার করিয়া লইল (১৩৫৩খৃঃ)। দিনাজপুর

জেলার ধনজর পরগনায়, মহানন্দার উপনদী বলীয়া ও শ্রীমতী (চিরামতী) নদীর মধ্যে একডালা নামক স্থানে ইলিয়াস একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার চারিদিকে দুর্গ-প্রাকারকে পরিবেষ্টিত করিয়া ৬০ফুট প্রশস্ত পরিখা ছিল। এই দুর্গটি এত বৃহৎ ছিল যে ইহার অভ্যন্তর ইলিয়াসের সমগ্র বাহিনী ও রাজধানীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। এই দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান করিয়া ইলিয়াসের সৈন্যদল আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্গের বাহিরে দিল্লীর সৈন্যদল নানা অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। বিশেষত, তাহারা দিবা রাত্রি অসংখ্য মশকের দংশনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময় কলন্দর দরবেশগণ প্রচার করিতে লাগিল যে দিল্লীর সৈন্যগণের বিষম দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ইলিয়াস এই সব প্রচারে বিশ্বাস করিয়া এই সুযোগে অতর্কিত আক্রমণে দিল্লীশ্বরের বাহিনীকে পরাভূত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সমগ্র সৈন্যদল ১০,০০০ অশ্বারোহী, সমগ্র হস্তীসৈন্য ও বহুসংখ্যক পদাতিক লইয়া দুর্গের বাহিরে আসিলেন এবং একডালা দুর্গ হইতে ১৪ মাইল দূরে একটি নালার নিকটে দিল্লী বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ দরবেশগুলি দিল্লীশ্বরের গুপ্তচর ছিল। ইলিয়াসকে দুর্গের বাহিরে লইয়া আসিবার জন্যই তাহারা মিথ্যা প্রচারকার্য্য চালাইতেছিল। ইলিয়াসের সৈন্যদলকে দেখিয়াই দিল্লীশ্বরের বাহিনী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। মালিক দীলান দক্ষিণ পার্শ্বে, হিসামুদ্দিন দুয়া বাম পার্শ্বে ও তাতার খাঁ মধ্যস্থলে থাকিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মালিক দীলান ইলিয়াসের বাহিনীর বামপার্শ্ব আক্রমণ করিল, কিন্তু ইলিয়াসের সৈন্যগণ ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হটাইয়া দিল। হিসামুদ্দিন দুয়া বিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলে যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তোঘলক তাহার সৈন্যগণকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইল। কিন্তু সূর্য্যাস্ত কালে ইলিয়াসের সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে লাগিল। ইলিয়াস পুনরায় একডালা দুর্গে প্রবেশ করিলেন।[১] কিন্তু

১। ১৩৫৪ খৃঃ একডালার নিকটের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তারিখ-ই-মুবারক-সাহীতে লিখিত হইয়াছে যে এই যুদ্ধে বাঙালীরা পরাজিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সেনাপতি সহদেব ও অন্যান্য অনেকে নিহত হইয়াছিল। ইলিয়াস স্বপক্ষীয় হিন্দু বীরগণকে উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশের মতে তিনি চট্টবংশীয় দুর্য্যোধনকে 'বঙ্গভূষণ' ও পুতিতুণ্ড বংশীয় চক্রপাণিকে 'রাজজয়ী' উপাধি দান করিয়াছিলেন।

সুলতান ফিরোজ তোঘলক দুর্গ অধিকারের চেষ্টা না করিয়া কতকগুলি যুদ্ধবন্দী ও ৪৭টি হস্তী ও অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন (জিয়া উদ্দিন বার্ণির তারিখ-ই-ফিরোজশাহী)।

অতঃপর ইলিয়াস দিল্লীশ্বরের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া গৌড়বঙ্গ শাসন করিতে লাগিলেন এবং ১৩৫৫ ও ১৩৫৬ খৃঃ দিল্লীর দরবারে উপহার প্রেরণ করিয়া দিল্লীর সন্তুষ্টি বিধান করিলেন। ১৩৫৭ খৃঃ পুনরায় মালিক তাজুদ্দিনের মারফৎ উপঢৌকন পাঠাইলেন। তাজুদ্দিন দিল্লী হইতে প্রতিদানে আরবী অশ্বসমূহ, খোরাসানী ফল ও অন্যান্য মুল্যবান উপহারসহ ফিরিয়া আসিল। এই রূপে দিল্লীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ইলিয়াস কামরূপ আক্রমণ করেন এবং কামরূপ সহর দখল করেন। ৭৫৮ হিঃ (১৩৫৭ খৃঃ নভেম্বর)-তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

২৭। সেকেন্দর সাহ (১৩৫৭-৮৯ খৃঃ)।

সমসউদ্দিন ইলিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেকেন্দর সাহ গৌড়-বঙ্গের সুলতান হন। তিনি ৭৫৯ হিঃ কামরূপ হইতে নিজনামে মুদ্রা প্রচার করেন। এই মুদ্রার উপরে "চাউলীস্থান ওরফে কামরূপ" কথাগুলি মুদ্রিত আছে। ইহার ৭৫৯ হিঃ-৭৯১ হিঃ পর্য্যন্ত কালের মুদ্রা পাওয়া যায়।

সুলতান হইবার পরেই সেকেন্দর সাহ দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার নিকট আজম খাঁকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন এবং কয়েক মাস পরে উপঢৌকন স্বরূপ পাঁচটি হস্তীসহ মালিক সইফ উদ্দিনকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু দিল্লীশ্বরের সন্তোষ বিধান করিতে পারিলেন না।

১৩৫৭ খৃঃ সোনার গাঁয়ের সুলতান ফকরউদ্দিনের জামাতা জাফর খাঁ ইরাণী দিল্লীশ্বর ফিরোজ সাহ তোঘলকের দরবারে যাইয়া ইলিয়াস সাহের বিরুদ্ধে তাঁহার শ্যালককে সপরিবারে হত্যা করার অভিযোগ করিয়া বিচারপ্রার্থী হন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ফিরোজ সাহ তোঘলক ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ৪৭০ হস্তী সৈন্য ও বহুসংখ্যক পদাতিক লইয়া লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সেকেন্দর ভীত হইলেন না। তিনি পিতার রণনীতি অবলম্বন করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া একডালা দুর্গে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। বৎসরাধিক কাল খণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শেষে একডালা দুর্গ জয় করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরোজ তোঘলক ১৩৫৯ খৃঃ সন্ধি করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন[১]। ইহার পর প্রায় দুই

১। ফিরোজ সাহ তোঘলকের (১৩৫১-৮৮ খৃঃ) পর ছয় বৎসরের মধ্যে

শত বৎসরের মধ্যে কোন দিল্লীশ্বর গৌড়-বঙ্গের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

সুলতান সেকেন্দর সাহের প্রধান কীর্ত্তি পাণ্ডুয়ার (ফিরোজাবাদ) উপকণ্ঠে অবস্থিত আদিনা মসজিদ। এই মসজিদটির আয়তন ৪০০´×১৫০´। ইহার চতুর্দ্দিকে ৪০০টি স্তম্ভযুক্ত বারান্দা। ইহার পশ্চিম দিকের দেওয়ালে যে ক্ষোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য ৭৬৬ হিঃ (১৩৬৪ খৃঃ) হইতে আরম্ভ হইয়া ৭৭০ হিঃ (১৩৬৮ খৃঃ) শেষ হয়। বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া), সুবর্ণগ্রাম ও সহর-ই-নৌ নামক স্থানে তাঁহার টাকশাল ছিল।

২৮। গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খৃঃ)।

নিজামুদ্দিন ও ফিরিস্তা উভয়ের মতে সেকেন্দর সাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ সুলতান হন। তাঁহার ৭৯৫-৮১৩ হিঃ মুদ্রা পাওয়া যায়। রিয়াজ-উস-সালাতিনে লিখিত আছে যে পিতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ সুলতান হইয়াছিলেন।

তাঁহার পাঁচজন বংশধর নামমাত্র দিল্লীশ্বর হন। তৎপর তাঁহার পৌত্র মামুদ সাহ তোঘলক (১৩৯৪-১৪১১ খৃঃ) রাজত্ব করেন। এই সময় তৈমুর লঙ্গ ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী নগর বিধ্বস্ত করেন (১৩৯৮-৯৯ খৃঃ)। মামুদ সাহ তোঘলক তোঘলক বংশের শেষ দিল্লীশ্বর। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ খিজির খাঁ মামুদ সাহ তোঘলককে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র সৈয়দ মোবারক সাহ (১৪১২-১৪৩৪ খৃঃ) দিল্লীর সুলতান হন। তৎপর সৈয়দ বংশের আর দুইজন সুলতান মহম্মদ সাহ ও আলাউদ্দিন আলম সাহ ১৪৫১ খৃঃ পর্য্যন্ত সুলতান ছিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বহলুল লোদী, সৈয়দ আলাউদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি জৌনপুর রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খৃঃ) সুলতান হন। তিনি আগ্রা নগরীর স্থাপনকর্ত্তা। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬ খৃঃ) সুলতান হন। ১৫২৬ খৃঃ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদীর আহ্বানে কাবুল হইতে আসিয়া বাবর সাহ পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

গিয়াসউদ্দিন আজম সাহের রাজত্বকালের দুইটি গল্প প্রচলিত আছে। একটি কাজি সিরাজউদ্দিনের বিচার সম্বন্ধে এবং অন্যটি ইরাণী কবি হাফিজের সহিত সুলতানের পদ্য বিনিময় সম্বন্ধে[১]।

প্রথম গল্পটি এই যে, একদা সুলতান তীর নিক্ষেপ করা অভ্যাস করিতে-ছিলেন। সহসা একটি তীর একটি বিধবার পুত্রকে বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। বিধবা কাজি সিরাজউদ্দিনের এজলাসে বিচারপ্রার্থী হইলে কাজি সুলতানের উপর পরওয়ানা জারি করিলেন। সুলতান আদালতে উপস্থিত হইয়া দোষ স্বীকার করেন এবং কাজির বিচার অনুসারে বিধবাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। বিচার শেষ হইলে কাজি বিচারাসন হইতে উঠিয়া যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলে সুলতান বলিলেন, কাজি বিচারকার্য্যে অবহেলা করিলে কাজির শিরশ্ছেদ করিতেন। কাজিও হাসিয়া বলিলেন, সুলতান আইন অমান্য করিলে তিনিও মহামান্য সুলতানকে বেত্রদণ্ড দিতেন।

কবি হাফিজের গল্পটি এইরূপ— একদা সুলতান পীড়িত হইলে সাইপ্রেস, (Cypress), গোলাপ ও টিউলিপ (Tulip) নামক তাঁহার প্রীতিভাজন তিনজন হারেমবাসিনীকে আদেশ দেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারা যেন তাঁহার মৃতদেহ ধৌত করেন। সুলতান এবার বাঁচিয়া যান এবং ঐ তিনজন হারেমবাসিনীকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দেখাইতে থাকেন। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অপর হারেমবাসিনীগণ তাহাদিগকে 'খছালে' (শব ধৌতকারিণী) বলিয়া উপহাস করিলে তিনি একটি কবিতার প্রথম পংক্তি রচনা করেন। কিন্তু ইহার উপযুক্ত দ্বিতীয় পংক্তিটি রচনা করিতে না পারিয়া কবি হাফিজকে পদ পূরণ করিয়া দিতে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানান। কবিও পদ পূরণ করিয়া পাঠান। এতদ্ব্যতীত হাফিজ আরও একটি গজল সুলতানকে প্রেরণ করেন। তাহা এইরূপ—"এই পার্শী শর্করা বাঙলায় যাইতেছে, তাহাতে ভারতের তোতা পাখিগুলি মিশ্রী বর্ষণ করিবে। হে হাফিজ, সুলতান গিয়াসুদ্দিনের দরবারের

১। "অদ্বৈত বাল্যলীলা সূত্রং" নামক ১৪৮৭ খৃঃ বিরচিত একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে ১৩২৯ শাকে (৮১৪ হিঃ) দিনাজপুরের ভৌমিক রাজা গণেশ যবনাত্মজ গৌড়েশ্বরকে জয় করিয়া গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ গিয়াসুদ্দিন আজম সাহের সহিত তাঁহার পিতার যুদ্ধে এই গণেশ গিয়াসুদ্দিন আজম সাহের প্রধান সহায়ক ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব হইতে রাজা গণেশই প্রকৃত গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন।

মোহে বাক্যহীন হইও না। কারণ তাহা হইলে তোমার বিলাপই সার হইবে।"

"আসাম বুরুঞ্জি" হইতে জানা যায় যে আহমরাজ সুদাঙ্ফার রাজ্যকালে (১৩৯৭-১৪০৭ খৃঃ) তাওসুলাই নামক একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি রাজার বিরাগভাজন হইয়া কামতারাজের আশ্রয়প্রার্থী হন। কামতারাজ তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলে আহমরাজ কামতারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ এই সুযোগে কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন। কামতারাজ উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া আহমরাজের সহিত সন্ধি করতঃ উভয়ে মিলিত হইয়া আজম সাহের সম্মুখীন হন। তাঁহাদের মিলিত আক্রমণে আজম সাহ পরাজিত হইয়া নিজরাজ্যে প্রস্থান করেন।

ফেরিস্তার ইতিহাসে লিখিত আছে যে আজম সাহ জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা খাজা জাহানের (১৩৯৪-৯৯ খৃঃ) নিকট হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। চীন সম্রাট থুংলো প্রেরিত একটি দৌত্য ১৪০৬ খৃঃ আজম সাহের দরবারে উপস্থিত হয়। ঐ দূত দলের সহিত মাহুয়ান নামক একজন চীনা দোভাষী আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত "থিং-আই-সেঙ-লান্"-এ লিখিত আছে যে, বাঙলা রাজ্যে পৌছিতে হইলে সুমাত্রা হইতে নদীপথে একবিংশ দিবসে চট্টগ্রাম বন্দরে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থান হইতে ক্ষুদ্র নৌকায় ৫০০ লি (৮৪ ক্রোশ) গমন করিলে সুবর্ণ গ্রাম পাওয়া যায়। এই দেশের লোকেরা অধিকাংশ মুসলমান ও কৃষ্ণবর্ণ। রাজা ও রাজকর্ম্মচারীরা মুসলমানী পোষাক পরিধান করে। এই দেশের ভাষা বাঙলা। পার্শীও ব্যবহৃত হয়। এখানে মুদ্রার নাম তঙ্কা ও কড়ি। সমস্ত বৎসর চীন দেশের ন্যায় গরম। ধান্য, যব, গম, সর্ষপ জন্মে। নারিকেল, ধান্য, তাল হইতে মদ্য তৈয়ার হয়। কলা, কাঁঠাল, আম, দাড়িম, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। ছয় প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র, রেশম ও রেশম বস্ত্র উৎপন্ন হয়। এখানে চিকিৎসক, জ্যোতিষী, শিল্পী ও পণ্ডিতগণ বাস করে। এখান হইতে বিদেশে বাণিজ্য জাহাজ গমনাগমন করে। মুক্তা ও বহুমূল্য মণি চীনদেশে যায়। চীন দেশের মিং রাজ বংশের ইতিহাস অনুসারে ১৫০৯ খৃঃ গিয়াসউদ্দিন চীনরাজের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। এই সময় প্রসিদ্ধ ফকির নূর কুতুব আলম (আলাউল হকের পুত্র) পাণ্ডুয়ায় বাস করিতেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ ছিল। তাঁহারা উভয়ে শেখ হামিদউদ্দিন নাগোবীর ছাত্র ছিলেন। ১৭০৯ খৃঃ (৮১৩ হিঃ) নূর কুতুবের মৃত্যু হয়।

২৯। সৈফুদ্দিন হামজা সাহ (১৪০৯-১০ খৃঃ)।

আজম সাহের পর তৎপুত্র সৈফুদ্দিন হামজা সাহ স্থলতান-উস্‌-সালাতিন উপাধি গ্রহণ করিয়া স্থলতান হন (হিঃ ৮১৩-১৪)। ইহার সময় ভীষণ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং রাজা গণেশ তাঁহাকে গদীচ্যুত করেন। ইহার ৮১৩-১৪ হিঃ (১৪০৯-১৪১০ খৃঃ) মুদ্রা পাওয়া যায়।

৩০। সিহাবুদ্দিন বায়জিদ সাহ (৮১৪-১৭ হিঃ, ১৪১১-১৪ খৃঃ)।

সৈফুদ্দিন হামজা সাহের পালিত পুত্র সিহাবুদ্দিন বায়জিদ সাহের ৮১৬-১৭ হিঃ ও তৎপুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহের ৮১৭ হিঃ (১৪১৪ খৃঃ) মুদ্রা পাওয়া যায়।

৩১। রাজা গণেশ, দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব (১৪০৮ ?-১৪২১ খৃঃ)

এই সময় গৌড়-বঙ্গের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহা বাঙালী হিন্দুর পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ এই সময়ে গণেশ, দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব নামক তিনজন হিন্দুরাজা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া মুসলমান প্লাবিত গৌড়-বঙ্গে স্বাধীনতার ধ্বজা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আবার দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব নিজ নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করিতে ভীত হন নাই।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার "Coins and Chronology of the Early Sultans of Bengal" নামক গ্রন্থে রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দন-দেবকে একই ব্যক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করায় এবং তৎপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "History of Bengal Part II"-তে ঐ মত গৃহীত হওয়ায় গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। এই সময়ের প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা আর একজন স্বাধীন হিন্দু রাজার পরিচয় পাই। তাঁহার নাম দনৌজামাধবদেব। ১২৮২ খৃঃ দিল্লীর স্থলতান বলবন তোগ্রল খাঁর বিদ্রোহ দমন করিয়া যখন দিল্লীতে ফিরিয়া যান তখন পর্য্যন্ত সোনার গাঁয়ে রাজা দনৌজামাধবদেব স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বিক্রমপুর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নওয়াখালি, বরিশাল, চন্দ্রদ্বীপ, ফরিদপুর, যশোহর খুলনা ও ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত সমগ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙলার অধিপতি ছিলেন। কিরূপে সোনার গাঁয়ের এই পরাক্রান্ত দেববংশীয় স্বাধীন নৃপতি অথবা তাঁহার বংশধরগণের হস্ত হইতে তাঁহাদের এই বিস্তীর্ণ রাজ্য মুসলমান অধিকারে

চলিয়া গেল, তাহার কোন প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণাবতীর বলবন বংশীয় সুলতান সমস উদ্দিন ফিরোজ সাহের আদেশে সিকন্দর খাঁ গাজী রাজা গৌড়গোবিন্দকে পরাজিত করিয়া ৭০৩ হিঃ (১৩০৩-০৪ খৃঃ) শ্রীহট্ট অধিকার করেন। ইহার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ ৭০২ হিজরীতে সোনার গাঁ তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। ৭০৫ হিঃ (১৩০৫ খৃঃ) সুবর্ণগ্রামের টাকশাল হইতে সুলতান সমস উদ্দিনের মুদ্রা মুদ্রিত হওয়ায় এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। দনৌজামাধবদেববংশীয় রাজগণ বোধহয় তখন হইতে সুবর্ণগ্রাম ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের রাজ্যের অপর কোন অংশে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৩৪৯ খৃঃ পূর্ব্বে সোনার গাঁয়ের সুলতান ফকর উদ্দিন চট্টগ্রাম অধিকার করেন। অতঃপর খৃঃ পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে আমরা দেববংশীয় দনুজমর্দ্দনদেব নামক একজন রাজাকে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতে দেখিতে পাই। এই দনুজমর্দ্দনদেবের সহিত দনৌজমাধবদেবের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই।

শ্রীশ্রী সনাতন গোস্বামীর (১৪৮৮-১৫৫৮ খৃঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র [চন্দ্রদ্বীপ নিবাসী] জীব গোস্বামীকৃত "লঘুতোষণী" নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার নিজ বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে রাজা দনুজমর্দ্দনের উল্লেখ করিয়াছেন।[১] তিনি লিখিয়াছেন—"রাজা দনুজমর্দ্দন যাঁহার পাদ পূজা করিতেন সেই গুণীশ্রেষ্ঠ কৃতি পদ্মনাভ গঙ্গাতীরবাসী হইবার ইচ্ছায় শেখরভূমিবাস ত্যাগ করিয়া নবহট্টে (নৈহাটি) বাস করিয়াছিলেন।" এই পদ্মনাভের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র কুমার। কুমারের পুত্র রূপ, সনাতন ও বল্লভ। বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। "লঘুতোষণীর" মতে কুমার "কশ্চিদ্রোহমবাপ্য * * বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ" বঙ্গে গমন করেন। "ভক্তি-রত্নাকরের" মতে কুমার,

> "নিজগণ সঙ্গে বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
> বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামে বাস কৈলা॥"

রাজা দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন বলিয়াই বোধহয় কুমার নৈহাটি হইতে সুদূর চন্দ্রদ্বীপে বাসের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৪৮৪ খৃঃ সনাতন গোস্বামীর জন্ম ও ১৫৫৮ খৃঃ তাঁহার তিরোভাব হয়। পদ্মনাভ সনাতন গোস্বামীর পিতামহ ছিলেন। তিন পুরুষে ৮০ বৎসর ধরিলে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে (১৩২৬ শকাব্দ) পদ্মনাভ ও তাঁহার সমসাময়িক রাজা দনুজমর্দ্দন জীবিত ছিলেন ইহা অনুমান করা

১। "ততো দনুজমর্দ্দন-ক্ষিতিপ-পূজ্যপাদঃ ক্রমাৎ।
উবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥ ১০"

যাইতে পারে। বৃন্দাবন পুততুণ্ড মহাশয়ের "চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসে" দৃষ্ট হয়—প্রাচীন ঘটককারিকার মতে রাজা দনুজমর্দ্দনদেব হইতে পঞ্চম পুরুষে রাজা জয়দেব। অপুত্রক রাজা জয়দেবের কন্যার সহিত বলভদ্র বসুর বিবাহ হইয়াছিল। বলভদ্র বসুর পুত্র রাজা পরমানন্দ চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন[১]। রাজা দনুজমর্দ্দন হইতে রাজা পরমানন্দ পর্য্যন্ত সাত পুরুষে ১৭৫ বর্ষ হইতে পারে। আইন-ই-আকবরীর মতে আকবরের রাজ্যের উনত্রিংশবর্ষে অর্থাৎ ১৫৮৪ খৃঃ চন্দ্রদ্বীপের তৎকালীন রাজা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে কুমার পরমানন্দ রায় উচ্চ দেবমন্দিরের চূড়ায় আরোহন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহার প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা দনুজমর্দ্দনদেব ১৪০৯ খৃঃ (১৩৩১ শকাব্দ) জীবিত ছিলেন। দনুজমর্দ্দনদেবের সমসাময়িক উত্তর বঙ্গে (বরেন্দ্রে) রাজা গণেশ (১৪০৮-১৪১৪ খৃঃ) নামক অপর একজন হিন্দু রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক ১৪০৯ শকে (১৪৮৭ খৃঃ) বিরচিত "বাল্যলীলা· সূত্রং" গ্রন্থে[২] এই রাজার উল্লেখ আছে। তথায় ইহাকে বিষ্ণুভক্ত বলা হইয়াছে এবং

১। বঙ্গজ ঘটককারিকা অনুসারে দনুজমর্দ্দনদেবের পর তৎপুত্র রমাবল্লভদেব, তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভদেব, তৎপুত্র হরিবল্লভদেব, তৎপুত্র জয়দেব ক্রমান্বয়ে চন্দ্রদ্বীপে রাজা হন। জয়দেব অপুত্রক থাকায় তাঁহার দৌহিত্র পরমানন্দ বসু রায় চন্দ্রদ্বীপে রাজা হন।

"বলভদ্রাত্মজোধীমান্ পরমানন্দ সংজ্ঞকঃ॥
তস্য মাতামহ কৃতী জয়দেব মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো দেববংশ সমুদ্ভবঃ॥
মৃত্যুকালং প্রাপ্য স হি ততো পঞ্চত্বমাগতঃ।
পরমানন্দকস্তস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপে শ্বরোহভবৎ॥" (ধ্রুবানন্দের কারিকা)

এই ধ্রুবানন্দ মিশ্র চন্দ্রদ্বীপ রাজ প্রেমনারায়ণের সভাসদ ছিলেন। এই কারিকাখানি ১২৯৬ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে।

২। এই গ্রন্থের একখানি পুঁথি ঢাকা উথলি নিবাসী অদ্বৈত বংশীয় শ্রীনাথ গোস্বামীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া ঐ পুঁথি সংশোধন করিয়া শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় ১৩২২ সালে ঐ গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। তাহাতে এই শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয়—

"শ্রীমান্ নৃসিংহস্য মহাত্মনো বৈ যশঃ প্রসূনেস্ফুটিতে মনোজ্ঞে।
তৎসৌরভব্যূহ বিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী॥ ৪৮

আরও বলা হইয়াছে যে দিনাজপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল এবং ১৩২৯ শকে ১৪০৭-০৮ খৃঃ, ৮১৪ হিঃ) যবনাত্মজ গৌড়পালগণকে জয় করিয়া তিনি গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খৃঃ) ঈশান নাগর রচিত "অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থে উক্ত "বাল্যলীলা সূত্রং"এর উল্লেখ আছে। অচ্যুতচরণ চৌধুরী সম্পাদিত

সদ্বংশ শৈলে দ্বিজরাজ কল্পো বেদজ্ঞ সদ্বিপ্র সমাশ্রয়ো যঃ।
দুষ্টস্য শাস্তা কিল সাধু পালো দাতা গুণজ্ঞো হরিভক্ত চূড়ঃ॥ ৪৯
দূতৈস্তমানীয় চ রাজধান্যাং দিনাজপুরাখ্যে বহু সভ্য যুক্তে।
তস্মিন্ নৃসিংহে বহুনীত্যভিজ্ঞে সংন্যস্য মন্ত্রিত্ব মবাপভদ্রং॥ ৫০
তদ্ব্যক্তি চাতুর্য্য বলেন রাজা শ্রীমদ্গণেশোবরদস্যুরূপান্।
গৌড়স্য পালান্ যবনাত্মজান্ হি জিত্বা চ গৌড়েশ্বরতা মবাপ॥ ৫১
গ্রহ পক্ষাক্ষি শশধৃঙ্মিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রদৃগভূৎ॥ ৫২

"শ্রী বাল্যলীলা সূত্রং"এর অপর একখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাবনা নিবাসী অদ্বৈতবংশীয় শ্রী মুরলীমোহন গোস্বামীর নিকট ছিল। তাহা হইতে তিনি গণেশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আমাদিগকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা আমি ১৩২০ সালে আমার "বগুড়ার ইতিহাস" ১ম সংস্করণে ও পরে দ্বিতীয় সংস্করণেও উদ্ধৃত করি। যথা—

"যশঃ প্রসূনে স্ফুটিতে নৃসিংহ নাম্নঃ সদা লোকানুগীতকীর্ত্তেঃ।
তদ্গন্ধসন্দোহ বিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী॥ ৪৬
কায়স্থ বংশাগ্র্য বরগুণজ্ঞো লোকানুকম্পী বরধর্ম্মযুক্তঃ।
দাতা সুধীরো জনরঞ্জকশ্চ শ্রীবিষ্ণুপাদাব্জযুগানুরক্তঃ॥ ৪৭
দূতৈ স্তমানীয় নিজস্যধাম্নি দিনাজপুরে বহুসভ্যযুক্তে।
তস্মিন্ নৃসিংহ লাড়ুলীত্যুপাধৌ সংন্যস্য মন্ত্রিত্ব মবাপভদ্রং॥ ৪৮
তদ্ব্যক্তি চাতুর্য্যবলেন রাজা শ্রীমদ্গণেশো বরদস্যুরূপান্।
গৌড়স্য পালান্ যবনাত্মজান্ হি জিত্বা চ গৌড়েশ্বরতা মবাপ॥ ৪৯
গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃঙ্মিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনান্ জিত্বা গৌড়ৈকছত্রধৃগভূৎ॥ ৫০"

অতঃপর ১৩৩০ সালের কায়স্থ পত্রিকা চৈত্র সংখ্যা ৪৪০ পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে পারদর্শী পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস, ভাগবতরত্ন "রাজা গণেশ" নামক

এই "অদ্বৈত প্রকাশের" ৫৬ পৃঃ লিখিত আছে যে রাজা দিব্য সিংহ—

"ভক্তিবলে হৈল তিঁহ প্রভুর কৃপাপাত্র।
সংস্কৃতে রচিলা প্রভুর বাল্যলীলা সূত্র॥"

একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার শ্লোকগুলিতে পাঠবৈষম্য ও শ্লোক সংখ্যার অমিল দেখিয়া লিখিয়াছেন, "এইরূপ পাঠবৈষম্য ও শ্লোক সংখ্যার অমিল দেখিয়া শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে দেখাইলে তিনি বলেন যে পাবনা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উক্ত গ্রন্থের পুঁথি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—পুঁথিখানি অন্ততঃ দুইশত বৎসরের প্রাচীন। আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করায় তিনি উক্ত গোস্বামীকে পত্র লিখিয়া রাজা গণেশ সম্বন্ধীয় শ্লোক কয়েকটি তাঁহার পুঁথি হইতে নকল করাইয়া আনাইয়া দেন। ঐ পত্র এখন আমার নিকট আছে।" এই বলিয়া তিনি নিম্ন শ্লোকগুলি উক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যশঃ প্রসূনে স্ফুটিতে নৃসিংহ নাম্নঃ সদা লোকানুগীতকীর্ত্তেঃ।
তদ্গন্ধ সন্দোহ বিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো বহু শাস্ত্রদর্শী॥
দূতৈ স্তুমানীয় স্বকীয়ধাম্নি দিনাজপুরাখ্যে বহুসভ্য যুক্তে।
তস্মিন্ নৃসিংহ লাড়ুলীত্যুপাধৌ সংনস্ত মন্ত্রিত্ব মবাপ ভদ্রং॥
তদ্যুক্তি চাতুর্য্য বলেন রাজা শ্রীমান্ গণেশো বরদস্যুরূপান্।
গৌড়স্থ পালান্ যবনাত্মজান্ হি জিত্বাচ গৌড়েশ্বরতামবাপ॥
গ্রহ পক্ষাব্ধি শশধৃঙমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনান্ জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধৃগভূৎ॥"

পূর্ব্বোক্ত তিন দফা শ্লোক সমূহের মধ্যে ২।৩ দফার শ্লোক সমূহে দুই একটি সামান্য পার্থক্য ব্যতীত সমস্তই মিল রহিয়াছে। কেবল ২য় দফার ৪৭ শ্লোকটি ৩য় দফায় উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা যাঁহার দ্বারা নকল করান হইয়াছিল তাঁহার অসতর্কতার জন্য হওয়াই সম্ভব। ১ম দফার ৪৯ শ্লোক ব্যতীত অন্যান্য শ্লোকে সামান্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। তাহা নকলকারকের দোষে ও অচ্যুতবাবুর সংশোধনের ফলেও হইতে পারে। কিন্তু ১ম দফার ৪৯ শ্লোক যাহা ২য় দফার ৪৭ শ্লোকের স্থলে বসান হইয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এই যে অচ্যুতবাবুর সম্পাদিত গ্রন্থের প্রথম সর্গের ২।৩ শ্লোকে "বন্দে শ্রী গৌর গোপালং হরিং ত্বং প্রেম সাগরং" বলিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। কারণ ১৪০৯ শকে (১৪৮৭ খৃঃ) গ্রন্থরচনার কালে শ্রী চৈতন্যের বয়স মাত্র ২ বৎসর।

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র লিখিত আছে —

সেই নরসিংহ যশঃ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥"
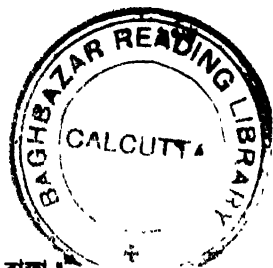
(১৪৯০ শকে, ১৫৬৮ খৃঃ রচিত ঈশান নাগরের "অদ্বৈত প্রকাশ")।

প্রামাণিক মুসলমান ইতিহাস নিজামউদ্দিন আহম্মদের তাবাকাৎ-ই-আকবরী (১৫৯৩ খৃঃ), আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী ও মহম্মদ কাশিম ফিরিস্তার তারিখ-ই-ফিরিস্তা (১৬১১ খৃঃ)-তেও রাজা গণেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই তিনখানি গ্রন্থই প্রায় সমসাময়িক। নিজামউদ্দিন আহম্মদের তাবাকাৎ-ই-আকবরীতে লিখিত হইয়াছে—"সুলতান সমসউদ্দিনের (সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ সাহ) মৃত্যু হইলে গণেশ (কন্‌স) নামক একজন হিন্দু জমিদার বাঙলার আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার আধিপত্যকাল (ইত্তিল) সাত বৎসর ছিল।······ গণেশের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র রাজ্যলোভে মুসলমান হইয়া সুলতান জালালউদ্দিন নাম ধারণ করেন। তাঁহার সময় প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। তিনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন।"

আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন—"গণেশ (কন্‌স) নামক একজন বাঙালী সুলতান গিয়াসউদ্দিনের পৌত্র সমসউদ্দিন (মুদ্রার সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ সাহ)-কে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুসলমান হইয়া সুলতান জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করেন।"

তখন কেহই তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানিতেন না। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় এই ২।৩ শ্লোক দুইটি প্রক্ষিপ্ত হওয়াই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে মুরলীমোহন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পুঁথি হইতে যে শ্লোকগুলি আমাদিগকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার শ্লোক সংখ্যা ৪৬ । ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। এই শ্লোকগুলির প্রায় অনুরূপ শ্লোকগুলির সংখ্যা অচ্যুতবাবুর সম্পাদিত গ্রন্থে ৪৮। ৪৯ । ৫০। ৫১। ৫২। মুরলীমোহন গোস্বামীর পুঁথিতে অচ্যুতবাবুর পুঁথির ২।৩ শ্লোক না থাকায় শ্লোক সংখ্যার এইরূপ তারতম্য হইতে পারে। সুতরাং গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় ঐ ২।৩ শ্লোক অচ্যুত-বাবুর পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

মহম্মদ কাশিম ফিরিস্তার তারিখ-ই-ফিরিস্তায় লিখিত আছে—"সুলতান-উস সালাতিন্ (সইফ-উদ্দিন-হামজা সাহ)-এর মৃত্যুর পর আমীরগণ তাঁহার পুত্রকে সমসউদ্দিন নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। তিনি অল্পবয়স হেতু অল্পবুদ্ধি ছিলেন। গণেশ নামক একজন হিন্দু এই সময় রাজকোষ ও রাজক্ষমতা হস্তগত করিয়া প্রকৃতপক্ষে সুলতান হইয়া উঠেন। ৭৮৭ হিঃ (প্রকৃত তারিখ ৮১৭ হিঃ) সমসউদ্দিনের মৃত্যু হইলে গণেশ স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুসলমানদের সহিত সৌহার্দ্দ্য ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখিয়া ৭ বৎসর রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র জিৎমল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সুলতান জালালউদ্দিন নাম ধারণ করিয়া সুলতান হন। রাজা গণেশ মুসলমানগণের এরূপ প্রিয় ছিলেন যে তাহারা তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই মনে করিত। এমনকি তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা তাঁহার মৃতদেহ মুসলমান প্রথা অনুযায়ী কবরে প্রোথিত করিতে ইচ্ছুক ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর জিৎমল আমীর ও ওমরাহগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন —"আমি মুসলমান ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। এরূপ অবস্থায় যদি আপনারা আমাকে সমর্থন করেন, তবেই আমি সিংহাসনে বসিব। অন্যথা আপনারা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইতে পারেন।" যাহারা রাজ্য ভাঙাগড়ার মালিক তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন, "ধর্ম্মের সহিত পার্থিব ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব আমরা আপনাকে সমর্থন করিব।" জিৎমল লক্ষ্মণাবতীর আলেম ও ফাজেলগণকে ডাকাইয়া মহাবাক্য 'কলমা' উচ্চারণ করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা লইলেন এবং সুলতান জালালউদ্দিন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারসহ ১৭ বৎসর কতিপয় মাস রাজ্যশাসন করতঃ আধুনিক নৌসিরবান বলিয়া খ্যাত হইলেন। ৮১২ হিঃ (প্রকৃতপক্ষে ৮৩৫ হিঃ)-তে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আহম্মদ সাহ সুলতান হন এবং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ন্যায়বিচার ও দানশীলতার সহিত ১৬ বৎসর (প্রকৃত পক্ষে ১০ বৎসর) রাজত্ব করেন।"

পূর্ব্বোক্ত তাবাকাৎ-ই-আকবরী, আইন-ই-আকবরী, ও: তারিখ-ই-ফিরিস্তার বিবরণের মধ্যে বিশেষ কোন অসামঞ্জস্য নাই। ইহাতে মনে হয় ঐ তিনজন গ্রন্থকার একই আকর হইতে তাঁহাদের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাবাকাৎ-ই-আকবরী ও তারিখ-ই-ফিরিস্তার মুখবন্ধে যে নজীর-গ্রন্থের তালিকা দেওয়া আছে তাহাতে 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' নামক একখানি ইতিহাসের নাম দৃষ্ট হয়। তৎকালে পরিচিত 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' এখন আর পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই

'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' ১৪৪২ খৃঃ রাজা গণেশের পৌত্রের মৃত্যুর পরে ও ১৪৯১ খৃঃ সমসউদ্দিন মুজঃফর সাহের (হাবসী) সিংহাসন লাভের পূর্ব্বে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং এই 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' হইতে তাঁহারা তিন জনই রাজা গণেশ ও তাঁহার বংশধরগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন[১]। পূর্ব্বোক্ত তিনখানি

১। এই "তারিখ-ই-বাঙ্গালার" রচনাকাল ও তাহার উপযোগিতা বুঝিতে হইলে ঐ সময়ের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। হাজি ইলিয়াস বংশীয় দ্বিতীয় নাসিরউদ্দিন মহম্মদ ১৪৯০ খৃঃ রাজ্যলাভ করেন। ফিরিস্তা প্রথমতঃ তাঁহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতান সইফউদ্দিন ফিরোজ সাহের (১৪৮৭-৯০ খৃঃ) পুত্র বলেন। তৎপর তারিখ-ই-কান্দাহারীর নজীর উদ্ধৃত করিয়া বলেন দ্বিতীয় নাসিরউদ্দিন জালালউদ্দিন ফতে সাহের (১৪৮১-৮৭ খৃঃ) পুত্র ছিলেন। কিন্তু তাবাকাৎ-ই-আকবরীতে দ্বিতীয় নাসিরউদ্দিনকে কেবলমাত্র সুলতান সইফউদ্দিন ফিরোজ সাহের পুত্র বলিয়াই বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় নিজামউদ্দিনের নিকট "তারিখ-ই-কান্দাহারী" ছিল না।

দ্বিতীয় নাসিরউদ্দিনের পর তাঁহার হাবসী হত্যাকারী সমসউদ্দিন মুজঃফর শাহ (১৪৯১-৯৩ খৃঃ) সুলতান হন। এই মুজঃফরের হত্যার বিবরণে ফিরিস্তা লিখিয়াছেন—"মন্ত্রী সৈয়দ মক্কীর নেতৃত্বে বিদ্রোহিগণ রাজপ্রাসাদ অবরুদ্ধ করিলে মুজঃফর সসৈন্যে প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া সম্মুখসমরে নিহত হন।" পরে তারিখ-ই-আকবরীর মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, 'তারিখ-ই-আকবরী'র মতে জনগণ মুজঃফর সাহের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলে আলাউদ্দিন নামক একজন সৈন্য প্রহরিগণের সর্দ্দারকে বশীভূত করিয়া ষোলজন পাইকসহ রাত্রিকালে রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া মুজঃফরকে হত্যা করে।

ইহা হইতে মনে হয় ফিরিস্তার নিকট 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' ব্যতীত 'তারিখ-ই-কান্দাহারী' ও 'তারিখ-ই-আকবরী' ছিল। কিন্তু নিজামউদ্দিনের নিকট 'তারিখ-ই-কান্দাহারী' ছিল না। তাঁহার নিকট 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' ব্যতীত অপর একখানি নজীর-গ্রন্থ ছিল যাহা ফিরিস্তার নিকট না থাকায় তাঁহাকে নিজাম-উদ্দিনের মত স্বতন্ত্র উল্লেখ করিতে হয়। মুজঃফর হাবসীর বিবরণের জন্য নিজাম-উদ্দিন ও ফিরিস্তাকে সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থের উপর নির্ভর করিবার হেতু এই হইতে পারে যে তারিখ-ই-বাঙ্গালা উভয়ের নিকট থাকিলেও তাহাতে মুজঃফর হাবসীর বিবরণ ছিল না—অর্থাৎ তারিখ-ই-বাঙ্গালা ১৪৪২ খৃঃ গণেশের পৌত্র সমসউদ্দিন আহম্মদের মৃত্যুর পর ও ১৪৯০ খৃঃ মধ্যে লিখিত ও সমাপ্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন ইতিহাসের প্রায় ২০০ শত বৎসর পরবর্ত্তী রিয়াজ-উস্-সালাতিন ও মুন্সী শ্যামপ্রসাদের বিবরণের তুলনা করা যাউক। রিয়াজের রচয়িতা গোলাম হোসেন ইংরেজ কোম্পানীর আমলে মালদহের ডাকমুন্সী ছিলেন। তিনি মালদহস্থ কুঠীর বড় সাহেব জর্জ্জ আডনীর আদেশে ১৭৮৮খৃঃ 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' রচনা করেন। প্রায় একই সময়ে মেজর ফ্রাঙ্কলিনের অনুরোধে মুন্সী শ্যামপ্রসাদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত একখানি হস্তলিখিত ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়া বুকানন হ্যামিলটন ১৮১০ খৃঃ তাঁহার দিনাজপুরের বিবরণে রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্রপৌত্রের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বুকাননের ঐ বিবরণকে স্যার যদুনাথ সরকার "a careless and incorrect summary of 'Riaz-us-Salatin" (রিয়াজ-উস-সালাতিনের অসতর্ক ও অশুদ্ধ চুম্বক) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন (History of Bengal, Part II p 123 ; Dacca University Edition)। রিয়াজ-উস-সালাতিন সম্বন্ধেও স্যার যদুনাথ লিখিয়াছেন, "১৭৮৭ খৃঃ লিখিত এই পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তা কোনই প্রামাণিক প্রাচীন নজীর-গ্রন্থ উদ্ধৃত, এমনকি নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভুলের সংখ্যাও খুব বেশী ও সাঙ্ঘাতিক" (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৪৭ সাল, পৃঃ ২৩৪)। নিম্নে রিয়াজের ও বুকাননের বিস্তৃত বিবরণের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল :—

(১) সুলতান সমসউদ্দিন (সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ সাহ) পরলোকগত হইলে দিনাজপুরের (পরগণা বিজয়নগর) রাজা গণেশ সিংহাসন অধিকার করেন। সেখ বদর-ই-ইসলাম ও তাঁহার পুত্র গণেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করায় তিনি তাঁহাদিগকে ও অনেক মুসলমান আলেম ও সেখগণকে হত্যা করেন এবং রাজ্য হইতে ইসলামকে উচ্ছেদ করিতে সঙ্কল্প করেন।

(২) রাজা গণেশের অত্যাচার হইতে মুসলমানগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রসিদ্ধ সাধু নূর কুতুব আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সরকীকে আহ্বান করিলে ইব্রাহিম সসৈন্যে আসিয়া ফিরোজাবাদের নিকট শিবির স্থাপন করিলে গণেশ ভীত হইয়া নূর কুতুব আলমের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার আদেশে দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া জালালউদ্দিন নাম দিয়া সিংহাসনে বসান। অবশেষে নূর কুতুবের আদেশে সুলতান ইব্রাহিম অসন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া যান। নূর কুতুবের বিষদৃষ্টিতে ইব্রাহিম ও তাঁহার প্রধান কাজি সেই বৎসরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন (এই স্থলে বুকাননের বিবরণে আছে যে, জালালউদ্দিন সুলতান হইয়া ইব্রাহিম সাহকে আক্রমণ করিয়া বধ করেন এবং তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন।)।

(৩) গণেশ যখন শুনিলেন যে ইব্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছে, তখন তিনি যদুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সুবর্ণকামধেনু প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হিন্দু করিয়া লইলেন এবং ঐ সুবর্ণ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন (বুকাননের বিবরণে ঐ প্রায়শ্চিত্তের কথা নাই)। অতঃপর যদুকে কারারুদ্ধ করিয়া গণেশ স্বয়ং পুনরায় রাজা হন এবং মুসলমানদের উপর অধিকতর অত্যাচার করিতে থাকেন। [তিনি নূর কুতুব আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার ও পৌত্র শেখ জাহিদকে ধৃত করিয়া নূর কুতুব আলমের ভূগর্ভ প্রোথিত ধনের সন্ধান করিয়া দিবার জন্য সোনারগাঁয়ে প্রেরণ করেন। প্রত্যাশিত ধন প্রাপ্ত না হওয়ায় শেখ আনওয়ারকে হত্যা করা হয়। যে দিন শেখ আনওয়ারকে সোনারগাঁয়ে হত্যা করা হয়, সেই দিনই রাজধানীতে গণেশের মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন যদু কারাগারে থাকিয়াই গণেশের রক্ষিগণকে ঘুষ দিয়া তাঁহার মৃত্যু সাধন করাইয়াছিলেন।] (বন্ধনীর মধ্যগত অংশ বুকাননে নাই)। তৎপর জালালউদ্দিন রাজা হইয়া হিন্দুদের উপর বিশেষতঃ তাঁহার প্রায়শ্চিত্তকারক ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের উপর অত্যাচার করিতে থাকেন এবং সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া ৮১২ হিঃ (১৪০৯ খৃঃ)-তে ও তৎপর তাঁহার পুত্র আহম্মদ তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হন[১]।

জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম কর্তৃক রাজা গণেশকে যুদ্ধে নিহত ও তৎপুত্রকে মুসলমান করতঃ গৌড় রাজ্যকে মুসলমান রাজ্যে পরিণত করার বিবরণ ১৪২৮ খৃঃ বিরচিত "সঙ্গীত শিরোমণি" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটিতে নাগরী অক্ষরে লিখিত ঐ গ্রন্থের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। (G 1713 পত্র সংখ্যা ২-২৬)। নিম্নে প্রাসঙ্গিক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল :—

১। "The legends about Raja Ganesh reduced to writing 370 years after his death, in the Riyuz-us-Salatin and the Pandua manuscript of Buchanon prove to be pious frauds when confronted with more probable account given by Nizamuddin Ahmed and Ferista" (Sir Jadu Nath Sarkar at p. 125, History of Bengal Vol. II, Dacca University).

গোলাম হোসেন কোন নজীর-গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। অনেক স্থলে 'লোকে বলে' ('গোয়েন্দ'), 'অনেকে বলে' (ব-কৌলে-বাজে) বলিয়াছেন।

* * * সংগ্রাম বহ্নিষু ॥
অসপত্নং ব্যধাদ্রাষ্ট্রমিবরাহিম ভূপতেঃ
ব্যানম্রাখিল-ভূমিপাল-মুকুট-প্রত্যগ্ররত্নপ্রভা-
কির্ম্মীরাভবদংঘ্রিযুগনখর জ্যোতির্বিতানোজ্জ্বলং ॥
কীর্ত্তিছত্র সুবর্ণদণ্ড সদৃশ স্ফূর্জ্জৎ-প্রতাপোচ্ছ্রয়ং।
লোকেস্মিন্নিব্রাহিম ক্ষিতিপতিং কোনাশ্রয়েৎ পার্থিবঃ ॥
ঘনাটোপং গর্জ্জদ্‌গজতুরগ সেনাজলধরৈঃ
স (শ) মং নীত্বা শঙ্কং শকশলভসপ্তার্চ্চিসময়ং।
তুরস্কং নির্ম্মায় প্রকটিত-নয়ং তস্য তনয়ং
ব্যধাৎ গৌড়ান্‌ প্রৌঢ়ঃপুনরপি শকানাং জনপদান্‌ ॥
আদক্ষিণ দধেরা চ হিমাদ্রেরা চ গাজনাৎ।
আগৌড়া দুর্জ্জলং রাজ্য মিবরাহিম ভূভুজঃ ॥
অস্যৈব সার্ব্বভৌমস্য প্রতাপাৎ পৃথিবীপতেঃ।
মালিকঃ সুলুতাশাহি মধ্যদেশাধিপোভবৎ ॥
গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে গঙ্গায়া বিপুলে তটে।
কড়াখ্যং নগরং তস্যা বেণ্যা যোজন পঞ্চকে ॥ (২।১ পত্র)
*
অচিকরদমুং নাম্না শ্রী সঙ্গীত শিরোমণিং।
ইব্রাহিম সম্রাজি শকরাজ্য প্রশাসতি ॥
বর্ষে চতুর্দ্দশ পঞ্চাশীত্যধিকে গতে।
বৈক্রমার্কে খবাণাগ্নি শশি সংখ্যে চ শাককে ॥ (২।২ পত্র)
* * * *
ইতি শ্রীমালিক শরক-শ্রীসুলিতান শাহেবা দেশেন নানা দেশীয়
পণ্ডিত মণ্ডলী বিরচিতে সঙ্গীত শিরোমণৌ তান প্রকাশঃ
(২।৩ পত্র)

উক্ত শ্লোকগুলি হইতে জানা যাইতেছে যে (জৌনপুরের) সার্ব্বভৌম ভূপতি ইব্রাহিমের অধীনে অনেক সামন্ত নরপতি ছিলেন, তাঁহার সাম্রাজ্য দক্ষিণ সমুদ্র হইতে হিমালয় ও গাজন (গজনি) হইতে গৌড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই প্রৌঢ় সম্রাট ইব্রাহিম ঘোর দর্পে গর্জ্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও সেনারূপ মেঘদ্বারা শক (মুসলমান) রূপ পতঙ্গের অগ্নিকে (রাজা গণেশকে) নির্ব্বাপিত অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়া এবং তাঁহার সুনীতিজ্ঞ পুত্রকে তুরুষ্ক (মুসলমান) করিয়া গৌড় দেশকে পুনরায় শক (মুসলমান) রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

এই সম্রাটের অধীনে মধ্যদেশাধিপতি মালিক স্থলুতা শাহি ত্রিবেণীর (প্রয়াগের) পাঁচ যোজন দূরে কড় নামক নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি নানা দেশ হইতে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা 'সঙ্গীত শিরোমণি' গ্রন্থ ১৪৮৫ বিক্রমাব্দে, ১৩৫০ শকাব্দে (১৪২৮-২৯ খৃঃ) রচনা করাইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সময় সম্রাট ইব্রাহিম (মৃত্যু ৮৪৫ হিঃ, ১৪৪১ খৃঃ) ও রাজা গণেশের পুত্র জালালউদ্দিন (মৃত্যু ৮৩৫ হিঃ, ১৪৩১ খৃঃ) জীবিত ছিলেন।

জালালউদ্দিন মহম্মদের সময় বিরচিত বৃহস্পতি রায় মুকুট কৃত "স্মৃতি রত্নহার" নামক গ্রন্থের একখানি হস্তলিপি বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে (৫২১৫ সংখ্যক পুঁথি) রক্ষিত আছে। উক্ত গ্রন্থে জালালউদ্দিন সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয়ঃ—

"স্বপতিকং বিষ্ণুর্দ্বাঃস্থমর্কেন্দুদীপকম্।
জগদস্তঃ পুরং যস্য তদীশাস্তঃ পুরং স্তবে ॥ ২
জিয়াদয়ং স জগদস্ত-সুতোঽতিবেল স্তৈ স্তৈঃ গুনৈঃ [সকলসুধীজনৈর্বন্দিতঃ]
[কৃচ্ছত] পা নিজভুজদ্রবিণাজ্জিতশ্রীঃ শ্রীরায় রাজ্যেধর নামপদং প্রপন্নঃ ॥ ৩
সৈন্যাধিপত্যমিভ সৈন্ধবতূর্য্যশঙ্খ ছত্রাবলী ললিত কাঞ্চনরূপ্য [যুক্তং]
[যস্মৈসগৌরবমদাং] বহুভূষণঞ্চ জল্লালদিন নৃপতি মুদিতোগুনঘৈঃ ॥ ৪
যো ব্রহ্মাণ্ডং কনকতুরগংস্যন্দনং বিশ্বচক্রং পৃথ্বীং কৃষ্ণাজি [নং] সুরতরুন্
ধেনুশৈলোদরীংশ্চ।
[দত্বাভূয়োবি] ধিবদবনীদেবতানামমন্দং ভিন্দন্ দৈন্যং সপদিদধতে
ধর্ম্মসূনোরভিখ্যাং ॥ ৫
জন্মাপ্তং জগদস্ততোগুণনিধে মূর্দ্ধাভিষিক্তয়ে দারা সন্তুলি
[তা সুতাশুদ্ধম] তিঃ শ্রীভাস্ক (স্ব)রাঃ সূনবঃ।
লক্ষ্মীরদ্ভুতদান ভোগ সুভগ মন্ত্রিত্বমুর্ব্বীভুজাং
ইত্থং যস্য মনোরথায় কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন কাম্যং স্থিতং ॥ ৬
আচার্য্য ইত্যভিমতং কবিচক্র [বর্ত্তীত্যাখ্যাপদ] দ্বিতীয় মধ্য নামস্ততো যঃ।
স শ্রী বৃহস্পতিরিয়ং বহুসংগ্রহার্থৈর্নিমাতি নির্ম্মলমতিঃ স্মৃতিরত্নহারম্ ॥" ৭[১]

১। উক্ত শ্লোকগুলির বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশগুলি নষ্ট হওয়ায় পাদপূরণ করিয়া দিলাম।

পূর্ব্বোদ্ধৃত "স্মৃতিরত্নহারে"র শ্লোকগুলির মধ্যে ৩ ও ৬ শ্লোকে 'জগদস্ত' স্থলে অধ্যাপক আর, সি, হাজরা 'গজদস্ত' পাঠ ধরিয়া উহা রাজা গণেশ অর্থে ব্যবহৃত

[সেই অতিবেল জগদন্তের রায়রাজ্যধর নামক পুত্রের জয় হউক, যিনি সেই সেই গুণ সমূহদ্বারা [সকল সুধীজনের বন্দিত], যিনি [কৃচ্ছতপা] ও যিনি ভুজবলে শ্রী অর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহাকে বহু গুণের জন্য রাজা জালালউদ্দিন সৈন্যাধিপত্য, হস্তী, অশ্ব, তূর্য্য, শঙ্খ, ললিতকাঞ্চন রৌপ্যযুক্ত ছত্রাবলী ও বহু ভূষণ দান করিয়াছিলেন, যিনি বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্ণঅশ্ব, রথ, বিশ্বচক্র, পৃথিবী, কৃষ্ণাজিন, কল্পতরু, শৈলোদরী ধেনু পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া তাঁহাদের দৈন্য দূর করতঃ ধর্ম্মপুত্র আখ্যা ধারণ করিতেছেন, গুণনিধি জগদন্ত হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বংশে (রাজবংশে) জন্মলাভ, উৎকৃষ্ট পত্নী, শ্রীভাস্বর পুত্রগণ, শুদ্ধমতি সুতা, অদ্ভুত দানভোগ দ্বারা চরিতার্থসম্পত্তি এবং রাজগণের মন্ত্রীত্ব লাভ করায় যে:কৃতিপুরুষের আর কোন কাম্যবস্তুর অবশিষ্ট ছিল না, সেই রায় রাজ্যধরের নিকট যিনি আচার্য্য ও কবিচক্রবর্ত্তী এই দুইটি অভিমত (উপাধি) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই বৃহস্পতি এই স্মৃতিরত্নহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।]

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলিলিখিত বর্ণনা ব্যতীত রাজা দনুজমর্দ্দনদেব, মহেন্দ্রদেব ও জালালউদ্দিনের নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলি পাওয়া গিয়াছে :—

১। [রাজা গণেশের পুত্র] জালালউদ্দিন মহম্মদ সাহের মুদ্রা, ৮১৮ হিঃ (১৪১৫ খৃঃ ১৩ই মার্চ্চ) টাকশাল ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া)।

৮১৮ হিঃ কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে টাকশালের নাম নাই।

হইয়াছে বলিয়া মনে করেন (I. H. Q. Vol. 17, p. 447-449)।

অপরপক্ষে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'জগদন্ত' স্থলে 'জগদত্ত' পাঠ গ্রহণ করিয়া "রায়রাজ্যধর"কে জগদত্তের পুত্র বলিয়া মনে করেন (I. H. Q. Vol. 17 p. 456-457)। বৃহস্পতি রায়মুকুটের রঘুবংশের টীকা "রঘুবংশ-বিবেকে" এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়—"ইতি মহিন্তাপনীয়-কবিচক্রবর্ত্তী-রাজ্যধরাচার্য্য-শ্রীমদ্ বৃহস্পতিমিশ্রকৃতে রঘুবংশবিবেকে ব্যাখ্যা বৃহস্পতৌ সপ্তদশঃ সর্গঃ।" এতদ্বারা মনে হয় বৃহস্পতি রায় রাজ্যধরের আচার্য্য ছিলেন। বৃহস্পতি কৃত মেঘদূতের বোধবতী টীকাতেও ঐরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। 'স্মৃতিরত্নহারে'র পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির ২নং শ্লোকে 'জগদন্তঃপুর' কথাটি দৃষ্ট হইতেছে। নকলকারক ঐ 'জগদন্ত' দৃষ্টে 'গজদন্ত'কে 'জগদন্ত' লেখা অসম্ভব নহে। 'গজদন্ত' শব্দের অর্থ 'গণেশ'। গ্রন্থকর্ত্তা রাজা গণেশ বুঝাইতে 'গজদন্ত' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিলে রায় রাজ্যধর রাজা গণেশের অপর পুত্র হইতেছেন। ফিরিস্তা রাজা গণেশের দ্বিতীয় পুত্র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নাম দেন নাই।

৮১৯ হিঃ একটি মুদ্রা (I. M. C. No. 94)

২। দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা।

সুবর্ণগ্রাম, চাটিগ্রাম, পাণ্ডুনগর হইতে ১৩৩৯ শকাব্দের (৮২০ হিঃ) ১৪১৭ খৃঃ।

সুবর্ণগ্রাম, চাটিগ্রাম, পাণ্ডুনগর হইতে ১৩৪০ শকাব্দের (৮২১ হিঃ) ১৪১৮ খৃঃ।

৩। মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা।

১৩৪০ শকাব্দের পাণ্ডুনগর ও চাটিগ্রাম হইতে।

৪। পুনরায় জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ।

৮২১ হিঃ (১৪১৮ খৃঃ) ও ৮২৩ হিঃ (১৪২০ খৃঃ)-এর মুদ্রা ফিরোজাবাদ হইতে। ৮২৩ হিঃ চাটিগ্রাম হইতে।

৮২৪ হিঃ সোনার গাঁ হইতে।

৮৩৫ হিঃ (১৪৩১ খৃঃ ৯ই সেপ্টেম্বর) ফিরোজাবাদ হইতে।

(Vide Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal by Nalini Kanta Bhattasali M. A.)

'বাল্যলীলা সূত্রং' অনুসারে রাজা গণেশ ১৩২৯ শকে (১৪০৭-০৮ খৃঃ, ৮১১ হিঃ) যবনগণকে জয় করিয়া গৌড়েশ্বর হন। এই সময়টি সমসউদ্দিন ইলিয়াসের পৌত্র গিয়াসউদ্দিন আজমের (৭৯৫-৮১৩ হিঃ) রাজত্বের শেষভাগ। গিয়াস-উদ্দিন আজম তাঁহার পিতা সিকন্দর সাহকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সুলতান হইয়াছিলেন। বোধ হইতেছে এই সময় হইতেই রাজ্যে দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন ও ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে গিয়াসউদ্দিন আজম ও তাঁহার পিতা বিলাসব্যসনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। সুতরাং এই সময়ে সামন্তরাজগণ প্রবল হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ বোধহয় পিতাপুত্রের যুদ্ধে পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজমের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন এবং এই সুযোগে ৮১১ হিঃ (১৪০৮ খৃঃ) সুলতানের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া de facto গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দিন আজম সাহের পুত্র সইফউদ্দিন হামজা সাহ মাত্র পনের কি ষোল মাস রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় রাজা গণেশই সর্ব্বেসর্ব্বা থাকাই সম্ভব। হামজা সাহের পালিত পুত্র সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ সাহ (৮১৫-৮১৭ হিঃ) সম্বন্ধে ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যকালে রাজা গণেশ রাজশক্তি ও রাজকোষ হস্তগত করিয়া রাজ্য শাসন করেন এবং বায়াজিদের মৃত্যুর পর তিনি স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়াজিদের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহের পাঁচটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি ৮১৭ হিজরীতে সাতগাঁ হইতে মুদ্রিত। একটি [তারিখ শূন্য]

মুদ্রা সম্ভবতঃ মুয়াজ্জমাবাদ (ময়মনসিং) হইতে মুদ্রিত। অপরটিতে তারিখ ও টাকশালের নাম নাই। মনে হয় রাজা গণেশ পাণ্ডুয়া (ফিরোজাবাদ) অধিকার করিলে মুসলমানগণ আলাউদ্দিন ফিরোজসাহকে লইয়া প্রথমতঃ সাতগাঁয়ে ও পরিশেষে বঙ্গে মুয়াজ্জমাবাদে বাধা দিতে চেষ্টা করে।

রাজা গণেশের পুত্র জালালউদ্দিন মহম্মদ সাহ ৮১৮ হিজরীতে (১৪১৫।১৩ই মার্চ্চ) ফিরোজাবাদ হইতে মুদ্রা প্রচার করেন। সুতরাং ৮১৭ হিঃ শেষে অথবা ৮১৮ হিজরীর প্রথমে রাজা গণেশের মৃত্যু হইয়াছিল।

নিজামউদ্দিন ও ফিরিস্তার মতে রাজা গণেশ ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র জিৎমল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুলতান হন। 'বাল্যলীলা সূত্রং'-এর মতে ১৪০৮ খৃঃ (৮১১ হিঃ) গণেশ গৌড়ের সুলতান সিকেন্দর সাহকে যুদ্ধে নিহত করিয়া গৌড়ের (de facto) রাজা হইয়াছিলেন। এই মতানুসারে ৮১১ হিঃ হইতে ৮১৭ হিঃ পর্য্যন্ত রাজা গণেশের রাজ্যকাল ৭ বৎসর হইতেছে।

রাজা গণেশের মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত 'সঙ্গীত শিরোমণি'র বচন দৃষ্টে জানা যায় যে, জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম হস্তী, অশ্ব ও সেনারূপ ঘোর গর্জ্জনকারী মেঘ দ্বারা শক (মুসলমান) রূপ পতঙ্গের অগ্নি (রাজা গণেশ)কে নির্ব্বাপিত (বিনষ্ট) করিয়া তাঁহার সুনীতিজ্ঞ পুত্র (জিৎমল)কে মুসলমান করতঃ গৌড় রাজ্যকে মুসলমান রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন[১]। নিজামউদ্দিন এবং ফিরিস্তাও বলেন রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ জালালউদ্দিন নাম ধারণ করিয়া সুলতান হন।

১। ঘটনার প্রায় ৩৮০ বৎসর পরে কোন নজীর-গ্রন্থের সহায়তা না লইয়া লোকের মুখে শুনিয়া লিখিত গোলাম হোসেনের রিয়াজ-উস্-সালাতিন গ্রন্থের বিবরণ অনুসরণ করিয়া ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার "Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal" গ্রন্থে মুদ্রার দনুজ-মর্দ্দন দেবকে রাজা গণেশ বলিয়া ও রাজা গণেশের পুত্র জালালউদ্দিনকে মুদ্রার 'মহেন্দ্রদেব' বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "History of Bengal" Vol II-এ ঐ মত অনুসরণ করিয়া গণেশকে দনুজমর্দ্দন দেবের সহিত অভিন্ন এবং রাজা গণেশের দ্বিতীয় পুত্রকে মহেন্দ্রদেবের সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

রিয়াজ-উস্-সালাতিনের বিবরণে দেখা যায় যে, সমসউদ্দিনের (বায়াজিদ)

ইহারা কেহই গণেশ ও জালালউদ্দিনের দ্বিতীয়বার রাজা হওয়ার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত দেন নাই। সুতরাং গোলাম হোসেনের ঐরূপ উক্তি বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। নিজামউদ্দিন বলেন, জিৎমল রাজ্যলোভে মুসলমান হইয়াছিলেন। রাজা গণেশ ফিরোজাবাদের সিংহাসন অধিকার করিবার পর অধিক সময় জীবিত ছিলেন না। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সসৈন্যে ফিরোজাবাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন এবং তৎপুত্র জিৎমলকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া জালালউদ্দিন মহম্মদ নাম দিয়া ফিরোজাবাদের সিংহাসনে বসাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। জালালউদ্দিন সুলতান হইয়া ৮১৮ হিঃ ফিরোজাবাদ টাকসাল হইতে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। ৮১৯ হিঃ মুদ্রিত জালালউদ্দিনের একটিমাত্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে টাকসালের

মৃত্যুর পর রাজা গণেশ সিংহাসন অধিকার করিয়া মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে নূর কুতুব আলমের আহ্বানে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সসৈন্যে ফিরোজাবাদের নিকট উপস্থিত হইলে রাজা গণেশ ভীত হইয়া তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র যদুকে মুসলমান করিয়া জালালউদ্দিন নাম দিয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিলে ইব্রাহিম ফিরিয়া যান ও সেই বৎসরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইব্রাহিমের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া গণেশ যদুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন ও যদুকে পুনরায় হিন্দু করিয়া কারারুদ্ধ করেন। পরে রাজা গণেশের মৃত্যুর পর যদু পুনরায় মুসলমান হইয়া জালালউদ্দিন নাম লইয়া সুলতান হন। ৮১৮ হিঃ জালালউদ্দিন ফিরোজাবাদ হইতে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ৮১৯ হিঃ একটি মুদ্রা পাওয়া যায় (I. M. C. No. 94)। ৮২০ ও ৮২১ হিঃ দনুজমর্দ্দনদেবের এবং ৮২১ হিঃ মহেন্দ্রদেবের ও ৮২১ হিঃ পুনরায় জালালউদ্দিনের মুদ্রা মুদ্রিত হয়। এতদ্বারা ভট্টশালী মহাশয় প্রভৃতি রাজা গণেশের সহিত দনুজমর্দ্দনদেবের অভিন্নতা অনুমান করেন। কিন্তু গোলাম হোসেনের বর্ণিত গণেশের দ্বিতীয়বার রাজা হওয়া প্রভৃতি কাহিনী কোন প্রাচীন নজীর-গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত নহে। সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইব্রাহিমের মৃত্যু হওয়ায় গণেশ সাহসী হইয়া যদুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন একথাও ঠিক নহে। কারণ ইব্রাহিম ঐ সময়ের বহু পরেও ৮৪৫ হিঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ঐ সময় জালালউদ্দিনের বয়সও ১২ বৎসর ছিল না, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। কারণ প্রায় সমসাময়িক গ্রন্থ 'সঙ্গীত শিরোমণি'র মতে জালালউদ্দিন ঐ সময়ে "প্রকটিত নয়ঃ" (প্রকৃষ্ট নীতিজ্ঞ) ছিলেন। গোলাম হোসেন বলেন জালালউদ্দিন সাত বৎসর রাজত্ব

নাম নাই (I. M. C. No. 94)। সম্ভবত এই সময় দনুজমর্দ্দন দেব তাঁহাকে পাণ্ডুয়া হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বায়াজিদ সাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজসাহ তখনও সাতগাঁ ও মুয়াজ্জমাবাদ (পূর্ব্বময়মনসিং) নিজ অধিকারে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। ইতি মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দনদেব চট্টগ্রাম ও সোনার গাঁ অধিকার করিয়া ৮২০ হিঃ (১৩৩৯ শকাব্দে=১৪১৭ খৃঃ) জালালউদ্দিন মহম্মদকে পাণ্ডুনগর (পাণ্ডুয়া) হইতে বিতাড়িত করতঃ পাণ্ডুনগর অধিকার করেন এবং ১৩৩৯ শকাব্দেই চাটিগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম ও পাণ্ডুনগর হইতে মুদ্রা প্রচারিত করেন। দনুজমর্দ্দন দেব ১৩৪০ শকেও (৮২১ হিঃ) পাণ্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগ্রাম হইতে মুদ্রা প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ১৩৪০ শকাব্দে পাণ্ডুনগর ও চাটিগ্রাম হইতে মহেন্দ্রদেব নামক রাজা মুদ্রা মুদ্রিত করেন। দনুজমর্দ্দন দেবের

করিয়া ৮১২ হিজরীতে পরলোক গমন করেন, ইহাও মিথ্যা। রাজা গণেশ যে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারী ও জালালউদ্দিন যে হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচারী ছিলেন গোলাম হোসেনের এই উক্তি নিজামউদ্দিন, আবুল ফজল, কি ফিরিস্তার বিবরণ দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বরং 'স্মৃতি রত্নহারে'র শ্লোকে দেখা যায় যে জালালউদ্দিন রায়রাজ্যধরকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন গণেশের পুত্রের নাম পর্য্যন্তও ভুল করিয়াছেন। কারণ নিজামউদ্দিন প্রভৃতি ঐ নাম 'জিৎমল' লিখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময় জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সাহ শর্কী এরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন যে তিনি দিল্লী নগরীর প্রাচীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তৈমুরলঙ্গের দিল্লী আক্রমণের (৮০১ হিঃ, ১৩৯৮ খৃঃ) পর হইতে ৮৫৫ হিঃ (১৪৫২ খৃঃ)-তে বহলোল লোদীর রাজ্যলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিল্লীর সুলতানগণের রাজ্য দিল্লীর চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ইব্রাহিমের জীবিতাবস্থায় রাজা গণেশের পক্ষে জালাল উদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করা সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ "সঙ্গীত শিরোমণি"তে পরিষ্কার লিখিত আছে যে ইব্রাহিম গণেশরূপ অগ্নিকে সৈন্যরূপ বারিধারা দ্বারা নির্ব্বাপিত অর্থাৎ নিহত করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে ঐ সময় দনুজমর্দ্দনদেব নামে বঙ্গে (চন্দ্রদ্বীপ) আর একজন শক্তিশালী রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। গণেশের নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত না করিয়া "দনুজমর্দ্দনদেব" নামে মুদ্রা প্রচারের কোনও কারণ দেখা যায় না। কেহই এমনকি গোলাম হোসেনও গণেশের অপর নাম যে দনুজ-মর্দ্দনদেব তাহা বলেন নাই। অতএব ভট্টশালীর মত গ্রহণযোগ্য নহে।

মুদ্রার একদিকে "শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দেবস্য" ও অপরদিকে "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ" এবং মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার একদিকে "শ্রীশ্রীমহেন্দ্র দেবস্য" ও অপরদিকে "শ্রীশ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ" অক্ষরগুলি খোদিত থাকায় উভয়কে একই বংশীয়, সম্ভবতঃ পিতা-পুত্র বলিয়া মনে হয়। মহেন্দ্রদেব বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত (সুবর্ণগ্রাম হইতে ৯ ক্রোশ দূরে কালীগঙ্গাতীরস্থ) শ্রীপুরের ভৌমিকও হইতে পারেন। শ্রীপুরের অন্যতম ভৌমিক দেববংশীয় কেদার রায় বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীপুর এক্ষণে পদ্মা গর্ভে। মনে হয় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে ইলিয়াসের বংশধরগণের দুর্ব্বলতার সুযোগে গৌড়ের ও বঙ্গের কতিপয় শক্তিশালী হিন্দু ভৌমিক অন্যান্য হিন্দু ভৌমিক গণের সহায়তায় স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হন। তাঁহাদের মধ্যে দিনাজ-পুরের রাজা গণেশ ও চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দন দেব প্রধান ছিলেন। ১৪০৮খৃঃ হইতে ১৭১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা গণেশই ইলিয়াস বংশীয় সুলতানগণের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনিই গৌড়-বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে-ছিলেন। ৮১৭ হিঃ (১৪১৪খৃঃ) বায়াজিদসাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহকে বিতাড়িত করিয়া রাজা গণেশ ফিরোজাবাদের (পাণ্ডুয়া) সিংহাসন অধিকার করেন। এই কার্য্যে তিনি সম্ভবতঃ গৌড়-বঙ্গের অনেক হিন্দু সামন্ত রাজগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। নানা গোলযোগে তাঁহার স্বল্পকাল রাজত্বের মধ্যে তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র জিৎমল মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দিন মহম্মদ নামে ফিরোজাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করায় রাজা দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া চট্টগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়া তথা হইতে দনুজমর্দ্দন দেব নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন এবং ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডুনগর) হইতে জালালউদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া তথা হইতেও মুদ্রা প্রচার করেন। অতঃপর জালালউদ্দিন কতকটা নিরাপদ স্থান মনে করিয়া সপ্তগ্রামে সরিয়া যান। দনুজ-মর্দ্দন দেবের সপ্তগ্রাম হইতে মুদ্রিত কোন মুদ্রা না পাওয়ায় ঐ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। বোধ হয় ৮১৯ ও ৮২০ হিঃ-র কতকাংশ পর্য্যন্ত গৌড়-বঙ্গে আধিপত্য করিবার পর সপ্তগ্রাম অধিকার করিতে চেষ্টা করিলে জালালউদ্দিনের সহিত যুদ্ধে রাজা দনুজ-মর্দ্দন দেব নিহত হন এবং তৎপর মহেন্দ্র দেব রাজা হইয়া পাণ্ডুনগর ও চট্টগ্রাম হইতে ১৩৪০ শকে (৮২১ হিঃ, ১৪১৮ খৃঃ) মুদ্রা প্রচার করেন। সম্ভবতঃ ৮২১ হিঃ জালালউদ্দিনের পক্ষ প্রবল হইয়া পুনরায় পাণ্ডুনগর (ফিরোজাবাদ) অধিকার করতঃ তথা হইতে মুদ্রা প্রচার করেন এবং মহেন্দ্র দেব সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রাম ও চট্টগ্রামে আধিপত্য করিতে থাকেন। তৎপর জালালউদ্দিন বোধহয় ৮২৩ হিঃ

চট্টগ্রামে ও ৮২৪ হিঃ সোনার গাঁ উদ্ধার করিয়া ঐ ঐ স্থান হইতে মুদ্রা প্রচার করেন।

এইরূপে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা গণেশ, দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব মুসলমান কবলিত গৌড়ে ও বঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইলেও গণেশের পুত্র জিৎমল মুসলমান হওয়ায় গণেশের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং শেষে গণেশের উক্ত মুসলমান উত্তরাধিকারী জালালউদ্দিন মহম্মদের হস্তে পরাজিত হওয়ায় দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্র দেবের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। গণেশের মুসলমান উত্তরাধিকারীদের ইতিহাস বর্ণনাকালে মুসলমান ঐতিহাসিকগণকে প্রসঙ্গক্রমে গণেশের কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব সম্বন্ধে ঐরূপ কোন কারণ না থাকায় মুসলমানলিখিত ইতিহাসে তাঁহাদের নাম স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। পরন্তু দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্র দেবের বিস্মৃত কাহিনী দূরাগত জনশ্রুতিতে গণেশের দ্বিতীয় অভ্যুদয়ের কাহিনীতে পরিণত হইয়া গোলাম হোসেনের ভ্রম উৎপাদন করিয়াছে।

৩০। জালালউদ্দিন মহম্মদ

(৮২১ হিঃ-৮৩৫ হিঃ। ১৪১৮ খৃঃ-১৪৩১ খৃঃ)।

সাতগাঁ হইতে চাটিগাঁ পর্য্যন্ত জালালউদ্দিনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁহার ৮২১ হিঃ, ৮২৩ হিঃ ও ৮৩৫ হিঃ-তে ফিরোজাবাদ হইতে, ৮২৩ হিঃ-তে চাটিগাঁ হইতে ও ৮২৪ হিঃ-তে সোনারগাঁ হইতে প্রচারিত মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩১। সমসউদ্দিন আহম্মদ (১৪৩১-১৪৪২ খৃঃ)।

অনুমান ৮৩৫ হিঃ-তে জালালউদ্দিনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সমসউদ্দিন আহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৮৪৬ হিঃ (১৪৪২ খৃঃ) সাদিখাঁ ও নাদিরখাঁ নামক দুইজন ক্রীতদাসের হস্তে তিনি নিহত হন।

ক্রীতদাসদের রাজ্য (১৪৪২ খৃঃ)।

অতঃপর উপরোক্ত ক্রীতদাসদ্বয়ের হস্তে শাসনক্ষমতা চলিয়া যায়। কিছু দিন পর নাদিরখাঁকে হত্যা করিয়া সাদি খাঁ স্বয়ং সুলতান হন। কিন্তু ওমরাহগণ ক্রীতদাসের ক্ষমতা সহ্য করিতে না পারিয়া সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাকে হত্যা করিয়া ইলিয়াস সাহের এক বংশধরকে সিংহাসন প্রদান করেন।

৩২। নাসিরউদ্দিন আবুল মজঃফর মাহমুদ খাঁ। (১৪৪২-৫৯ খৃঃ)।

ফিরিস্তার মতে ইলিয়াস সাহের এই বংশধর কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। সুলতান হইয়া তিনি নাসিরউদ্দিন আবুল মজঃফর মাহমুদ খাঁ নাম ধারণ করেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজাগণ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং বহু মসজিদ, খানকা, তোরণ, সেতু ও সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সময় জৌনপুরের সার্কি সুলতানগণের সহিত দিল্লীর লোদীগণের ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু শেষে সার্কিরা পরাজিত হয়। এই সার্কিরা বিহার পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করায় গৌড়ের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা লোদীদের নিকট পরাজিত হওয়ায় গৌড়-বঙ্গের ভীতি দূর হয়। খুলনা জেলার বাগেরহাটে খান্ জাহান নামক একজন মুসলমানের সমাধির উপরিস্থ ৮৬৩ হিঃ (১৪৫৯ খৃঃ।২৬ অক্টোবর) তারিখে একটি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথমে ঐ অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। সুলতান নাসিরউদ্দিনের ৮৪৬ হিঃ (১৪৪২ খৃঃ) মুদ্রার তাঁহার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রা ও পূর্ব্বোক্ত খোদিতলিপি তাঁহার রাজ্যকালের সর্ব্বশেষ লিপি। তাঁহার অনেকগুলি রজতমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রায় মাহমুদাবাদ, নসরতাবাদ ও ফতেহাবাদের নাম আছে। কিন্তু তাঁহার কোন মুদ্রায় ফিরোজাবাদ কি সুবর্ণগ্রামের নাম দৃষ্ট হয় না।

৩৩। রুকনুদ্দিন বার্ব্বকসাহ (১৪৫৯-৭৪খৃঃ)।

নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রুকনুদ্দিন বার্ব্বকসাহ সুলতান হন। পিতার জীবদ্দশায় তিনি সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ার নামক স্থানে ইছমাইলগাজীর সমাধি আছে। তথায় একজন ফকিরের নিকট রিসালৎ-উস্-সুহাদা নামক একখানি পার্শীগ্রন্থ পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থে লিখিত যে ইসমাইল গাজি বার্ব্বকসাহের সেনাপতি। উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া তিনি গড় মান্দারন অধিকার করিয়াছিলেন। কামরূপ রাজ্যও তিনি অক্রমণ করিয়াছিলেন। গেইট সাহেবের আসামের ইতিহাসের (পৃঃ ৮২) মতে ঐ সময় আহম বংশীয় সুফাকৃফার পুত্র সুসেনফা আসামের রাজা ছিলেন (১৮৩৯-৮৮খৃঃ)। ঐ রিসালায় লিখিত আছে, ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের ষড়যন্ত্রে বার্ব্বক সাহ ইসমাইলের প্রানদণ্ড করেন (১৪৭৪। জানুয়ারী=৮৭৮ হিঃ)। ফিরিস্তা বলেন, ওমরাহদের

ক্ষমতা খর্ব্ব করার জন্য বার্ব্বকসাহ প্রায় ৮০০০ হাবসী ক্রীতদাসকে সৈন্যদলে, প্রাসাদরক্ষকের কার্য্যে ও অন্যান্য অনেক উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৮৭৬ হিজরায় (১৪৭১ খৃঃ) তাঁহার শেষ মুদ্রা মুদ্রিত ও ৮৭৯ হিজরাতে (১৪৭৪ খৃঃ জানুয়ারী) তাঁহার রাজ্যকালের শেষ শিলালিপি খোদিত হয়। তবাকাৎ-ই-আকবরী ও তারিখ-ই-ফিরিস্তার মতে তিনি ১৭ বৎসর রাজ্য করিয়া ৮৭৯ হিঃ (১৪৭৪-৭৫ খৃঃ)-তে পরলোকগত হন। বাখরগঞ্জ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁহার রাজ্যকালে ৮৭০ হিঃ (১৪৬৫ খৃঃ) বাখরগঞ্জ জেলার মীর্জ্জাগঞ্জের একটি মসজিদের শিলালিপি হইতে, ৮৬৮ হিঃ (১৪৬৩ খৃঃ) শ্রীহট্ট জেলার হাটখোলায় প্রাপ্ত খুরসেদ খাঁর লিপি হইতে, চট্টগ্রামে অবস্থিত আলাওল খাঁর দরগায় প্রাপ্ত রস্তি খাঁর ৮৭৮ হিঃ (১৪৭৩-৭৪ খৃঃ)-র মসজিদ লিপি হইতে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বার্ব্বকসাহের বহু রজতমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন স্থানের নাম পাওয়া যায় না। সমস্ত মুদ্রাই 'দার-উজ-জরব' (টাকশাল) ও 'খাজনা' (কোষাগার) হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল (Catalogue of Coins in the Indian Museum Vol. II Part II, p. 167-68)।

বার্ব্বকসাহ বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ) রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে গ্রন্থরচয়িতা বর্দ্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম নিবাসী মালাধর বসু গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, গৌড়েশ্বর বার্ব্বকসাহ তাঁহাকে গুণরাজ খাঁ ও তাঁহার পুত্রকে সত্যরাজ খাঁ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন।

৩৪। সমসউদ্দিন ইউসফ (১৪৭৪-৮১ খৃঃ)।

বার্ব্বকসাহের পর তৎপুত্র সমসউদ্দিন ইউসফ সুলতান হন। নিজামউদ্দিন ও ফিরিস্তা উভয়েই বলেন যে, সমসউদ্দিন শিক্ষিত, ধার্ম্মিক ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায় ৮৮২ হিঃ (১৪৭৭ খৃঃ)-তে লিখিত মসজিদের শিলালিপি দৃষ্টে বোধহয় হুগলী জেলায় উড়িষ্যার প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল। মেজর ফ্রাঙ্কলিন মালদহে পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদে একটি শিলালিপি দেখিয়াছিলেন, তদনুসারে ৮৮৫ হিঃ মহরম মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে ইউসফ সাহ কর্ত্তৃক এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল (Ravenshaw's Gour, Its Ruins And Inscriptions p. 55, note)। সমসউদ্দিন ইউসফ সাহের শিলালিপিই শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আরবী শিলালিপি। ইহাতে মনে হয় এই সময়েই শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুরাজা গৌরগোবিন্দ পরাজিত হইয়াছিলেন। ৮৮৬ হিঃ (১৪৮১ খৃঃ)-তে সমসউদ্দিন ইউসফের উত্তরাধিকারী জালালউদ্দিন ফতের মুদ্রা মুদ্রিত হওয়ায় মনে হয় ঐ

বৎসরেই সমসউদ্দিন ইউসফের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময়ে ১৪০২ শকে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা শেষ হয়। "তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥" (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)। ইহার পূর্ব্বে বিজয় পণ্ডিত মহাভারতের আদি হইতে অভিষেক পর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ষোড়শ খৃষ্টাব্দে রচিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী' নামক কুলগ্রন্থে বিজয় পণ্ডিতের পুত্রের কুলপরিচয় লিখিত আছে।

৩৫। জালালউদ্দিন ফত্তা (১৪৮১-৮৭ খৃঃ)

সমসউদ্দিন ইউসফের পর সেকেন্দর নামক তাঁহার এক অর্দ্ধোন্মাদ পুত্র সার্দ্ধ দুইদিন রাজত্ব করিবার পর তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ঐ বংশীয় মামুদের পুত্র হুসেন, জালালউদ্দিন ফত্তা নাম গ্রহণ করতঃ সুলতান হন (১৪৮১-৮৭ খৃঃ)। ফত্তা সাহের (৮৮৬ হিঃ, ১৪৮২ খৃঃ) ফতেহাবাদ হইতে মুদ্রিত রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার আর একটি মুদ্রায় 'মহম্মদাবাদ' নাম দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব হইতেই হাবসীগণ রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাহাদের আধিপত্য এই সময়ে দুর্ব্বার হইয়া উঠে। জালালউদ্দিন ফত্তা তাহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করিলে, প্রাসাদ রক্ষকদের নেতা সুলতান শাজাদা নামক একজন হাবসী খোজা তাঁহাকে হত্যা করে (১৪৮৭ খৃঃ)।

তাঁহার রাজ্যকালের সর্ব্বশেষ শিলালিপির তারিখ ৮৮২ হিঃ ৪ঠা মহরম (১৪৮৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারী)। তাঁহার রাজ্যকালের সোনার গাঁয়ে প্রাপ্ত ৮৮৯ হিঃ মহরম মাসে (১৪৮৪ খৃঃ)র লিখিত লাউড় বা শ্রীহট্ট থানার সরলস্কর কর্ত্তৃক ও সপ্তগ্রামে প্রাপ্ত ৮৯২ হিঃ ৪ঠা মহরম তারিখের ক্ষোদিত লিপিতে সরলস্কর উলুখ মজলিস নূর কর্ত্তৃক মসজিদ নির্ম্মিত হওয়ার কথা থাকায় ঐ ঐ স্থানগুলি তাঁহার রাজ্যভুক্ত থাকা প্রমাণিত হয়।

হাবসী

অতঃপর শাজাদা হাবসী বার্ব্বক সাহ (২য়) নাম গ্রহণ করিয়া সুলতান হন। তিনি প্রায় ৬ মাস রাজতক্তে আসীন থাকার পর মালিক আন্দিল নামক একজন হাবসী সেনাপতি বার্ব্বককে হত্যা করিয়া তাহার প্রভু জালালউদ্দিন ফত্তার

বিধবা পত্নীকে তাঁহার শিশু-পুত্রের পক্ষে সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিধবা মালিক আন্দিলকেই সুলতান করিবার জন্য ওমরাহগণকে অনুরোধ করায় তাঁহারা আন্দিলকেই সুলতান মনোনীত করেন।

৩৬। সইফউদ্দিন ফিরোজ (১৪৮৭-৯০ খৃঃ)

আন্দিল সইফউদ্দিন ফিরোজ সাহ নামে সুলতান হন ১৪৮৭ খৃঃ (৮৯১ হিঃ)। ৮৯২ হিঃ (১৪৮৮ খৃঃ) ৮৯৫ হিঃ (১৪৮৯ খৃঃ) পর্য্যন্ত কালের তাঁহার মুদ্রা পাওয়া যায়। তাঁহার কতকগুলি মুদ্রা ফতেহাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে। গৌড়ের ফিরুজী মিনার তাঁহার নির্ম্মিত।

৩৭। নাসিরউদ্দিন মামুদ (২য়) (১৪৯০-৯১ খৃঃ)

অতঃপর নাসিরউদ্দিন মামুদ (২য়) সুলতান হন (১৪৯০-৯১ খৃঃ)। ফিরিস্তা বলেন নাসিরউদ্দিন মামুদ সইফউদ্দিন ফিরোজ সাহের পুত্র ছিলেন। পরে আরিফ কান্দাহারীর মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন নাসিরউদ্দিন মামুদ জালাল উদ্দিন ফত্তা সার পুত্র ছিলেন। কিন্তু নিজামউদ্দিনের তাবাকাৎ-ই-আকবরীর মতে ইনি সইফউদ্দিন ফিরোজের পুত্র। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে সকল হাবসী এদেশে আনিত হইত তাহারা সকলেই খোজা ছিল।

৩৮। সমসউদ্দিন মজঃফর (সিদি বদর দেওয়ানা) (১৪৯১-৯৩ খৃঃ)

অতঃপর বদর দেওয়ানা নামক একজন হাবসী নাসিরউদ্দিন মামুদ (২য়)কে ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হবস খাঁকে হত্যা করিয়া সমসউদ্দিন মজঃফর সাহ নাম গ্রহণ করতঃ গৌড়ের সুলতান হন (১৪৯১-৯৩ খৃঃ)। সৈয়দ হোসেন মক্কী তাঁহার উজির হন। সমসউদ্দিন মজঃফরের অত্যাচারে গৌড় নগরের অধিবাসীগণ উত্যক্ত হইয়া উঠে এবং অধিকাংশ বিদ্রোহী হইয়া নগর পরিত্যাগ করে। তখন মজঃফর ৫০০০ হাবসী, ১০০০ আফগান ও গৌড়ীয় সৈন্য লইয়া গৌড়ের দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফিরিস্তা বলেন কান্দাহারীর মতে চারিমাসব্যাপী যুদ্ধে উভয় পক্ষে প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার লোক নিহত হয়। শেষে উজির সৈয়দ মক্কী বিদ্রোহী দলে যোগদান করেন। চারিমাস পরে মজঃফর দুর্গের বাহিরে আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন। পরে ফিরিস্তা বলেন, নিজামউদ্দিনের মতে মক্কী প্রাসাদরক্ষকদের সাহায্যে নিশাযোগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মজঃফরকে হত্যা করে। সমসউদ্দিন মজঃফর সাহের রাজ্যকালে ৮৯৮ হিঃ রবিউল আউএল মাসের

১০ তারিখে (১৪৯২ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর)এ মজলিস উলুখ মোরসেদ একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিলালিপি স্থাপন করে। ইহাই তাঁহার রাজত্বকালের শেষ শিলালিপি।

হোসেন সাহী বংশ

১। আলাউদ্দিন হোসেন সাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ)

সমসউদ্দিন মজঃফর সাহ নিহত হইলে গৌড়ের প্রবীণগণ সৈয়দ হোসেনকে স্থলতান করিলেন। তিনি আলাউদ্দিন হোসেন সাহ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করতঃ ন্যায় পথে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ৮৯৯ হিঃ জিলকাদা মাসের ১০ তারিখে (১৪৯৪ খৃঃ ১২ আগষ্ট) হোসেন সাহের রাজ্যকালে মজলিস্ বাহাতুল্লার নির্ম্মিত একটি মসজিদে যে শিলালিপি সংযুক্ত ছিল তাহাই হোসেন সাহের রাজ্যকালের প্রথম শিলালিপি। এই শিলালিপিটি মালদহে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হোসেন সাহের পূর্ব্বপরিচয় সঠিক জানা যায় না। জ্যাও ডি বারোশ বিরচিত "দা এশিয়া" নামক গ্রন্থে একটি বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, পর্ত্তুগিজগণ জোয়াও ডি সিলভিরোর নেতৃত্বে ১৫১৭ খৃঃ চট্টগ্রামে পৌছেন। ইহার পূর্ব্বে এডেন বাসী জনৈক আরব দুইশত সঙ্গীসহ একটি জাহাজে আরোহণ করিয়া চট্টগ্রাম বন্দরে উপনীত হন। কালক্রমে তিনি গৌড়ের প্রাসাদ রক্ষক নিযুক্ত হন এবং প্রভুহত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

ব্লকম্যান মনে করেন এই এডেন বাসী আরব ফিরিস্তা বর্ণিত সৈয়দ হোসেন মক্কী। রাঢ়দেশে মুর্শিদাবাদজেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় এক আনি চাঁদ পাড়া নামে গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি স্থবৃহৎ পুরাতন মসজিদ ও ইহার নিকটে আলাউদ্দিন হোসেন সাহের রাজ্যকালের বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে হোসেন সাহ ও তাঁহার পিতা আসরফ-উল-হোসেনী এদেশে আসিয়া এই চাঁদ পাড়া গ্রামে চাঁদ কাজির গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কাজি হোসেনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাসের শ্রী চৈতন্য ভাগবতে (১৫৩৫ খৃঃ) লিখিত আছে, হোসেন সাহ স্থবুদ্ধিরায় নামক রাজস্ব বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হন। একটি

পুষ্করিণী খননের পরিদর্শন কার্য্যে ত্রুটি হওয়ায় সুবুদ্ধিরায় তাঁহাকে বেত্রদণ্ড দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে সুলতান হইয়া স্ত্রীর আগ্রহে তিনি সুবুদ্ধিরায়ের জাতি ধ্বংস করেন। কিন্তু সুবুদ্ধিরায় চৈতন্য দেবের অনুগ্রহে হরিনাম জপ করিয়া শুদ্ধ হন। ৮৯৯ হিঃ (১৪৯৩ খৃঃ) তে মুদ্রিত হোসেন সাহের একটি রজতমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ৯২৫ হিঃ ১৫ সাবন তারিখে (১৫১৯।১২ আগষ্ট) হোসেন সাহের রাজ্য কালে মোল্লাহিজবর আকবর খাঁ সুবর্ণগ্রামে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

হোসেন সাহের স্বর্ণমুদ্রাগুলি কোষাগার ও মুয়াজ্জমাবাদ হইতে ও রজত মুদ্রাগুলি হোসেনাবাদ, মহম্মদাবাদ, মুয়াজ্জমাবাদ, ফতেহাবাদ, ও কোষাগার হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। গৌড় বঙ্গ ও মগধের নানা স্থান হইতে হোসেন সাহের রাজ্যকালের মসজিদের বহু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। কথিত আছে হোসেন সাহ সুলতান হইয়া তাঁহার সেনাদিগকে গৌড় নগর লুণ্ঠন হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন এবং হাবসীদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বহুকালব্যাপী বিরোধের পর এই সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা মিলনের ভাব দেখা দিয়াছিল এবং অনেক হিন্দু উচ্চরাজপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গোপী নাথ বসু (পুরন্দর খাঁ) হোসেন সাহের উজির ছিলেন। রূপ ও সনাতন নামক ভ্রাতৃদ্বয় উচ্চরাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রাতা অনুপ টাকশালাধ্যক্ষ, সনাতন হোসেন সাহের দবীর খাস ছিলেন ও রূপ সাকর মল্লিক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৪৮৪ খৃঃ সনাতন ও ১৪৯০ খৃঃ রূপের জন্ম এবং ১৫৫৮ খৃঃ সনাতনের ও ১৫৬৩ খৃঃ রূপের মৃত্যু হয়। শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দাস হোসেন সাহের চিকিৎসক এবং কেশব বসু (কেশব ছত্রী) দেহরক্ষী সেনাপতি ও গৌরমল্লিক অন্যতম সেনাপতি ছিলেন (চৈতন্যভাগবত)। এই সময়ের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা শ্রী চৈতন্যদেবের ভাগবৎ ধর্ম্ম প্রচার। ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে (১৪৮৬ খৃঃ) সুলতান জালালউদ্দিন ফত্তাসাহের রাজ্যকালে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব ও অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ বয়সে আষাঢ়ের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে রবিবারের তৃতীয় প্রহরে ১৪৫৫ শকাব্দে (জুলাই ১৫৩৩ খৃঃ) পুরীতে তাঁহার তিরোভাব হয়। (চৈতন্য চরিতামৃত)।

দিল্লীর সুলতান সেকেন্দরলোদী ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের সুলতান হুসেনকে কাশীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলে জৌনপুর-সুলতান গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই কারণে ১৪৯৫ খৃঃ প্রথমে গৌড়রাজ্যের সীমান্তের অদূরে দৌলতাবাদে দিল্লীর সৈন্যদল উপস্থিত হয়। কিন্তু অবশেষে লোদীসেনা-

নায়ক মামুদ লোদী ও মোবারক লোহানির চেষ্টায় উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। এই সন্ধিসূত্রে দিল্লী ও গৌড়রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়া যায়।

কমতাপুরের তৃতীয় খেন রাজা নীলাম্বর ঘোড়াঘাট পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করায় হোসেন সাহ কমতাপুরের বিরুদ্ধে সেনাপতি ইসমাইল গাজীকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। প্রায় দ্বাদশ বৎসর কমতাপুর অবরুদ্ধ রাখিবার পর কমতাপুর অধিকৃত হয়, কিন্তু নীলাম্বর পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। হুসেনের পুত্র দানিয়েল কমতাপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন (১৪৯৯ খৃঃ)। ১৫০২ খৃষ্টাব্দের মালদহের একখানি শিলালিপিতে হুসেন সাহের এই বিজয়ের উল্লেখ আছে। সুলতানজাদা দানিয়েল ১৪৯৮ খৃঃ পর্য্যন্ত মুঙ্গেরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মুঙ্গের দুর্গের প্রাচীরে নিকটে একটি দরগার প্রাচীরে ৯ ৩ হিঃর (১৪৯৮ খৃঃ) একটি লিপিতে দানিয়েলের নাম আছে।

অতঃপর হুসেন সাহের সৈন্যগণ দানিয়েলের নেতৃত্বে কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল। কামরূপরাজ সুহঙ্গ-মুঙ্গ আসামের শৈলমালায় আশ্রয় লন। পরে বর্ষা আরম্ভ হইলে পাহাড় হইতে নামিয়া প্লাবন পীড়িত মুসলমান সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলেন। এই যুদ্ধে দানিয়েল নিহত হন।

উড়িষ্যার যুদ্ধ। হুসেন সাহের ৯১০ হিঃ (১৫০৪-০৫ খৃঃ)র মুদ্রায় কামরূপ-কামতা ও জাজনগর (উড়িষ্যা) বিজয়ের কথা মুদ্রিত আছে। মাদলা পঞ্জীর মতে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপরুদ্র রাজধানী হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় গৌড়ের মুসলমান সেনাপতি ইসমাইল গাজী পুরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অনেকগুলি মন্দির ধ্বংস করেন, কিন্তু প্রতাপরুদ্র পুরীতে আগমন করিলে ইসমাইল গাজী মান্দারণ দুর্গে সরিয়া যান এবং তথায় যুদ্ধ চলিতে থাকে। প্রতাপরুদ্র মান্দারণ দুর্গ অবরোধ করেন কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক তাঁহার একজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অবরোধ উঠাইয়া লইতে হয়। ১৫২৬ খৃঃ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার স্থানে স্থানে গোলযোগ চলে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে শ্রীচৈতন্যের উৎকল যাত্রার পথের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য গদাধর, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের সহিত উৎকল যাত্রা করেন[১]। গঙ্গাতীরে ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ ঘাটে গমন করিলে

১। শ্রীচৈতন্য ১৫০৯ খৃঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। অনুমান ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি পুরী হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন গৌড় ও উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। পুরী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার সহিত

তথাকার গ্রামপতি রামচন্দ্র খাঁ শ্রীচৈতন্তকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করেন।

... ... হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে আশু বলি লয় প্রাণে॥"

চৈতন্তভাগবত

শান্তিপুরেও ভক্তগণ তাঁহাকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—

"তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সেরাজ্যে এখানে কেহ পথ নাহি বয়॥
দুই রাজার হইয়াছে অত্যন্ত বিপদ।
মহাযুদ্ধে স্থানে স্থানে পরাণ প্রমাদ॥ (চৈতন্তভাগবত)

ত্রিপুরার যুদ্ধ। সুবর্ণগ্রামে কানিংহাম সাহেব হোসেন সাহের রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহা হইতে জানা যায় ৯১৯ হিঃ, রবিউল সানি মাসের ২ তারিখে (১৫১২ খৃঃ ৭ই জুন) ত্রিপুরার শাসনকর্ত্তা ও ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদের উজীর খাওয়াস খাঁ কর্ত্তৃক একটি মস্জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে ত্রিপুরার কিয়দংশ হোসেন সাহের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরার ইতিহাস (রাজমালা) দৃষ্টে জানা যায় হোসেন সাহের সৈন্যদল গোমতী নদীর পশ্চিম তীর হইতেই পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় অভিযানে গৌড়ের সেনাপতি গৌরমল্লিক মেহেরকুল দুর্গ অধিকার করেন এবং ত্রিপুরার সেনাপতি রায় চৈচাগ পার্ব্বত্য অঞ্চলে সোনামাটিয়া দুর্গে আশ্রয় লয়। অতঃপর গৌরমল্লিক ত্রিপুরার রাঙ্গামাটি অভিমুখে অগ্রসর হন কিন্তু গোমতী নদীর শুষ্ক খাত অতিক্রম করিবার সময় কতিপয় মাইল উজানে বাঁধ বাঁধিয়া ধরিয়া রাখা জলরাশিকে ছাড়িয়া দিয়া রায় চৈচাগ গৌরমল্লিককে সসৈন্যে ডুবাইয়া মারিতে সক্ষম হন। হোসেন সাহের তৃতীয় অভিযানের সেনাপতি হাতিয়ান খাঁর ভাগ্যেও ঐরূপ বিপর্যয় ঘটে। অবশেষে হোসেন সাহ স্বয়ং চতুর্থবার অভিযান করেন। এবার তিনি ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার

সনাতনের সাক্ষাৎ হয়। কিছুকাল পর সনাতন হোসেন সাহের সহিত উড়িষ্যা অভিযানে যাইতে অস্বীকার করায় বন্দী হন। চৈতন্ত অতঃপর বৃন্দাবনে যান। তথা হইতে কাশীতে আসিলে সনাতনের সহিত তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয় (১৫১৬ খৃঃ)।

করিতে সক্ষম হন। এই সময় ধন্য মাণিক্য ত্রিপুরার অধীশ্বর ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৫১২ খৃঃ ৭ই জুনের পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। কারণ উক্ত তারিখে ত্রিপুরার শাসনকর্ত্তা ও ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদের উজীর খাওয়াস খাঁ মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

হোসেন সাহ পরাগল খাঁ নামক লস্করকে চট্টগ্রামে জায়গীর দান করিয়াছিলেন। এই পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত পয়ারে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

"নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করী বিষয় পাই আউবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেলা হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে মহামতি।
পুরাণ শুনত নিতি হরষিত মতি॥"

১৪১৭ শকে (১৪৯৫ খৃঃ) বিপ্রদাস মনসামঙ্গল রচনা করেন।

মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
... ...
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসারে॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ে সুলক্ষণ॥"

যশোরাজ খাঁর একটি গানে শ্রদ্ধার সহিত হোসেন সাহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। "শ্রীযুত হুসন, জগত ভূষণ, সেহ এহি রস জানে।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে হোসেন সাহ উদার মতাবলম্বী ছিলেন। দীক্ষার পর চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে উপস্থিত হইলে হোসেন সাহ স্বীয় শরীর রক্ষক কেশব ছত্রী (কেশব বসু)কে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন—

"সর্ব্বলোকে লইয়া সুখে করুন কীর্ত্তন।
কি বিরলে থাকুন, যেথা লয় তাঁর মন॥
কাজি বা কোটাল তাঁকে কোন জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥"
(বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, আদিলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ)

উত্তর-পশ্চিমে সারণ ও বিহার, দক্ষিণ-পূর্ব্বে শ্রীহট্ট ও চাটিগাঁ, উত্তর-পূর্ব্বে কামতা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গড়মান্দারণ ও চব্বিশপরগণা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল। তিনি সেকালে হিন্দু মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

৯২৫ হিজরায় (১৫১৯ খৃঃ) মুদ্রিত হোসেন সাহের পুত্র নাসির উদ্দিন নসরৎ সাহের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব ১৫১৯ খৃষ্টাব্দেই বোধহয় হোসেন সাহের মৃত্যু হইয়াছিল।

২। নাসিরউদ্দিন আবুল মজঃফর নসরৎ সা (১৫১৯-৩২ খৃঃ)

নাসিরউদ্দিন পিতার জীবদ্দশাতেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ সময় ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রা মুদ্রিত করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর ১৫১৯ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাগণের প্রাণ সংহার না করিয়া তাহাদের পদবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নসরৎ সাহ কর্ত্তৃক তীরভুক্তির হিন্দুরাজ্য বিজিত হইয়াছিল এবং তাঁহার আদেশে তাঁহার ভগ্নীপতিদ্বয় মখ্‌দুম আলম ও আলাউদ্দিন সমগ্র তীরভুক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর সঙ্গমস্থলে হাজিপুরে স্কন্দাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। চাগ্‌তাই মুঘল বংশীয় জহীর উদ্দিন মহম্মদ বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিলে বহুসংখ্যক পাঠান গৌড়রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদীর অধীনে মুঘলদের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

মোগল-পাঠানের যুদ্ধে নসরৎ সাহ নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেন। বাবর জৌনপুর রাজ্য অধিকারে ব্যস্ত থাকায় মামুদ লোদী চুণার দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অপরদিকে বাবরের সৈন্যগণ জৌনপুর রাজ্য জয় করিয়া বিহারের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাবরের আগমন সংবাদে মামুদ লোদীর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ণ করিল। তখন বহুমূল্য উপহার-সহ দূত প্রেরণ করিয়া নসরৎ সাহ বাবরের সহিত সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। ইতিমধ্যে বাবর তীরভুক্তি অধিকার করিয়া গঙ্গা ও গণ্ডকীর সঙ্গমস্থলে পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া (.৫২৮ খৃঃ) নসরৎ সাহের সহিত সন্ধি করা স্থির করিলেন। শের খাঁ শূরও দক্ষিণ বিহারে মোগলদের অধীনে জায়গীর গ্রহণ করিলেন। অবস্থা দেখিয়া লোদীরাও মোগলদের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হইল।

পাঠানদিগকে ভগ্নোদ্যম দেখিয়া নসরৎ সাহ সের খাঁ ও লোহানিদিগকে

গোপনে সাহস দিয়া মামুদ লোদীর সহিত পুনরায় একত্রিত করিয়া বাবরের সহিত যুদ্ধ করাইতে উৎসাহিত করিলেন। ১৫২৯ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মামুদ লোদী ও সের খাঁ শূর গঙ্গার দুই তীর দিয়া চুণার ও কাশী অভিমুখে এবং বিবন ও বায়াজিদ লোহানি উত্তর দিকে ঘর্ঘরা পার হইয়া গোরক্ষপুরের দিকে অভিযান সুরু করিলেন। নসরৎ সাহের গোপন আদেশে কুতুব খাঁর অধীনে অপর একদল সৈন্য লক্ষ্ণৌএর পথে অগ্রসর হইল। পরিকল্পনা অনুসারে সের খাঁ কাশী অধিকার করিলেন। কুতুব খাঁ অনেকগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। বিবন ও বায়াজিদ সারণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু মামুদ লোদী বাবরের আগমনের সংবাদে কোন যুদ্ধ না করিয়াই মহোবার দিকে পলায়ন করায় নসরৎ সাহের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল। বাবর বিবন ও বায়াজিদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঘর্ঘরার দিকে অগ্রসর হইলেন। সের খাঁ ও অধিকাংশ পাঠান মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিল। হাজিপুরে মকদুম-ই-আলমের অধীনে নসরৎ সাহের সৈন্যদল অবস্থান করিতেছিল। ১৫২৯ খৃঃ এপ্রিল মাসে বক্সার শিবির হইতে বাবর নসরৎ সাহের নিকট সন্ধির নিয়মাবলী পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে তিনি ঘর্ঘরা উত্তীর্ণ হইবার জন্য সহায়তা চাহিলেন। কিন্তু এক মাসের মধ্যেও কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঘর্ঘরা তীরে তিনদিন যাবৎ যুদ্ধ হইল। পাঠান সৈন্যদল পরাজিত হইল। বাবর ঘর্ঘরা পার হইয়া সারণে উপস্থিত হইলেন। অন্যতম পাঠান সেনাপতি জালাল বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। অবশেষে নসরৎ সাহ বাবরের সর্ত্তানুযায়ী সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৫২৯খৃঃ)। ১৫৩০ খৃঃ বাবরের মৃত্যু হওয়ায় নসরৎ সাহের গোপন উৎসাহে পুনরায় পাঠানেরা মামুদ লোদীর অধীনে দলবদ্ধ হইল। সের খাঁও তাহাদের সহিত যোগ দিল। ১৫৩১ খৃঃ জুন মাসে পাঠানেরা বিহার হইতে অগ্রসর হইয়া জৌনপুর অধিকার করতঃ লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু দাদ্রার যুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণ পরাভূত হইল এবং বিবন ও বায়াজিদ নিহত হইল। সের খাঁ বশ্যতা স্বীকার করিয়া চুণার দুর্গ লাভ করিল। গুজরাটের শাসনকর্ত্তা বাহাদুরের বিদ্রোহ সংবাদে হুমায়ুন সেই দিকে চলিয়া গেলেন। গৌড়রাজ্যে মোগলভীতি আপাততঃ তিরোহিত হইল [১]।

আসাম যুদ্ধ। মোগলভীতি তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু ১৫২৯ খৃঃ আহম

১। মামুদ লোদীর ৯৪৯ হিঃ (১৫৪২ খৃঃ) মৃত্যু হয়।

রাজ সুহুঙ্গ মুঙ্গ মুসলমানদের কোচ হাজোতে যে প্রধান শিবির ছিল তাহা আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে একদল সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইয়া নারায়ণপুরে সেনানিবাস স্থাপন করিল। দুই বৎসর পর ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ৫০ খানি যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া মুসলমান সেনা আহম রাজের দরঙ্গ জেলা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তেমোহানী নামক স্থানের যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হইল ও তাহাদের সেনাপতি অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করিল। আহমগণ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে ও উত্তরে গলা ও শিংরী নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিল।

শিংরীতে আহম সেনাপতি বড়পাত্র গোঁহাই পুনরায় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত ও তাহাদের সেনাপতি বিদ্ মালিক নিহত হইয়াছিল এবং আহমগণ খাজারিজান (নওগাঁ) পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। বহু কামান ও বন্দুক ও ৫০টি অশ্ব আহমগণের হস্তগত হইয়াছিল।

নাসিরউদ্দিন নসরৎ সাহ অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ও অত্যাচারী ছিলেন। ১৫৩২ খৃঃ একদিন গৌড়ে তাঁহার পিতার সমাধি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী একজন খোজা ক্রীতদাস এই সময় বিশেষ অপরাধ করায় তিনি তাহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন। নসরৎ সাহ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই খোজা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যান্য খোজার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

তিনি দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে নিরপেক্ষনীতি অবলম্বন করিয়া যেভাবে গোপনে পাঠানদিগকে মোগলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিযুক্ত রাখিয়া গৌড় রাজ্যকে মোগলের আক্রমণ হইতে নিরাপদে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার রাজ্যকালে বহু মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৯৩৮ হিঃ (১৫৩১-৩২ খৃঃ)তে মালদহে চালসাপাড়া নামক স্থানে তিনি একটি ইন্দারা খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার বহু রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল মুদ্রা নসরতাবাদ, ফতেহাবাদ (ফরিদপুর), হোসেনাবাদ (সপ্তগ্রাম), খলিফাবাদ (দক্ষিণ যশোর), মহম্মদাবাদ (উত্তর যশোর) ও টাকশাল হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় বঙ্গ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন—

" ... ... নসরৎ খাঁন।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান॥"

এই সময় হোসেন সাহের চট্টগ্রামের সেনাপতি পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকরনন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের বঙ্গানুবাদ রচনা করেন।

৩। আবুল বদর (১৫৩২ খৃঃ)

৪। আলাউদ্দিন ফিরোজ (১৫৩২-৩৩ খৃঃ)

৫। গিয়াসুদ্দিন মামুদ (১৫৩৩-৩৮ খৃঃ)

নসরৎ সাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল বদর (মামুদ) ৯৩৩ হিঃ (১৫২৬ খৃঃ) ফতেহাবাদ ও নসরতাবাদ হইতে মুদ্রাপ্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে "বদর সাহী" কথাগুলি খোদিত আছে। তিনি নসরৎ সাহের রাজ্যকালেই আমীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর বিহারের শাসনকর্ত্তা মকদুম নসরৎ সাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন। তিনি কতিপয় মাস মাত্র রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার কালনায় প্রাপ্ত একটি খোদিত লিপি (১৫৩৩ খৃঃ ২৭ শে মার্চ্চ) ও কতিপয় মুদ্রা ব্যতীত তাঁহার রাজ্য কালের আর কোন নিদর্শন নাই। তাঁহার আদেশে কবি শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত আবুল বদর তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া (১৫৩৩ খৃঃ) গিয়াসুদ্দিন মামুদ নাম গ্রহণ করেন।

আলাউদ্দিন ফিরোজের হত্যার সংবাদে উত্তর বিহারের (মিথিলা) শাসনকর্ত্তা মকদুম বিদ্রোহী হইলেন। গিয়াসউদ্দিন মুঙ্গেরের শাসনকর্ত্তা কুথবখাঁকে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মকদুমকে দমন করিতে প্রেরণ করিলেন। এই কার্য্যে লোহানিরা গিয়াস-উদ্দিনের সমর্থক হইল। কিন্তু সেরখাঁ মকদুমের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং কুথবখাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া বহু ধন সম্পত্তি হস্তগত করিলেন। গিয়াস-উদ্দিন পুনরায় মকদুমের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। মখদুম যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে সেরখাঁর নিকট তাঁহার বহু ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধে মখদুম পরাজিত ও নিহত হওয়ায় সেরখাঁ মখদুমের সমস্ত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইলেন। এইরূপে বহু অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সেরখাঁ প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠিলে বিহারের শাসনকর্ত্তা জালাল লোহানি সেরখাঁর এই বলবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া প্রকাশ্যে গিয়াস উদ্দিন মামুদের সহিত যোগ দিয়া সেরখাঁকে দমন করিতে চেষ্টিত হইলেন। ১৫৩৪ খৃঃ গিয়াসউদ্দিন কুথব খাঁর পুত্র ইব্রাহিম খাঁ ও জালাল খাঁ লোহানির অধীনে একটি প্রকাণ্ড সৈন্যদল সেরখাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সেরখাঁ সুরজ গড় দুর্গে এক মাস কাল অবস্থান করিয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিলেন। এই সুরজ গড় দুর্গ তিনদিকে গঙ্গা, কিউলনদী ও খড়্গপুর পর্ব্বতমালা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

একমাস পর সের খাঁ দুর্গ হইতে বাহিরে আসিয়া শত্রু সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। সকালবেলা দেখা গেল গিয়াসউদ্দিনের বিপুল বাহিনী সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছে, ইব্রাহিম খাঁ নিহত হইয়াছেন ও জালাল লোহানি দ্রুত বেগে পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে সেরখাঁর প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। সের খাঁ ভাগলপুর পর্য্যন্ত নিজরাজ্য ভুক্ত করিয়া লইলেন। ১৫৩৫ খৃঃ হুমায়ুন গুজরাটের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায়, সেরখাঁ নিশ্চিন্ত মনে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। গিয়াসউদ্দিন তাঁহাকে সিক্রিগলি (তেলিয়াগড়)তে বাধাদিতে প্রস্তুত হইলেন। সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য দেখিয়া সেরখাঁ তাঁহার পুত্র জালাল খাঁকে একদল সৈন্যসহ তেলিয়াগড়ে রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্যসহ তিনিই সর্ব্বপ্রথম অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঝাড়খণ্ডের দুর্গম পথের মধ্যদিয়া অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ গৌড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেরখাঁর এই রণ কৌশলে বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াসউদ্দিন দ্রুতগতি তাঁহার সৈন্যদলকে তেলিয়াগড়ী হইতে অপসারণ করিয়া রাজধানী রক্ষার্থ উদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু অবশেষে যুদ্ধ করিতে সাহসী না হইয়া সের খাঁকে তেরলক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রা দিয়া সন্ধি করিলেন। সন্ধিসূত্রে সের খাঁ তেলিয়াগড়ী পর্য্যন্ত নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন (৯৪৩ হিঃ, ১৫৩৬ খৃঃ)। সিক্রিগলির মণ্ডলা দুর্গ সের খাঁর অধিকারে চলিয়া যাওয়ায় গিয়াসউদ্দিন সশঙ্ক চিত্তে গৌড়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় থাকা নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া ১৫৩৭ খৃঃ চট্টগ্রামে পর্ত্তুগিজগণের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন[১]। পর্ত্তুগিজেরা জানাইলেন যে পরবৎসর সাহায্য পাঠাইবেন। এই সময় হুমায়ুন আগ্রায় বাস করিতেছিলেন। তৎসত্ত্বেও সের খাঁ তেলিয়াগড়ীর পথে গৌড়ে উপস্থিত হইয়া গৌড় দুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন। হুমায়ুন ইহা জানিতে পারিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া গঙ্গা তীরে পর্ব্বত শীর্ষে অবস্থিত চুণার দুর্গ অবরোধ করিলেন। সের খাঁ তাঁহার সেনাপতি খাওয়াস খাঁ ও জালালকে গৌড়ে রাখিয়া স্বয়ং দ্রুতগতি চুণারে উপস্থিত হইলেন এবং

১। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা কুনহা পাঁচখানি জাহাজে ৫০০ জন পর্ত্তুগীজ সৈন্য চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। তাহাদের নেতা জুসার্ত্তে তাঁহার কয়েকজন অনুচরকে বহুমূল্য উপঢৌকনসহ গৌড়ে গিয়াসউদ্দিন মামুদের নিকট প্রেরণ করিলে গিয়াসউদ্দিন তাহাদিগকে বন্দী করেন এবং তাঁহার আদেশে চট্টগ্রামে জুসার্ত্তে ও তাহার ৩০ জন অনুচর ধৃত হইয়া গৌড়ে প্রেরিত হয়। আফগানগণের সহিত যুদ্ধে এই পর্ত্তুগীজগণ গিয়াসউদ্দিনকে সাহায্য করিলে গিয়াসউদ্দিন তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

তাঁহার পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি নিরাপদ স্থানে অপসারিত করিয়া চুণারের রক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিলেন। উভয়স্থানের অবরোধ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল। অবশেষে চুণার রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া সের খাঁ গৌড় জয়ের জন্য অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া গিয়াসউদ্দিন মামুদ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া বিপক্ষগণকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইয়া কতিপয় অনুচর সহ হুমায়ুনের সাহায্যের আশায় উত্তর বিহারের দিকে পলায়ন করিলেন। সের খাঁর সৈন্যগণ গৌড় অধিকার করিয়া লইল (৯৪৪ হিঃ ৬ই জিলকাদ, ১৫৩৮ খৃঃ ৬ই এপ্রিল)।

অপরদিকে ছয় মাস অবরোধের পর হুমায়ুন চুণার অধিকার করিয়া গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মনারের নিকটে দরবেশপুরে পলায়মান গিয়াস উদ্দিনের সহিত হুমায়ুনের সাক্ষাৎ হইল। ইত্যবসরে সের খাঁ রোটাসগড় হইতে ৫০০ সৈন্য লইয়া হুমায়ুনকে অতিক্রম করিয়া ২ দিনে গৌড়ে পৌঁছিলেন এবং তেলিয়া গড়ী রক্ষার্থ হাজি খাঁ ও জালাল খাঁকে প্রেরণ করিলেন। সের খাঁ গৌড়ে আসিয়া নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত করিলেন এবং হস্তী, অশ্ব, ও অশ্বতরের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া নয়কোটি সুবর্ণমুদ্রা মূল্যের ধন সম্পত্তি লইয়া পুত্র জালাল খাঁ সহ রোটাস দুর্গে চলিয়া গেলেন। এদিকে হুমায়ুন ও গিয়াসউদ্দিন মামুদ কহল-গাঁয়ে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া গিয়াসউদ্দিন শুনিতে পাইলেন যে সের খাঁর লোকেরা তাঁহার পুত্রদ্বয়কে হত্যা করিয়াছে। এই সংবাদে সুলতান গিয়াসউদ্দিন মর্ম্মাহত হইয়া শীঘ্রই পরলোকে গমন করিলেন (১৫৩৮ খৃঃ)। অতঃপর হুমায়ুন তেলিগা গড়ে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সের খাঁর সৈন্যদল সরিয়া গেলে হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করিলেন। গৌড়ে হুমায়ুনের নামে খুদবা পঠিত ও মুদ্রা মুদ্রিত হইল। হুমায়ুন তিন মাস গৌড়ে অবস্থান করিয়া বর্ষারম্ভে গৌড় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি গৌড়ের নাম পবিবর্ত্তন করিয়া জিন্নতাবাদ রাখিলেন।

গিয়াসউদ্দিন মামুদের অনেকগুলি সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি হোসেনসাহী বংশের শেষ সুলতান।

হুমায়ুন যখন গৌড়ে বিলাসে কালযাপন করিতেছিলেন, সেই সময় সের খাঁ দক্ষিণ বিহার অধিকার করিয়া লইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ কাশী হইতে বরৈচ পর্য্যন্ত মোগল রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সের খাঁর অশ্বারোহী সৈন্যগণ গৌড়সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ইয়াকুব বেগের অধীনস্থ ৫০০০ মোগল সৈন্যের একটি বাহিনীকে পরাস্ত করিল। কিন্তু বায়াজিদ তাহাদিগকে

তাড়াইয়া দিল। এই সময় হুমায়ুনের ভ্রাতা মীর্জ্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহী হইলেন। তাঁহার অপর ভ্রাতা মীর্জ্জা আস্কারীর সৈন্যগণ বেতন বৃদ্ধির দাবী করিতে লাগিল। এই সব কারণে হুমায়ুন বাধ্য হইয়া জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ গৌড়ের শাসনভার দিয়া জুলাই মাসে গৌড় ত্যাগ করিলেন এবং মুঙ্গেরে তাঁহার সেনাপতি আস্কারীর সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর তিনি গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরিয়া মনের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। সাহাবাদ জেলায় উপস্থিত হওয়ামাত্র সের খাঁর সৈন্যগণ তাঁহাকে ক্রমাগত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে হুমায়ুন যখন বক্সারের ৪ মাইল পশ্চিমে কর্ম্মনাশা নদীর পূর্ব্ব তীরে চৌসা নামক স্থানে পৌঁছিলেন, সের খাঁ স্বয়ং তাঁহার পথরোধ করিতে অগ্রসর হইয়া দুই মাইল দূরে থেরো নদীর পূর্ব্বতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে জৌনপুর, চুণার ও অযোধ্যার সৈন্যাধ্যক্ষ বাবা বেগ, মিরাক বেগ ও মুঘল বেগ হুমায়ুনের সাহায্যার্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সের খাঁ হুমায়ুনকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না এবং কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া হুমায়ুনের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে হুমায়ুন যদি সের খাঁকে গৌড়-বঙ্গের আধিপত্য ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিনি হুমায়ুনের অধীনে উহার শাসনভার লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন। হুমায়ুন খাদ্যাভাবে পীড়িত হইয়া ও ভ্রাতাদের নিকট হইতে কোন সাহায্যের আশা না পাইয়া সের খাঁর এই সন্ধি প্রস্তাবে মোটামুটি সম্মত হইলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপিত হওয়ায় উভয় শিবিরের মধ্যে যাতায়াত, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ও পান ভোজন চলিতে লাগিল। এইরূপে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া সের খাঁ একদিন মহন্তর নামক তথাকার চের জাতির অধিপতিকে আক্রমণ করিবার ছলে দুইদিন শিবির হইতে সসৈন্যে বহির্গত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং তৃতীয় দিন অতর্কিত ভাবে মোগল শিবির আক্রমণ করিলেন। মোগল সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই আক্রান্ত হইয়াছিল। শত্রুপক্ষের একটি হস্তী হুমায়ুনের বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহার দেহরক্ষী গুর্গ আলি ও টট্টবেগ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। হুমায়ুন টট্টবেগের হস্ত হইতে বর্শা কাড়িয়া লইয়া হস্তীকে তদ্দ্বারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আফগানগণের ভীষণ আক্রমণে সমস্ত শিবির হইতে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল। এই শিবিরে হুমায়ুনের পরিবারবর্গ ও ১৭০০০ ভৃত্য ছিল। হুমায়ুনের বেগম চারিসহস্র মোগল কুলবধূ সহ শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছিল এবং শিবিরের সমস্ত ধন রত্ন ও অস্ত্র শস্ত্র সের খাঁর হস্তগত হইয়াছিল। নৌ সেতু ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বহু মোগল জলমগ্ন

হইয়াছিল। আবুল ফজলের মতে ৮০০০ মোগল মীর্জ্জা মহম্মদ জমান ও মৌলানা জালালসহ ডুবিয়া মরিয়াছিল। সম্রাট স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠ হইতে গঙ্গাজলে ঝম্প প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং নিজাম নামক একজন ভিস্তি তাহার মশকের সাহায্যে গঙ্গার অপর তীরে পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দের সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসে বক্সার ও চৌসার মধ্যবর্ত্তী ছাপড়াঘাট নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে। কৃতজ্ঞ সম্রাট পরে উক্ত ভিস্তিওয়ালাকে তাঁহার হীরক খণ্ড ছয়ঘণ্টার জন্য ধারণ করিতে দিয়াছিলেন। অতঃপর হুমায়ুন কনৌজে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ও মোগল রমণীগণ সের সাহ কর্ত্তৃক রোটাস গড়ে প্রেরিত হইয়াছিল।

হুমায়ুন কনৌজ হইতে আগ্রায় চলিয়া গেলে সের খাঁ গৌড়ের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। গৌড়ে তখন মোগল শাসনকর্ত্তা জাহাঙ্গীর কুলি বাস করিতে ছিলেন। সের খাঁ সিক্রিগলীতে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত করিলেন এবং তাঁহার পুত্র জালাল খাঁ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ সুরু করিলেন। জাহাঙ্গীর কুলি কিছুদিনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল এবং অনুচরগণ সহ নিহত হইল। গৌড় অধিকার করিবার পর গৌড়-বঙ্গের অন্যান্য অংশও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। চট্টগ্রাম তখনও সৈয়দ মাসুদ সা, খুদাবক্স খাঁ ও মীর্জ্জা খাঁ পোর্ত্তুগীজদের সাহায্যে অধিকারে রাখিয়াছিল। নওয়াজিস খাঁ নামক সের খাঁর একজন সেনানী তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লইল। পোর্ত্তুগীজ পোতাধ্যক্ষ সম্পায়ো পেগুতে চলিয়া গেল।

এইরূপে গৌড়, সোরিফাবাদ, সাতগাঁ ও চট্টগ্রামে সের খাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি গৌড়-বঙ্গ ও বিহার মোগলশূন্য করিয়া ৯৪৬ হিজরায় (১৫৩৯ খৃঃ) ফরিদউদ্দিন আবুল মজঃফর সের সাহ নাম ধারণ পূর্ব্বক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৫৩৯-৪৫ খৃঃ ৫ই মে)।

শূর বংশ (১৫৩৮-৬৪ খৃঃ)

১। সের সাহ শূর (১৫৩৮-৪৫ খৃঃ)

পরবৎসর খিজির খাঁকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া সেরসাহ আগ্রা অভিমুখে অভিযানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি ইশাখাঁকে মালব ও গুজরাটে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া ছিলেন এবং পরে তাঁহার পুত্র কুতব খাঁ তথায় প্রেরিত

হয়। হুমায়ুনও তাঁহার ভ্রাতা হিন্দাল ও আস্করীকে চন্দেরী দুর্গে প্রেরণ করেন। হিন্দাল ও আস্করীর সহিত যুদ্ধে কুতব খাঁ পরাজিত ও নিহত হয়। অতঃপর ৯৪৬ হিঃ জালকাদামাসে (১৫৪০ খৃঃ এপ্রিল) হুমায়ুন সসৈন্যে কনৌজ অবধি অগ্রসর হন। এই সময় সেরসাহ কনৌজের পরপারে সসৈন্যে অবস্থান করিতে ছিলেন। ৯৩৭ হিঃ মহরম মাসের ১০ তারিখে (১৫৪০ খৃঃ ১৭ই মে হুমায়ুন বিলগ্রামের নিকট গঙ্গা পার হইয়া চল্লিশ হাজার (কোন মতে নব্বই হাজার) সৈন্য ও ৭০০০ কামান লইয়া হুমায়ুন সের সাহকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। মীর্জ্জা হিন্দাল সম্মুখে, মীর্জ্জা আস্করী দক্ষিণ পার্শ্বে, নাসীর মীর্জ্জা বাম পার্শ্বে, হুমায়ুন ও তাঁহার দোস্ত মীর্জ্জা হায়দর কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া ব্যূহবদ্ধ হইতে ছিলেন। ব্যূহরচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সের সাহ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহার পুত্র জালাল খাঁ মীর্জ্জা হিন্দোলের উপর আপতিত হইলেন কিন্তু মোগল সৈন্যের আক্রমণে অশ্ব হইতে পড়িয়া পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। ঠিক সেই সময়ে নাসির মীর্জ্জা আফগান বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের নেতা মুবারিজ খাঁ, বাহাদুর খাঁ ও হোসেন জালানীকে পিছে হটাইয়া দিল।

বহুযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে সের খাঁ এই বিপদ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কেন্দ্র হইতে উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য ঐ দুইটি দলের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং আক্রমণে যোগদান করিলেন। সময়মত সাহায্য পাইয়া পশ্চাদপদ আফগান সেনা ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ভীষণ বেগে পুনরায় আক্রমণ করিয়া মোগল সৈন্য দলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। ঠিক এই সময়ে আফগান বাহিনীর বামপার্শ্ব খাওয়াস খাঁ বরম জিৎগৌড় ও অন্যান্যের নেতৃত্বে মোগল বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া মোগল বাহিনীর পশ্চাতে গিয়া পড়িল। পৃষ্ঠ দেশে আক্রান্ত হইয়া মোগল বাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল ও জ্ঞানশূন্য হইয়া দ্রুত বেগে গঙ্গার দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আফগান সৈন্যদল দ্বারা তাড়িত হইয়া ও গঙ্গাজলে নিমজ্জিত হইয়া বহু মোগল সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। স্বয়ং সম্রাট হুমায়ুন হস্তী পৃষ্ঠে গঙ্গার অপর পারে অতিকষ্টে পৌঁছিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। অতঃপর তিনি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া খালি পায়ে ও খালি মাথায় আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে বিলগ্রামের যুদ্ধে উত্তরাপথের শাসনদণ্ড সের খাঁর হস্তগত হইল।

হুমায়ুন আগ্রায় পলায়ন করিলে বিহারের শাসনকর্ত্তা সুজাৎখাঁ গোয়ালিয়র দুর্গ এবং নাসির খাঁ সম্ভলদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। আগ্রায় অবস্থান করা অসম্ভব দেখিয়া হুমায়ুন রাজধানী ত্যাগ করিয়া লাহোর গমন করিয়াছিলেন। সের সাহ

আগ্রা অধিকার করিয়া লাহোর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। সুলতানপুরে মোগল পাঠানে পুনরায় যুদ্ধ হইয়াছিল। বরমজিদনূর ও খাওয়াস খাঁ মোগলদিগকে পরাজিত করায় হুমায়ুন ও মীর্জ্জা কামরান্ লাহোর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। সের সাহ লাহোর অধিকার করিয়া খুশাব পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং পাঞ্জাবে রোটাস নামক আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া সীমান্ত সুরক্ষিত করিয়াছিলেন (Elliot's History of India Vol IV p. 382-83)। সের খাঁ এইরূপে দিল্লীশ্বর হইলেন (১৫৪০ খৃঃ)। ইতিমধ্যে সের খাঁ কর্ত্তৃক নিযুক্ত গৌড়-বঙ্গের শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁ পরলোকগত গৌড়েশ্বর গিয়াসউদ্দিন মামুদ সাহের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বাধীনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সংবাদে সের সাহ পাঞ্জাব হইতে গৌড়ে আসিয়া খিজির খাঁকে বন্দী করিলেন এবং কাজি ফজীলৎকে গৌড়-বঙ্গের শাসনভার প্রদান করিলেন (১৫৪১ খৃঃ মার্চ্চ)। এই সময় তিনি গৌড়-বঙ্গকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া প্রতি বিভাগে একজন করিয়া আমীর নিযুক্ত করেন। ফিরিস্তার মতে অতঃপর সের সাহ আগ্রায় ফিরিয়া আসিয়া ৯৪৯ হিজরিতে (১৫৪২ খৃঃ) মালব যাত্রা করেন। এই সময় গোয়ালিয়রের কিল্লাদার আবুল কাশিম বেগ গোয়ালিয়র দুর্গ সের সাহকে অর্পণ করেন। অতঃপর সের সাহ রাইসিন দুর্গ অধিকার করিয়া (৯৫০ হিঃ, ১৫৪৩ খৃঃ) হাজি খাঁ ও সদরখাঁকে মালবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন এবং রন্থম্ভোর (রণস্তম্ভপুর) দুর্গ অধিকার করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল সাহকে তাহার শাসনকর্ত্তা করতঃ আগ্রায় ফিরিয়া যান। তারিখ-ই-দায়ুদী অনুসারে তিনি দুই বৎসর আগ্রায় বাস করেন। অতঃপর বিহারে ফিরিয়া যান। ৯৫০ হিজরীতে মালবের পূর্ণমল্লকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তিনি শাহবাজ খাঁ আচাখেল সরওয়ানিকে রৈসিনের কিল্লাদার নিযুক্ত করেন। ঐ বৎসরেই সের সাহ যোধপুরের রাজা মালদেবকে আক্রমণ করেন এবং সের সাহের চক্রান্তে প্রতারিত হইয়া মালদেব পলায়ন করেন, কিন্তু রাঠোর রাজের সামন্ত জয় ও গোহার আক্রমণে সের সাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৯৫১ হিঃ ১৫৪৪ খৃঃ সের সাহ নগর ও চিতোর অধিকার করেন। ৯৫২ হিঃ রবি উলআউয়েল মাসের ১২ তারিখে (১৫৪৫ খৃঃ ২৪ মে) কালঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে তোপখানায় আগুন লাগিয়া সের সাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাসারামের এক সামান্য জায়গীরদারের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি নিজ বাহুবল ও বুদ্ধিমাত্র সম্বল করিয়া সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার এইরূপ আকস্মিকভাবে

জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

সের খাঁর পিতামহ ইব্রাহিম খাঁ শূর বহলোল লোদীর আহ্বানে সোলেমান পর্ব্বতে অবস্থিত রোহরীগ্রাম হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া চল্লিশজন অশ্বারোহীর ভরণপোষণ জন্য হিসার ফিরোজায় কয়েকখানি গ্রাম লাভ করেন। তাঁহার পুত্র হসন খাঁ শূর সাহাবাদ পরগণায় সাসারাম, খাসপুরতন্দা ও হাজীপুর নামক তিনখানি গ্রাম জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। হসন খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সের খাঁ। পিতা তাঁহাকে তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহের উপযুক্ত জায়গীর না দেওয়ায় সের খাঁ গৃহত্যাগ করিয়া জৌনপুরে আসিয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর তিনি আগ্রায় সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সভায় গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পৈতৃক জায়গীর অধিকার করিয়া লন। সের খাঁর প্রকৃত নাম ফরিদ খাঁ। এই সময় একটি ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া সের খাঁ নাম প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি স্বীয় জায়গীর নিজাম খাঁর হস্তে রাখিয়া বাদসা বাবরের দরবারে গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে স্বীয় জায়গীর সাসারামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং বিহারের শাসনকর্ত্তা সুলতান মহম্মদ খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলতান মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর সের খাঁ তাঁহার বিধবা বিবি দুদু ও নাবালক পুত্র জালাল খাঁর অভিভাবক স্বরূপ কার্য্য করিয়া মধ্য প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময় হাজীপুরের শাসনকর্ত্তা মকদুম আলমের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। চুনার দুর্গের কিল্লাদার তাজ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী লাজমালিকার সহিত সপত্নী-পুত্রগণের বিবাদ আরম্ভ হইলে সের খাঁ লাজমালিকাকে বিবাহ করিয়া চুনার দুর্গ অধিকার করিয়া লন এবং বহু ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে বিহারের শাসনকর্ত্তা জালাল খাঁ গৌড়েশ্বর গিয়াসউদ্দিন মামুদের আশ্রয়প্রার্থী হইয়া গৌড়ে চলিয়া গেলে সের খাঁ বিনা যুদ্ধে দক্ষিণ বিহার হস্তগত করিয়াছিলেন। অতঃপর কিরূপে তিনি সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বর হইয়াছিলেন তাহা বলা হইয়াছে। তিনি সোনার গাঁ হইতে সিন্ধু তীর পর্য্যন্ত যে শাহী রাজপথ প্রস্তুত করেন তাহা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত।

সের সাহ ১৫৪৫ খৃঃ ২৪শে মে মাত্র পাঁচ বৎসর সাম্রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিবার পর তাঁহার পুত্র (২) ইসলাম সা শূর (১৫৪৫-১৫৫৩ খৃঃ ৩০শে অক্টোবর) আট বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। অতঃপর তাঁহার শিশু পুত্র (৩) ফিরোজ খাঁ সুলতান হইবার কিয়দ্দিনমধ্যেই সের খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মবরিজ খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন এবং (৪) মবরিজ খাঁ মহম্মদ সা আদিল নাম গ্রহণ করিয়া সুলতান হন। তিনি কলহপ্রিয় আফগানগণকে

বশে রাখিতে পারেন নাই। ১৫৫৩ খৃঃ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ শূর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সমসউদ্দিন মহম্মদ সা গাজী নাম গ্রহণ করিলেন। তিনি আরাকান আক্রমণ করেন এবং জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু ছাপরামৌ নামক স্থানে আদিল সা'র সেনাপতি হিমু (হেমেন্দ্র?) কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন (১৫৫৫ খৃঃ ডিসেম্বর)। অতঃপর আদিল সা সাহাবাজ খাঁকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সমসউদ্দিন মহম্মদের পুত্র খিজির খাঁ এলাহাবাদের অপর পারে ঝুঁসীতে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর সা নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৫৫৬ খৃঃ সাহাবাজ খাঁকে পরাজিত করিয়া গৌড়-বঙ্গ অধিকার করেন। ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া হুমায়ুন আফগান শাসনকর্ত্তা সিকন্দার শূরকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিয়া লন এবং ১৫৫৬ খৃঃ ২৬ জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আকবর তিন সপ্তাহ পর দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন এবং ১৫৫৬ খৃঃ ৫ই নভেম্বর আদিল সাহের সেনাপতি হিমুকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আদিল পলায়ন করেন কিন্তু গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর সাহ কর্ত্তৃক সুরযগড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে ফতেপুর নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত হন (১৫৫৭ খৃঃ এপ্রিল)।

অতঃপর গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর জৌনপুরে অগ্রসর হইলে অযোধ্যার মোগল শাসনকর্ত্তা খান জমান তাঁহাকে পরাজিত করায় তিনি গৌড়রাজ্যে ফিরিয়া যান। ১৫৬০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা জালালউদ্দিন শূর দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন নামে গৌড়বঙ্গের সুলতান হন। ১৫৬৩ খৃঃ দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ৭ মাস রাজত্ব করিবার পর তাঁহাকে নিহত করিয়া তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন সুলতান হন। ১৫৬৪ খৃঃ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাজ খাঁ কররানী গৌড়-বঙ্গের সুলতান হন। এইরূপে ১৫৩০ হইতে ১৫৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত সের খাঁর বংশ রাজত্ব করিবার পর গৌড়বঙ্গ কররানী বংশের হস্তে চলিয়া যায়।

কররানী বংশ (১৫৬৪-৭৬ খৃঃ)

১৫৬৪ খৃঃ তাজ খাঁ কররানী গৌড় অধিকার করিলে সুলেমান কররানী তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ গৌড়রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এক বৎসরের মধ্যে তাজ খাঁর মৃত্যু হয়। তখন সুলেমান গৌড়রাজ্যের সুলতান হন এবং আটবৎসর (১৫৬৫-৭২ খৃঃ) রাজত্ব করেন। সোলেমান কররানী বাদসাহ ফরিদউদ্দিন সের সাহের রাজ্যকালেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইসলাম সাহের রাজ্যকালে তিনি দক্ষিণ বিহারের (মগধের) শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দিল্লী, অযোধ্যা গোয়ালিয়র ও এলাহাবাদে মোগল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে আফগানগণ সুলেমানের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল। সুলেমান উড়িষ্যা ও কোচবিহার রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং গৌড় হইতে তাণ্ডায় রাজধানী অপসারিত করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার শক্তিশালী গজপতি বংশীয় রাজা পুরুষোত্তম দেব ও প্রতাপ রুদ্রদেবের (১৪৯৭-১৫৪০ খৃঃ) পর শাসনদণ্ড দুর্ব্বল হস্তে পতিত হইয়াছিল। কালুয়া দেব (১৫৪০-৪২ খৃঃ), কথারুয়া দেব (১৫৪২-৪৯ খৃঃ) ও চক্রপ্রতাপদেব (১৫৪৯-৫৭ খৃঃ) নামে মাত্র রাজা ছিলেন। চক্রপ্রতাপদেব ১৫৫৭ খৃঃ তাঁহার পুত্র নরসিংহ জেনার হস্তে নিহত হন এবং নরসিংহ জেনাকে (১৫৫৭ খৃঃ) হত্যা করাইয়া (১৫৫৭ খৃঃ) মন্ত্রী হরিচন্দন মুকুন্দ দেব নরসিংহের ভ্রাতা রঘুরাম জেনাকে (১৫৫৭-৬০ খৃঃ) সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন (১৫৬০-৬৮ খৃঃ)।

আদিল সাহের প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম খাঁ শূর কোন স্থানে সুবিধা করিতে না পারিয়া উড়িষ্যারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল (১৫৫৯ খৃঃ)। উড়িষ্যারাজ তাঁহাকে সুলেমান কররানীর হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, আকবর যখন চিতোর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সুযোগে ১৫৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে সুলেমান তাঁহার পুত্র বায়াজিদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য উড়িষ্যা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। মুকুন্দ দেব এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ছোটরায় ও রঘুভঞ্জ নামক দুইজন সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মুকুন্দ দেবকেই আক্রমণ করে। যুদ্ধে ছোটরায় ও মুকুন্দ দেব উভয়েই হত হন। অতঃপর সারংগড়ের সেনাধ্যক্ষ রামচন্দ্রভঞ্জ (দুর্গাভঞ্জ) উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু সুলেমান কররানীর হস্তে রামচন্দ্র ভঞ্জ ও ইব্রাহিম শূর উভয়েই

নিহত হন। উড়িষ্যা সুলেমান কররানীর হস্তগত হয় (১৫৬৮ খৃঃ)।

অতঃপর উত্তর উড়িষ্যার রাজধানী জাজপুর হইতে মুসলমান ধর্মাবলম্বী কালাপাহাড় (রাজু)-এর অধীনে একদল আফগান অশ্বারোহী পুরীতে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের মন্দিরের একাংশ ও জগন্নাথের মূর্ত্তি ও আরও অনেক দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বহু ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়।

১৫১৫ খৃঃ বিশ্বনাথ সিংহ নামক কোচজাতীয় একজন শক্তিশালী ব্যক্তি কামতাপুর রাজ্যের ধংসাবশেষের উপর কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজা নরনারায়ণ (১৫৩৮-১৫৮৭ খৃঃ) ও তৃতীয় পুত্র সেনাপতি শুক্লধ্বজ (চিলারায়) রাজ্যের পরিধি অনেক বৃদ্ধি করেন। এই সময় (১৫৬৮ খৃঃ) গৌড়েশ্বর সুলেমানের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক চিলারায় পরাজিত ও বন্দী হন। মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইয়া কামাখ্যা মন্দির ও আরও বহু মন্দির ধ্বংস করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। কিয়ৎকাল পর চিলারায় মুক্তি লাভ করে।

১৫৭২ খৃঃ ১১ই অক্টোবর সুলেমান কররানীর মৃত্যু হয়।

অতঃপর সুলেমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ সুলতান হন। কিন্তু অনতিকালমধ্যে সুলেমানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা হানসু অসন্তুষ্ট লোহানীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বায়াজিদকে হত্যা করে কিন্তু স্বয়ং হানসু সোলেমানের উজির মিঞা লোদী কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হয়। অতঃপর সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ কররানী গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি গুজর খাঁ বায়াজিদের পুত্রকে বিহারে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সিংহাসন লাভ করিয়া দাউদ নিজনামে মুদ্রা প্রচার করেন এবং সৈন্যসহ মিঞা লোদীকে বিহারে প্রেরণ করেন। অপর দিকে জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবরের আদেশে মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ বিহার আক্রমণ করেন। তখন গুজর খাঁ ও মিঞা লোদী উভয়ে মিলিয়া মুনিম খাঁকে বহু উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিল, ইহা জানিতে পারিয়া দাউদ বহু সৈন্য লইয়া পাটনা অধিকার করেন, এবং কৌশলে মিঞা লোদীকে হস্তগত করিয়া হত্যা করেন। এই সময় বাদসাহ আকবর গুজরাটের যুদ্ধ শেষ করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন এবং মুনিম খাঁর সাহায্যার্থ নূতন সৈন্যদল বিহারে প্রেরণ করিলেন। মুনিম খাঁ পাটনা দুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং আকবর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩ আগষ্ট বহুসংখ্যক রণতরী, রণহস্তী ও কামান লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ৬ই আগষ্ট রাত্রিতে পাটনার ঠিক বিপরীত দিকে গঙ্গার উত্তর কূলে অবস্থিত হাজিপুর দুর্গ মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক

অধিকৃত হইল। পাটনা দুর্গে থাকা আর নিরাপদ নহে মনে করিয়া সেই রাত্রেই মন্ত্রী শ্রীহরির সহিত সৈন্যদল লইয়া দাউদ খাঁ জলপথে ও সেনাপতি গুজর খাঁ স্থলপথে গৌড়াভিমুখে পলায়ন করিলেন। মোগলসৈন্য অবিলম্বে অনায়াসে পাটনা দুর্গ অধিকার করিল এবং বহু রণহস্তী, রসদ, ধনসম্পত্তি ও যুদ্ধোপকরণ তাহাদের হস্তগত হইল। স্বয়ং আকবর তৎক্ষণাৎ পলায়মান আফগানদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পাটনা ও মুঙ্গেরের মধ্যপথে দরিয়াপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। পথে পলাতকদের ২৬৫টি রণহস্তী ও বহু যুদ্ধোপকরণ ও অর্থ তাঁহাদের হস্তগত হইল।

১৩ই আগষ্ট মুনিম খাঁকে ২০০০ সৈন্যসহ পলায়মান ও ভীত আফগানদের পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত করিয়া ও ফরহৎ খাঁকে রোটাস দুর্গ অধিকারে প্রেরণ করিয়া আকবর আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন। সুরযগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহলগাঁ একের পর এক বিনাযুদ্ধে মোগলসৈন্য অধিকার করিয়া ফেলিল এবং ক্রমে তেলিয়াগড়ী গিরিপথের পশ্চিমে আসিয়া পড়িল। তেলিয়াগড়ী সুরক্ষিত থাকায় মোগলবাহিনীর একাংশ তথায় পাহারায় নিযুক্ত থাকিল এবং একদল দুর্দ্ধর্ষ মোগল অশ্বারোহীসহ মজনুন কাকশাল রাজমহল গিরিমালার মধ্যদিয়া তেলিয়াগড়ীকে উত্তরে রাখিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। তাহারা আফগানগণের পশ্চাতে আসিলে আফগানগণ পুনরায় পলায়ন করিল এবং মুনিম খাঁ নির্ব্বিবাদে ২৫শে সেপ্টেম্বর গৌড়ের রাজধানী তাণ্ডায় প্রবেশ করিলেন। পথে কেহই বাধা দিতে অগ্রসর হইল না (আকবরনামা ৩য় খণ্ড)।

তেলিয়াগড়ী অধিকৃত হইলে দাউদ সপ্তগ্রামাভিমুখে এবং কালাপাহাড়, সোলেমান মনক্লী ও বাবুই মনক্লী ঘোড়াঘাটে পলায়ন করিয়াছিলেন। খানখানান্ মুনিম খাঁ, মহম্মদ কুলী খাঁ বরলগ ও রাজা তোডরমল্লকে দাউদের অনুসরণে ও মজনুন খাঁ কাকশালকে ঘোড়াঘাটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঘোড়াঘাটে সোলেমান মনক্লী ও অন্যান্য আফগান প্রধানগণ পরাজিত ও নিহত এবং সুলতান জালালউদ্দিন শূরের পুত্রগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। এই সময় ইমাদ খাঁ কররানীর পুত্র জুনৈদ্ কররানী মোগল শিবির ত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং পরাজিত আফগানগণ কুচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কুচবিহাররাজ নরনারায়ণ গৌড়যুদ্ধে আকবরকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং যুদ্ধে গৌড়রাজ দাউদ সা পরাজিত হইলে আকবর ও নরনারায়ণ তাঁহার রাজ্য ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। জুনৈদ খাঁ কররানী ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া মোগল সেনানী মহম্মদ খাঁ গখর ও রায়বিহারী মল্লকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন এবং সরকার মামুদাবাদে মামুদ খাঁ (মহম্মদ খাঁ) সেলিমপুর অধিকার করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু রাজা তোডরমল্ল সৈন্য প্রেরণ করিয়া মামুদ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সেলিমপুর পুনরধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর জুনৈদ পুনরায় ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিলেন।

মোগল সেনানী মহম্মদ কুলী খাঁ বরলাস সপ্তগ্রামের ২০ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলে আফগানগণ সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। মোগলসেনা সপ্তগ্রাম অধিকার করিলে দাউদের বন্ধু ও প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীহরি বহু ধনসম্পদ লইয়া যশোর অভিমুখে চলিয়া গিয়াছিলেন। মহম্মদ কুলী খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও বন্দী করিতে পারেন নাই। রাজা তোডরমল্ল মন্দারনে উপস্থিত হইলে দাউদ দীনকসারী গ্রামে শিবির স্থাপন করেন এবং পরে হুগলীজেলার ধরমপুর গ্রামে মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া মোগল সেনার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন। ইলিয়া খাঁ লঙ্গা অন্যপথে মোগল সেনা চালনা করায় দায়ুদের উদ্যম ব্যর্থ হয়। অতঃপর সুবর্ণরেখা তীরে তক্‌রাই বা মোগলমারী গ্রামে দাউদের সহিত খান্ খানান্ মুনিম খাঁ ও তোডরমল্লের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে (৯৮২ হিঃ জিলকাদা মাসের ২০ তারিখে, ১৫৭৫ খৃঃ ৩রা মার্চ্চ) দাউদ খাঁ পরাজিত ও গুজর খাঁ নিহত হইয়াছিলেন। শহিম খাঁ ও রাজা তোডরমল্ল দাউদের অনুসরণ করিয়া ভদ্রকে উপস্থিত হইলে দাউদ কটক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং ফতে খাঁ ও নিজাম খাঁকে মোগল শিবিরে পাঠাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৯৮৩ হিঃ ১লা মহরম (১৫৭৫ খৃঃ ১২ই এপ্রিল) কটকে দাউদ আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় দাউদকে জায়গীর দিয়া উক্ত বর্ষের সফর মাসের দশম দিবসে খান খানান্ মুনিম খাঁ টাঁড়ায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন (আকবরনামা ও মন্তখব-উৎ-তওয়ারিখ)।

মুনিম খাঁ যখন উড়িষ্যায় ছিলেন তখন কালাপাহাড় ও বাবুই মনকলী ঘোড়াঘাট হইতে কাকশালদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল। মুনিম খাঁর আদেশে মজনুন খাঁ কাকশাল পুনরায় ঘোড়াঘাট অধিকার করে। ফরহাৎ খাঁর সহিত মজঃফর খাঁ রোটাস দুর্গ অধিকার করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি সাসারাম অধিকার করিয়াছিলেন এবং ঝাড়খণ্ডে গণ্ডকীতীরে ও হাজীপুরে আফগানগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মজঃফর খাঁ যখন তীরভুক্তির আফগান দমনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি আগ্রায় যাইতে আদিষ্ট হন। তথায় গমন করিলে আকবর তাঁহাকে বিহার (মগধ) প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন।

অতঃপর মুনিম খাঁ গৌড়ে গমন করেন। এইখানে বহু মোগল কর্ম্মচারী ও সৈন্য মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং গৌড় নগর

শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এই সময় জুনৈদ খাঁ কররানী বিহার আক্রমণ করায় মুনিম খাঁ গৌড় হইতে টাঁড়ায় গমন করেন এবং তথায় ১৫৭৫ খৃঃ ২৭শে অক্টোবর দেহত্যাগ করেন।

মুনিম খাঁর মৃত্যু সংবাদে দাউদ সাহ পুনরায় গৌড়রাজ্য অধিকারে অগ্রসর হইলেন। আফগান সেনা গঙ্গা পার হইয়া গৌড়াভিমুখে ধাবিত হইল এবং অল্পকাল পরে গৌড়রাজ্য অধিকার করিল। এই সংবাদে আকবর খাঁ জহান ও রাজা তোডরমল্লকে গৌড়ে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং ফতেপুর সিক্রী হইতে একদল সৈন্য লইয়া গৌড়াভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইতিমধ্যে খাঁ জহান রাজমহলে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। ৯৮৪ হিঃ রবিউলসানী মাসের ১৫ তারিখে (১৫৭৬ খৃঃ ১০ই জুলাই) খাঁ জহান (হোসেন কুলী খাঁ) ও রাজা তোডরমল্লের সহিত বিহারের শাসনকর্ত্তা মজঃফর খাঁ মিলিত হইলেন।

রাজমহল সহর হইতে প্রায় ৮ মাইল পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়। সহরের প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণে ঐ পাহাড় ঝুঁকিয়া আসিয়া গঙ্গার ২ মাইল পশ্চিমে শেষ হইয়াছে। এই দুই মাইলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে গঙ্গার দূরত্ব এক মাইলের বেশী হইবে না। গঙ্গার পশ্চিম তীরের এই গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া গৌড় বিহারের সাহী রাস্তা উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। এই গিরি সঙ্কটের দক্ষিণে রাজমহল পাহাড় হইতে উদ্ভূত হইয়া নালা নামক একটি ক্ষুদ্র নদী কতকগুলি জলাভূমির মধ্য দিয়া সাহী রাস্তা ভেদ করিয়া পূর্ব্বদিকে গঙ্গায় পড়িয়াছে। এই সমস্ত জলাভূমি থাকায় ঐ গিরি সঙ্কটের পশ্চিমভাগ দিয়া উত্তর-দক্ষিণে যাতায়াত প্রায় অসম্ভব ছিল। উত্তর-দক্ষিণে অভিযানের একমাত্র রাস্তা ঐ সঙ্কটের মাইল খানেক পূর্ব্বভাগ। সুতরাং উত্তর বা দক্ষিণ হইতে আগত বিজিগীষুর পথ রোধ করিবার একমাত্র স্থান ঐ গিরিসঙ্কটের পূর্ব্বভাগ। এই গিরিসঙ্কটের উত্তরে যে একটি প্রাকার দৃষ্ট হয় তাহা উত্তর হইতে আগত মোগল বাহিনীর গতিরোধার্থ দাউদ খাঁ দ্বারা নির্ম্মিত[১]। এই প্রাকারের দক্ষিণের সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে যে দুর্গ ছিল দাউদ সসৈন্যে সেই দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন।

মুজঃফর খাঁর আগমনের পরেই ১৫৭৬ খৃ ১১ই জুলাই যুদ্ধারম্ভ হইল। বদায়ুনী

১। ইহার ১৮৭ বৎসর পর দক্ষিণ হইতে আগত ইংরেজ বাহিনীর গতি রোধার্থ মীর কাশিম ষাট ফুট উচ্চ একটি প্রাকার ঐ গিরিসঙ্কটের দক্ষিণে নির্ম্মাণ করিয়া দুর্গটি সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

লিখিয়াছেন, "দাউদ দুঃসাহস ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলে মোগলেরা তাঁহাকে আক্রমণ করে। মোগল পক্ষে কেন্দ্রে খাঁ জহান, দক্ষিণ পার্শ্বে মুজঃফর খাঁ, বামপার্শ্বে রাজা তোডরমল্ল। শিরে শহিম খাঁ ও মুরাদ খাঁ। স্কন্ধে ইসমাইল কুলী খাঁ ও কুইয়া খাঁ। আফগান পক্ষে কেন্দ্রে দাউদ খাঁ স্বয়ং। দক্ষিণ কক্ষে কালাপাহাড়। বাম কক্ষে জুনৈদ খাঁ। শিরে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা কতলু খাঁ। মোগল বাম কক্ষে ও আফগান দক্ষিণ কক্ষে যুদ্ধ সুরু হইল। মোগল বাহিনীর সম্মুখে ছিল উধুয়া নালা। বহুক্ষণ ব্যাপী যুদ্ধে অবশেষে দাউদ খা সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। জুনৈদ কামানের গোলায় নিহত হইল। স্বয়ং দাউদ বন্দী হ লেন এবং তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল। কালাপাহাড় ও কৎলু লোহানী আহত হইয়া পলায়ন করিল। আব্দুল্লাহ খাঁ দাউদের ছিন্ন মস্তক লইয়া পথিমধ্যে আকবরের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। অপব দিকে রাজমহলের যুদ্ধের ২৫দিন আগে রাজা প্রতাপ সিংহ হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

অতঃপর খাঁ জহান সপ্তগ্রামে আসিয়া মামুদ খাঁ খাসখেল (ওরফে মতি) ও তথাকার অন্যান্য আফগান দলপতিগণকে নির্মূল করিলেন। অবশেষে দাউদের মাতা নৌলাখ ও তাঁহার অবশিষ্ট পরিবারবর্গ মুশিদাবাদের নিকটে খাঁ জহানের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। দাউদের ধনসম্পত্তি খাঁ জহানের হস্তগত হইল।"(আকবরনামা, তাবকাৎ-ই-আকবরী, বদায়ুনী)।

ভাওয়ালের আফগান দলপতি ইব্রাহিম মরল ও করিমদাদ মজানি বিদ্রোহী হওয়ায় খাঁ জহান তথায় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁহার একদল সৈন্য পদ্মা নদীর উজানে এগার সিন্দুর পর্য্যন্ত আসিয়া ইশাখাঁকে পরাজিত করে। ইশাখাঁ পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর খান জহান টাঁড়ার নিকটে সিহাতপুরে ফিরিয়া আসিয়া তথায় একটি নগর স্থাপন করেন। এইস্থানে তিনি ১৫৭৮ খৃঃ ১৯শে ডিসেম্বর প্রাণত্যাগ করেন।

অতঃপর মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁ[১], কৎলু খাঁ লোহানী ও ঈশা খাঁ লোহানী বঙ্গে দীর্ঘকাল স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। গৌড় রাজ্যে মোগল বাদসাহের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে আরও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল।

১। আকবরনামা প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে ঈশা খাঁকে ভাটি প্রদেশের অধীশ্বর বলা হইয়াছে। ঈশা খাঁর পিতা কালিদাস গজদানী অযোধ্যাবাসী রাজপুত ছিলেন। মুসলমানরা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মুসলমান করে। তিনি

১। মুজঃফর খাঁ তুর্ব্বতি (১৫৭৯-৮২)।

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুজঃফর খাঁ তুর্ব্বতি গৌড়-বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। আকবর তাঁহার রাজ্যকে দ্বাদশটি সুবায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সুবায় এক একজন সুবাদার (নবাব নাজিম), দেওয়ান, বক্সী, মির আদল, সদর, কোতয়াল, মীরবহর, ওয়াকানবিস নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে গৌড় ও বিহারে যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারী শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা যথেচ্ছাচারী ছিলেন এবং লুণ্ঠন দ্বারা বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া কার্য্যকাল শেষ হইলে আগ্রা দিল্লী প্রভৃতি সহরে বিলাসে মগ্ন হইতেন। বর্ত্তমান নিয়মে যথেচ্ছাচারের সুবিধা না থাকায় বিহারে ও গৌড়ে সৈনিক কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অসন্তোষ জন্মিতে লাগিল এবং ক্রমে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ১৫৮০ খৃঃ ১৯শে জানুয়ারী একদল সৈনিক তাণ্ডা ত্যাগ করিয়া নয় দিনের মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিহারের বিদ্রোহীরা তেলিয়াগড়ী অধিকার করিল। একদল গৌড়-বিদ্রোহী রাজমহলের নিকট গঙ্গা পার হইয়া বিহারের বিদ্রোহীদের সহিত যোগ স্থাপন করিল। মুজঃফর তাণ্ডার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁহাকে হত্যা করিল (১৫৮০ খৃঃ ১৯শে এপ্রিল) এবং দুর্গে সঞ্চিত বহু ধনসম্পত্তি লুঠ করিল। তাহারা বাবা কাকশালকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ও মাসুম খাঁ কাবুলীকে উকিল নিযুক্ত করিল। আরব বাহাদুর পাটনার ও বাহাদুর বদক্সী (বাহাদুর সা) ত্রিহুতের শাসনকর্ত্তা হইলেন। কিন্তু রোটাস দুর্গের রাজভক্ত মুহিব আলি খাঁ আরব বাহাদুরকে পরাজিত করিয়া বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে পাটনা উদ্ধার করিল। আকবর নূতন সৈন্যসহ তার্স্যন খাঁ ও তোডর-মল্লকে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা শীঘ্রই মুঙ্গেরে পৌছিলেন (১৫৮০ খৃঃ ১৯শে মে)। বিদ্রোহীগণ তেলিয়াগড়ী হইতে এখানে অগ্রসর হইয়া (৭ই জুন) বাদসাহী ফৌজের সহিত খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হইল। আকবর ২৮শে জুন পুনরায় নূতন সৈন্য প্রেরণ করিলে বিদ্রোহীরা পলায়ন করিল (২৫শে

মুসলমান হইয়া সলিমান খাঁ নাম প্রাপ্ত হন ও এক পাঠান নারীকে বিবাহ করেন। তাজ খাঁ ও সেলিম খাঁ তাঁহাকে হত্যা করে, এবং ঈশা খাঁ দাসরূপে বিক্রীত হইয়া দূর দেশে নীত হন। পরে তাঁহার মাতুল তাঁহাকে বঙ্গদেশে লইয়া আসেন। প্রতিভাবলে ঈশা খাঁ সুবে বাঙলার একজন প্রধান ভৌমিক হন। (আকবরনামা)।

জুলাই)। পাটনা ও মুঙ্গের বিদ্রোহী মুক্ত হইল বটে, কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় বাদসাহী ফৌজকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইল।

অতঃপর পাটনার একদল বাদসাহী ফৌজ মাসুম খাঁ কাবুলীর হস্ত হইতে বিহার সহর ও গয়া দখল করিয়া লইল (সেপ্টেম্বরের শেষভাগ)। অন্যদিকে আজম খাঁ কোকা আকবরের আদেশে জগদীশপুরের দলপৎ সাকে পরাজিত করিয়া বিহারে বাদসাহী ফৌজের সহিত মিলিত হইল। অধিকাংশ বিদ্রোহী ভয়ে গৌড়-বঙ্গে পলায়ন করিল। এই সময় সাহাবাজ খাঁ ও আজম খাঁর মধ্যে ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া মোগল শিবির দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। গর্ব্বোদ্ধত সাহাবাজ খাঁ আজম খাঁর আদেশ পালনে অস্বীকৃত হইয়া পাটনায় বসিয়া রহিলেন এবং আজম খাঁ ও তোডরমল্ল হাজিপুরে পৃথক শিবির স্থাপন করিলেন। গৌড়-বঙ্গের পুনরুদ্ধারের কার্য্য আরও দুই বৎসর পিছাইয়া গেল।

ইত্যবসরে ফতেহাবাদের (ফরিদপুর) ফৌজদার মোরাদ খাঁর মৃত্যু হওয়ায় ভৌমিক মুকুন্দরায় তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। উড়িষ্যায় কিয়া খাঁ হোসেন বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন এবং দাউদ খাঁর অন্যতম অনুচর কতলু খাঁ লোহানী উড়িষ্যায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাহার আক্রমণে হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ নিজৎ খাঁ পরাজিত হইয়া পর্ত্তুগীজ কাপ্তান পেড্রো ট্যাভারিজের শরণাপন্ন হইলেন। কতলু অতঃপর মঙ্গলকোটের (বর্দ্ধমান) নিকট অপর এক মোগল বাহিনীকে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা হইতে মোগলগণকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিলেন।

গৌড়ের বিদ্রোহীদের নেতা বাহাদুর খেসগী মোগলনেতা সাদীক খাঁর হস্তে মুঙ্গেরের নিকট নিহত হইল। বিদ্রোহীদের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী নেতা মাসুম খাঁ ফরন খুদী অযোধ্যার নিকটে সাহাবাজ খাঁ কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইল। এই সময় আকবরের সেনাদল কাবুল অধিকার করায় (৩রা আগষ্ট) তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতা মির্জ্জা হাকিম পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন।

২। খান-ই-আজম (১৫৮২-৮৩ খৃঃ)।

১৫৮২ খৃঃ ৬ই এপ্রিল আকবর খান্-ই-আজমকে সুবে বাঙলার (গৌড়-বঙ্গের) সুবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং বিহার ও অযোধ্যার বাদসাহী ফৌজকে তাঁহার সহায়তা করিতে আদেশ দিলেন। এই সময় খান্-ই-আজম আগ্রায় থাকায় সুবে বাঙলার বিদ্রোহীরা হাজিপুর দখল করে এবং কতলু খাঁর একদল আফগান

সৈন্য লইয়া বাহাদুর খুরো তাণ্ডার নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু পাটনা দুর্গের মোগল সেনাপতি সাদিক খাঁ সসৈন্যে হাজিপুরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদলপতি জোবারি, খবিদ্‌ ও তর্খানকে আক্রমণ করিয়া ৪০ দিন যুদ্ধের পর তাহাদিগকে পরাজিত করে। যুদ্ধে খবিদ নিহত হইল। তর্খানের পুত্র নূর মহম্মদ ধৃত ও নিহত হইল। বিদ্রোহীদের অপর নেতা খাজা আবদুল গফোর অরণ্যবাসীগণের হস্তে নিহত হইল।

খান-ই-আজম হাজিপুরে উপস্থিত হইলে অযোধ্যা ও বিহারের মোগল জায়গীরদারগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইল। এই স্থান হইতে বহু সৈন্য লইয়া আজম খাঁ মুঙ্গের ও কহলগাঁর মধ্যদিয়া রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কাটিগঙ্গা নামক নামক খালের নিকট উপনীত হইলেন। অপরদিকে বিদ্রোহীগণের অন্যতম নেতা মাসুম কাবুলী উড়িষ্যার নেতা কতলু খাঁ ও সরকার ঘোড়াঘাটের কাকশাল-গণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া ১৫৮৩ খৃঃ ২৭শে মার্চ্চ তারিখে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। ইহার সাত দিন পূর্ব্বে আজম খাঁ তেলিয়াগড়ী দখল করিয়া লইয়াছিলেন। উভয় পক্ষেই বহু সৈন্য লইয়া এক মাস যাবৎ পরস্পর মুখামুখী হইয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে সামান্যরূপ খণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ২৪শে এপ্রিল ফরিদপুর হইতে আগত বিদ্রোহীপক্ষের নৌ সেনাপতি কামানের গোলায় নিহত হইল এবং আরও কয়েকদিন পর বিদ্রোহীদের বিখ্যাত সেনানায়ক কালাপাহাড়ও যুদ্ধে হত হইল। এই সময় মাসুম কাবুলীর সহিত ঘোড়াঘাটের কাকসালগণের বিরোধ উপস্থিত হইল। মাসুম প্রতিশোধ লইবার জন্য ঘোড়াঘাট অবরোধ করিল। কিন্তু আজম খাঁ ৪০০০ দ্রুতগামী অশ্বসৈন্য প্রেরণ করিয়া অবরোধ ভাঙ্গিয়া দিলেন।

৩। সাহাবাজ খাঁ

অতঃপর সুবে বাঙলার জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় আজম খাঁর অনুরোধে আকবর তাঁহাকে তাঁহার নিজ জায়গীর হাজিপুরে এবং তৎস্থলে পাটনা হইতে সাহাবাজ খাঁকে সুবে বাঙলায় প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে কতলু খাঁ বিদ্রোহী হওয়ায় সেরপুর মুর্চ্চা (বগুড়া) হইতে বাদসাহী সৈন্য বর্দ্ধমানে পৌছিয়া দামোদর নদ পার হইয়া কতলু খাঁর সম্মুখীন হইল (জুনের শেষভাগ) এবং আফগান নেতা বাহাদুর খুরোকে পরাজিত করিল (১৫ই জুলাই)। তাণ্ডা হইতে একদল বাদসাহী সৈন্য ঘোড়াঘাটের বন্ধুভাবাপন্ন কাকশালগণের রক্ষার্থ প্রেরিত হইল এবং আর একদল বাদসাহী সৈন্য সপ্তগ্রামের পথে উড়িষ্যার সীমান্তে বিদ্রোহী

কতলু খাঁ লোহানীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রেরিত হইল।

১৫৮৩ খৃঃ অক্টোবরের প্রথমে মাসুম কাবুলী ঈশা খাঁর আশ্রয় হইতে পুনরায় বাহির হইয়া তাণ্ডার ১৪ মাইলের মধ্যে তাজপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া মোগল সৈন্যের নেতা তার্সুন খাঁকে অবরুদ্ধ করে। এই সংবাদে সাহাবাজ খাঁ পাটনা হইতে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া মাসুমকে বিতাড়িত করিলেন। সাহাবাজ অতঃপর তাণ্ডা হইতে অগ্রসর হইলে বিদ্রোহী বাবা ভকারা মাহি সন্তোষ (দিনাজপুর) হইতে ও মাসুম কাবুলী যমুনার (দাওকোবা) অপর তীর হইতে পলায়ন করে (১৫ নভেম্বর)। সাহাবাজ ঘোড়াঘাট পৌছিলে মাসুম ভাটিপ্রদেশে ও জব্বারী কোচবিহারে আশ্রয় লয়।

বর্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সাহাবাজ খাঁ বিক্রমপুর অঞ্চলে ঈশা খাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতঃ নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে খিজিরপুর হইতে অগ্রসর হইয়া সোনারগাঁ দখল এবং ঈশা খাঁর বাসভূমি কত্রাভূ লুণ্ঠন করিলেন। অতঃপর শীতল লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত "এগার সিন্দু" দুর্গ দখল করিয়া উহার বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে টোক নামক স্থানটি সুরক্ষিত করিয়া লইলেন, এবং এই স্থান হইতে মাসুম কাবুলীর বিরুদ্ধে তর্সুন খাঁ পরাজিত ধৃত ও নিহত হইল। অতঃপর সাহাবাজ খাঁ সাত মাস কাল টোকের সুরক্ষিত শিবিরে বসিয়া রহিলেন এবং মাসুম কাবুলীকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে অথবা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে ঈশা খাঁকে তাগিদ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশা খাঁ মিথ্যা মিষ্ট বাক্যে সাহাবাজকে ভুলাইয়া রাখিয়া উপযুক্ত সময়ের প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রবল বন্যা উপস্থিত হইলে এক অন্ধকার রাত্রিতে আফগানেরা পনের স্থানে ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ কাটিয়া দিল। সাহাবাজের শিবির ও তোপসমূহ জলে ভাসিয়া গেল। ঈশা খাঁ বাদসাহের ঢাকার থানাদার সৈয়দ হোসেনকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাদ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সাহাবাজ অতি কষ্টে ঢাকার পথে ভাওয়াল উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহার অধস্তন সেনানীগণ তাঁহার সহায়তা না করায় যুদ্ধে বিফলমনোরথ হইয়া ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষে সাহাবাজ ভাওয়াল ত্যাগ করিয়া তাণ্ডা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য ও ধনসম্পত্তি ঈশা খাঁর হস্তে পতিত হইল। নানাদিক বিবেচনা করিয়া ঈশা খাঁ সাহাবাজ খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করা সঙ্গত মনে করিলেন না। কিন্তু মাসুম খাঁ সেরপুর (বগুড়া) পর্য্যন্ত এবং অপর কতকগুলি আফগাণ মালদহ পর্য্যন্ত খণ্ডযুদ্ধ চালাইল।

অপরদিকে বাদসাহের অপর সেনাপতি ওয়াজির খাঁ বৰ্দ্ধমানের নিকট কতলু খাঁর সম্মুখীন হইয়া তুকারো পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে কতলু খাঁ বশ্যতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মারফৎ ৬০ টি হস্তী আকবরের নিকট প্রেরণ করিলেন (১৫৮৪ খৃঃ ১১ ই জুন)। অতঃপর আকবর ওয়াজির খাঁকে তাণ্ডায় এবং সাদিক খাঁকে পাটনায় পাঠাইলেন (আকবর নামা)।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথমভাগে ওয়াজির খাঁ ও সাদিক খাঁ মাসুম কাবুলীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। মার্চ্চ মাসের শেষদিন ত্রিবেণীর (হুগলী) জলযুদ্ধে পরাজিত হইয়া মাসুম পলায়ন করিল। তাজপুরের (দিনাজপুর) বিদ্রোহী নেতা তাহির ইশান চাক গোলযোগ চালাইতে লাগিল। অপর বিদ্রোহী নেতা তর্খান দেওয়ানা তাণ্ডা পর্য্যন্ত লুণ্ঠনকার্য্য চালাইতেছিল, কিন্তু বিতাড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অবশেষে আকবরের আদেশে সাহাবাজ বিহারে গেলেন ও সাদিক খাঁ সুবে বাঙলায় আসিলেন। ইশা খাঁ ভয় পাইয়া সাহাবাজের সহিত যুদ্ধে যে সকল হস্তী ও অস্ত্রশস্ত্র ও ধনসম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত আকবরকে ফিরাইয়া দিলেন। কররানীদের দলভুক্ত আফগানগণ ও অন্যান্য বিক্ষিপ্ত আফগান মিলিত হইয়া এই সময় বৰ্দ্ধমান আক্রমণ করিল। কিন্তু সাদিক, ওয়াজির খাঁ ও মুহিব আলি অগ্রসর হইয়া অজয় নদী উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্রোহীগণকে আক্রমণ করতঃ তাহাদের অধিকাংশকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল (১৫৮৫ খৃঃ, ১০ জুন) দস্তম কাকশাল এই সময় ঘোড়াঘাট অবরুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। (আকবর নামা)।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের সুবে বাঙলার অভিযানের ফল আশানুরূপ না হওয়ায় আকবর ১৫৮৬ খৃঃ ৩০ শে জানুয়ারী সাহাবাজ খাঁকে পুনরায় সুবে বাঙলায় প্রেরণ করিলেন ইশা খাঁ ভয় পাইয়া যে সমস্ত স্থান তিনি অধিকার করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পণ ও মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করিয়া ও মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া সম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন। মাসুম খাঁ তাঁহার পুত্রকে আকবরের দরবারে পাঠাইয়া স্বয়ং হজ যাত্রা করিলেন। কতলু খাঁর পক্ষের অনেকে তাঁহাকে ত্যাগ করিলেও তিনি উড়িষ্যায় প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। আরাকানের শাসনকর্ত্তাও আকবরকে অনেক উপহার প্রেরণ করিলেন।

৪। উজির খাঁ ও মুহিব আলি

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে নবেম্বর আকবরের নূতন শাসনপদ্ধতি অনুসারে সুবে বাঙলায় উজির খাঁ ও মহিব আলি সুবাদার করমুল্লা দেওয়ান, সাহাবাজ বকসী

পদ (Paymaster General) এবং বিহারে সৈয়দ খাঁ। ও ইউসফ খাঁ। সুবাদার, রায় পাত্রদাস দেওয়ান ও আব্দুর রজ্জাক বকসীপদ লাভ করিলেন। পরে ১৫৮৭ খৃঃ ১ লা আগষ্ট উজির খাঁর মৃত্যু হইলে, ঐ মাসের ২৬ তারিখে সৈয়দ খাঁ। তৎস্থলে নিযুক্ত হন।

৫। রাজা মানসিংহ

১৫৯৪ খৃঃ ১৭ই মার্চ্চ সাহজাদা সালিম ১০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন এবং রাজা মানসিংহ তাঁহার অভিভাবক হইলেন। জগৎসিংহ, দুর্জ্জন সিংহ, শক্তসিংহ সুবে বাঙলায় ও হিম্মত সিংহ, ভাউ সিংহ, খুর্দ্দার রাজা রামচন্দ্রদেব, সুর ও লোহানী গোষ্ঠীর অনেক পাঠান সর্দ্দার ওড়িষ্যায় জায়গীর পাইলেন, রাজা মানসিংহ সুবে বাঙলার সুবাদার ও সুবে বাঙলায় জায়গীর পাইয়া ১৫৯৪ খৃঃ ৪ঠা মে তাঁহার নূতন সুবাদারী কার্য্যে যোগ দিলেন[১]।

১। ইহার পূর্ব্বে ১৫৮৭ খৃঃ ১৮ই ডিসেম্বর রাজা মানসিংহ সুবে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া সিধৌরের বিদ্রোহী রাজপুত রাজা পূরণমল ও খড়্গপুরের (মুঙ্গেরের নিকট) বিদ্রোহী রাজা সংগ্রাম সিংহকে বশীভূত করেন। অতঃপর পাটনায় ফিরিয়া গিয়া তথায় জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহকে রাখিয়া গয়া জেলায় গমন করতঃ সাহাবাদের বিদ্রোহী চেরো নেতা অনন্ত চেরোকে দমন করেন। রাজা মানসিংহ যখন গয়া জেলায় যুদ্ধে রত ছিলেন, সেই সময় বাঙলার বিদ্রোহী দলপতি সুলতান কুলী পূর্ণিয়া ও দ্বারভাঙ্গা পার হইয়া হাজিপুরের নিকটে পৌঁছিলে জগৎ সিংহের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় কিন্তু তাহারা পরাস্ত হইয়া পলাইয়া যায়। ১৫৯০ খৃঃ ৩রা এপ্রিল রাজা মানসিংহ ৫৪টি হস্তী ও লুণ্ঠনলব্ধ বহু মূল্যবান ধন সম্পত্তি লাহোরে আকবরের নিকট প্রেরণ করেন। (আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড)।

অতঃপর রাজা মানসিংহ ভাগলপুর ও বর্দ্ধমানের মধ্যদিয়া জাহানাবাদে (হুগলী জেলার আরামবাগ) পৌছেন। উত্তর উড়িষ্যার নেতা কতলু খাঁ। লোহানী রাজা মানসিংহের শিবিরের ৫০ মাইল পশ্চিমে সরকার বালেশ্বরের অন্তর্গত রায়পুর দুর্গে সৈন্য সমাবেশ করে এবং একদিন রাত্রিকালে মোগল বাহিনীর অগ্রগামী সৈন্যের নেতা কুমার জগৎ সিংহকে অতর্কিত আক্রমণে পরাস্ত করে। যুদ্ধে জগৎ সিংহ আহত হন কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ঘটনার দশদিন পর কতলু খাঁর

ইতিমধ্যে কতল খাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেমান ও ওসমান উড়িষ্যা হইতে সাতগাঁ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন চালাইতে লাগিল কিন্তু তথায় বাধা পাইয়া ভূষণায় (যশোর জেলা) আশ্রয় লইল। এখানে তাহাদের আশ্রয়দাতা [কেদার রায়ের পুত্র] চাঁদ রায়কে

মৃত্যু হয় এবং তাহার উজির খাজাইশার পরামর্শে কতলুর অল্পবয়স্ক পুত্র নাসির খাঁ। ১৫ই আগষ্ট তারিখে মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। সন্ধির নিয়মানুসারে জগন্নাথ দেবের মন্দির ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলি বাদসাহের অধিকারে চলিয়া যায় এবং বাদসাহ ১০০টি হস্তী ও অনেক উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। অতঃপর মানসিংহ বিহারে চলিয়া যান (আকবর নামা)। ইতিমধ্যে উজির খাজা ইশার মৃত্যু হইলে ১৬৯১ খৃঃ বর্ষা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পাঠানেরা পুনরায় জগন্নাথ মন্দির দখল করে এবং বীর হাম্বিরের রাজ্য আক্রমণ করে। [এই সকল ঘটনা বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের পটভূমি স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে]। ১৫৯১ খৃঃ ৩রা নবেম্বর মানসিংহ তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে বাঙলার সুবাদার সৈয়দ খাঁ। তাঁহার সহিত সসৈন্য যোগ দেন। ১০ই এপ্রিল, ১৫৯২ খৃঃ সমগ্র আফগান বাহিনী সুবর্ণরেখা অতিক্রম করিয়া বেনাপুরের জঙ্গলে উপস্থিত হইয়া মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করে। কিন্তু মোগল কামানসমূহ ও তীরন্দাজ সৈন্য পাঠান সৈন্য দলের মধ্যে ভীষণ হত্যা কাণ্ডের সৃষ্টি করে তাহাদের রণগজসমূহ ধ্বংস করে। তাহাদের অন্যতম সেনাপতি খাজা ওয়াজ নিহত হয়, সেনাপতি সুলতান শূর মোগল হস্তে বন্দী হয়। এই যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ ও দুর্জ্জন সিংহের বাহুবলে ও রণকৌশলে মোগল বাহিনী জয়লাভ করে। কিন্তু বাঙলার সুবাদার সাদ খাঁ। ঈর্ষা পরবশ হইয়া রাজার অনুরোধ স্বত্বেও বাঙলায় ফিরিয়া যান।

অতঃপর কটকের বিদ্রোহী দিগকে পরাজিত করিয়া রাজা মানসিংহ কটক অধিকার করেন, কটক হইতে রাজা জগন্নাথ ক্ষেত্রে তীর্থ যাত্রা করেন। অতঃপর খুর্দ্দা রাজ্য আক্রমণ করিলে খুর্দ্দার বিদ্রোহী রাজা রামচন্দ্র দেব আত্মসমর্পণ করেন এই অবসরে আফগানগণ রাজার পশ্চাদ্ভাগে জলেশ্বর সহর কাড়িয়া লয়। কিন্তু মোগল সৈন্য তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ৩০শে মে সারঙ্গগড় মোগলগণ অধিকার করে। ১৫৯৩ খৃঃ ৩০ জানুয়ারী খুর্দ্দারাজ রামচন্দ্র দেব স্বয়ং মানসিংহের দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁহার এক কন্যাকে রাজা মানসিংহের সহিত বিবাহ দেন। এইরূপে উড়িষ্যা বিজয় আপাতত শেষ হয়। ১৫৯৪ খৃঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী মানসিংহ সম্রাটের আদেশে লাহোরে সম্রাটের সহিত দেখা করেন।

হত্যা করিয়া ভূষণা দুর্গ দখল করিল (১৫৯৩ খৃঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী)।

১৫৯৪ খৃঃ ৭ঠা মে মানসিংহ আগ্রা হইতে রওনা হইলেন এবং তাণ্ডায় পৌছিয়া সুবে বাঙলার বিভিন্ন পরগণায় বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যদল পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পুত্র হিম্মত সিংহ এইরূপ একটি সৈন্যদল লইয়া ভূষণা দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন (১৫৯৫ খৃঃ ২রা এপ্রিল)। ঐ বৎসর ৭ই নবেম্বর মানসিংহ অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া রাজমহলে সুবে বাঙলার নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং তাহার নাম আকবর নগর রাখিলেন। এই স্থান হইতে ৭ই ডিসেম্বর ভাটি প্রদেশে (পুর্ব্ববঙ্গ) ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলাকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। আফগানগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং মানসিংহ সেরপুর মূর্চ্চায় (বগুড়া জেলা) শিবির সন্নিবেশ করিয়া তথায় সলিম নগর নামক অস্থায়ী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। উড়িষ্যার কক্রুয়া দুর্গের অধিপতি গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করায় এবং বাঙলায় খাজা সুলেমান লোহানী ও কেদার রায় ভূষণা দুর্গ পুনরায় দখল করিয়া লওয়ায় রাজা মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কক্রুয়া দুর্গ ও ভূষণা দুর্গ পুনর্দ্দখল করিল (১৫৯৬ খৃঃ ২০শে জুন)। ভূষণা দুর্গের যুদ্ধে সুলেমান নিহত হইল ও কেদার রায় আহত হইয়া ঈশা খাঁর নিকট পলায়ন করিল।

বর্ষাকালে (১৫৯৬ খৃঃ জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর) রাজা মানসিংহ ঘোড়াঘাটে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায়, ঈশাখাঁ, মাসুম কাবুলী প্রভৃতি বিদ্রোহীগণ নৌবহর লইয়া রাজার শিবির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল কিন্তু শীঘ্রই নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় তাহারা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। রাজা আরোগ্য লাভ করিয়াই হিম্মৎ সিংহকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহীরা পলাইয়া গেল এবং হিম্মৎ সিংহ এগারসিন্দুব দখল করিয়া লইয়া চারিদিকে লুণ্ঠন চালাইতে লাগিল।

কুচবিহারের মিত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা রঘুদেব ও ঈশা খাঁ এই সময় আক্রমণ করে। মানসিংহ ঐ সময় সলিম নগরে ছিলেন। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের সাহায্যার্থ গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে তথায় লক্ষ্মীনারায়ণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন (১৫৯৬খৃঃ ২৩শে ডিসেম্বর)। অতঃপর রঘুদেব ও ঈশা খাঁ ভীত হইয়া পলায়ন করে। ইহার প্রায় তিন মাস পর রাজার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ সাহসী পুত্র হিম্মত সিংহ বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ (১৫৯৭ খৃঃ, ১৬ই মার্চ্চ) করায় রাজা মানসিংহ

ইতিমধ্যে কতল খাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেমান ও ওসমান উড়িষ্যা হইতে সাতগাঁ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন চালাইতে লাগিল কিন্তু তথায় বাধা পাইয়া ভূষণায় (যশোর জেলা) আশ্রয় লইল। এখানে তাহাদের আশ্রয়দাতা [কেদার রায়ের পুত্র] চাঁদ রায়কে

মৃত্যু হয় এবং তাহার উজির খাজাইশার পরামর্শে কতলুর অল্পবয়স্ক পুত্র নাসির খাঁ। ১৫ই আগষ্ট তারিখে মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। সন্ধির নিয়মানুসারে জগন্নাথ দেবের মন্দির ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলি বাদসাহের অধিকারে চলিয়া যায় এবং বাদসাহ ১০০টি হস্তী ও অনেক উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। অতঃপর মানসিংহ বিহারে চলিয়া যান (আকবর নামা)। ইতিমধ্যে উজির খাজা ইশার মৃত্যু হইলে ১৬৯১ খৃঃ বর্ষা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পাঠানেরা পুনরায় জগন্নাথ মন্দির দখল করে এবং বীর হাম্বিরের রাজ্য আক্রমণ করে। [এই সকল ঘটনা বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের পটভূমি স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে]। ১৫৯১ খৃঃ ৩রা নবেম্বর মানসিংহ তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে বাঙলার সুবাদার সৈয়দ খাঁ তাঁহার সহিত সসৈন্য যোগ দেন। ১০ই এপ্রিল, ১৫৯২ খৃঃ সমগ্র আফগান বাহিনী সুবর্ণরেখা অতিক্রম করিয়া বেনাপুরের জঙ্গলে উপস্থিত হইয়া মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করে। কিন্তু মোগল কামানসমূহ ও তীরন্দাজ সৈন্য পাঠান সৈন্য দলের মধ্যে ভীষণ হত্যা কাণ্ডের সৃষ্টি করে তাহাদের রণগজসমূহ ধ্বংস করে। তাহাদের অন্যতম সেনাপতি খাজা ওয়াজ নিহত হয়, সেনাপতি সুলতান শূর মোগল হস্তে বন্দী হয়। এই যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ ও দুর্জ্জন সিংহের বাহুবলে ও রণকৌশলে মোগল বাহিনী জয়লাভ করে। কিন্তু বাঙলার সুবাদার সাদ খাঁ ঈর্ষা পরবশ হইয়া রাজার অনুরোধ স্বত্বেও বাঙলায় ফিরিয়া যান।

অতঃপর কটকের বিদ্রোহী দিগকে পরাজিত করিয়া রাজা মানসিংহ কটক অধিকার করেন, কটক হইতে রাজা জগন্নাথ ক্ষেত্রে তীর্থ যাত্রা করেন। অতঃপর খুর্দ্দা রাজ্য আক্রমণ করিলে খুর্দ্দার বিদ্রোহী রাজা রামচন্দ্র দেব আত্মসমর্পণ করেন এই অবসরে আফগানগণ রাজার পশ্চাদ্ভাগে জলেশ্বর সহর কাড়িয়া লয়। কিন্তু মোগল সৈন্য তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ৩০শে মে সারঙ্গগড় মোগলগণ অধিকার করে। ১৫৯৩ খৃঃ ৩০ জানুয়ারী খুর্দ্দারাজ রামচন্দ্র দেব স্বয়ং মানসিংহের দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁহার এক কন্যাকে রাজা মানসিংহের সহিত বিবাহ দেন। এইরূপে উড়িষ্যা বিজয় আপাতত শেষ হয়। ১৫৯৪ খৃঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী মানসিংহ সম্রাটের আদেশে লাহোরে সম্রাটের সহিত দেখা করেন।

হত্যা করিয়া ভূষণা দুর্গ দখল করিল (১৫৯৩ খৃঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী)।

১৫৯৪ খৃঃ ৭ঠা মে মানসিংহ আগ্রা হইতে রওনা হইলেন এবং তাণ্ডায় পৌছিয়া সুবে বাঙলার বিভিন্ন পরগণায় বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যদল পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পুত্র হিম্মত সিংহ এইরূপ একটি সৈন্যদল লইয়া ভূষণা দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন (১৫৯৫ খৃঃ ২রা এপ্রিল)। ঐ বৎসর ৭ই নবেম্বর মানসিংহ অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া রাজমহলে সুবে বাঙলার নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং তাহার নাম আকবর নগর রাখিলেন। এই স্থান হইতে ৭ই ডিসেম্বর ভাটি প্রদেশে (পুর্ব্ববঙ্গ) ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলাকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। আফগানগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং মানসিংহ সেরপুর মূর্চ্চায় (বগুড়া জেলা) শিবির সন্নিবেশ করিয়া তথায় সলিম নগর নামক অস্থায়ী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। উড়িষ্যার কত্রুয়া দুর্গের অধিপতি গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করায় এবং বাঙলায় খাজা সুলেমান লোহানী ও কেদার রায় ভূষণা দুর্গ পুনরায় দখল করিয়া লওয়ায় রাজা মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কত্রুয়া দুর্গ ও ভূষণা দুর্গ পুনর্দ্দখল করিল (১৫৯৬ খৃঃ ২০শে জুন)। ভূষণা দুর্গের যুদ্ধে সুলেমান নিহত হইল ও কেদার রায় আহত হইয়া ঈশা খাঁর নিকট পলায়ন করিল।

বর্ষাকালে (১৫৯৬ খৃঃ জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর) রাজা মানসিংহ ঘোড়াঘাটে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায়, ঈশাখাঁ, মাসুম কাবুলী প্রভৃতি বিদ্রোহীগণ নৌবহর লইয়া রাজার শিবির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল কিন্তু শীঘ্রই নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় তাহারা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। রাজা আরোগ্য লাভ করিয়াই হিম্মৎ সিংহকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহীরা পলাইয়া গেল এবং হিম্মৎ সিংহ এগারসিন্দুব দখল করিয়া লইয়া চারিদিকে লুণ্ঠন চালাইতে লাগিল।

কুচবিহারের মিত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা রঘুদেব ও ঈশা খাঁ এই সময় আক্রমণ করে। মানসিংহ ঐ সময় সলিম নগরে ছিলেন। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের সাহায্যার্থ গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে তথায় লক্ষ্মীনারায়ণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন (১৫৯৬খৃঃ ২৩শে ডিসেম্বর)। অতঃপর রঘুদেব ও ঈশা খাঁ ভীত হইয়া পলায়ন করে। ইহার প্রায় তিন মাস পর রাজার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ সাহসী পুত্র হিম্মত সিংহ বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ (১৫৯৭ খৃঃ, ১৬ই মার্চ্চ) করায় রাজা মানসিংহ

অত্যন্ত দুঃখিত হন। আবার এই ঘটনার অনতিকাল মধ্যেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎসিংহ পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য অঞ্চল নগরকোটে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া (১৫৯৭ খৃঃ এপ্রিল-১৫৯৮ খৃঃ জুন) তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়।

অতঃপর রঘুদেব পুনরায় কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিলে মানসিংহের একদল সৈন্য তাহাকে পরাজিত করে (১৫৯৭ খৃঃ ৩রা মে)। কিন্তু মোগল সৈন্য ফিরিয়া আসিবামাত্র ঈশা খাঁ রঘুদেবের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। সংবাদ পাইয়া মানসিংহ পুত্র দুর্জ্জন সিংহকে জল ও স্থল উভয় পথে ঈশা খাঁর প্রধান আশ্রয় কত্রাভু আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু বিক্রমপুর হইতে ১২ মাইল দূরে ঈশা খাঁ ও মাসুম খাঁ একটি বৃহৎ নৌবহর লইয়া মোগলবাহিনীকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। দুর্জ্জন সিংহ ও তাহার অনেক সৈন্য নিহত হয় ও কিছু সৈন্য বন্দী হয়। তথাপি ঈশা খাঁ নানাদিক চিন্তা করিয়া সম্রাটের বশ্যতাস্বীকার করিয়া সন্ধি করিলেন (আকবর নামা)।

উপর্যুপরি দুইটি পুত্রকে হারাইয়া মানসিংহ সম্রাটের অনুমতিক্রমে বিশ্রাম লাভার্থ আজমীর চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংহকে সম্রাট সুবে বাঙলায় প্রেরণ করিলেন (১৫৯৮ খৃঃ)। ইতিমধ্যে ঈশা খাঁর মৃত্যু হওয়ায় (১৫৯৯ খৃঃ সেপ্টেম্বর) একজন প্রধান বিদ্রোহী চলিয়া গেল। ১৫৯৯ খৃঃ ৬ই অক্টোবর আগ্রায় অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে জগৎসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র মহাসিংহ তৎস্থলে সুবে বাঙলায় প্রেরিত হইলেন। এই সুযোগে ওসমান খাঁ, গাজয়াল খাঁ ও অন্যান্য পাঠানদলপতি পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিল এবং মহাসিংহ ও তাহার অভিভাবক খুল্লতাত প্রতাপসিংহের সৈন্যদলকে পরাস্ত করিল (১৬০০ খৃঃ ২৯ এপ্রিল)। পাঠানেরা উড়িষ্যা অধিকার করিয়া লইল। বাঙলাতেও আরও কয়েক স্থানে পাঠানেরা বিজয়ী হইল। এমনকি মোগল বাহিনীর পরিদর্শক আব্দুর রজ্জাক মামরী তাহাদের হস্তে বন্দী হইল।

এই সমস্ত দুর্ঘটনায় মানসিংহকে বাধ্য হইয়া সুবে বাঙলায় ফিরিয়া আসিতে হইল। সেরপুর আটিয়ার (ময়মনসিংহ জেলা) যুদ্ধে সমগ্র পাঠান বাহিনীকে তিনি ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া বন্দী ও আব্দুর রজ্জাককে উদ্ধার করিলেন (১৬০১ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী)। পরবৎসর তিনি ঢাকা অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়কে বশ্যতাস্বীকার করিতে প্ররোচিত করিলেন। এই সময় বাজ-ঘোগরার জালাল খাঁ মালদহ ও আকরা দখল করায় তিনি ঘোড়াঘাট হইতে পৌত্র মহাসিংহকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জালাল খাঁ

৫০০ অশ্বারোহী ও ৫০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া (মালদহ সহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত) কালিন্দী নদীর অপর পারে অবস্থান করিতেছিল। মহাসিংহ অশ্বপৃষ্ঠে সসৈন্যে নদী পার হইয়া জালাল খাঁর উপর পতিত হইলেন। জালাল খাঁর সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল ও জালাল খাঁ পলায়ন করিল। অতঃপর মহাসিংহ পূর্ণিয়া জেলায় প্রবেশ করিয়া তত্রত্য বিদ্রোহী নেতা কাজি মথিনকে নিহত করিলেন।

কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান খাঁ ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ময়মনসিংহের মোগল থানাদার বাজ বাহাদুর কালমাক্‌কে ভাওয়ালে বিতাড়িত করায় মানসিংহ ঢাকা হইতে ২৪ ঘণ্টায় ভাওয়ালে উপস্থিত হন এবং বানার নদীর তীরে ওসমানকে আক্রমণ করিয়া বহু বিদ্রোহীকে নিহত ও বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং পুনরায় থানাদার বাজ বাহাদুরকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঢাকায় ফিরিয়া যান (১৬০২ খৃঃ ফেব্রুয়ারী)। অতঃপর ঈশাখাঁর পুত্র মুশা খাঁ ও শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের ও অন্যান্য বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে ইছামতী নদীর অপর পারে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীগণ জলপথ সমূহ অবরুদ্ধ করিয়া ঐ সৈন্যদলকে বাধা দিতে থাকে। অবশেষে স্বয়ং মানসিংহ ঢাকা হইতে সাহাপুরে উপস্থিত হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে ইছামতী নদীগর্ভে নামিয়া পড়িলে রাজার দলবল অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার অনুগমন করিয়া নদী পার হইয়া বিপক্ষগণকে আক্রমণ করে। শত্রুপক্ষ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে রাজা ও তাঁহার সৈন্যদল তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে নারায়ণগঞ্জ ও সুরাজদির মধ্যে উপস্থিত হয়। এই স্থানে অন্যতম ভৌমিক সের গাজি রাজার শিবিরে আসিয়া আত্ম-সমর্পণ করিলে রাজা বিক্রমপুর ও শ্রীপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু অন্যতম বিদ্রোহী নেতা (কতলু খাঁর উজির পুত্র) দায়ুদ ও অন্যান্য পাঠান বিদ্রোহী সোনার গাঁয় পলাইয়া যাওয়ায় রাজা ঢাকায় ফিরিয়া যান।

অতঃপর মগ জলদস্যুগণ ঢাকার জলপথগুলি আক্রমণ করিয়া ত্রিমোহিনী দুর্গ অবরুদ্ধ করে এবং অনেকগুলি মোগল শিবির আক্রমণ করিতে থাকে। রাজা মানসিংহ ইব্রাহিম বেগ আটকা, রঘুদাস, আস্করণ, দলপৎরাও প্রভৃতি নৌসেনাগণকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে বহুসংখ্যক মগদস্যু নিহত হইলে তাহারা তাহাদের নৌকায় পলায়ন করে কিন্তু মোগল কামান সমূহের গোলার আঘাতে তাহাদের বহু নৌকা জলমগ্ন হয় (১৬০৩ খৃঃ আগষ্ট)।

এই সময় কেদার রায়[১] তাঁহার বিপুল নৌবহর লইয়া মগদের সহিত যোগদান

১। আকবর নামায় কেদার রায়কে চাঁদরায়ের পিতা বলা হইয়াছে।

করতঃ শ্রীনগরের মোগল সেনানিবাস আক্রমণ করেন। বিক্রমপুরের নিকট ভীষণ যুদ্ধে কেদার রায় স্বয়ং আহত ও বন্দী হন। কিন্তু তাঁহার আহত দেহ মানসিংহের নিকট নীত হইবামাত্র তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। এই যুদ্ধে বহু পর্ত্তুগীজ জলদস্যু ও বাঙালী নৌযোদ্ধা জীবনদান করে। মগ-রাজাও নিজ রাজ্যে প্রস্থান করে। অতঃপর মানসিংহ ঢাকায় গমন করেন এবং তথা হইতে নাজিরপুরে যাইয়া বর্ষাকাল যাপন করেন (১৬০৪ খৃঃ জুলাই)।

পর বৎসর (১৬০৫ খৃঃ) আকবর স্বীয় অন্তিমকাল আসন্ন দেখিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরগণকে নিজের নিকট ডাকিয়া পাঠাইলেন। ১১ই মার্চ্চের সমকালে মানসিংহ আগ্রায় পৌছিয়া সম্রাটের মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৬০৫ খৃঃ ১৫ই অক্টোবর) তাঁহার নিকট রহিয়া গেলেন (আকবরনামা)[১]।

কিন্তু ঘটক কারিকার মতে ঘৃতকৌশীক গোত্রীয় দেব বংশীয় রামদেব রায়ের পুত্র রায় মুকুটের দ্বিতীয় পুত্র যাদব রায়ের পুত্র চাঁদ রায় ও তৎপুত্র কেদার রায়। কেদার রায় চন্দ্রদ্বীপ পতি পরমানন্দ রায়ের পুত্র রাম রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ভূষণার রাজা মুকুন্দ রায়ও রামদেব রায়ের বংশীয় ছিলেন। (কায়স্থ সমাজ পত্রিকা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)।

১। আকবরের সময়ের একটি ঘটনা খুব প্রসিদ্ধ। ইহা 'আনারকলি' নাম্নী এক রূপসী তরুণীর মর্ম্মন্তুদ জীবনাবসান। আনারকলির আসল নাম নাদিরা বেগম। বিদেশী পর্য্যটক উইলিয়ম ফিঞ্চের বিবরণীতে এই রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৬১১ খৃঃ ফিঞ্চ ইরাবতীর তীর ধরিয়া লাহোরের পথে চলিতে-ছিলেন। দেখিলেন একটি স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া সাহেব জানিতে পারিলেন আফগানিস্থানের এক গরীবের ঘরের মেয়ে ছিল নাদিরা বেগম। আমীরের হারেমে থাকিয়া সে নৃত্যগীতে পারদর্শিনী হইয়াছিল। একবার বাদসাহ আকবর আফগানিস্থানে আমীরের দরবারে উপস্থিত। তিনি দরবারে নাদিরাকে দেখিয়া তাহার রূপ ও গুণের প্রশংসা করিলেন। দিল্লীতে ফিরিবার সময় অন্যান্য উপহারের সহিত আমীর নাদিরাকেও উপঢৌকন দিলেন। আকবর প্রথমে তাহার নাম দিলেন সরিফুন্নিশা (গর্ব্বিত রমণী)। প্রৌঢ় আকবরের জীবনে সরিফুন্নিশা যখন একটি বাসনার বস্তু হইয়া উঠিল, তখন বাদসাহ আদর করিয়া তাহাকে 'আনারকলি' বলিয়া ডাকিতেন। ক্রমে আনারকলির জীবনে নেপথ্যে আবির্ভূত হইল যুবরাজ সেলিম—ভারতের পরবর্ত্তী বাদসাহ। ক্রমে কথাটা উঠিল আকবরের কানে। আকবর আনারকলিকে জীবন্ত কবর

জাহাঙ্গীর (সেলিম) সম্রাট হইয়া পক্ষকাল মধ্যেই রাজা মানসিংহকে তৃতীয়বার সুবে বাঙলার সুবেদার করিয়া পাঠাইলেন (১৬০৫ খৃঃ ১০ই নভেম্বর)। তখনও জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসাকে ভুলিতে পারেন নাই। মেহেরউন্নিসা তখন তাঁহার বিবাহিত স্বামী বর্দ্ধমানের জায়গীরদার তুর্কী জাতীয় সের-আফগান ইস্তাজলুর সহিত বাস করিতেছিলেন। রাজা মানসিংহ সুবে বাঙলার সুবাদার থাকিলে জাহাঙ্গীরের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনা না থাকায়, সম্রাট তাঁহাকে বিহারের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন এবং তৎস্থলে তাঁহার পালিতভ্রাতা কুতুবুদ্দিন খাঁ কোকাকে বাঙলার সুবাদারী প্রদান করিলেন। অতঃপর ১৬০৮ খৃঃ মার্চ্চ মাসে রাজা মানসিংহ সম্রাটের আদেশে বিহারের সুবাদারী ত্যাগ করিয়া আগ্রায় চলিয়া গেলেন (তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী)।

৬। কুতুবউদ্দিন খাঁ কোকা (১৬০৬-০৭ খৃঃ)। জাহাঙ্গীর কুলী বেগ (১৬০৭-০৮ খৃঃ)।

কুতুবুদ্দিন খাঁ কোকা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের মে পর্য্যন্ত সুবাদার থাকিয়া বর্দ্ধমানের ফৌজদার সের আফগানের হস্তে নিহত হন। সের আফগানও বাদসাহী ফৌজের হস্তে নিহত হন। তৎপর জাহাঙ্গীর কুলী বেগ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সুবাদার হন। তিনি ১৬০৮ সালের এপ্রিল মাসে বাঙলাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৭। ইছলাম খাঁ (১৬০৮-১৩ খৃঃ)।

তৎপর ইছলাম খাঁ (সেক আলাউদ্দিন চিস্তি) ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সুবাদার হন। ইনি প্রসিদ্ধ দরবেশ সেখ সলিম চিস্তির পৌত্র। তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী ও ইকবালনামা হইতে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের অনেক বিবরণ জানা যায়। কিন্তু মির্জ্জা নথন রচিত বাহারিস্তান-ঘাইবী নামক সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে তাৎকালিক সুবে বাঙলার ইতিহাসের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। বাহারিস্তানের প্রথম খণ্ডের নাম ইছলামনামা (ইছলাম খাঁর সুবেদারীর ইতিহাস)। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম কাশিমনামা (কাশিম খাঁর সুবেদারীর

দিতে আদেশ দিলেন। স্বয়ং সেলিমের মাতা মহারাজ্ঞী যোধবাই সম্রাটের নিকট তাহার প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। কোন ফল হয় নাই। সেলিম সম্রাট হইয়া সেই স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অন্যরূপ গল্পও আছে।

ইতিহাস)। তৃতীয় খণ্ডের নাম ইব্রাহিমনামা (ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের সুবেদারীর ইতিহাস) ও চতুর্থ খণ্ডের নাম ওয়াকিয়াৎ-ই-জহান সা (বিদ্রোহী কুমার সাহজহান অধিকৃত সুবে বাঙলার ইতিহাস)।

১৬০৮ খৃঃ জুনমাসের প্রথম দিকে ইছলাম খাঁ রাজমহলে পৌছিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমেই অকর্ম্মণ্য ও অসৎ কর্ম্মচারীগণকে বরখাস্ত করিলেন এবং মাসুম খাঁ কাবুলীর পুত্রগণ ও লাচিন খাঁ কাকশালের ন্যায় সন্দিগ্ধ চরিত্রের আফগান প্রধানগণকে সদর দরবারে প্রেরণ করিলেন। বর্ষা অন্তে নূতন মীরবহর (Admiral) ইতিমাম খাঁ ইছলাম খাঁর সহিত যোগদান করিলেন। ইতিমধ্যে বোকাইন নগরের খাজা ওসমান (ময়মনসিং জেলার) আলাপসাহীর মোগল থানা আক্রমণ করিয়া থানাদার সজাওয়াল খাঁ নিয়াজিকে নিহত করতঃ ঐ থানা দখল করিলে ইছলাম খাঁ তাঁহার ভ্রাতা সেখ গিয়াসুদ্দিনকে (ইনায়েত খাঁ) সসৈন্যে প্রেরণ করেন। সেখ গিয়াসুদ্দিন অনায়াসে ঐ থানা পুনর্দ্দখল করিতে সমর্থ হন। এই সময় যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ইছলাম খাঁর দরবারে উপযুক্ত উপহারসহ সেখ বদী ও কনিষ্ঠপুত্র সংগ্রামাদিত্যকে প্রেরণ করেন। কুমার সংগ্রামাদিত্য এই নিয়মে তথায় রহিয়া গেলেন যে স্বয়ং প্রতাপাদিত্যকে উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ লইয়া আলাইপুরে সুবেদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে ও মুশাখাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে মোগলপক্ষকে সাহায্য করিতে হইবে।

রাজমহলে বসিয়াই ইসলাম খাঁ তাঁহার যুদ্ধের নীতি ও পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং প্রধান শত্রু সোনার গাঁয়ের ভৌমিক মুশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বর্ষা শেষ হইলে ইছলাম খাঁ একটি বৃহৎ সৈন্যদল ও ২৯৫ খানি রণতরী লইয়া স্থল ও জলপথে অভিযান আরম্ভ করিলেন। মীরবহর ইতিমাম খাঁর তত্ত্বাবধানে কামান ও নৌবহর তিতুলিয়া (মালদহজেলা) পর্য্যন্ত আসিয়া চিলা জোয়ারের (ভাতুড়িয়া পরগণার অংশ) রাজস্ব আদায়কারীর নিকট জানিতে পারিলেন যে মীর্জ্জা মমিন, দরিয়া খাঁ ও মধুরায় নামক বিদ্রোহী ভৌমিক গণ ইতিমাম খাঁর অন্যতম জায়গীর সোনাবাজু পরগণা ও তাহার প্রধান নগর চাটমহর (পাবনাজেলা) অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইতিমাম খাঁর হাতে যে স্বল্প সৈন্য ছিল তাহা পাঠাইয়া বিশেষ ফল না হওয়ায় তিনি ইছলাম খাঁর নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু ইতিমাম খাঁ ইছলাম খাঁর সহিত মিলিত হইবা মাত্র ইছলাম খাঁ তথা হইতে অগ্রসর হইয়া পরগণে গৌড়ে (মালদহ জেলা) শিবির স্থাপন করিলেন এবং

তথা হইতে বীরভূমের (বিষ্ণুপুর) জমিদার বীর হাম্বীর পঞ্চকোটের জমিদার সমস খাঁর ও হিজলীর জমিদার সলিম খাঁর বিরুদ্ধে সেনাপতি কামাল খাঁকে প্রেরণ করিলেন। বীর হাম্বীর ও সলিম খাঁ বিনাযুদ্ধে বশ্যতাস্বীকার করিলেন। সমস খাঁ ১৪ দিন যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করিলেন।

ইছলাম খাঁ ক্রমশ (মুর্শিদাবাদ জেলার) গোয়াস পরগণায় গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন (১৬০৯ খৃঃ জানুয়ারী)। তথা হইতে পদ্মানদী পার হইয়া (রাজসাহী জেলার পুঁঠিয়া হইতে ১২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত) গঙ্গাতীরে আলাইপুরে পৌছিলেন। নাবাধ্যক্ষ ইতিমাম খাঁ পরে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এখান হইতে তিনি ভূষণার রাজ্য মুকুন্দরায়ের পুত্র রাজা শত্রাজিতের বিরুদ্ধে সেনাপতি ইফতিখার খাঁকে প্রেরণ করিলেন। শত্রাজিৎ আটা খালের (বর্ত্তমান নাম মালুয়ার খাল—যশোর জেলার নড়াইলের এক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত) তীরে শক্তিশালী দুর্গ প্রস্তুত করিয়া শত্রুকে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মোগল সৈন্য তাহাদের গুপ্তচরের সাহায্যে কিছুদূরে অগভীর জলে খাল পার হইতে সমর্থ হওয়ায় রাজা শত্রাজিৎ আত্মসমর্পণ করিলেন। ইছলাম খাঁ শত্রাজিতের রাজ্য বজায় রাখিলেন এবং তাঁহাকে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন[১]।

আলাইপুরে সেখ কামালের সহিত বীরভূম, পঞ্চকোট (পাঁচেট) ও হিজলীর ভৌমিকগণ আসিয়া ইছলাম খাঁর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বশ্যতা জ্ঞাপন করে। ইছলাম খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের জমিদারী বহাল রাখেন।

আলাইপুর হইতে (ইতিমাম খাঁর জায়গীর) সোনাবাজু পরগণা উদ্ধারের জন্য ইছলাম খাঁ মীর্জ্জানাথানকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। মীর্জ্জা নাথান চাটমহরে

১। রাজা শত্রাজিতের পিতা রাজা মুকুন্দরায় মুরাদ খাঁর মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণকে বধ করিয়া ফতেহাবাদ অধিকার করিয়া লয় (আকবরনামা, তৃতীয়ভাগ ৪৬৯ পৃঃ)। রাজা মানসিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে পুত্র হিম্মৎসিংহকে প্রেরণ করিলে তিনি নামমাত্র বশ্যতাস্বীকার করেন। কিন্তু ভূষণা দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ফতেহাবাদে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন (আকবর নামা, তৃতীয়ভাগ, ১০২৩ পৃঃ)। মুকুন্দরায়ের মৃত্যুর পর শত্রাজিৎ রাজা হন। বগুড়া জেলার সেরপুরের নিকট মীর্জ্জাপুরে মোরাদ খাঁ নির্ম্মিত শিলালিপি যুক্ত মসজিদ (বগুড়ার ইতিহাস দ্রষ্টব্য) আছে ও তাহার নিকট রাজ বাড়ী মুকুন্দ নামক স্থানে মুকুন্দ রায়ের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এবং শত্রাজিৎ বালা নামক স্থান দৃষ্ট হয়।

পৌছিয়া দেখিলেন শক্ররা পূর্ব্বেই পলাইয়া করতোয়া ও আত্রাই নদীর সঙ্গমস্থলে চলিয়া গিয়াছে।

মীর্জ্জা নাথান চাটমহর হইতে (পাবনা শহরের ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) আত্রাই নদীতীরে সাহপুর নামক স্থানে যাইয়া ইছলাম খাঁর নিকট হইতে আরও সাহায্যের প্রতীক্ষায় তথায় তিনটি সুরক্ষিত দুর্গ স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইছলাম খাঁর আদেশে ইফতিখার খাঁ ও রাজা শত্রাজিৎ নূতন সৈন্যদল লইয়া নাজিরপুরের (পাবনা জেলা) মধ্যদিয়া বিপক্ষের সুরক্ষিত স্থান (পাবনা সহরের ৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত ইছামতী নদীতীরস্থ) একদণ্ডা অভিমুখে গমন করিলেন। একদণ্ডায় মীর্জ্জা নাথানের সৈন্যদল তাহাদের সহিত মিলিত হইল। এখানে আসিয়া তাহারা দেখিল শক্ররা সোনার গাঁয়ে মুশা খাঁর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

অতঃপর সাহাপুর থানার নিকট আত্রাই নদীর অপরতীরে রাজা প্রতাপাদিত্য স্বয়ং ইছলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্থির হইল রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজ্যে পৌছিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যের নেতৃত্বে ৪০০ রণতরী সম্রাটের নৌবহরের সহিত যোগদান করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন। এবং বর্ষা অন্তে রাজা স্বয়ং ২০০০০ পাইক, এক হাজার অশ্বারোহী, ১০০ রণতরী লইয়া মুশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিবেন এবং ঐ সময় ইছলাম খাঁও ঘোড়াঘাটের মধ্যদিয়া মুশা খাঁর রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবেন।

১৬০৯ খৃঃ ২রা জুন ইছলাম খাঁ ঘোড়াঘাটে পৌছিয়া বর্ষাবাসের জন্য তথায় ছাউনি স্থাপন করিলেন। ইছলাম খাঁর সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা ও সতর্কতা সত্ত্বেও এই সময় স্থানীয় কোন কোন জমিদার মোগল জায়গীরদারদের জায়গীর আক্রমণ করিতে লাগিল। পাবনা জেলার অন্যতম ভৌমিক রাজারায় আলপসিংহের থানাদার তকমাক খাঁর জায়গীরের প্রধান নগর সাহাজাদপুর (পাবনা জেলা) আক্রমণ করেন কিন্তু তকমাক খাঁ তাঁহাকে বিতাড়িত করে। ঢাকার মহকুমা মানিকগঞ্জের বিনোদ রায় নামক এক স্থানীয় জমিদার মিরাক বাহাদুর জলাইর নামক একজন উচ্চপদস্থ মোগলের জায়গীর চাঁদপ্রতাপ পরগণা (মানিকগঞ্জ মহকুমার উত্তরাংশ) আক্রমণ করেন। সোনা বাজু পরগণার মির্জ্জা মমিন, দরিয়া খাঁ ও মধুরায় নামক অপর তিনজন মোগল বিতাড়িত জমিদার বিনোদ রায়কে সাহায্য করে। কিন্তু সাহাজাদপুর হইতে নূতন মোগল সৈন্য আসিয়া পড়ায় আক্রমণকারিগণ হটিয়া যায়।

এই সময় কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কোচ

হাজোর (কামরূপ) রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণের বিবাদ উপস্থিত হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ ইছলাম খাঁর নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ইছলাম খাঁ আব্দুল ওয়াহিদকে কামরূপ আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পরীক্ষিৎনারায়ণের হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন। অপরদিকে ফতেহাবাদের জমিদার মজলিস কুতবের বিরুদ্ধে ইছলাম খাঁ তাঁহার ভ্রাতা সেখ হবিবুল্লাকে প্রেরণ করিলেন। ইছলাম খাঁর অনুরোধে ভূষণার রাজা শত্রাজিৎ হবিবুল্লার সহিত যোগ দিলেন। মুশা খাঁও মজলিস কুতবের সাহায্যার্থ মীর্জ্জা মমিনকে প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে মোগল পক্ষের জয় হইল এবং ফতেহাবাদের দুর্গ অধিকৃত হইল। মজলিস কুতব ও মীর্জ্জা মমিন পলাইয়া মুশা খাঁর আশ্রয়ে গমন করিল।

১৬০৯ খৃঃ অক্টোবরের শেষে ইছলাম খাঁ ঘোড়াঘাটের ছাউনি ত্যাগ করিয়া করতোয়া-নদী-পথে সাহাজাদপুর ও তথা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বলিয়ায় (বোয়ালিয়ায়) উপস্থিত হইলেন। এখানে বসিয়া তিনি মুশা খাঁকে আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি ২০ রণতরী, ২০০০ বন্দুকধারী ৫০ টি কামান ও ১০০ মণ বারুদ ও ১০০ মণ গন্ধকাদিসহ সেখ কামাল, তকমাক খাঁ ও মিরাক বাহাদুর জলাইরকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং মূলবাহিনী ও নৌবহর লইয়া যাত্রাপুরের পথে পশ্চিমদিক হইতে মুশা খাঁকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

বর্ত্তমান ঢাকা জেলার প্রায় অর্দ্ধাংশ, বর্ত্তমান ত্রিপুরার অর্দ্ধাংশ, (সুসঙ্গ-রাজ রাজা রঘুনাথের রাজ্য ও খাজা ওসমানের রাজ্য বাদে) ময়মনসিং জেলা সম্পূর্ণ এবং বর্ত্তমান রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার কিয়দংশ মুশাখাঁর পিতা ঈশা খাঁর এলাকাভুক্ত ছিল। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর (১৫৯৯ খৃঃ সেপ্টেম্বর) মুশা খাঁ পিতার এই বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুশা খাঁর শাসনকেন্দ্র ছিল পদ্মা, শীতল লক্ষ্যা ও মেঘনার তাৎকালিক সঙ্গমস্থলে। তাঁহার খিজিরপুর দুর্গ দুলাই ও শীতল লক্ষ্যা নদীর মিলন স্থলে ঢাকা যাইবার একমাত্র জলপথের উপর অবস্থিত ছিল। খিজিরপুরের বিপরীত দিকে লক্ষ্যা নদীর অপর তীরে ছিল মুশা খাঁর পরিবারবর্গের বাসস্থান কত্রাভূ। বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের অপর দিকে মুশা খাঁর অপর সুরক্ষিত স্থান কদম রছুল এবং খিজিরপুরের ৩ মাইল পূর্ব্বে ও ঢাকার ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে মুশা খাঁর সুরক্ষিত রাজধানী সোনার গাঁ অবস্থিত ছিল। এই সোনার গাঁ তৎকালে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। পদ্মা, ধলেশ্বরী ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে মুশা খাঁর অপর একটি সুরক্ষিত স্থান ছিল যাত্রাপুর। রাজমহল হইতে ঢাকা যাইতে হইলে এই যাত্রাপুর হইয়া

ইছামতী দিয়া যাইতে হইত। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর ও শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের মৃত্যুর পর এই দুইটি সুরক্ষিত সহরকে মুশা খাঁ মোগল বাহিনীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। মুশা খাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা আতাউল খাঁ ও তাঁহার নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাযুদ খাঁ, আব্দুল্লা খাঁ ও মাসুদ খাঁ তাঁহার সহকারী ছিলেন। কেবলমাত্র অপর ভ্রাতা ইলিয়া খাঁ মুশা খাঁর প্রথম পরাজয়ের পরেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। মুশা খাঁর অপর প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী খাজা চাঁদ, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী হাজি সমসউদ্দিন বগদাদী এবং তাঁহার শক্তিশালী নৌবহরের অধ্যক্ষ আদিল খাঁ।

এতদ্ব্যতীত 'দ্বাদশ ভৌমিক' নামে প্রসিদ্ধ ভৌমিকগণ এই স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল। বাহারী স্থানে যদিও পুনঃ পুনঃ 'মুশা খাঁ ও দ্বাদশ ভৌমিক' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু এই দ্বাদশ ভৌমিক কাহাদিগকে লইয়া গঠিত তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই। একস্থানে, তাঁহার সহায়ক ভৌমিকদের মধ্যে (১) বাহাদুর গাজী, (২) সোনা গাজী, (৩) আনোয়ার গাজী (৪) সেখ পীর, (৫) মীর্জ্জা মমিন, (৬) মধুরায় (খলসীর জমিদার), (৭) বিনোদ রায়, (চাঁদ প্রতাপের জমিদার), (৮) পালোয়ান, (৯) হাজি সমসউদ্দিন বাগদাদীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার সহিত যশোহরের প্রতাপাদিত্য ও চন্দ্রদ্বীপের ও ভুলুয়ার রাজাকে ধরিলে দ্বাদশ ভৌমিক হয়।

বাহাদুর গাজীকে চৌড়ার জমিদার বলা হইয়াছে। ইহার শক্তিশালী নৌবহর ছিল। সোনা গাজী ত্রিপুরা জেলার উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত সরাইলের জমিদার ছিলেন। পালোয়ান সরাইলের উত্তরে ও তরফ নামক স্থানের দক্ষিণে মাতঙ্গ নামক স্থানের জমিদার ছিলেন। শ্রীহট্টের আফগানগণের নেতা বায়াজিদ কররানীও মুশা খাঁর একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন। তাঁহার বহুসংখ্যক রণহস্তী ছিল। বায়াজিদ শেষ পর্য্যন্ত খাজা ওসমানের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে মুশা খাঁকে সাহায্য করিয়াছিলেন। খাজা ওসমান ইশা খাঁ লোহানী মিঞা খেলের পুত্র ছিল। বানিয়াচঙ্গের (শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমা) দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও মাতঙ্গের উত্তরে তরফ নামক পার্ব্বত্য অঞ্চল ওসমানের অধিকারভুক্ত ছিল এবং ইহা ওসমানের পুত্র মমরিজ ও ওসমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মালহীর বাহুবলে রক্ষিত হইতেছিল। ওসমান স্বয়ং ময়মনসিং জেলার বোকাই নগরের দুর্গ ও হাসানপুর দুর্গ ও এগার সিন্দুর দুর্গ রক্ষা করিতেন। বানিয়াচঙ্গ আনোয়ার গাজীর জমিদারী ছিল।

ইছলাম খাঁ বলিয়া হইতে অভিযান করিয়া পদ্মা, ইছামতী ও ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থলে কটাসগড়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাবাধ্যক্ষ ইতিমাম খাঁও তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং ত্রিমোহিনীর নিকটে তিনটি দুর্গ স্থাপন করিল। কটাসগড়ের কিছু দূরে ভাটিতেই ঈশা খাঁর যাত্রাপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ অবস্থিত ছিল। এই দুর্গকে লক্ষ্য করিয়া ইছলাম খাঁ স্থল সৈন্য লইয়া ইছামতী নদীর তীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অধিকৃত অংশে সুরক্ষিত ঘাঁটিসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সমস্ত ঘাঁটি ও স্থলবাহিনীর কামানের আশ্রয়ে নাবাধ্যক্ষ ইতিমাম খাঁ তাহার রণবহর লইয়া ইছামতী নদী দিয়া সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অপরপক্ষে যাত্রাপুরের দুর্গ রক্ষার্থ মুশা খাঁ তাহার তিনজন শ্রেষ্ঠ সহায়ক মীর্জ্জা মমিন, দরিয়া খাঁ ও মধুরায়কে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু মীর্জ্জা মমিন দরিয়া খাঁকে হত্যা করিয়াছে সংবাদ পাইয়া মুশা খাঁ স্বয়ং তাঁহার বিশ্বস্ত সামন্তগণকে ও ৭০০ রণতরী সঙ্গে লইয়া ইছামতী নদীদিয়া অবিলম্বে ইছলাম খাঁর প্রধান দুর্গ কটাস গড় আক্রমণ করিলেন। প্রথম দিন যুদ্ধের পর যাত্রাপুরের ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ডাকচরায় (ঢাকা জেলার) শত্রু ঘাঁটির অনতিদূরে পদ্মাতীরে একটি মাটির দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন এবং দুর্গের পরিখার ধার দিয়া বাঁশের বেড়া স্থাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে মুশা খাঁ নূতন উৎসাহ লইয়া বিপক্ষের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। প্রথমেই মুশাখাঁর কামানশ্রেণীর গোলাবর্ষণে মোগলপক্ষের বহু হতাহত হইল এবং একটি গোলা বিপক্ষের পতাকাবাহীকে আঘাত করিল। তখন মোগল পক্ষ পাল্টা আক্রমণ সুরু করিল। তাহাদের আক্রমণে মধুরায়ের পুত্র ও বিনোদ রায়ের ভ্রাতা নিহত হইল, রণতরীর অনেকে আহত ও নিহত হইল ও অনেকগুলি রণতরী ডুবিয়া গেল। পরদিন প্রত্যুষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মধুরায় ও বিনোদ রায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া মোগলদের পরিখা ভেদ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তৃতীয় আক্রমণে মোগলপক্ষ বিপক্ষের অনেক সৈন্যকে ডুবাইয়া দিল ও বহু বিপক্ষ সৈন্য হস্তী পদতলে পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অবশেষে মোগলরা জয়লাভ করিল এবং মুশা খাঁ রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া ডাকচরা ও যাত্রাপুরে পলাইয়া গেলেন। মুশা খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু ইছলাম খাঁ ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতঃ ডাকচরায় মুশা খাঁকে আক্রমণ করিলেন এবং তথায় মুশা খাঁকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া রাত্রিযোগে যাত্রাপুরে অতর্কিতভাবে আপতিত হইলেন। এই সময় মোগল পক্ষের সেখ কামাল ঢাকার সুরক্ষিত স্থানগুলি রক্ষা করিতেছিল। তকমাক খাঁ ঢাকার দক্ষিণে কোদালিয়া নদীর

মোহানায় পাহারায় নিযুক্ত ছিল এবং মিরাক বাহাদুর বিশখানি রণতরী লইয়া কুথারুইয়া (কীর্ত্তিনাশা) ও ইছামতীর সংযোগস্থলে অবস্থান করিতেছিল। রাত্রির শেষভাগে কটাসগড় হইতে ইছলাম খাঁ স্বয়ং শেষোক্ত স্থানে পৌছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইছামতী নদী পার হইতে আরম্ভ করিলেন। মুশা খাঁ যখন সংবাদ পাইলেন তখন ইছলাম খাঁর সমগ্র বাহিনী নদীপার হইয়া যাত্রাপুর দুর্গ ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে। মুশা খাঁর সৈন্যগণ অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর দুর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং ইছলাম খাঁ অনায়াসে দুর্গটি অধিকার করিলেন।

অতঃপর ইছলাম খাঁ সমগ্র শক্তি লইয়া ডাকচরা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মুশা খাঁ প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিলেন। একমাস যাবৎ ভয়াবহ যুদ্ধ চলিল এবং উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইল। অবশেষে মীর্জ্জা নাথানের রণকৌশলে মোগলসৈন্য পরিখা পার হইয়া দুর্গ প্রাচীর ভেদ করিতে সমর্থ হইল। ১৬১০ খৃঃ ১৫ই জুলাই ডাকচরার দুর্ভেদ্য দুর্গ মোগল বাহিনীর হস্তগত হইল। অতঃপর খিজিরপুর দুর্গ রক্ষা করা সম্ভব নহে দেখিয়া মুশা খাঁ তাহা পরিত্যাগ করায় মোগল সৈন্যেরা তাহাও দখল করিয়া লইল।

জুলাই মাসের শেষভাগে সমগ্র জল ও স্থল বাহিনী লইয়া ঢাকায় পৌছিয়া ইছলাম খাঁ স্বয়ং মুশা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁ আক্রমণে সচেষ্ট হইলেন। এবং মিরাক বাহাদুরকে শ্রীপুর ও বায়াজিদ খাঁকে বিক্রমপুরের দিকে প্রেরণ করিলেন। মুশা খাঁও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না তিনি হাজি সমসউদ্দিন বগদাদীকে রাজধানী সোনারগাঁ রক্ষার্থে রাখিয়া রাজধানীর পার্শ্ববাহিনী বন্দর খাল যেখানে লক্ষ্যা নদীর সহিত (নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে) মিলিত হইয়াছে তথায় খালের দুই তীরে দুইটি মৃণ্ময় দুর্গ স্থাপন করতঃ তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক মীর্জ্জা মমিনের সাহায্যে তিনি স্বয়ং একটিতে রহিলেন এবং অপরটিতে তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা আলা উল খাঁকে রাখিলেন। তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে আব্দুল্লা খাঁকে কদম রছুল কেল্লার দায়ুদ খাঁকে কত্রাভু দুর্গের ও মামুদ খাঁকে নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল উজানে দুলাই ও লক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত দামেরা কেল্লার ভার দিলেন। চৌড়ার বিশ্বস্ত জমিদার বাহাদুর গাজী ২০০ রণতরী লইয়া চৌড়ার নিকট লক্ষ্যানদীর উজানে স্থাপিত হইলেন।

ইছলাম খাঁ লক্ষ্যা নদীর দক্ষিণ তীরে ও মুশা খাঁ বামতীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। দক্ষিণ তীরস্থ পূর্ব্বাধিকৃত খিজিরপুর দুর্গ শত্রু পক্ষের কত্রাভু ও কদম রছুল ঘাঁটিতে যাইবার প্রবেশদ্বার বিধায় ইছলাম খাঁ তথায় প্রথমে মীর্জ্জা নাথানকে এবং পরে তাহার পিতা ইতিমান খাঁকে নিযুক্ত করিয়া তথায় নৌবহর ও তোপ

স্থাপিত করিলেন। কত্রাভূর অপর দিকে খিজিরপুরের উত্তরে একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন করিয়া তথায় মীর্জ্জা নাথানকে নিযুক্ত করিলেন। শত্রু পক্ষের মামুদ খাঁর রক্ষিত দামেরাঘাটির অপর দিকে সেখ রুকুকে এবং বাহাদুর গাজী রক্ষিত চৌড়ার অপর দিকে আব্দুল ওয়াহিদকে স্থাপন করিলেন। দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জের দেড় মাইল দক্ষিণে কুমারসরে সেখ কামাল, আরও দক্ষিণে কোদালিয়া খালের মোহানার নিকটে তকমাক খাঁ, আরও দক্ষিণে শ্রীপুরে মিরাক বাহাদুর জলাইর ও বিক্রমপুরে জহান খানপণি ও বায়াজিদ খাঁ শত্রুঘাঁটির মুখামুখি স্থাপিত হইল।

১০২০ হিজরীর (১৬১১ খৃঃ ১২ মার্চ্চ) প্রথম দিবসে মীর্জ্জা নাথান রাত্রিতে বিপক্ষের কত্রাভূ দুর্গ আক্রমণ করিল। দুর্গরক্ষক দায়ুদ খাঁ পরাজিত হইয়া দুর্গত্যাগ করতঃ মুশা খাঁর নিকট পলায়ন করিল। অতঃপর ইতিমান খাঁ দুলাই নদী হইতে তাহার রণতরী সমূহ বাহির করিয়া লক্ষ্যা নদীতে আসিয়া আব্দুল্লা খাঁর রক্ষিত কদম রছুল দুর্গ আক্রমণ করিল। মোগল ঘাঁটি কোদালিয়া হইতে তকমাক খাঁ আসিয়া ইতিমান খাঁর বলবৃদ্ধি করায় আব্দুল্লা খাঁ দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অতঃপর মোগল নৌবাহিনী পলায়মান বিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু বিপক্ষেরা ফিরিয়া দাঁড়াইলে সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইল। ঠিক সেই সময় মীর্জ্জা নাথান পিতার সাহায্যার্থ আসিয়া বিপক্ষের দৃষ্টি অন্যদিকে আকর্ষণের জন্য বন্দর খালের মোহানায় অবস্থিত মুশা খাঁর দুইটি ঘাঁটি আক্রমণ করিল। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া মুশা খাঁ ও মীর্জ্জা মমিন পলায়ন করিল। মীর্জ্জা নাথান ইত্যবসরে খাল পার হইয়া কদম রছুল দুর্গ দখল করিয়া লইল। এই সকল পরাজয়ে মুশা খাঁ অত্যন্ত ভয় পাইলেন এবং রাজধানী সোনার গাঁ ত্যাগ করিয়া মেঘনা নদীর মধ্যস্থ ইব্রাহিমপুর দ্বীপে আশ্রয় লইলেন। মীর্জ্জা মমিন মুশা খাঁর পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তিসহ ঐ দ্বীপে মুশা খাঁর সহিত সহিত মিলিত হইল। হাজি সমসউদ্দিন বগদাদী আত্মসমর্পণ করিয়া সোনার গাঁ সহরটি ইছলাম খাঁর হস্তে অর্পণ করিলেন (১৬১১ খৃঃ এপ্রিল)। মুশা খাঁর ভ্রাতা দায়ুদ খাঁ কত্রাভূ দুর্গ পুনরধিকার করিতে যাইয়া ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হস্তে নিহত হইল। রাজা মানসিংহের সময় স্থাপিত একটি পরিত্যক্ত দুর্গের সংস্কারসাধন করিয়া মুশা খাঁ তথা হইতে পুনরায় মোগলবাহিনীকে বন্দর খালে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ইতিমাম খাঁ ও তৎপুত্র মীর্জ্জা নাথান কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করায় মুশা খাঁ ইব্রাহিমপুরদ্বীপে পুনরায় ফিরিয়া গেলেন।

অতঃপর মুশা খাঁর পক্ষভুক্ত ভৌমিকগণ ক্রমশঃ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। চৌড়ার বাহাদুর গাজী ও ফতেহাবাদের মজলিস কুতুব তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ইছলাম খাঁর শরণাগত হইল। ইছলাম খাঁ তাহাদিগকে জমিদারীতে বহাল রাখিলেন কিন্তু তাহাদের রণপোতগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। মুশা খাঁর প্রধান কর্ম্মচারী হাজী সমসউদ্দিন বগদাদীও ইছলাম খাঁর শরণাগত হইল। এই সময় মালদহ জেলায় আলি আকবর নামক একজন মনসবদার বিদ্রোহী হইয়া চতুর্দ্দিকে লুটতরাজ চালাইতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ সেরপুর মুর্চ্চার থানাদার ইফতিকার খাঁ তাহার পূর্ণিয়ায় অবস্থিত জয়পুরের জায়গীরে উপস্থিত হইয়া আলি আকবরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শান্তি স্থাপিত করে।

ইছলাম খাঁ অতঃপর ভুলুয়ার রাজা অনন্তমাণিক্যকে দমন করিবার জন্য আব্দুল ওয়াহিদকে উপযুক্ত সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। তাহার সাহায্য করিবার জন্য হাজি সমসউদ্দিন বগদাদীকে তাহার সহিত পাঠাইলেন। অনন্তমাণিক্য নিজ রাজধানী ভুলুয়াকে সুরক্ষিত করিয়া উত্তর দিকে মেঘনার উপনদী ডাকাতিয়া নদীতীরে একটি শক্তিশালী দুর্গ প্রস্তুত করিয়া মোগলদিগকে বাধা দিতে প্রস্তুত হন। মোগলেরা সুবিধা করিতে না পাবায় ইছলাম খাঁ নূতন সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহাতেও কোনও ফল না হওয়ায় আব্দুল ওয়াহিদ ভুলুয়া রাজের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ মীর্জ্জা ইউসফ বরলাসকে প্রলুব্ধ করতঃ হস্তগত করায় রাজা রাত্রিযোগে দুর্গ ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানেও যুদ্ধে ব্যর্থকাম হইয়া আরাকানে আশ্রয় লন। ভুলুয়া রাজ্য মোগলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রাজবাড়ীতে একজন থানাদার স্থাপিত হয়।

ভুলুয়ার পতনে মুশা খাঁ হতাশ হইয়া সেখ কামালকে ইছলাম খাঁর নিকট শান্তির প্রস্তাবসহ পাঠাইলেন এবং অবশেষে স্বয়ং তাঁহার ভ্রাতাগণ ও দলবল ও অনুচরগণসহ জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। ইছলাম খাঁ মুশা খাঁ ও তাঁহার সহকারী জমিদারগণের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিলেন, তাঁহাদের সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিলেন, নৌবহর মোগল নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদিগকে মোগলবাহিনীর অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন কিন্তু মুশা খাঁর স্বাধীনতা হরণ করিয়া আপাততঃ তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় রাখা হইল (১৬১১ খৃঃ জুলাই)।

১৬১১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে ইছলাম খাঁ ১০০০ বাছাইকরা অশ্বারোহী, ৫০০০ বন্দুকধারী ও ৩০০ রণহস্তী ৩০০ রণতরী এবং মুশা খাঁ ও অনুগত জমিদার গণের সম্পূর্ণ জলবাহিনীসহ সেখ কামাল ও সেখ আব্দুল

ওয়াহিদকে ওসমান খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ঢাকা হইতে রওনা হইয়া সেখ কামাল ও সেখ আব্দুল ওয়াহিদ তিনদিনে সমস্ত স্থলসৈন্যসহ হাসানপুরে পৌছিয়া তথায় ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। পরে কদম রছুল হইতে এগারসিন্দুর অতিক্রম করিয়া ইতিমাম খাঁ ও মীর্জ্জা নাথান জলবাহিনী লইয়া তথায় স্থলসৈন্যসহ মিলিত হইলেন। নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় নৌবাহিনীর চলাচল ব্যাহত হওয়ায় ইছলাম খাঁর আদেশে সেখ কামাল ও আব্দুল ওয়াহিদ স্থলবাহিনী লইয়া হাসানপুর হইতে ওসমান খাঁর রাজধানী বোকাইনগর অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে সুরক্ষিত ঘাঁটিসমূহ স্থাপন করিতে করিতে সতর্কতার সহিত গমন করিতে লাগিল। গিয়াস খাঁ সমগ্র মোগল নৌবাহিনী লইয়া হাসানপুর ও আলপসিংহের মধ্যস্থলে অবস্থিত সাবন্দরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এই সময় শ্রীহট্ট অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় জমিদার বানিয়াচঙ্গের আনোয়ার খাঁ গাজী দুষ্ট অভিপ্রায় লইয়া স্বেচ্ছায় ঢাকায় আসিয়া ইছলাম খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং শ্রীহট্টে ওসমান খাঁর দলভুক্ত যে সকল জমিদার আছে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ইছলাম খাঁর বশীভূত করিয়া দিতে পারিবে বলিয়া প্রকাশ করে। ইছলাম খাঁ আনোয়ার খাঁর ছলনায় ভুলিয়া আনোয়ারকে তাহার জমিদারীতে বহাল রাখিতে স্বীকার করেন এবং তাহার উপর শ্রীহট্টে যুদ্ধকার্য্য চালাইবার ভার দেন। আনোয়ার ঢাকা হইতে ফিরিবার পথে এগার-সিন্দুরে পৌছিয়া মোগল শিবিরে অবস্থিত মহম্মদ খাঁ ও বাহাদুর গাজির সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করে যে তাহারা মোগলবাহিনীর ভিতর হইতে ও ওসমান বাহির হইতে হাসনপুরের মোগল বাহিনীকে একযোগে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে এবং তৎপর ঢাকা পৌছিয়া ইছলাম খাঁকে বন্দী করিবে। ষড়যন্ত্র অনুসারে আনোয়ার খাঁ একটি ভোজ সভায় সমস্ত মোগল পক্ষীয় নেতাগণকে আহ্বান করেন, কিন্তু রাজ বাহাদুর কালমাকের নিজস্ব নৌবাহিনীব অধিনায়ক ইছলাম কুলী ও সাহাজাদপুরের ভৌমিক রাজা রায় মাত্র তাহার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়ে এবং তাহাদিগকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া আনোয়ার বানিয়াচঙ্গে প্রস্থান করে। ষড়যন্ত্রের অবশিষ্ট অংশ আর কার্য্যে পরিণত হয় না।

ইছলাম খাঁ ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া অবিলম্বে মাহমুদ খাঁ ও বাহাদুর গাজীকে বন্দী করিলেন এবং আনোয়ার খাঁর বিরুদ্ধে রাজা শত্রাজিৎ ও মোবারিজ খাঁকে প্রেরণ করিয়া ওসমানের বিরুদ্ধে আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। বিপুল মোগল বাহিনী ওসমানের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই ওসমানের সেনানী ও মিত্রগণের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

বোকাই নগরের ৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত তাজপুরের আফগান সর্দ্দার নাছির খাঁ ভয় পাইয়া মোগল পক্ষে যোগ দেওয়ায়, ওসমান বোকাই নগরে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া সদলবলে উহা ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে বায়াজিদ কররাণীর আশ্রয়ে চলিয়া গেলেন। ১৬১১ খৃঃ ২৬শে নভেম্বর রমজানের ঈদ শেষ করিয়া মোগল সেখ কামাল ও সেখ আব্দুল ওয়াহেদ পরিত্যক্ত বোকাই নগর দুর্গে প্রবেশ করিল।

ইছলাম খাঁ অতঃপর তরফ দুর্গে অবস্থিত ওসমানের ভ্রাতা খাজা মালহি ও পুত্র খাজা মমরিজের বিরুদ্ধে একদল ও মাতঙ্গের জমিদার পালোয়ানের বিরুদ্ধে আর একদল ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন এবং আনোয়ার খাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করিলেন। প্রথমেই আনোয়ার খাঁ আত্মসমর্পণ করিল এবং কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর মাতঙ্গ ও তরফ দুর্গ মোগল সেনাপতি হাজি সমসউদ্দিন বগদাদীর করায়ত্ত হইল। এইরূপে শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গ, মাতঙ্গ তরফ দুর্গ অধিকৃত হওয়ায় মোগল বাহিনীর পক্ষে ওসমানকে পরাজিত করার পথ সুগম হইল।

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য (১৬১২ খৃঃ)।

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-৬০ খৃঃ) অন্নদামঙ্গল কাব্যে রাজা প্রতাপাদিত্যের নাম অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছেন।

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তাঁয়
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাদী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্ত রায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥
ক্রোধ হইল পাতশায় বাঁধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইল॥

পাতশাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ আদিত্য হারে॥
শেষ ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে হৈল জয়।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপ আদিত্যে লয়॥
... ...
প্রতাপ আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাঁহারে॥

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের ঘটনা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে জনশ্রুতিতে কিরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কবি ভারতচন্দ্রের বিবরণ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত[১]।

১। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য' (১৮০১ খৃঃ) ও হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮৫৬ খৃঃ) ও ঘটককারিকা সমূহে প্রতাপাদিত্যের জীবনকথা প্রচারিত হয়। কিন্তু তাহাতে সত্য ও মিথ্যা এরূপভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহা হইতে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। ঘটক কারিকা অনুসারে বিরাট গুহের বংশীয় প্রথম কুলীন দশরথ গুহের বংশে প্রতাপাদিত্যের জন্ম। প্রতাপাদিত্যের পিতামহ রামচন্দ্র সপ্তগ্রামে যাইয়া তথায় কাননগো দপ্তরে কার্য্যে নিযুক্ত হন। রামচন্দ্রের তিনপুত্র ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ পার্শী ভাষায় সুদক্ষ হন এবং কাননগো দপ্তরে কার্য্য করিতে থাকেন। ভবানন্দের শ্রীহরি ও গুণানন্দের জানকী বল্লভ নামে পুত্র জন্মে। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ উভয়ে দায়ুদ খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। দায়ুদ গৌড়েশ্বর হইলে শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করিয়া উজিরের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহারা বঙ্গোপসাগরের নিকট সুন্দরবনের মধ্যে যশোর প্রভৃতি স্থান জায়গীর প্রাপ্ত হন। বিক্রমাদিত্য এখানে অরণ্যাদি কাটিয়া এক সুন্দর নগর ও বাসস্থান স্থাপন করেন। দিগ্বিজয় প্রকাশের মতে যশোর রাজ্যের পশ্চিম সীমা কুশদ্বীপ (ভাগীরথী) পূর্ব্বে ভূষণা ও বাকলা রাজ্যের সীমা মধুমতী নদী ও দক্ষিণে সুন্দরবন (সমুদ্র?)। দায়ুদের মৃত্যুর পর (৯৮৩

আমরা সমসাময়িক মীর্জ্জা নাথানের "বাহারীস্থান ঘাইবী" অনুসরণ করিয়া প্রতাপাদিত্যের পতনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রতাপাদিত্য নিজ অঙ্গীকার অনুসারে মুশা খাঁর বিরুদ্ধে ইছলাম খাঁকে সাহায্য না করায় ইছলাম খাঁ তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। এই সময় প্রায় সমুদয় জমিদার পরাজিত ও বশীভূত হওয়ায় প্রতাপাদিত্য ভীত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ৫০ খানি রণতরী সহ কুমার সংগ্রামাদিত্যকে ইছলাম খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। ইছলাম খাঁ কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রেরিত রণতরীগুলি ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন এবং প্রতাপাদিত্যের রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইলেন।

প্রতাপাদিত্যের ধনবল ও সৈন্যবল অপরিমিত ছিল। সুতরাং ইছলাম খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য কোন চেষ্টাই বাকী রাখিলেন না। ৩০০০ শ্রেষ্ঠ সাদীসৈন্য ও ৩০০ বাদসাহী রণপোত ও ৫০০০ কামানবন্দুক সংগৃহীত হইল। এতদ্ব্যতীত অনুগত ও বিজিত মুশা খাঁ প্রভৃতি জমিদারগণের প্রচুর জল ও স্থল বাহিনী তাহাদের সহিত যোগ দিল। ইফতিখার খাঁর পুত্র মীর্জ্জা মক্কী, মীর্জ্জা সইফউদ্দিন, সেখ ইস্মাইল ফতেপুরী, সা বেগ খাকসার, লছমী রাজপুত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রণনিপুণ সেনানায়কগণ এই বিপুল বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং সুবাদারের ভ্রাতা বহু যুদ্ধ বিজেতা গিয়াসউদ্দিন এনায়েৎ খাঁ সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন। মীর্জ্জা নাথান রণপোত ও তোপ বাহিনীর ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ঠিক একই সময়ে প্রতাপাদিত্যের জামাতা ও রাজা কন্দর্পনারায়ণের পুত্র বাকলার রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধেও একটি প্রবল বাহিনী প্রেরিত হইল, যাহাতে বাকলার রাজা তাঁহার শ্বশুরকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে না পারেন এবং বাকলা বিজিত হইলে সেই বাহিনীও একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে যশোর রাজ্যকে আক্রমণ করিতে পারে। অপর দিকে ওসমানকে বাধা দিবার জন্য সেখ কামাল, সেখ আব্দুল ওয়াহেদ, মবরিজ খাঁ প্রভৃতি বহু যুদ্ধজয়ী সেনা-

---

হিঃ ১৫৭৫ খৃঃ) বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় তোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুবে বাঙলার কাগজ পত্র বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহার সুপারিশে বাদসাহের নিকট যশোর রাজ্য জমিদারী স্বরূপ লাভ করেন। এবং তথায় যশোর সমাজ স্থাপন করেন। বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য পার্শী ভাসায় ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং আগ্রায় গমন করিয়া বাদসাহের প্রিয়পাত্র হন এবং নিজনামে জমিদারী সনদ লাভ করেন।

নায়কগণ অপর একটি স্থলবাহিনী লইয়া ও মীরবহর (মহানাবিক) ইতিমাম খাঁ ৪০০ রণতরী লইয়া এগারসিন্দুর অঞ্চলের ঘাঁটি সমূহে স্থাপিত হইল।

অতঃপর সেনাপতি গিয়াসউদ্দিন থানা আলাপসিং হইতে সসৈন্যে বাহির হইয়া আলাইপুরের নিকট পদ্মা পার হইলেন। তৎপরে জলঙ্গী নদী ও তাহার উপনদী ভৈরবের উভয়তীরস্থ ও কৃষ্ণনগরের ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত বাঘোয়ান (পাখোয়ান) নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং মীর্জ্জা নাথনের রণবহরের অপেক্ষায় তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন।

এই সময় চিলাজোয়ারের জমিদার (পুঁঠিয়া জমিদারীর আদিপুরুষ) পীতাম্বর ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অনন্ত বিদ্রোহী হওয়ায় মীর্জ্জা নাথন তাঁহাদিগকে দমনকার্য্যে রত ছিলেন। মীর্জ্জা নাথন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা নিকটবর্ত্তী আলাইপুরের জমিদার আলা বক্সের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু মোগল রণহস্তীদল তাঁহাদিগের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তাঁহারা পলায়ন করেন। অতঃপর মীর্জ্জা নাথন নৌবহর লইয়া বাঘোয়ানে গিয়াস খাঁর সহিত মিলিত হন এবং সমগ্র স্থল ও জলবাহিনী গঙ্গা, জলঙ্গী, ও ভৈরবের তীর ও খাত দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ১৬১১ খৃঃ ডিসেম্বরের মধ্যভাগে সমগ্র মোগলবাহিনী বনগ্রামের ধার দিয়া যমুনা ও ইছামতীর সংযোগস্থলে সাল্‌কায় উপনীত হয় এবং এখানেই প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহাদের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

রণপণ্ডিত প্রতাপাদিত্য পূর্ব্বেই তাঁহার অধিকাংশ স্থলবাহিনী ও ৫০০ রণতরীসহ জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যকে এই সাল্‌কার দুর্ভেদ্য দুর্গ রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া রাজধানী ধূমঘাটে রহিলেন। সাল্‌কাতে উদয়াদিত্যকে অশ্বারোহী ও রণহস্তী লইয়া সেনানী জামাল খাঁ এবং নৌবহর লইয়া মীরবহর খাজা কামাল সাহায্য করিতে লাগিল।

উভয় তীরস্থ স্থলবাহিনীদ্বারা রক্ষিত হইয়া মোগল নৌবহর সতর্কভাবে ইছামতী নদী দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময় উদয়াদিত্য তাঁহার নৌবহর লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। খাজা কামাল সম্মুখে ও উদয়াদিত্য কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন এবং জামাল খাঁর উপর দুর্গ ও হস্তীবাহিনী রক্ষার ভার প্রদত্ত হইল। উদয়াদিত্যের নৌবহরের রণতরীগুলি সংখ্যায় ও আকারে বৃহত্তর ও প্রবলতর ছিল। কিন্তু নদীর উভয় তীরে স্থাপিত বিপক্ষের বিপুল মোগল স্থলবাহিনীর তীর ও গুলি বর্ষণে সকীর্ণ ও বাঁকপূর্ণ ইছামতীর বক্ষে উদয়াদিত্যের নৌবাহিনীর মধ্যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। মীর্জ্জা নাথন সাহসের সহিত যশোহরের নৌবাহিনীর পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া

ফেলিল। যশোর নৌবাহিনীর অন্যতম অধ্যক্ষ খাজা কামাল এই সময় নিহত হওয়ায় তাহাদের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া গেল। অবশেষে উদয়াদিত্য সালকিয়া দুর্গ ত্যাগ করতঃ মাত্র ৪২ খানি রণতরী সহ পশ্চাদপসরণ করিতে সমর্থ হইলেন।

মোগল বাহিনী সালকিয়া দুর্গে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে ইছামতী তীর দিয়া অগ্রসর হইয়া বুরহান হাটি (সাতক্ষীরা মহকুমা) দুর্গে পৌছিয়া তথায় শিবির সংস্থাপন করিল। ইতিমধ্যে মোগল বাহিনী বাকলার অল্পবয়স্ক রাজা রামচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিল। সাতদিন পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াও রাজা পরাজিত হওয়ায়, মাতার আদেশে তিনি বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইছলাম খাঁর অনুমতিক্রমে রাজা শত্রাজিৎ রাজা রামচন্দ্রকে ঢাকায় লইয়া গেলেন। বিজয়ী মোগল সৈন্য যশোরের সৈন্যদলের সহিত যোগ দিবার জন্য মহোল্লাসে অগ্রসর হইল। জামাতার ভাগ্য বিপর্য্যয়ে প্রতাপাদিত্য ক্ষুব্ধ হইলেও তিনি কাগারহাট ও যমুনার সংযোগস্থলে, রাজধানী হইতে ৫ মাইল উত্তরে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনদিন পর মোগলবাহিনী বুরহান দুর্গ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে যমুনা (বসন্তপুর হইতে ধুমঘাট পর্য্যন্ত ইছামতী নদীর নাম যমুনা) বহিয়া খারওয়ান ঘাটে পৌছিল।

১৬১২ খৃঃ জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে একদিন মীর্জ্জা নাথন তাঁহার নৌবহর ও সৈন্যদল লইয়া প্রতাপাদিত্যের নৌবাহিনীকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিলেন। সেই আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রাজার নৌবাহিনী পশ্চাৎপদ হইয়া দুর্গের কামানের আওতায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। দুর্গের কামানের গোলাবর্ষণে মীর্জ্জা নাথনের বহর আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। অপরদিকে সেনাধ্যক্ষ গিয়াস খাঁও যমুনা পার হইতে না পারায় মীর্জ্জা নাথন ও লছমী রাজপুতকেই যুদ্ধের প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হইল। প্রবল গোলা বর্ষণ সত্ত্বেও তাঁহারা কাগারহাট খাল দিয়া দলেদলে নরম কাদার অপর পারে অবস্থিত শত্রু দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দুর্গের প্রবল গোলা বর্ষণ ও শত্রু নৌবহরের আক্রমণের মুখে খাল পার হইয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মীর্জ্জা নাথন অন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি বর্ম্মপরিহিত বাদসাহী রণহস্তীর সাহায্যে খাল অতিক্রম করিতে চেষ্টা করায় দুর্গের কামানগুলি সেইদিকে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সেই অবসরে, বাদসাহী রণতরীসমূহ যমুনায় প্রবেশ করিয়া কামানের আশ্রয়বর্জ্জিত প্রতাপাদিত্যের নৌবহরকে পরাভূত করিল এবং মীর্জ্জা নাথনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। এইরূপে নৌবহরের সাহায্যে

খাল পার হইয়া মীর্জ্জা নাথন হস্তীসৈন্যকে সম্মুখে লইয়া দুর্গের উপর পতিত হইলেন। অতঃপর হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষে বহুসৈন্য হতাহত হইল। অবশেষে প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তে দুর্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিলেন। ঠিক এই সময় প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি জামাল খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোগল দলে চলিয়া গেল। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া উদয়াদিত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া অবিলম্বে কাগারহাটায় যাইয়া গিয়াস খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। উদয়াদিত্য রাজধানীতে রহিলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্য গিয়াস খাঁর সহিত ঢাকায় যাইয়া ইছলাম খাঁর কঠোর হস্ত হইতে মুক্তি পাইলেন না। তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল ও তাঁহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত হইল। তাঁহার পুত্রগণকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল্লী দরবারে প্রেরণ করা হইল, কিন্তু তথায় ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের সুপারিশে বাদসাহ জাহাঙ্গীর তাঁহাদের মুক্তির আদেশ দিলেন। গিয়াস খাঁ যশোহর রাজ্যের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন ও অধিকৃত বাকলা রাজ্য শাসনেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইল (১৬১১ খৃঃ ডিসেম্বর হইতে ১৫ ই জানুয়ারী)। রাজা প্রতাপাদিত্যের পরিণাম কি হইল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। কথিত আছে, দিল্লী যাইবার পথে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিতের পতনের পর ইছলাম খাঁ খাজা ওসমানের বিরুদ্ধে শ্রীহট্টে অভিযান চালাইতে মনস্থ করিলেন। শ্রীহট্ট আফগানদের শেষ আশ্রয় ছিল এবং বায়াজিদ্ কররানী তাহাদের নেতা এবং ওসমানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইজন্য ইছলাম খাঁ বায়াজিদের বিরুদ্ধে একটি এবং ওসমানের বিরুদ্ধে আর একটি সৈন্যদল পাঠাইলেন। ওসমান এই সময়ে শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ সীমায় "উহার" দুর্গে ছিলেন। রাজধানী হইতে আগত সেখ সেলিম চিস্তির বংশোদ্ভব সুজাত খাঁর সেনাপতিত্বে ৫০০ বাছাবাছা অশ্বারোহী সৈন্য, ৪০০০ বন্দুকধারী, বহু সংখ্যক গজারোহী সৈন্য ওসমানের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিল এবং সরাইলের জমিদার সোনা গাজির নৌবহর ও সম্রাটের বিপুল নৌবহর লইয়া মীরবহর ইতিমাম খাঁ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

অপর দিকে বায়াজিদের বিরুদ্ধে সেখ কামালকে সেনাপতি করিয়া ১০০০ বাছাই করা অশ্বসৈন্য, ৪০০০ বন্দুকধারী, ১০০ গজসৈন্য বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য ও মুশা খাঁ ও তাঁহার সহযোগীদের নিকট হইতে ধৃত সমগ্র নৌবাহিনী প্রেরিত হইল।

সুজাত খাঁ ঢাকা হইতে রওনা হইয়া প্রথমে (ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ৭ মাইল উত্তরে)

সরাইলে শিবির স্থাপন করিলেন। তথায় ইতিমাম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক হোসেনের অধীনে নৌবাহিনী রাখিয়া স্থলবাহিনী মেঘনার উভয় তীর দিয়া উত্তর-পূর্ব্বে ৩৪ মাইল গমন করত 'তরফ' দুর্গে পৌছিল। তথায় একদিন বিশ্রাম করিয়া সুজাত খাঁ পরদিন টুপিয়া (পুটিয়া জুবী) গিরিপথের পাদদেশে উপনীত হইলেন। এখানে দুইটি দুর্গ ওসমানের ভ্রাতা খাজাওয়ালী রক্ষা করিতেছিল। মোগলেরা আসিয়া দেখিল দুর্গ দুইটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথায় ১৬১২ খৃঃ ৩ রা ফেব্রুয়ারী ঈদ-কোরবানী পর্ব্ব পালন করিয়া পর দিন সুজাত খাঁ ওসমানের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অপর দিকে ওসমান মোগলবাহিনীকে বাধা দিবার জন্য রাজধানী "উহার" হইতে পূর্ব্ব দিকে ১২ মাইল দূরে দৌলম্বাপুরে আসিয়া মোগল ঘাঁটির দেড় মাইল দূরে একটি কর্দ্দমপূর্ণ জলাভূমির অপর পারে ঘাঁটি স্থাপন করিলেন এবং এই দুর্ভেদ্য স্থান হইতে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। ওসমান স্বয়ং ২০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী, ৩০০০ পদাতিক, ৪০টি গজসৈন্য লইয়া কেন্দ্র, খাজাওয়ালী ১০০০ অশ্ব ২০০০ পদাতিক ৩০ টি গজসৈন্য লইয়া বামপার্শ্ব, সির-ই-ময়দান ৭০০ অশ্ব, ১০০০ পদাতিক, ২০ গজসৈন্য লইয়া দক্ষিণ পার্শ্ব ও ওসমানের ভ্রাতা খাজা মলাহি ও ভ্রাতুষ্পুত্র খাজা দায়ুদ ১৫০০ অশ্ব, ২০০০ পদাতিক, ৫০ গজসৈন্য লইয়া সম্মুখভাগ রক্ষা করিতেছিল। মোগল ব্যূহের কেন্দ্রে সুজাৎ খাঁ, বাম পার্শ্বে কিশওয়ার খাঁ, সম্মুখভাগে মীর্জ্জা নাথান ও তাহার সহকারী সৈয়দ আদম, সেখ আচ্ছা ও মীর্জ্জা কাশিম স্থান গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

১৬১২ খৃঃ ১২ই মার্চ্চ রবিবার প্রত্যূষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণে ওসমানের বাহিনী মোগল বাহিনীকে শোচনীয়রূপে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। মোগলদের নিজেদের গুলির আঘাতেই সম্মুখভাগের সেখ আচ্ছা নিহত হইল। দক্ষিণ পার্শ্বের নেতা ইফতিখার খাঁ, বামপার্শ্বের কিশওয়ার খাঁ ও সৈয়দ আদম ওসমানের বাহিনীর হস্তে নিহত হইল, এবং মোগল বাহিনী পশ্চাতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। মোগল পক্ষের গোলা বর্ষণের জন্য ওসমান মোগল বাহিনীর শিবির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না, কিন্তু মোগল সৈন্যের পশ্চাদ্দিকে মীর্জ্জা নাথন আক্রান্ত হইলেন এবং ওসমানের বাজ ও বাখতা নামক রণহস্তীদ্বয় মোগল সৈন্য মধ্যে ঘোরতর হত্যাকাণ্ড সাধন করিতে লাগিল। বাখতা মীর্জ্জা নাথনকে অশ্বসহ উৎক্ষিপ্ত করিয়া দূরে অজ্ঞান অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিল। আহত ও মূর্চ্ছিত নাথনকে শিবিরে স্থানান্তরিত করিতে হইল। মোগল বাহিনীর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব ও সম্মুখ ভাগ বিপর্য্যস্ত হওয়ায় মোগল পক্ষের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হইয়া

গেল। কেবল মাত্র কেন্দ্র তখনও অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল। ওসমানের মদমত্ত প্রকাণ্ড রণহস্তী বাখতাকে ও অন্য একটি হস্তীকে সুজাত খাঁকে ও তাহার পতাকাবাহীর উপর চালাইয়া দেওয়া হইল। বাখতা সুজাত খাঁ অশ্বচ্যুত করিতে সমর্থ হইল কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিবলে ও পার্শ্বচরগণের সহায়তায় তিনি বাঁচিয়া গেলেন। অপর হস্তীর আঘাতে পতাকাবাহীর অশ্ব মরিয়া গেল ও পতাকা-বাহী ভূমিতে পড়িয়া গেল, কিন্তু সুজাত খাঁর চেষ্টায় তাহাকে অন্য এক অশ্বে উঠাইয়া পতাকা পুনরায় উড়াইয়া দেওয়া হইল এবং বাখতাকে মারিয়া ফেলা হইল।

এই গোলযোগের মধ্যে যখন ওসমানের পক্ষে জয়ের আশা নিশ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ে নিহত ইফতিখার খাঁর বিশ্বস্ত অনুচর সেখ আব্দুল জলিলের একটি তীর হস্তীপৃষ্ঠারূঢ় ওসমানের বাম চক্ষু ভেদ করিয়া মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিল। ওসমান বর্শাদ্বারা নিমেষ মধ্যে আব্দুল জলিলকে বিদ্ধ করিয়া নিহত করতঃ নিজ চক্ষু হইতে তীর টানিয়া বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তীরের সহিত তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুও বাহির হইয়া আসিল এবং ক্ষণকাল মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ওসমানের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে হতাশা ও ভীতির সঞ্চার হইল এবং সারাদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াই করিয়া তাহারা রাত্রিকালে রাজধানী "উহার" অভিমুখে ওসমানের মৃতদেহ লইয়া পলায়ন করিল।

উহারে পৌঁছিয়া তাহারা ওসমানের মৃতদেহ কবরস্থ করিল ও ওসমানের স্ত্রীগণ ও কন্যাগণকে তরবারীদ্বারা হত্যা করিয়া অপর এক কবরে প্রোথিত করিল। ওসমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মমরিজ খাঁ পিতার তরবারী ও পাগড়ীসহ গদী লাভ করিল।

পরদিন সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়াও সুজাত খাঁ তাঁহার বিশৃঙ্খল সৈন্যদল লইয়া বিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সাহসী হইলেন না। নূতন সৈন্যদল আসিয়া তাঁহার বলবৃদ্ধি করিবার পর তিনি অভিযান আরম্ভ করিলেন। আফগানগণের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায় অচিরকাল মধ্যেই তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। ১৬১২ খৃঃ ৪ঠা মার্চ্চ খাজাওয়ালী, খাজা মালহি, খাজা ইব্রাহিম, খাজা দাযুদ, খাজা মমরিজ, খাজা ইয়াকুব প্রভৃতি ৪০০ আফগান নেতা সুজাত খাঁর দরবারে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল। সুজাত খাঁ 'উহার দুর্গ' দখল করিয়া তথায় সৈন্যদল স্থাপন এবং 'তরফ' ও 'সরাইল' দুর্গে উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিলেন। সরাইলে এই সময় মীরবহর ইতিমাম

খাঁর মৃত্যু হয়। অতঃপর ১৬১২ খৃঃ ৮ই এপ্রিল সমস্ত বাদসাহী সৈন্যসহ সুজাত খাঁ ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। ইছলাম খাঁ ওসমান খাঁর সমগ্র রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিলেন ও তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণকে বন্দী করিলেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ শুনিয়া খোদা তালাকে ধন্যবাদ দিলেন, ইছলাম খাঁকে ছয়হাজারী মনসবদার ও সুজাত খাঁকে 'রুস্তম-ই-জমান' উপাধিসহ একহাজারী মনসবদার করিলেন।

অপর দিকে বায়াজিদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেখ কামাল নূতন সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া সুর্মা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। ইহার অনতিদূরে অবস্থিত বায়াজিদের রাজধানী শ্রীহট্ট দুর্গ অবস্থিত। সেখ কামাল সুর্মা তীরে একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন করিবার জন্য রাজা শত্রাজিৎকে পাঠাইলেন। বায়াজিদও তাঁহার ভ্রাতা ইয়াকুবকে পাঠাইয়া ঐ ঘাঁটির বিপরীত দিকে একটি ঘাঁটি নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজা শত্রাজিৎ কামানের আশ্রয়ে নদী পার হইয়া ইয়াকুবের ঘাঁটি অধিকার করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই কাছাড়ের রাজা শত্রুদমন প্রতাপ নারায়ণের নিকট সাহায্য পাইয়া ইয়াকুব রাজা শত্রাজিৎকে পুনরাক্রমণ করায় শত্রাজিৎ অপর পারে নিজ ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় ওসমানের পতন সংবাদ পাইয়া বায়াজিদ ভগ্নোৎসাহ হইলেন এবং যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া সেখ কামালের হস্তে তাঁহার সমস্ত হস্তী অর্পণ করিলেন ও সদলবলে ঢাকার দরবারে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

মবরিজ খাঁকে সম্রাটের সৈন্যদলের ভার দিয়া শ্রীহট্টের শাসনের ব্যবস্থা করিয়া সেখ কামাল বায়াজিদ ও তাহার দলকে লইয়া ঢাকায় ইছলাম খাঁর দরবারে চলিয়া আসিলেন। ইছলাম খাঁ কোন দয়া দেখাইলেন না। তিনি শ্রীহট্ট রাজ্য বাজেয়াপ্ত এবং বায়াজিদ ও তাহার দলকে বন্দী করিলেন।

অতঃপর ইছলাম খাঁর আদেশে সেখ কামাল কাছাড়-রাজ শত্রুদমনের (১৬০৫-২৮ খৃঃ) রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে রাজার প্রধান দুইটি দুর্গ প্রতাপগড় ও অসুরাটিকার অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর বাদসাহের প্রেরিত সেনাপতি মবরিজ খাঁ অসুরাটিকার দুর্গে থানা স্থাপন করিয়া কাছাড় রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলে কাছাড় রাজ বশ্যতা স্বীকার করেন (১৬১২ খৃঃ মে)।

অতঃপর ১৬১২ খৃঃ এপ্রিলের প্রারম্ভে রাজমহলের পরিবর্ত্তে ঢাকা নগরে সুবে বাঙলার রাজধানী স্থাপন করিয়া ইছলাম খাঁ সম্রাটের নামানুসারে উহার "জাহাঙ্গীর নগর" নামকরণ করেন।

কামরূপ বিজয়, ১৬১৩ খৃঃ।

কুচবিহারের অপর শাখা কামরূপরাজ পরীক্ষিত কুচবিহার রাজের বাহারবন্দ ও ভিতরবন্দ আক্রমণ করিয়া কতকাংশ অধিকার করিয়া লয় এবং সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথের পরিবারবর্গকে আটক করিয়া রাখে। এই কারণে ইছলাম খাঁ কামরূপরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন।

১৬১২ খৃঃ নভেম্বর মাসে ইছলাম খাঁ মকরম খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সহিত সেখ কামাল ও রাজা রঘুনাথ গমন করেন। উক্ত সৈন্যদলে ১০০০ অশ্বারোহী, ৫০০০ বন্দুকধারী, ৩০০ গজারোহী ও ৪০০ বাদসাহী রণতরী ছিল। এতদ্ব্যতীত মুশা খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত ১০০ রণতরীও ছিল। মীরবহর আদিল খাঁ রণতরীর ভার প্রাপ্ত হইয়া ছিল। তাহারা ঢাকা হইতে ভাওয়াল, টোক (এগারসিন্দুরের অপর পারে), বজরাপুর পাতিলাদহ হইয়া ব্রহ্মপুত্রের বামতীরে সালকোনায় পৌছিল (১৬১২ খৃঃ ৮ই ডিসেম্বর)। এইখানে কামরূপের ৩০০ খানি রণতরীর সহিত সংঘর্ষে কামরূপের পরাজয় ও তাহার ৩০০ রণতরীর কতক জলমগ্ন, কতক মোগলবাহিনীর হস্তগত হইল। অতঃপর মোগল বাহিনী ব্রহ্মপুত্র ও তাহার উভয় তীর ধরিয়া পার্ব্বত্য জঙ্গলময় ভূভাগের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ধুবড়ীতে পৌছিল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ পাতিলাদহ ও ধুবড়ীর মধ্যবর্ত্তী বাহারবন্দের ও ভিতরবন্দের যে অংশ কামরূপরাজ দখল করিয়া লইয়াছিল তাহা মীর্জ্জা নাথন কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। সাড়ে তিনমাস অবরোধের পর ধুবড়ীর দুর্ভেদ্য দুর্গ মোগলবাহিনীর হস্তগত হইল (১৬১৩ খৃঃ এপ্রিল)। ধুবড়ী দুর্গের অধ্যক্ষ ফতে খাঁ শালকা মোগলের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল এবং তথায় অবস্থিত কামরূপের হতাবশিষ্ট সৈন্যের অনেকে প্রায় ১০ মাইল দূরবর্ত্তী কামরূপরাজের রাজধানী গিলাছারে পলাইয়া গেল।

ধুবড়ী দুর্গের পতনে কামরূপরাজ পরীক্ষিত ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ইছলাম খাঁ স্বয়ং পরীক্ষিতের আত্মসমর্পণ দাবী করায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই সময় কুচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণ কামরূপের পশ্চিম সীমার কন্থাঘাট পরগণা আক্রমণ করিলেন এবং তাহার সাহায্যার্থ রাজা শত্রাজিতের সেনাপতিত্বে ২০০ মোগল তরী (গোয়ালপাড়া জেলার) ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতীরস্থ খরবোজা ঘাট আক্রমণ করায় পরীক্ষিত যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া রাজধানী গিলাছারে পলাইয়া গেলেন।

অতঃপর মোগলপক্ষে বাহাদুর গাজী ও সোনা গাজী ২৫০ রণতরী ও ৪০০

বন্দুকধারী সৈন্য লইয়া কামরূপের রাজধানী গিলাছার অবরোধ করিবার জন্য গদাধর নদীর তীরে গিলার সম্মুখে একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি প্রস্তুত করিল। অবরোধ এড়াইবার জন্য কামরূপরাজ তাঁহার জামাতা ডিমারুয়া রাজাকে রণতরী ও গজসৈন্য লইয়া গদাধরতীরস্থ মোগল ঘাঁটি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া স্বয়ং সমগ্র স্থলবাহিনী লইয়া ধুবড়ী দুর্গ আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। ডিমারুয়া রাজা যথাসময়ে বাহাদুর ও সোনাগাজীর নৌবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাহাদের ঘাঁটি দখল করিতে সমর্থ হইল। গাজীদ্বয়ের প্রায় সমস্ত নৌবাহিনী কামরূপের হস্তগত হইল। মাত্র ৪৩ খানি রণতরী লইয়া গাজীরা পলায়ন করিল।

অতঃপর ডিমারুয়া রাজা প্রভাতে ধুবড়ীতে পৌছিয়া দেখিলেন যে কামরূপরাজ পরীক্ষিতের স্থলবাহিনী তখনও তথায় পৌছে নাই। স্থলসৈন্য পৌছামাত্র রাজা ধুবড়ী দুর্গ আক্রমণ করিলেন ও তাঁহার জামাতা নৌবাহিনী লইয়া মোগল নৌবাহিনীর উপর পতিত হইলেন। দুর্গে জামাল খাঁ, মানকালী ও লছমী রাজপুতের অধীনে অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল। জামাল ও লছমীকে আহত করিয়া কামরূপ-সৈন্য অনায়াসে বিজয়ী হইল কিন্তু ওসমানের ধনুকধারী সৈন্যেরা অপর একটি ঘাঁটি রক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে নূতন মোগল সৈন্য আসিয়া তাহাদের বলবৃদ্ধি করিল। কামরূপরাজের পতাকাবাহী নিতাই ৪০০।৫০০ ধনুকধারী সৈন্য লইয়া এই সময় উপস্থিত হইল, কিন্তু বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত তীরে বিদ্ধ হইয়া নিতাইএর হস্তী নিতাইকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ছুটিতে লাগিল এবং কামরূপের সৈন্যমধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। রাজা পরীক্ষিত চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভীষণ রৌদ্রে সমস্ত দিন আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ চলিতে লাগিল। অপর দিকে জলযুদ্ধে ডিমারুয়া রাজা অনেকটা কৃতকার্য্য হইলেন বটে, কিন্তু অকস্মাৎ একটি কামানের গোলার আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় কামরূপের নৌবহরে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। তখন কামরূপরাজ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া গিলা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মোগলবাহিনী তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া গিলায় পৌছিয়া দেখিল রাজা মনাস নদীর তীরে অবস্থিত তাঁহার অন্য রাজধানী বড় নগরে চলিয়া গিয়াছেন। বাদসাহী ফৌজ গিলা অধিকার করিয়া পুনরায় রাজার পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করিল। পথে কুচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণ বাদসাহী সৈন্যদলে যোগ দিল। ছয়দিন যাবৎ পশ্চাদনুসরণ চলিল। মীর্জ্জা কাশিম খাজাঞ্চি ও রাজা শত্রাজিৎ নৌবহর লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদীতে কামরূপরাজের গতিপথ অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভীত সন্ত্রস্ত

কামরূপরাজ অবশেষে সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন (১৬১৩ খৃঃ জুলাই)। কামরূপ রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। বাদসাহী সেনাপতি মকরম খাঁ ও সেখ কামাল বিজয়োল্লাসে ভাওয়ালে পৌছিয়া দেখিতে পাইল ইছলাম খাঁ পীড়িত হইয়া তৎপূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন (১৬১৩ খৃঃ আগষ্ট) [বাহার-ই-স্তান, পাদসানামা ও আসাম বুরুঞ্জি]।

৮। কাশিম খাঁ (১৬১৩-১৬১৭ খৃঃ)।

ইছলাম খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা কাশিম খাঁ ১৬১৩ খৃঃ সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি প্রায় আট মাস পর ১৬১৪ খৃঃ ৬ই মে জাহাঙ্গীর নগরে আসিয়া কার্য্যে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে ইছলাম খাঁর পুত্র সেখ হুসাং, দেওয়ান মীর্জ্জা হোসেন বেগ, বকসী খাজা তাহের মহম্মদ ও সংবাদ লেখক আকা ইয়াখমা কাজ চালাইলেন।

কাশিম খাঁ প্রথমেই মীর্জ্জা হোসেন বেগকে কারারুদ্ধ ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর প্রেরিত সাদৎ খাঁর অনুসন্ধানে হোসেন বেগ নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি মুক্ত হন ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়া পান ও একলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পান। কাশিম খাঁ ইতিমধ্যে কোচবিহার-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণ ও কামরূপরাজ পরীক্ষিতকে বন্দী করিয়া আগ্রায় প্রেরণ করেন। কাছাড়রাজ শত্রুদমনের বিরুদ্ধে মবরিজ খাঁকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। প্রথমে কিছু সুবিধা হইলেও হঠাৎ মবরিজ খাঁর মৃত্যু হওয়ায় মোগল সৈন্য শ্রীহট্টে ফিরিয়া আসে।

বীরভূমের জমিদার বীর হাম্বির, পাঁচেটের (পঞ্চকোট) জমিদার সমস খাঁ, হিজলীর জমিদার বাহাদুর খাঁ ও চন্দ্রকোণার জমিদার বীরভানু রীতিমত কর না দেওয়ায় কাশিম খাঁ বীর হাম্বির ও (ছালম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র) সমস খাঁর বিরুদ্ধে সেখ কামালকে এবং বাহাদুর খাঁ ও বীরভানুর বিরুদ্ধে মীর্জ্জা মক্কীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য না দেওয়ায় তাহারা উভয়েই অকৃতকার্য্য হয়।

আরাকান রাজ মেং খেমাং ও সন্দ্বীপের পর্ত্তুগীজ জলদস্যু সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস একযোগে ভুলুয়ার থানা আক্রমণ করে। থানাদার আব্দুল ওয়াহিদ ভয়ে পলায়ন করায় আরাকানী ও পর্ত্তুগীজরা ভুলুয়ায় ও চতুর্দ্দিকের গ্রামাঞ্চলে যথেচ্ছা উৎপীড়ন ও লুণ্ঠন করিতে থাকে। সৌভাগ্যবশতঃ আরাকানরাজের সহিত ফিরিঙ্গীদের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় এই সুযোগে সেখ কামাল ও মীর্জ্জা মক্কী সৈন্য ও রণতরীসহ উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ চট্টগ্রামে ও ফিরিঙ্গীরা

সন্দীপে ফিরিয়া যায় (১৬১৪ খৃঃ ডিসেম্বর)।

১৬১৫ খৃঃ অক্টোবরে আরাকানরাজ পুনরায় ভুলুয়া আক্রমণ করে। থানাদার আব্দুল ওয়াহেদ পুনরায় পলায়ন করে, কিন্তু তাহার পুত্র মীর্জ্জা নূর উদ্দিন ও কতিপয় সাহসী মোগল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে প্রবলভাবে আরাকানীদিগকে আক্রমণ করে। সহসা আক্রান্ত হইয়া আরাকানীরা পশ্চাৎপদ হইতে হইতে একটি কর্দ্দমময় জলাভূমির মধ্যে আটকাইয়া যায় এবং বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অতঃপর তাহাদের সমস্ত বাহিনী, সাজসরঞ্জাম ও রণহস্তী মোগল হস্তে অর্পণ করিয়া রাত্রিযোগে আরাকানরাজ সামান্য কতিপয় অনুচরসহ চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান।

অতঃপর কাশিম খাঁ আসামরাজের বিরুদ্ধে প্রায় ১০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক, ২০০০ বন্দুকধারী, ৪০০ রণতরীসহ সৈয়দ আবুবকরকে প্রেরণ করেন। আবুবকর প্রথমে কামরূপের পুরাতন রাজধানী বড়নগর ও পরে হাজোতে শিবির স্থাপন করিলেন এবং তথায় বর্ষাকাল (১৬১৫ জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) অতিবাহিত করিলেন। ১৬১৫ খৃঃ নভেম্বরে সহসা আক্রমণ করিয়া আহমরাজের সীমান্ত দুর্গ কাজলী অধিকার করিলেন। আহমরাজের পরবর্ত্তী দুর্গ (ব্রহ্মপুত্র ও ভরলী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত) সামধরা রক্ষার জন্য হাতী বড়ুয়া, রাজখাওয়া ও খরঘুকা ফুকনকে তথায় স্থাপন করিলেন। আবুবকর সামধরা দুর্গের বিপরীত দিকে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিলেন। ১৬১৬ খৃঃ জানুয়ারীর মধ্যভাগে রাত্রিকালে ভরলী নদীর উপর তিনটি নৌসেতু স্থাপন করিয়া তৎসাহায্যে আহমেরা ৩০০০০০ সৈন্য ও ৭০০ রণহস্তী লইয়া অপর পারে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করে। ঘোরতর যুদ্ধের পর মোগল ঘাঁটি অধিকৃত হয় এবং রণগজগুলি ধৃত হয়। সেনাপতি আবুবকর, সৈয়দ হাকিম, সৈয়দ কালু, জামাল খাঁ মানকালী, লছমীরাজপুত প্রভৃতি সেনানায়কগণ নিহত হন। সম্পূর্ণ নৌবাহিনী আহমদের হস্তগত হয়। নৌসেনানীগণের মধ্যে ইনদাদ খাঁ রাজারায়, নরসিংহ রায়, প্রভৃতি আহত ও বন্দী হয়। কেবলমাত্র জমিদারদের নৌবাহিনীর অধিনায়ক মীরাণ সৈয়দ মদায়ুদ, সোনাগাজী ও রাজা শত্রাজিৎ কোনরূপে নিজ নৌকায় উঠিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

আসামের ভীষণ পরাজয়ে নিরুৎসাহ না হইয়া কাশিম খাঁ চট্টগ্রাম আক্রমণের জন্য ভুলুয়া হইতে আব্দুল নবীকে ৫০০০ অশ্বারোহী ৫০০০ বন্দুকধারী, ২০০ রণহস্তী ও ১০০০ রণতরীসহ চট্টগ্রামে পাঠাইলেন। অপর দিকে আরাকানরাজ মেং খামাং তাহার প্রধান সেনাপতিকে ১০০,০০০ পদাতিক ৪০০ রণহস্তী, ১০০০

রণতরীসহ চট্টগ্রামের ২০ মাইল উত্তর পশ্চিমে কাঠগড় নামক স্থানে পাঠাইলেন (১৬১৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী) এবং স্বয়ং রাজধানী ম্রোহং হইতে ৩০০,০০০ পদাতিক ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং বহুসংখ্যক রণহস্তী ও রণতরী লইয়া চট্টগ্রামে রওনা হইলেন।

মোগলেরা বিলম্ব না করিয়া প্রত্যুষে কাঠগড়ের অসমাপ্ত দুর্গ সহসা আক্রমণ করায় আরাকানীরা প্রথমে কিছু অসুবিধাগ্রস্ত হইলেও মোগল সেনাপতি সেদিন অপরাহ্নে যুদ্ধ বন্ধ করায়, আরাকানীরা তাহাদের দুর্গ সুরক্ষিত ও সৈন্য সুসজ্জিত করিবার সুযোগ লাভ করে। মোগলেরা পরদিন দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হয় এবং অগত্যা কিছুদিন দুর্গ অবরোধ করিয়া থাকিয়া নিজেরাই খাদ্যাভাবে অবরোধ ত্যাগ করিয়া জাহাঙ্গীর (ঢাকা) নগরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

৯। ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ (১৬১৭-১৬২৩ খৃঃ)।

কাশিম খাঁর অকর্ম্মণ্যতার জন্য জাহাঙ্গীর তাঁহাকে সরাইয়া তৎস্থলে নূরজহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গকে সুবে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কাশিম খাঁ আরও সাতমাস কার্য্যত্যাগ করিলেন না। অবশেষে ১৬১৭ খৃঃ নবেম্বরের প্রথমে ইব্রাহিম খাঁ জাহাঙ্গীর নগরে পৌছিলেন। তাঁহার ৫ বৎসর শাসনকালে বাঙলাদেশ মোটামুটি শান্ত ছিল। ফলে কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পে এদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঢাকার মস্‌লিন ও গৌড়ের রেশম বস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাঁহার সুপারিশক্রমে রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্রগণ ও কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও পরীক্ষিত নারায়ণকে বাদসাহ মুক্তি দান করেন। জাহাঙ্গীর নগরে বন্দী মুশা খাঁ ও অন্যান্য জমিদারগণকেও তিনি মুক্তি দান করেন (১৬১৮ খৃঃ মার্চ্চ)। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও মুশা খাঁ অতঃপর তাঁহাদের জীবনকাল পর্য্যন্ত বাদসাহের অনুগত থাকিয়া বাদসাহের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

১৬১৮ খৃঃ নবেম্বরে ইব্রহিম খাঁ ত্রিপুরারাজ যশোমাণিক্যের বিরুদ্ধে মীর্জ্জা ইসকাণ্ডিয়ারের অধীনে একদল ও মীর্জ্জা নূরউদ্দিন ও মুশা খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, প্রথম দল গোমতীতীরস্থ ত্রিপুরা রাজধানী উদয়পুরের ২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কালীয়াগড়ের পথে ও দ্বিতীয় দল উদয়পুরের ১৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মেহেরকুলের পথে উদয়পুরাভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহাদিগকে সাহায্যের জন্য মীরবহর বাহাদুর খাঁর অধীনে একটি নৌবাহিনী গোমতী নদী দিয়া উজান বহিয়া রাজধানী অভিমুখে যাইতে লাগিল। কালীয়াগড়ের যুদ্ধে ত্রিপুরা-

রাজ ভীষণ ভাবে পরাজিত হইয়া রাজধানীর দিকে পশ্চাৎপদ হইলেন। পথে মীর্জ্জা নূরউদ্দিন ও মুশাখাঁর সহিত যুদ্ধেও রাজা হারিয়া গেলেন। অবশেষে রাজা নিজ নৌবহর লইয়া মোগল নৌবহরের গতি রোধ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না। মোগলেরা যখন রাজধানীতে প্রবেশ করিল, তখন রাজা সপরিবারে ধনরত্নসহ আরাকানে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ধৃত হইয়া জাহাঙ্গীর নগরে আনীত হইলেন রাজধানী উদয়পুরে একটি মোগল থানা স্থাপিত হইল।

১৬২১ খৃঃ মার্চ্চমাসে ইব্রাহিম খাঁ ত্রিপুরা হইতে চট্টগ্রামে আরাকানীদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া অকৃতকার্য্য হন। অতঃপর হিজলীর জমিদার বাহাদুর খাঁ বিদ্রোহী হয়। কিন্তু শেষে সুবাদারের নিকট যশোহরে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে। সুবাদার তাঁহাকে জমিদারী রাখিতে দেন কিন্তু ৩০০০০০ টাকা জরিমানা আদায় করিয়া লন। ১৬২১ খৃঃ আগষ্টের মধ্যভাগে আরাকানীরা মেঘনা নদীর মোহানাস্থিত দ্বীপ দক্ষিণ সাহাবাজপুরে লুণ্ঠন আরম্ভ করিলে সুবাদার স্বয়ং ৪।৫ হাজার রণতরী লইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হন, কিন্তু ব্রহ্মরাজ আরাকান আক্রমণ করায় আরাকানীরা নিজদেশে চলিয়া যায়, অতঃপর দুইবৎসর মধ্যে বাঙলায় আর কোন উপদ্রব হয় নাই।

১৬২৫ খৃঃ মার্চ্চ মাসে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেনাপতি সেখ কামালের ও ১৬২৩ খৃঃ এপ্রিল মাসে মুশা খাঁর মৃত্যু হয়। সুবাদার সেখ কামালের ও পুত্র সেখ সাহ মহম্মদ ও মুশা খাঁর পুত্র মাসুম খাঁকে তাহাদের পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

জাহাঙ্গীরের (সলিম) শেষ জীবনে নূরজহানের ষড়যন্ত্রে রাজ্যের শান্তি নষ্ট হয়। জাহাঙ্গীরের চারিপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ খসরু রাজ্যলোভে বিদ্রোহী হয়, কিন্তু জাহাঙ্গীর তাহাকে পরাজিত ও অন্ধ করিয়া বন্দী করিয়া রাখেন ও ১৬২২ খৃঃ বন্দী অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পরভিজ ও চতুর্থ পুত্র শাহরিয়র অপেক্ষা তৃতীয় পুত্র সাহজহান যোগ্যতর ছিলেন। সাহজহানের শ্বশুর আসফ খাঁ নূরজহানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও একজন প্রধান ওমরাহ ছিলেন। সাহজহান আশা করিয়াছিলেন যে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তিনিই বাদসাহ হইবেন। কিন্তু নূরজহানের পূর্ব্বপক্ষের কন্যার সহিত শাহরিয়রের বিবাহ হইয়াছিল, সেই সূত্রে নূরজহান জামাতা শাহরিয়রকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য সাহজহান বিদ্রোহী হইয়া প্রথমে রাজধানী আগ্রা অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ ও পরভিজ তাঁহাকে পরাজিত করায় তিনি দাক্ষিণাত্যে বুরহানপুরে পলায়ন করেন। ১৬২৩ খৃঃ অক্টোবর মাসে তথা হইতে গোলকুণ্ডা

ও মছলিপত্তম হইয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন। এই সময় ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মীর্জ্জা আহম্মদ বেগ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

সাহজহান মানপুরে চতরদিয়ার গিরিপথ অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা রাজমহলে পলাইয়া গেলে সাহজহান অনায়াসে উড়িষ্যা দখল করেন। তিনি খুর্দ্দায় আসিলে তথাকার রাজা পুরুষোত্তমদেব ও অন্যান্য অনেক জমিদার তাঁহার অনুগত্য স্বীকার করিল এবং কটকে আসিলে হুগলী ও পিপ্লির পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা মিগুয়েল (Miguel Rodrigues) তাঁহাকে মূল্যবান উপহার দিয়া বন্ধুত্ব প্রদর্শন করে। তিনি বর্দ্ধমানে আসিলে ফৌজদার মীর্জ্জা সালি তাঁহাকে বাধা দেয়, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর সাহজহান আকবর নগরে (রাজমহল) পৌছিলে আহম্মদ বেগ ইব্রাহিম খাঁর নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ইব্রাহিম ৬০০০ অশ্বারোহী, ১০০ রণ-হস্তী, ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া আকবর নগরে পৌছিলেন। এতদ্ব্যতীত মীরবহর মীর সমসের নেতৃত্বে ৩০০ রণহস্তী ও পর্ত্তুগীজ মেনোল ট্যাভারিসের (Manoel Tavares) কতকগুলি নৌকা ও মাসুম খাঁর রণতরী তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। সাহজহান কালবিলম্ব না করিয়া দোরিয়া খাঁ রোহিলাকে গঙ্গাপার হইয়া ইব্রাহিম খাঁর শিবির আক্রমণ করিতে ও দোরাব খাঁকে বহুসংখ্যক কামান সহ আকবর নগর দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর দোরিয়া খাঁর সাহায্যার্থ ১৫০০ অশ্বারোহীসহ তাঁহার সেনাপতি আব্দুল্লা খাঁ ও রাজা ভীম ও তাঁহার রাজপুত যোদ্ধৃগণকে প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ নিহত ও আহম্মদ বেগ আহত হইল এবং সাহজহানের পক্ষ জয়লাভ করিল (১৬২৪ খৃঃ ২০ এপ্রিল)। সুবে বাঙলার সুবাদারের মৃত্যুর পর আকবর নগরের দুর্গ ও রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর অল্পকাল মধ্যেই কুমার সাহজহানের হস্তগত হইল। তিনি রাজা ভীমকে আকবর নগরের শাসনকর্ত্তা দোরাব খাঁকে সুবে বাঙলার সুবাদার, খাজা মুল্‌কীকে দেওয়ান, মীর্জ্জা হেদায়েতু খাঁকে সংবাদলেখক ও খাজাঞ্চী, মালিক হোসেনকে কোষাধ্যক্ষ, আদিল খাঁ ও পহার খাঁকে মীরবহর, খিদমৎ পরস্ত খাঁকে তোপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। জাহাঙ্গীর নগরে সাহজহান বহু ধনরত্ন, নগদ ৪০লক্ষ টাকা ও বহু পোষাক পরিচ্ছদ, ৫০০ রণ হস্তী, ৪০০ যুদ্ধাস্ত্র, সমস্ত কামান ও রণপোত প্রাপ্ত হইলেন। পরে মীর্জ্জা মুলকীর স্থলে জহর মলদাস দেওয়ান ও মীর্জ্জা নাথান (সাজহানের দলে যোগ দেওয়ায়) রাজা ভীমের স্থলে আকবর নগরের শাসনকর্ত্তা হন ও রাজা ভীম পাটনায় প্রেরিত হন।

আরাকানরাজ মেং খামাংএর ইতিমধ্যে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র রাজা

খিরি খুঙ্গম্মা কুমার সাহজহানের সহিত-বন্ধুত্ব প্রদর্শন করেন।

অতঃপর সাহজহান বিহার ও জৌনপুর ও অযোধ্যা অধিকার করিয়া এলাহাবাদ ও চুণার দুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু এই সময় কুমার পারভেজ ও সম্রাটের সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। মীর্জ্জাপুর জেলায় তমসানদীর তীরে কাণ্টি নামক স্থানে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল (১৬২৪ খৃঃ অক্টোবরের শেষভাগে)। সাহজহান যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ও সুবে বাঙলার সুবাদার দোরাব খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করায় তিনি পুনরায় দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিলেন।

সম্রাটের আদেশে মহব্বৎ খাঁ বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন ও দোরাব খাঁর প্রাণদণ্ড হইল এবং কুমার পারভেজ দাক্ষিণাত্যে সাহজহানের পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত হইল (১৬২৫ খৃঃ মার্চ্চ)।

১৬২৬ খৃঃ জুনমাসে মহব্বৎ খাঁ বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্যে সাহজহানের দলে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে মহব্বৎ খাঁর অকর্ম্মণ্য পুত্র খানজাদ খাঁ জাহাঙ্গীর নগরে থাকিয়া বাঙলার শাসনকার্য্য চালাইতেছিল। আরাকানরা এই সময় খিজির পুর পৌঁছিয়া জাহাঙ্গীর নগর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর খানজাদ খাঁকে আগ্রার দরবারে ডাকিয়া লইয়া মকরম খাঁকে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয় (১৬২৬ খৃঃ জুন)। ১৬২৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারীতে মকরম খাঁর মৃত্যু হয়। তৎপর ফিদাই খাঁ বাঙলার সুবাদার হন (১৬২৭ খৃঃ মার্চ্চ)। ইনি বাদসাহ জাহাঙ্গীরকে বার্ষিক পাঁচলক্ষ ও সাম্রাজ্ঞী নূরজহানকে বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা বাঙলার রাজকোষ হইতে প্রেরণ করিতেন। ১৬২৭ খৃঃ অক্টোবর জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সাহজহান সম্রাট হন (১৬২৮ ফেব্রুয়ারী) তিনি কাশিম খাঁকে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত করেন (১৬২৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারী)। এই কাশিম খাঁ নূরজহানের ভগ্নীপতি ছিলেন।

ইহার সময়ের প্রধান ঘটনা—পর্ত্তুগীজদের হস্ত হইতে-হুগলী অধিকার (১৬৩২ খৃঃ ১৯ সেপ্টেম্বর)। হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম এককালে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। ইহা সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। সরস্বতী ও যমুনা নদীদ্বয় ইহার নিকটে গঙ্গা হইতে নির্গত হওয়ায় ঐস্থান ত্রিবেণী নামে পরিচিত। কালক্রমে যমুনা ও সরস্বতীর স্রোত সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সপ্তগ্রামের বন্দর ধ্বংস হয় ও তৎপরিবর্ত্তে তিন মাইল পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে হুগলীতে বন্দর গড়িয়া উঠে। পর্ত্তুগীজরাই প্রধানতঃ এই বন্দর হইতে সামুদ্রিক বাণিজ্য চালাইত। ১৫৭৮ খৃঃ মে মাসে পেড্রো ট্যাভারিজ (Pedro Tavares) নামক একজন পর্ত্তুগীজ আকবরের নিকট হইতে বাঙলাদেশে একটি নগর স্থাপনের, গির্জ্জা নির্ম্মাণের ও ধর্ম্মপ্রচারের

ফার্ম্মান লাভ করেন (আকবর নামা, তৃতীয় খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ)। এই ফার্ম্মানের বলে হুগলীতে পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। সাহজহানের অভিষেকের সময় পর্ত্তুগীজেরা কোন উপঢৌকন বা দূত প্রেরণ না করায়, সাহজহানের অনুমতি অনুসারে কাশীম খাঁ পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হন। তিনি বাহাদুর কম্বুর নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। তাঁহার পুত্র এনায়েতুল্লার নেতৃত্বে আর একদল সৈন্য বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে খাজা সেরের অধীনে বাদসাহী রণবহর ও (মুশা খাঁর পুত্র) মাশুম খাঁর নেতৃত্বে জমিদার গণের রণতরীসমূহ শ্রীপুর হইতে (কলিকাতায় ১০ মাইল দক্ষিণে) শাকরাইলে আসিয়া পৌছিল (১৬৩২ খৃঃ ১৬ জুন)। ক্রমে বর্দ্ধমানের ও মুর্শিদাবাদের বাদসাহী বাহিনী তাহদের সহিত যোগ স্থাপন করিল। ২০ শে জুন সমস্ত বাহিনী হুগলীতে উপস্থিত হইল ও তিনমাস যুদ্ধের পর ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী মোগল বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। ১৬৩২ খৃঃ ১৯ শে সেপ্টেম্বর কাশিম খাঁর মৃত্যু হয়।

পাদসানামার মতে শত্রুপক্ষের সর্ব্বপ্রকারে প্রায় ১০,০০০ লোক নিহত ও ৪৪০০ খৃষ্টীয়ান বন্দী হইয়াছিল। ৪০০ ফিরিঙ্গী পুরুষ ও স্ত্রী আগ্রায় বন্দী দশায় আনীত হইয়াছিল (১৬৩৩ খৃঃ ৮ জুলাই)। অবশিষ্টকে সমস্ত জীবনকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। আব্দুল হামিদ লাহোরী সরকারী বিবরণ দৃষ্টে বলেন মোগল বাহিনীর ১০০০ সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

অতঃপর আজম খাঁ মীর মহম্মদ বাকর (১৬৩২ খৃঃ অকটোবর—১৬৩৫ খৃঃ ১২ মার্চ্চ) সুবে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তৎপর ইছলাম খাঁ মাসাদি ১৬৩৫ খৃঃ ১১ই এপ্রিল হইতে ১৬৩৯ খৃঃ জানুয়ারী পর্য্যন্ত সুবাদার ছিলেন।

ইছলাম খাঁ মাসাদির সময় পুনরায় কামরূপে (কোচহাজো) যুদ্ধ হয়। এই সময় সুসেঙ্গফা (প্রতাপ সিংহ ১৬০৩-৪১ খৃঃ) আসামে প্রবল রাজা ছিলেন। কামরূপ রাজ পরীক্ষিৎ ১৬১৬ খৃঃ পরলোকগত হইলে তাঁহার ভ্রাতা বলীনারায়ণ সুসেঙ্গফার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুসেঙ্গফা তাঁহাকে ধর্ম্মনারায়ণ নাম দিয়া দরং এর রাজা করিয়া দেন। ইছলাম খাঁ মাসাদির সুবাদারী আমলে বলীনারায়ণ পাণ্ডুর মোগল থানাদার রাজা শত্রাজিতের পরামর্শে কামরূপের ফৌজদার আব্দাস সালামকে আক্রমণ করিলে ফৌজদার ঢাকার সুবাদারের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সুবাদার সেখ মঈউদ্দিন সালিহকম্বু, জয়েনউদ্দিন প্রভৃতিকে নূতন সৈন্য বাহিনাসহ প্রেরণ করিলেন (১৬৩৬ খৃঃ জুলাই)। কিন্তু মোগল বাহিনীর

সেনানায়কগণের মধ্যে একতা না থাকায় ও রাজা শত্রাজিতের বিশ্বাসঘাতকতা মূলক সংবাদে আস্থা স্থাপন করায় পাণ্ডুর ঘাঁটিটি তাহাদের হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু আব্দাস্ সালাম হাজো (কামরূপ) অধিকার করিয়া রহিল এবং জৈন-উল-আবাদিনকে আহমদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। ফলে আহমেরা তাহাদের শ্রীঘাট সীমান্তে ফিরিয়া গেল। এই সময় ঢাকা হইতে সুবাদারের ভ্রাতা মীর জয়েনউদ্দিন আলির অধীনে নূতন সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু আহমদের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিল না। পাণ্ডুর থানাদার রাজা শত্রাজিৎ ও বাঙলার অপর কতকগুলি জমিদার পলাইয়া গেল। মাজুলী দ্বীপের যুদ্ধে মোগলেরা সম্পূর্ণরূপে হারিয়া গেল। সালিহকম্বু নিহত, বায়াজিদ্ বন্দী ও সম্পূর্ণ জলবাহিনী ও রসদ আহমদের হস্তগত হইল।

অতঃপর বলীনারায়ণ হাজো মোগল সৈন্যগণকে অবরুদ্ধ করিলে, খাদ্যাভাবে মোগলেরা আত্মসমর্পণ করিল। আবদাস্ সালাম ও (তাহার ভ্রাতা) মহি-উদ্দিন বন্দী হইল, কেবলমাত্র জয়েন-উল আবাদিন যুদ্ধে প্রাণ দিল (১৬৩৭ খৃঃ জানুয়ারী)। পরীক্ষিৎ নারায়ণের অপর পুত্র চন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরস্থ কড়িবাড়ী অধিকার করিয়াছিল। মীর জয়েনউদ্দিন আলির নেতৃত্বে মোগলগণ কড়িবাড়ী পুনরধিকার করিলে, চন্দ্র নারায়ণপলায়ন করিল (১৬৩৬ খৃঃ ২৮ ডিসেম্বর)। ধুবড়ীতে রাজা শত্রাজিৎ ধৃত হইয়া ঢাকায় প্রেরিত ও তথায় নৃশংস ভাবে নিহত হইল। বিষ্ণুপুরের নিকট কালাপানি নদীতীরে বলীনারায়ণ ও আহমগণ পরাস্ত হইয়া পলাইয়া গেল। আহমদের ৪০০০ সৈন্য নিহত ও অনেক সেনানায়ক বন্দী হইল ও বহু রণসম্ভার মোগলদের হস্তগত হইল। মোগলেরা পাণ্ডু ও শ্রীঘাট দখল করিয়া লইল। পরিশেষে কলং ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কাজলীদুর্গ অধিকার করায় সমগ্র কোচ হাজো রাজ্য মোগল অধিকারে আসিল ও গৌহাটিতে তাহাদের রাজধানী হইল। এইরূপে ১২ বৎসর যুদ্ধের পর উত্তরে বড়নদী ও দক্ষিণে অসুরালীকে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া আহমরাজ সন্ধি করিতে বাধ্য হইল (১৬৩৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর)।

আরাকানের রাজা সুধর্ম্মারাজের (১৬২২-১৬৩৮ খৃঃ) মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীর উপপতি রাজপুত্রকে বধ করিয়া রাজা হয়। মৃত রাজার খুল্লতাত মঙ্গৎ রায় চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এই সুযোগে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, কিন্তু নূতন আরাকান রাজের সহিত যুদ্ধে অপারগ হইয়া বাঙলার সুবাদারের সাহায্যে ঢাকায় মোগল রাজ্যে আশ্রয় লাভ করে। তাহাতে আরাকানরাজ ভুলুয়া ও শ্রীপুরে আক্রমণ চালাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু শেষে

পলায়ন করে (১৬৩৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর)।

১০ সাহজাদা মহম্মদ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খৃঃ)।

অতঃপর সাহজাদা মহম্মদ সুজা ১৬৩৯ খৃঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী সুবে বাঙলার সুবাদার হন।

১৬৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত বাঙলার শান্তি অক্ষুন্ন ছিল। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর বাদসাহ সাহজহান গুরুতর পীড়িত হন। তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের গর্ভজাত তাঁহার চারিপুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দারা সেকো চল্লিশ হাজারী মনসবদার ও পাঞ্জাব-মূলতান-এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু যুবরাজ বলিয়া স্বয়ং রাজধানীতে থাকিতেন এবং প্রতিনিধি দ্বারা ঐ সকল প্রদেশ শাসন করিতেন। তিনি বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। দ্বিতীয়পুত্র সুজা বাঙালার সুবাদার ছিলেন। তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব কূট রাজনীতিজ্ঞ, নির্দ্দয়, কলাবিদ্যাবিরোধী গোঁড়াসুন্নী মুসলমান ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। চতুর্থ পুত্র সরল প্রকৃতি, বিলাসপ্রিয় ও যুদ্ধনিপুণ সাহসী মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দারা পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারী হইলেও অপর তিন ভ্রাতা তাহা স্বীকার করিতেন না। সুতরাং সাহজহানের পীড়ার সংবাদ পাইয়া সিংহাসন-লোলুপ অপর তিনভ্রাতা রাজধানী আগ্রা অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিলেন। পথিমধ্যে মালবে ঔরঙ্গজেবের সহিত মুরাদের সাক্ষাৎ হইল। এবং ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারা সন্ধি করিলেন যে পিতৃরাজ্য তাঁহারা সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইবেন।

দারা সাহজহানের অনুমতিক্রমে রাজা যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁকে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের বিরুদ্ধে এবং দারারপুত্র সুলেমান সিকো ও রাজা জয়সিংহকে সুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কাশীর নিকট সুলেমান সুজাকে পরাজিত করিলেন, কিন্তু ১৬৫৮ খৃঃ এপ্রিলমাসে ধর্ম্মাটের যুদ্ধে কাশিম খাঁ গোপনে ঔরঙ্গজেবের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া যুদ্ধে যোগ না দেওয়ায় একা যশোবন্ত সিং তাঁহার রাজপুত সৈন্য লইয়া ভীষণ যুদ্ধ করিয়াও ঔরঙ্গজেব ও মুরাদকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। বিজয়ী ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে আগ্রার নিকট সমুদ্রগড়ে স্বয়ং দারা ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পাঞ্জাবে পলায়ন করিলেন (১৬৫৮ খৃঃ মে)। অতঃপর ঔরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করিয়া সাহজহানকে বন্দী করিয়া রাখিলেন (১৬৫৮ খৃঃ জুন), এবং মুরাদকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে

বন্দী করিয়া শিরশ্ছেদ করা হইল (১৬৬১ খৃঃ ডিসেম্বর)।

ধর্ম্মাট ও সমুদ্রগড়ের যুদ্ধে দারার সৈন্যগণ পরাজিত হওয়ায় সুলেমান সিকো নিরুপায় হইয়া গাড়োয়ালরাজের আশ্রয়ে গমন করেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে রাখিয়া দিলেন। তথায় আফিং প্রয়োগে ধীরে ধীরে তাহাকে হত্যা করেন। দারা পাঞ্জাব হইতে মুলতান, তথা হইতে ক্রমশ সিন্ধু গুজরাট ও রাজপুতানায় পলায়ন করিয়া অবশেষে ১৬৫৯ খৃঃ মার্চ্চ মাসে দেওয়াইর যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের হস্তে পরাজিত হন এবং পলাইয়া পারস্যে যাইবার পথে ঔরঙ্গজেবের লোকের হস্তে ধৃত হইয়া ঔরঙ্গজেবের হস্তে পতিত হন ও ১৬৫৯ খৃঃ আগষ্টমাসে ঔরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হন। সুজা আর একবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া খাজোয়া নামক স্থানে ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হইয়া বাঙলায়, পরে আরাকানে পলায়নঃ করেন। ১৬৬১ খৃঃ আরাকান রাজের আদেশে তিনি নিহত হন।

১১। মীর জুম্‌লা (১৬৬০-১৬৬৩ খৃঃ)।

ঔরঙ্গজেব ১৬৫৮ খৃঃ জুন মাসে আগ্রা অধিকার করিয়া ও সাহজহানকে বন্দী করিয়া সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃঃ জুন মাসে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয় এবং তিনি আলমগীর (বিশ্ব বিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন। ১৬৬০ খৃঃ ৯ই মে সুজার সুবে বাঙলা ত্যাগ করার সংবাদ পাইবামাত্র ঔরঙ্গজেব মীর জুম্‌লাকে (মুয়াজ্জম খাঁ খান্ খানান্) সুবে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং ১৬৬০ খৃঃ ৯ই মে মীর জুম্‌লা ঢাকায় প্রবেশ করিয়া বাঙলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন (১৬৬০ খৃঃ ৯ই মে-১৬৬৩ খৃঃ ৩১শে মার্চ্চ)। ১৬৬১ খৃঃ ১লা নবেম্বর মীর জুম্‌লা ১২০০০ অশ্বারোহী, ৩০০০০ পদাতিক, শক্তিশালী রণপোত ও কামানশ্রেণী সহ কোচবিহার আক্রমণ করিলে রাজা রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন এবং ১৬৬১ খৃঃ ১৯শে ডিসেম্বর মীর জুম্‌লা পরিত্যক্ত রাজধানী অধিকার করিয়া কুচবিহারের নাম আলমগীরনগর রাখিলেন ও তথায় আলমগীরের নামে মুদ্রা মুদ্রিত করাইলেন। অতঃপর তথায় ইশকান্দিয়ার বেগকে রাখিয়া আসাম আক্রমণে অগ্রসর হইলেন (১৬৬২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী)।

আহমেরা ক্রমাগত পশ্চাৎপদ হইতে হইতে অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ মার্চ্চ মাসে একটি নৌযুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইল এবং তাহাদের ৩০০ রণতরী মোগলদের হস্তগত হইল। অতঃপর মীর জুম্‌লা দ্রুতগতি আহম রাজধানী গড় গাঁ অধিকার করিলেন (১৭ই মার্চ্চ)। আহমরাজ জয়ধ্বজ (১৬৪৮-৬৩ খৃঃ) রাজধানী

ও সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ১০০০ রণপোত ও বিপুল ধনধান্য ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিল। রাজধানী গড় গাঁয়ে মীর মুর্ত্তাজাকে রাখিয়া মীর জুম্‌লা গড় গাঁ হইতে ৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে মথুরাপুরের উচ্চভূখণ্ডে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মীরবহর ইবন হোসেন ১৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে লখাউ নামক স্থানে গভীর জলে সমগ্র নৌবাহিনী লইয়া অবস্থান করিলেন (১৬৬২ খৃঃ ৩১ মার্চ্চ)। মে মাস হইতে আসামের ভীষণ বর্ষায় চারিদিক প্লাবিত হইতে লাগিল। চারিদিকে জল জমিয়া মোগল ছাউনিগুলি দ্বীপাকার ধারণ করিল। এই সময় কামরূপের পাহাড় শ্রেণী হইতে নামিয়া আসিয়া আহমগণ মোগলগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ৮ই জুলাই ও ১২ই জুলাই তাহারা উপর্য্যুপরি গড গাঁও আক্রমণ করিল কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। মথুরাপুর আক্রমণ করিয়াও আহমেরা কৃতকার্য্য হইল না।

আগষ্ট মাসে মথুরাপুরে মোগল সেনাদের মধ্যে খাদ্যাভাব ও মহামারী দেখা দেওয়ায় জীবিত মোগলগণ গড় গাঁয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু গড় গাঁয়েও খাদ্যাভাব ও মহামারী দেখা দিল। মোটা চাউল ছাড়া আর কোন খাদ্য রহিল না। সেপ্টেম্বরের শেষে বর্ষা থামিয়া যাওয়ায় আবার পথ ঘাট দেখা দিল ও খাদ্যাভাব দূর হইল। মীরবহর ইবন হোসেন গড় গাঁয়ের নিকটে দেবল গাঁয়ে আসিয়া নঙ্গর করিল। মোগল সৈন্যমধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ হইল।

১৬৬২ খৃঃ ১৬ই নবেম্বর কামরূপ পাহাড়ে আহমরাজকে খুঁজিয়া বাহির করিতে মীর জুম্‌লা যাত্রা করিলেন। আহম সেনাপতি বাদুলী ফুকন মোগলের শরণাপন্ন হইল। মীরজুম্‌লা তাহাকে আসামের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। বাদুলী ফুকনের দৃষ্টান্তে আসামের অনেক ভুঁইয়া মোগল পক্ষে চলিয়া আসিল। ১০ই ডিসেম্বর মীর জুম্‌লা জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। এই সময় আহমরাজ সন্ধির প্রার্থনা করায় উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ আহমরাজ ২০০০০ তোলা স্বর্ণ, ১২০,০০০ তোলা রূপা, ও ৯০টি হস্তী তিনটি মাসিক কিস্তিতে দিতে স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে ভারলী নদীর পশ্চিম ও দক্ষিণে কালাও নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী সমস্ত আহমরাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। আরও চুক্তি হইল আহমরাজ জয়ধ্বজের একটি কন্যাকে পাতসাহের হারেমে (অন্তঃপুর) পাঠাইতে হইবে; এই সন্ধির দ্বিতীয় বর্ষ হইতে প্রতিবৎসর করস্বরূপ ২০টি হস্তী সম্রাটকে দিতে হইবে, চারিজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির পুত্রগণকে প্রতিভূ স্বরূপ ঢাকায় বাস করিতে হইবে, আহমগণ কর্ত্তৃক ধৃত যাবতীয় মোগল প্রজাগণকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইরূপে বন্য হস্তীপূর্ণ দরং অঞ্চলের

অধিকাংশ ও দিমারুয়া, বেলতলা ও গারোপাহাড়ের সন্নিহিত নাককাটি রাণীর রাজ্য পর্য্যন্ত মোগলেরা লাভ করিল।

সন্ধির পর মীর জুম্‌লা পীড়িত অবস্থায় পাল্কীতে চড়িয়া ঢাকা রওনা হইলেন (১৬৬৩ খৃঃ ১০ই জানুয়ারী)। কিন্তু ৩১শে মার্চ্চ খিজিরপুরে পৌছিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। ইহার আটমাস পরে আহমরাজ জয়ধ্বজেরও মৃত্যু হইল।

ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলনে ষোড়শ ও সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের বাঙলাদেশ যেমন গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তেমনি স্বাস্থ্যে ও কৃষিবাণিজ্যেও উহা প্রকৃত "সোনার বাঙলা" ছিল। তখনকার বংশকুঞ্জ ও আম-কাঁঠালের ঘনচ্ছায়ায় ঢাকা বাঙলার পল্লীগ্রামসমূহ স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। তাহার বিশাল প্রান্তরগুলি ধান্য, গম, ইক্ষু, আদা, লঙ্কা, কার্পাস ও তুঁত গাছের চাষে প্রতিনিয়ত শ্যামায়মান থাকিত। ইউরোপীয় পর্য্যটকগণের বিবরণীতে বাঙলার এই স্বাস্থ্য ও সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়[১]। তখন পল্লীবাসীগণ স্ব স্ব পল্লীতে আখড়ায় আখড়ায় সমবেত হইয়া লাঠি, তরবারি চালনা, কুস্তি ও অন্যান্য ক্রীড়া ইত্যাদিতে যোগ দিয়া আমোদ ও স্বাস্থ্যলাভ করিতেন এবং বাহুবল ও অস্ত্র চর্চ্চা করিয়া নির্ভীক হইয়া উঠিতে এবং অকুতোভয়ে মগ, ফিরিঙ্গী, আহম, পাঠান ও মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই সময় ইউরোপীয় বণিকদল বাঙলায় আসিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হন। চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে পর্ত্তুগীজ বণিকদের দুইটি বন্দর ছিল। পরে হুগলীতেও ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজদের এবং চন্দননগরে ফরাসীদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে লুডি-ভিকো ডি ভারথেমা নামক একজন ইটালীয় পর্য্যটক বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, বাঙলায় এত অধিক পরিমাণে শস্য, মাংস, চিনি, আদা ও তুলা জন্মিত যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ সেরূপ উৎপাদন করিতে পারিত না। এখানে অনেক ধনশালী বণিকের সমাগম হইত। এখান হইতে প্রতি বৎসর পঞ্চাশখানি জাহাজ কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রে বোঝাই হইয়া তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, পারস্য, ইথিওপিয়া ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে গমন করিত। এইখানে বিভিন্ন দেশ হইতে অনেক জহরৎ

১। It is plentiful in rice, wheat, sugar, ginger, long pepper, cotton aud silk and enjoyeth a very wholesome ayre (Purchas His Pilgrims, the 4th Part, 5th Book p. 308).

ব্যবসায়ী আগমন করিত ১।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ্ বঙ্গদেশ আগমন করেন (১৫৮৬ খৃঃ)। টাঁড়া, হিজলী, বাকলা, শ্রীপুর, সোনারগাঁ, কোচবিহার, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানের কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের প্রাচুর্য্যের বিষয় তাঁহার বিবরণে দৃষ্ট হয়। সোনার গাঁয়ের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের (ঢাকাই মসলিন) কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অপর্য্যাপ্ত ধান্য ও চাউলের উৎপত্তির কথা ও বড় বড় বাণিজ্য নৌকার উল্লেখও তিনি করিয়াছেন। সপ্তগ্রাম বন্দরের প্রচুর আমদানী ও রপ্তানীর কথা ও ধান্য, চাউল, গম, ইক্ষু, আদা, লঙ্কার চাষের কথাও তিনি বলিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, কোচবিহারে মৃগনাভি পাওয়া যাইত। পুরচা (Purcha) লিখিয়াছেন, প্রধানতঃ সন্দ্বীপ হইতে প্রতিবৎসর তিনশত জাহাজ লবণ বিদেশে রপ্তানী হইত।

এইরূপে কৃষি ও বাণিজ্যলব্ধ প্রচুর অর্থাগমে সেকালে বঙ্গবাসীগণ সুস্থ শরীরে ও সানন্দ চিত্তে সময় অতিবাহিত করিত। একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালার শিক্ষা চলিত, অন্যদিকে তেমনি প্রতিমাসে কীর্ত্তন, মঙ্গলচণ্ডী, রামায়ণ ও নানা প্রকার পল্লীগীতির মধুর নিক্কণে নীরব রজনীর নিস্তব্ধ আকাশ ধ্বনিত হইত। একালের ন্যায় সেকালেও দুর্গা পূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, দোল, রাস, ঝুলন প্রভৃতি উৎসবে গ্রাম ও নগরগুলি আনন্দকোলাহলে মুখরিত হইত।

১২। শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৪-৮৮ খৃঃ)।

মীর জুম্‌লার মৃত্যুর পর ইতিসাম খাঁ শাসনকার্য্য ও রায় ভগবতী দাস রাজস্ব বিভাগের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ইতিসাম খাঁর পর দিলীর খাঁ, তৎপর দাযুদ খাঁ অস্থায়ীভাবে শাসনকার্য্য চালাইলেন। অবশেষে ১৬৬৩ খৃঃ মে মাসে ঔরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ সুবেবাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া ১৬৬৪ খৃঃ ৮ই মার্চ্চ রাজমহলে উপস্থিত হইলেন এবং ১৬৬৪ খৃঃ ডিসেম্বরে ঢাকায় পৌঁছিয়া শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

শায়েস্তা খাঁ দাক্ষিণাত্যের সুবাদাররূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে নববিজিত পুণা দুর্গে অবস্থানকালে শিবাজী ও তাঁহার কতিপয় অনুচর কর্ত্তৃক রাত্রিকালে আক্রান্ত হইয়া পলায়নকালে তাঁহার একটি অঙ্গুলী কর্ত্তিত

১। The Travels of Ludivico di Varthema.

হয় ও তাঁহার এক পুত্র এবং কয়েকজন দেহরক্ষী নিহত হয়। যখন তিনি ১৬৬৪ খৃঃ সুবে বাঙলার সুবাদার হন তখন তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর। তখন তিনি কর্ম্মোদ্যমহীন ও আরামপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার চারিজন উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান পুত্র ছিল। প্রথম পুত্র বুজুর্গ উম্মেদ খাঁন ১৬৬৬ খৃঃ চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং ১৬৮২ খৃঃ বিহারের সুবাদার হন। দ্বিতীয় পুত্র জাফর খাঁ চট্টগ্রামের থানাদার নিযুক্ত হন। তৃতীয় পুত্র আবু নজর উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার হন এবং চতুর্থ পুত্র ইরাদত খাঁ কুচবিহার জয় করিয়া (১৬৮৫ খৃঃ) কুচবিহার ও রাঙ্গামাটির ফৌজদারের পদ লাভ করেন।

১৬৬২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী পূর্ব্ববর্ত্তী সুবাদার মীর জুম্‌লা কুচবিহার অধিকার করিয়া তথায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া আসাম আক্রমণে গমন করিয়াছিলেন। এই সুযোগে রাজা প্রাণনারায়ণ কুচবিহার পুনরধিকার করেন। কিন্তু শায়েস্তা খাঁর আগমনের সংবাদে বার্ষিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা কর দেওয়ার অঙ্গীকারে সন্ধি করেন। ১৬৬৬ খৃঃ রাজা প্রাণনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী মধু নারায়ণ বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করেন, কিন্তু কর না দেওয়ায় রাঙ্গামাটির ফৌজদার (শায়েস্তা খাঁর পুত্র) ইরাদত খাঁ ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া কুচবিহার দুর্গ অধিকার করিলে রাজা পার্ব্বত্য দুর্গ আহসামে পলায়ন করেন (১৬৮৫ খৃঃ শায়েস্তা খাঁর রিপোর্ট)। অতঃপর ইরাদত খাঁ রাঙ্গামাটি ও কুচবিহারের ফৌজদার হইলে কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত চাকলা ফতেপুর, কাজির হাট ও কাকিনা ও পরগণা টেপা, ও মন্থোনা প্রভৃতির ভারপ্রাপ্ত রাজ কর্ম্মচারীরা বাঙলার সুবাদারকে কর দিতে স্বীকার করিয়া ঐ সকল চাকলা ও পরগণার জমিদার হন। ১৭১১ খৃঃ কুচবিহার রাজের সহিত সুবাদারের যে সন্ধি হয় তাহাতে ঐ জমিদারগুলি স্বীকৃত হয়।

হিজলির জমিদার বাহাদুর মসনদ-ই-আলা বিদ্রোহী হওয়ায় রথম্ভর দুর্গে আটক ছিলেন। শায়েস্তা খাঁকে একলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ায় তিনি মুক্তিলাভ করেন ও সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন (১৬৬৭ খৃঃ সেপ্টেম্বর)। জয়ন্তিয়ার রাজা শ্রীহট্টের সীমান্ত আক্রমণ করিলে শায়েস্তা খাঁ তাঁহার পুত্র ইরাদত খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (১৬৮২ খৃঃ নবেম্বরে)। ত্রিপুরার রাজা শ্রীহট্ট সহর আক্রমণ করায় শায়েস্তা খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে, রাজা সম্রাটকে তিনটি হস্তী দিয়া আপোষ করেন (১৬৮২ খৃঃ অকটোবর)।

বহু দিন যাবৎ চট্টগ্রামের আরাকানী মগেরা ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা যশোর, হুগলী, ভূষণা, বিক্রমপুর, সোনার গাঁ এমনকি ঢাকা পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিত এবং

বহু নরনারীকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত ও তাহাদিগকে দাসদাসীরূপে বিক্রয় করিত অথবা নিজেদের ব্যবহারে লাগাইত। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য শায়েস্তা খাঁ ৩৩০ খানি রণতরী প্রস্তুত করাইলেন। দিলাওয়ার নামক একজন বিদ্রোহী মোগল নৌসেনাপতি চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী সন্দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। মীরবহর ইবন হোসেনকে নৌবহরসহ পাঠাইয়া শায়েস্তা খাঁ এই সন্দ্বীপ অধিকার করেন (১৬৬৫ খৃঃ নবেম্বর)। এই সময় চট্টগ্রামের মগ শাসনকর্ত্তার সহিত তথাকার পর্ত্তুগীজ অধিবাসীদের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় পর্ত্তুগীজেরা সপরিবারে চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়া নোয়াখালির মোগল সেনাপতির আশ্রয়ে চলিয়া আইসে (১৬৬৫ খৃঃ ডিসেম্বর)। শায়েস্তা খাঁ তাহাদিগকে নিজ নৌবাহিনীতে উপযুক্ত বেতনে ভর্ত্তি করিয়া লওয়ায় তাঁহার নৌশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

১৬৬৫ খৃঃ ২৪ ডিসেম্বর সুবাদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বুজুর্গউম্মেদ খাঁ ২৮৮ খানি রণতরী ও ৬৫০০ নৌযোদ্ধা লইয়া ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হন। তৎসহ ফিরিঙ্গীদের ৪০ খানি রণতরী যোগ দেয়। নওয়াখালিতে আসিয়া তাহারা জগদিয়াতে ফেণীনদী পার হইয়া আরাকানীদের অধিকারে প্রবেশ করে (১৬৬৬ খৃঃ ১৪ই জানুয়ারী)। এখান হইতে ফরহিদ খাঁর নেতৃত্বে স্থল-বাহিনী তীর দিয়া জঙ্গল কাটিয়া অগ্রসর হইতে থাকে ও নৌবাহিনী ইবন হোসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম হইতে দুইদিনের পথ দূরে কুমিরা খালে, আসিয়া উপস্থিত হয়। ২১ জানুয়ারী স্থল ও নৌবাহিনী একত্রিত হয়। ২৩ জানুয়ারী কুমিরা খাল হইতে বাহির হইয়া ইবন হোসেন তাহার নৌবাহিনী লইয়া কাঁঠালিয়া খালের মুখে সমুদ্রবক্ষে মগদের নৌবাহিনীকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে। অগ্রবর্ত্তী ফিরিঙ্গী রণতরীর কামানের ঘায়ের মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া মগেরা তাহাদের বড় বড় রণতরীগুলি (ঘুরাব) হইতে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িল ও ছোট নৌকাগুলি লইয়া পলায়ন করিল। বড় রণতরীগুলি মোগলেরা দখল করিয়া লইল। মোগল নৌবাহিনী আরও অগ্রসর হইলে তাদের প্রধান নৌবাহিনী হুরলা প্রণালী হইতে বাহির হইয়া পুনরায় মোগল নৌবাহিনীর সম্মুখীন হইল। কিন্তু এবারেও পরাজিত হইয়া কর্ণফুলী নদীতে পলাইয়া গেল (অপরাহ্ণ ৩টা)। মোগল নৌবাহিনী নদীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় মগদিগকে আক্রমণ করিল। ফিরিঙ্গীরা ও বাঙলার জমিদার মনতয়ার খাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে ও কামান সমূহের গোলাবর্ষণে মগ নৌবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইল এবং ধ্বংসাবশিষ্ট ১৩৫ খানি যুদ্ধজাহাজ মোগলদের হস্তগত হইল। মোগল নৌসেনাগণ তাহাদের যুদ্ধজাহাজে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন (২৫শে জানুয়ারী) চট্টগ্রাম দুর্গ অবরোধ

করিয়া গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। দুর্গের সৈন্যেরা একদিন যুদ্ধ করিয়া পরদিন (২৫শে জানুয়ারী) ইবন হোসেনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। পরদিন প্রভাতে সেনাপতি বুজুর্গউম্মেদ খাঁ স্থলবাহিনী লইয়া আসিয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। প্রায় ২০০০ বন্দী ক্রীতদাসরূপে বিক্রিত হইল। যে সকল বঙ্গবাসীকে মগেরা ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছিল তাহারা মুক্তিলাভ করিল।

সম্রাটের আদেশে চট্টগ্রামের নাম ইছলামাবাদ রাখা হইল ও তথায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইল।

বাদসাহজাদা মহম্মদ আজম অতঃপর ১৬৭৮ খৃঃ ২৯শে জুলাই হইতে ১৬৭৯ খৃঃ ১২ অকটোবর পর্য্যন্ত অস্থায়ী ভাবে সুবে বাঙলার সুবেদারী করেন। তৎপর পুনরায় শায়েস্তা খাঁ (১৬৭৯ অকটোবর হইতে ১৬৮৮ খৃঃ জুন পর্য্যন্ত) বাঙলার সুবাদার হন। কিন্তু তাঁহার এই সময়ের ইতিহাস ইংরেজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বিরোধের ইতিহাস।

১৪৫৩ খৃঃ সাম্রাজ্যবাদী তুর্কিরা কন্‌ষ্টান্টিনোপল অধিকার করার ফলে ভূমধ্য সাগরে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইউরোপীয় বণিকদিগকে আরব বণিকদের মারফতে ভারত প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের সহিত বাণিজ্য চালাইতে হইত। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইউরোপীয় নাবিকদের দুঃসাহসী অভিযান আরম্ভ হয়। পর্ত্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নাবিকগণ এই অভিযানে নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হয়। ১৪৮৮ খৃঃ বার্থোলোমিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপে ও ১৪৯৮ খৃঃ ভাস্কোডাগামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকটে উপস্থিত হন। ১৪৯২ খৃঃ কলম্বাস আটলান্টিক পার হইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

এই সকল জলপথ আবিষ্কারের ফলে পর্ত্তুগীজ ও ওলান্দাজ বণিকগণ ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশ হইতে অল্পমূল্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া বিলাতে বহু অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিত। ইহাতে প্রলুব্ধ হইয়া ১৫৯৯ খৃঃ ২২শে সেপ্টেম্বর ২১৮ জন ইংলণ্ডবাসী বণিক মিলিয়া "ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী" গঠিত করে। উক্ত কোম্পানীর মূলধন ছিল ৭০ হাজার পাউণ্ড। ১৬০০ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর ঐ কোম্পানী রাণী এলিজাবেথের নিকট সনদ (charter) প্রাপ্ত হয়। মাত্র ১৫ বৎসরের জন্য ঐ কোম্পানীকে পূর্ব্বদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। একজন গভর্ণর ও ২৪ জন সদস্যের উপর কোম্পানীর পরিচালনার ও তজ্জন্য আবশ্যকীয় বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার অর্পিত হয়। ১৬৬১ ও ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ বলে এই কোম্পানী ভারতে রাজ্য বিস্তার,

দুর্গ নির্ম্মাণ, মুদ্রা প্রচার, সৈন্য রক্ষা ও নিজ এলাকার জনগণের শাসন ও বিচারের ক্ষমতা লাভ করে।

১৬৯৮ খৃঃ ইংলিস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী গঠিত হয়। পরে রাণী এ্যানের প্রধান মন্ত্রী লর্ড গডলফিমের মধ্যস্থতায় উভয় কোম্পানী ১৭০৮ খৃঃ একত্রিত হইয়া যায়। তদবধি এই সম্মিলিত কোম্পানী ২৭ জন ডিরেক্টর দ্বারা গঠিত একটি কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর পরিচালনাধীন হয়। ইতিমধ্যে মূল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬১২ খৃঃ সুরাটে, ১৬৩৯ খৃঃ মাদ্রাজে ও ১৬৬৮ খৃঃ বোম্বাইতে কুঠী স্থাপন করিয়াছিল। সুবে বাঙলায় সর্ব্ব প্রথম হুগলীতে ১৬৫২ খৃঃ ইহাদের কুঠী স্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্বে ১৬৪২ খৃঃ বালেশ্বরে তাহাদের প্রধান কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ১৬৫২ হইতে ১৬৫৩ খৃঃ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকায় কোম্পানীর বাঙলাদেশের বাণিজ্য অচল হইবার উপক্রম হয়। এমনকি কোম্পানীর লণ্ডনের পরিচালকবর্গ বাঙলার কারবার বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দেন। কিন্তু ১৬৬০ খৃঃ যখন ঔরঙ্গজেব বিজয়ী হইয়া সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন এবং ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাঙলায় ইংরেজ কোম্পানীর কার্য্য দ্রুত উন্নতিলাভ করে।

১৬৮২ খৃঃ আগষ্ট মাসে কোম্পানীর হুগলীর কুঠী স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং উইলিয়ম হেজেস হুগলী, কাশিমবাজার, ঢাকা, বালেশ্বর, পাটনা ও মালদহের কুঠীগুলির প্রথম শাসনকর্ত্তা (Governor) নিযুক্ত হন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে অর্থলোলুপ মোগল রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারে কোম্পানীর কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। নবাব শায়েস্তা খাঁর প্রিয়তম কর্ম্মচারী বালচাঁদ তখন শুল্ক সংগ্রাহক ছিল। তাহার নির্ম্মম অত্যাচারে ইংরেজগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। হেজেস সাহেব ঢাকায় নবাব দরবারে তাঁহাদের অভিযোগ পেশ করিয়াও যখন কোন ফল পাইলেন না, তখন তিনি লণ্ডনের ডিরেক্টর সভায় বলপ্রয়োগ দ্বারা এই সমস্ত অত্যাচার নিরসনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে রাজা দ্বিতীয় জেমসের আদেশে বল প্রয়োগের পথ অবলম্বন করাই স্থির হইল। ১৬৮৬ খৃঃ ইংলণ্ড হইতে সৈন্যসহ ভারতে কয়েকখানি জাহাজ প্রেরিত হইল। তন্মধ্যে তিনখানি জাহাজ বাঙলায় উপস্থিত হইল (১৬৮৬ খৃঃ শেষভাগ)। হুগলীতে ইংরেজ সৈন্যদলসহ জাহাজ তিনখানি পৌছিবার খবর পাইয়া শায়েস্তা খাঁ হুগলীর পাহারার জন্য ৩০০ অশ্বারোহী ও ৩০০০ পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময় একদিন ৩ জন ইংরেজ সৈন্য

হুগলীর বাজারে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিতে যাইয়া আক্রান্ত ও আহত হয় (১৬৮৬ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর)। তাহাদের সাহায্যের জন্য নূতন ইংরেজ সৈন্য উপস্থিত হইলে, মোগল ফৌজদার আব্দুল গণি ইংরেজ জাহাজের উপর কামানের গোলা বর্ষণ করে এবং কোম্পানীর অনেকগুলি গৃহ পোড়াইয়া দেয়। ইংরেজরাও কামান দাগিয়া মোগলদের কামানসমূহ অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয় এবং সহরের অনেক অংশ পোড়াইয়া দেয়। পরদিন প্রভাতে ফৌজদার ছদ্মবেশে পলায়ন করে।

শায়েস্তা খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরেজদিগকে দমন করিবার জন্য বহু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ইংরেজরা তাহাদের লোকজন ও ধনসম্পত্তিসহ জাহাজে উঠিয়া হুগলী নদী দিয়া ২৪ মাইল ভাটিতে সুতানুটিতে গিয়া নঙ্গর করে (২৬শে ডিসেম্বর)। ১৬৮৭ খৃঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর প্রতিনিধি জব চার্ণক মোগলদের থানা দুর্গ (বর্ত্তমান গার্ডেনরিচ) অধিকার করেন এবং তথা হইতে যাইয়া হিজলী দ্বীপে (মেদিনীপুর জেলা) অবতরণ করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। মার্চ্চ মাসে ১৭০ জন ইংরেজ সৈন্য ও নাবিক বালেশ্বরে উপস্থিত হয় এবং তথাকার মোগল দুর্গ অধিকার করিয়া সমগ্র সহর ভস্মীভূত করে। ২৮শে মে শায়েস্তা খাঁর সেনানী আব্বাস সামাদ ৭০০ অশ্বারোহী ও ২০০ কামান লইয়া রছুলপুর নদী পার হইয়া হিজলী সহর অধিকার ও ইংরেজদের সুরক্ষিত স্থান অবরোধ করে। এখানকার অল্প সংখ্যক ইংরেজ এরূপভাবে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল যে আব্বাস সামাদ অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ১১ই জুন ইংরেজরা তাহাদের সমস্ত লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র, ধনসম্পত্তিসহ হিজলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অবশেষে ১৬৮৭ খৃঃ ১৬ আগষ্ট শায়েস্তা খাঁ ইংরেজদিগকে লিখিত অনুমতি দিলেন যে তাহারা উলুবেড়িয়ায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া হুগলীতে বাণিজ্য চালাইতে পারিবে। তদনুসারে জব চার্ণক সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় সুতানুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বোম্বাই উপকূলে ইংরেজদের সহিত মোগল রণতরীর সংঘর্ষ হওয়ায় শায়েস্তা খাঁ পূর্ব্বোক্ত অনুমতি বাতিল করিয়া দিলেন। ইংরেজদের নূতন কাপ্তান হিথ ইংরেজ দলকে লইয়া মাদ্রাজের পথে বালেশ্বরে পৌঁছিয়া বালেশ্বরের মোগল দুর্গ ধ্বংস করিয়া চট্টগ্রামে পৌঁছিলেন (২৩শে ডিসেম্বর)। অবশেষে তাঁহারা মাদ্রাজে পৌঁছিলেন (১৬৮৯ খৃঃ ১৭ ফেব্রুয়ারী)।

১৩। খান-ই-জহান কোকা।

১৪। ইব্রাহিম খাঁ (১৬৮৯-৯৭ খৃঃ)।

ইতিমধ্যে ১৬৮৮ খৃঃ জুন মাসে শায়েস্তা খাঁর সুবাদারী শেষ হওয়ায় তিনি বাঙলা ত্যাগ করিলেন। তৎপর খান্-ই-জহান কোকা এগার মাস সুবাদারী করিয়া পদচ্যুত হন (১৬৮৮ খৃঃ জুলাই—১৬৮৯ খৃঃ জুন)। তৎপর ১৬৮৯ খৃঃ ২রা জুলাই ইব্রাহিম খাঁ সুবাদারী পদে যোগ দিলেন এবং বাদসাহ আওরঙ্গজেবের হুকুমে ইংরেজ কোম্পানীর মাদ্রাজ অফিসে পত্র দিয়া বার্ষিক ৩০০০ টাকা করে বাঙলায় বাণিজ্য করিতে আহ্বান করিলেন। ৭ই অক্টোবরের এই পত্র মাদ্রাজে পৌছিল। তদনুসারে জব চার্ণক কোম্পানীর প্রতিনিধি স্বরূপ ১৬৯০ খৃঃ ২৪শে আগষ্ট সুতানুটিতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে ফরাসী কোম্পানীর প্রতিনিধি ডেস ল্যাণ্ডও চন্দননগরে কুঠী স্থাপন করিলেন (১৬৯২ খৃঃ জুলাই) এবং সম্রাটকে ৪০০০০ টাকা নজর দিয়া বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইলেন।

১৬৯৫ খৃঃ মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল-চন্দ্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত চেতো-বর্দার জমিদার শোভাসিং বিদ্রোহী হইয়া চারিদিকে লুণ্ঠন চালাইতে থাকে। বর্দ্ধমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম তাহাকে বাধা দিতে যাইয়া যুদ্ধে নিহত হন (১৬৯৬ খৃঃ জানুয়ারী)। তাঁহার স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ ও প্রচুর ধন সম্পত্তিসহ বর্দ্ধমান শোভাসিংএর হস্তগত হয়। উড়িষ্যার আফগানদের নেতা রহিম খাঁ তাহার দলবল লইয়া শোভাসিংএর সহিত যোগ দেওয়ায় শোভাসিং-এর শক্তি বৃদ্ধি পায়। রাজা কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জগৎরায় ঢাকায় যাইয়া নবাব ইব্রাহিম খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুগলীর পশ্চিম বঙ্গের ফৌজদার নুরুল্লা খাঁকে নবাব শোভাসিংএর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন কিন্তু ১৬৯৬ খৃঃ ২২ শে জুলাই শোভাসিং হুগলী লুণ্ঠন করিলে নুরুল্লা পলায়ন করে। অতঃপর চুঁচড়ার ডাচগণ শোভাসিংকে বিতাড়িত করিলে বিদ্রোহীরা গঙ্গার পশ্চিম তীরে চন্দননগরের সীমা পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে, হুগলী হইতে বিতাড়িত হইয়া শোভাসিং রহিম খাঁর উপর দলের নেতৃত্ব দিয়া বর্দ্ধমানে গমন করে। তথায় রাজা কৃষ্ণরায়ের দুহিতার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করিলে তেজস্বিনী রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে শোভাসিংকে বধ করিয়া স্বয়ং আত্মঘাতিনী হন। শোভাসিংএর পুত্র হিম্মৎসিং অকর্ম্মণ্য বিধায় রহিমকে বিদ্রোহীরা নেতা নির্ব্বাচিত করিয়া লুণ্ঠন করিতে করিতে নদীয়ার পথে মুর্শিদাবাদে পৌছিল।

মোগল জায়গীরদার নিয়ামত খাঁ বিদ্রোহীদিগকে বাধা দিতে গিয়া সে ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র নিহত হইল। মুর্শিদাবাদ (মুকস্থদাবাদ) লুণ্ঠন করিয়া বিদ্রোহীরা গ্রামাঞ্চলসমূহ লুণ্ঠন করিতে করিতে ক্রমে রাজমহল ও ১৬৯৭ খৃঃ মার্চ্চ মাসে মালদহ অধিকার করিল।

সম্রাট ওরঙ্গজেব সংবাদ পাইয়া ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করিলেন এবং পৌত্র আজিমউদ্দিনকে (১৬৯৭ খৃঃ মধ্যভাগে) বাঙলার স্থবাদার নিযুক্ত করিলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁর উপর কার্য্য চালাইবার ভার দেওয়া হইল। জবরদস্ত খাঁ বাদসাহী ফৌজ লইয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করিল। তখন রহিম খাঁ ও হিম্মৎসিং গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভগবানগোলায় শিবির স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিল। জবরদস্ত খাঁ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দুই দিন ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিল (১৬৯৭ খৃঃ মে)। অতঃপর বাদসাহী ফৌজ রাজমহল ও মালদহ এবং মুকস্থবাদ ও বর্দ্ধমান অধিকার করিয়া হিম্মৎসিং ও রহিমকে চন্দ্রকোনার জঙ্গলে তাড়াইয়া দিল। তৎপর জবরদস্ত খাঁ বর্দ্ধমানে ও স্থবাদার আজিম মুঙ্গেরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নবেম্বরে স্থবাদার বর্দ্ধমানে আসিলেন, কিন্তু জবরদস্ত খাঁর সহিত আশানুরূপ ব্যবহার না করায় জবরদস্ত খাঁ পদত্যাগ করিয়া পিতার নিকট দাক্ষিণাত্যে বাদসাহী শিবিরে প্রস্থান করিলেন (১৬৯৮ খৃঃ জানুয়ারী)।

জবরদস্ত খাঁ চলিয়া গেলে বিদ্রোহীরা পুনরায় নদীয়া হুগলী অঞ্চল লুণ্ঠন করিতে করিতে বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী হইল এবং প্রধানমন্ত্রী খাজা আনোয়ারকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিল। তখন হামিদ খাঁ কোরেসীর বাদসাহি সেনা চন্দ্রকোনার নিকটে বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করে ও রহিম খাঁর শিরশ্ছেদ করে। অতঃপর নেতার অভাবে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

এই গোলযোগের সময় ইব্রাহিম খাঁ যখন স্থবাদার তখন ইংরেজ ফরাসী ও ওলন্দাজদের প্রার্থনাক্রমে স্থবাদার তাঁহাদিগকে নিজ নিজ কুঠী স্থরক্ষিত করিতে আদেশ দেন (১৬৯৭ খৃঃ)। ইহাই কলিকাতায় ইংরেজদের ফোর্টউইলিয়ম, চন্দননগরে ফরাসীদের ফোর্ট আলিয়ান্স ও চুঁচড়ায় ওলন্দাজদের স্থরক্ষিত ঘাঁটি নির্ম্মাণের মূল দলিল।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে একদিন ইংরেজ কুঠীসমূহের অধ্যক্ষ জব চার্ণকের পাল্কীবাহকেরা শিয়ালদহের ঘন অরণ্যে (মতান্তরে নিমতলার নিমবনে) বিশ্রামার্থ পাল্কী রাখিয়া

বিশ্রাম সুরু করিল। সেই অবসরে জব চার্ণক সেই বনের সবুজ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। পূর্ব্বে উলুবেড়িয়ায় কুঠী নির্ম্মাণের পরিকল্পনা ছিল কিন্তু তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি এই স্থানেই কুঠী নির্ম্মাণ করা স্থির করিয়া ইংল্যাণ্ডে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। অনুমতি আসিবামাত্র ১৬৯০ খৃঃ ২৪শে আগষ্ট জব চার্ণক গোবিন্দপুর মৌজায় বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্টাফিসের নিকট কোম্পানীর কুঠী ও বর্ত্তমান হাইকোর্টের নিকট নিজ বাসাবাটী নির্ম্মাণ করাইলেন। এই সময়ে একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন নিকটবর্ত্তী শ্মশানঘাটে একটি সুন্দরী যুবতী হিন্দু নারীকে তাহার মৃত স্বামীর সহিত সহমরণের জন্য তাহার আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গ লইয়া আসিয়াছে। শুনিবামাত্র চার্ণক লোকজন পাঠাইয়া বিধবাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন এবং তাহার সম্মতিক্রমে কিছুদিন নিজ আশ্রয়ে রাখিয়া তাহাকে বিবাহ করেন [১]। ১৬৯৮ খৃঃ জুলাই মাসে নূতন সুবাদার আজিম-উস-সানকে ১৬০০০ টাকা নজর দিয়া সুতানুটি (বাগবাজার খাল হইতে নিমতলা), কলিকাতা (নিমতলা হইতে চাঁদপালঘাট) ও গোবিন্দপুর (চাঁদপাল ঘাট হইতে আদিগঙ্গা) এই তিনটি মৌজা মালিক জমিদারদের নিকট ক্রয় করিয়া লইবার অনুমতি লাভ করেন। অতঃপর ১৬৯৮ খৃঃ ১০ই নভেম্বর জমিদার মনোহর দত্ত, রামচাঁদ রায় বাহাদুর ও প্রাণমোহন সিং-এর নিকট তিনি মাত্র একহাজার তিনশত টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া লইয়া গোবিন্দপুরে ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৭৪২, ১৭৫৭, ১৮৩৭, ১৮৯৩ খৃঃ কলিকাতার জরীপ হয়।

১৫। আজিম উসান (১৬৯৭-১৭১২ খৃঃ)।

আজিম-উস-সানের প্রকৃত নাম মহম্মদ আজিমউদ্দিন। তিনি বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের পুত্র প্রথম বাহাদুর সাহের পুত্র ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মামুদ তাঁহার জীবিত কালেই মৃত হন (১৬৭৬ খৃঃ)। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র আকবর বিদ্রোহী হওয়ায় পারস্যে নির্ব্বাসিত হইয়া ১৭০৭ খৃঃ তথায় পরলোক

১। বিবাহের ৩৬ বৎসর পব চার্ণকের এই স্ত্রী সন্তানাদি রাখিয়া পরলোক গমন করিলে সেণ্টপল গির্জ্জায় তাহাকে সমাহিতা করা হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর চার্ণক ৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। কথিত আছে প্রতিবৎসর তিনি স্ত্রীর মৃত্যু-দিবস পালন করিতেন।

গত হন। ১৭০৭ খৃঃ ৮ই জুন ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুয়াজ্জম কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজম ও কামবক্সকে হত্যা করিয়া সাহ আলম বাহাদুর সাহ (১ম) নামে সম্রাট হন (১৭০৭-১২ খৃঃ)। তৎপর বাহাদুর সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র জান্দাহার সাহ (১৭১২-১৩ খৃঃ), তৎপর আজিম উসানের পুত্র .ফারুক সিয়র (১৭১৩-১৯ খৃঃ), তৎপর আজিম-উসানের ভ্রাতা জাহির সাহের পুত্র মহম্মদ সাহ (১৭১৯-৪৮ খৃঃ) বাদসাহ হইয়াছিলেন।

১৬৯৭ খৃঃ হইতে ১৭১২ খৃঃ পর্য্যন্ত আজিমউদ্দিন সুবে বাঙলার সুবাদার ছিলেন।

১৭০৭ খৃঃ তিনি আজিম-উসান উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সুবাদারী আমলের শেষ নয় বৎসর তিনি নায়েব সুবাদার দ্বারা কার্য্য চালাইতেন ও স্বয়ং রাজধানী আগ্রায় থাকিতেন।

ইতিমধ্যে কারতলব খাঁ নামে একজন রাজপুরুষ বাঙলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ইনি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শৈশবে হাজি সফী ইস্পাহানী তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মহম্মদ হাদি নাম দেন এবং পারস্যে লইয়া যান। তথায় তিনি পারস্য ভাষা ও পারস্য কৃষ্টিতে পারদর্শী হন। সফী ইস্পাহানী ১৬৬৮ খৃঃ হইতে ১৬৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত দিল্লী সাম্রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন ও ১৬৯০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে ১৬৭৮ ও ১৬৮০ খৃঃ তিনি বাঙলার ও ১৬৮৩-৮৯ খঃ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান ছিলেন। মহম্মদ হাদি তাঁহার পালক পিতার অধীনে থাকিয়া দেওয়ানী বিভাগের কার্য্যে সুদক্ষ হন। ১৬৯০ খৃঃ সফী ইস্পাহানী মহম্মদ হাদিকে লইয়া পারস্যে যান। সফীর মৃত্যুর পর (১৬৯৬ খৃঃ) মহম্মদ হাদী ভারতে ফিরিয়া আসেন। ঔরঙ্গজেব ইহার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া নিজের অধীনে হায়দরাবাদের দেওয়ান ও ইয়েল কোস্তলের ফৌজদার নিযুক্ত করেন (১৬৯৮ খৃঃ)। ১৭০০ খৃঃ ১৭ই নবেম্বর বাদসাহ মহম্মদ হাদিকে (কার তলব খাঁ) বাঙলার দেওয়ান ও মুকসুদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত করেন।

তিনি এতদ্ব্যতীত মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের ও ফৌজদার নিযুক্ত হন (১৭০১ খৃঃ ২৩শে জুলাই) এবং উড়িষ্যার দেওয়ান (৪ঠা আগষ্ট) নিযুক্ত হন। ১৭০২ খৃঃ ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুর্শিদকুলী খাঁ উপাধি লাভ করেন। ১৭০৩ খৃঃ ২১ জানুয়ারী তিনি উড়িষ্যার নায়েব সুবাদারী ও পরে সুবাদারী এবং ১৭০৪ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারী বিহারের দেওয়ানী লাভ করেন। যতদিন ঔরঙ্গজেব জীবিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত তিনি উপরোক্ত সমস্ত পদগুলিতে নিযুক্ত থাকিয়া এরূপ

দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতেন যে স্বয়ং ঔরঙ্গজেবও বিস্ময় প্রকাশ করিতেন[১]।

যদিও এই সময়ে কুমার আজিমুদ্দিন বাঙলার সুবাদার ছিলেন, কিন্তু তিনি বাঙলায় থাকিতেন না, আগ্রায় থাকিতেন। আজিমুদ্দিনের পুত্র ফারুকসিয়ার ঢাকায় থাকিয়া পিতার নায়েব স্বরূপ কার্য্য চালাইতেন। ঔরঙ্গজেবের আদেশে ফারুকসিয়ারও নিজ অভিভাবকের ন্যায় মুর্শিদকুলীর আদেশ পালন করিতেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৭ খৃঃ ৮ই জুন জজৌয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সম্রাট বাহাদুর সাহ (১ম) তাঁহার পুত্র আজিম উদ্দিনকে আজিম উস-সান উপাধি দিয়া তাঁহাকে পুনরায় বাঙ্গলা ও বিহারের সুবাদারী পদে বহাল করিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রাতেই পিতার নিকট থাকিতেন এবং পুত্র ফারুক সিয়ার ও করিমুদ্দিন তাঁহার নায়েব স্বরূপ যথাক্রমে বাঙলা ও বিহার শাসন করিতেন। ইতিমধ্যে মুর্শিদকুলী কিছুদিনের জন্য (১৫ই জুলাই হইতে ১৮ই নবেম্বর, ১৭০৭ খৃঃ) বাঙলার নায়েব সুবাদারের কাজে বহাল ছিলেন। কিন্তু ১৮ই নবেম্বর ফারুক সিয়ার বাঙলার নায়েব সুবাদার, ১৭০৮ খৃঃ ১৯শে জানুয়ারী উড়িষ্যার সুবাদার এবং ১৭০৭ খৃঃ ১৮ অক্টোবর জিয়াউল্লা খাঁ বাঙলার দেওয়ান হন। মুর্শিদকুলী দাক্ষিণাত্যের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া (১৭০৮ হইতে ১৭০৯ খৃঃ পর্য্যন্ত) বাঙলার বাহিরে চলিয়া যান।

১৭১০ খৃঃ ২০শে জানুয়ারী জিয়াউল্লা তাঁহার সৈন্যদের হাতে নিহত হইলে মুর্শিদকুলী বাঙলার দেওয়ান নিযুক্ত হন (১৭১০ খৃঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী)।

যতদিন বাহাদুর সা জীবিত ছিলেন ততদিন আজিম-উস-সান্ বাঙলার সুবাদার ছিলেন। ১৭১২ খৃঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাহাদুর সাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র জাহান্দার সাহ সম্রাট হন। তৎকালে আজিম-উস-সানের পুত্র ফারুকসিয়ার বাঙলার নায়েব সুবাদার এবং খান-ই-জহান (২য়) সুবাদার ছিলেন।

১। Auranzib wrote in 1704, "One and the same man is diwan of Bengal and Bihar, and nazim and diwan of Orissa, with absolute authority. I myself have not the capacity for doing so much work. Perhaps only a man who, by god, is gifted with the requisite ability can do it."

১৬। নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী খাঁ (১৭১৭-২৭ খৃঃ)।

ফারুকসিয়র সম্রাট হইলে (১৭১৩ খৃঃ ৯ই জানুয়ারী) তাঁহার শিশুপুত্র ফারখুন্দাসিয়র বাঙলার সুবাদার ও কাজ চালাইবার জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ নায়েব সুবাদার হন। ১৭১৭ খৃঃ আগষ্ট মুর্শিদকুলী বাঙলার নবাব নাজিম হন ও তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৭২৭ খৃঃ ৩০শে জুন) বাঙলার নবাব নাজিম ও দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুর্ব্বলচিত্ত বাদসাহেরা গৃহবিবাদে মত্ত থাকায়, যতদিন পর্য্যন্ত বার্ষিক রাজস্ব (এক কোটি কয়েক লক্ষ টাকা) নিয়মিত রূপে প্রেরিত হইত, ততদিন তাঁহারা নবাবের কার্য্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না।

মুর্শিদকুলী নবাব নাজিম নিযুক্ত হইবার পর বাঙলার রাজ কর্ম্মচারীগণের জায়গীর গুলি খাস করিয়া লইলেন এবং ঐ সমস্ত জমি উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট কিস্তিতে কড়াকড়ি ভাবে তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপ ইজারা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে তিনি সুবে বাঙলার সমস্ত জমির জরিপ জমাবন্দী করায় ন্যায়-সঙ্গত রাজস্ব ধার্য্যের কোন বাধা রহিল না। পূর্ব্বে আগ্রা ও পাঞ্জাব হইতে রাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া আসিত। মুর্শিদকুলী বাঙালী উচ্চশ্রেণীর সুশিক্ষিত পার্শীনবীশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগে নিযুক্ত করিতে ও ইজারা বন্দোবস্ত দিতে লাগিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ সমকালে লিখিত তারিখ-ই-বাঙলার লেখক সলিমুল্লা মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব আদায়ের নির্ম্মম কড়াকড়ি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইজারাদারগণকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে ও ঢাকায় নজরবন্দী করিয়া মলমূত্র পরিপূর্ণ গভীর গর্ত্তে রাখিয়া বৈকুণ্ঠ বাস করান অন্যতম। কিন্তু এই সময়ে সাধারণ প্রজাগণ ও ব্যবসায়ীগণের উপর কোন অত্যাচার ছিল না এবং তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শান্তিতে বাস করিত।

বাদসাহ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) ১৫৮০ খৃঃ মোগল সাম্রাজ্যকে ১২টি বিভাগে বিভক্ত করতঃ রাজা টোডরমল্ল ও খাজা সা মনসুরের উপর সকল প্রদেশের রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করিবার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা "আসলতুমার জমা" নামে পরিচিত। ইহাতে সমগ্র সুবে বাঙলা ১৮টি সরকার[১] ও ৬৮২টি মহালে বিভক্ত ও উহার

১। জিন্নতাবাদ (গৌড়), টাঁড়া, ফতেবাদ, মহম্মদাবাদ, বাকলা, খলিফাবাদ,

রাজস্ব ১,০৬,৯৩,১৫২ টাকা স্থির হইয়াছিল (আকবর নামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১৩-১৪, বিভারিজ সাহেবের অনুবাদ)। কিন্তু তৎকালে এই জমাবন্দী ভাটি প্রদেশে কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে নাই। সাহজহানের রাজত্বের (১৬২৭-১৬৫৭ খৃঃ) শেষভাগে সাহজাদা সুজার (১৬৩৭-১৬৫৯ খৃঃ) সুবাদারী আমলে ১৬৫৭ খৃঃ সুবে বাঙলার রাজস্বের দ্বিতীয় হিসাব প্রস্তুত হয়। ইহাতে সুবে বাঙলা ৩৪ সরকার ও ২৩৫০টি মহলে বিভক্ত হয়। অতঃপর মুর্শিদকুলী খাঁর নবাবীর আমলে ১৭২২ খৃঃ তিনি প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ মিত্র ও রঘুনন্দনের সাহায্যে সুবে বাঙলার রাজস্বের যে তৃতীয় হিসাব প্রস্তুত করেন তাহা 'জমা কামেল তুমারী' নামে প্রসিদ্ধ। এই পাকা হিসাবই পরবর্ত্তী সমুদয় বন্দোবস্তের ভিত্তি। ইহাতে সুবে বাঙলা ১৩টি চাকলা ও ২৫টি জমিদারী ও ১৩টি জায়গীরে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক চাকলায় একজন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত হয়। উপরোক্ত ২৫টি জমিদারীর ১২৫৬ পরগণার মোট খালসা ও সায়ের জমা ১,০৯,১৮,০৮৪ টাকা ধার্য্য হয়। সে কালে বাঙলার নানা স্থানে ভূমি নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া তাহার আয় হইতে নাজিম, দেওয়ান ও সৈন্য বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। এই ভূমিগুলির নাম জায়গীর। জায়গীর সহ মোট পরগনার সংখ্যা ১৬৬০, ও জায়গীর জমা সহ সমগ্র রাজস্ব ১৪২৮৮১৮৬ টাকা স্থির করা হইল। ১৩টি চাকলা মধ্যে বালেশ্বর ও হিজলী উড়িষ্যার সীমা হইতে সুবে বাঙলায় খারিজ করিয়া লওয়া হয়; গঙ্গা ও ভাগীরথীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, সপ্তগ্রাম, (হুগলী) যশোহর, ভূষণা, আকবর নগর, রাজমহল ও বালেশ্বর-হিজলী এই আটটি ও পূর্ব্বপারে, ঘোড়াঘাট, কড়ইবাড়ী, জাহাঙ্গীর নগর, (ঢাকা) শ্রীহট্ট, ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) এই পাঁচটি মোট ১৩টি চাকলা।

ভূমি রাজস্ব ব্যতীত খালসা (রাজস্ব) সেরেস্তার খাসনবিশ ও মুতঃসুদ্দীগণের পার্ব্বনী বাবদ আবওয়াব আদায় হইত। এই আবওয়াব ও বাদসাহ সরকারে প্রেরিত বার্ষিক নজরানা বাবদ মোট ২৫৮৪৫৭ টাকা সমগ্র বাঙলার ভূ-সম্পত্তির উপর পড়তা করিয়া আদায় হইত। জমিদারী বন্দোবস্তে একমাত্র বীরভূম ছাড়া প্রধান জমিদার মাত্রই হিন্দু ছিল।

মুর্শিদকুলী ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণকে বিনা শুল্কে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে, কোম্পানীকে টাকশালে বিনাব্যয়ে কোম্পানীর মুদ্রা প্রস্তুত

পূর্ণিয়া, তাজপুর, ঘোড়াঘাট, পিঞ্জরা, বাজুহা, সোনার গাঁ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, শরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ, সাত গাঁ, ও মন্দারণ।

করিতে, কিম্বা কলিকাতার পার্শ্বে বল সঞ্চয়ের জন্য জমিদারী গ্রহণ করিতে দেন নাই। তাঁহার সময়ে সুবে বাঙলা নিম্নলিখিত ২৫টি জমিদারীতে বিভক্ত হইয়াছিল :—

(১) ত্রিপুরা—ত্রিপুরার হিন্দুরাজ্য প্রাচীনকাল হইতেই স্বাধীন ছিল। আরাকান রাজের সহিত যুদ্ধে হীনবল হইবার পর সাহজহানের আমলে এই রাজ্যের নিম্নভূমির কিয়দংশ মুঘলের অধিকৃত হয়। তাহাই ৭ পরগণায় সরকার উদয়পুর নামে অভিহিত হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় এই সরকার নামে মাত্র জমায় ত্রিপুরারাজ রামমাণিক্যের নামে বন্দোবস্ত হয়। সুজা খাঁর সময় রামমাণিক্যের পুত্র ধর্ম্মমাণিক্যের নামে যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে মূল ৪ পরগণাকে ২৪ পরগণায় বিভক্ত করিয়া সেকালে রোসেনাবাদ নামে (হস্তী ধরিয়া দিবার ব্যয় বার্ষিক ৪৫০০০ টাকা বাদে) ৪৭৯৯৩ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়। মীর কাশেমের বন্দোবস্তে ৯৬,৭৫৮ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হয়।

(২) পঞ্চকোট (পাঁচেট) এই রাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজারা প্রাচীনকাল হইতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। মোগল আমলে ইঁহারা নাম মাত্র অধীনতা স্বীকার করিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে পাঁচেট ও শেরগড় এই দুই পরগণায় বিভক্ত এই রাজ্যের ১৮২০৩ টাকা পেশকস ধার্য্য হয়। মীর কাশেমের সংশোধিত বন্দোবস্তে ইহার উপর ৩৩২৩ টাকা আবওয়াব ধার্য্য হয়।

(৩) বিষ্ণুপুর—কথিত আছে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে ক্ষত্রিয় বংশীয় আদি মল্ল রঘুনাথ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বিরের সময় বৃন্দাবন হইতে আগত বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ তৎকর্ত্তৃক অপহরণ ও পরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের উপদেশে গ্রন্থগুলি প্রত্যর্পণ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। আকবরের সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজা নাম মাত্র মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন। সায়েস্তা খাঁর সুবাদারী আমলে এই রাজ্যের উপর সামান্য পেশকস ধার্য্য হয়। মুর্শিদকুলীর সময় পরম ভাগবত রাজা গোপাল সিংহের সহিত বিষ্ণুপুর ও সেরপুর এই দুই পরগণায় ১৯৮০৩ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়। মীর কাশেমের বন্দোবস্তে ইহার উপর ২০০৭৯ টাকা আবওয়াব ধার্য্য হয়।

(৪) বৰ্দ্ধমান—সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কপুর ক্ষেত্রী বংশীয় আবু রায় পঞ্জাব হইতে আসিয়া বৰ্দ্ধমান এলাকার চৌধুরী বা রাজস্ব সংগ্রাহকের পদ লাভ করেন। তৎপুত্র বাবু রায় আরও তিনটি পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। বাবু

রায়ের পৌত্র কৃষ্ণরাম রায় জমিদারীর আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার সময়ে শোভা সিংহের বিদ্রোহে রাজ্য বিপর্য্যস্ত হয়। বিদ্রোহের অবসানে তৎপুত্র জগৎরাম আজিম-উস-সানের নিকট আরও কতকগুলি মহাল প্রাপ্ত হন। জগৎরামের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের সময় বর্দ্ধমান চাকলার অধিকাংশ, হুগলীর ভূরশুট (ভূরিশ্রেষ্ঠী) প্রভৃতি পরগণা, মুর্শিদাবাদ চাকলার মনোহরশাহী প্রভৃতি পরগণা লইয়া বৃহৎ বর্দ্ধমান রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ১৭২২ খৃঃ মুর্শিদকুলীর বন্দোবস্তে রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের সহিত ৫০ পরগণায় ২০,৪৭৫০৬ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। মীর কাশেমের বন্দোবস্তে মোট রাজস্ব ৩২,২৬৯৩৪ টাকা স্থির হয়।

(৫) দিনাজপুর—বর্ত্তমান দিনাজপুর সহর সরকার পিঞ্জরার অন্তর্গত বিজয় নগর পরগণায় অবস্থিত। কথিত আছে রাজা গণেশের রাজধানী এই দিনাজপুরে অবস্থিত ছিল এবং আধুনিক দিনাজপুর রাজের জমিদারীর অধিকাংশই সেকালের রাজা গণেশের রাজ্যভুক্ত ছিল[১]। আকবর বাদশাহের রাজ্যকালে বিষ্ণুদত্ত নামক একজন উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ প্রাদেশিক কানুনগো পদে নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুরে বাস করেন। কথিত আছে তিনি রাজা গণেশের জ্ঞাতি-বংশীয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত বাদশাহ সাহজহানের রাজ্যকালে সাসুজার নিকট দিনাজপুর জমিদারী লাভ করেন। শ্রীমন্তের হরিশ্চন্দ্র নামক পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। বর্দ্ধমান জেলার কুলাই গ্রামের হরিরাম ঘোষের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হয়। হরিশ্চন্দ্রের নিঃসন্তান পরলোকগমনের পর দৌহিত্র সূত্রে হরিরাম ঘোষের পুত্র শুকদেব ঘোষ দিনাজপুর জমিদারী ও অন্যান্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। শুকদেবের পুত্র প্রাণনাথ সম্পত্তির আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া রাজা উপাধি লাভ করেন। প্রাণনাথের পোষ্যপুত্র রামনাথ বহু অর্থ সঞ্চয় করেন। মুর্শিদাবাদের নবাবেরাও তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় দিনাজপুরের জমিদারী ৮৯ পরগণায় ৪৬২৯৬৪৲ টাকা রাজস্বে রাজা রামনাথের সহিত বন্দোবস্ত হয়।

১। "Calcutta Review"-তে ওয়েষ্ট মেকট সাহেব দিনাজপুর রাজ সম্বন্ধে প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "It is much more probable that the Estate dated from earlier times, possibly from those of 'Ganesh.' (Calcutta Review, 1872 p. 123)।

অদ্বৈত বাল্যলীলা সূত্রঃ গ্রন্থে রাজা গণেশের রাজধানী দিনাজপুরে ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুদত্ত পাটুলীর কেশবদত্তের ভ্রাতা ছিলেন।

মীর কাশেমের বন্দোবস্ত আমলে রাজস্ব প্রায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়া ১৮২০৭০০৲ টাকা হয়[১]।

(৬) ইত্রাকপুর—(বর্দ্ধনকুঠী)—চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ইত্রাকপুর জমিদারী বহু প্রাচীন কাল হইতে একটি বারেন্দ্র কায়স্থ বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর ১৭৮১ খৃঃ গুড ল্যাড সাহেব কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের নিকট যে রিপোর্ট দেন তাহাতে রাজা রাজেন্দ্র এই রাজবংশের প্রথম রাজা বলিয়া লিখিত আছে। উক্ত রিপোর্ট অনুসারে রাজা রাজেন্দ্রের উত্তরাধিকারীগণের ক্রমিক নাম এইরূপ—

রাজা ভগীরথ, রাজা নরোত্তম, রাজা শ্যামকিশোর, রাজা ভবানীকান্ত, রাজা দুর্গাকান্ত, রাজা দুর্গা প্রসাদ, রাজা রামদুলাল, রাজা গোপীরমণ, রাজা অমরকান্ত, রাজা গৌরহরি, রাজা কৃষ্ণানন্দ ও রাজা আর্য্যবর। রাজা আর্য্যবরের পুত্র রাজা ভগবান। ইঁহারা ষোল আনা বর্দ্ধনকুঠী জমিদারী ভোগ করিতেন। রাজা ভগবান যে ১৫৩৩ শকে (১৬১১ খৃঃ) বর্ত্তমান ছিলেন তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধনকুঠীর নিকটবর্ত্তী রামপুর গ্রামের মন্দিরের ইষ্টকলিপি হইতে জানা যায়। লিপিটি এই—

গুণাব্ধিশরচন্দ্রেন যুতে শাকে ভবচ্ছিদে।
ভবাব্ধিভীত ভগবান দদৌ শ্রীবিষ্ণবে মঠং॥

(ভবসাগরভীত রাজা ভগবান ভবভয়হারী শ্রীবিষ্ণুকে ১৫৩৩ শকে এই মঠ প্রদান করিলেন)।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের যদুনন্দন কৃত ঢাকুর গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটি।
আর্য্যবর মণ্ডল বাস কৈলা বর্দ্ধন কুঠী॥

১। শুকদেব ঘোষের পিতামহ দেবকীনন্দন ঘোষের পিতা ভগবান ঘোষ বর্দ্ধনকুঠী জমিদারের দেওয়ান ছিলেন। তিনি বর্দ্ধনকুঠী জমিদারীর সাত আনা অংশ লাভ করেন। ১৬৮২ শকে (১৭৬০ খৃঃ) রাজা রামনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ ও তাঁহার দত্তক পুত্র রাধানাথের সময় দিনাজপুর জমিদারির বহু পরগণা নিলাম হইয়া যায়। রাধানাথের দত্তক পুত্র মহারাজ গোবিন্দনাথের মৃত্যুর (১৮৪১ খৃঃ) পর তাঁহার পত্নী মহারাণী শ্যামাঙ্গিনীর দত্তক পুত্র মহারাজ গিরিজানাথ রায় ও তৎপর তৎপুত্র মহারাজ জগদীশনাথ যথাক্রমে রাজা ছিলেন।

তার পাত্র ভগবান করিয়া চাতুরী।
ভগবান রাজা হৈলে নিলা জমিদারী॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙলায় আইলা।
নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিলা॥
তাহার তনয় হইল কুমুদা নন্দন।
তস্য পুত্র রঘুনাথ বড়ই সদ্‌গুণ॥
মনোহর তস্য পুত্র তস্য পুত্র হরি।
রাজা বিশ্বনাথ তস্য সুত নামধারী॥"

পূর্ব্বোক্ত বিভাগ সম্বন্ধে গুড ল্যাড সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন—"Raja Erjobher was succeeded by his son Raja Bhogwan who was an idiot. His dewan was also of the same name, who availing himself of his master's weakness went to Dacca, where bribing the subah, claimed the zemindary on his own right and turned out the lawful possessor. A long dispute ensued, which at length ended on the division of the zaminders, the lawful possessor having nine annas and the usurper seven, which seven annas are part of the zemindery of Dinajpur." অর্থাৎ রাজা আর্য্যবরের পুত্র ভগবান নির্ব্বোধ ছিলেন, তাঁহার দেওয়ানের নামও ভগবান ছিল। এই সুযোগে দেওয়ান ঢাকার সুবাদারকে উৎকোচ প্রদান করিয়া সমস্ত জমিদারী নিজ নামে সনন্দ করিয়া লন। এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল গোলযোগ চলে। শেষে রাজা নয় আনা ও দেওয়ান সাত আনা অংশ প্রাপ্ত হন। এই সাত আনা অংশ দিনাজপুর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাজা বিশ্বনাথের সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর সময় এই ইদ্রাকপুর জমিদারী ৬০ পরগণায় ৮১৯৭৫ টাকা বার্ষিক রাজস্বে বন্দোবস্ত হয়।

গুড ল্যাড তাঁহার রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিবার সময় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রদত্ত দুইখানি ফার্ম্মান দর্শন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানি রাজা রঘুনাথের অপরখানি রঘুনাথের পৌত্র হরিনাথের নামে ছিল। রাজা রঘুনাথের নামীয় ফার্ম্মান দৃষ্টে জানা যায় যে বাদসাহের রাজত্বের একাদশ বর্ষে (১৬৬৯ খৃঃ) সাহ সুজার নবাবী আমলে এই জমিদারীর নয় আনা অংশ মধ্যে পাঁচ আনা অংশ মধুসিংহ নামে এক ব্যক্তি বেদখল করিয়া লয়। রাজা বাদসাহের নিকট প্রতিকার

প্রার্থী হইলে বাদসাহ মধুসিংহকে তাড়াইয়া দিয়া সম্পূর্ণ নয় আনা অংশ বাবদ রাজা রঘুনাথকে ফার্ম্মান দান করেন। এইরূপ হইলেও পরবর্ত্তীকালে ইদ্রাকপুর জমিদারীর স্বরূপপুর ও জোলাদশী পরগণা বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দসহ চাঁদরায়ের ও কুণ্ডী পরগণা কুণ্ডীর জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকারে চলিয়া যায়। দশশালা বন্দোবস্তের সময়েও ইদ্রাকপুর জমিদারীর ৬৯ পরগণায় ১৬০১৯৬ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছিল। পরে এই জমিদারীর অধিকাংশ নীলাম হইয়া যায়। এই বংশের শেষ রাজা কুমার শৈলেশ রায়ের সময় জমিদারী চলিয়া যায়।

(৭) পুঠিয়া—সরকার বার্ব্বকাবাদের অন্তর্গত পরগণা লস্করপুর ও গয়রহের ভৌমিক ছিলেন (সাধু বাগচির বংশীয়) পুঁটিয়ার বৎসাচার্য্যের পুত্র পীতাম্বর। "বাহারীস্তান" হইতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের (জাহাঙ্গীরের সময়) পূর্ব্ব হইতে সরকার বাজুহার অন্তর্গত ভাতুড়িয়া পরগণার চিনা জোয়ারের ভৌমিক ছিলেন এবং ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। লস্করপুর পরগণার অন্তর্গত আলাইপুরের লস্কর খাঁ নামক ব্যক্তির জায়গীর লস্করপুর পরগণা নামে পরিচিত ছিল। উক্ত লস্করপুর পরগণাসহ ২৩ পরগণা জমিদারী পরে বৎসাচার্য্যের সময় তৎপুত্র পীতাম্বরের নামে বন্দোবস্ত হয়। পীতাম্বর নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে তাঁহার মৃত ভ্রাতা নীলাম্বরের পুত্র অনন্তরাম ঠাকুর উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তরাম বাদসাহের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করেন। অনন্তরামের পুত্র রতিকান্ত। তৎপুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর, তৎপুত্র দর্পনারায়ণ, তৎপুত্র অনুপনারায়ণ ঠাকুরের সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ১৫ পরগণায় বার্ষিক ১২০৫১৬ টাকা রাজস্বে জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত লস্করপুর পৃথক কালেক্টরী ছিল। রাজা অনুপনারায়ণের পর হইতে রাণী হেমন্তকুমারীর স্বামী যতীন্দ্রনারায়ণ পর্য্যন্ত সপ্তম পুরুষ হইয়াছে।

(৮) রুকনপুর বা কাননগোহ জমিদারী—রাজা টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্ত আমলে তিনি দশজন প্রধান কাননগো নিযুক্ত করেন (আইন-ই-আকবরী প্রথম খণ্ড)। এই প্রধান কাননগোগণ পরগণা কাননগোগণের নিকট হইতে রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেন, তদ্দৃষ্টে টোডরমল্লের রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত হয়। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের অদূরবর্ত্তী ডাহাপাড়া নিবাসী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ মিত্র বংশীয় ভগবান রায় সুবে বাঙলার প্রথম প্রধান কাননগো নিযুক্ত হন। তৎপর তাঁহার ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। তৎপর প্রধান কাননগোর ক্ষমতা হ্রাস করার উদ্দেশে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের আদেশে বঙ্গবিনোদের পুত্র হরিনারায়ণকে অর্দ্ধাংশ প্রধান কাননগো

ফার্ম্মান প্রদান করা হয় (১০৯০ হিঃ, ১৬৭৯ খৃঃ) এবং অপর অর্দ্ধাংশ বাবদ ভট্টবাড়ী নিবাসী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সিংহ বংশীয় জয়নারায়ণের পূর্ব্ব পুরুষের নামে ফার্ম্মান প্রদত্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় কাননগো বাদশাহী ফার্ম্মান লাভ করিয়াও নিজ পদে অধিকার প্রাপ্ত হন না। শেষে সুবাদারের মধ্যস্থতায় তাঁহাকে কাননগো রসুমের ছয় আনা অংশ প্রদত্ত হয়। তৎকালে সদর রাজস্বের উপরে শতকরা আট আনা কাননগো রসুম নির্দ্দিষ্ট ছিল। হরিনারায়ণের পর তৎপুত্র দর্পনারায়ণ প্রথম কাননগো ও পূর্ব্বোক্ত জয়নারায়ণ দ্বিতীয় কাননগো ছিলেন। দর্পনারায়ণের পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমিক যে জমিদারী ছিল তৎপুত্র শিবনারায়ণের কাননগো আমলে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া মুর্শিদকুলীর সময়ে ৬২ পরগণায় ২৪২৯৪৩ টাকা রাজস্বে শিবনারায়ণের নামে বন্দোবস্ত হয়। প্রধান পরগণা রুকনপুরের নামানুসারে এই জমিদারী রুকনপুর জমিদারী নামে পরিচিত। মীর কাশেমের সময় এই রাজস্বের উপর ৭৩৯৬৮ টাকা বৃদ্ধি হয়।

(৯) রাজসাহী (বা নাটোর)। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সাঁওতাল পরগণার পাকুড় মহকুমায় রাজসাহী পরগণা অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ জমিদারগণ এই পরগণার মালিক ছিলেন। রাজসাহী পরগণার দেবীনগরে ইহাদের বাস ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ঐ জমিদার বংশীয় উদয়নারায়ণ রায় রাজসাহী প্রভৃতি পরগণা ভোগ করিতেন। উদয়নারায়ণের কর্ম্মদক্ষতায় মুর্শিদকুলী তাঁহার হস্তে পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। এই কার্য্যে তিনি কৃতকার্য্য হইবার পর তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীন হইবার বাসনা জন্মে এবং দুর্গাদি নির্ম্মাণ ও বলসঞ্চয় করিতে থাকেন। সুবাদার তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ফৌজ পাঠাইলে তৎসহ যুদ্ধে উদয়নারায়ণ পরাস্ত ও বন্দী হন।

স্বনামধন্য নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন নামক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রতিভা ও দক্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া পুঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ তাঁহাকে স্বীয় উকিলস্বরূপ মুর্শিদকুলী খাঁর মুর্শিদাবাদ দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অনতিকাল মধ্যে রঘুনন্দন প্রধান কাননগো দর্পনারায়ণ রায়ের নায়েব কাননগো পদ লাভ করেন। তাঁহার অনুরোধে মুর্শিদকুলী তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে পূর্ব্বোক্ত রাজসাহী জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অতঃপর পরগণা বানগাছীর চৌধুরী গণেশরাম ও ভগবতীচরণ পুনঃপুনঃ খাজনা আদায়ে অসমর্থ হওয়ায় এই জমিদারীও রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত হয় (১১১৩ সাল, ১৭০৬ খৃঃ)।

মহম্মদপুরের বিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের উচ্ছেদের পর তাঁহার ভূষণা রাজ্যের অধিকাংশ রামজীবনের জমিদারীভুক্ত হয়। সীতারামের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির ফলকলিপি হইতে তাঁহার রাজ্যকালের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার দশভুজা মন্দির ১৬২১ শকে (১৬৯৯ খৃঃ), লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ১৬২৫ শকে (১৭০৩ খৃঃ) ও দুর্গবহিস্থ কানাই নগরের কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির ১৬২৫ শকে (১৭০৩ খৃঃ) স্থাপিত হয়। নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময় (১৬৮৯-১৬৯৮ খৃঃ) সুবে বাঙলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সীতারাম রায় ধীরে ধীরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হন। ভূষণার মধুমতী তীরে হরিহর নগর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে সীতারামের জন্ম হয়। সেকালে ভূষণা অঞ্চলের রীতিমত কর আদায় হইত না। উপযুক্ত বলিয়া সীতারাম এই ভূভাগের নলদী (নড়াইল) পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও অসাধারণ সাহসের বলে তিনি ক্রমশঃ আরও অনেকগুলি পরগণার ভূস্বামী হইলেন। ফৌজদার নুরুল্লা তাঁহার অগ্রগতি রোধ করিতে সাহসী হইল না। তিনি ক্রমে দুর্দ্দমনীয় একদল সেনা সংগ্রহে সমর্থ হইলেন। খুলনা জেলার মাগুরা মহকুমার ৭ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে মহম্মদপুরে তাঁহার সুরক্ষিত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়। কথিত আছে তিনি উপযুক্ত নজর দিয়া বাদশাহের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ভূষণা হইতে ১০ মাইল দূরে মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে বাগজানী গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া জনৈক মুসলমান সাধুর নামানুসারে উহার নাম মহম্মদপুর রাখিয়াছিলেন। নুরুল্লার পর সৈয়দ আবুতোরাব ভূষণার ফৌজদার হইয়া আসিলেন। কিন্তু তিনিও সীতারামকে দমন করিতে সাহসী হইলেন না। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সীতারামের সৈন্যদলের সহিত সংঘর্ষে আবুতোরাব নিহত হইলে, সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া ভূষণার নবনিযুক্ত ফৌজদার (মুর্শীদকুলীর আত্মীয়) বক্সআলি খাঁকে সীতারামের বিরুদ্ধে বহু সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। বক্সআলি পার্শ্ববর্তী জমিদারগণের সাহায্যে সীতারামকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করেন (১৭১৪ খৃঃ, ফেব্রুয়ারী)। এই ব্যাপারে নবাবপক্ষকে নাটোর-রাজ বহু সহায়তা করায় সীতারামের জমিদারীর অধিকাংশ নাটোর-রাজ রামজীবনের ও কিয়দংশ নলডাঙ্গার জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত হয়।

অতঃপর ১১১৭ সালে (১৭১০ খৃঃ) সাঁতোলের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা রামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী রাণী সর্ব্বানীর মৃত্যু হইলে রামকৃষ্ণের একমাত্র উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম রায় অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহার বিস্তীর্ণ ভাতুড়িয়া

প্রভৃতি পরগণা নাটোরের রাজা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় (১১২৩ হিঃ ১৭১১ খৃষ্টাব্দের বাদশাহ শাহ আলমের সময়ের সনন্দ)।

অবশেষে সরকার মহম্মদাবাদের (নদীয়া ও যশোহর জেলার অধিকাংশ) অন্তর্গত টুঙ্গী স্বরূপপুরের জমিদার সুজাৎ খাঁ ও নিজাবৎ খাঁর জমিদারীও রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত হয়। কথিত আছে উক্ত সুজাৎ খাঁ ও নিজাবৎ খাঁ নবাব সরকারে প্রেরিত ৬০ হাজার টাকা লুণ্ঠন করায় মুর্শিদকুলী খাঁর আদেশে হুগলীর ফৌজদার আশানুল্লা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন এবং তাহাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইয়া নাটোর জমিদারীভুক্ত হয়।

এইরূপে অত্যল্প কাল মধ্যে সুবে বাঙ্গলার প্রায় একের পাঁচ অংশ রঘুনন্দনের উদ্যোগে রাজসাহী বা নাটোর জমিদারীভুক্ত হয়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলীর বন্দোবস্তে রাজসাহী জমিদারীর ১৩৯ পরগণায় জায়গীর বাদে ১৬,৯৬,০৮৭ টাকা রামজীবনের নামে রাজস্ব ধার্য্য হয়। রাণী ভবানীর সময় আরও কতকগুলি পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাজসাহী জমিদারী একটি রাজ্যের আকার ধারণ করে। মীরকাশেমের সময় বাহারবন্দ ও ভিতরবন্দ প্রভৃতি যোগে এই জমিদারীর আয়তন কিছু বৰ্দ্ধিত হইলেও রাজস্ব দ্বিগুণের উপর বৰ্দ্ধিত হইয়া ৩৫,৫৩,৪৮৫৲ টাকা হইয়াছিল।

(১০) বীরভূমি—মুসলমান আগমণের পূর্ব্ব হইতে বীরভূমিতে এক অৰ্দ্ধ-স্বাধীন হিন্দু রাজ বংশ রাজত্ব করিত। রাজনগর তাহাদের রাজধানী ছিল। মুসলমান বিপ্লবের মধ্যে এই হিন্দু রাজবংশের কর্ম্মচারী আসাদ উল্লা ও জোনাদ খাঁ নামক ভ্রাতৃদ্বয় উক্ত হিন্দু রাজ্য অধিকার করে। জোনাদের পুত্র রাজা রণমস্ত খাঁ সীমান্ত রক্ষার ভার পাইয়া বীরভূমি রাজ্য জায়গীর স্বরূপ ভোগ করেন। তৎপুত্র সাধুশীল ও আসাদউল্লার সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্ত সূত্রে মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ ও বীরভূম, সেনভূম প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ২২ পরগণায় ৩৬৬৫০৯ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়। মীর কাশেমের সময় এই জমিদারীর রাজস্ব ১৩৪২১৫৩ টাকা হয়।

(১১) ইউসুফপুর (যশোহর)—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ভবেশ্বর রায় ও তৎপুত্র মহাতপ, প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মোগল পক্ষকে সাহায্য করায় বৰ্ত্তমান যশোহরের মধ্যে সৈদপুর প্রভৃতি পরগণা জমীদারী স্বরূপ লাভ করেন। মহাতপের পৌত্র মনোহর রায় ইউসফপুর প্রভৃতি পরগণা অর্জ্জন করিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্র কৃষ্ণরামের সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ২৩ পরগণায় ১৮৭৭৫৪ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়। তৎকালে যশোহরের প্রায় অৰ্দ্ধাংশ এবং বৰ্দ্ধমান, খুলনা

ও ২৪ পরগণার কিয়দংশ এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মীর কাশেমের সময় ইহার রাজস্ব ৪১৬৩১৮ টাকা হয়।

(১২) নবদ্বীপ (কৃষ্ণনগর)—বন্দ্যবংশীয় প্রসিদ্ধ ভবানন্দ মজুমদার এই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। নদীয়া, উখুড়া প্রভৃতি ২০ পরগণা ইহার জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। ভবানন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রাজা রঘুরায়, রাজা উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে মুর্শিদকুলীকে সাহায্য করায় আরও কতকগুলি পরগণা এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার পুত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। রাজা রঘুরায়ের সহিত ৭৩ পরগণায় ৫৯৪৮৪৬ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়।

(১৩) ফতেসিংহ—রাজা মানসিংহের সময় জেমোর ভূমিহার বংশীয় সবিতা রায় মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এই ফতেসিংহ জমিদারী লাভ করেন। এই বংশের ঘনশ্যাম রায়ের পুত্র জগৎ রায়, কালু রায় প্রভৃতি শোভা সিংহের বিদ্রোহে যোগদান করায় জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়। পরে মুর্শিদকুলীর অনুগ্রহে উহা পুনঃপ্রাপ্ত হন। সবিতা রায়ের বংশধর আনন্দচন্দ্র নিঃসন্তান পরলোকগত হওয়ায় ঐ বংশের অন্যতম বৈদ্যনাথের ভগ্নীপতি সূর্য্যমণি চৌধুরী ফতেসিংহ জমিদারী প্রাপ্ত হন। সবিতা রায়ের বংশধরগণ জেমোর রাজা ও সূর্য্যমণি বাঘডাঙ্গার জমিদার বলিয়া পরিচিত। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় সূর্য্যমণির পুত্র হরিপ্রসাদের নামে ১১ পরগণায় ১৮৬২১ টাকা জমায় এই জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। অতঃপর এই জমিদারী জেমো ও বাঘডাঙ্গার মধ্যে বিভক্ত হয় ও ইহার রাজস্ব ১৩৭২৯১ টাকা হয়। মীর কাশেমের সময় ইহার উপর ১২১০৩ টাকা আবওয়াব ধার্য্য হয়।

(১৪) মহম্মদসাহী ভূষণা—কথিত আছে নলডাঙ্গার রাজ বংশের আদি পুরুষ বিষ্ণুদেব হাজরা বাদসাহী সৈন্যের রসদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া ৫ খানি গ্রামের জমিদারী লাভ করেন। পরে ঐ বংশের শ্রীমন্তরায় মামুদসাহীর জমিদারী অর্জ্জন করেন। রাজা সীতারাম রায় এই জমিদারীর অধিকাংশ বেদখল করেন। তাঁহার পতনের পর ভূষণার অধিকাংশ রাজসাহী জমিদারীভুক্ত হয়। অবশিষ্ট অংশে নলডাঙ্গার রাজবংশের রাজা রামদেবের সহিত জায়গীর বাদে ২৯ পরগণায় ১১০৬৩৩ টাকা জমায় বন্দোবস্ত হয়। মীর কাশেমের সময় আবওয়াব প্রভৃতিতে বাড়িয়া রাজা কৃষ্ণদেবের সহিত ২৭৩৪৩৪ টাকা জমা ধার্য্য হয়।

(১৫) জালালপুর দিগর—চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকা) সমগ্র খালসা ভূমি ও চাকলে ভূষণা ও ঘোড়াঘাটের কিছু অংশ লইয়া এই জমিদারী গঠিত হয়। ত্রিপুরার সরাইল পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকে বিভক্ত। জায়গীর বাদে ইহার ১১৫ পরগণায় ৮৯৯৭৯০ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়।

(১৬) সেরপুর-ধরমপুর (পূর্ণিয়া)—পূর্ণিয়া অঞ্চলের জায়গীর বাদে অবশিষ্ট দুইটি প্রধান পরগণা সেরপুর-ধরমপুর নামে এই জমিদারী গঠিত হয়। তৎকালে ফৌজদার সইফ খাঁ ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৩ পরগণায় ইহার রাজস্ব ৯৮৬৬৪ টাকা ধার্য্য হয়। মীর কাশেমের আমলে বিশগুণ বর্দ্ধিত হইয়া রাজস্ব ২০,৯৮,১১১ টাকা হয়।

(১৭) ফকিরকুণ্ডী (রঙ্গপুর)—চাকলে ঘোড়াঘাটের উত্তরভাগ ও সরকার বাজুহারকুণ্ডী প্রভৃতি পরগণা লইয়া ফকিরকুণ্ডী জমিদারী সৃষ্ট হয়। ইহাই পরে রঙ্গপুর জেলায় পরিণত হয়। ইহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র তালুক ছিল। জায়গীর জমা ৯০৫৪৮ টাকা বাদে ইহার রাজস্ব ২৪৪ পরগণায় ২৬৯১২৩ টাকা ধার্য্য হয়। মীর কাশেমের সময় এই রাজস্ব ৬৩৭৬৩২ টাকা হয়।

(১৮) কলিকাতা জমিদারী—কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের সহিত ২৭ পরগণায় ২২২৯৫৮ টাকা রাজস্বে এই জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। হুগলীর ফৌজদার এই রাজস্ব আদায় করিতেন। ইংরেজ কোম্পানী ক্রমশঃ ইহার ২৪টি পরগণা হস্তগত করিয়া ২৪ পরগণা জেলার নামকরণ করে। মীর কাশেম ইহার রাজস্ব ৫৫৫০৩৬ টাকা ধার্য্য করেন।

(১৯) কাঁক জোল (রাজমহল)—রাজমহলের সমীপবর্ত্তী কাঁক জোল (কয়ঙ্গল) প্রভৃতি ১০ পরগণায় ৭৪,৩১৭ টাকা রাজস্ব ধার্য্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি তালুকে এই কাঁকজোল জমিদারী গঠিত হয়। মীর কাশেমের সময় ইহার রাজস্ব ১৭৭৪৪৭ টাকা হয়।

(২০) তমোলুক (মহিষাদল)—গোয়ালপাড়া, মহিষাদল, জলামুঠা, সুজামুঠা প্রভৃতি ১৬ পরগণায় ১৮৫৭৬৫ টাকা রাজস্ব ধরিয়া রাজা শুকদেবের সহিত এই জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। তমোলুক পূর্ব্বকালে পুরাতন এক রাজবংশের অধিকারভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে জনার্দ্দন উপাধ্যায় মহিষাদল জমিদারী প্রাপ্ত হন। জনার্দ্দন হইতে চতুর্থ পুরুষে শুকদেব। এই শুকদেবের পুত্র আনন্দলাল নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে তাঁহার দূরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী গুরুপ্রসাদ গর্গ এই জমিদারী প্রাপ্ত হন। মীর কাশেমের সময় এই জমিদারীর রাজস্ব ৮৫৬৮৭৪ টাকা হয়।

(২১) শ্রীহট্ট—চাকলা শ্রীহট্টের জায়গীর জমা বাদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের সহিত ৩৬ পরগণায় ৭০০১৬ টাকা রাজস্ব ধার্য্যে এই জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। মীর কাশেমের সময় ইহার জমা ৪৮৫৬১৪ টাকা হয়। এই জমিদারী লইয়া পরে শ্রীহট্ট জেলার সৃষ্টি হয়।

(২২) ইছলামবাদ (চট্টগ্রাম)—মুর্শিদ কুলী খাঁ ইছলামবাদকে একটি স্বতন্ত্র চাকলা করিয়া ইহার সমস্ত রাজস্ব (৪৫০,০০০ টাকা) জায়গীরের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন। মীর কাশেম এই জমিদারীর রাজস্ব ৩৩৫১৩৫ টাকা স্থির করেন।

(২৩) সুহেস্ত ও খোস্তাঘাট—চাকলা বন্দর বালেশ্বর হইতে খারিজী সুহেস্ত প্রভৃতি পরগণা ও চাকলা কড়ইবাড়ীর অন্তর্গত খোস্তাঘাট পরগণা এই দুই জমিদারীর ২৮ পরগণায় ১২৯৪৫০ টাকা রাজস্ব একত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সুহেস্তদিগরের রাজস্ব ৯২৮৭৫ টাকা।

(২৪) মজকুরী তালুক—নিম্ন লিখিত ২১টি মজকুরী তালুকে মোট ১৩৬টি পরগণায় ৭৮৫২০১ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয় যথা—

১। বহরুল—সরকার সবিফাবাদের ১৩টি পরগণার এই জমিদারীর রাজস্ব ২৪১৩৯৭ টাকা ধার্য্য হয়। ইহা সাতোল রাজা রামকৃষ্ণের জমিদারী ছিল। পরে ইহার অধিকাংশ রাজসাহী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

২। মণ্ডলঘাট—সরকার সাতগাঁর ৫টি পরগণার এই জমিদারী পদ্মনাভের নামে ২৪৬২৬১ টাকা রাজস্বে বন্দোবস্ত হয়। পরে ইহা বর্দ্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩। আর্ষা—সরকার সাতগাঁর ২১টি পরগণার এই জমিদারী রঘুদেবের নামে ১২৫৩৫১ টাকা রাজস্বে বন্দোবস্ত হয়। ইহাও পরে বর্দ্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪। চুণাখালী—ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ সহর অবস্থিত। ৩ পরগণার এই জমিদারীর ৯৫৪০৭ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়। ইহার কিয়দংশ নবাবের খাস তালুক ও অপরাংশ রাজসাহী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫। আসাদনগর ও মহাব্বিদিগর—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত এই জমিদারীর কিয়দংশ রাজসাহী জমিদারীর অধীন হয়। অপর অংশ ৩ পরগণায় ৬৫৭৯৮ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়।

৬। জাহাঙ্গীরপুরদিগর—কথিত আছে চাকলা ঘোড়াঘাটের মধ্যগত এই জমিদারী ব্রাহ্মণ জাতীয় নয়চাঁদ চৌধুরী জাহাঙ্গীর বাদসাহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় এই বংশীয় রামদেবের সহিত ১১ পরগণায় ৬৪২৪৯ টাকা রাজস্বে ইহা বন্দোবস্ত হয়। মীর কাশেমের সময় ইহার রাজস্ব ১১৯০৪০ টাকা হয়।

৭। চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত আটিয়া, কাগমারী, বড়বাজু, হোসেনসাহী প্রভৃতি ১০টি পরগণার ৬৭৮৮৩ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়। আইন-ই-আকবরীতে

কাগমারী পরগণার নাম নাই। সম্ভবতঃ তৎকালে উহা বড়বাজুর অন্তর্গত ছিল। সম্রাট সাহজহানের সময় সাহজমান নামক একজন পীর এই পরগণা প্রাপ্ত হন। সাহজমানের পর তদীয় অনুচর বাকলা নিবাসী যাদবেন্দ্র রায় উহা প্রাপ্ত হন। যাদবেন্দ্রের পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায় উহা প্রাপ্ত হন। তৎপর ইহা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বনাথ চৌধুরীর অধিকারে আসে। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে ইহা বিভক্ত হয়। মধ্যমপুত্র রামনাথ অপুত্রক থাকায় তাঁহার অংশ তাঁহার কন্যা শিবাণী প্রাপ্ত হন। শিবাণীর বংশীয়গণ আলোয়ার জমিদার নামে পরিচিত। মুর্শিদকুলির বন্দোবস্তে এই পরগণার উল্লেখ আছে। বড়বাজু পরগণা ঈশার্খার মৃত্যুর পর বেলকুচির আবজাল মহম্মদের হস্তগত হয়।

৮। শেলবর্ষ পরগণা—এই জমিদারী পূর্ব্বে দুনীচাঁদ ছত্রীর ছিল। তাঁহাকে উৎখাত করিয়া ১০৭৬ সালে (১৬৬৯-৭০ খৃঃ) সৈয়দ আহম্মদের সহিত ৩৭২০৩ টাকা রাজস্ব ধার্য্যে বন্দোবস্ত হয়। এক্ষণে এই জমিদারীর রাজস্ব ৫৭৪৩৫ টাকা ধার্য্য হইল।

৯। তাহেরপুর, বার্ব্বকপুর ও মসিদা এই তিন পরগণা ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের সহিত ৫৫,৭৯১ টাকা রাজস্বে বন্দোবস্ত হয়। তাহেরপুর এই সময় রাজা কংস নারায়ণের বংশধরগণের অধিকারে ছিল। পরবর্ত্তীকালে ঐ বংশের দৌহিত্র বংশে চলিয়া গিয়াছে। বার্ব্বকপুর পরে দুবলহাটির জমিদার বংশে গিয়াছে।

১০। চাঁদলাই প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহল—মুর্শিদাবাদ, আকবরনগর, ঘোড়াঘাট ও জাহাঙ্গিরনগর এই চারি চাকলায় বিক্ষিপ্ত ২৪টি তালুক ও ৭ পরগণা লইয়া ৫৫৭২৯ টাকা রাজস্ব ধার্য্যে নবাব সরকারের একজন প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারিকে এই জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। পরে ইহার বার আনা অংশ শত্রাজিৎ ও চার আনা ভোলানাথ প্রাপ্ত হয়।

১১। পাতলাদহ ও কুণ্ডী—চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত এই দুইটি তালুক ৭ পরগণায় ৬৭৬৩২ টাকা জমায় বন্দোবস্ত হয়। পরে ইহার অধিকাংশ রাজশাহী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১২। সন্তোষ দিগর—ঘোড়াঘাটের মধ্যগত ময়মনসিংহ জেলার এই দুইটি পরগণা ৯৪৮০৭ টাকা রাজস্ব ধার্যে রঘুনাথের নামে বন্দোবস্ত হয়। পরে ইহা দিনাজপুর ও ইদ্রাকপুর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৩। আলাপসিং ও ময়মন সিং—এই দুই পরগণা ৭৫৭৫৫ রাজস্বে টিকরার

মহম্মদ মেহেন্দীর নামে বন্দোবস্ত হয়। মুক্তাগাছার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য চৌধুরী নবাব সরকারে রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি আলাপ সিং পরগণা নিজনামে পরবর্ত্তীকালে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ বগুড়া জেলার ঝাকইর পরগণার জমিদার ছিলেন। প্রায় এই সময় শ্রীকৃষ্ণ তলাপাত্র নামক অপর একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নবাব সরকারে কানুনগো পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ (বগুড়া জেলার) তরফ কড়ই এর জমিদার ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তলাপাত্র ময়মনসিং (পরগণা মমিনসাহীর) জমিদারী প্রাপ্ত হন (১৭১৮ খৃঃ)। ইঁহার পুত্র চাঁদ রায় আলীবর্দ্দী খাঁর খালসা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী হন। ইনি পিতার নামে জাফরসাহী পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লন।

১৪। সাতসইকা—ইহা বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বধারে অবস্থিত। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় একরাম চৌধুরীর সহিত ৩ পরগণায় ৫১১৬৭ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়।

১৫। মহম্মদ আমিনপুর—এই জমিদারী বর্দ্ধমান ও হুগলীজেলায় ভাগীরথীর পশ্চিম তীর ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহার জমিদার উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কেশব দত্ত পাটুলীর রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কথিত আছে ইঁহারা রাজা গণেশের জ্ঞাতি ছিলেন। পরে ইঁহারা পৃথক হইয়া এক শাখা বাঁশবাড়ীয়া ও অপর শাখা সেওড়াফুলীতে বাস করেন। কেশব দত্তের সপ্তম পুরুষ রাজা রাঘব দত্ত বাঁশবেড়িয়ায় বাস করেন। ১৪ পরগণায় ইহার রাজস্ব ১৪০০৪৬ টাকা ধার্য্য হয়। মীর কাশেমের বন্দোবস্তে ইহার রাজস্ব ৩২৬৭৪৭ টাকা হইয়াছিল।

১৬। পাত্তাস, করদিহা ও ফতেজঙ্গপুর—চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ৯ পরগণায় ১০০৮৭৮ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়। পরে ইহা দিনাজপুর জমিদারী-ভুক্ত হয়।

১৭। পুখুরিয়া—জাফরসাহী—সরকার বাজুহার অন্তর্গত এই জমিদারীর ৫ পরগণায় ৫৪৫১৯ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়। পরে প্রথমটি রাজসাহী ও দ্বিতীয়টি জালালপুর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮। মাইহাটি—সরকার সাতগাঁর মধ্যস্থিত এই জমিদারী ১৫ পরগণায় ২৮৮৩১ টাকায় সীতারাম নামক এক ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত হয়।

১৯। হুজরীতালুকদারান্—মোটামুটি চাকলা মুর্শিদাবাদ ও সাতগাঁর মধ্যগত ২ পরগণায় মোট ৯৫৮২৫ টাকা ধার্য্যে ৯৮ জন ক্ষুদ্র তালুকদারের সহিত বন্দোবস্ত হয়। ইহারা খালসা সেরেস্তায় স্বয়ং রাজস্ব দিতেন।

২০। আকবর নগর বা রাজমহলের সায়রাৎ বা শুল্ক প্রভৃতি লইয়া ২ পরগণা ধরিয়া ৫৪৪৩২ টাকা জমা ধার্য্য হয়। পরে ইহা কাঁকজোল (কঙ্গল) জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

২১-২৪। অন্যান্য ক্ষুদ্র মহাল—সমগ্র সুবে বাঙলায় যে সকল মৌজা উল্লিখিত জমিদারীগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগকে একসঙ্গে ৮ পরগণা ধরিয়া লইয়া মোট ৪৮৯৯২ টাকা জমা ধার্য্য হয়।

এইরূপে সমস্ত মজকুরীতালুকের ১৩৬ পরগণায় ৭৮৫২০১ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়।

(২৫) সায়রাৎ মহাল (শুল্ক)।

১। চূণাখালি—১১৩০ সালে মুশিদাবাদ ও কাশিমবাজার প্রভৃতি নগর সমূহের আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের মাশুল ও হাটবাজার প্রভৃতির কর বাবদ ৩১১৬০৩ টাকা।

২। হুগলীবন্দর (বক্স বন্দর)—৩৭ খানি গঞ্জ ও বাজারের কর, মাশুল প্রভৃতি বাবদ মোট ৩৪২০০৮ টাকা। ইহা হইতে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কলিকাতার আয় ৪৪৭৬৭ টাকা বাদে ২৯৭৯৪১ টাকা।

৩। মুর্শিদাবাদের দার-উল-জারবের (টাকশালের) আয়—৩০৪১০৩ টাকা।

মোট সায়ের রাজস্ব—৯১৩৬৪৭ টাকা।

১৩৩৫ সালের সমগ্র খালসা ও সায়ের জমা (২৫ জমিদারীর মোট ১২১৬ পরগণায়)—১,০৯,১৮,০৮৪ টাকা।

জায়গীর জমা।

(১)	সুবাদারের নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জায়গীর		—৬০ পরগণায়	১০৭০৪৬৫৲
(২)	বাদসাহের প্রধান সেনাপতির	,,	,, —১৮ ,,	২২৫০০০৲
(৩)	ঢাকার নায়েব নাজিম	,,	,, —১৬ ,,	১০০১৪৫৲
(৪)	শ্রীহট্টের ফৌজদারের ও অন্য চারিজন সীমান্ত রক্ষকের	,,	,, —৪৮ ,,	১৭৯১৬১৲
(৫)	পূর্ণিয়ার ফৌজদারের	,,	,, —৯ ,,	১৮০১৬৬৲
(৬)	ঘোড়াঘাটের ফৌজদারের	,,	,, —৩ ,,	১৬৬৬৬৲
(৭)	রাজমহল ও তেলিয়াগড়ির ফৌজদারের	,,	,, —৪	
(৮)	মনসবদারান্ (সেনানীগণের)			
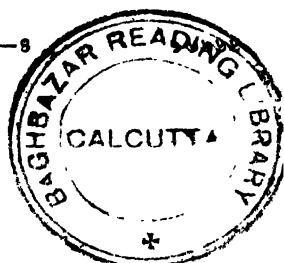
(শ্রীহট্ট, ঢাকা, হিজলী ও রাজমহলের

প্রান্তদেশ রক্ষার জন্য) ,, ,, —২০ ,, ১১০৮৫২৲

(৯) ত্রিপুরা, মাকোয়া, সুসঙ্গ[১], তেলিয়াগড়ি

এই চারিজন সীমান্ত জমিদারের জায়গীর ,, —২ ,, ৪৯৭৫০৲

(১০) মদৎমাস (ধর্ম্মার্থ দেয়) জায়গীর ,, —৭ ,, ২৫৬৬৫৲

(১১) শালীয়ান্ দারান্ (শ্রীহট্টের কয়েকজন

তালুকদারের বাৎসরিক বৃত্তি বাবদ) জায়গীর ৯ ,, ২৫৯২৭৲

(১২) দুইজন শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবীর (উত্তরাধিকারী

ক্রমে ভোগের জন্য) বৃত্তি বাবদ জায়গীর —১ ,, ২১২৭৲

(১৩) জনৈক মোল্লাকে প্রদত্ত নস্করপুরের অন্তর্গত জায়গীর ৩৩৭৲

(১৪) আমলে নাওয়ারা (নৌবিভাগ) জায়গীর

উপকূলভাগ ও নদীমুখে মগ, ফিরিঙ্গী প্রভৃতি জলদস্যুগণের উপদ্রব নিবারণার্থ এই নৌবিভাগ স্থাপিত হয়। বর্ণিত সময়ে ৯২৩ জন ফিরিঙ্গী (পর্ত্তুগীজ) এই বিভাগে নিযুক্ত ছিল। ৭৬৮ খানি সশস্ত্র রণতরী ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জায়গীর। ৫৫ পরগণায় মোট আয় ৭'৮৯৫৪৲

(১৫) আমলে আসাম—পূর্ব্ব বিভাগের সীমান্ত রক্ষার নিমিত্ত সেনানিবাসের ব্যয় বাবদ এই জায়গীর। ঢাকা প্রদেশে স্থাপিত ২৮২০ জন রক্ষকের জন্য ১৩ পরগণায় ১৩৫০৬০ টাকা; চট্টগ্রামের ৩৫২২ জনের জন্য ১১৭ কিসমতে ১৫০২৫১ টাকা, রাঙ্গামাটি বা কামরূপ অঞ্চলের ১৪৭৮ জনের জন্য ৪ পরগণায় ৬৩০৪৫ টাকা ও শ্রীহট্টের ২৮২ জনের জন্য ৪ পরগণায় ১০৮২৪ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। মোট ৮১১২ জন সৈনিকের জন্য ১৩৮ পরগণায় রাজস্ব—৩৫৯১৮০ টাকা।

(১৬) খেদা-আ-ফিল (হস্তী ধরিবার ব্যয়) বাবদ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টে এই জায়গীর ছিল। তাহার রাজস্ব—৪০১০১ টাকা। এতদ্ব্যতীত নিজ সরকারের খালসা সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারী ও মুৎসুদ্দীগণের পার্ব্বনী বাবদ আবওয়াব (অতিরিক্ত কর) ধার্য্য হইয়াছিল। ইহার নাম খাসনবিসী আবওয়াব।

১। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই সুসঙ্গ (দুর্গাপুর) পরগণা এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশের অধিকারে আছে। রাজা রঘুনাথ সিংহ বাদসাহী সৈন্য সাহায্যে গারো দিগকে দমন করেন এবং কর স্বরূপ অগুরু কাষ্ঠ প্রদান করেন। ইহার পৌত্র রামজীবন সিংহ প্রথম জমিদার হন ও বাদসাহী সনদ প্রাপ্ত হন।

খালসা ও সায়রাৎ—১২৫৬ পরগণায় ১০৯১৮০৮৪৲
জায়গীর প্রভৃতি—২১২ ,, ২১৪৯২৭২৲
সৈন্য বিভাগাদি—১৯২ ,, ১১৭৮২৩৫৲
১৬৬০ পরগণায় ১৪২৪৫৫৬১৲
অন্যান্য ৪২৬২৫৲
মুর্শিদকুলী খাঁর জমা কামেল তুমারী ১৪২৮৮১৮৬৲

মুর্শিদকুলীর শাসনের প্রথমে সৈয়দ একরাম খাঁ তাঁহার দেওয়ান ও ভূপতিরায় রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন (১৭১৭ খৃঃ)। ভূপতি রায়ের পর কাননগু রূপনারায়ণ ও রঘুনন্দন এই বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে রচিত মুর্শিদকুলী খাঁর এই কামেল তুমারী জমা তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ১৭২২ খৃঃ (হিঃ ১১৩৬) এই বন্দোবস্ত কার্য্য শেষ হয়। মুর্শিদকুলী যখন দেওয়ান হইয়া আসেন তখন সমগ্র বাঙলা বিদ্রোহাদিতে পূর্ণ ও সম্পূর্ণরূপে বেবন্দোবস্ত ছিল। এই সময় আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ এত অল্প ছিল যে সৈন্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য অন্য সুবা হইতে টাকা আনাইতে হইত (তারিখ-ই-বাঙলা)। কিন্তু এক্ষণে বাঙলার রাজস্ব স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ায় ঐ অসুবিধা দূর হইল। দেশের লোকও শান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিল।

১৭২৭ খৃঃ ৩০শে জুন মুর্শিদকুলী খাঁ পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সুবে বাঙলা একজন সুদক্ষ শাসক ও রাজস্বতত্ত্ববিদকে হারাইল। তারিখ-ই-বাঙলার রচয়িতা (১৭৬৩ খৃঃ) সলিমউল্লা ও ইহার গ্রন্থের ৮২ বৎসর পরে রচিত রিয়াজ-উস-সালাতিন রচয়িতা গোলাম হোসেন উভয়েই তাঁহাকে (আরঙ্গজেবের ন্যায়) গোঁড়া মুসলমান বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। "সকাল বেলা হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনি কোরান নকল করিতেন। তিনি ২০০০ কোরান পাঠক নিযুক্ত রাখিতেন। বিলাসিতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। সপ্তাহে দুই দিন তিনি স্বয়ং বিচার কার্য্য করিতেন, এজন্য কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। তাঁহার একমাত্র পরিণীতা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকে তিনি আসক্ত হন নাই।" (রিয়াজ)। তিনি গোঁড়া মুসলমান হইলেও তাঁহার হিন্দু প্রীতির অভাব ছিল না। তাঁহার অধীনে বহু হিন্দু উচ্চ পদ লাভ করিয়াছে ও বাঙলার জমিদারের প্রায় সকলেই হিন্দু ছিল। মুর্শিদকুলীর দৌহিত্রীর স্বামী সৈয়দ রজি খাঁ নায়েব দেওয়ান স্বরূপে রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ করিতেন।

১৭। সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ (১৭২৭-৩৯ খৃঃ)।

মুর্শিদকুলীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা জিন্নৎউন্নিসার বিবাহ আফসার তুর্কী বংশীয় সুজা উদ্দিন মহম্মদ খাঁর সহিত হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী জামাতাকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদ প্রদান করিয়াছিলেন। সুজা উদ্দিন দুশ্চরিত্র ছিলেন ও অন্য এক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য মুর্শিদকুলী তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজকে বাঙলার সুবাদারীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দ্দী[১] নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে ও পরামর্শে সুজাউদ্দিন তাঁহার অন্য ভার্য্যার পুত্র তকি খাঁকে উড়িষ্যায় রাখিয়া সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওনা হন। পথে বাদসাহী সনদ পৌঁছিল। পুত্র সরফরাজ বাধা দিতে উদ্যত হইল। ধর্ম্মপরায়ণা মাতা জিনৎউন্নিসার চেষ্টায় বিনা বাধায় সুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলীর চিহল সতুন প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সুবাদারী পদ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তিনি পুত্র সরফরাজ খাঁকে নামে মাত্র সুবে বাঙলার দেওয়ানী পদে বহাল রাখিলেন এবং অপর পুত্র তকি খাঁকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিমের পদে এবং জামাতা মুর্শিদকুলী (২য়)কে জাহাঙ্গিরাবাদের (ঢাকা) নায়েব নাজিমের পদ প্রদান করিলেন। আলিবর্দ্দী রাজমহলের ফৌজদার, তাঁহার ভ্রাতা হাজি মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র নোয়াজিস মহম্মদ চুণাখালির শুল্ক বিভাগের দারোগা, দ্বিতীয় পুত্র সইদ আহম্মদ রঙ্গপুরের ও কনিষ্ঠ পুত্র জইনউদ্দিন রাজমহলের নায়েব ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। হাজি আহম্মদ, রায় রায়ান আলম চাঁদ ও ফতে চাঁদ জগৎ শেঠকে[২] লইয়া সুজাখাঁর মন্ত্রীসভা গঠিত হইল।

১। আলিবর্দ্দীর পিতামহ আরঙ্গজেবের পালিত ভ্রাতা ও মনসবদার ছিলেন। আলিবর্দ্দীর পিতা মীর্জ্জা মহম্মদ আরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র আজম সার পেয়ালা বাহক ছিলেন। তাঁহার মাতা আফসার তুর্কী বংশীয়া ও সুজাউদ্দিনের আত্মীয়া ছিলেন। আলিবর্দ্দী আরব বংশীয় ছিলেন।

২। রাজপুতানার যোধপুর রাজ্যের নাগর নামক সহরে ইহার পূর্ব্বপুরুষের বাড়ী ছিল। এই স্থান হইতে ১৬৫৩ খৃঃ এই বংশীয় হীরানন্দ সা পাটনায় বাস করেন। তৎপুত্র মানিকচাঁদ ঢাকায় কুঠী স্থাপন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। মুর্শিদকুলীর অনুগ্রহে ইনি মুর্শিদাবাদের টাকশালের অধ্যক্ষ হন ও শেঠ উপাধি লাভ করেন (১৭১৫ খৃঃ)। ১৭২২ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ফতেচাঁদ বাদসাহ মহম্মদ সাহের নিকট জগৎ শেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন।

মুর্শিদকুলী খাঁর সময় খাজনা বাকী পড়ার জন্য যে সব জমিদার নজরবন্দী ছিলেন, সুজা উদ্দিন তাহাদের নিকট খাজনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মাত্র পাইয়াই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। মুর্শিদকুলীর ত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য ৬১০০০০০৲ টাকা কয়েকটি হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন দিল্লীতে প্রেরিত হইল। বর্ষশেষে রাজকরের সহিত অন্যান্য উপহারও প্রেরিত হইল। বাদশাহ সুজা খাঁকে মোতোমন উল্ মুল্ক সুজাউদ্দিন বাহাদুর আসদ্ জঙ্গ উপাধি, সাতহাজারী মনশবদারী ও ঝালরদার পাল্কী দিলেন।

অত্যল্পকাল পরে পাটনার শাসনকর্ত্তা ফকর উদ্দোলা পদচ্যুত হইলে বাদশাহ মহম্মদ সার অনুগ্রহে সুজাউদ্দিন বিহারেরও সুবাদারী লাভ করিলেন (১৭৩৩ খৃঃ) এবং সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া আলিবর্দ্দী খাঁকে বিহারের নায়েব সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। আলিবর্দ্দী বিহারের নায়েব সুবাদার হওয়ার সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগম সিরাজদ্দোলাকে প্রসব করায় অপুত্রক আলিবর্দ্দী এই দৌহিত্রকেই তাঁহার সৌভাগ্যের কারণ মনে করিয়া তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইলেন এবং বালককে মীর্জ্জা মনসুর মহম্মদ নাম দিয়া তাহার পিতামাতাসহ সঙ্গে লইয়া পাটনায় গেলেন।

সুজার জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী ঢাকায় নায়েব নাজিম পদে থাকাকালে তাহার অনুগত মীর হবিব নামক এক পারসিক যুবক তাঁহার নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হন। নানা বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ও কয়েক প্রকার দ্রব্যের একচেটিয়া বাণিজ্য নিজ হস্তে রাখিয়া তিনি প্রভুর যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া দিলেন। জালালপুরের জমিদার নুরউল্লাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নিহত করিয়া তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। ত্রিপুরা রাজের ভ্রাতুষ্পুত্র জগৎরাম নির্ব্বাসিত হইয়া ঢাকায় মীর হবিবের সাহায্যপ্রার্থী হইলে মীর হবিব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে ত্রিপুরা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। নবাবী সৈন্য ত্রিপুরার সীমায় প্রবেশ করিলে রাজা গোবিন্দ মাণিক্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। সমগ্র সমতল প্রদেশ মীর হবিবের পদানত হইল। চণ্ডীগড় ও জয়ন্তী দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ লাভ করিলেন। মীর হবিব ত্রিপুরার এই অংশ কুমার জগৎ রামের সহিত বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা রাজস্বে জমিদারী বন্দোবস্ত করিলেন এবং কিয়দংশ সৈন্যসহ তথায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। সুজা খাঁ বহুমূল্য উপহারসহ ত্রিপুরা বিজয়ের সংবাদ পাইয়া ত্রিপুরার নাম রোসেনাবাদ রাখিলেন।

অতঃপর উড়িষ্যার নায়েব নাজিম তকি খাঁর মৃত্যু হইলে, মুর্শিদকুলী (২য়)

তৎপদে নিযুক্ত হইলেন (১৭৩৪ খৃঃ)। ঢাকার নায়েব নাজিমী পদে সরফরাজকে নিযুক্ত করা হইল এবং কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তথায় ঘালেব আলি খাঁকে প্রেরণ করা হইল। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমলের মুন্সী যশোবন্ত রায় দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। বৈদ্য রাজবল্লভ এই সময় যশোবন্ত রায়ের মুহুরীর পদ লাভ করায় তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত হইল।

যশোবন্ত রায়ের কার্য্যদক্ষতায় ঢাকা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জনপদ পুনরায় শস্য সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সায়েস্তা খাঁর নবাবী আমলে এখানে চাউলের দর টাকায় আট মণ হওয়ায়, তিনি ঢাকার পশ্চিম দিকে একটি তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর লিখিয়া ছিলেন যে 'যে রাজার আমলে টাকায় আটমণ চাউল বিক্রয় না হইবে তিনি যেন এই তোরণদ্বার উন্মুক্ত না করেন।' যশোবন্ত রায়ের শাসনগুণে পুনরায় টাকায় আটমণ দরে চাউল বিক্রীত হওয়ায় এই সময় মহা আড়ম্বরে ঐ তোরণদ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ঘালেব খাঁকে সরাইয়া ঢাকার নায়েব সুবাদারী পদে জমীদারদের বিখ্যাত উৎপীড়ক রজী খাঁর পুত্র মুরাদ খাঁকে নিযুক্ত করা হয়। ইনি তথায় নৌবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। সরফরাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার এই পদোন্নতি হইল। ঢাকায় আবার অত্যাচার অবিচার আরম্ভ হইল। নায়েব নবাবের ব্যবহার দেখিয়া যশোবন্ত রায় পদত্যাগ করিলেন। রাজবল্লভ এই সময় মাওয়ারা বিভাগের পেস্কার হন।

হাজি আহম্মদের পুত্র সইদ্ আহম্মদ রঙ্গপুরের ফৌজদার হইয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে ঐ অঞ্চল উৎপীড়িত হইতে থাকে। তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে সৈন্য আনাইয়া দিনাজপুর ও কোচবিহার আক্রমণ করিয়া যথা সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবৃত হইলেন।

বীরভূমের জমিদার বাদী উল জমান বিদ্রোহী হন। কিন্তু দ্বিতীয় সেনাপতি মীর সরিফুদ্দিন ও খোজা বসন্ত সসৈন্যে বীরভূমে প্রবেশ করিলে উক্ত জমিদার এক লক্ষ টাকা পেস্কশ (জরিমানা) দিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এই সকল ঘটনা সত্ত্বেও সুজাউদ্দিনের সময় সুবে বাঙলায় মোটামুটি শান্তি বিরাজ করিতেছিল। সুজাউদ্দিন সুবিচারক, বন্ধুবৎসল, দানশীল, বিশেষতঃ কর্ম্মচারী ও অনুচরবর্গের প্রতি দানে, বন্ধুবর্গের প্রীতিভোজে ও গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানে ও উৎসবাদিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় বিলাস ব্যসনে ও নারী সহবাসে অতিবাহিত হওয়ায় রাজকার্য্য অবহেলিত হইয়াছিল। মুর্শিদকুলীর প্রাসাদের পরিবর্ত্তে নিজ অভিরুচি অনুসারে তিনি সুসজ্জিত সুরম্য বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং নবাবী কেল্লার সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিম

তীরে ফররাবাগ বা আনন্দকুঞ্জ নামে বহুমূল্য প্রমোদভবন নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। মন্ত্রীগণের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া এই প্রমোদভবনেই তিনি অধিকাংশ সময় নারীগণসঙ্গে অতিবাহিত করিতেন।

তাঁহার এই বিলাস ব্যসনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহার শাসন কালে কয়েকটি অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিতে হইয়াছিল। (১) নজরানা মোকররী, (২) জার মাথেট (নজর সওয়ারী)[১] (৩) মাথট পিলখানা ও (৪) আবওয়াব ফৌজদারী এই চারি প্রকার অতিরিক্ত করে উনিশলক্ষ টাকারও অধিক আদায় হইত। তাহা সমস্তই নবাবী আড়ম্বরে ও বিলাসিতায় ব্যয়িত হইত।

সুজাউদ্দিনের শাসনকালে আয় বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যশুল্ক বিষয়েও অনেকগুলি নূতন নিয়ম ও শুল্ক ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে কেবল হুগলী ও আজিমগঞ্জে শুল্ক ঘাঁটি ছিল। হলওয়েলের বিবরণে দেখা যায় যে এক্ষণে আরও ২০টি নূতন ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছিল।

সুজাউদ্দিন ক্রমশঃ রাজকার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইলে হাজি আহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠের উপরই রাজকার্য্যের সমস্ত ভার অর্পিত হয়। এই সময় হইতেই হাজি আহম্মদের মনে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী হস্তগত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ্চ (১১৫১ হিঃ ১৩ই জেলহজ্জ) নবাব সুজাউদ্দিন পরলোক গমন করেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দৃষ্টান্ত অনুসারে তিনি ভাগীরথীর অপর পারে কেল্লার সম্মুখে স্বীয় সমাধিভবন ও মসজিদ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডাহাপাড়া রোশনীবাগে সুজাউদ্দিনের সমাধি দৃষ্ট হয়। মসজিদের "রওনাক আজ বাঙলা রপ্ত" লিপি হইতে ১১৫৬ হিঃ অব্দ পাওয়া যায়। সম্ভবত মসজিদ আলিবর্দ্দীর সময় সমাপ্ত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে সুজা তাঁহার কর্ম্মচারীগণকে দুইমাসের বেতন পুরস্কার দেন ও তাঁহার কাহারও নিকট কোন অপরাধ থাকিলে তাহা ক্ষমা করিতে বলেন।

১৮। সরফরাজ খাঁ আলা-উ-দ্দৌলা হায়দর জঙ্গ (১৭৩৯-৪০ খৃঃ)।

অতঃপর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র ও সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁ

১। জার = টাকা। মাথট = আরবী মাং হেট। শস্যক্ষেত্র মাড়াইয়া অশ্বারোহী সৈন্য যাইবে না এই অনুগ্রহের জন্য প্রজার উপর ধার্য্য কর।

আলা-উ-দ্দৌলা হায়দর জঙ্গ উপাধি গ্রহণ করিয়া সুবে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার (নবাব) হন। কিছুকাল পর তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের পরামর্শে প্রধান দেওয়ান হাজি আহম্মদকে রাজকার্য্য হইতে অবসর দেন। এই সময় হইতেই হাজি নবাব সরফরাজকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নবাব সরফরাজ রাজকার্য্য অপেক্ষা বিলাসব্যসনেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার হারেমে (অন্তঃপুরে) ১৫০০ নারী ছিল।[১] এই সমস্ত নারী অথবা স্বার্থান্বেষী চাটুকার, ধর্ম্মব্যবসায়ী ও দুশ্চরিত্র বন্ধুগণের সহিত তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। এই সুযোগে হাজিআহম্মদ ও আলিবর্দ্দী বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী পদ লাভের জন্য চেষ্টিত হইলেন। বাদশাহ মহম্মদ সাহের বিশেষ প্রিয়পাত্র ইসাকর্খা (১ম) আলিবর্দ্দীর বন্ধু ছিলেন। আলিবর্দ্দী তাঁহার সাহায্যে বাদসাহের নিকট হইতে আলিবর্দ্দীর নামে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদারী সনদ ও সরফরাজকে বলপূর্ব্বক পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা পত্র পাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তৎপরিবর্ত্তে আলিবর্দ্দী সম্রাটকে এককোটি মুদ্রা নজর ও বাৎসরিক কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইলেন। নাদিরসার দিল্লীধ্বংসের পর দারুন অর্থসঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় হীনবল সম্রাট মহম্মদ সাহের দরবারে ঘুষের রাজত্ব চলিতেছিল।

উক্তরূপ ব্যবস্থা পাকা করিয়া আলিবর্দ্দী ১৭৪০ খৃঃ মার্চ্চমাসের শেষভাগে সসৈন্যে পাটনা হইতে রওনা হইলেন। ৭০০০ অশ্বারোহী, বহু পদাতিক ও কামান তাঁহার সহিত চলিল। রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া সাহাবাদ ও তেলিয়াগড়ী গিরিপথ অতিক্রম করিয়া তিমি চাকলা আকবর নগরের সীমায় বিনাবাধায় প্রবেশ করিলেন। হাজিআহম্মদের জামাতা আতাউল্লা খাঁ এই এই সময় রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন। শ্বশুরের গোপন পরামর্শে আতাউল্লা সমস্ত সংবাদ চাপিয়া রাখায় আলিবর্দ্দীর এই অভিযানের সংবাদ তখন পর্য্যন্ত নবাব সরফরাজের কর্ণগোচর হয় নাই। এইসময় আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গ মুর্শিদাবাদেই ছিলেন। তাহাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া, আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আলিবর্দ্দী সরফরাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন "আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজি আহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের অবমাননার

১। প্রবাদ আছে যে সরফরাজ জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সুন্দরী পুত্রবধূকে নিজ গৃহে লইয়া যান। ইহাতে ফতেচাঁদ অবমানিত বোধ করিয়া আলিবর্দ্দীর সহিত যোগ দিয়া সরফরাজকে পদচ্যুত করিতে সাহায্য করেন। (আর্মির ইতিহাস)

সংবাদ শুনিয়া আমি আপনার অনুমতি না লইয়াই এতদূর অগ্রসর হইয়াছি। মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই। তাঁহাদিগকে নিরাপদে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেই আমি ফিরিয়া যাইব।" সেনাপতি ঘৌস খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া অদূরদর্শী সরফরাজ বৃদ্ধহাজিকে পরিবারবর্গসহ আলিবর্দ্দীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই ভুলই নবাবের পক্ষে মারাত্মক হইল। কারণ হাজি আহম্মদ সপরিবারে আলিবর্দ্দীর শিবিরে পৌঁছিবার পর আলিবর্দ্দী কালবিলম্ব না করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে সুতী হইতে চড়কাবালিঘাটা পর্য্যন্ত শিবির স্থাপন করিলেন। অবস্থা দৃষ্টে সরফরাজও সসৈন্যে ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে গিরিয়ায় আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং তাঁহার সেনাপতি ঘৌস খাঁ সসৈন্যে পরপারে বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। আলিবর্দ্দীও তাঁহার বিশ্বস্ত হিন্দু সেনাপতি নন্দলালের অধীনে অর্দ্ধাংশ সৈন্য স্বীয় পতাকাসহ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে রাখিয়া তাঁহার দুই দল উৎকৃষ্ট আফগান সৈন্য লইয়া নিশাযোগে ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যুষেই নবাব শিবিরে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। একটি গোলা নবাবের তাম্বুর ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। সরফরাজের বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ তাঁহাকে পলায়ন করিতে বলিল কিন্তু নবাব উপাসনা শেষ করিয়া কোরাণ হস্তে হস্তীপৃষ্ঠে উঠিলেন এবং অসীম সাহসে শত্রুর দিকে সৈন্য চালনা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর নবাবের অধিকাংশ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। নবাব তখনও সতেজে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার হস্তীপক প্রভুর প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়নে উদ্যত হইলে তাহাকে তিরস্কারে করিয়া নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিপক্ষের একটি গোলা আসিয়া তাঁহার মস্তক বিদ্ধ করায় তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। যুদ্ধের সময় সেনাপতি মীর হবিব, রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ ও সমসের খাঁর দল যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শক মাত্র ছিলেন। মন্ত্রী আলম চাঁদ যুদ্ধে আহত হইয়া পশ্চাদপদ হন। গৃহে ফিরিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। নদীর পশ্চিম পারে প্রধান সেনাপতি ঘৌস খাঁ নন্দলালকে পরাভূত ও নিহত করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু সরফরাজের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ভগ্নহৃদয়ে পুত্রদ্বয় সহ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দ্বিতীয় সেনাপতি সরীফুদ্দিন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। পরে কোন আশা না দেখিয়া পলায়ন করিলেন (১৭৪০ খৃঃ ৯ এপ্রিল)।

জমাদার বিজয় সিংহ খামরার মাঠে নবাব সৈন্যের পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতে ছিলেন। অগ্রসর হইয়া অনেক বিপক্ষকে হতাহত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার নবমবর্ষ-বয়স্ক পুত্র জালিম সিংহ মৃত পিতার দেহ রক্ষার্থ

অসি হস্তে দণ্ডায়মান হইল। আলিবর্দ্দী এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বালককে রক্ষা করিবার আদেশ দিয়া তাহার পিতার মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অদ্যাপি এই স্থান জালিম সিংহের মাঠ নামে পরিচিত।

গিরিয়ার যুদ্ধে এইরূপে জয়লাভ করিয়া দুই দিন পর আলিবর্দ্দী মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। সরফরাজের মৃতদেহ যুদ্ধের দিন রাত্রেই আনীত হইয়াছিল। সরফরাজের পুত্র মীর্জ্জা আমানী ও তাহাদের আত্মীয়বর্গ রাত্রিযোগে নাকুটাখালীর বাড়ীতে উহা সমাহিত করিয়াছিলেন পরে আলিবর্দ্দী নগর অধিকার করিয়া প্রথমে সরফরাজ জননী জিন্নেতুন্নেছার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাদিগকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। সেখানে কোন উত্তর না পাইয়া দরবারে প্রবেশ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন (১৭৪০ খৃঃ ১২ই এপ্রিল)।

১৯। আলিবর্দ্দী খাঁ মহব্বৎ জঙ্গ (১৭৪০-৫৬ খৃঃ)।

নবাব হইয়া আলিবর্দ্দী জ্যেষ্ঠ জামাতা (ঘেসেটি বেগমের স্বামী) নওয়াজিস মহম্মদকে ঢাকার নায়েব সুবাদার ও হোসেন কুলী খাঁকে তাঁহার নায়েব নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা আহম্মদ খাঁ (শাহবেগমের স্বামী) পূর্ণিয়ার ও কনিষ্ঠ জামাতা (আমিনা বেগমের স্বামী) জয়েন উদ্দিন বিহারের সুবাদার হইলেন। তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা আব্দুল আলিখাঁ (ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের মাতুল) ত্রিহুতের নায়েব সুবাদার ও বিহার পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ভগ্নীপতি কাসীম আলী খাঁ রঙ্গপুরের ফৌজদার, নছরউল্লা বেগ খাঁ নূতন সেনাবিভাগের খাজাঞ্চি ও হায়দর আলি খাঁ নবাবের কামান সমূহের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগ্নীর স্বামী মীর মহম্মদ জাফর খাঁ সৈন্য পরিসংখ্যার দেওয়ান ও পরে মীর বক্সী (প্রধান সেনাপতি) পদ লাভ করেন। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ জানকীরাম সোম প্রথমতঃ দেওয়ানীতন্ ও পরে রাজোপাধিসহ সামরিক বিভাগের প্রধান দেওয়ানী পদ এবং রাজস্ব বিভাগের অভিজ্ঞ নায়েব দেওয়ান লালা কায়স্থ চিন্ময় রায় রায় রায়ান্ উপাধি সহ রাজস্ব সচিব পদ লাভ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন মধ্যে আরও অনেকে নূতন নূতন পদ পাইলেন।

সিংহাসন অধিকার করিয়া আলিবর্দ্দী মুর্শিদকুলীর সময় হইতে সঞ্চিত অগাধ ধন রত্নের অধিকারী হইয়াছিলেন। বাদসাহ মহম্মদ সার নিকট পেস্কশ (উপঢৌকন) স্বরূপ প্রায় কোটী পরিমাণ টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইল। বাদশাহ দরবার হইতে আলিবর্দ্দী "সুজা-উল-মুলক হেসামদ্দৌল্লা

(রাজ্যমধ্যে বীরকেশরী, রাজ্যের তরবারী) উপাধি ও সাতহাজারী মনসবদারী প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণের পর ক্ষমতাহীন নামমাত্র বাদসাহের ফরমানের দোহাই দিয়া রাজ্য অধিকার ন্যায়সঙ্গত করিয়া লওয়া হইত।

সমগ্র ব্যবস্থা ঠিক করিয়া আলিবর্দ্দী উড়িষ্যার সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিলেন। সুজাউদ্দিনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার ছিলেন। আলিবর্দ্দী তাঁহাকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মুর্শিদকুলী তাঁহার স্ত্রী দুর্দ্দানা বেগম ও জামাতা বাখর খাঁর প্ররোচনায় তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সুতরাং আলীবর্দ্দী তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে মেদিনীপুরের পথে উড়িষ্যায় প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে ময়ুরভঞ্জের রাজা রঘুনাথ ভঞ্জ সুবর্ণরেখা নদীতীরে রাজঘাটে বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু নবাবী কামানের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। আলিবর্দ্দীর সৈন্যদল সুবর্ণরেখা পার হইয়া বালেশ্বরের সম্মুখে রামচন্দ্রপুরে বিপক্ষের দুর্ভেদ্য ব্যূহ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। স্থানীয় জমিদারদের বিপক্ষতার জন্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় আলিবর্দ্দী যখন দোদুল্যমান চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মুর্শিদকুলীর (অন্য নাম রস্তম জঙ্গ) জামাতা বাখর খাঁ তাহাদের ঘাঁটি ফুলওয়ারী হইতে অগ্রসর হইয়া সহসা আলিবর্দ্দীর সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল। আলিবর্দ্দী ও তাঁহার বেগমের হস্তীদ্বয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ক্রোশাধিক দূরে বিতাড়িত হইল। তাঁহার সৈন্যদলের এক অংশ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় বামপার্শ্ব রক্ষক সেনাপতি মীরজাফর খাঁ কতক সৈন্য লইয়া দ্রুতগতি পলায়িত সৈন্যদলের সাহায্যে উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে বাখরের সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। স্বয়ং বাখর খাঁ জামাতা সহ এক বাণিজ্য পোতারোহণে মছলীপত্তনে পলাইয়া গেল। শেষে খুর্দ্দার জমিদারের সাহায্যে তদীয় সেনাপতি সা মুরাদ তাহাদিগকে গঞ্জামে লইয়া যায়। তথা হইতে তাহারা মীর্জ্জা বাকরের নিকট চলিয়া যায়।

আলিবর্দ্দী একমাস উড়িষ্যায় থাকিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁ (ওরফে মহম্মদ উদ্দৌলা সওকং জঙ্গ)কে তথাকার নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ১৭৪১ খৃঃ আগষ্ট মাসে মীর্জ্জা বাকর একদল মারহাট্টা সৈন্য লইয়া কটকে পুনরায় প্রবেশ করিয়া সৌকং জঙ্গকে সপরিবারে বন্দী করিয়া বরাবাটি দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

এই সংবাদে আলিবর্দ্দী বিচলিত হইয়া ২০০০০ অশ্বারোহী ও উপযুক্ত

কামান সহ মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিলেন এবং মহানদীর দক্ষিণ তীরে রায়পুরে পৌঁছিয়া তথায় মীর্জ্জা বাকরকে পরাজিত করিয়া সৌকতজঙ্গকে সপরিবারে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন (১৭৪১ খৃঃ ডিসেম্বর)। মীর্জ্জা বাকর পুনরায় খুর্দ্দার রাজার সাহায্যে পলায়ন করিল। আলিবর্দ্দী পাঁচ হাজার সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সহ সৌকতজঙ্গকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

অতঃপর উড়িষ্যার সুশাসনের জন্য আলিবর্দ্দী তিন মাস কাল তথায় অবস্থান করিলেন। পানিপথ নিবাসী তাঁহার বন্ধু সেখ মাসুমকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম ও রাজা জানকীরামের পুত্র দুর্লভরামকে তাঁহার পেস্কার নিযুক্ত করিয়া তিনি বাঙলায় প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মেদিনীপুরের নিকট জয়গড়ে আসিয়া তিনি তাঁহার একজন রাজস্ব আদায়কারীর নিকট শুনিলেন মহারাষ্ট্র ফৌজ পঞ্চকোটের ভিতর দিয়া বাঙলায় প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছে। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার মোবার মঞ্জিলে (বর্দ্ধমানের প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত সাহিন বান্দী) আসিয়া শুনিলেন তাহারা বর্দ্ধমান জেলা লুণ্ঠন করিয়াছে। তিনি দ্রুত গমন করিয়া ১৭৪২ খৃঃ ১৫ই এপ্রিল বর্দ্ধমানে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন যে মারহাট্টারা তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একদল ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে, আর একদল বর্দ্ধমান সহরের ৪৫ মাইল পর্য্যন্ত লুণ্ঠন কার্য্যে রত হইয়াছে। আলিবর্দ্দী দশ দিন এইরূপে বর্দ্ধমানে অবস্থান করিয়া ২৫শে এপ্রিল অনশন-ক্লিষ্ট সেনাদল সহ মুস্তাফা খাঁর সাহসী আফগান অশ্বারোহীর ও কামানের গোলাবর্ষণ দ্বারা মারহাট্টা ব্যূহ ভেদ করতঃ ২৬শে এপ্রিল কাটোয়ায় পৌঁছিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে যাইয়া নিগুন সরাইয়ে মুশাহিব খাঁ প্রাণ দিল। শীঘ্রই যথেষ্ট রসদ ও সেনা আসিয়া কাটোয়ায় আলিবর্দ্দীর বলবৃদ্ধি করিল।

আলিবর্দ্দী নিরাপদে কাটোয়ায় পৌঁছিলে, ভাস্কর পণ্ডিত বর্ষাকালে বাঙলায় থাকা নিরাপদ ও লাভজনক হইবে বলিয়া মনে করিলেন না এবং শীঘ্রই নাগপুরে ফিরিয়া যাওয়ার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় রুস্তম জঙ্গের সহকারী মীর হবিব তাঁহার নিকট আসিয়া অরক্ষিত রাজধানী মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনের জন্য তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিলেন। ৭০০ বাছাই করা মারহাট্টা অশ্বারোহী ১৭৪২ খৃঃ ৬ই মে রাত্রিতে প্রায় ৪০ মাইল অতিক্রম করিয়া মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে ডাহাপাড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইল এবং তথাকার বাজার লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত করিয়া ভাগীরথী পার হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিল। নির্ব্বিবাদে একদিন সহরটি লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ করিল। একমাত্র

জগৎ শেঠের গৃহ হইতেই তিনলক্ষ টাকা লুণ্ঠিত হইল। কিন্তু ৭ই মে আলিবর্দ্দী সসৈন্যে আসিয়া পড়ায় লুণ্ঠনকারীরা কাটোয়ায় পলাইয়া গেল। যাইবার পথে সমস্ত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া গেল।

১৭৪২ খৃঃ জুন হইতে কাটোয়া মারহাট্টাদের প্রধান আড্ডায় পরিণত হইল। মীর হবিবের পরামর্শে হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ রজাকে বন্দী করিয়া (জুলাই তথায় শিবরাওকে ফৌজদার করা হইল। অতঃপর ভাগীরথীর পশ্চিমপারের প্রায় সমস্ত পশ্চিম বঙ্গ মারহাট্টাদের অধিকারে চলিয়া গেল। শিব রাও সুবে বাঙলার এই অংশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। মীর হবিব তাঁহার দেওয়ান ও উপদেষ্টা নিযুক্ত হইলেন।

অত্যাচার পীড়িত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের লোকেরা দলে দলে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্ব তীরস্থ গ্রাম সমূহে চলিয়া যাইতে লাগিল। পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র গ্রাম ও নগর বর্গীর উৎপাতে উৎসন্ন যাইতে লাগিল।

ইংরেজগণ এক্ষণে আলিবর্দ্দী খাঁর অনুমতি লইয়া কলিকাতার তিন দিকে গড় খাত নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। বণিকগণের নিকট হইতে প্রায় ২৫০০০ টাকা উঠাইয়া স্থানীয় লোকদের দ্বারা বিনা ব্যয়ে ছয়মাসে তিন মাইল গড় খাত খনিত হইয়াছিল। এই সময়েই কাশিমবাজারের কুঠির চারিদিকেও ইষ্টক প্রাচীর ও চারি কোণে চারিটি বুরুজ নির্ম্মিত হয় এবং কলিকাতার অধিবাসী ইউরোপীয় ফিরিঙ্গী ও আর্ম্মানীগণকে লইয়া একটি স্বেচ্ছা সৈন্যদল গঠিত হয় এবং নিয়মিত সৈন্যদলে আরও কতকগুলি নূতন লস্কর লওয়া হয়; এতদ্ব্যতীত দুর্গ সংস্কার ও কামান বন্দুক প্রভৃতিও যথেষ্ট সংগ্রহ করা হয়।

বর্ষাকাল মধ্যেই আলিবর্দ্দী যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। বিহার হইতে কনিষ্ঠ জামাতা জইন উদ্দিন সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। বর্ষা শেষ হওয়া মাত্র নবাব সসৈন্যে কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন বর্গীগণ পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র কর আদায় ও লুঠতরাজ, নরহত্যা, গৃহদাহ, নারী ধর্ষণাদি করিয়া বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। ভাস্কর রাম দাঁইহাটে দুর্গোৎসবের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন করিয়াছিল। নিশাযোগে নৌসেতুর সাহায্যে নবাবী সৈন্যের অগ্রগামীদল নদী পার হইল। সেই দুই তিন সহস্র সৈন্য লইয়া সেনাপতি মুস্তাফা ও মীরজাফর অতি প্রত্যূষে সবেগে মারহাট্টা শিবির আক্রমণ করিল। অতর্কিত আক্রমণে মারহাট্টা সৈন্য ভীতিগ্রস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ভাস্কর পণ্ডিত নবমী পূজা শেষ না করিয়াই সেই পলায়মান সৈন্যদের সহিত পলায়নে বাধ্য হইলেন (১১৪৯ সাল, আশ্বিন)। ইতিমধ্যে

অবশিষ্ট সৈন্য, কামান ও হস্তিআদি সহ নবাবও নদী পার হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত নবাবী সৈন্য ভাস্কর পণ্ডিতের পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইল। ভাস্কর পণ্ডিত মীর হবীবের নির্দ্দেশ মত বিষ্ণুপুরের বনভূমির মধ্য দিয়া মেদিনীপুরের পথে উড়িষ্যায় প্রবেশ করিল। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মাসুমকে অগ্রগামী বর্গীগণ পরাভূত ও নিহত করিয়াছিল কিন্তু নবাবী সৈন্যগণ দ্রুতগতিতে তথায় উপস্থিত হইয়া বর্গীগণকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। অন্যতম সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর আত্মীয় আব্দুল নবী খাঁকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া নবাব বাঙলায় ফিরিয়া গেলেন। বর্গীগণও স্বদেশে প্রস্থান করিল।

১৭৪৩ খৃঃ মার্চ্চ মাসে নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোঁসলে ভাস্কররামকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় বহু অশ্বারোহী সৈন্যসহ কাটোয়ায় আসিলেন। দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮ খৃঃ) মহারাষ্ট্রপতি রাজা সাহুকে (১৭০৮-৪৯ খৃঃ) বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার চৌথ আদায়ের ক্ষমতা দিয়াছিলেন এবং সাহু রাজা বাঙলার চৌথ আদায়ের ভার রঘুজি ভোঁসলের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে রঘুজি কাটোয়ায় আসিয়া চৌথ আদায়ের নামে পশ্চিম বাঙলায় পুনরায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ১৭৪২ খৃঃ নভেম্বর মাসে দিল্লীশ্বরের সহিত পেশোয়া বালাজি বাজীরাওএর (১৭৪০-৬১ খৃঃ) চুক্তি হইয়াছিল যে পেশোয়া বালাজি রাজা রঘুজিকে বাঙলা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবেন। তদনুসারে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে প্রচুর সৈন্যসহ বিহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে সাঁওতাল পরগণার বনভূমি ও পাহাড়ের মধ্য দিয়া বীরভূমে প্রবেশ করতঃ তথা হইতে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। উভয় সঙ্কটে পড়িয়া পথিমধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বহরমপুর হইতে দশ মাইল দক্ষিণে চৌরিয়াদীঘীতে আলিবর্দ্দী সন্ধি প্রস্তাব লইয়া পেশোয়ার সহিত সাক্ষাত করিলেন (১৭৪৩ খৃঃ ৩০শে মার্চ্চ)। স্থির হইল যে আলিবর্দ্দী সাহু রাজকে সুবে বাঙলার চৌথ দিবেন এবং পেশোয়া বালাজিকে তাঁহার অভিযানের ব্যয় বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দিবেন। অপর দিকে রঘুজি ভোঁসলা যাহাতে বাঙলা হইতে অবিলম্বে প্রস্থান করে এবং আর বাঙলায় প্রবেশ না করে, পেশোয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তদনুসারে পেশোয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া রঘুজি ভোঁসলকে আক্রমণ করিলেন ও রঘুজির বহু সৈন্য হতাহত করতঃ তাহাকে মানভূমের মধ্যদিয়া সম্বলপুরের পথে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং পুনা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রায় নয় মাস যাবৎ অবস্থা শান্ত ছিল কিন্তু ১৭৪৩ খৃঃ ৩১শে আগষ্ট রঘুজি ও বালাজি উভয়ে রাজা শাহুর দরবারে তাহাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইলে রাজা সাহু মীমাংসা করিয়া দেন যে পাটনার পশ্চিমে সাহাবাদ, টিকারী প্রভৃতি বিহারের যে অংশ হইতে ১২০০০০০ টাকা চৌথ আদায় হয় তাহা পেশোয়া আদায় করিবেন এবং বিহারের অবশিষ্ট অংশ ও বাঙলা ও উড়িষ্যার চৌথ রঘুজি আদায় করিবেন। এই মীমাংসার পর ১৭৪৪ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় দলবল লইয়া উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া পশ্চিম বাঙলায় প্রবেশ করিল।

মারহাট্টাদের শঠতাপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব উপায়ন্তর না দেখিয়া নিজেও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করা স্থির করিলেন। তাঁহার পাঠান সেনাপতি গোলাম মুস্তাফা খাঁ ও দেওয়ান জানকীরামের সহিত পরামর্শ করিয়া বাঙলার চৌথ সম্বন্ধে আপোষে মীমাংসার জন্য তিনি ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁহার প্রধান প্রধান অনুচরগণকে মানকারা নামক স্থানে (বহরমপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে) নবাব শিবিরে আহ্বান করিলেন। ১৭৪৪ খৃঃ ৩১শে মার্চ্চ তথায় এক দরবারে ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁহার ২১ জন সেনানায়ক সরল বিশ্বাসে প্রবেশ করিবামাত্র পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিবিরের পার্শ্বে লুক্কায়িত সশস্ত্র নবাবী ঘাতকগণ দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। অসুস্থতা হেতু একমাত্র মারহাট্টা সেনানায়ক রঘুজি গায়কয়াড় দরবারে উপস্থিত না থাকায় মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া যান এবং তিনি মারহাট্টা সৈন্যদল লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিতে সমর্থ হন। এই সময় নবাবের অর্থাভাব মিটাইতে কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানী সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ও নবাবের পারিষদগণ ৪৩৫০০ টাকা এবং চন্দন নগরের ফরাসী কোম্পানী ৪৫০০০ টাকা নবাবকে দিতে বাধ্য হয়।

নবাবের সৈন্যদলের অধিকাংশই বিহারের আফগান ছিল। এই আফগানগণের প্রধান নেতা গোলাম মুস্তাফা খাঁ নবাবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি ভাস্কর পণ্ডিত ও তাহার সেনানীগণের হত্যা করার পুরস্কার স্বরূপ বিহারের নায়েব নাজিমের পদ দাবী করেন। কিন্তু নবাব অস্বীকৃত হওয়ায় মুস্তাফা পদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার অধীনস্থ ৯০০০ অশ্বারোহী ও প্রায় অনুরূপ পদাতিক সৈন্য লইয়া বিহারে চলিয়া গেলেন (১৭৪৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারী)। অতঃপর তিনি বিদ্রোহী হইয়া মুঙ্গের দুর্গ অধিকার ও পাটনা সহর আক্রমণ করিলেন (১৭৪৫ খৃঃ ১৪ই মার্চ্চ)। কিন্তু আলিবর্দ্দীর জামাতা জয়েন উদ্দিন আহম্মদের হস্তে পরাজিত হইয়া (২১শে মার্চ্চ) সাহাবাদ জেলায় চলিয়া গেলেন। এপ্রিল মাসে আলিবর্দ্দী

বাঙলা হইতে আসিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে বিহার হইতে তাড়াইয়া দিলে মুস্তাফা অযোধ্যা প্রদেশের চুণারে চলিয়া যান। ইতিমধ্যে মুস্তাফার আহ্বানে রঘুজি ভোঁসলা পুনরায় বাঙলা আক্রমণ করায় আলিবর্দ্দী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মুস্তাফাও সাহাবাদ জেলায় জগদীশপুরের জমিদার উদ্বন্ত সিংহের এলাকায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু জয়েন উদ্দিন তৎক্ষণাৎ পাটনা হইতে আসিয়া শোন নদীতীরে করহানী নামক স্থানে মুস্তাফাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত করেন। অবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া মুস্তাফার পুত্র মুর্ত্তাজা খাঁ মগরোর গ্রামে পলাইয়া যান।

ইতিমধ্যে রঘুজি ভোঁসলা কটক অধিকার করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা দুর্লভরামকে বন্দী করতঃ এপ্রিল মাসে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া বর্দ্ধমানে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে ৭০০০০০ টাকা কর আদায় করিয়া বীরভূমে বর্ষাকাল যাপন করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে প্রবেশ করতঃ শোন নদী পার হইয়া মগরোর গ্রামে মুর্ত্তজা খাঁর সহিত মিলিত হন। কিন্তু তথা হইতে পাটনার পথে রাণীপুকুরে সহসা আলিবর্দ্দী চালিত সৈন্য দলের সম্মুখীন হন। মীরজাফরের সেনাদল রঘুজির শিবিরের উপর অতর্কিত আক্রমণ করায় রঘুজি কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। অতঃপর মীর হবিবের দ্বারা চালিত হইয়া মারহাট্টা সৈন্য অরক্ষিত মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় নবাব তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু রঘুজির সৈন্যদল সোজা পথে ২১শে ডিসেম্বর (৭৪৫ খৃঃ) মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। নবাব পরদিন মুর্শিদাবাদে পৌছান; কাটোয়ার নিকটে রাণীপুকুরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রঘুজি ভীষণভাবে পরাজিত হইয়া নাগপুরে ফিরিয়া যান। মীর হবিব ২৫০৯ মারহাট্টা ও ৪০০০ আফগান সৈন্যসহ কাটোয়ায় থাকিয়া যান। পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত নবাব কিয়ৎকাল মুর্শিদাবাদে বিশ্রাম করিয়া ১৭৪৬ খৃঃ এপ্রিল মাসে হবিব খাঁ ও তাঁহার সৈন্যদলকে উড়িষ্যায় বিতাড়িত করেন। এই সময়ে নবাবের আফগান সেনাপতি সমশের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ নবাবের বিরুদ্ধে মারহাট্টাদের সহিত ষড়যন্ত্র করায় জুন মাসে নবাব তাহাদিগকে পদচ্যুত করেন। তাহারা নবাবের আদেশে দ্বারভাঙ্গা জেলায় নিজ গৃহে চলিয়া যায়।

১৭৪৬ খৃঃ নভেম্বর মাসে ৭৫০০ সৈন্যসহ নবাবের সেনাপতি মীরজাফর মেদিনীপুরে প্রবেশ করিয়া হবিবের সেনাপতি সৈয়দ নুরকে পরাজিত করেন। কিন্তু মীর হবিব বালেশ্বরের দক্ষিণ হইতে আসিয়া (১৭৪৭ খৃঃ জানুয়ারী) নাগপুর হইতে কটকের মধ্য দিয়া আসিয়া রঘুজির পুত্র জানজি ভোঁসলার

সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইলে মীরজাফর ভয় পাইয়া মেদিনীপুর ত্যাগ করতঃ বর্দ্ধমানে পলায়ন করেন। পরে নবাবের বিরুদ্ধে রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লার সহিত ষড়যন্ত্র করায় ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইলে নবাব উভয়কে পদচ্যুত করেন (মুতাক্ষরীণ ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫৭)।

অতঃপর নবাব আলিবর্দ্দী আমানীগঞ্জের শিবির হইতে অগ্রসর হইয়া বর্দ্ধমানের নিকটে জানজিকে ভীষণভাবে পরাজিত করায় জানজি মেদিনীপুরে পলায়ন করে (১৭৪৭ খৃঃ মার্চ্চ)। নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া গিয়া তথায় বর্ষাকাল যাপন করেন।

১৭৪৮ খৃঃ জানুয়ারীতে পদচ্যুত আফগান সেনানী সমশের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ তাহাদের আফগান সেনাগণ লইয়া দ্বারভাঙ্গা হইতে বাহির হইয়া পাটনা সহর দখল করে এবং আলিবর্দ্দীর জামাতা জয়েনউদ্দিন আহম্মদকে (হায়বৎ জঙ্গ) ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং জয়েনউদ্দিনের বিধবা স্ত্রী আমিনা বেগমকে সন্তানগণসহ আফগান শিবিরে বন্দী করিয়া রাখে। (১৭৪৮ খৃঃ ১৩ই জানুয়ারী)। এই সংবাদে দুঃখিত হইয়া আলিবর্দ্দী আমানিগঞ্জ হইতে সসৈন্যে বাহির হইয়া (২৯শে ফেব্রুয়ারী) বিহার অভিমুখে দ্রুত ধাবিত হইলেন এবং বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে উড়িষ্যা হইতে প্রেরিত হবিব খাঁর অধীনস্থ একদল মারহাট্টা সৈন্যকে ভাগলপুরের নিকট পরাজিত করিলেন এবং পাটনা হইতে ২৬ মাইল পূর্ব্বে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে রাণী সরাই নামক স্থানে বিদ্রোহী আফগান ও মারহাট্টাগণকে আক্রমণ করিলেন (১৬ই এপ্রিল)। প্রকাণ্ড নবাবী তোপের সম্মুখে বিদ্রোহীরা স্থির থাকিতে পারিল না। যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাহাদের অন্যতম সেনাপতি সর্দ্দার খাঁ নিহত হইল। অতঃপর নবাবী সেনানী হবিব বেগ হস্তী পৃষ্ঠে আরূঢ় সমশের খাঁকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিল এবং তাহার ছিন্নমুণ্ড নবাবের পদতলে স্থাপিত হইল। তৎপর বিজয়ী নবাবী সেনা মারহাট্টাগণকে আক্রমণ করিলে বিদ্রোহী আফগানগণের পরাজয় লক্ষ্য করিয়া তাহারাও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। নবাব বিদ্রোহীদের শিবির অধিকার করিয়া বহুমূল্য দ্রব্য লাভ করিলেন। তথা হইতে দ্রুত অগ্রসর হইয়া নবাব পাটনা অধিকার ও কন্যা আমিনার উদ্ধার সাধন করিলেন। অতঃপর বিহারের নায়েব-সুবাদারী প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌল্লাকে দিয়া কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মন্ত্রী জানকীরামকে তথায় রাখিয়া দিলেন। অন্য জামাতা সইদ আহম্মদ পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর নবাব সগৌরবে মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া গেলেন (৩০শে নভেম্বর)।

১৭৪৯ খৃঃ মার্চ্চ মাসে বৃদ্ধ নবাব পুনরায় উড়িষ্যা বিজয়ে যাত্রা করিলেন। জানজি ভোঁসলা তাঁহার মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মীর হবিবকে উড়িষ্যায় রাখিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। নবাবী সৈন্তের আগমনে মীর হবিব মেদিনীপুর ছাড়িয়া ক্রমশঃ পশ্চাদপদ হইতে লাগিল। নবাব সসৈন্তে কটক অধিকার করিলেন (১৭৪৯ খৃঃ ১৭ই মে)। এক মাস পর বারাবাটি দুর্গ নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

এইরূপে উড়িষ্যা বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া নবাব তথায় একদল সেনা রাখিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন (জুলাই)। কিন্তু মীর হবিবের দল পুনরায় কটক অধিকার করিয়া লইল। অক্টোবরের মাঝামাঝি নবাব মেদিনীপুরে আসিয়া পুনরায় শিবির স্থাপন করিলেন। ১৭৫০ খৃঃ ফেব্রুয়ারীতে মারহাট্টারা পুনবায় বাঙলা আক্রমণ করিতে বাহির হইল। ৬ই মার্চ্চ মীর হবিব মুর্শিদাবাদের নিকটে আসিয়া চতুর্দ্দিক লুণ্ঠন করিতে লাগিল। নবাব বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলে লুণ্ঠনকারীরা জঙ্গলে পলাইয়া গেল। নবাব পুনরায় মেদিনীপুরে ফিরিয়া গেলেন (এপ্রিল)।

এই সময় (১৭৫০ খৃঃ জুন) সিরাজদ্দৌলা চাটুকার ও বন্ধুদের পরামর্শে বলপূর্ব্বক জানকীরামের হস্ত হইতে বিহারের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণের জন্ত নিশাযোগে লুৎফুন্নেশা বেগমকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতগামী নবাবী গোষানে আরোহণ করিয়া অনুচরবর্গসহ পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনায় পৌঁছিয়া সিরাজ জানকীরামকে পাটনা দুর্গ সিরাজের নিজ হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন (১৭৫০ খৃঃ জুলাই)। কিন্তু জানকীরাম কর্ত্তব্যানুরোধে নবাবের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিলেন। সিরাজের ক্ষুদ্র সেনাদল দুর্গের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করিল। দুর্গ-মধ্য হইতেও প্রত্যুত্তর আসিল। সিরাজের সেনাপতি মেহেদীনেশা গোলার আঘাতে নিহত হইলে সিরাজের যুদ্ধসাধ মিটিল। জানকীরাম দুর্গের বাহিরে সিরাজের উপযুক্ত বাসস্থান ঠিক করিয়া দিয়া নবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই নবাব মেদিনীপুর হইতে পাটনায় আসিলেন। আবার সিরাজের সহিত নবাবের মিলন হইল। নবাব সিরাজকে বুঝাইয়া তাহাকে মুর্শিদাবাদে রাজধানীতে সঙ্গে লইয়া গেলেন (সেপ্টেম্বর)।

১৭৫০ খৃঃ ডিসেম্বরে নবাব পুনরায় মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এক্ষণে মারহাট্টা ও নবাবপক্ষ উভয়েই যুদ্ধক্লান্ত হইয়াছিল। বৃদ্ধ নবাব সন্ধির প্রস্তাব করিলে মারহাট্টাগণ তাহাতে সম্মত হইলেন। এই মর্ম্মে সন্ধি হইল যে (১) মীর হবিব আলীবর্দ্দীর অধীনে উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম হইবেন এবং উড়িষ্যার

উদ্বৃত্ত অর্থ রঘুজিকে দিবেন, (২) বাঙলার চৌথ বাবদ নবাব রঘুজিকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিবেন, (৩) সুবর্ণরেখা নদী উভয়পক্ষের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল (১৭৫১ খৃঃ মে)। এই সময় হইতে মেদিনীপুর জেলা সুবে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হইল।

এই সন্ধির পর মীর হবিব জানজির মারহাট্টা সৈন্যদের হস্তে নিহত হয়। তাহার স্থলে রঘুজির সভাসদ মুসালিহউদ্দিন মহম্মদ খাঁ উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হন (১৭৫২ খৃঃ ২৪শে আগষ্ট) এবং উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে যদিও উড়িষ্যা নবাবের হস্তচ্যুত হইল তথাপি সুবে বাঙলায় এই সময় হইতে শান্তি বিরাজিত হওয়ায় নবাব বাঙলার উন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলেন।

১৭৫৪ খৃঃ সিরাজদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা একরাম-উ-দ্দৌলা বসন্ত রোগে প্রাণ ত্যাগ করে। আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম ও তাঁহার স্বামী সাহামৎ জঙ্গ (নোয়াজিস মহম্মদ) ইহাকে পালিত পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পালিত পুত্রের মৃত্যু শোকে সাহামৎ জঙ্গ ১৭৫৫ খৃঃ ১৭ই ডিসেম্বর শোথ রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আলিবর্দ্দীর দ্বিতীয় জামাতা সৌলৎ জঙ্গ (সইদ আহম্মদ) ১৭৫৮ খৃঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী পরলোকগত হইলেন। বৃদ্ধ নবাব ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৬ খৃঃ শোথ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত শোকে তিনিও ৮০ বৎসর বয়সে ১০ই এপ্রিল (১৭৫৬ খৃঃ) সকাল ৫ ঘটিকার সময় প্রাণত্যাগ করিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে খোসবাগে তাঁহার মাতার সমাধির পার্শ্বে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম দশায় ১৭১৩ খৃঃ দাক্ষিণাত্যে নিজাম উল মুলক আসফজা, ১৭২৩ খৃঃ অযোধ্যায় সাদত আলি, ১৭১৩ খৃঃ পাঞ্জাবে শেরু-উ-দ্দৌলা এবং ১৭৩৩ খৃঃ বাঙলায় আলিবর্দ্দী এই চারিজন শক্তিশালী দুঃসাহসী বিদেশী ব্যক্তি শাসন কর্তৃত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকে সাহসী যোদ্ধা, সুদক্ষ সেনানায়ক ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন।

২০। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌল্লা
(১৭৫৬ খৃঃ ১০ই এপ্রিল-৫৭ খৃঃ ২রা জুলাই)।

আলিবর্দ্দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার তিন কন্যাই বিধবা ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমা মেহের উন্নিসা (ঘসেটি বেগম) নিঃসন্তান ছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা শাহ বেগমের দুইটি পুত্র সওকৎ জঙ্গ ও মীর্জ্জা রমজানী। তৃতীয়া কন্যা আমিনা বেগমের দুই পুত্র সিরাজ-উ-দ্দৌলা ও মুজা মেহেদী।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সিরাজ-উ-দ্দৌলা আলিবর্দ্দীর প্রিয়তম দৌহিত্র ছিলেন। মাতামহের নিকট অতিরিক্ত আদর প্রশ্রয় পাইয়া সিরাজ যৎপরোনাস্তি উচ্ছৃঙ্খল, দুশ্চরিত্র ও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবাবের জ্যেষ্ঠ জামাতা নোয়াজিস ঢাকার নায়েব নাজিম হইলেও তিনি ঢাকায় থাকিতেন না। হোসেন কুলী খাঁ নামক একব্যক্তি তাঁহার দেওয়ান স্বরূপ ঢাকায় থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেন এবং রাজনগরের রাজবল্লভ তাঁহার পেস্কার ছিলেন। নোয়াজিস রাজধানী মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ প্রান্তে মতি ঝিলের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সুরম্য প্রাসাদে বাস করিতেন। আলিবর্দ্দীর আদেশে বিহারের তৎকালীন নায়েব নাজিম সিরাজ-উ-দ্দৌলার মনস্তুষ্টির জন্য ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি সরোবরকে আরও বিস্তৃত করিয়া তাহার নাম হীরাঝিল রাখা হইল এবং তাহার পার্শ্বে নোয়াজিসের প্রাসাদ অপেক্ষা আরও বৃহৎ ও সুন্দর একটি প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। প্রাসাদের সম্মুখে মনোরম উদ্যান মধ্যে জলকেলীর জন্য একটি হ্রদ ও তন্মধ্যে একটি সুসজ্জিত প্রমোদভবন নির্ম্মিত হইল। তাহার নাম সিরাজের মূল নামানুসারে "মনসুর গঞ্জ" রাখা হইল। ঐ প্রাসাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিকটে মনসুর গঞ্জ নামক বাজার স্থাপিত হইল এবং নজরানা মনসুর গঞ্জ নামক একটি নূতন কর জমিদারদের উপর ধার্য্য হইল[১]। গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহার রাজস্ব বিবরণীতে এই নজরানা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাসাদ নির্ম্মিত হইলে দৌহিত্রের নিমন্ত্রণে পাত্র মিত্র সহ নবাব সেই প্রাসাদে আগমন করেন এবং কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে সিরাজের কৌশলে বন্দী হন। সমবেত জমিদারবর্গ এই চাতুরীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া চাঁদা করিয়া ৫০১৫৯৭ টাকা সিরাজের হস্তে দিয়া নবাবকে কারামুক্ত করিয়া দেন। ইহা পরবর্ষ হইতে নজরানা মনসুর গঞ্জ নামে কর স্বরূপ আদায় হইতে লাগিল। এই টাকায় নবনির্ম্মিত প্রমোদভবনে কুক্রিয়াসক্ত যুবকদলের সহিত মিশিয়া অনাচার ও বিলাসতরঙ্গে সিরাজ গা

১। নবাব আলিবর্দ্দীর সময় জমিদারদের উপর নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কর ধার্য্য হয়:—

(১)	নজরানা মনসুর গঞ্জ	৫০১৫৯৭ টাকা।
(২)	প্রাসাদ ইত্যাদির জন্য চূণ আনার ব্যয়	১৮৪১৫০ টাকা।
(৩)	গৌড় হইতে ইষ্টকাদি বিক্রয় জমা	৮০০০ টাকা
(৪)	চৌথ মারহাট্টা	১৫৩১৮১৭ টাকা
		মোট—২২২৫৫৬৪ টাকা

ভাসাইয়া দিয়াছিল।

১৭৫৬ খৃঃ ১০ই এপ্রিল আলিবর্দ্দীর মৃত্যু হইলে সিরাজ-উ-দ্দৌলা দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সওকৎ জঙ্গ দূরে পূর্ণিয়ায় পৈতৃক গদীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী ঘসেটি বেগম মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে মতিঝিলের সুরক্ষিত দুর্গে প্রহরী বেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহার দিক হইতে সিরাজের ভীতির বেশী কোন কারণ ছিল না। তাঁহার দেওয়ান হোসেন কুলীর সহিত ঘেসেটি বেগমের ও সিরাজমাতা আমিনা বেগমের অবৈধ প্রণয় কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায় আলিবর্দ্দীর জীবিত কালেই সিরাজের আদেশে তাঁহার অনুচরগণ সিরাজের সমক্ষেই হাজি মহম্মদের গৃহে লুক্কায়িত হোসেন কুলীকে বলপূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিয়া মুর্শিদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথে তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল এবং হোসেন কুলীর অন্ধ ভ্রাতা হায়দর কুলীরও ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল (১৭৫৪ খৃঃ এপ্রিল)। ঘসেটি বেগমের আর একজন সহায় ছিল রাজা রাজবল্লভ। তিনি ঢাকার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, হোসেন কুলীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ছিলেন। সিরাজ তাঁহার বিরুদ্ধেও তহবিল তছরুপের অভিযোগে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আনাইয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন (১৭৫৬ খৃঃ মার্চ্চ) এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে আটক করিবার জন্য ঢাকায় লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ জগন্নাথ যাত্রার ছলে সমস্ত ধন সম্পদ ও পরিবারবর্গ সহ কলিকাতায় চলিয়া যান ও কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে উৎকোচ প্রদানে তথায় আশ্রয় প্রাপ্ত হন (১৭৫৬ খৃঃ ১৩ ই মার্চ্চ)।

সিরাজ-উ-দ্দৌলার আর একজন শত্রু ছিল মীরজাফর আলির্খা। মীরজাফর নিঃসম্বল অবস্থায় ভারতে আসিয়া আলিবর্দ্দীর বৈমাত্র ভগ্নী সাহ খানুমাকে বিবাহ করেন। এবং ক্রমশ সাহসের পরিচয় দিয়া আলিবর্দ্দীর দেওয়ান ই-তন ও প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। তিনি আলিবর্দ্দীর অন্তিমদশায় সওকতজঙ্গকে মুর্শিদাবাদের নবাবী পদে বসাইবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পরেই সিরাজউদ্দৌল্লা সিংহাসন অধিকার করিলেন। এবং প্রথমেই নিকটস্থ শত্রু ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া বেগমের বহু মূল্য ধন সম্পদ মনসুর প্রাসাদে লইয়া গেলেন ও অসহায় বেগমকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

অতঃপর সিরাজ মীরজাফরকে দেওয়ান-ই-তন অর্থাৎ সমর বিভাগের দেওয়ানী পদ (Paymaster General and Minister of the musters) হইতে অপসারিত করিয়া কেবল মাত্র প্রধান সেনাপতি পদে বহাল রাখিলেন এবং উক্ত দেওয়ান-ই-তন পদ তাঁহার অনুরক্ত মীরমদনকে প্রদান ও তাঁহার প্রিয়পাত্র মোহনলালকে মহারাজা উপাধি দিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে মীরজাফর, রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতি প্রাচীন পদস্থ কর্ম্মচারীগণের মনোভঙ্গের কারণ হইল।

তৎপর ১০ ই মে সিরাজ তাঁহার প্রধান শত্রু পূর্ণিয়ার নবাব-নাজিম সওকত জঙ্গের বিরুদ্ধ যুদ্ধযাত্রা করিয়া মে মাসের ২২ শে তারিখ রাজ মহলে পৌছিলেন। সংবাদ পাইয়া সওকত জঙ্গ ও তাঁহার পাত্র মিত্রগণ হতবুদ্ধি হইলেন। কিন্তু সিরাজ আর অগ্রসর না হইয়া ইংরেজদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য সহসা প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।[১]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের ক্রোধের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার সময় ইংরেজের বাঙলার কুঠি সমূহের অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব উপযুক্ত উপঢৌকন সহ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ আলিবর্দ্দীর জীবিত কালে একদিন সিরাজ ইংরেজদের কাশীমবাজারের কুঠি এলাকায় প্রবেশ করিতে চাহিলে কুঠির কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তৃতীয়তঃ পলায়িত কৃষ্ণবল্লভকে ইংরেজরা তাহাদের কলিকাতার কুঠি এলাকায় আশ্রয়দান করিয়াছিল। সিরাজ তাঁহার গুপ্তচর বিভাগের অধ্যক্ষের ভ্রাতা নারায়ণ দাসকে তাঁহার আদেশ পত্র সহ ড্রেক সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণবল্লভকে নবাবের হস্তে প্রত্যার্পণ করিতে বলিলেও ড্রেক সাহেব সেই আদেশ গ্রাহ্য করেন নাই এবং নারায়ণ দাসকে গুপ্তচর বলিয়া কলিকাতা এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন (১৭৫৬ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল)। চতুর্থতঃ ইউরোপে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হওয়ায় (১৭৫৬ খৃঃ মে মাসে সংঘটিত সপ্ত বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ) ইংরেজরা নবাবের অনুমতি না লইয়াই (বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্ট অফিসের পশ্চিমে অবস্থিত) নদীতীরস্থ রক্ষা প্রাচীরগুলির সংস্কার সাধন, মারহাট্টা খাতের পরিষ্কার করণ,

---

১। ফরাসী 'ল' সাহেব বলেন, পূর্ণিয়ার গুপ্তচরেরা ইংরেজ পক্ষ কর্তৃক সওকৎ জঙ্গকে লিখিত গোপন পত্রের কথা প্রকাশ করায় সিরাজ প্রথমে ইংরেজ দিগকেই সায়েস্তা করিবার সংকল্প করেন।

বাগবাজারের উপরে উত্তোলনশীল সেতু ও রক্ষাপ্রাচীর (Perring's Redoubt) নির্ম্মাণ প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া কলিকাতার রক্ষা কার্য্য সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

সিরাজ রাজমহল হইতে ফিরিয়া ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি অধিকার করিয়া তথাকার অধিকাংশ ইংরেজদের বন্দী করিলেন (২৪শে মে)। হেষ্টিংস প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র তাঁহাদের বন্ধুগৃহে পলাইয়া রক্ষা পাইলেন[১]। ৫ই জুন সিরাজ কলিকাতা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন এবং এগার দিনে ১৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ১৬ই জুন কলিকাতার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন।

১১ই জুন ড্রেক সাহেব হিসাব করিয়াছিলেন, কলিকাতায় ১৮০ জন সৈন্য (তন্মধ্যে ৪০ জন ইউরোপীয়), ৫০ জন ইউরোপীয় স্বেচ্ছাসৈনিক, ৬০ জন ইউরোপীয় ও ১৫০ জন আর্ম্মেনীয় ও পর্ত্তুগীজ রক্ষী (militia), ৩৮ জন ইউরোপীয় গোলন্দাজ, ৪০ জন জাহাজী স্বেচ্ছাসৈন্য মোট ৫১৫ জন যোদ্ধা ছিল (Hill, I, LXX)। কাপ্তেন মিনচিন ঐ যোদ্ধাগণের সেনাপতি ছিলেন।

১৬ই জুন মধ্যাহ্নে নবাব সৈন্য উত্তর দিকে বাগবাজারের দিক হইতে আক্রমণ সুরু করিল। এখানকার খালের অপর পার্শ্বস্থ পেরিং প্রাকারের নিকটে একটি সেতু ছিল। খালের উত্তর পার্শ্বে যে জঙ্গলাবৃত স্থান ছিল তাহার সম্মুখে ভাগীরথী গর্ভে ১৮টি কামান সহ ইংরেজদের একটি জাহাজ ছিল। প্রাকার ও সেতু রক্ষার জন্য ২০ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। আক্রমণের সংবাদ পাইয়া তাহাদের সাহায্যার্থ ২টি কামানসহ আরও ৩০ জন সৈন্য তথায় প্রেরিত হইল। নবাব বাহিনীর অগ্রভাগের প্রায় ৪০০০ সৈন্য ৪টি কামান লইয়া ঐ জঙ্গলাবৃত স্থানটি অধিকার করিয়া বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত গোলাবর্ষণ করিল। ইংরেজগণও জল ও স্থল হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। পরদিন পূর্ব্বদিকের অরক্ষিত স্থান দিয়া দলে দলে নবাব সৈন্য নগরে প্রবেশ করিল। দুর্গের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে বড় বাজার পর্য্যন্ত দেশীয় মহাজনদের আবাসস্থান সকল তাহারা দখল করিয়া লইল। অপরাহ্ণে তাহারা বড় বাজারে অগ্নি সংযোগ করিল।

১৮ই জুন নবাবের সৈন্যেরা পূর্ব্ব দিকে শিয়ালদহের নিকটস্থ বৌবাজার ও এসপ্লানেড পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া ইউরোপীয়দের বড় বড় বাড়িগুলি অধিকার

১। কথিত আছে কাশিমবাজার এষ্টেটের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর মুদীর দোকানে হেষ্টিংস লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিদান স্বরূপ হেষ্টিংস কান্তবাবুকে জমিদারী প্রদান করেন।

করিয়া লইল এবং গোলাবর্ষণ দ্বারা ছোট ছোট ইংরেজ রক্ষীদলকে বিতাড়িত করিয়া দুর্গের কামানগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল এবং দুর্গের বহিস্থ তোপমঞ্চগুলিও দখল করিয়া লইল। কেবলমাত্র ফোর্ট উইলিয়ম এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভূভাগ (গঙ্গা হইতে ডালহউসী স্কোয়ার ওয়েষ্ট এবং ফেয়ারলি প্লেস হইতে জেনারেল পোষ্ট অফিসের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত) ইংরেজরা রক্ষা করিতে লাগিল।

ঐ দিন রাত্রিতে যতদূর সম্ভব স্ত্রীলোকগণকে জাহাজ সমূহে প্রেরণ করা হইল। পাচকগণ পলায়ন করায় রন্ধন অভাবে দুর্গ রক্ষী সৈন্যগণ উপযুক্ত আহার্য্য না পাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। গোলাগুলিও ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছিল। শেষ রাত্রিতে অধ্যক্ষ ড্রেক সভা আহ্বান করিলেন। তাহাতে দুর্গ পরিত্যাগ করাই স্থির হইল।

পরদিন ১৯শে জুন স্বয়ং ড্রেক ও সেনাপতি মিনচিন একখানি জাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। জাহাজগুলি কেবলমাত্র পলাতক ইংরেজ নরনারীদের লইয়া ফলতায় আসিয়া নোঙ্গর করিল (২৬শে জুন)। পলায়নকালে কোন শৃঙ্খলা না থাকায় প্রিন্স জর্জ্জ, নেপচুন, ক্যালকাটা ও ডিলিজেন্স নামক জাহাজগুলি চড়ায় আবদ্ধ হয় এবং তাহাদের আরোহীগণ নবাবী সৈন্যের হস্তে বন্দী হয়।

তখন আর্ম্মেনী ও ফিরিঙ্গী ব্যতীত আরও ১৭০ জন ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি দুর্গে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর জে, জেড হলওয়েলকে ১৯শে জুন বৈকালে অধ্যক্ষ ও সেনাপতি মনোনীত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কিন্তু নবাবী তোপের মুখে তাহারা দাঁড়াইতে পারিল না। শেষে ইংরেজ সৈন্যগণও তাহাদের সেনাপতির আদেশ মান্য করিতে অস্বীকৃত হইল এবং পলায়িতগণের গৃহে ঢুকিয়া পানোন্মত্ত হইল। ৫৩ জন ডাচ সৈন্য পলাইয়া বিপক্ষ দলে মিশিয়া গেল।

২০শে জুন রবিবার প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ইংরেজ পক্ষে ২৫ জন হত ও ৭০ জন আহত হইল। ১৭ জন সৈন্য মাত্র অক্ষত দেহে অবশিষ্ট রহিল। হলওয়েল এই সময় যুদ্ধ বিরতিসূচক শ্বেত পতাকা উত্তোলন করিলেন। বৈকাল প্রায় ৪টার সময় নবাবী সৈন্য দুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিল এবং একজন ডাচ সার্জ্জেণ্ট নদীর দিকে যে দুর্গদ্বার ছিল তাহা খুলিয়া দেওয়ায় নবাবী সৈন্য সেই দিক দিয়াও দুর্গপ্রবেশের সুযোগ পাইল। দ্বার রক্ষী কতকগুলি সৈন্য তরবারির আঘাতে নিহত হইল। হলওয়েল স্বয়ং আত্মসমর্পণ করায় যুদ্ধ শেষ হইল এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া সিরাজ-উ-দ্দৌলা দুর্গে প্রবেশ করিলেন। নবাব

কাহাকেও বন্দী করিলেন না। পর্ত্তুগীজ ও ডাচ দিগকে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইল ও বহু ইউরোপীয় দুর্গ হইতে পলাইয়া গেল। হলওয়েল প্রভৃতি যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হইয়াছিল। হলওয়েল নবাবের সহিত তিনবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনবারই নবাব তাঁহাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়াছিলেন।

অন্ধকূপের দুর্ঘটনা।

সূর্য্যাস্তকালে কতকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য মত্ত অবস্থায় নবাব সৈন্যের সহিত কলহ করায় তাহারা ঐ ঘটনাগুলি নবাবের গোচরে আনিলে নবাব অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে ঐরূপ অপরাধীদিগকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অন্ধকূপ (Black Hole) নামক কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তদনুসারে নবাব ঐ অপরাধীদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া নিজ শিবিরে বিশ্রামার্থ চলিয়া যান। এই কারাগৃহটির আয়তন ১৮´×১৪´-১০″ ও উহাতে একটিমাত্র ক্ষুদ্র জানালা ছিল। জুন মাসের অসহ্য গরমে সেই ক্ষুদ্র গৃহে সমস্ত রাত্রি সমস্ত অপরাধীকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে অধিকাংশ বন্দীই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অথবা যুদ্ধে আহত থাকার জন্য মরিয়া গিয়াছে (Hill, 1, XC)। হিল সাহেবের মতে বন্দী সংখ্যা ৫৬। কিন্তু হলওয়েলের মতে ঐ সংখ্যা ১৪৬ ও মৃতের সংখ্যা ১২৩ [১]। কিন্তু ঐরূপ অল্প পরিসর গৃহে উহার অর্দ্ধেক সংখ্যক ইউরোপীয়কেও প্রবেশ করান অসম্ভব। এই দুর্ঘটনার পর হলওয়েল ও কোম্পানীর আরও কতিপয় পদস্থ কর্ম্মচারীকে মুর্শিদাবাদে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। হলওয়েল স্বয়ং অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মিসেস ক্যারী নামক একজন ইউরোপীয় নারীও অন্ধকূপে বন্দী হন। ইঁহারা উভয়েই জীবিত ছিলেন। অন্ধকূপ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে হলওয়েলের বিবরণ আনুমানিক ও অতিরঞ্জিত বলিয়া হিল সাহেব প্রভৃতি অনেকে মনে করেন।

কলিকাতা আক্রমণের ফলে ইংরেজ কোম্পানীর ৯৫ লক্ষ টাকা ও কলিকাতা বাসীগণের ১৬০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। কিন্তু নবাব মাত্র অর্দ্ধলক্ষ টাকা কোম্পানীর কোষাগারে প্রাপ্ত হন। কলিকাতা অধিকারের তিনদিন পর নবাব কলিকাতা ত্যাগ করেন।

কলিকাতা অধিকারের পর দেওয়ান মানিক চাঁদের উপর কলিকাতার

১। মুতাক্ষরীণের অনুবাদক মুস্তাফার মতে বন্দীসংখ্যা ১৩২ জন।

শাসনভার অর্পিত হয়। কৃষ্ণবল্লভ ও বনিক অমিচাঁদকে ইংরাজরা বন্দী করিয়া রাখিয়া ছিল। নবাব তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলেন। কলিকাতা ত্যাগের পর নবাব ডাচ ও ফরাসীগণের নিকট হইতে যথাক্রমে সাড়ে চার ও সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আদায় করিয়া ১১ই জুলাই মহা আড়ম্বরে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

সওকতজঙ্গ ও মণিহারীর যুদ্ধ।

পিতা আহম্মদ খাঁ সৌলত জঙ্গের মৃত্যুর পর ১৭৫৬ খৃঃ ২৭ মার্চ্চ সওকতজঙ্গ পূর্ণিয়ার নায়েব নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর মীরজাফর তাঁহার নিজের ও মুর্শিদাবাদ দরবারের অনেক পদস্থ ব্যক্তির সমর্থন জানাইয়া সওকত জঙ্গকে সুবে বাঙ্গালা আক্রমণ করিবার জন্য গোপনে পত্র প্রেরণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তখনও জানিতেন না যে সওকত জঙ্গ সিরাজ-উ-দ্দৌলার মতই মদ্যপায়ী ইন্দ্রিয়াসক্ত ও দুরাচার, বরং সিরাজের অপেক্ষাও দুর্বিনীত, নির্বোধ, দুর্ম্মুখ, অক্ষরজ্ঞানহীন অনভিজ্ঞ ও দুরাকাঙ্ক্ষ। দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহ দ্বিতীয় আলমগীরের (১৭৫৪-৫৯খৃঃ) উজির গাজি উদ্দিনকে তিনি এক কোটি টাকা উৎকোচ প্রদানের অঙ্গীকারে সিরাজের নিকট হইতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাবী কাড়িয়া লইবার হুকুমনামাও সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। সওকত জঙ্গ তাঁহার সুদক্ষ তোপাধ্যক্ষ লালু হাজারিকে অকারণ অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলে তিনি মুর্শিদাবাদ দরবারে উপনীত হইয়া সিরাজের নিকট মুর্শিদাবাদ দরবারের ষড়যন্ত্র ও উজিরের হুকুমনামার বিষয় প্রকাশ করিয়া দিলেন। সিরাজ সওকতের অভিসন্ধি জানিবার জন্য দুর্লভরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায় রাসবিহারীকে সওকতের বরাবর চিঠি দিয়া পূর্নিয়া বিভাগের বীর নগর ও গোন্দোয়ারার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। রাসবিহারী রাজমহল হইতে সওকতের নিকট সিরাজের চিঠি প্রেরণ করিলেন। পত্রের উত্তরে সওকত সিরাজকে লিখিলেন "আমি স্বনামে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবাদারীপদের বাদসাহী সনন্দ পাইয়াছি। তুমি আমার ভ্রাতা, তোমার প্রাণ বধের ইচ্ছা করি না। তোমার ভরণ পোষণ জন্য তোমাকে ঢাকার নায়েব নাজিমের সনন্দ দিতে প্রস্তুত আছি। ইতিমধ্যে তুমি মুর্শিদাবাদের তক্ত ও রাজকোষ ইত্যাদি আমাকে ছাড়িয়া দিবে। রেকাবে পা তুলিয়া তোমার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছি।" (মুতাক্ষরীণ)।

সওকতের চিঠি পাইয়া সিরাজ ক্রোধান্ধ হইলেন। শেঠগণের সহযোগে নজরের টাকা দিল্লীর দরবারে জমা দিয়া বাদসাহী সনদ আনা হইত। এতদিন

সনন্দ আনাইবার জন্য যথোচিত চেষ্টা কেন করা হয় নাই এই অপরাধে মহাতপচাঁদ জগৎ শেঠকে সিরাজ যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। রাজকোষে অর্থাভাব প্রভৃতির উল্লেখ করিলে ও অন্যান্য কারণ দেখাইলে সিরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া প্রকাশ্য দরবারে প্রবীণ জগৎ শেঠের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করায় সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইল। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জগৎ শেঠকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। শেষে সভাসদগণের ও আলিবর্দ্দীর বেগমের চেষ্টায় জগৎ শেঠ কারামুক্ত হন।

অতঃপর ত্বরায় যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হইল। নবাবের সৈন্যদল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একদল সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হইল। নবাবের আদেশে পাটনার নায়েব সুবাদার রাম নারায়ণ[১] ও বিহারের বহু জমিদার সসৈন্যে তাঁহার দলপুষ্টি করিল। অপর দল রাজা মোহনলালের অধীনে রাজ মহলের নিকটে গঙ্গা পার হইয়া হায়াৎপুর ও বসন্তপুরের গোলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ পূর্ণিয়ার মণিহারীতে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে সওকতজঙ্গের বাহিনীও মণিহারীর ৪ মাইল উত্তরে নবাব গঞ্জে পৌছিল। এই স্থানের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বেষ্টন করিয়া সোনাডা নামক কুশী নদীর মরা খাদের দ্বারা সৃজিত বিস্তৃত কর্দ্দমাক্ত জলাভূমি অবস্থিত ছিল। কেবলমাত্র পশ্চিম দিক হইতে এই স্থানে পৌছিবার একটি সংকীর্ণ পথ ছিল। এই সংকীর্ণ পথের মুখে মুষ্টিমেয় সাহসী সুশিক্ষিত সৈন্যের সাহায্যেই সওকতজঙ্গ আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। সওকত জঙ্গ স্বয়ং নবাবগঞ্জে শিবির স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আদেশে সেনাপতি কারওয়াজ খাঁ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাঁহার দেড় ক্রোশ পশ্চিমে সোনাড়ার বাঁকের ধারে স্থান গ্রহণ করিল এবং গোলন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক বাঙালী কায়স্থ শ্যামসুন্দর দে সওকতের একমাইল পূর্ব্বে আসিয়া তথা হইতে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

১৬ই অক্টোবর প্রায় মধ্যাহ্নের সময় মোহনলালের সৈন্যদল মণিহারী হইতে অগ্রসর হইয়া সওকৎ জঙ্গের শিবির হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে বলদিয়াবাড়ী উপস্থিত হইল এবং গঙ্গার পাহাড়ের উপর একটি উচ্চ স্থানে শিবির স্থাপন করিল। মধ্যে বিলের অংশবিশেষ ব্যবধান। মীরজাফর, দোস্ত মহম্মদ মীর কাশেম ও প্রসিদ্ধ বীর উমেৎ খাঁর পুত্রদ্বয় দিলির খাঁ ও অসালত খাঁ প্রভৃতি সিরাজের সেনানায়কগণও যথানির্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধার্থ ব্যূহবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামানগুলি হইতে প্রথমতঃশত্রু শিবিরে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। কিন্তু গোলাগুলি সম্মুখস্থ জলাভূমিতে পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বড় কামান-

১। রাজা রামনারায়ণ শ্রীবাস্তব কায়স্থ ছিলেন (মুতাক্ষরীণ)।

গুলি আসিলে তাহাদের কতকগুলি গোলা সওকৎ জঙ্গের শিবির মধ্যে পতিত হওয়ায় সওকৎ জঙ্গ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে বিব্রত দেখিয়া গোলন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক শ্যামসুন্দর শত্রুপক্ষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে সিরাজের সৈন্যদল কিছুক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইল কিন্তু মোহনলালের কামানের গোলার সম্মুখে শ্যামসুন্দর অধিকক্ষণ লড়াই করিতে সক্ষম হইল না। ইতিমধ্যে সওকৎজঙ্গের দারুণ ভর্ৎসনায় তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যদল কারওয়াজ খাঁর নেতৃত্বে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইয়া বিলের পঙ্ক মধ্যে পতিত হইয়া বিপক্ষের কামানের মুখে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্যামসুন্দরও যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়া শিবিরে নীত হইলেন। এই সময় সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য গোলামহোসেন (মুতাক্ষরীণ প্রণেতা) প্রভৃতির পরামর্শে সওকৎ মত্ত অবস্থায় হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিবিরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বিপক্ষের একটি গোলা আসিয়া তাঁহার ললাট ভেদ করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল। সওকতের মৃত্যুর সহিত তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যদল রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িল। সূর্য্যদেবও অস্তগমন করিলেন। যুদ্ধে সিরাজের জয়লাভ হইল।

যুদ্ধ শেষে শান্তি স্থাপন জন্য মহারাজা মোহনলাল কিছুদিন পূর্ণিয়ায় অপেক্ষা করিলেন। সওকতজঙ্গের সমস্ত সম্পত্তি ও বেগমগণ ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়গণ মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। সিরাজ-উ-দ্দৌলা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনকে আত্মীয় বলিয়া ধনসম্পদসহ নিরাপদে চলিয়া যাইতে দিলেন। নিজের মনোনীত একজন সুদক্ষ লোকের হস্তে পূর্ণিয়ার শাসনভার দিয়া কিছুকাল পরে মোহনলাল মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার পুত্রকে পরে পূর্ণিয়ার নায়েবী পদে নিযুক্ত দেখা যায় (মুতাক্ষরীণ)। মণিহারীর যুদ্ধে জয়লাভের পর সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছুকালের মধ্যেই বহু অর্থের বিনিময়ে দিল্লীশ্বরের একখানি ফার্ম্মাণ প্রাপ্ত হইলেন। এই ফার্ম্মাণ দ্বারা বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যায় তাঁহার সুবাদারী পাকা হইল।

বাঙলা বিহার উড়িষ্যায় সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সিরাজ আশা করিতে ছিলেন যে অতঃপর ইংরেজ বণিকগণ পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে পুনরায় নিরাপদে বাণিজ্য চালাইতে পারেন তজ্জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট সবিনয় আবেদন করিবে। কিন্তু ১৭৫৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসেই তিনি জানিতে পারিলেন যে আবেদন নিবেদনের পরিবর্ত্তে কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য ফলতায় ১৫ই ডিসেম্বর ১৭৫৬ খৃঃ কর্ণেল ক্লাইব ও এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে মাদ্রাজ

হইতে নূতন স্থল ও নৌসৈন্য দল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর্কটের রক্ষা কার্য্যে ও দুর্ব্বার আংগ্রীয়া দমনে[১] অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া কর্নেল ক্লাইব তৎকালে মাদ্রাজের ইংরেজ সমাজে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ২৭ শে ডিসেম্বর

১। ১৭৪৮ খৃঃ হায়দরাবাদের নিজামের মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজঃফরজঙ্গের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। নিজামের অধীনস্থ কর্ণাটকের রাজধানী আর্কটেও সিংহাসন লইয়া আনোয়ারউদ্দিন ও চাঁদ সাহেবের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। ফরাসী ডুপ্লে মুজঃফরজঙ্গের ও চাঁদ সাহেবের এবং ইংরেজেরা নাসিরজঙ্গ ও আনোয়ারউদ্দিনের পক্ষ সমর্থন করেন। ১৭৪৯ খৃঃ আনোয়ারের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহম্মদ আলি আর্কটের ও ১৭৫০ খৃঃ নাসিরজঙ্গের মৃত্যু হইলে মুজঃফরজঙ্গ যুদ্ধ চালাইতে থাকে। চাঁদ সাহেব যখন ত্রিচিনোপল্লীতে মহম্মদ আলিকে অবরোধে ব্যস্ত, তখন ক্লাইব মাত্র ৫০০ সৈন্য লইয়া আর্কট অধিকার করেন। চাঁদ সাহেব তাঁহার পুত্র রাজাসাহেবকে আর্কট উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিলে তাহাকেও পরাজিত করিয়া তিনি আর্কট রক্ষা করেন (১৭৫১ খৃঃ)। অতঃপর ক্লাইব ডুপ্লে ও চাঁদ সাহেব উভয়ের মিলিত সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ত্রিচিনোপল্লী অধিকার করিয়া মহম্মদ আলিকে উদ্ধার করেন ও তাঁহাকে আর্কটের সিংহাসনে স্থাপন করেন (১৭৫২ খৃঃ)।

খৃঃ অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে কানোজী আংগ্রীয়া নামক এক ব্যক্তি ভারতের পশ্চিমোপকূলে মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ জাহাজ পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন। কথিত আছে ইনি কনোজী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল আপ্পাজী। ইনি বোম্বাই হইতে ৮০ মাইল দক্ষিণে সুবর্ণ দুর্গের অধিনায়ক হন ও কালক্রমে মহারাষ্ট্র শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে থাকেন। ১৭১৩ খৃঃ সামান্য মাত্র কর দিতে স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ উপকূলভাগের স্বাধীন রাজা হইয়া উঠেন এবং বিদেশী জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৭২৮ খৃঃ কানোজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্যতম পুত্র তুলাজি আংগ্রীয়া বিজয় দুর্গে রাজধানী করিয়া পিতৃবৃত্তি পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া পেশোয়া বালাজি বাজীরাও ইংরেজের সাহায্যে তাহাকে দমন করিতে সঙ্কল্প করেন। ১৭৫৬ খৃঃ ইংলণ্ড হইতে যুদ্ধ জাহাজসহ নৌসেনাপতি ওয়াটসন ও সেনাপতি ক্লাইব বোম্বাই বন্দরে উপনীত হইলে জলপথে ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজে ও স্থলপথে ইংরেজ ও মারহাট্টা সৈন্য বিজয় দুর্গ আক্রমণ করিয়া আংগ্রীয়াকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে ক্লাইব যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

ঐ সৈন্যদল ফলতা হইতে রওনা হইয়া দুই দিন পরে বজবজ পার হইয়া মাকওয়া থানা ও (বজবজের ৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত) আলিগড়ের নূতন মৃৎদুর্গের মধ্যে এক স্থানে জাহাজগুলি নোঙ্গর করিল। মায়াপুর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া ক্লাইবের সৈন্যেরা স্থলপথে চলিল। ২৯ শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্ন কালে বজ বজের ঘাঁটিকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে নবাবের একদল নূতন সৈন্য লইয়া মানিকচাঁদ বজবজের দিকে যাইতেছিল। ক্লাইবের স্থলবাহিনীর সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে মানিকচাঁদ পশ্চাৎপদ হইলেন। ইংরেজের জাহাজ হইতে বজবজের দুর্গের উপর গোলা বর্ষিত হইল। রাত্রিকালে বজবজের নবাবী সৈন্যগণ দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। মধ্যরাত্রিতে ষ্ট্রাইন নামক একজন ইংরেজ নাবিক মত্ত অবস্থায় একাকী প্রাকারের ভগ্ন স্থান দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়া রক্ষীগণকে আক্রমণ করে, পরে জাহাজ হইতে অন্যান্য ইংরেজ সৈন্য আসিয়া দুর্গ অধিকার করে। ইংরেজ জাহাজের বৃহৎ কামানগুলির অশ্রুতপূর্ব্ব প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের শব্দে নবাবের সৈন্যদল এরূপ ভীত হইয়াছিল যে তাহারা যুদ্ধ না করিয়াই মাকওয়া থানা ও আলিগড় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পরদিন বজবজ দুর্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া ইংরেজগণ কলিকাতার অভিমুখে অগ্রসর হইল। ১৭৫৭ খৃঃ ২রা জানুয়ারী ক্লাইব একদল স্থল সৈন্য লইয়া স্থলপথে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময় এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের যুদ্ধ জাহাজ কলিকাতা পৌঁছে এবং তাহার একদল নাবিক ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে প্রবেশ করিয়া কলিকাতা দখল করিয়া লইয়াছিল। ইংরেজ পক্ষে মাত্র ৯ জন নিহত হয়।

১৭৫৭ খৃঃ ৩রা জানুয়ারী ক্লাইব ও ওয়াটসন কর্তৃক নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। এক সপ্তাহ পরে ক্লাইব বরাহ নগরে একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন করিলেন এবং তথা হইতে তিনখানি ক্ষুদ্র জাহাজে মেজর কিলপ্যাট্রিক ও কাপ্তান কুট কিছু গোরা ও সিপাহী সৈন্য লইয়া হুগলী অভিমুখে রওনা হইলেন। ১০ই জানুয়ারী তাহারা হুগলীর সম্মুখে আসিয়া গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। দুর্গ রক্ষক নবাবী সৈন্য ভয়ে পলাইয়া গেল। দুর্গ ও ফৌজদারী সম্পত্তি, হুগলী নগরী এবং পার্শ্ববর্ত্তী ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি স্থানের সরকারী গোলাবাড়ী ও প্রজাগণের ধন সম্পত্তি এক সপ্তাহ ধরিয়া লুণ্ঠন করিয়া ইংরেজরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

সংবাদ পাইয়া ১৯শে জানুয়ারী নবাব হুগলীতে আগমন করিলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া খালের পূর্ব্ব পার্শ্বে

শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং স্বয়ং (পুরাতন শোভাবাজার ও শ্যামবাজারের মধ্যবর্ত্তী হালসী বাগানে) অমিচাঁদের বাগান বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৪০ সহস্র অশ্ব ও ৬০ সহস্র পদাতিক সৈন্য ও ৩০টি কামান ছিল। বৃটিশ পক্ষে ৭১১ জন গোরা পদাতিক ও ১০০ জন কামান চালক সৈন্য, ১৪টি কামান ও ১৩০০ সিপাহী ছিল।

৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিশেষে ইংরেজ সৈন্য বরানগরের শিবির হইতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নবাব শিবির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। অকস্মাৎ কামান গর্জ্জনে সুখ সুপ্ত নবাব সৈন্য চমকিত হইয়া উঠিল। যে যে অবস্থায় পারিল অন্ধকারে গোলাগুলি ছুঁড়িতে লাগিল। কুয়াশার ঘন আবরণে নবাব সৈন্যের সহিত ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ এক অনিশ্চিত অবস্থায় চলিতে লাগিল। অবশেষে নবাবী অশ্বারোহী সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নবাব শিবির ভেদ করিয়া ইংরেজ সৈন্য অমি চাঁদের বাগানে নবাবের তাম্বুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। নবাব অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন পথে যদিও নবাব সৈন্যের আক্রমণে ইংরেজ সৈন্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তথাপি মধ্যাহ্নকালে ফোর্ট উইলিয়মে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইল।

এই আক্রমণে ইংরেজ পক্ষে ৫৭ জন হত ও ১৩৭ জন আহত এবং নবাব পক্ষে ১৩০০ জন হতাহত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে নবাব কলিকাতা ছাড়িয়া ঢাকুরিয়ার জলাভূমিতে সরিয়া গেলেন এবং তথা হইতে সন্ধির প্রস্তাব আরম্ভ হইল। চারিদিন পর ৯ই ফেব্রুয়ারী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। নবাব পক্ষের জগৎ শেঠের সহকারী রণজিৎ রায়ের উদ্যোগে এই সন্ধি হয়। সন্ধির মর্ম্ম এইরূপ—"ইংরেজ কোম্পানী সমস্ত বাণিজ্যাধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, কোম্পানী কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করিতে পারিবেন। কলিকাতায় টাকশাল নির্ম্মাণ করিয়া কোম্পানী নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারিবেন—তজ্জন্য কোন বাটা দিতে হইবে না। কোম্পানীর যে কুঠি নবাবে দখল করিয়াছে, তাহা ইংরেজরা ফেরত পাইবেন। ইংরেজদের যে সব ক্ষতি হইয়াছে নবাব তাহা পূরণ করিবেন"।

নবাব, দেওয়ান দুর্লভ রাম ও মীরজাফর এই সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই ৯ই ফেব্রুয়ারীতে "পরস্পরের শত্রুর বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করিবেন" এইরূপ মর্ম্মে উভয় পক্ষে পত্র বিনিময় হইল। নবাব অতঃপর ক্লাইবের নিকট বিশজন ইংরেজ গোলন্দাজ চাহিয়া লইয়া ও নম্রপ্রকৃতি ওয়াটসন সাহেবকে নবাব দরবারে রাখিবার অনুরোধ করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করিলেন।

চন্দন নগর অধিকার।

নবাবকে ঠাণ্ডা করিবার পর ক্লাইবের মনে ইংরেজের চিরশত্রু ফরাসীর উচ্ছেদ কল্পনা জাগিয়া উঠিল। ফরাসীরা যাহাতে ভবিষ্যতে ইংরেজের বিরুদ্ধে নবাবকে সাহায্য করিতে না পারে তজ্জন্য বাঙলার ফরাসী শক্তিকে চিরতরে ধ্বংস করিবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। আলিবর্দ্দী যেমন তাঁহার রাজ্য মধ্যে বিদেশী কোম্পানীদিগকে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সিরাজদ্দৌলার সেই প্রকার দূরদর্শিতা ও নৈতিক বল ছিলনা। নবাবের প্রকাশ্য নিষেধ নাই বলিয়া ক্লাইব সসৈন্যে ভাগীরথী পার হইয়া চন্দন নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া রহিলেন (১২ই মার্চ্চ ১৭৫৭ খৃঃ)। তিনি চন্দননগরের ২ মাইল দূরে শিবির স্থাপন করিলেন। ওয়াটসনও জলপথে যুদ্ধ জাহাজ লইয়া অগ্রসর হইলেন। এই সময় দিল্লী হইতে আতঙ্ক-জনক সংবাদ আসিতে ছিল। ১৭৫৭ খৃঃ ২১ জানুয়ারী আফগান রাজ আহম্মদ সা আবদালীর সৈন্যগণ দিল্লী অধিকার করিয়া তাঁহার নামে খুদবা পাঠ করে এবং তাহারা শীঘ্রই পাটনা ও বাঙলা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে বলিয়া গুজব রটিতেছিল। সুতরাং সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিতে সাহসী হইলেন না। সাহায্যের জন্য ফরাসীদের কাতর প্রার্থনা তাঁহার নিকট পৌছিলেও তিনি বিশেষ কিছুই করিলেন না। কেবল মাত্র হুগলীর ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে আবশ্যকমত সসৈন্য ইংরেজদিগকে বাধা দিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে[১] নন্দকুমারও কার্য্যকালে ফরাসী দিগকে কোন সাহায্য পাঠাইলেন না।

চন্দননগরের দুর্গ (Fort-de-Orleans) প্রত্যেক দিকে ৬০০´ ফিট একটি বর্গক্ষেত্র। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত। ১৬টি কামান যুক্ত চারটি বুরুজ দ্বারা ইহা রক্ষিত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণে ১৮ ফুট উচ্চ ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

১। Hill's Bengal in 1756-57 অনুসারে নন্দকুমার ইংরেজের সাহায্যে পাকা ফৌজদার হওয়ার আশা করিয়াছিলেন। অর্ম্মি-এর মতে অমিচাঁদ প্রদত্ত ১২০০০৲ উৎকোচে কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছিল। অর্ম্মি আরও বলেন ইংরেজ চন্দননগর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া সিরাজ-উ-দ্দৌলা রাজা দুর্লভরামের অধীনে ফরাসীদের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। হুগলীর ১০ ক্রোশ উত্তরে তাহাদের সহিত নন্দকুমারের সাক্ষাৎ হয়। নন্দকুমার তাহাদের নিরস্ত করেন (Orme II, 142)।

পূর্ব্বদিকে গঙ্গাতীর দিয়া কতকগুলি দোকানঘর ছিল। অন্য তিন দিকে যে পরিখা ছিল তাহা শুষ্ক ছিল। বাহিরের কতকগুলি উচ্চগৃহ হইতে ইংরেজদের পক্ষে দুর্গে কামান দাগিবার সুবিধা ছিল। পূর্ব্বদিকের গঙ্গাগর্ভে ফরাসীরা কতকগুলি নৌকা ডুবাইয়া ইংরেজ জাহাজের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইংরেজেরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া এখানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

১৪ই মার্চ্চ রাত্রি যোগে ক্লাইব বহির্দ্দেশস্থ ফরাসী রক্ষাগৃহগুলি ভাঙিয়া দিয়া, রণতরীর অপেক্ষায় রহিলেন। ১৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় ফরাসী কামানচালক সাব-লেফ্‌টেন্যান্ট টেরানো (Cossart de Terraneau) দুর্গ ত্যাগ করিয়া ইংরেজ পক্ষে যোগদান করেন এবং অনেক মূল্যবান তথ্য বলিয়া দেন। তাহাতে ইংরেজপক্ষের গোলন্দাজগণের অনেক সুবিধা হয়। দুর্গমধ্যে ফরাসীদের ২৪৭ জন সৈনিক, ১২০ জন নাবিক, ১০০ জন ফরাসী নাগরিক, ১৫৭ জন সিপাহী ও ১০০ জন ফিরিঙ্গী বন্দুকধারী ও ৭০ জন অন্যান্য মোট—৭৯৪ জন লোক ছিল। অধ্যক্ষ Mons. Renault এই লোকবল লইয়া দুর্গ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য করিলেন।

২৩ মার্চ্চ ক্লাইব ফরাসীদের কামানগুলির উপর ইংরেজ জাহাজের ১০০টি কামান হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া ফরাসী কামানগুলি ও দুর্গ ধ্বংস করিলেন। ইংরেজ পক্ষে দুইখানি জাহাজ জলমগ্ন হইল। ফরাসীপক্ষে দুইজন কাপ্তান নিহত ও ২০০ যোদ্ধা হতাহত হইল। বেলা ৯॥টার সময় ফরাসীরা শ্বেতপতাকা উড্ডীন করিল। এই পরাজয়ে বাঙ্গালা হইতে ফরাসী আধিপত্য বিলুপ্ত হইল

চন্দননগর অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু হতাবশিষ্ট অনেক ফরাসী পলাইয়া কাশিমবাজারে নবাবের আশ্রয় পাইল ফরাসীদের সাহায্য পাইলে নবাব শক্তিশালী হইবে এই কথা চিন্তা করিয়া ইংরেজ পক্ষ উদ্বিগ্ন হইল এবং সিরাজদ্দৌলাকে নবাবীপদ হইতে সরাইয়া তাহাদের অনুকূল কাহাকেও নবাব করিতে মনস্থ করিল। জগৎশেঠ মহাতাপ রায় [১] রাজা দুর্লভরাম ও

১। কথিত আছে, সিরাজদ্দৌলা একদিন সন্ধ্যার পর জগৎ শেঠের গৃহে নারী বেশে প্রবেশ করিয়া তদীয় সুন্দরী কন্যা অসামান্যাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, জামাতা সিরাজকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সিরাজ একদিন রাজপথে শেঠ জামাতাকে হত্যা করাইয়া তাহার ছিন্ন মুণ্ড রূপার থালায় রাখিয়া তাহা বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শেঠ দুহিতার নিকট

মীরজাফর প্রভৃতি সকলেই সিরাজের নিকট অপমানিত হইয়া সিরাজের প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। এপ্রিলের শেষে কলিকাতার ইংরেজ মন্ত্রীসভা তাঁহাদের সকলেরই সহযোগিতা লাভ করিল। ১লা মে ইংরেজ পক্ষ মীরজাফরকে নবাব করিবার জন্য তাঁহার সহিত একটি গুপ্ত সন্ধিতে সম্মত হইল। মীরজাফর নিম্নলিখিত সন্ধির সর্তগুলিতে স্বাক্ষর করিলেন :—

(১) নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের যে সন্ধিপত্র হইয়াছে আমি (মীরজাফর) তাহার সমস্ত সর্ত্ত পালন করিতে সম্মত।

(২) দেশীয় বা ইউরোপীয় যে কেহ ইংরেজের শত্রু, সে আমারও শত্রু।

(৩) বাঙলায় ও বিহারে এবং উড়িষ্যায় ফরাসীগণের যে সমস্ত সম্পত্তি ও কুঠি আছে, তাহা ইংরেজগণের অধিকারে আসিবে। ফরাসীদিগকে ঐ প্রদেশগুলিতে বাস করিতে দিব না।

(৪) সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা অধিকার, লুণ্ঠন ও সৈন্যগণের ব্যয় প্রভৃতির জন্য ইংরেজগণকে এক কোটি টাকা দিব।

(৫) কলিকাতার ইংরেজদের ক্ষতিপুরণ বাবদ ৫০ লক্ষ, দেশীয়গণের ক্ষতি পূরণ জন্য ২০ লক্ষ, আরমানিগণের ক্ষতিপূরণ জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিব। কোন ব্যক্তি কিরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবে ওয়াটসন, ক্লাইব, ড্রেক, ওয়াটস, কিল-প্যাট্রিক ও বিচার তাহা ঠিক করিয়া দিবেন।

(৬) কলিকাতা যে খাত দ্বারা বেষ্টিত তন্মধ্যে যে সকল জমিদারের জমি আছে, সেই জমি ও খাতের বাহিরে ৬০০ গজ পর্য্যন্ত জমি ইংরেজ কোম্পানীকে দান করিব।

(৭) কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পী পর্য্যন্ত ভূভাগ কোম্পানীর জমিদারী হইবে।

(৮) যখন ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য চাহিব, তখন তাহার ব্যয়ভার আমার।

(৯) হুগলীর দক্ষিণে কোন স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিব না। ইংরেজ কোম্পানী তাহাদের ঢাকা ও কাশিমবাজারের কুঠী সুরক্ষিত করিতে পারিবে।

(১০) আমি ঐ তিন প্রদেশের নবাবীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই উল্লিখিত সমস্ত কার্য্য করিব।

তারিখ ১৫ রমজান। ৪ জলুস্। (১৭৫৭ খৃঃ ৪ঠা জুন।

স্বাক্ষর (মীরজাফর খাঁ)

পাঠাইয়া দেন। এই সকল ঘটনায় জগৎ শেঠ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

ইংরেজ পক্ষ হইতেও উহার অনুরূপ একখানি সন্ধিপত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়া স্বাক্ষরিত হয়ঃ—

(১) মীরজাফর খাঁ বাহাদুর উল্লিখিত সর্ত্ত সকল শপথ করিয়া স্বীকার করায় নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমরা ঈশ্বর ও বাইবেলের শপথ করিয়া স্বীকার করিতেছি যে আমরা আমাদের সমগ্র সৈন্য লইয়া তাঁহার বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী লাভে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তিনি নবাব হইয়া সন্ধিসর্ত্ত পালন করিলে তাঁহার যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যে কোন সময়ে প্রাণপণে তাঁহাকে সাহায্য করিব।

(স্বাক্ষর) ওয়াটসন, ক্লাইব, ড্রেক, ওয়াটস্, কিলপ্যাট্রিক, বিচার।

এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর কমিটির প্রাপ্য বাবদ ১২ লক্ষ ও সৈন্যাদির বাবদ ৪০ লক্ষ টাকার জন্য একখানি গুপ্ত স্বীকারপত্র লেখা হইল। অমিচাঁদের মধ্যস্থতায় সমস্ত কার্য্য হওয়ায় অমিচাঁদকে ওয়াটসের নির্দ্দেশমত ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ছিল। ওয়াটস সাহেব কাশিমবাজার কুঠী হইতে ইংরেজ পক্ষে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন।

সন্ধিপত্রসহ ১১ই জুন মীর্জ্জা আমির বেগ কলিকাতায় পৌছিলেন ও ইংরেজ কমিটির নিকট মীরজাফরের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলেন।

অমিচাঁদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্লাইব দুইখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করাইলেন। আসলখানি সাদা কাগজে ও জালখানি লাল কাগজে লিখিত হইল। এই লাল কাগজে অমিচাঁদের ৩০ লক্ষ টাকার কথা থাকিল। আসলখানিতে ইহা থাকিলনা। সকলেই দুইখানাতেই স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু ওয়াটসন জালখানিতে সহি করিতে অস্বীকার করায় ক্লাইবের কথায় যুবক লুসিংটন ওয়াটসনের নাম জাল করিয়া দিল।

১৭৫৭ খৃঃ ৪ঠা জুন রাজা দুর্লভরাম, জগৎ শেঠ প্রভৃতি সকলের সম্মতিক্রমে মীরজাফর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এদিকে ঐ দিন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা মীরজাফর খাঁকে সেনাপতির পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া খাজা হাদীকে ঐ সেরেস্তার কার্য্য বুঝিয়া লইবার আদেশ দেন। কিন্তু তখনও তিনি ষড়যন্ত্রের সন্ধান পান নাই। সিরাজ পরে মীরজাফরকে অসন্তুষ্ট করিতে সাহসী না হইয়া তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করেন।

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার পরে ১১ই জুন ক্লাইব একশত জাহাজী গোরা চন্দননগর রক্ষার জন্য রাখিয়া সমগ্র সৈন্যসহ যুদ্ধ যাত্রার সংকল্প করিলেন। ঐ তারিখেই ওয়াটস সাহেব কাশিমবাজার ত্যাগ করিয়া পরদিন বৈকাল তিনটার

সময় ইংরেজ সৈন্যদলে মিশিলেন। আয়ার কুট কর্তৃক কাটোয়ার দুর্গ সহজেই অধিকৃত হইল (১৯শে জুন)। ২১শে জুন ক্লাইব তথায় একটি সভা আহ্বান করিলেন। অধিকাংশের মতে স্থির হইল বর্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। কিন্তু ইহার এক ঘণ্টা পরেই ক্লাইব মত পরিবর্ত্তন করিয়া পরদিনই যুদ্ধযাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। ২২ জুন ইংরেজ সৈন্য কাটোয়ায় গঙ্গা পার হইয়া ঝড় বৃষ্টির মধ্যে মধ্য রাত্রিতে পলাশীর আম্রকাননে উপনীত হইল।

ইতিমধ্যে ১৭ই জুন মীরজাফরের নিকট হইতে ক্লাইব একখানি এই মর্ম্মে পত্র পাইলেন যে মীরজাফর নবাবের সহিত মৌখিক মিলন করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও ইংরেজদিগকে সাহায্য না করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, কিন্তু ইংরেজদের সহিত প্রতিজ্ঞাপত্র অনুসারেই কার্য্য করিবেন। তথাপি ক্লাইবের মনে সন্দেহ রহিয়া গেল।

এদিকে মীরজাফরের সহিত পুনর্মিলনের কার্য্য শেষ হইবার পরই সিরাজ ক্লাইবের চরম পত্র পাইলেন এবং ইংরেজরা যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছে তাহারও সংবাদ পাইলেন। তিন দিন ধরিয়া সৈন্যগণকে তিনি তাহাদের প্রাপ্য বেতন বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। নবাব প্রথমতঃ মনকরায় যুদ্ধার্থ সমবেত হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। শেষে নবাব বাহিনীও পলাশীর দিকেই অগ্রসর হইল।

ক্লাইব পলাশীতে আসিয়া যে আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিলেন তাহার নাম লক্ষবাগ। ইহার আয়তন ৮০০×৩০০ গজ। কথিত আছে ইহাতে বহু সারিতে বিভক্ত একলক্ষ আম গাছ ছিল। ইহার চারিদিক মৃন্ময় বাঁধদ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইহার উত্তর পশ্চিম কোণ ভাগীরথী হইতে ১৫০ গজ দূরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং ইহার বামপার্শ্ব ভাগীরথী দ্বারা এবং পশ্চাদ্ভাগ ১১০০ গজ দূরে অবস্থিত পলাশী গ্রাম দ্বারা রক্ষিত ছিল। আম্রবাগানের ২০০ গজ উত্তরে নদীতীরে নবাবের একটি ইষ্টকনির্ম্মিত মৃগয়াগৃহ ছিল। ইহার চারিদিক পাকা প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ক্লাইব এই মৃগয়াগৃহটি প্রথমেই অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার ছাদ হইতে রণক্ষেত্র পরিদর্শনের সুবিধা ছিল। এই মৃগয়াগৃহের ৪০০ গজ উত্তরে নদীর অনতিদূরে চারিদিকে উচ্চ পাহাড় বিশিষ্ট একটি বড় পুকুর এবং তাহার ১০০ গজ উত্তরে একটি ছোট পুকুর ছিল। এই স্থানের প্রায় ৫০০ গজ উত্তরে ও নদীতীর হইতে ৪০০ গজ পূর্ব্বে একটি জঙ্গলাবৃত উচ্চ ভূখণ্ডে নবাবের নিজের

শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার প্রবেশমুখে নবাবের সৈন্যগণ পাহারা দিতেছিল। নবাব শিবিরের দক্ষিণে একটি মৃৎপ্রাকার ও আরও দক্ষিণে একটি পরিখা ছিল। আম্রকানন ও এই পরিখার মধ্যস্থলে উক্ত পুকুরদ্বয়ের মধ্যে মীরমদন ও মোহনলালের সৈন্যদল স্থানগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার দক্ষিণে বড় পুকুরের পাহাড়ে ফরাসী সিন্‌ফ্রে (Monsieur de Sinfray)-র অধীনে ৪৬ জন ফরাসী গোলন্দাজ ৮টি কামান লইয়া নবাবপক্ষে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ছিল। ইহাদের বামে পরিখার দক্ষিণ পার হইতে প্রায় পলাশী গ্রাম পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দুর্লভরাম, ইয়ারলতিফ ও মীরজাফরের সৈন্যদল অবস্থিত ছিল। নবাব পক্ষে ৩৫০০০ পদাতিক, ১৫০০০ অশ্বারোহী ও ৪০টি কামান ছিল।[১] ইহাদের অধিকাংশই ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিত্রয়ের অধীনে পরিচালিত হইতেছিল।

নবাবের এই বিশাল সৈন্যদলের দক্ষিণে আমবাগানের সম্মুখে মৃগয়াগৃহ পর্য্যন্ত ক্লাইবের ৯৫০ জন গোরা পদাতিক সৈন্য, ১৫০ জন গোরা গোলন্দাজ (ইহাদের মধ্যে ৫৭ জন নাবিক) এবং ২১০০ সিপাহী পদাতিক সৈন্য (লালপল্টন) যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছিল। মধ্যস্থলে মেজর কিলপ্যাট্রিক, আর্কিবল্ড গ্র্যাণ্ট, আয়ারকুট ও ক্যাপ্টেন গৌপ চারিটি ব্যাটালিয়নে বিভক্ত গোরাসৈন্যদলকে পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের দুই পার্শ্বে দুইভাগে বিভক্ত সিপাহী সৈন্যদল এবং গোরা পদাতিক সৈন্যের কিয়দ্দূর সম্মুখে প্রত্যেক পার্শ্বে ৩টি করিয়া কামান স্থাপিত হইয়াছিল।

১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার (১১৭০ হিঃ ৫ই শওয়াল) প্রাতে সেই বিপুল নবাব বাহিনী ইংরেজগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইল সেই রক্তাস্তরণ শোভিত রণহস্তী, সুসজ্জিত অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যশ্রেণী, ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গগনভেদী পতাকাবলী ইংরেজদের হৃৎকম্প উপস্থিত করিল। মৃগয়াগৃহের উপর হইতে নবাবসৈন্য দর্শন করিয়া অসম সাহসিক সেনাপতি ক্লাইবের হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে হইল মীরজাফরের দল প্রতিকূল আচরণ করিলে একজন ইংরেজও সংবাদ দিতে ফিরিবে না।

সকাল ৮টার সময় নবাব পক্ষে ফরাসীগণই প্রথম কামান দাগিল।

১। ক্লাইব স্বয়ং এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন (Letter to the Secret committee, Life Vol I p. 263)। অর্মির মতে ১৮ হাজার অশ্বারোহী, ৫০০০০ পদাতিক ও ৫০টি কামান ছিল।

চন্দননগরের সন্ত পরাজবের প্রতিহিংসা তখনও বোধ হয় তাহারা ভুলিতে পারে নাই। অতঃপর নবাবসৈন্তের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে কামানের গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, কিন্তু অধিকাংশ গোলা উর্দ্ধপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। ফরাসীদের প্রথম গোলায় ইংরেজপক্ষে একজন হত ও একজন আহত হইল। ইংরেজরাও তাহাদের কামান হইতে অগ্রগামী নবাবসৈন্তের উপর গোলাবৃষ্টি করিয়া বহুসংখ্যক শত্রুর ধ্বংস সাধন করিল, কিন্তু এই কামানগুলির গোলা দূরগামী না হওয়ায় বিপক্ষের কামানগুলিকে নিস্তব্ধ করিয়া দিতে পারিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ইংরেজদের ৩০ জন সৈন্য হতাহত হইল। তখন ইংরেজ সৈন্য বৃক্ষান্তরালে বাঁধের নীচে বসিয়া পড়িতে আদিষ্ট হইল এবং বাঁধের আড়াল হইতে বাঁধের দেওয়ালে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে কামান দাগিয়া প্রতিপক্ষের অগ্রগতি রোধ করিতে লাগিল।

তিন ঘণ্টাকাল এইরূপ ভাবে চলিবার পর ১১টার সময় ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহাতে পলাশীর মাঠ কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল এবং নবাবের সমস্ত বারুদ ভিজিয়া কার্য্যের অনুপযুক্ত হইল; ইংরেজপক্ষে তাহাদের বারুদ সাবধানে ঢাকিয়া রাখাতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইল না। বৃষ্টি থামিলে মীরমদন ইংরেজদের বারুদও ভিজিয়া গিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া শত্রু নিপাতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ইংরেজদের কামানের পাল্লার মধ্যে আসিবা মাত্র ইংরেজ কামানের অব্যর্থ গোলাবৃষ্টির ফলে মীরমদনের বহু সৈন্য হতাহত হইল এবং স্বয়ং মীরমদন সাংঘাতিক আহত হইয়া সিরাজ শিবিরে নীত হওয়ার পর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বন্দুকধারী দলের সেনাপতি বাহাদুরআলিখাঁ কামানাধ্যক্ষ নওয়েসিংহ হাজারী ও আরও কতিপয় উচ্চপদস্থ সেনানীও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন নবাবের হতাবশিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যদল মুখ ফিরাইয়া তাহাদের পরিখা অভিমুখে সরিয়া গেল। অপরাহ্ণ ২টার সময় ক্লাইব মৃগয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, নবাব সৈন্যের সমস্ত কামান নিস্তব্ধ এবং সৈন্যদল নবাব শিবিরের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে। কারণ ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার ফল ফলিতে আরম্ভ করিতেছিল। মীরমদনের পতনের পর নবাব ভীত হইয়া মীরজাফরকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইলে অবশেষে পুত্র মীরণ ও খাদেম হোসেন খাঁ প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সহিত সশস্ত্র দলবদ্ধ হইয়া তিনি নবাব শিবিরে উপনীত হইলেন। মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর কথা স্মরণ করিয়া দিয়া নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় ও পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাজ

মুকুট তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া সিরাজ নিজ জীবন ও সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন জানাইলেন। কিন্তু মীরজাফর বহুদিন হইতে যে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহাই আগত দেখিয়া ছলনাপূর্ব্বক কোরাণ স্পর্শ করিয়া উত্তর দিলেন 'অগ্য দিবা অবসান প্রায়। আর আক্রমণের সময় নাই। সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করুন। যাহারা যুদ্ধ করিতেছে তাহারা এখন শিবিরে ফিরিয়া আসুক। কল্য আমি সমগ্র সৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধের ব্যবস্থা করিব।' এদিকে নবাব শিবির হইতে মীরজাফর বাহির হইয়া নিজ সৈন্যদলের নিকট আসিয়াই ক্লাইবকে পত্রদ্বারা জানাইলেন 'এখনই নবাব শিবির আক্রমণ করিবেন। নিতান্ত অসুবিধা হয় রাত্রিযোগে আক্রমণ করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে।' ইতিমধ্যে মোহনলাল[১] মহাবিক্রমে ইংরেজ সৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন; তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার পদাতিকদল ক্রমাগত প্রবল অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। ফরাসী সিনফ্রেও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অবিরাম কামানের গোলা নিক্ষেপ করিতেছিল, এমন সময় নবাবের আদেশ পাইয়া নবাবপক্ষের সমগ্র সৈন্যদল পশ্চাদপদ হইতে লাগিল। শত্রুরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে দেখিয়া কিলপ্যাট্রিক দুই দল সৈন্যসহ আমবাগানের বাহিরে আসিলেন। ক্লাইব তখন মৃগয়াগৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। কিলপ্যাট্রিক অগ্রসর হইবার অনুমতি চাহিলে ক্লাইব বাহিরে আসিয়া প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া কিলপ্যাট্রিককে অবশিষ্ট সৈন্য আমবাগান হইতে বাহিরে আনিতে বলিয়া স্বয়ং সৈন্যপরিচালনা আরম্ভ করিলেন এবং সিনফ্রের অসহায় দলটিকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিলেন। বিপক্ষের প্রবল আক্রমণে বাধ্য হইয়া সিনফ্রে সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপদ হইয়া নবাব শিবিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ প্রাকারের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন। তখন ক্লাইব সিনফ্রের বৃহৎপুকুরের অবস্থানটি অধিকার করিয়া তথায় কামান স্থাপন করিলেন এবং শত্রু শিবিরে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সুযোগের অপেক্ষা করিয়া শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অল্পক্ষণ মধ্যেই দেখিতে পাইলেন, একদল নবাব সৈন্য যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছে। নবাবের সৈন্যদলের মধ্যে সকলেই বিশ্বাসঘাতক ছিলনা। একদল রাজপুত ও একদল সিয়া (পারসীক) সৈন্য যুদ্ধ না করিয়া পলাইয়া যাওয়া অপমানজনক মনে করিয়া

১। মীরজাফর যখন নবাবকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার পরামর্শ দিতেছিলেন তখন মোহনলাল এই বলিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন যে তাহা হইলে সৈন্যদল মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। (মুতাক্ষরীণ)

কোন সেনানায়কের অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধার্থ ইংরেজের সম্মুখীন হইল। কিন্তু তাহারা অধিক অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। বৃষ্টিতে ভূমি কর্দমে পরিণত হইয়াছিল, তাহাদের অশ্বের ক্ষুর ও ভারী কামানের চক্র সমূহ এবং কামানবাহী বলদের ক্ষুর সেই পঙ্কে প্রোথিত হওয়ায় অগ্রগমনে বাধা জন্মিতে ছিল। অপর দিকে ২০০ গজ ব্যবধান হইতে ইংরেজের কামান সমূহের উদ্গীরিত ভীষণ গোলাসমূহ পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। যদিও সিনফ্রের কামানগুলি এই সময় প্রাকার হইতে এবং নবাবপক্ষের কতক গোলন্দাজ প্রাকারের পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত পাহাড়ের উপর হইতে মধ্যে মধ্যে গোলাবর্ষণ করিয়া ইংরেজ সৈন্যদলকে হতাহত করিতেছিল (Broome, 148), তথাপি নবাবের এই সৈন্যদলও আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। নবাবব্যূহের কেন্দ্রে ও বামপার্শ্বে অবস্থিত মীরজাফর, দুর্লভরাম ও ইয়ারলতিফের সৈন্যদল একটিও গোলাবর্ষণ না করিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছিল। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ক্লাইব তাঁহার সমগ্র বাহিনী একত্র করিয়া চূড়ান্ত আঘাত দিয়া নবাবপক্ষের সমস্ত শক্তি চূর্ণ করিয়া দিলেন। নবাব স্বয়ং যুদ্ধ শেষ না হইতেই ৪ ঘটিকার সময় শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার ত্যক্ত হতাবশিষ্ট বিশৃঙ্খল ও আতঙ্কগ্রস্ত সৈন্যদলকে পুনরায় একত্র করিয়া পরিচালিত করিবার কেহই রহিল না। মোহনলাল, মানিকচাঁদ[১], খাজা হাদী আহত হইয়া স্থানান্তরে নীত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় ক্লাইব যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। সেই রাত্রেই ক্লাইবের সৈন্যদল সুশৃঙ্খলার সহিত ছয়মাইল পর্য্যন্ত নবাবের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দাদপুরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিল। এখানে পুত্র মীরণ ও সহচরগণের সহিত মীরজাফর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুর্শিদাবাদে চলিলেন। এই যুদ্ধে ৫০০ হত ও প্রায় ঐ পরিমাণ আহত হয়। ইংরেজ পক্ষে ৭ জন গোরা, ১৬ জন সিপাহী হত, ১০ জন গোরা ও ৩৬ জন সিপাহী আহত, মোট ৭২ জন হতাহত হয়[২]।

১। মানিকচাঁদ বাঙালী কায়স্থ ছিলেন।

২। ইংরেজদের সরকারী হিসাব অনুসারে ১৬ জন হতাহত এবং ৪ জন নিরুদ্দিষ্ট মোট ৮০ জন সৈন্য ক্ষতি হইয়াছিল [মেজর ব্রাইগেড জন ফ্রেজারের স্বাক্ষরযুক্ত হিসাব— (Hill, II, 425)]। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে নবাবপক্ষে ১২০০০ সৈন্য ও ১২টি কামান, ইংরেজপক্ষের ৩২০০ সৈন্য ও ৮টি কামানের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। ইংরেজপক্ষে Grape firing gun থাকায় তাহাদের বহু সুবিধা হইয়াছিল।

সিরাজ-উ-দ্দৌলার পরিণাম।

সিরাজ একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রে চড়িয়া মধ্যরাত্রে রাজধানী মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলেন। সামন্তবর্গের অনেকেও সেই রাত্রিতেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিরাজ আদেশ দিলেন, যে পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান সেনানীগণ যেন তাঁহার শরীর রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু এক্ষণে কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। সিরাজের শ্বশুর ইংরেজ খাঁও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে গমন করিল। পাত্র মিত্র ও সৈন্যগণ সকলেই তাঁহাকে ক্রমে ত্যাগ করিল দেখিয়া সিরাজ নিজের শরীর রক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। এজন্য তিনি মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিলেন। কিন্তু যে যাহার মত অর্থ লইয়া চলিয়া গেল। কেহই তাঁহার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল না।

এইরূপে সহায়হীন অবস্থায় ২৪শে জুন (১৭৫৭ খৃঃ) সমস্তদিন রাজধানীতে অতিবাহিত করিয়া সিরাজ অতীব চিন্তাকুল ও ভয়বিহ্বল হইলেন। অতঃপর গভীর রাত্রে লুৎফউন্নিসা ও অন্যকয়েকজন প্রিয়তমা বেগমকে ধনরত্নসহ দ্রুতগামী গোযানে উঠাইয়া ও স্বয়ং নিজের মনোমত দ্রব্যাদি লইয়া হস্তিপৃষ্ঠে উঠিয়া মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। পরদিন মীরজাফর মুর্শিদাবাদে আসিয়া নিজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৯শে জুন ক্লাইব রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া প্রাসাদের নিকট মুরাদবাগে শিবির স্থাপন করিলেন এবং অপরাহ্নে হীরাঝিল প্রাসাদে গমন করিয়া তথায় সমবেত সামন্ত রাজগণ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণসহ মীরজাফরকে হস্তধারণপূর্ব্বক মসনদে উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন। অতঃপর সমবেত সকলেই উপযুক্ত নজর দিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের সমর্থন জানাইলেন (Hill, Vol II 437)। মীরজাফর রাজা দুর্লভরামকে প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করিয়া সিংহাসন সুরক্ষিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই সুবে বাংলায় মুসলীম শাসনের অবসান ঘটিল এবং বিদেশী ইংরেজ ইহার শাসক নির্ব্বাচক ও ভাগ্য নিয়ন্তা হইল।

এদিকে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা স্থলপথে পদ্মাতীরে ভগবান গোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে নৌকায় আরোহণ করিয়া উজানপথে ফরাসী নায়ক মঁসিয়ে জীন ল ও নায়েব নাজিম রামনারায়ণের সাহায্য পাইবার আশায় পাটনা অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ৩০শে জুন রাজমহলের কিছু ভাটিতে আহার অন্বেষণে তীরে অবতরণ করিলেন। তাঁহার দীনবেশ সত্ত্বেও দান শা

নামক একজন ফকির এখানে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া রাজমহলের শাসনকর্ত্তা মীরজাফরের ভ্রাতা মীর দাউদকে সংবাদ দিলে তিনি সিরাজকে বন্দী করিয়া সৈন্ত পাহারায় মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। সিরাজ তাঁহার সুসময়ে এই ফকিরের নাক কান কাটাইয়া দিয়াছিলেন।

১৭৫৭ খৃঃ ২রা জুলাই রাত্রিতে সিরাজ মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের প্রকোষ্ঠে আনীত হইলেন। মীরজাফর তাঁহাকে পুত্র মীরণের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিশ্রামার্থ প্রকোষ্ঠান্তরে চলিয়া গেলেন। নিষ্ঠুর মীরণ সেই রাত্রেই নিজ শয্যা-কক্ষের পার্শ্বে একটি কক্ষে সিরাজকে বন্দী করিয়া সেই কারাকক্ষে তাঁহার বধ সাধন করাইলেন[১]। ইংরেজরা তখন ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলনা। মহম্মদীবেগ নামক মীরণের অনুরক্ত এক ব্যক্তি এই নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ডের ভার গ্রহণ করে। সিরাজের আগমনের দুই তিনঘণ্টা পরে এই ব্যক্তি সুতীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে তাঁহার কারাকক্ষে প্রবেশ করে। তাহাকে দেখিয়াই সিরাজ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন ঘাতকের নির্ম্মম তরবারি প্রচণ্ডবেগে তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। কয়েকবার আঘাতের পর 'আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। হোসেন-কুলীর প্রতিশোধ হইল' বলিতে বলিতে সিরাজ ধরাশায়ী হইলেন। অবিলম্বে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে মৃত নবাবের ক্ষতবিক্ষত দেহ হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া নগরের রাজপথে প্রদক্ষিণ করান হইল। গোলামহোসেন (মুতাক্ষরীন) লিখিয়াছেন, প্রদক্ষিণ কালে হস্তী ঠিক হোসেনকুলীখাঁর বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইলে, সিরাজের আহত দেহ হইতে কয়েক ফোঁটা রক্ত, হোসেনকুলী যেখানে হত হইয়াছিলেন, ঠিক সেইখানেই পতিত হয়।

হস্তীপৃষ্ঠে সিরাজের দেহ যখন তাঁহার মাতা আমিনা বেগমের দ্বারদেশে

১। সিরাজের ভ্রাতা মীর্জ্জা মেহেদী ও অপর মৃত ভ্রাতা আক্রামউদ্দৌলার পুত্র মুবারুদ্দৌলাকেও মীরণের আদেশে হত্যা করা হয়। সৌকতজঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জ্জা রমজানআলির পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। এইরূপে আলিবর্দ্দীর বংশ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়। মুতাক্ষরীণের মতে সিরাজ-উ-দ্দৌলা ধৃত হইয়া মধ্যাহ্নে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিলেন। তখন মীরজাফর মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে নিদ্রিত ছিলেন। মীরণ সিরাজকে আপনার শয়ন কক্ষের পার্শ্বে একটি প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখেন এবং দুই তিন ঘণ্টা পরে মহম্মদীবেগ তাঁহাকে হত্যা করে।

উপস্থিত হইল, তখন আমিনা বেগম পর্দা ভেদ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে রাজপথে ছুটিয়া আসিয়া ধূল্যবলুন্ঠিত হইলেন। মীরজাফরের অনুগত খাদেম হোসেন খাঁ নিজ প্রাসাদের উপর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া লোক পাঠাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার নিজ বাটীতে পুনঃপ্রবেশ করাইলেন। সিরাজের মৃতদেহ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে খোসবাগের সমাধি মন্দিরে আলিবর্দ্দীর পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। অতঃপর বাঙ্গালা তথা ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়।

সিরাজ যে সময় রাজমহলে ধৃত হইয়াছিলেন, সেই সময়েই প্রভুপরায়ণ বীর মোহনলাল ভগবানগোলায় ধৃত হন এবং রাজা দুর্ল্লভরামের হস্তে সমর্পিত হন। রাজা দুর্ল্লভরাম তাঁহার বিপুল অর্থ হস্তগত করেন এবং সম্ভবতঃ দুর্লভরামের প্ররোচনায় তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনলালের জীবননাশ ঘটে। মোহনলালের পুত্র পূর্ণিয়ার ফৌজদার ছিলেন। তিনিও পরে কারারুদ্ধ হন এবং ঐ কারাগার হইতে তিনি বাহিরে আসিয়াছিলেন কিনা ইতিহাস তাহার খবর রাখে না।

সিরাজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র সম্বন্ধে মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, নবাব পরিবারের একদল দুশ্চরিত্র যুবকের সহিত সিরাজ সর্ব্বদাই জঘন্য ব্যবহারে লিপ্ত হইত। পদমর্য্যাদা, বয়স বা স্ত্রীপুরুষ কিছুই গ্রাহ্য করিত না। তাহার কামাসক্তির নিকট ইচ্ছামত স্ত্রীপুরুষের বলিদান ও যৌবনসুলভ চাপল্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপরই অনাচার চলিতে লাগিল। পাপপুণ্যের ভেদজ্ঞান রহিত হওয়ায়, সে নিকট কুটুম্বও মানিত না। আত্মহারা লোকের মত সম্মানী ও উচ্চবংশীয় লোকের ভবনেও কুক্রিয়ার পণ্যশালা প্রস্তুত করিতে সে কুণ্ঠিত হইত না।

সমাময়িক ফরাসী জিন ল (Jean Law)র বিবরণীতে সিরাজের দ্বারা বর্ষাকালে খেয়ার নৌকা ডুবাইয়া আমোদ দেখা, ঘাটে ঘাটে চর পাঠাইয়া গঙ্গাস্নানের জন্য সমাগতা সুন্দরী স্ত্রীলোক ধরিয়া আনাইবার কথা লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য মুসলমান ইতিহাসেও সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা লিখিত আছে। পরবর্ত্তী কালেও গর্ভিণীর গর্ভবিদারণ, জনপূর্ণ নৌকা নিমজ্জন প্রভৃতি বহু প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। নারীর ছদ্মবেশে জগৎশেঠের ভবনে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যার ধর্ম্মনাশের চেষ্টার কাহিনী পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। রাণীভবানীর বিধবা কন্যা তারাঠাকুরাণীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করা ও তারাঠাকুরাণীকে জিয়াগঞ্জের মস্তরাম বাবাজীর (স্বামী সদানন্দ)

আখড়ায় লুকাইয়া রাখিয়া মিথ্যা চিতা সাজাইয়া তাহার মৃতদেহ পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ রটনা করিয়া তাহাকে নদীপথে মথুরায় প্রেরণ করার কাহিনীও উত্তরবঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। মূতাক্ষরীণের অনুবাদক মুস্তাফা লিখিয়াছেন, ফৈজি নাম্নী এক সুন্দরী নর্ত্তকীকে লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে সিরাজ দিল্লী হইতে আনয়ন করেন। পরে এই নর্ত্তকীকে অন্যের প্রতি আসক্ত সন্দেহে সিরাজ তাহাকে ইষ্টক নির্ম্মিত এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া উহার দ্বারাদি ইষ্টক দ্বারা বন্ধ করিয়া দেন। তিন মাস পর তাহার শুষ্ক মৃত দেহ বাহির করা হয়। মুস্তাফা তাহার কয়েকখানি চিত্র বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন।

সিরাজের প্রণয়িনী লুৎফুন্নেছা মোহনলালের কন্যা ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। মোহনলালকে কেহ কেহ কাশ্মিরী কেহ কেহ বাঙালী কায়স্থ বলিয়া মনে করেন। নিজামত রেকর্ডে উমদৎ-উন্নেসা নাম্নী সিরাজের আর এক স্ত্রীর উল্লেখ আছে। খোসবাগের সমাধিগৃহে সিরাজের পদ প্রান্তে উভয়েরই সমাধি আছে।

নবাবী আমলের শাসন ব্যবস্থা।

গ্রাম্য সমিতি, প্রধান ও মণ্ডলের হস্তে গ্রাম শাসনের ভার প্রাচীনকালের মতই ন্যস্ত ছিল। চৌধুরী বা ভৌমিকগণ প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া জায়গীরদার বা স্বয়ং সুলতান বা নবাবের সেরেস্তায় প্রেরণ করিতেন। ভৌমিক বা জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় বিচার ও শাসন কার্য্যে স্বাধীন ছিলেন। নবাবী আমলে সুবে বাংলায় দশটি ফৌজদার বিভাগ ছিল—ইছলামাবাদ (চট্টগ্রাম), শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর (ঘোড়াঘাট); রাঙ্গামাটি, জালালগড় (পূর্ণিয়া), আকবর নগর (রাজমহল), রাজসাহী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বক্স বন্দর (হুগলী)। ইহা ব্যতীত মুর্শিদাবাদ সহরে একজন ফৌজদার ছিলেন ও সুজার্খার সময় ত্রিপুরার যে অংশ অধিকৃত হয় তথায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত হন। ফৌজদারদের অধীনে পাঁচশত হইতে সহস্রাধিক সৈন্য থাকিত (মূতাক্ষরীণ)। বিদ্রোহী জমিদারকে দমন করা, দস্যু তস্করাদিকে শাসন করা ও সুবাদারকে সাহায্য করা ও দেশের শান্তিরক্ষা ফৌজদারদের কার্য্য ছিল। ফৌজদারের অধীনে থানাদার ছিল।

প্রত্যেক সুবায় সদরস্ সদুর নামে বাদশাহ নিয়োজিত একজন প্রধান বিচারপতি ছিলেন। নবাবী আমলে নবাব নাজিমের অধীনে মুর্শিদাবাদে 'দার-উল-কাজী' নামক প্রধান বিচারালয়ে ঐরূপ একজন প্রধান বিচারপতি

ছিলেন। ইনি প্রদেশের কাজিগণের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল শুনিতেন। তদ্ব্যতীত তথায় সদর নিজামত, সদর দেওয়ানী ও সদর ফৌজদারী আদালত ছিল।

প্রত্যেক সুবায় একজন প্রধান কানুনগো থাকিতেন। তিনি রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অধীনে প্রত্যেক পরগণায় একজন পরগণী কানুনগো থাকিত। ইহাদের হস্তে প্রত্যেক পরগণার জমাবন্দী থাকিত। প্রধান কানুনগোর হস্তে সমস্ত সুবার সবিস্তার জমাবন্দী থাকিত। সদর রাজস্বের শতকরা আট আনা প্রধান কানুনগোর রসুম ছিল। সুবে বাঙ্গালার প্রথম প্রধান কানুনগো ছিলেন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভগবান রায়। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবী কেল্লার সম্মুখে ভাগীরথীর অপর পারে ডাঙ্গাপাড়ায় বাস করিতেন।

এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদ সদরে নিম্নলিখিত মন্ত্রী ছিল :—

১। দেওয়ান-ই-আলা (প্রধান মন্ত্রী)। ২। দেওয়ান খানসা শরিফা (রাজস্ব মন্ত্রী)। ৩। দেওয়ান-ই-তন (তনখা দেওয়ান বা Paymaster General) ৪। দেওয়ানী-ই-বেয়ুতাৎ (Home Secretary) ৫। দেওয়ান খানসমান (Lord High Steward)।

সামরিক বিভাগে ছিল (১) মীরবকসীকুল (প্রধান সেনাপতি বা সেপাহশালার আজম) (২) বক্‌সী জুয়েম, সুয়েম, চাহারম্ ইত্যাদি (৩) বক্সী আহবাদিয়ান (Commander of Royal guards) (৪) বকসী সাগেদ পাশা (চোপদারদের নায়ক), (৫) বক্সী সুবাজাৎ (নায়েব সুবার সেনাদের সেনাপতি) (৬) জমাদার (পদাতিকদের সেনানায়ক)।

দৌত্য বিভাগে ছিল—(১) এলচিয়ান্ (Ambassadors) ও উকীল (২) ওয়াকেনবিদ (দরবারের দৈনিক বিবরণ লেখক) (৩) সওয়ানে নেগার (সরকারী সংবাদপত্র লেখক)।

ফৌজদারী বিভাগে ছিল—(১) ফৌজদার (২) থানাদার (৩) কোতোয়াল (৪) দারোগা-ই-দাগ।

নৌ বিভাগে—মীর বহর (Commander of the Navy) ছিলেন সর্ব্বপ্রধান।

২১। নবাব মীরজাফর আলি খাঁ

(১৭৫৭ খৃঃ ২রা জুলাই-১৭৬০ খৃঃ ১৮ই অক্টোবর)।

১৭৫৭ খৃঃ ২৯ জুন বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর 'সুজাউলমুলক হিসামুদ্দৌলা মীরজাফর আলিখাঁ বাহাদুর মহব্বৎজঙ্গ' উপাধি লইয়া নবাব হইলেন। পুত্র

মীরণকে সাহামৎজঙ্গ ও ভ্রাতা কাজেমখাঁকে হায়বৎজঙ্গকে উপাধি প্রদত্ত হইল। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণকে নিজ নিজ কার্য্যে বহাল রাখিয়া পরওয়ানা জারী হইল।

পরদিন ক্লাইবের সহিত দেনা পাওনার কথা উঠিলে মীরজাফর বলিলেন প্রতিশ্রুত অর্থ রাজকোষে নাই। ক্লাইব বলিলেন, জগৎশেঠকে লইয়া ইহার মীমাংসা করা হউক। তখন ক্লাইব, মীরজাফর, দুর্ল্লভরাম, ওয়াট্‌স্ প্রভৃতি শেঠভবনে গমন করিলেন। অমিচাঁদ তথায় উপস্থিত থাকিলেও কেহই তাহাকে ডাকিল না। তথাপি তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শেঠ গৃহে চলিলেন। কিন্তু মন্ত্রণাগারে কেহ তাহাকে আহ্বান করিল না। তিনি বহির্দ্দেশে বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রণাগারে সন্ধিপত্রগুলি পঠিত ও স্বীকৃত হইল। রাজকোষে আবশ্যকীয় অর্থ না থাকায় স্থির হইল স্বীকৃত অর্থের অর্দ্ধাংশ তখনই প্রদত্ত হইবে। ইহার দুইভাগ নগদ মুদ্রা ও একভাগ মণিমুক্তাদি দ্বারা পরিশোধিত হইবে। অপরার্দ্ধ তিনবৎসরে শোধ করা হইবে। রাজা দুর্লভরামকে প্রকাশ্য সন্ধিপত্রে স্বীকৃত এককোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন এখনই নগদ দেওয়া হইল। অমিচাঁদকে ক্লাইবের আদেশে ক্রাফটন হিন্দি ভাষায় বলিয়াছিলেন "অমিচাঁদ, লাল সন্ধিপত্র ছলমাত্র, তুমি কিছুই পাইবে না।" অমিচাঁদ এই কথা শুনিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।[১]

এই উপলক্ষে কলিকাতায় ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ যে অর্থ লাভ করেন, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কমনস্ সভায় কমিটি তাহার এইরূপ হিসাব দিয়াছেন—

১।	গভর্ণর ড্রেক	—	২৮০০০০৲
২।	কর্ণেল ক্লাইব	—	২০৮০০০০৲
৩।	ওয়াট্‌স্	—	১০৪০০০০৲
৪।	মেজর কিলপ্যাট্রিক	—	৫৪০০০০৲
৫।	ম্যানিংহাম	—	২৪০০০০৲

১। অর্ম্মি (Orme) বলেন অমিচাঁদকে পাল্কীতে করিয়া তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তথায় তাঁহার উন্মাদের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অল্পকাল পরে উন্মত্ত অবস্থায় তিনি মালদহের এক তীর্থস্থানে (রামকেলী ?) গমন করেন। যখন ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষিপ্তাবস্থা। এই সময় তিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাদি ধারণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে দেড় বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৬।	অন্য ছয়জন কাউন্সিলর	—	৬০০০০০৲
৭।	ওয়ালস্	—	৫০০০০০৲
৮	ক্রাফটন	—	২০০০০০৲
৯।	লুসিংটন	—	৫০০০০৲
			৫৫৩০০০০৲

অতঃপর কোম্পানীকে স্বীকৃত অর্দ্ধাংশ টাকা মধ্যে নগদ ৭২৭১৬৬৬৲ টাকা প্রথমে প্রদত্ত হইল এবং সিন্দুকে পুরিয়া তাহা তরণীযোগে কলিকাতায় প্রেরিত হইল। ৯ই আগষ্ট ১৬৫৫৩৫৮৲ টাকা ও ৩০শে আগষ্ট স্বর্ণ জহরৎ ও রৌপ্য মুদ্রায় ১৫৯৩৭৩৭৲ রাজা দুর্লভরাম পরিশোধ করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট ৫৮৪০৯৫৲ টাকা আরও কিছুদিন বাকী ছিল (Orme)। পুর্ব্বেই ম্যানিংহাম বিজয় সংবাদসহ বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যে কোম্পানীর এইরূপ ভাগ্য পরিবর্ত্তনে ক্লাইবের যশঃসৌরভে দিগন্ত পুর্ণ হইল।

পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা ফরাসী মুঁসে ল'কে তাঁহার সাহায্যার্থ আসিবার জন্য পাটনায় পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং তৎসহ পাটনার বাকী খাজনায় তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দশহাজার টাকা তাঁহাকে দিবার আদেশপত্র পাঠাইয়াছিলেন। টাকা পাইতে বিলম্ব হওয়ায় 'ল' যথাসময়ে আসিতে পারেন্ নাই। তেলিয়াগড়ীর নিকটে আসিয়া পলাশীযুদ্ধের ফল জানিতে পারিয়া 'ল' পাটনায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। বিহারের নায়েব-নবাব রাজা রামনারায়ণ বঙ্গের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন নাই। 'ল' তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া পাটনা অঞ্চলে গোলযোগ বাধাইতে পারেন আশঙ্কা করিয়া ক্লাইব মিরজাফরের পরামর্শক্রমে মেজর কুটের অধীনে একদল ইংরেজসৈন্য তথায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ফরাসী 'ল' অযোধ্যার নবাবের আশ্রয়ে চলিয়া যাওয়ায় এবং রাজা রামনারায়ণ বশ্যতা স্বীকার প্রদর্শন করায় ১৩ই সেপ্টেম্বর কুট সদলবলে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। কুটের সৈন্যদলের কতক কাশিম-বাজারে, কতক চন্দননগরে প্রেরিত হইল। ক্লাইব অতঃপর কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

এই সময় মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজা রামসিংহকে হিসাব নিকাশের জন্য মুর্শিদাবাদে আসিবার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং না আসিয়া দুইজন আত্মীয়কে প্রেরণ করেন। ইহাতে নবাব মীরজাফর ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ আত্মীয়দ্বয়কে

নজরবন্দী এবং খাজা হাদীকে রাজা রামসিংহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু ক্লাইবের চেষ্টায় রাজা রামসিংহের সহিত নবাবের মিলন সাধিত হয়।

এদিকে পূর্ণিয়ার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী অচলসিংহ ও হাজির আলি বিপ্লবের সুযোগে শাসনকর্ত্তা মোহনলালের পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া সমগ্র দেশ করায়ত্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। বিহারের রাজা রামনারায়ণের ভাবও সন্দেহাতীত ছিল না। ইতিমধ্যে ক্লাইব ছাপড়া হইতে ইংরেজ রেসিডেণ্টের প্রেরিত এক ষড়যন্ত্রের সংবাদ নবাবকে জানাইলেন। সংবাদটি এই যে, ইংরেজ পক্ষের গুপ্তচর আলিবর্দ্দী বেগমের লিখিত রামনারায়ণের নামের একপত্র ধৃত করিয়াছে তাহাতে রামনারায়ণকে অযোধ্যার নবাবের সহযোগে মীরজাফরকে নবাবী হইতে বিতাড়িত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সিরাজের পতনের পরেও দুর্লভরাম আলিবর্দ্দী বেগমের প্রাসাদে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত ও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এজন্য দুর্লভরামকে এই ষড়যন্ত্রের মূল বলিয়া নবাবের সন্দেহ হইল। কিন্তু ওয়াটসের মধ্যস্থতায় দুর্লভরাম ও নবাবের মধ্যে মৌখিক মিলন সাধিত হইল।

ইতিমধ্যে ঢাকা অঞ্চলে কতিপয় লোক নবাব সরফরাজ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র আমানীখাঁকে নবাব করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। এই সময় মীরজাফরের অনুপস্থিতিতে তৎপুত্র মীরণ এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিলেন যে সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মীর্জ্জামেহেদিকে নবাব করিবার জন্য রাজারামনারায়ণ অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌলা ও ফরাসী 'ল' সাহেবের সহযোগে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছেন (Orme II, 271)। কিন্তু ১০ই নভেম্বর মুর্শিদাবাদ সহরের সকলেই জানিতে পারিল, গত রাত্রে মীরণ আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রাসাদে ঘাতক পাঠাইয়া বালক মীর্জ্জা মেহেদিকে হত্যা করিয়াছেন এবং আলিবৌর্দ্দবেগম ও আমিনাবেগমকে ঢাকায় প্রেরণ করিয়াছেন।

অতঃপর ক্লাইব মুর্শিদাবাদে পৌছিয়া দেখিলেন যে সেখানে গুজব উঠিয়াছে যে দুর্লভরাম মহারাষ্ট্রদলপতি জানজীর সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিন্তু দুর্লভরামের প্রকৃত মনোভাব অবগত হইয়া ক্লাইব সকলকে ঠাণ্ডা করিয়া রাজমহলে নবাব সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। নবাব ইংরেজ সৈন্যগণকে দশহাজার টাকা পুরস্কার দিলেন।

এখান হইতে নবাব খাদেম হোসেন খাঁকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার করিয়া পাঠাইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া খাদেম হোসেন সহজেই তথাকার বিদ্রোহ দমন করিলেন।

এক্ষণে সর্বদিকে নিশ্চিন্ত হইয়া নবাব পাটনায় যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ক্লাইব কোম্পানীর কিস্তির টাকা তলব করিয়া বসিলেন। দেওয়ান দুর্লভরাম ক্লাইবের চিঠি পাইয়া ইংরেজের প্রাপ্য ২৩ লক্ষ টাকার অর্দ্ধাংশ রাজকোষ হইতে এবং অবশিষ্ট বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজা ও হুগলীর ফৌজদার আমির বেগের রাজকরের উপর বরাত চিঠি দিয়া শোধের ব্যবস্থা করিলেন। পরবর্ত্তী কিস্তির টাকার জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে কলিকাতার দক্ষিণস্থ কোম্পানীর জমিদারীর জন্যও ফরমান প্রদত্ত হইল।

অতঃপর নবাবী সৈন্য, ক্লাইবের সৈন্য ও দুর্লভরামের সৈন্য পাটনা যাত্রা করিল। ক্লাইবের চিঠি পাইয়া রামনারায়ণ পথিমধ্যে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা পাটনায় পৌঁছিলে বাঙলার চৌথ স্বরূপ ২৪ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া মারাঠা দলপতিগণের লোক পাটনায় উপস্থিত হইল। নবাব মীরণকে নামে মাত্র বিহারের নায়েব নবাব করিয়া রামনারায়ণকে ডেপুটি নবাবী পদে স্থায়ী করিলেন। এই সময় ক্লাইব ইংরেজ কোম্পানীর জন্য একটি সুবিধা করিয়া লইলেন। বিহারের ছাপরা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর সোরা উৎপন্ন হইত। ইংরেজ কোম্পানী এই সোরার কারবার করিয়া প্রচুর লাভ করিত। ক্লাইব নবাবের নিকট হইতে এই সোরার কারবারে একচেটিয়া অধিকার লাভ করিলেন। এই সময় দিল্লীর দরবার হইতে মীরজাফরের নামে সুবাদারী সনদ আসিল। ১৫ই মে নবাব ও ক্লাইব মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং বিলাত হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের পত্র আসিয়াছে শুনিয়া ক্লাইব কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ২৬শে জুন ক্লাইব কোম্পানীর কর্ত্তৃত্ব পাইলেন।

রাজা নন্দকুমার রাজস্ব বিভাগের দক্ষতার জন্য দুর্লভরামের পেস্কার হইয়াছিলেন। এখন ইংরেজ পক্ষের টাকা পরিশোধের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। রাজা নন্দকুমার অতঃপর দুর্লভরামের বিরুদ্ধে মীরণের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলে দুর্লভরাম ক্লাইবের সহায়তায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারবর্গও পরে কলিকাতায় চলিয়া যায় (১৮৫৭ খৃঃ সেপ্টেম্বর)।

অতঃপর নবাবের অন্যতম সেনাপতি খাজা হাদি নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে কার্য্যচ্যুত হইয়া স্বদেশ বিহারে গমন কালে পথিমধ্যে মীরণের আদেশে রাজমহলের ফৌজদার কর্ত্তৃক নিহত হন।

প্রায় এই সময়ে (১৭৫৮খৃঃ) মাদ্রাজের উত্তর সরকারে ইংরেজদের সহিত ফরাসীদের পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রাজমহেন্দ্রীর রাজা আনন্দরাজ দফরাসীর

বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্যপ্রার্থনা করায় ১৭৫৯খৃঃ ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডকে ৫০০ গোরা ও ২০০ সিপাই সহ তথায় প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে জয় হওয়ায় উত্তর সরকার ইংরেজদের হস্তগত হইল।

ক্রমাগত বিপ্লবে, মহারাষ্ট্র শক্তির প্রাদুর্ভাবে এবং নাদিরসা ও আহম্মদসা আবদালীর প্রচণ্ড আক্রমণে এই সময় দিল্লীর মোগলশক্তি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল। ১৭৫৫খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নিজাম উল মুল্কের পৌত্র উজির গাজিউদ্দিনের হস্তের ক্রীড়াপুতুল নামমাত্র বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের জ্যেষ্ঠপুত্র আলি গোহর অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া দুরন্ত উজিরের দৃঢ়মুষ্টি হইতে মুক্ত হইয়া রোহিলখণ্ডে পলায়ন করেন। এই আলি গোহর পরবর্ত্তীকালে ইতিহাসে দ্বিতীয় সাহআলম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

বাদশাহজাদা আলি গোহর এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ কুলীখাঁ, কাশীরাজ বলবন্তসিং ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সাহায্যে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা অধিকারের আশায় ১৭৫৯খৃঃ বিহারের প্রান্তসীমায় সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে কূট-বুদ্ধি নবাব সুজাউদ্দৌলা আলি গোহরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ দুর্গ অধিকার করিয়াছেন। মহম্মদ কুলীখাঁ তখন নিজ রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন কিন্তু এলাহাবাদে আসিয়া নিহত হইলেন। অতঃপর আলি গোহর অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া ক্লাইব ও রামনারায়ণের শরণাপন্ন হইলে তাঁহারা জমিদারগণের নিকট হইতে দশহাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিলে তিনি বিহারের দিকে আর অগ্রসর না হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপে ক্লাইবের কর্ম্মকুশলতায় বাদশাহজাদা আলি গোহরের হাত হইতে বিহার প্রদেশ রক্ষা পাইল। অতঃপর ক্লাইব কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন (১৭৫৯ খৃঃ জুন)। এই সময় কর্ণেল ফোর্ডও উত্তর সরকারে বিজয়লাভ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া ক্লাইব যখন নিশ্চিন্ত চিত্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন আর এক অভাবনীয় বিপদের সংবাদে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন। সংবাদ আসিল, যবদ্বীপ হইতে ওলন্দাজগণের যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্যদল বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। সর্ব্ব বিষয়ে ইংরেজদের কর্ত্তৃত্বে বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ মীরজাফর গোপনে হুগলীর ওলন্দাজগণকে সমর্থন করিতেছিলেন। যাহা হউক ১৭৫৯, ৫ই ডিসেম্বর চুঁচুড়ার নিকটে বেদারা গ্রামের যুদ্ধে ক্লাইব ওলন্দাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করায় মীরজাফরের পক্ষে ইংরেজদিগের কবল হইতে মুক্তিলাভের আর কোনই পথ রহিল না।

ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের অধঃপতন দেখিয়া এবং নবাবের সহিত সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ক্লাইব ১৭৬০ খৃঃ ফেব্রুয়ারীর প্রথমে কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। যাইবার পুর্ব্বে কলিকাতা কাউন্সিলের সহিত পরামর্শ করতঃ ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে মেজর কেলড্‌কে বঙ্গীয় সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে বাদসাহজাদা আলি গোহর পুনরায় সুবে বাঙলা অধিকারে অগ্রসর হইতেছিলেন। ১৭৬০ খৃঃ জানুয়ারী মাসে কর্ম্মনাশা পার হইয়াই সংবাদ পাইলেন যে উজির গাজি উদ্দিন, বাদসাহ আলমগীরকে হত্যা করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে দ্বিতীয় সাহজহান নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছেন। এক্ষণে সকলের পরামর্শে আলি গোহর সাহ আলম নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে বাদসাহ বলিয়া প্রচার করিলেন এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে উজিরীপদ ও রোহিলা সরদার নজরউদ্দৌলাকে আমির উল ওমরা পদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে বাদসাহী-পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে যত্নবান হইলেন। এই সময়ে আহম্মদ সা আবদালী মারহাট্টাদের বিরুদ্ধে লাহোর প্রদেশে অগ্রসর হইতেছিলেন। সাহ আলম তাঁহার সাহায্য চাহিয়াও দূত প্রেরণ করিলেন। এই অবস্থায় নানা স্থান হইতে সৈন্য সামন্ত আসিয়া তাঁহার দল পুষ্ট করিতে লাগিল। এই সৈন্যদল লইয়া তিনি বিহারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গতি রোধার্থ পাটনার ডেপুটি নবাব রামনারায়ণ পাটনা সহরের বাহিরে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র একদল ইংরেজ সৈন্য লইয়া কাপ্তেন কক্রেন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে ১৭৬০ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারী কেলড্‌ তিনশত গোরা ও একহাজার সিপাহী সৈন্য, একদল গোলন্দাজ ও ছয়টি কামান এবং মীরণ ১৫০০০ নবাবী সৈন্য ও ২৫টি কামানসহ মুর্শিদাবাদ হইতে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৩০শে জানুয়ারী বাঙলার এই সৈন্যদল সিক্রীগলিতে পৌছিল। এখান হইতে পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী নায়েব নবাব খাদেম হোসেনকে ইংরেজদের মধ্যস্থতায় বশীভূত করিতে এক সপ্তাহ লাগিল। ইতিমধ্যে সাহ আলমের সৈন্যদল পাটনার নিকটবর্ত্তী হইল এবং উভয় পক্ষে খণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া রাজা রামনারায়ণ ৯ই ফেব্রুয়ারীতে যুদ্ধার্থ মসিমপুরের প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাহ আলমের পক্ষে দিলীর খাঁ ও আসালৎ খাঁ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। জমিদার পালোয়ান সিং যুদ্ধারম্ভেই নবাব পক্ষ ত্যাগ করিয়া শত্রু পক্ষে যোগ দিয়াছিল। বাদসাহ পক্ষে ত্রিহুতের নবাব কামদার খাঁ ভীষণ যুদ্ধ

করিয়া নবাব পক্ষের সেনানী রহিম খাঁ ও রাজা মুরলীধরকে বন্দী এবং বর্শাঘাতে হস্তীপৃষ্ঠারূঢ় রাজা রামনারায়ণকে আহত করিলেন। রাজার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া ইংরেজ সেনাপতি কাপ্তেন কক্রেন ও অন্য দুইজন ইংরেজ সেনানী নিহত হইলেন। কেবলমাত্র ডাক্তার ফুলার্টন অবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্যদল লইয়া শত্রুর মধ্যদিয়া নগরে ফিরিতে সমর্থ হইলেন। রাজা রামনারায়ণ আহত হইলেও অবশিষ্ট সৈন্যসহ নগরে প্রবেশ করিয়া নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী সংবাদ আসিল বঙ্গীয় সৈন্যদল চৌদ্দ ক্রোশ দূরে আসিয়া পৌছিয়াছে। সাহ আলম পরদিন যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। গণকদের পরামর্শে মীরণ ২২শে তারিখের পূর্ব্বে যুদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু কেলড্ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ দানে প্রস্তুত হইলেন। বাদশাহী সৈন্যদল নবাবী সৈন্যদলকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিয়া যখন প্রায় পরাভূত করিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময় ইংরেজ সৈন্যদল বাদশাহী সৈন্যদলের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিল। তাহা প্রতিহত করিতে না পারিয়া যখন বাদশাহী সৈন্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, তখন নবাবের প্রবল অশ্বারোহী সৈন্যদল প্রচণ্ডবেগে শত্রুদলের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিল। কিন্তু মীরণ আহত হওয়ায় শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করা সম্ভব হইল না। বাদশাহ ঐ রাত্রে রণস্থল হইতে ৫ ক্রোশ দূরে বিহারে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

২৯শে পর্য্যন্ত মীরণ পাটনায় রহিলেন। পরদিন যখন মীরণ বিহারে পৌছিলেন, তখন সংবাদ পাইলেন বাদশাহী সৈন্য বাঙ্গালা যাত্রা করিয়াছে। ত্বরায় পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া নৌকাযোগে ইংরেজ সৈন্য ও স্থলপথে মীরণের অশ্বারোহী সৈন্য বাঙ্গালার পথে অগ্রসর হইল। তিনদিন পর তাহারা বাদশাহী সৈন্যের নিকটবর্ত্তী হইলে বাদশাহী সৈন্য পাটনা অভিমুখে ফিরিয়া গেল।

বাদশাহের পাটনা পৌছিবার পূর্ব্বেই রামনারায়ণ ও ইংরেজপক্ষ নগর রক্ষার জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বাঙলা হইতে একদল সিপাহী ও কাপ্তেন নক্সের সৈন্যদল পাটনার নিকটবর্ত্তী হইল। নক্স সাহেব পরদিন মধ্যাহ্নে বাদশাহী সৈন্য আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন। সাহ আলম তখন টিকারীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা খাদেম হোসেন খাঁ বাদশাহের সহিত যোগ দিবার জন্য নদীর পূর্ব্বপার দিয়া অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া মীরণ ও কেলড্ অপর পার দিয়া ধাবিত হইলেন। খাদেম হোসেন হাজিপুরে পৌছিলেন, কাপ্তেন নক্স ও সেতাব রায় ২০০ গোরা, ১০০ সিপাহী ও ৫০০ অশ্বারোহীসহ

নদীপার হইয়া খাদেম হোসেনের অগ্রগামী দলকে আক্রমণ করিলেন, এবং অমিতবিক্রমে ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের পর খাদেম হোসেনের বিপুল বাহিনীকে পরাস্ত করিলেন[১]। খাদেম হোসেন গুরুভার দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। নবাবী সৈন্যদল চারিদিন যাবৎ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে ২রা জুলাই রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যখন সকলে তাম্বুতে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় মীরণের তাম্বুতে বজ্রপাত হইয়া দুইজন হতভাগ্য অনুচরসহ মীরণের মৃত্যু হয়। পাটনা হইতে মীরণের মৃতদেহ নৌকাযোগে রাজমহলে আনিয়া তথায় সমাহিত করা হয় (মুতাক্ষরীণ)[২] মীরণের এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ পাটনায় বঙ্গীয় সৈন্যের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন।

ক্লাইব বিলাত গমন করিলে স্বনামধন্য হলওয়েল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া কিয়ৎকালের জন্য কলিকাতায় ইংরাজ কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের অধ্যক্ষ হন। হলওয়েল প্রথমে চিকিৎসকরূপে এদেশে আসিয়া পরে কোম্পানীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে অন্ধকূপ হইতে জীবিত অবস্থায় বাহির হইয়া এক্ষণে কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চপদ লাভ করিলেন। অধ্যক্ষ হইবার অল্পকাল পরেই (১৭৬০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী) নবাব-জামাতা মীরকাশেমের সহিত হলওয়েলের সাক্ষাৎ হয়। মীরজাফরের শাসন শৈথিল্যে কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা তখনও শোধ হয় নাই। উপরন্তু তিনি ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদিগের সহিত এমনকি সাহ আলমের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া হলওয়েল সিলেক্ট কমিটির অন্যান্য সদস্যদিগকে স্বপক্ষে আনিয়া

১। মুতাক্ষরীণ প্রণেতা গোলাম হোসেন এই সময় পাটনায় উপস্থিত ছিলেন। কাপ্তেন নক্স পাটনায় আসিয়া সেতাব রায়ের অসাধারণ বীরত্বের প্রশংসা করেন।

২। গোলাম হোসেন মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যুর বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। মীরণের শেষ পাটনা যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি বাখর খাঁকে ঘেসেটী ও আমিনা বেগমকে ঢাকা হইতে আনিতে প্রেরণ করেন। ঐ দুর্বৃত্ত বেগমদ্বয়কে হস্তগত করিয়া ঢাকার কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে তাহাদিগকে জলমগ্ন করেন। মীরণের আসল নাম মীর সাদেক আলি খাঁ। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হওয়ার পর তাঁহার পকেটে তিনশত লোকের নাম লেখা একখানি কাগজ পাওয়া যায়। তিনি তাহাদিগকে পর পর হত্যা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

মীরকাশেমকে নবাব করিতে চেষ্টিত হইলেন। এই সময়ে প্রিয়পুত্র মীরণের মৃত্যু সংবাদে মীরজাফর শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জমিদারদের নিকট খাজনা আদায়ে পূর্ব্বেই বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছিল। এক্ষণে সমস্ত বিভাগেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ হইতে বান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতায় কোম্পানীর অধ্যক্ষ হইয়া আসিলে হলওয়েল কার্য্যত্যাগ করিলেন। কিন্তু হলওয়েল তখনও সর্ব্বকার্য্যে পরামর্শদাতা হইয়া রহিলেন। ২০শে সেপ্টেম্বর মীরকাশেম কলিকাতায় আসিয়া খোজা পিক্রর মধ্যস্থতায় তাঁহার প্রস্তাব হলওয়েলের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর হলওয়েল ঐ প্রস্তাব ডিরেক্টর সভায় উপস্থিত করিলেন। পরদিন একটার সময় মীর কাশেমের সন্ধির প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। সন্ধি অনুসারে মীর কাশেম বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নায়েব-নবাব হইলেন। কোম্পানীর গোরা ও সিপাহী সৈন্য মীর কাশেমের রাজকার্য্য পরিচালনায় সাহায্য করিবে এবং ঐ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর কোম্পানীকে প্রদত্ত হইবে। শ্রীহট্টে উৎপন্ন তিন বৎসরের চূণের অর্দ্ধাংশ উপযুক্ত মূল্য দিয়া কোম্পানী ক্রয় করিতে পারিবে। পূর্ব্ব স্বীকৃত তনখার বাকী টাকা কিস্তিবন্দী মত প্রদত্ত হইবে ইত্যাদি। বান্সিটার্টকে পাঁচলক্ষ, হলওয়েলকে দুইলক্ষ সত্তর হাজার, ম্যাগোয়ারকে দুইলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার, সমরুকে দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার, স্মিথকে একলক্ষ চৌত্রিশ হাজার, মেজর ইয়র্ককে একলক্ষ ত্রিশ হাজার, কর্ণেল কেলড্‌কে দুইলক্ষ টাকা দিতে মীর কাশেম স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর ২৯শে সেপ্টেম্বর মীর কাশেম মেজর ইয়র্কের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলেন।

২রা অক্টোবর গভর্ণর বান্সিটার্ট ও সেনাপতি কেলড্‌ মুর্শিদাবাদে যাত্রা করিয়া ১৪ই অক্টোবর কাশিমবাজারে পৌঁছিলেন। ১৬ই অক্টোবর বান্সিটার্ট নবাব মীরজাফরকে সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। কিন্তু নবাব পরদিনও কোন উত্তর না দেওয়ায় রজনীযোগে ইংরেজ সৈন্য ভাগীরথী পার হইয়া প্রাসাদ বেষ্টন করিল। কিয়ৎকাল পরে মীর কাশেমের পতাকা ও রণডঙ্কা দেখা দিল। দুর্ব্বল নবাব জামাতাকে রাজকীয় শীলমোহর প্রেরণ করিলেন। এবং ইংরেজ রক্ষীর সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

২২। মীর কাশেম [নবাব নাসির উল্ মুল্ক ইমতিয়াজ উ দ্দৌলা মীর মহম্মদ কাশেম আলি খাঁ নসরৎ জঙ্গ]

(১৭৬০ খৃঃ ১৭ই অক্টোবর—১৭৬৪ খৃঃ অক্টোবর)।

মীর জাফর নাম মাত্র নবাব থাকিতে সম্মত না হওয়ায় মীর কাশেম[১] উপরোক্ত সুদীর্ঘ নাম গ্রহণ করিয়া নবাব হইলেন। নবাব হইয়া তিনি দেখিলেন রাজকোষে নগদ মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা ও স্বর্ণরৌপ্যাদিতে তিন লক্ষ টাকা আছে। ইংরেজদের পূর্ব্ব ঋণ ও স্বীকৃত অর্থ অবিলম্বে শোধ করিতে হইবে। সেনাদলকে বাকী বেতন দিতে হইবে। প্রচুর অর্থ আবশ্যক। অর্থাভাবে তিনি স্বর্ণ রৌপাদি দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহা দ্বারা ও জগৎ শেঠের সাহায্যে ও নিজ সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ লইয়া ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পূর্ব্ব বাকী দশলক্ষ টাকার মধ্যে সাড়ে নয় লক্ষ টাকা ও পাটনায় স্থাপিত নবাবী সৈন্যের ব্যয় বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা দ্বাদশ দিনের মধ্যেই শোধ করিয়া দিলেন। এখনও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অবস্থায় তিনি সমস্ত রাজকীয় বিভাগে ব্যয় সংক্ষেপ করিলেন। হিসাব নিকাশের দায়ে জায়গীর বিভাগে মীরজাফরের প্রিয় অনুচর কিস্তুরাম ও মণিলালের সমস্ত সম্পত্তি রাজেয়াপ্ত ও তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কারাগারেই তাহাদের মৃত্যু হইল। নবাব মীর জাফরের প্রিয়তম ছকর হরকরারও ঐ দশা হইল। সরকারের অন্যান্য কর্ম্মচারীগণকেও উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ নিষ্কাশিত করা হইল। মীর জাফরের দাস দাসীবর্গও এই অর্থদোহন হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। নাগরিকগণের ধনসম্পত্তিও তিনি যথেচ্ছ আত্মসাৎ করিলেন (মজঃফরনামা)।

এইরূপে এবং জমিদারগণের নিকট যথেষ্ট নজর আদায় করিয়া মীর কাশেম মুর্শিদাবাদস্থ নবাবী সেনাদলের বাকী বেতনের অনেকাংশ শোধ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিলেন। পাটনার ইংরেজ সৈন্যের জন্যে অন্যতম রাজস্ব সচিব নবং রায় তিন লক্ষ টাকাসহ কেলড্ সাহেবের নিকট প্রেরিত হইলেন। কাশিমবাজারের ইংরেজ প্রতিনিধি ব্যাটসনের হস্তে কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার মধ্যে আরও প্রায় সাত লক্ষ টাকা দেওয়া হইল।

১। মীর কাশেমের পিতার নাম রজি খাঁ ও পিতামহের নাম ইমতিয়াজ খাঁ। রজি খাঁ বিহারের এক ক্ষুদ্র জায়গীরদার ছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর আগ্রহে মীরজাফরের কন্যা ফতিমা বেগমের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

এদিকে নবাব পরিবর্ত্তনের ফলে পশ্চিমাঞ্চলে বাদসাহ সাহ আলম পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান ইংরেজদিগের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়ায় মেদিনীপুরের কতিপয় সামন্ত রাজা ও বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের অনুগত রাজা নন্দকুমার সাহ আলমের শিবিরে কামদার খাঁর সহিত ও মারহাট্টা সর্দ্দার শ্রীভট্টের সহিতও পত্রাদিদ্বারা সংযোগ রক্ষা করিতেছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজার সহিত সংযোগ রক্ষা করায় বান্সিটার্ট নন্দকুমার ও জানকীরামকে তাঁহাদের কলিকাতাস্থ ভবনে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। (Papers relating to disputes in Council, p. 229)

মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান প্রদেশে কোম্পানীর অধিকার স্থাপনের জন্য কাপ্তেন মার্টিন হোয়াইট একদল গোরা ও গোলন্দাজ সৈন্য ও কতকগুলি সিপাহী লইয়া প্রথমে মেদিনীপুরে শান্তি স্থাপন করিলেন ও তথায় নবাবী সৈন্যের সাহায্যের জন্য কিছু সিপাহী সৈন্য রাখিয়া তিনি বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলেন (১৭৬০ খৃঃ ডিসেম্বর)। বর্দ্ধমানের রাজা একদল সৈন্য পাঠাইয়া বাধা দিতে চেষ্টা করিলে তাহারা সহজেই ইংরেজের নিকটে যুদ্ধে পরাভূত হয় ও বর্দ্ধমানরাজ বশ্যতা স্বীকার করেন।

বীরভূমের জমিদার আসাদ জমান বিদ্রোহী হইয়া বিশ হাজার পদাতিক ও প্রায় পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ কড়েয়ার নিকট এক সুরক্ষিত দুর্গম স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। মীর কাশেমের সেনাপতি খাজা মহম্মদী খাঁ ও গোলন্দাজ সৈন্যের অধিপতি গুর্গন খাঁ ও ইংরেজ সেনানী মেজর ইয়র্ক তাহাকে সম্মুখভাগ হইতে ও বর্দ্ধমান হইতে কাপ্তেন হোয়াইট পশ্চাৎ ভাগ হইতে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ পরাজিত করিল। তাব্রিজ হইতে আগত মহম্মদ তকি খাঁ নামক একজন সাহসী ও কার্য্যদক্ষ সেনানী মীর কাশেমের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকেই বীরভূমের ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। মুঙ্গেরের দক্ষিণভাগে খড়্গপুরের রাজাও এই সময় বিদ্রোহী হয়। মুঙ্গেরে এনসাইন ষ্টেবলসের অধীনে একদল গোরা সৈন্য ছিল। পাটনা হইতেও একদল সৈন্য আসিয়া মিলিত হইল। ইহারা মুঙ্গেরের তিন মাইল দূরে রাজ সৈন্যকে পরাভূত করিল। অতঃপর ইংরেজ সৈন্য তথা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে রাজ শিবির আক্রমণ করিল। রাজসেনা পরাভূত হইয়া রাজ বাটির পরিখা মধ্যে আশ্রয় লইল। এখানেও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। ইংরেজ সৈন্য খড়্গপুরে আগুন লাগাইয়া রাজবাড়ী ও সমস্ত গ্রাম ভস্মীভূত করিল। এইরূপে সমস্ত বিদ্রোহ প্রশমিত হইল।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দের শেষদিন কর্ণেল কেলড্ মেজর কার্ণাকের হস্তে বঙ্গীয় সৈন্যের ভার দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। এই সময় সাহ আলম গয়ার ও বিহারের নিকট সৈন্য সমবেত করিয়া প্রজাগণের নিকট খাজনা আদায় করিতেছিলেন। কার্ণাক অবিলম্বে সা আলমের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। নবাবী সৈন্যের অধিনায়ক রাজা রাজবল্লভ ও রাজারামনারায়ণও পরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। ১৭৬১ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারী বিহারের তিন ক্রোশ পশ্চিমে মোহানী নদী তীরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গোলার আঘাতে সাহ আলমের মাহুত নিহত হইলে হস্তী সাহ আলমকে লইয়া শিবিরে পলায়ন করায় নেতার অদর্শনে বাদসাহ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের জয় হইল। বাদসাহ পলাইয়া পাটনার দিকে প্রস্থান করিলেন। ফরাসী সেনাপতি মসিয়ে ল বাদসাহের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলসহ মেজর কার্ণাকের হস্তে বন্দী হইলেন। ইংরেজ সৈন্য ক্রমাগত বাদসাহের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে ২রা ফেব্রুয়ারী উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে, বাদসাহের সৈন্যদল ভয়ে পলায়ন করায় নিরুপায় হইয়া বাদসাহ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি কামগার খাঁকে পদচ্যুত করিয়া ৬ই ফেব্রুয়ারী গয়ার অনতিদূরে ইংরেজ সেনানী কার্ণাকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পরদিন ইংরেজ শিবিরে পদার্পণ করিলেন। কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার চ্যাম্পিয়নের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য ও রাজা রাজবল্লভের অধীনে নবাবী সৈন্যের একদল গয়ায় রাখিয়া ১৪ই ফেব্রুয়ারী ইংরেজ সেনাপতি ও রামনারায়ণ সাহ আলমকে লইয়া পাটনায় রওনা হইলেন। পাটনার দুর্গ মধ্যে বাদসাহের বাসস্থান প্রদত্ত হইল।

এদিকে বিহার অঞ্চলে বাদসাহ সাহ আলমের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া মীর কাশেম সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া মেজর ইয়র্কের সৈন্যদলসহ পাটনা যাত্রা করিয়াছিলেন। ১৭৬১ খৃঃ ১লা মার্চ্চ পাটনার উপকণ্ঠে বৈকুণ্ঠপুরে নবাবের তাঁবু স্থাপিত হইল। রাজবল্লভ নবাবের আদেশে সৈন্যদলসহ পূর্ব্বেই গয়া হইতে পাটনায় আসিয়াছিলেন। রাজা রামনারায়ণ, রাজবল্লভ ও মেজর কার্ণাক নবাব শিবিরে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর পাটনার ইংরেজ কুঠিতে সাহ আলমের সহিত নবাবের সাক্ষাৎ হইল। মীর কাশেম বাদসাহকে হাজার এক স্বর্ণমুদ্রা নজর ও বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন। বাদসাহও ২৪ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর ধার্য্যে আলিজা উপাধিসহ মীর কাশেমকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবাবী খেলাত ও উপহার

প্রদান করিলেন। অতঃপর সাহ আলম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে গমন করিলেন।

বাদসাহের পাটনা ত্যাগের পর মীর কাশেম রাজা রামনারায়ণের অতুল সম্পত্তি হস্তগত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং তাঁহার নিকট বিহার প্রদেশের সমগ্র হিসাব চাহিলেন। রামনারায়ণ ইতস্ততঃ করিলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইল। যথোচিত নির্য্যাতনের পর তাঁহার বাসগৃহ লুণ্ঠিত করিয়া নয় লক্ষ টাকা পাওয়া গেল। রাজার আত্মীয় বন্ধুগণকে যন্ত্রণা দিয়া আরও ৭ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল। জায়গীরদার রাজা সুন্দর সিংহ ও তাঁহার দেওয়ান গঙ্গাবিষ্ণুকেও কারারুদ্ধ করা হইল। রামনারায়ণের ভ্রাতা ধীরাজনারায়ণ ও চরাধ্যক্ষ রাজা মুরলীধরকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হইল। পাটনার কোতোয়াল মহম্মদ ইশাক ও প্রধান কুঠিয়াল মনসারাম সাহু ও পাটনার সমুদয় ধনী নাগরিকগণের নিকট বহু উৎপীড়ন করিয়া বহু অর্থ সংগৃহীত হইল। রোটাস দুর্গের ও বিহারের বাদসাহী সেনাপতির জায়গীরের তত্ত্বাবধায়ক রাজা সেতাব রায় ইংরেজদের সাহায্যে কলিকাতায় প্রস্থান করায় ও তথা হইতে অযোধ্যায় চলিয়া যাওয়ায় তিনি রক্ষা পাইলেন (মুতাক্ষরীণ)। এইরূপে পাটনায় সংগৃহীত অর্থেই মীর কাশেম ইংরেজদের সমস্ত ঋণ শোধ করিলেন। রাজস্ব বিভাগের মুৎসুদ্দী সীতারাম ও চরাধ্যক্ষগণকে তিনি নির্দ্দয় ভাবে নিহত করিলেন।

অতঃপর মীর কাশেম সমগ্র বঙ্গের জমিদারী-কর বৃদ্ধির সংকল্প করিলেন। আলি ইব্রাহিম খাঁ নামক রাজস্ব বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হিন্দু কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে তিনি সুবে বাঙলার জমিদারগণের রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিলেন।[১]

সুবে বাঙলা ও বিহারের নিরূপিত রাজকর প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া অত্যাচার উৎপীড়নে তিন বৎসর কাল এই বর্দ্ধিত রাজস্ব আদায় করিয়া দোর্দ্দণ্ড

১। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস লিখিয়াছেন "His short administration may rather be deemed a regular pillage than a system of government. He ruined almost all the wealthy families of the country, massacred great number and carried off an immense treasure with him when driven out of the country."

(Franci's Plan for a Settlement of Bnegal p. 38)

প্রতাপে এই অত্যাচারী নবাব রাজকার্য্য পরিচালনা করিলেন।

এই সময় কলিকাতার কোম্পানীর কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্যে হলওয়েল, প্লেডেল, সমার ও ম্যাগোয়্যারকে পদচ্যুত করিয়া বিলাতের ডিরেক্টরসভা আদেশ দেওয়ায় তাঁহারা স্বদেশ গমন করিলেন। ইহারা অধ্যক্ষ বান্সিটার্টের স্বপক্ষে ছিলেন। ইঁহাদের অভাবে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাধিক্য হইল। উগ্রস্বভাব এলিস্ সাহেব পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ হইলেন।

কলিকাতায় বান্সিটার্টের পক্ষ ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং মুর্শিদাবাদে ইংরেজ প্রভাব প্রবল হইতেছে দেখিয়া মীর কাশেম মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হইতে বহু দূরে মুঙ্গেরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং ইংরেজদের সহিত বিরোধের আশঙ্কায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সৈন্যদল প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হইলেন। ইতঃ পূর্ব্বে তিনি গ্রেগরী (গুর্গিন খাঁ)র[১] অধীনে মুর্শিদাবাদের সৈন্যগণের মধ্য হইতে একদল গোলন্দাজ ও একদল পদাতিক সৈন্যকে ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন তকি খাঁকে ঐরূপ আরও সৈন্যদল গঠনের আদেশ প্রদত্ত হইল। অবশেষে বাণিজ্য শুল্ক নিয়ন্ত্রণ করিতে যাইয়া তিনি ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইলেন।

কোম্পানী নবাবের রাজ্যে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণকে তাহাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙলায় ইংরেজদের প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী তাহাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য নবাবের প্রাপ্য শুল্ক দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এমনকি তাহাদের অনুগৃহীত অনেক ভারতীয় বণিকও তাহাদের সাহায্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিত। ইহাতে নবাবের ও অপর ভারতীয় বণিকগণেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছিল। মীর কাশেম প্রথমতঃ কোম্পানীর পরিচালকদের বলিয়া কহিয়া এই অন্যায় রীতি সংশোধনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পরিচালকদের মধ্যে মতৈক্য না থাকায় তাহা হইয়া উঠিল না। তখন মীর কাশেম বাণিজ্য শুল্ক একেবারে রহিত করিয়া দিলেন।

এই ব্যবস্থায় ইংরেজপক্ষ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। নানা প্রকার দরবার, আলোচনা ও পত্র বিনিময়ের পর ১৪ এপ্রিলের মন্ত্রণাসভায় কলিকাতা দরবার যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা একরূপ স্থির করিয়া ফেলিল এবং পাটনার কুঠীর

১। এই খোজা গ্রেগরী কলিকাতার প্রসিদ্ধ আর্ম্মানী খোজা পিক্রর ভ্রাতা। মর্কার ও আরও কয়েকজন আর্ম্মানীও মীর কাশেমের সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অধ্যক্ষ এলিসের নিকট উপযুক্ত আদেশ প্রেরিত হইল।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ আসন্ন মনে করিয়া গুর্গিন খাঁর পরামর্শে নবাব বীরভূমের ফৌজদার তকি খাঁকে জগৎ শেঠ ও তৎ ভ্রাতা স্বরূপ চাঁদকে মুঙ্গেরে পাঠাইতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। আদেশ পাইয়া তকি খাঁ মুর্শিদাবাদ হইতে শেঠ দ্বয়কে গ্রেপ্তার করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় তাঁহারা নজরবন্দী অবস্থায় রহিলেন। রাজা রামনারায়ণ ও রাজবল্লভ প্রভৃতিকে পূর্ব্বেই বন্দী অবস্থায় এখানে আনয়ন করা হইয়াছিল।

২৫শে মে পাটনার ইংরেজদের ব্যবহারার্থ কলিকাতা হইতে প্রেরিত অস্ত্রপূর্ণ কয়েকখানি নৌকা মুঙ্গেরের নিকটে পৌছিলে নবাবের আদেশে ঐ নৌকাগুলিকে আটক করা হইল। ইতিপূর্ব্বে ইংরেজ পক্ষ হইতে এমিয়ট ও হে মুঙ্গেরে আলোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। যদিও এমিয়টকে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইল, কিন্তু হে-কে প্রতিভূ স্বরূপ আবদ্ধ রাখা হইল। ২৪শে জুন এই সংবাদ পাইয়া এলিস ঐ রাত্রেই পাটনা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। পাটনার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মীর মেহেদী সদলবলে মুঙ্গেরের দিকে পলায়ন করিলেন। কিন্তু হিন্দু সেনানী লাল সিংহ পাটনা দুর্গে ও মহম্মদ আমিন দরবার গৃহে ও প্রাসাদে কতকগুলি সৈন্যসহ আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হইলেন।

এদিকে পাটনার সৈন্যদলের সাহায্যে নবাব প্রেরিত আর্ম্মানী সেনানী মর্কারের অধীনস্থ সৈন্যদলের সহিত ফতোয়ায় মীর মেহেদির সাক্ষাৎ হইল। তখনও দুর্গাদি শত্রু হস্তগত হয় নাই শুনিয়া মর্কার অবিলম্বে পাটনা উদ্ধারে ধাবিত হইলেন। নবাবের অগ্রগামী সেনানী মীর নাসের পাটনার পূর্ব্ব দ্বারে স্থাপিত ইংরেজ সেনাগণকে পরাভূত করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। মর্কার ইংরেজ কুঠী আক্রমণ করিয়া অবরুদ্ধ করিলেন। চারি দিন কুঠীর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া অবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্য ২৯শে জুন রাত্রিতে গঙ্গাপার হইয়া ছাপরার দিকে দিকে পলায়ন করিল। ইংরেজদের অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়া নবাব সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইল। ইংরেজ দলের গতি রোধার্থ সেনানী সমরু[১] অধীনে

১। এই ব্যক্তির নাম ওয়ালটার রেণড্। ফ্রান্সের আলশে প্রদেশেস ইঁহার জন্মস্থান। ষ্ট্রাসবুর্গে শিক্ষালাভ করিয়া কোম্পানীর সুইস্ সৈন্যদলে যোগদান করিয়া তিনি বোম্বাই আসেন। পরে তিনি ফরাসী সৈন্যদলে যোগ দেন। ইঁহার কঠোর গম্ভীর মুখ দেখিয়া লোকে ইঁহাকে 'সম্বার' (sombre) বলিয়া ডাকিত। ইহাই বিকৃত হইয়া সমরুতে পরিণত হয়। অতঃপর মীর কাশেমের

আর একদল নবাবী সৈন্য বক্সার হইতে গঙ্গা পার হইয়া ধাবিত হইল। ১লা জুলাই মাঞ্জী নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। বান্সিটার্টের মতে ইংরেজদের এই সৈন্যদলে ২২০ জন গোরা, ২৭ জন অফিসার, ৫৭ জন গোলন্দাজ, ২২০০ সিপাহী ছিল। কিন্তু বহু সংখ্যক নবাবী সৈন্যের আক্রমণে তাহারা পরাভূত হইল। সেনানী কারষ্টেয়ার ও অন্য কয়েকজন নিহত হইল। অনন্তর সমগ্র ইংরেজ বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করিয়া আত্ম সমর্পণ করিল। ইংরেজগণ বন্দীবেশে মুঙ্গেরে আনীত হইল।

ইতিমধ্যে ইংরেজ কর্ত্তৃক পাটনা আক্রমণের সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের ফৌজদার সইদ মহম্মদের উপর এমিয়টকে বন্দীকরিবার জন্য নবাবের পরওয়ানা প্রেরিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের নিকটেই এমিয়টের নৌকা আটক করা হইল। এমিয়ট আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলে উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় হইল। এমিয়ট গুলির আঘাতে নিহত হইলেন। হতাবশিষ্ট ইংরেজদল বন্দী হইল। একজন হাবিলদার ও দুইজন সিপাহী পলাইয়া কলিকাতায় সংবাদ দিল (Second Report of the Select Committee ; মুতাক্ষরীণ)।

অতঃপর কলিকাতায় ইংরেজেরা নূতন নবাব মীর কাশেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করা স্থির করিলেন এবং ৬ই জুলাই প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রসহ মেজর এডামস, কার্ণাক, ব্যাটসন ও কার্টিয়ারকে মীর জাফরের নিকট প্রেরণ করা হইল। মীরজাফর নন্দকুমারকে দেওয়ান ও খোজা পিক্রকে সৈন্যদলে লইতে চাহিলেন। ৭ই জুলাই দরবারে মীরজাফরকে নবাব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা পত্র প্রস্তুত হইল। এই দরবার শেষ না হইতেই সংবাদ আসিল মীর কাশেমের সৈন্যদল ৬ঠা জুলাই কাশিমবাজারের কুঠী বেষ্টন করিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত গভর্ণর বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস যুদ্ধ ঘোষণার বিরুদ্ধে ছিলেন। এক্ষণে স্বজাতির সম্মান রক্ষায় সকলেই একমত হইলেন। মেজর এডাম্স মুর্শিদাবাদ অধিকারে অগ্রগামী হইলেন। মুন্সী নবকৃষ্ণ মেজর এডামসের দেওয়ান হইয়া

নূতন সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া সমরু দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া মীর কাশেমের প্রিয়পাত্র হন। মীর কাশেমের পতনের পর সমরু সুজাউদ্দৌলার সৈন্যদলে কার্য্য গ্রহণ করেন। সুজাউদ্দৌলার নিগ্রহ সময়ে সমরু উত্তর-পশ্চিম যাত্রা করেন। নানারূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর ইনি সার্দ্ধানার বেগমকে বিবাহ করিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করেন। (কীন সাহেবের ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।)

তাঁহার সহিত যাত্রা করিলেন। দ্বিতীয়বার ইংরেজদের সহিত সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মীরজাফর সদলবলে কলিকাতা হইয়া অগ্রদ্বীপে অগ্রগামী ইংরেজ সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইলেন। (১৭৬৩ খৃঃ ১৭ই জুলাই)।

ইতিমধ্যে কাশিমবাজার অধিকার করিবার পর হতাবশিষ্ট ইংরেজগণকে মুঙ্গেরে পাইয়া মীর কাশেমের আদেশে মুঙ্গের হইতে আগত জাফর খাঁ ও হায়াৎ উল্লার অধীনস্থ সৈন্যদল, মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানের দিক হইতে লেফটেন্যাণ্ট গ্লেনের অধীনে একদল ইংরেজ সিপাহী মেজর এডামসের সহিত যোগ দিতে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া তাহারা কাটোয়ার নিকটে অজয়ের দক্ষিণ তীরে তাহাদের সম্মুখীন হইল। মুঙ্গেরের এই সৈন্যদল সংখ্যায় অধিক হইলেও তাহাদের সহিত কামান না থাকায় তাহারা ইংরেজ সিপাহীর কামানের অগ্নিবৃষ্টির মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইল। গ্লেন অতঃপর কাটোয়ায় উপনীত হইয়া এখান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দুই দিনেই অগ্রদ্বীপে এডামসের সহিত মিলিত হইলেন।

এদিকে মুঙ্গেরের সৈন্যদল পশ্চাৎপদ হইয়া ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া পলাসীর দক্ষিণে তকি খাঁর শিবিরের নিকট শিবির সন্নিবেশ করিল। ১৯শে জুলাই সমগ্র ইংরেজ সৈন্য অগ্রগামী হইলে তকি খাঁ অন্যদলের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার নিজ হস্তে শিক্ষিত অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া অমিত বিক্রমে ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। ইংরেজের ভীষণ অগ্নিবৃষ্টির সম্মুখে বারবার প্রতিহত হইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। গোলার আঘাতে স্বয়ং আহত ও অশ্ব হত হইলেও অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন দক্ষিণ পার্শ্বে খালের নিম্নে লুক্কায়িত একদল ইংরেজ সিপাহী একযোগে অগ্নিবৃষ্টি করায় একটি গুলি তকি খাঁর মস্তক ভেদ করিল ও তাঁহার বহু সৈন্য হতাহত হইল। তকি খাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সেনাদল রণে ভঙ্গ দিল। মুঙ্গেরাগত সৈন্যদলও পলায়ন করিল।

যুদ্ধের দুঃসংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের ফৌজদার সইদ আহম্মদ মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ২৩শে জুলাই নবাব মীরজাফর দ্বিতীয়বার ইংরেজবন্ধুসহ মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। মীর কাশেমের শোষণে উৎপীড়িত সকলেই প্রাচীন নবাবকে অভ্যর্থনা করিল। মীরজাফর পুনরায় সিংহাসন গ্রহণ করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর মীর কাশেমের আদেশে সুতীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাঁহার সৈন্যদল উপস্থিত হইয়া সুরক্ষিত গড়খাই প্রস্তুত করতঃ তথায় বিপক্ষের জন্য প্রতীক্ষা

করিতে লাগিল। চারি দিন পর ইংরেজ সেনা ভাগীরথী পার হইয়া সুতীর নিকটবর্ত্তী হইল। দুইদিন পর মীরজাফর সসৈন্যে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর ক্ষুদ্র বাঁশলুই নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া সমগ্র সৈন্য পর পারে উত্তীর্ণ হইল (১৭৬৩ খৃঃ ১লা আগষ্ট)। পরদিন প্রাতে মীর কাশেমের বিপুল বাহিনী তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

সুতীর সুরক্ষিত গড়খাতের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গিরিয়ার সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মীরকাশেমের সৈন্যদল সমবেত হইয়াছিল। ভাগীরথী ও বাঁশলুই নদীর মধ্যে বিপক্ষের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। মধ্যস্থলে সমরু ও মর্কারের সুশিক্ষিত পদাতিক, দক্ষিণে আসাদুল্লার অশ্বারোহীদল এবং বামে শের আলির সৈন্যদল ব্যূহবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। ইংরেজপক্ষেও মধ্যে গোরাসৈন্য, বামে ও দক্ষিণে সিপাহীসৈন্য, পশ্চাতে মেজর কার্ণাকের অধীনে কোম্পানীর অবশিষ্ট সিপাহী ও মীরজাফরের সৈন্যদল যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইল। প্রথমেই আসাদুল্লার অশ্বারোহীদল সুদক্ষ সেনানী বদরুদ্দিনের পরিচালনায় ইংরেজের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিল। সেই প্রচণ্ড আক্রমণে ইংরেজপক্ষ বিচলিত হইয়া গেল। অনেক সৈন্য বাঁশলুইএর জলে নিমজ্জিত ও অনেকে হতাহত হইল। বদরুদ্দিনের দল অতঃপর ইংরেজের বামপার্শ্ব ভেদ করিয়া দুইটি কামান অধিকার করতঃ গোরাদলের বামভাগ আক্রমণ করিল। সেনাপতি এডাম্‌স তখন কার্ণাকের দলকে উহাদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। ইহাতে ইংরেজ দলের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। সমরু ও মর্কারের আক্রমণ ক্রমে শিথিল হইতে হইতে তাহাদের সৈন্যদল পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিল। বদরুদ্দিনও বিপন্ন হইলেন। তিনি ও আসাদুল্লা ইংরেজের গোলার মুখে তাঁহাদের সৈন্যদলকে সংযত রাখিতে পারিলেন না। এই সময় ইংরেজদল সঙ্গীন স্কন্ধে দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়ায় বিপক্ষদল বাধা দিতে সমর্থ হইল না। তাহারা দ্রুত পলায়ন করায় ইংরেজের জয় হইল। বিপক্ষের ২০টি কামান ও দেড়শত নৌকাপূর্ণ খাদ্যসম্ভার ইংরেজের হস্তগত হইল।

অতঃপর মীরকাশেম মুঙ্গেরে আসিয়া পত্নী মীরজাফর দুহিতা ও অন্য কয়েকজন প্রিয়তমা বেগমকে মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ মীর সুলেমন ও রাজা নবৎরায় সমভিব্যাহারে রোটাস দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং উধুয়ানালায় যাত্রার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে হিন্দু বন্দীগণের প্রাণনাশের পৈশাচিক কল্পনা কার্যে পরিণত করিবার আদেশ দিলেন। অবিলম্বে রাজা রাজনারায়ণ পুত্রগণসহ ও রাজা রাজবল্লভ, ধনকুবের মহাতাপ রায়, জগৎশেঠ ও তাঁহার ভ্রাতা

মহারাজ স্বরূপচাঁদ, উমেদরাম ও রাজা ফতেসিংহ, বুনিয়াদ সিংহ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিহার জমিদারগণ নৃশংসরূপে নিহত হইল (মুতাক্ষরীণ, ২য় খণ্ড)। অতঃপর মীরকাশেম সদলবলে ভাগলপুর চম্পানগর পৌঁছিলেন, এখান হইতে উধুয়ানালার রক্ষার জন্য ক্রমশঃ সৈন্য প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রী আলিইব্রাহিমের পরামর্শে পরাক্রান্ত জমিদার কামগাঁর খাঁর সহিত সন্ধি করিয়া নিজ দলভুক্ত করিলেন। গুর্গিন খাঁ প্রধান সেনাপতি হইলেন।

রাজমহলের অনতিদূরে পর্ব্বতমালার পূর্ব্বোত্তরে পশ্চিমগামী সংকীর্ণ রাজপথের নিকটে উধুয়ানালার এই গিরিসঙ্কট অবস্থিত। দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নদী উধুয়া হইতে এই স্থানের নাম উধুয়ানালা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে নাতিগভীর বিল, দক্ষিণে ভাগীরথী। এই স্বাভাবিক সুদৃঢ় স্থানে পূর্ব্বাবধি একটি ক্ষুদ্র সুরক্ষিত সেনানিবাস ছিল। মীর কাশেম ইহাকে একটি দৃঢ়প্রাকার ও পরিখাবেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। দুর্গের পশ্চাদ্ভাগে ও উধুয়া নদীর উপরে এক প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু। দুর্গভিত্তির চতুর্দ্দিকে ও শৈলের উপরিভাগে সারি সারি কামান সজ্জিত। মীরকাশেম মনে করিয়াছিলেন উধুয়ানালার এই দুর্ভেদ্য ভূমিতে স্বীয় সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সাহায্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন। ইতিপূর্ব্বে অন্যতম আর্ম্মানী সেনাপতি আরাটুনের শিক্ষিত সেনাদল, এবং মীরনজফ্ ও হিম্মৎ আলি প্রভৃতির অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল উধুয়ানালায় স্থাপিত হইয়াছিল। চম্পানগর হইতে ক্রমশঃ আরও সৈন্য প্রেরিত হইল। গিরিয়ার হতাবশিষ্ট সৈন্যদলও এখানে আসিয়া মিলিত হইল।

অপর পক্ষে মেজর এডামস্ ও মীরজাফর নিজ নিজ সৈন্যদল লইয়া ৪ঠা আগষ্ট গিরিয়া হইতে রওয়ানা হইয়া ১১ই আগষ্ট উধুয়ানালার দুই ক্রোশ দূরে পাঙ্কীপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সুদক্ষ ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই স্বীয় কার্য্যের দুরূহতা বুঝিতে পারিলেন। গঙ্গাতীর ভিন্ন অন্যদিক দিয়া আক্রমণ যে সম্ভব নহে তাহাও তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল। নৌকা হইতে কামান অবতরণ, সম্মুখে দুর্গপ্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত কামান-বন্দুকের গোলাগুলির অবরোধ ও পরিখা পূরণাদির জন্য উপকরণ সংগ্রহ এবং তৎসাহায্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বপক্ষের তোপমঞ্চ স্থাপন ইত্যাদি প্রাথমিক কার্য্যেই তিন সপ্তাহ চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে বিপক্ষের সৈন্যদল নিশাযোগে বিলপার হইয়া আসিয়া ইংরেজ সৈন্যের বামভাগে মীরজাফরের শিবির পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে লাগিল। সকল দিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ক্রমশঃ

অগ্রসর হইয়া চতুর্বিংশ দিবসে ভাগীরথীতীর হইতে এডামসের সৈন্যদল গোলা-গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্রমাগত গোলাবর্ষণেও দুর্গের মৃৎপ্রাচীরের কোনও ক্ষতি করিতে পারিল না। কেবল নদীর দিকের দুর্গদ্বারের নিকটে একটি স্থান সামান্য ভগ্ন হইল। এডামসের সৈন্য এক্ষণে দুর্গপ্রাচীরের তিনশত গজ দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। আর অগ্রসর হইলে দুর্গপ্রাচীরের কামানের পাল্লার মধ্যে পড়িতে হইবে। এডামস্ চিন্তিত হইলেন। প্রবীণ চক্রী খোজা পিক্রকে মীরজাফর সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এপর্য্যন্ত মীরজাফরের অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক ষড়যন্ত্রে পিক্র লিপ্ত ছিল। এই পিক্র যুদ্ধের পরে কোম্পানীর দরবারে এবং আবেদন পত্রে লিখিয়াছিলেন যে উধুয়ানালার যুদ্ধের সময় মেজর এডামসের আজ্ঞানুসারে তিনি (পিক্র) মীরকাশেমের অন্যতম আর্মানী সেনানী মর্কার ও আরটুনকে ইংরেজদের উপকার করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন (Coja Petruse's defence—Long Selections, No. 647)। অনেকে মনে করেন, ঐ পত্রের ফলে উক্ত আর্মানী সেনানীদ্বয় ইংরেজ সেনাপতিকে দুর্গপ্রবেশের গুপ্ত পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। কারণ যুদ্ধের এই অবস্থায় একজন ইংরেজসৈন্য রাত্রিতে দুর্গ হইতে নিক্রান্ত হইয়া ইংরেজ শিবিরে আগমন করে। অতঃপর রজনীযোগে ঐ ইংরেজ সৈন্যের প্রদর্শিত পথ দিয়া অস্ত্রশস্ত্র মস্তকে বহন করিয়া ইংরেজ ও সিপাহী সৈন্য দুর্গমূলে উপস্থিত হয়। এইসময় দুর্গপ্রাকারের বাহিরে মীরকাশেমের যে কয়েকজন প্রহরী নিদ্রা যাইতেছিল, সংগীনের আঘাতে তাহাদিগকে নিহত করিয়া ইংরেজদল নিঃশব্দে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতঃ দুর্গমধ্যে অবতরণ করিল। এক্ষণে পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত দুর্গস্থ পাহাড়ের উপর হইতে উজ্জ্বল আলোক দেখাইয়া দক্ষিণ দিকের বহিঃস্থ ইংরেজ সৈন্যকে সঙ্কেত করা হইল। যুগপৎ দুর্গদ্বারের ভিতর ও বাহির হইতে অগ্নিবৃষ্টি করিতে করিতে ইংরেজসেনা ধাবিত হইল। এরূপ স্থলে যাহা হইবার তাহাই হইল। দুর্গস্থ প্রতিপক্ষ সৈন্যদল অতর্কিত আক্রমণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। অবিলম্বে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া জলস্রোতের ন্যায় ইংরেজসৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সুপ্তোত্থিত অনেক মুসলমানসৈন্য ঘটনা অবগত হইবার পূর্ব্বেই নিহত হইল। তাহাদের সেনাপতিগণও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। সকলে পশ্চাৎদিকের দুর্গদ্বার ও সেতু দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এ অবস্থায় অনেকে নদীগর্ভে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। ইংরেজেরা অবিলম্বে এই পশ্চাৎদ্বারও অধিকার করিল এবং সম্পূর্ণ দুর্গটিই অনতিকালমধ্যে

তাহাদের করায়ত্ত হইল।

উধুয়ানালার যুদ্ধের পরাজয়ের পর মীরকাশেম, রাজমহল বা তেলিয়াগড়ীতে সৈন্য স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া একেবারে মুঙ্গেরের দিকে পলায়ন করিলেন। মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, সমরু ও মর্কারের দল প্রথমেই সেতুর পরপারে আসে। মুসলমান সেনাপতি মীরনজফ ও আসাদুল্লা অতিকষ্টে পলায়নে সমর্থ হয়। মুস্তাফার মতে এই যুদ্ধে মীরকাশেমের পক্ষের পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

মুঙ্গের পৌছিয়া অন্যতম সেনানী আরাব আলির উপর দুর্গরক্ষার ভার দিয়া বন্দী ইংরেজগণকে সঙ্গে লইয়া মীরকাশেম পাটনায় প্রস্থান করিলেন (৯ই সেপ্টেম্বর)। মুঙ্গের ত্যাগের পর পথিমধ্যে কতিপয় মোগল সৈনিক রাত্রিকালে গুর্গনখাঁর তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে (মুতাক্ষরীণ)।

ইতিমধ্যে ইংরেজ সেনাপতি দুর্গস্থ কামান ও বহু যুদ্ধোপকরণ হস্তগত করিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর রাজমহল গমন করিলেন এবং এখানে আহতদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া পরদিন সসৈন্যে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। আরাব আলীর বিশ্বাসঘাতকতায় মুঙ্গের দুর্গ ইংরেজদের হস্তগত হইল।

পাটনায় পৌছিয়া মীরকাশেম চূড়ান্ত ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশ করিলেন। তিনি ইংরেজবন্দীগণের প্রাণবধের আদেশ দিলেন। ৫ই অক্টোবর প্রাতে কারাগারের মধ্য হইতে প্রথমে এলিস্, হে, লুসিংটন ও আরও ছয়জনকে বাহিরে ডাকিয়া আনা হইল। সমরুর অনুচরবর্গ তাহাদের প্রাণনাশ করিল। অতঃপর কেহই আর বাহিরে আসিতে চাহিলনা। তখন কারাগারের মধ্যেই গুলি বর্ষণ আরম্ভ করা হইল এবং এইরূপে সমস্ত ইংরেজকেই হত্যা করা হইল। তাহাদের হস্ত হইতে নারীগণও রক্ষা পাইল না। এলিসের শিশুপুত্র পর্য্যন্ত নিহত হইল। পরদিন প্রাতে চত্বর মধ্যস্থ কূপে তাহাদের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইল। ১১ই তারিখে পাটনার দরবারগৃহে যে সকল আহত ইংরেজ ছিল তাহাদিগকেও হত্যা করা হইল। মোট ৫০ জন ইংরেজ কর্ম্মচারী ও শতাধিক সৈন্য এইরূপে নিহত হয়। একমাত্র ডাক্তার ফুলার্টন চিকিৎসাসূত্রে মীর কাশেমের পরিচিত বলিয়া রক্ষা পান।

এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইবামাত্র মেজর এডামস ও মীরজাফর পাটনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মীর কাশেম অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় লাভার্থ কর্ম্মনাশার দিকে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে রোটাস দুর্গ হইতে তাঁহার পরিবারবর্গ মিলিত হইল। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা তখন বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত রাজার আক্রমণ প্রতিরোধার্থ এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন।

মীর কাশেম এলাহাবাদে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন বাদশাহ সাহ আলমও এলাহাবাদে ছিলেন। উভয়ে বাদশাহ শিবিরে গমন করিলেন। বাদশাহ ও সুজাউদ্দৌলা মীর কাশেমকে তাঁহার নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইতিমধ্যে বুন্দেলরাজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যাওয়ায়, সুজাউদ্দৌলা পাটনা আক্রমণে যাত্রা করিতে স্বীকৃত হইলেন। স্থির হইল বিহারের সীমায় প্রবেশের পর হইতে যতদিন সুজাউদ্দৌলার সৈন্য মীর কাশেমের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন ততদিন মীর কাশেম সুজাউদ্দৌলাকে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ মাসিক এগার লক্ষ টাকা দিবেন।

অতঃপর সুজাউদ্দৌলা এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে ৯ই মার্চ্চ কাশীতে আসিলেন। মীর কাশেমও সমরু ও ম্যাডাকের শিক্ষিত সৈন্যসহ তাঁহার অনুগমন করিলেন। গঙ্গা পার হইয়া ৯ই এপ্রিল তাঁহারা বকসারে পৌছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি কার্ণাক ও মীরজাফরের সেনাদল ইতিমধ্যে পাটনায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সুজা ও মীর কাশেমের সৈন্যদল অগ্রসর হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। ৩রা মে তাঁহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সমরু ইংরেজের অগ্নিবৃষ্টির ফলে পশ্চাৎপদ হইয়া একটি খালের মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। তাহাদের পক্ষের অশ্বারোহীদলও দুই তিনবার আক্রমণ চালাইয়া নিবৃত্ত হইল। সুজার বাম পার্শ্বে স্থাপিত কাশীরাজের সৈন্যদল ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে স্থাপিত রোহিলা অশ্বারোহিদলও বিপক্ষের ভীষণ গোলাবর্ষণে হতাহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় স্বয়ং সুজা তাঁহার সম্মুখ ভাগের সৈন্যদল লইয়া প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াও পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। ইংরেজ আগ্নেয়াস্ত্রেরই জয় হইল। সুজা স্বয়ং আহত হইয়া মীর কাশেমকে গালাগালি দিতে দিতে সন্ধ্যাকালে হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

অতঃপর সুজা মীর কাশেমকে লইয়া বক্সারে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

জুনের শেষে কার্ণাকের পদচ্যুতি ঘটিলে তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মীরজাফরও ভ্রাতা মীর কাজেমকে সুবে বিহারের নায়েব-নবাব ও রামনারায়ণের ভ্রাতা ধীরাজনারায়ণকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ হইতে আগত মেজর মনরো সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া পাটনায় গমন করিলেন।

মীর কাশেম মাসিক এগার লক্ষ টাকা সুজাকে যুদ্ধের ব্যয় দিতে চাহিয়াছিলেন। এক্ষণে যুদ্ধ দীর্ঘব্যাপী হওয়ায় বহু অর্থ সুজার পাওনা হইল দেখিয়া মীর কাশেম চিন্তিত হইলেন। বাদসাহের প্রাপ্য বাকী টাকার জন্যও পীড়াপীড়ি

আরম্ভ হইল। সমরুর সেনাদলের বাকী বেতনের জন্য সমরুর সেনাদল একদিন মীর কাশেমের শিবির বেষ্টন করিল। মীর কাশেমের নগদ অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। পরিবারবর্গের নিকট হইতে গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ঐ সেনাদলের বেতন পরিশোধ করিয়া দিয়া মীর কাশেম অর্থাভাবে সমরু ও তাহার সেনাদলকে ছাড়িয়া দেওয়ায় তাহারা অস্ত্রশস্ত্রসহ সুজাউদ্দৌলার সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করিল। স্বর্ণমুদ্রার গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়া সুজা মীর কাশেমের পট মণ্ডপ বেষ্টন করিলেন। প্রজা শোষণের দ্বারা সঞ্চিত গুপ্ত ধনের প্রায় সমস্তই মীর কাশেমের নিকট হইতে সুজা আদায় করিয়া লইলেন। শেষে একটি ভগ্নপাদ হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া মীর কাশেমকে বিদায় দিলেন।

বর্ষা শেষ হইলে ১৭৬৪ খৃঃ ৯ই অক্টোবর মেজর মনরো সদলে বক্সারের দিকে যাত্রা করিলেন। সুজার অগ্রগামী দল ইহাদের সম্মুখে পড়িয়া পশ্চাৎপদ হইল। বক্সারে সুজার গড়খাতের সম্মুখে উপনীত হইয়া মনরো স্বীয় সেনাদলকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করিলেন। তৃতীয় দিবসে সুজার সেনাদল গড়খাত হইতে বাহির হইয়া ইংরেজদলকে আক্রমণ করিল। দুরানী ও সেখজাদি অশ্বারোহীদল পুনঃপুনঃ প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিয়াও ইংরেজের ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। সমরু ও ম্যাডকের দলও আক্রমণ করিয়াও কিছুই সুবিধা করিতে পারিল না। সেনানী কুলী খাঁ ও তাঁহার সেনাদল সুজাউদ্দৌলার পশ্চাতে ছিল। তাহারা ঘুরিয়া আসিয়া বিল পার হইয়া ইংরেজদের কামানের সম্মুখে পড়িলে স্বয়ং কুলী খাঁ অনুচরগণসহ নিহত হইলেন। মোগল দুরানীগণ যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সুজাউদ্দৌলার শিবির লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। সুজা বিপন্ন হইয়া কেবল মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া এলাহাবাদের দিকে পলায়ন করিলেন। তাঁহার মন্ত্রী বেনীমাধু বাহাদুর সাহ আলমকে সঙ্গে লইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে তিনিও পলায়ন করিলেন। সুজার বিপুল শিবিরের বহু সম্পত্তি ও সমরোপকরণ ইংরেজদের হস্তগত হইল। বাদশাহ সাহ আলম সুজার কবল হইতে মুক্ত হইয়া ইংরেজের শরণ লইলেন।

মীর কাশেম খঞ্জ হস্তিনী পৃষ্ঠে এলাহাবাদে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে বক্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলার পরাজয়ের সংবাদ পাইলেন। বন্ধু আলি ইব্রাহিমের নিকট সংবাদ পাইলেন বেণী মাধু তাঁহাকে ইংরেজের হস্তে ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এলাহাবাদে পলায়ন করিয়া তথা হইতে পত্নী ও পরিবারবর্গকে অতি কষ্টে উদ্ধার করিয়া রোহিলাখণ্ডে গমন করিলেন। রোহিলা-খণ্ডের সামন্তরাজ ধর্মপ্রাণ নজবুদ্দৌলার অনুগ্রহে মীর কাশেম কিছুকাল বেরেলীতে

বাস করিলেন। শেষে নিজ কুটিল ষড়যন্ত্রের দোষে রোহিলাখণ্ড ত্যাগে বাধ্য হইয়া তিনি গোয়ালিয়রের সমীপে ঘোড়ের রাণার আশ্রয় লইলেন। ঘোড়ের রাণাও তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। অতঃপর কিছুকাল রাজপুতনায় ঘুরিয়া দিল্লীতে সাহ আলমের মন্ত্রিত্ব লাভের চেষ্টা করিলেন। তথা হইতে বাদশাহের আদেশে বিতাড়িত হইয়া দিল্লীর অদূরে দিল্লী ও আগ্রার নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে (সাজাহানাবাদে) দরিদ্র্যের চরম ক্লেশ ভোগ করিয়া উদরী রোগে নবাব মীর কাশেম অসহায় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪ খৃঃ) তের বৎসর পরে লোকে দিল্লীর অদূরে একটি পরিত্যক্ত উদ্যানে একটি মৃতদেহ দেখিল। পরিচিত শালের আবরণ দেখিয়া তাহারা বুঝিল উহা মীর কাশেমের মৃতদেহ (মুতাক্ষরীণ)। Annual Register (1800 A.D) ক্রস্ লিখিয়াছেন মীর কাশেমের দেহান্তে তাঁহার একমাত্র শাল বিক্রয় করিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল (১৭৭৭ খৃঃ ৭ই জুন।

নবাব মীরজাফর আলি খাঁ (দ্বিতীয়বার)
(১৭৬৪ খৃঃ অক্টোবর-১৭৬৫ খৃঃ জানুয়ারী)।

বক্সারের যুদ্ধের পর হইতে মীরজাফর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নবাব হইলেন। তাঁহার সুপারিশে বাদশাহের পত্রানুমোদনক্রমে বৃদ্ধ মহারাজ দুর্লভরাম নিজামত বিভাগের দেওয়ান হইলেন ও দেওয়ানখানা, জায়গীর বিভাগ, পাটনা অঞ্চলের হিসাব হুজুর নবীশী ধনাগার প্রভৃতি নিজামৎ দেওয়ানী হইতে খারিজ হইয়া তাহাতে মহারাজ নন্দকুমার নিযুক্ত হইলেন। ১৭৬৪ খৃঃ নভেম্বর মাসে বান্সিটার্ট কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। নবাব পুনরায় কলিকাতায় আসিলে কোম্পানী টাকার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করিল। অর্থাভাবে নবাব রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াই শেষ শয্যায় শয়ন করিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ জানুয়ারী ৭৪ বৎসর বয়সে বিশ্বাসঘাতক, কুষ্ঠারোগাক্রান্ত, অহিফেনসেবী বৃদ্ধ নবাব মীরজাফর পরলোক গমন করিলেন।

দ্বিতীয়বার স্বদেশে যাইবার পর মন্ত্রীবর পিট ও স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর ক্লাইবকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া 'লর্ড' উপাধিদানে সম্মানিত করেন। প্রথম জীবনে কোম্পানীর সামান্য কেরাণীর পদ লইয়া এদেশে আসিয়া যিনি অসাধারণ কূটনীতি ও যুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়া ভারতে ইংরেজের জয় পতাকা উড়াইয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ডে এখন আর নগণ্য নহেন। তিনি এক্ষণে অতুল

ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। এই সময় বান্সিটার্ট ইংলণ্ডে গমন করিলেন। বান্সিটার্টের দুর্ব্বল ব্যবস্থায় ও কলিকাতা কাউন্সিলের মধ্যে দলাদলির ফলে বঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর আর্থিক দুরবস্থার সংবাদ আসিতে লাগিল। বিলাতের অংশীদার সভা এই অবস্থায় লর্ড ক্লাইবকেই পুনরায় বাঙলায় কোম্পানীর গভর্ণর করিয়া পাঠাইলেন। ১৭৬৪ খৃঃ ৪ঠা জুন সমার্স ও সাইকস-সহ যাত্রা করিয়া ১৭৬৫ খৃঃ মে মাসে ক্লাইব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন এবং তিনজন সভ্য দ্বারাই কমিটি গঠন করিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের এদেশে অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন বন্ধ করিবার জন্য কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ইতিপূর্ব্বে এক অঙ্গীকারপত্র প্রস্তুত করিয়া সকলকেই উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে আদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। জানুয়ারী মাসে এই অঙ্গীকারপত্র কলিকাতায় আসিলেও তাহাতে কেহই স্বাক্ষর করে নাই। ক্লাইব কলিকাতায় আসিয়াই তাহাতে সকলের স্বাক্ষর করাইলেন।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে লক্ষ্মণাবতীতে ও নদীয়ায় মুসলমানের আক্রমণ আরম্ভ হয়। তাহার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানেরা বিহারের ওদন্তপুর বিহার পোড়াইয়া ধ্বংস করে, তথাকার বৌদ্ধাচার্য্যগণকে নিহত করে ও তথায় যে প্রকাণ্ড পুস্তকাগার ছিল তাহা পোড়াইয়া দেয়। তাহাদের হাত হইতে নালন্দামহাবিহার ও বিক্রমশীলা মহাবিহারও রক্ষা পায় নাই। গৌড় হইতে রাজা লক্ষ্মণসেন আত্মরক্ষার্থ বঙ্গের বিক্রমপুরে দলবলসহ চলিয়া যান। তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ও বণিক অনেকেই চলিয়া যান। মুসলমানেরা বরেন্দ্রীর সোমপুর মহাবিহার ও জগদ্দল মহাবিহার ধ্বংস করে। পারসীকেরা সিন্ধু নদকে হিন্দু বলিত এবং তাহা হইতে তাহারা সমস্ত ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান নামে অভিহিত করিয়াছিল। তুর্কী ও আরবী মুসলমানেরাও এই দেশকে হিন্দুস্থান ও এদেশের অধিবাসীকে হিন্দু ও ইহাদের ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম নাম দিল। ইহাদের নিকট বাঙ্গালা, বৌদ্ধ, জৈন, বেদপন্থী সকলেই হিন্দু বলিয়া গণ্য হইল। বিহারগুলি ধ্বংসের সহিত হতাবশিষ্ট বৌদ্ধাচার্য্যগণ যে সকল পুস্তক রক্ষা করিতে পারিলেন তাহা লইয়া নেপালে, তিব্বতে পলাইয়া গেলেন। প্রায় দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত

গৌড়-বঙ্গের হিন্দুরা ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করিতে লাগিল। এই আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাঙালীর সাহিত্য রচনার কাজ বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপে ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ কাটিয়া গেল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দেশ কতকটা শান্ত হইল। মুসলমান শক্তি তখন প্রায় সমস্ত গৌড়-বঙ্গ দখল করিয়া বসিয়াছে।

এই সময় সাহিত্য রচনায় আবার নূতন উদ্যম দৃষ্ট হয় এবং এই উদ্যমে মুসলমান সুলতান ও হিন্দু রাজারা বিশেষভাবে সাহায্য করেন। মুসলমান সুলতান ইলিয়াস সাহের আমল হইতেই পণ্ডিত ও কবিরা বাহিরের মাঠে ও মণ্ডপে তাহাদের রচিত গান ও ছড়া আবৃত্তি করিয়া লোকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া রাজা ও সুলতানদের দরবারে তাহাদের গান ও কবিতা শুনাইয়া তথায় সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে রুকনুদ্দিন বার্ব্বক সাহ (১৪৫৯-১৪৭৫ খৃঃ) নামক একজন সুলতান গৌড়-বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মালাধর বসু নামে একজন বিদ্বান কবি তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। সুলতানের ইচ্ছাক্রমে মালাধর বসু শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে বাঙলা ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামক কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা ও মথুরালীলার ঘটনাগুলির বর্ণনা করেন। কবির কাব্য শ্রবণে সুলতান মুগ্ধ হইয়া কবিকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভণিতা হইতে জানা যায় যে এই গ্রন্থ ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ) রচিত হয়[১]। মালাধর বসু বর্দ্ধমান জেলার কুলীন গ্রামবাসী ছিলেন।

এই সময়েই মহাকবি বাল্মিকীর রামায়ণের অনুকরণে কবি কৃত্তিবাস বাঙলা কবিতায় 'শ্রীরাম পাঁচালী' বা 'রামায়ণ' রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণে কবি যে আত্মবিবরণী দিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে—

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

১। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে'র অনুকরণে সুলতান হোসেন সাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) সময় যশোরাজ খাঁ "কৃষ্ণমঙ্গল" কাব্য, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে গোবিন্দ আচার্য্য "কৃষ্ণমঙ্গল", ভাগবতার্য্য "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" এবং চণ্ডীদাস "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" রচনা করিয়াছিলেন।

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার ॥"

এই পদ্যগুলি আলোচনা করিলে জানা যায় যে কবি ১৩৮৯ খৃঃ ৩রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন [১]।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভণিতা হইতে জানা যায় যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজা দনৌজমাধবের (১২৮২ খৃঃ) সময় বঙ্গে বাস করিতেন। তথায় অরাজকতা উপস্থিত হইলে তাঁহারা দেশ ত্যাগ করিয়া গঙ্গা নদীর পূর্ব্ব তীরে কুলিয়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এখানে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বনমালী মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম মাণিকী দেবী। গুরু গৃহে বিদ্যার্জ্জনের পর তিনি এক রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া সম্মান প্রাপ্ত হন এবং বাঙলা ভাষায় রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন। এই রাজা বোধহয় রাজা গণেশ।

"কৃত্তিবাসের কণ্ঠে সরস্বতী খেলি।
সংসার মোহিত কৈল রামের পাঁচালী ॥"[২]

ময়মনসিংহের 'মনসা মঙ্গল' রচয়িতা দ্বিজ বংশীবদনের কন্যা চন্দ্রাবতী এই সময়ে একখানি রামায়ণ গান রচনা করেন।

অতঃপর কাশীরাম দাস মহাভারত পাঁচালী ছন্দে বাঙলা কবিতায় রচনা করিয়া যশস্বী হন। বিরাট পর্ব্বের শেষে লিখিত আছে।

"চন্দ্রবাণপক্ষঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয় ॥"

অর্থাৎ ১৫২৬ শকে বিরাট পর্ব্ব রচনা শেষ হয়। ১৫২৬ শক = ১৬০৪ খৃঃ। অতএব কাশীরামদাস খৃঃ সপ্তদশ শতকের প্রথমেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় জ্যোতিষ ও কুলশাস্ত্রের প্রমাণে বলেন কৃত্তিবাসের জন্মকাল ১৩৮৯ খৃঃ ৩রা জানুয়ারী, ৭ই মাঘ রবিবার, শুক্লা পঞ্চমীতে হওয়াই সম্ভব (সা, প, প ৪৮ বর্ষ ১২০ পৃঃ)।

২। খৃঃ ষোড়শ শতকে দ্বিজ বল্লভ ও খৃঃ সপ্তদশ শতকে অদ্ভুতাচার্য্য, দ্বিজ লক্ষ্মণ ও দ্বিজ ভবানীনাথ রামায়ণ পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণে সহস্রবাহু রাবণ বধের বিবরণ আছে। ইহাদের রামায়ণ কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় সমাদৃত হয় নাই।

(সা, প, পত্রিকা, ১৩১৯, ২য় সংখ্যা পৃঃ ১২৬)।

কাশীরাম বর্দ্ধমান জেলায় সিংহ গ্রামে (সিঙ্গি গ্রাম) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত। ইহার আরও দুই ভাই ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস' ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর 'জগৎ মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। ইহারা দেব বংশীয় কায়স্থ ছিলেন। গদাধর ১৫৬৭ শকে (১৬৪৫ খৃঃ) তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন [১]।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি আরও কতকগুলি পুরাণ ও শনির পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, সত্যপীরের পাঁচালী প্রভৃতি বাঙলায় রচিত হইয়াছে।

মঙ্গল কাব্য

চণ্ডীমঙ্গল।

সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অনুদিত গ্রন্থাদি ব্যতীত এই সময় আর এক শ্রেণীর কাব্য রচিত হয়। তাহাদিগকে 'মঙ্গল কাব্য' বলা হয়। ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার ও বিপদ এবং দারিদ্র্যাদি নিবারণের আশায় যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চ্চনা দেশে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, এই সকল মঙ্গল কাব্যে তাহাদের প্রভাব বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল প্রধান। এতদ্ব্যতীত রায়মঙ্গল (দক্ষিণরায় মঙ্গল, কালু রায়মঙ্গল), গাজি মঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অন্নদা মঙ্গল উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ গ্রন্থাকারে রচিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ছোট ছোট গান প্রচলিত ছিল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি রচয়িতা ছিলেন মানিক দত্ত। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে দ্বিজ মাধব নামে আর

১। সুলতান হোসেন সাহের সময় পরাগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস মহাভারত কাব্য রচনা করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁও চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার আদেশে শ্রীকর নন্দী একখানি মহাভারতের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। খৃঃ ষোড়শ শতকের শেষভাগে রামচন্দ্র খাঁ ও দ্বিজ রঘুনাথ বাঙলা কবিতায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল মহাভারত কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায় আদর লাভ করে নাই।

একজন কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গলই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া অদ্যাবধি জীবিত আছে। এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম 'শিবায়ণ' (দেব খণ্ড) এই খণ্ডে শিব দুর্গার বিরহ, তাহাদের ঘর সংসার ঝগড়া দ্বন্দ্বের কথা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম "কালকেতু ফুল্লরা খণ্ড"। এই খণ্ডে দুর্গা বা চণ্ডীদেবীর পূজা পৃথিবীতে প্রচারের গল্প আছে। তৃতীয় খণ্ডের নাম "ধনপতি-খুল্লনা" খণ্ড। এই খণ্ডে চণ্ডী পূজা প্রচারের কাহিনী আছে।

এই কাব্যে মুকুন্দরাম তৎকালের মুসলমান ডিহিদারের অত্যাচার, সেকালের সমাজের ও মানুষের স্বভাবের ইতিহাসের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কের গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

ইহা হইতে ১৪৯৯ শকাব্দ (১৫৭৭ খৃঃ) পাওয়া যায়।

মুকুন্দরামের বাস সলিমাবাদ পরগণায় দামিন্যা গ্রামে ছিল। ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণভূমের রাজা বাঁকুড়া রায়ের রাজধানী আড়রায় আসিয়া রাজানুগ্রহে তথায় বসতি করেন।

এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুইটি উপাখ্যান আছে—(১) কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, (২) শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান।

ধর্ম্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতু। কালকেতু ও তাহার সাধ্বী পত্নী ফুল্লরা সুখে বাস করে। কালকেতু পশু হত্যা করিয়া মাংস আনে। ফুল্লরা ঐ মাংস বিক্রয় করিয়া সংসার চালায়। একবার বনে পশুর অভাব হওয়ায় কালকেতুর বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু চণ্ডীদেবীর দয়ায় তাহার বহু ধন লাভ হইল এবং কালকেতু অরণ্য কাটিয়া তথায় রাজ্য বসাইল। নানা জাতির লোক আসিয়া তাহার রাজ্যে বাস করিল। একবার কলিঙ্গরাজ তাহার রাজ্য আক্রমণ করিল। কিন্তু যাইবার সময় কালকেতু দেবী চণ্ডীকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল। সেই অপরাধে কালকেতু কলিঙ্গ রাজের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী হইল। তখন কালকেতু নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া চণ্ডীকে কাতর স্বরে ডাকিতে লাগিল। ফুল্লরাও চণ্ডীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রক্ত জবা দিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিল। দেবী তুষ্ট হইয়া কলিঙ্গ রাজকে স্বপ্নে জানাইলেন যে কালকেতু তাঁহার ভক্ত। কালকেতুকে ছাড়িয়া না দিলে দেবী কলিঙ্গ রাজকে সবংশে ধ্বংস করিবেন। ভীত হইয়া কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে মুক্তি দিলেন এবং নিজে

চণ্ডী পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান হইল এই—শ্রীমন্তের পিতা চণ্ডীকে অবজ্ঞা করিয়া বাণিজ্য যাত্রা করায় তিনি সিংহলের রাজা কর্ত্তৃক বন্দী হন। শ্রীমন্ত দেবীকে আরাধনা করিয়া তুষ্ট করিলেন এবং দেবীর বরে সিংহলে যাইয়া পিতাকে উদ্ধার করিলেন।

মনসামঙ্গল।

সর্পসঙ্কুল বাঙলা দেশে মনসা পূজার গীত প্রচলিত হয়। ময়মনসিং জেলার দ্বিজ বংশীবদন ও ফরিদপুরের (১৪৮৪ খৃঃ) বিজয় গুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গের কেতকী দাস, ক্ষেমানন্দ, উত্তর বঙ্গে বগুড়ার জীবন মৈত্র ও চট্টগ্রামে নারায়ণ দেব-এর মনসামঙ্গল খুব সমাদৃত।

শিবের মানস কন্যা মনসা। মনসা সর্পরাজ বাসুকীর মাতা। শিবের নেত্রজলে জাত নেতাই ধোপানী মনসার সহচরী। মনসা নেতার সহিত যুক্তি করিয়া পৃথিবীতে আপন পূজা প্রচার করিতে সংকল্প করিলেন। অনেকে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। কিন্তু শিব-দুর্গার ভক্ত মহারাজ চাঁদ সওদাগর তাঁহার পূজা করিতে অস্বীকার করিলেন। চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরী ওঝা চাঁদকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মনসা চক্রান্ত করিয়া ধন্বন্তরীকে বিনষ্ট করিলেন এবং চাঁদের ছয় পুত্রকে সর্প বিষ প্রয়োগে হত্যা করিলেন। চাঁদ সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর লইয়া বাণিজ্য করিয়া বহু ধনরত্ন লইয়া ফিরিবার সময় তাঁহার সমস্ত ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিলেন। চাঁদ অতিকষ্টে বাড়ী ফিরিলেন।

অতঃপর চাঁদের সপ্তম পুত্র লখিন্দরের বিবাহ বাসো বেনের (কোন মতে সায় বেনের) কন্যা সুন্দরী ও গুণবতী বেহুলার সহিত হইল। চাঁদ সওদাগর সাঁতালী পর্ব্বতে এক লোহার বাসর ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পুত্র পুত্রবধূর বাসর যাপনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা বাসর ঘর তৈয়ার করিবার সময় মনসার ভয়ে দেওয়ালে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া দিয়াছিলেন। মনসার আজ্ঞায় কালনাগ সেই ছিদ্র পথে বাসর ঘরে ঢুকিয়া লখীন্দরকে দংশন করিয়া পলাইয়া গেল।

পরদিন বেহুলার প্রার্থনায় চাঁদ বেনে একটি কলাগাছের ভেলা নির্ম্মাণ করাইয়া পুত্রের মৃতদেহসহ বেহুলাকে তাহাতে উঠাইয়া দিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। অনেক বিপদ পার হইয়া বেহুলা স্বর্গের ঘাটে আসিয়া পৌছিল। সেখানে নেতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বেহুলা নেতাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার সাহায্যে স্বর্গে গেলেন এবং নৃত্যে শিব ও দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিয়া লখীন্দরকে জীবিত করিয়া লইলেন। বেহুলা চাঁদকে মনসার পূজা করিতে সম্মত করাইবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। চাঁদ প্রথমে মনসাকে পূজা করিতে

সম্মত হইলেন না। কিন্তু সকলের অনুরোধে শেষে বাঁ হাত দিয়া মনসার পূজা করিলেন। মনসা সন্তুষ্ট হইয়া চাঁদের মৃত ছয় পুত্রকে বাঁচাইয়া দিলেন ও সমস্ত ধনরত্ন উদ্ধার করিয়া দিলেন। তদবধি পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হইল।

ধর্ম্মমঙ্গল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের শরণ লইবার নির্দ্দেশ আছে। এই ত্রিরত্নের পূজাই বোধহয় ধর্ম্মঠাকুরের পূজায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। সম্ভবতঃ বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য হইলে বিষ্ণুর কূর্ম্মাবতারের সহিত যুক্ত হইয়া কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারী ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে চলিয়া যায়।[১]

প্রথমে মথুর ভট্ট লাউসেনের পৌত্র ধর্ম্মসেনের জন্য ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। পরে খেলারাম চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের কাব্য আর পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতকের শেষে রূপরাম চক্রবর্ত্তী যে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন তাহা বেশ আদৃত হয়। অতঃপর মানিক গাঙ্গুলী, শ্যামপণ্ডিত, সীতারামদাস ও গোবিন্দদাস ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছে এবং তাহা মুদ্রিত হইয়াছে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম "সংজাত পদ্ধতি" ইহাতে ধর্ম্ম পূজার নিয়মকানুন আছে। দ্বিতীয়ভাগ "শূন্য পুরাণ"। ইহাতে শূন্য হইতে ধর্ম্ম ঠাকুর কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন তাহার বিবরণ আছে। তৃতীয়ভাগ "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্য।

সৃষ্টির আগে সব শূন্য ছিল। এই শূন্য মধ্যে ধর্ম্মঠাকুর শূন্য রূপে ছিলেন। পরে শূন্যরূপ ধর্ম্ম নীল (মন) ও অনীলে (বাতাস) পরিণত হইলেন। তাহা হইতে ধর্ম্ম দেহ ধারণ করিলেন এবং তাঁহার হাই হইতে উল্লুক পাখী বাহির হইয়া ধর্ম্মের বাহন হইল। উড়িতে উড়িতে ক্লান্ত হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইলে ধর্ম্ম জল সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্ম ঠাকুর গা হইতে একটু ময়লা জলে ফেলিয়া দিলে তাহা হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইল। ধর্ম্ম ঠাকুরের ঘাম হইতে একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। ধর্ম্ম সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়া বল্লুকা নামক নদী তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। এদিকে ঐ কন্যার মুখ হইতে ব্রহ্মা, কপাল হইতে বিষ্ণু ও পেট হইতে শিব জন্মগ্রহণ করিলেন। অতঃপর ধর্ম্ম পুত্রগণকে পরীক্ষা করিবার

১। নাস্তি রূপং নাস্তি দেহং নাস্তি কায়ো নিনাদং। নাস্তি জন্ম নাস্তি মূর্ত্তি তস্মৈ শ্রীধর্ম্মায় নমঃ। কচ্ছপরূপধরং মহিং মনোহরং। নিলেজ নিরঞ্জনং শ্রীধর্ম্মায় নমঃ।" (ধর্ম্মপূজা বিধি)

জন্য শব রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের নিকট দিয়া আসিয়া যাইতে লাগিলেন।

তখন "মড়া দেখি ব্রহ্মা তবে দূর দূর করে।
বিষ্ণু তবে ঘৃণাভরে যায় দূরে সরে॥
ধ্যানযোগে শিব তবে মড়াটারে জানি।
সযতনে সৎকার করিল যে আনি॥"

ধর্ম্ম শিবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া শিবকে শ্রেষ্ঠ দেবতা করিলেন। অতঃপর ধর্ম্ম ঠাকুর জগতে নিজ-পূজা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রচার উপাখ্যানটি এই—

দক্ষিণ বঙ্গে কর্ণসেন ও উত্তর বঙ্গে ইছাই ঘোষ বঙ্গপতির সামন্ত রাজা ছিলেন। ইছাই ঘোষ বঙ্গরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন। বঙ্গেশ্বরের আদেশে কর্ণসেন বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য নিজ পুত্রগণকে পাঠাইলেন। কিন্তু ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে তাহারা মারা গেল। কর্ণসেনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বঙ্গরাজ নিজ শ্যালিকা রঞ্জনাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন। ধর্ম্ম ঠাকুরের আরাধনা করিয়া রঞ্জনাবতী 'লাউসেন' নামে পুত্র লাভ করিলেন। মহামদ ছিল বঙ্গরাজের শ্যালক ও সেনাপতি। তিনি কর্ণসেনের সহিত নিজ ভগ্নীর বিবাহে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি গুপ্তচর পাঠাইয়া লাউসেনকে চুরি করাইলেন। রঞ্জনাবতীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ধর্ম্ম ঠাকুর একফোঁটা কর্পূর দিয়া একটি ছেলে তৈয়ারী করিয়া রঞ্জনাবতীকে দিলেন এবং ধর্ম্ম ঠাকুরের এক অনুচর চিলের রূপ ধরিয়া মহামদের বাড়ী হইতে ঠোঁটে করিয়া লাউসেনকে উদ্ধার করতঃ রঞ্জনাবতীকে দিলেন। লাউসেন বড় হইয়া হনুমানের নিকট কুস্তী শিখিল। ধর্ম্ম ঠাকুরের স্ত্রী আদ্যাদেবী তাহাকে 'জয় খড়্গ' নামক অস্ত্র প্রদান করিলেন। এইরূপে নানা বিদ্যা শিখিয়া লাউসেন পথে মাতুল মহাশয়দের কুস্তীগীরদের পরাস্ত করিয়া ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীরকে বিনষ্ট করিয়া রাজ দরবারে উপস্থিত হইল। মন্ত্রী মহামদ রাজাকে বুঝাইলেন লাউসেন তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে। তাহা শুনিয়া রাজা লাউসেনকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কারাগারে লাউসেন ধর্ম্মঠাকুরকে শরণ করিলেন। ধর্ম্ম ঠাকুরের ইচ্ছায় বঙ্গরাজের মন প্রসন্ন হইল এবং তিনি লাউসেনকে সেনাপতি করিলেন।

এই সময় কামরূপরাজ বঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে রাজার আদেশে লাউসেন যুদ্ধ করিয়া কামরূপরাজকে পরাজিত করিল ও কামরূপ রাজের কন্যা 'কলিঙ্গ'কে বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এই যুদ্ধে কালু ডোম নামক ধর্ম্ম ঠাকুরের এক ভক্ত লাউসেনের সহায়ক হইয়াছিল।

অতঃপর বঙ্গরাজ 'কানাড়া' নাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে

সেই রাজার রাজ্য আক্রমণ করিলেন কিন্তু কানাড়া আদ্যাদেবীর ভক্ত থাকায় যুদ্ধে দেবী স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে বঙ্গরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং লাউসেনকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। লাউসেন ধর্ম্ম ঠাকুরের বরে অনায়াসে কানাড়ার পিতাকে পরাস্ত করিয়া কানাড়াকে বিবাহ করতঃ ফিরিয়া আসিল। ইহাতে বঙ্গরাজ লাউসেনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রী মহামদের কুপরামর্শে লাউসেনকে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। লাউসেন ইছাই ঘোষকে আক্রমণ করিলেন। আদ্যাদেবী ইছাই ঘোষের ও ধর্ম্মঠাকুর লাউসেনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। লাউসেন ইছাই ঘোষের সেনাপতি লোহাট্য সর্দ্দারকে বধ করিল। ধর্ম্ম ঠাকুরের ইচ্ছায় তেত্রিশ কোটি দেব দেবী কৌশল করিয়া ইছাই ঘোষকে নিহত করিল।

বঙ্গরাজ লাউসেনের পরাক্রম দেখিয়া ভীত হইলেন। কৌশলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য লাউসেনকে পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় দেখাইতে বলিলেন। লাউসেন ধর্ম্ম ঠাকুরকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বদেহের মাংস কাটিয়া আগুনে আহুতি দিল ও খড়্গাঘাতে নিজ মাথা কাটিয়া ধর্ম্ম ঠাকুরকে নিবেদন করিতে উদ্যত হইলে ধর্ম্মঠাকুর তুষ্ট হইলেন ও ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে রাজাকে 'পশ্চিমে সূর্য্যোদয়' দেখাইলেন। রাজা মন্ত্রী মহামদকে কঠোর শাস্তি দিলেন। অতঃপর লাউসেন পত্নী, পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধব সহ সুখে জীবন যাপন করিয়া 'ধর্ম্মের আশীষে' স্বর্গপুরে গমন করিল।

রায়মঙ্গল।

ব্যাঘ্র ও কুমীরের ভয়ে ভীত সুন্দরবনের ও তাহার আশে পাশের মানুষেরা ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায় ও কুমীরের দেবতা কালুরায়ের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরে কবিরা চণ্ডীমঙ্গলের অনুকরণে 'দক্ষিণরায় মঙ্গল' ও 'গাজিমঙ্গল' নামক কাব্য রচনা করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বসন্তের দেবী শীতলাদেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য 'শীতলামঙ্গল' প্রভৃতি আরও অনেক মঙ্গলকাব্য এই সময়ে রচিত হয়।

আরও পরে কবি রাম প্রসাদ 'কালিকামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তাঁহার 'শ্যামাসঙ্গীত' 'আগমনীগান' 'বিজয়াগান' ও 'দেহতত্ত্বে'র গানগুলি আজিও অমর হইয়া আছে। ২৪ পরগণা জেলার হালিসহরের নিকটে কুমারহট্ট গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

অন্নদামঙ্গল।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' একখানি উত্তম মঙ্গল কাব্য। তিনি এই মঙ্গল কাব্য লিখিয়া কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট 'রায়গুণাকর'

উপাধি লাভ করেন। অন্নদামঙ্গলের তিন অংশ। প্রথম অংশের নাম দেবী মঙ্গল। দ্বিতীয় অংশের নাম কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। তৃতীয় অংশের নাম ভবানন্দ, মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের উপাখ্যান।

ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান ছিল দক্ষিণ রাঢ়ের ভুরশিট পরগণায় পেঁড়ো বসন্তপুরে। বর্দ্ধমানের রাজার সহিত বিবাদ হওয়ায় তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হন। রাজা তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন ও বিষয় সম্পত্তি দান করেন। তিনি এই সময়ে অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়া রায়গুণাকর উপাধি লাভ করেন। ২৪ পরগণার মুলাজোড় গ্রামে তিনি নূতন করিয়া বসতি স্থাপন করেন। অন্নদামঙ্গল পাঠে জানা যায় এই সময়ে বাঙলা সাহিত্য আরবী ও ফারসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষার শব্দ লইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছিল। অন্নদামঙ্গলের উপাখ্যান এইরূপ :—

দেবী অন্নপূর্ণা কাশী হইতে রাঢ়দেশে হরি হোড় নামক এক দরিদ্র কায়স্থ ভক্তের বাড়ীতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দেবীর কৃপায় তিনি লক্ষপতি হন। বৃদ্ধ বয়সে হোড় মহাশয় নূতন বিবাহ করেন। ফলে সপত্নীদের কলহে তাঁহার গৃহ অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন দেবী হরি হোড়কে ত্যাগ করিয়া ভবানন্দ মজুমদার নামক এক অন্য ভক্তের গৃহে অধিষ্ঠিতা হন। দেবীর কৃপায় ভবানন্দ কৃষ্ণ নগরের রাজা হন। এই সময় আকবর বাদসাহ ছিলেন ভারত সম্রাট। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহী হইলে সম্রাট বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাপতি মানসিংহকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে মানসিংহ কয়েক দিন ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে বিশ্রাম করেন। এই সময় একদিন মানসিংহ ভবানন্দের সহিত বর্দ্ধমানের পুরাতন রাজবাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া রাজবাড়ীর একস্থানে একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পান। ভবানন্দ মানসিংকে এই সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিলেন : বর্দ্ধমানরাজের রূপগুণে ও বিদ্যায় শ্রেষ্ঠা বিদ্যা নামে এক কন্যা ছিল। বিদ্যা প্রতিজ্ঞা করিল যে, যে ব্যক্তি তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারিবে, সে তাহাকেই বিবাহ করিবে। অপর দিকে 'সুন্দর' নামক এক রাজপুত্র বিদ্যার রূপ গুণের কথা শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। রাজকুমার সুন্দর বর্দ্ধমানে যাইয়া হীরা মালিনীর গৃহে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হীরা মালিনী রাজকুমারী বিদ্যাকে প্রত্যহ ফুল যোগাইত। সুন্দরের অনুরোধে মালিনী বিদ্যাকে সুন্দরের সংবাদ দিল ও তাহার রূপ গুণের প্রশংসা করিল। সুন্দর মালিনীর বাড়ী হইতে বিদ্যার গৃহ পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ কাটিয়া একদিন সেই সুড়ঙ্গ পথে বিদ্যার শয়ন গৃহে উপস্থিত হইল। উভয়ে উভয়ের রূপে মুগ্ধ

হইল। বিদ্যার সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া সুন্দর বিদ্যাকে গোপনে বিবাহ করিল। কিছুদিন পর রাজ্যের গুপ্তচরেরা সমস্ত অবগত হইয়া সুন্দরকে বন্দী করিয়া রাজ সমীপে আনয়ন করিলে রাজার আদেশে সুন্দরকে বধ্যভূমিতে লওয়া হইল। সুন্দর দেবী অন্নপূর্ণার ভক্ত ছিল। সুন্দরের কাতর আহ্বানে দেবী কালীমূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। ভবানন্দ মজুমদার এই কাহিনী বলিয়া মানসিংহকে বলিলেন, দেবীর বরে অবশ্যই মানসিংহ যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিবেন। অতঃপর মানসিংহ অন্নপূর্ণার পূজা করিয়া ভবানন্দসহ যশোরে যাইয়া যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। ভবানন্দ দেবীর বরে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন।

রামপ্রসাদের 'কালিকামঙ্গলে' কেবলমাত্র বিদ্যা সুন্দরের গল্পটাই আছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' তদ্ব্যতীত আরও অনেক নতুন কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের ব্রতকথা ১৭৩৭ খৃঃ ও বিদ্যাসুন্দর ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ১৭৬০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্য।

জয়দেবের রাধাকৃষ্ণের লীলামূলক 'গীতগোবিন্দ' কাব্য অনুসরণ করিয়া যাঁহারা পদাবলী রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রধান। ইঁহারা উভয়েই সহজিয়া ভাবের সাধক ছিলেন। চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার অধিবাসী। উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন। চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে। তাহার পূর্ব্বেই যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা চৈতন্য চরিতামৃত হইতে জানিতে পারি—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে[১] মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা।)

১। শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, গীতগোবিন্দ, রায় রামানন্দের নাটক "জগন্নাথ বল্লভ" ও পদাবলী ও বিল্বমঙ্গল কৃত কর্ণামৃত গ্রন্থের রসাস্বাদন করিতেন।

বিদ্যাপতি মিথিলারাজ্যে শিবসিংহের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির কীর্ত্তনের ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হয়।

চৈতন্য দেবের পূর্ব্বে বাংলার কবিরা দেব দেবী মাহাত্ম্য, না হয় সামাজিক গল্পাদি লইয়া কাব্যরচনা করিতেন। কিন্তু চৈতন্য দেবের অপরূপজীবন বাংলার সাহিত্যে এক নূতন পথ খুলিয়া দিল। চৈতন্য দেবের জীবন কাহিনী ও তাঁহার লীলা সহচরদের জীবনী লইয়া বহু কাব্য রচিত হইতে লাগিল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত এই সমস্ত গ্রন্থের অগ্রদূত। বৃন্দাবন দাস ১৪২৯ শকে (১৫০৭খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চৈতন্যভাগবত সমাপ্ত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত ১৬১৫ খৃঃ বিরচিত হয়। চৈতন্য ভাগবতের পর লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গল লিখিত হয়। এতদ্ব্যতীত জয়ানন্দ ও চূড়ামণিদাস প্রভৃতিও চৈতন্যদেবের জীবনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃতে কেবল চৈতন্যের লীলাই বর্ণণা করা হয় নাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলিও নানা শাস্ত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জন্য ভক্ত ও পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ চৈতন্য চরিতামৃতকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন।

১৪৮৫ খৃঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র রূপে আবির্ভূত হন। তঁহার মাতা শচী দেবীও পরম ভক্তিমতী ছিলেন। চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। চৈতন্য অসাধারণ বুদ্ধিবলে অল্পবয়সেই ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই পারদর্শী হন। বিদ্যালাভ করিয়া একবিংশ বৎসর বয়সে তিনি একটি টোল খুলিয়া অধ্যাপনা সুরু করেন। অতঃপর লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার পিণ্ডদানের জন্য গয়ায় যান। তথায় বৈষ্ণব সাধু ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা লইয়া তাঁহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। অতঃপর মাতার আদেশে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার এই স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু বিবাহের পর তাঁহার উদাস ভাব বাড়িয়া গেল। পঞ্চবিংশবৎসর বয়সে একদা গভীর রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগ করতঃ কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা লইলেন। এইসময় তাঁহার নাম হইল শ্রীচৈতন্য। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল বিশ্বম্ভর। নিমবৃক্ষ তলে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার ডাকনাম হয় নিমাই এবং গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া

লোকে তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিত। সন্ন্যাসী হইবার পর বৃন্দাবনের পথে অবধূত নিত্যানন্দের সহিত চৈতন্য দেবের সাক্ষাৎ হয়। নিত্যানন্দ তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে লইয়া যান। তথায় শচীদেবীর সহিত ভক্তবৃন্দসহ তাঁহার সাক্ষাত হয়। অতঃপর নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্মবন্ধু সহ তিনি নীলাচলে (পুরীতে) গমন করেন। নীলাচলে উড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্র তাঁহার একজন ভক্ত হন। নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র রাজ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম একদা তাঁহার নিকট ভাগবতের—

"আত্মারামাশ্চ যুগয়ো নিগ্র'ন্থা অপ্যুরু ক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরি॥

এই শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। কিন্তু চৈতন্য দেব উক্ত শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করায় সার্ব্বভৌম চমৎকৃত হইয়া চৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর চৈতন্য নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিলেন। ইহার পর তিনি কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করেন। মধ্যে একবার তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। এইস্থানে আটচল্লিশবৎসর বয়সে তাঁহার তিরোধান হয়। নরপতি হোসেন সাহার মন্ত্রী সনাতন ও রূপ এই দুই ভ্রাতা রাজ কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহার আদেশে বৃন্দাবন যাইয়া তথায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। রূপ সনাতনের[১] ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী (জন্ম ১৪৯৮ খৃঃ) এবং গোদাবরী প্রদেশের (বিদ্যানগর) শাসন কর্ত্তা রায় রামানন্দ, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, যবন হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ পুরীতে চৈতন্যদেবের সহচর ছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনী সম্বন্ধে 'অদ্বৈত বাল্য লীলা সূত্রম' ও 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থ রচিত হয়।

এই সময়ের প্রধান সাহিত্য 'পদাবলী' নামে পরিচিত। ইহার শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা দ্বারা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদাবলী সাহিত্যের সূচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, ঘনশ্যামদাস, লোচন-

---

১। রূপগোস্বামী (১) ভক্তি রসামৃত সিন্ধু (২) ললিতমাধব (৩) বিদগ্ধমাধব (৪) বৃহৎ ভাগবৎ কথামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ও সনাতন গোস্বামী 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষিণী' রচনা করেন।

দাস, যদুনন্দনদাস, নরোত্তমদাস[১] বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা পদকর্ত্তার অসংখ্য পদাবলীর মধুর রসে বাঙলা দেশ প্লাবিত হইয়া গেল। রাধামোহন দাস প্রায় ৯০০ পদাবলী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদাস তাঁহার পদকল্পতরুতে প্রায় ৩৩০০ পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপর নিমানন্দ দাস তাঁহার পদরস সারে প্রায় ২৭০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। ভাবের মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই সকল গান সর্ব্বত্র আদরের জিনিষ।

এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত ভাষাতেও অনেক স্মৃতি, ন্যায়, ও তন্ত্র গ্রন্থ প্রভৃতি বাঙালীরা রচনা করেন। বৃহস্পতি রায়মুকুট অনেক সংস্কৃত কাব্যের টীকা ও একখানি স্মৃতি নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শ্রীকর অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন এবং বৃহস্পতির সহিত মিলিত হইয়া অমরকোষের একখানি টীকা লেখেন। শ্রীকরের পুত্র শ্রীনাথ একখানি স্মৃতি নিবন্ধ রচনা করিয়া নূতন করিয়া হিন্দু সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করেন। শ্রীনাথের শিষ্য রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব রচনা করিয়া সমাজ বাঁধিয়া দেন।

এই সময়ের বাঙালী নৈয়ায়িকগণের মধ্যে প্রথম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি অদ্বৈত মকরন্দের একখানি টীকা লেখেন। দ্বিতীয় রঘুনাথ শিরোমণি। তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধে চিন্তামণি দদিধতি প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়ে প্রাধান্য স্থাপন করেন। রঘুনাথের পর হরিরাম, জগদীশ, গদাধর, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ও বিশ্বনাথ ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

তান্ত্রিক লেখকদের মধ্যে একজন গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়। শঙ্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ব্ববঙ্গের বৌদ্ধদিগকে শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। ব্রহ্মানন্দের সংগ্রহ গ্রন্থে অক্ষোভ্য, তারা, বৈরোচণ প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের নাম পাওয়া যায়। রাঢ় দেশের আগমবাগীশেরও একখানি তান্ত্রিক সংগ্রহ গ্রন্থ আছে।

খৃঃ সপ্তদশ শতকে দৌলত কাজি নামক একজন মুসলমান কবি 'লোরচন্দ্রাবলী বা সতীময়না' নামক একখানি বাঙলা কাব্য রচনা করেন। কবি আলাওল নামক অন্য এক মুসলমান কবি 'পদ্মাবতী পাঁচালী' নামক অনুবাদ কাব্য, 'ছয়মূলমূলুক বদিয়জ্জমান', 'সপ্তপয়গম্বর' ও 'দারা সেকেন্দর' কাব্য রচনা করেন।

১। নরোত্তম দাসের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও 'স্বরূপকল্পতরু' প্রসিদ্ধ।

মধ্যযুগে চাটগাঁয়ের সৈয়দ সুলতান একখানি মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কাব্য, কবি মহম্মদ খাঁ হজরত মহম্মদের জীবনী অবলম্বনে 'মুক্তাল হোসেন' কাব্য ও কবি সবিবিদ খাঁ 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' রচনা করেন। উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুর জেলার সরকার ঘোড়াঘাট পরগণে বাগদুয়ার গ্রাম ঝাড় বিশিলার কাজি হায়াত মামুদ ১১৩০ বঙ্গাব্দে (১৭২৫ খৃঃ) কারবালার করুণ কাহিনী অবলম্বনে 'জঙ্গনামা কাব্য, ১৭৫৫ খৃঃ (১১৬০ বঙ্গাব্দে) 'হিতজ্ঞান বাণী' নামে কাব্য ও 'আম্বিয়াবাণী' নামে কাব্য রচনা করেন।

এই সময়ে ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃঃ) দেবীবর ঘটক এক রকম দোষযুক্ত রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণকে লইয়া এক একটি মেল বা দলের সৃষ্টি করেন। এইরূপে ৩৬টি মেলের উৎপত্তি হয়। দেবীবর রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণের অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ ও বাঙ্গালপাশী গ্রাম নিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধীধারী সর্ব্বানন্দ ঘটকের পুত্র ছিলেন বলিয়া কথিত হন। তিনি 'মেলবিধি' নামক কুলজি গ্রন্থের রচয়িতা।

এই সময়ে উদয়ণাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলীনগণ মধ্যে 'পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা' স্থাপন করেন। 'বারেন্দ্র জটিব্যাখ্যা' নামক কুলজি গ্রন্থে লিখিত আছে— "এই সকল ব্যাপার করিয়া বল্লাল সেনের স্বর্গারোহণ। কিন্তু কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়তে লন। শ্রোত্রিয়ের কন্যা কুলীনে লন। তার কিছু বিশেষ্য বিশেষণ করিলেন না। কিছুকাল পর জন্মিলেন উদয়ণাচার্য্য ভাদুড়ী। বাঙলাদেশ বৌদ্ধাক্রান্ত ছিল। তিনি বৌদ্ধ নিগ্রহ করেন, কুলীনগণমধ্যে পরিবর্ত্তমর্যাদা করেন।"

এই সময়ে (১৬৮৩ খৃঃ) বাণেশ্বরদেব 'বারেন্দ্র কায়স্থ কুলপঞ্জী' রচনা করেন ও ইহার প্রায় শত বর্ষ পরে যদু নন্দন দাসের 'বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুরী' প্রণীত হয়। ১৬৭৫ খৃঃ রচিত ভারত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' নামক বৌদ্ধ জাতির একখানি কুলপঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ১৬৫৩ খৃঃ কবিকণ্ঠহার 'সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকা' রচনা করিয়াছিলেন। উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের অনেকগুলি কুলজি এই সময় রচিত হইয়াছিল।

এই সময়ে অনেকগুলি পল্লীগীতিকা রচিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিনখণ্ড পল্লীগীতিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রথম খণ্ডের নাম 'দেওয়ানা মদিনা'। জালালগায়েন নামক এক ব্যক্তি ভাটিয়ালী সুরে এই গানটি গাহিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত। দ্বিতীয় খণ্ড জামতালি বয়তি রচিত 'মানিকতারা বা ডাকাতের পালা'। তৃতীয় খণ্ডের নাম 'মজুর মার পালা'। উত্তর বঙ্গে বগুড়া জেলায় 'যোগীকাছ' নামক পল্লীগীতি প্রচলিত ছিল।

কোম্পানীর আমল (১৭৬৫-১৮৬৮ খৃঃ)

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুবে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫ খৃঃ)।

মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নজমউ-দ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানীর অনুমোদন ক্রমে মুর্শিদাবাদে নবাব নাজিম হইলেন। ১৭৬৫। ২০ ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয়। এই সন্ধি সূত্রে নবাব আত্মরক্ষার জন্য কোম্পানীর সৈন্যদলের উপর নির্ভরশীল হন, বাংলার রাজস্ব আদায়ের ভার ঢাকার ফৌজদার মহম্মদ রেজাখাঁর উপর ও বিহারের আদায়ের ভার বিহারী কায়স্থ সেতাব রায়ের উপর অর্পিত হয়। স্থির হয় কোম্পানীর বিনানুমতিতে নবাব তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। এই বন্দোবস্তের ফলে সামরিক ও শাসন ও রাজস্ব বিভাগের ক্ষমতা কার্য্যতঃ কোম্পানীর হস্তগত হইল। নবাব কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইয়া রহিলেন। ৫৩৮৬১৩১ ।।/০ আনা তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি স্থির হইল। এই ব্যবস্থা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। সমস্ত রাজ কার্য্যের জন্য রেজাখাঁর সহিত রাজা দুর্লভরাম ও জগৎ শেঠ খোসাল চাঁদকে[১] লইয়া একটি মন্ত্রীসভা গঠিত ও সাইক্স সাহেবকে মুর্শিদাবাদে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া দিয়া ১৭৬৫ খৃঃ জুন মাসে সম্রাট দ্বিতীয় সাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব

১। ক্লাইবের কলিকাতা প্রত্যাগমনের পরেই জগৎশেঠ খোসাল চাঁদ মীর কাশেমের হস্তে পিতা জগৎশেঠ মহারাজ চাঁদ ও খুল্লতাত মহারাজ স্বরূপ চাঁদের নিধন ব্যাপারে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেক চাঁদ ও উদয় চাঁদকে সুজাউদ্দৌলার হস্ত হইতে উদ্ধার করার ব্যয়ে শেঠ পরিবার বিপন্ন, এ কথা তাঁহাকে জানাইলে ক্লাইব পরিবারকে ২১ লক্ষ টাকা সাহায্য এইরূপভাবে দেওয়া স্থির করেন যে অর্দ্ধেক কোম্পানী ও অর্দ্ধেক নবাব দিবেন (Long's Selections No. 447)।

পরবর্ত্তী দুই পুরুষে শেঠ পরিবারের আরও অবনতি ঘটে। মহিমাপুরের শেঠ ভবন এক্ষণে ভাগীরথীর গর্ভে। শুনাযায় খোসাল চাঁদের একটি গোপন রত্নকুঠি ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ মারা যাওয়ায় সেই রত্ন কুঠির সন্ধান পরবর্ত্তী জগৎশেঠ হরেক চাঁদ ও ইন্দ্র চাঁদ জানিতে পারেন নাই।

সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি করিবার জন্য গভর্ণর ক্লাইব এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে (১৭৬৫। মে) ইংরেজ সেনাপতি কার্ণাক এলাহাবাদের নিকটে কোড়ার যুদ্ধে হোলকারের মারাঠা দলের সহিত মিলিত সুজাউদ্দৌলার সেনাদলকে পরাজিত করায় মারাঠা দল সম্রাট দ্বিতীয় সাহ আলমকে সুজাউদ্দৌলা ও ইংরেজের আশ্রয়ে রাখিয়া পলায়ন করে ও সুজাউদ্দৌলা ইংরেজের নিকট সন্ধি প্রার্থী হন। ক্লাইবের আগমন সাপেক্ষে সন্ধি স্থগিত ছিল। ক্লাইব আসিয়াই সন্ধি নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিলেন। সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে সুজা নগদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদ ও কোড়া প্রদেশ কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করিবেন; কাশী রাজ বলবন্ত সিংহের রাজ্য বহাল থাকিবে; রাজা দুর্লভরামের মধ্যস্থতায় কোম্পানী এলাহাবাদ ও কোড়া বাদসাহ সাহ আলমকে দেওয়ায় ও বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকার করায় বাদসাহ কোম্পানীকে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করিলেন (১৭৬৫। জুন); ইংরেজ ও সুজা পরস্পরের শত্রুর বিরুদ্ধে সহায়তা করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন। এই সন্ধির ফলে প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যা ও কাশীরাজ্য ইংরেজের প্রভাবাধীন হইল ও বাদসাহ সাহ আলম কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইলেন। এইরূপে দেওয়ানী লাভের পর বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজস্বভাণ্ডার ইংরেজ কোম্পানীর হাতে আসিয়া পড়ায় প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার আসল চাবিকাঠি তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িল।

১৭৬৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে প্রচলিত প্রথানুসারে মুর্শিদাবাদ দরবারে পুণ্যাহের বৈঠক বসিল। নজম-উ-দ্দৌলা মসনদে বসিলেন। দক্ষিণে দেওয়ান কোম্পানী পক্ষে গভর্ণর ক্লাইব আসন গ্রহণ করিলেন। ইহা কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ। মহাসমারোহে পুণ্যাহ ও খেলাৎ বিতরণ সুসম্পন্ন হইল। মে মাসে নজম-উ-দ্দৌলা বিষম জ্বরে পরলোকগত হইলে তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয় সহোদর সইফ-উ-দ্দৌলা নবাব নাজিম হইলেন। মাতা মণিবেগমের হস্তে কর্ত্তৃত্ব পড়িল। এবার নবাবের বৃত্তি কমিয়া ৪১৮৬১৩১।৶০ আনা হইল। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে নানাবিধ পরিবর্ত্তন ও কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও সৈন্য দলের মধ্যে সংস্কার সাধন করিয়া ১৭৬৭ খৃঃ জুন মাসে ক্লাইব পুনরায় স্বদেশ ফিরিয়া গেলেন। সাতবৎসর পর খবর পাওয়া গেল ১৭৭৪ খৃঃ ২২ নবেম্বর তিনি স্বহস্তে ক্ষুর দিয়া গলা কাটিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ক্লাইবের পর ভেরেলেষ্ট (১৭৬৭-৬৯ খৃঃ) ও কার্টিয়ার (১৭৬৯-৭২ খৃঃ) যথাক্রমে কোম্পানীর গভর্ণর হন। তাঁহাদের সময়ে ক্লাইবের প্রবর্ত্তিত

দ্বৈতশাসন তন্ত্রের ফলে বাংলায় এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খৃঃ) এই দুর্ভিক্ষ হওয়ায় ইহাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়। রেজাখাঁ মীরকাশেমের অপেক্ষাও কঠোরতর ভাবে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। ১৭৬৯ খৃঃ ভালরূপ বৃষ্টি হইল না তজ্জন্য শস্য কম হওয়া সত্বেও সরকারী আদায় কম হইল না। বর্ষশেষে দেশে দারুণ খাদ্যাভাবে হাহাকার উঠিল। ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাংলার প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারাইল। কৃষক অভাবে বহু শস্য ক্ষেত্র জঙ্গলে পরিণত হইল।

১৭৭২ খৃঃ কার্টিয়ারের অবসর গ্রহণের পর ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানীর গভর্ণর হইলেন (১৭৭২-৭৩ খৃঃ)। ১৭৩২ খৃঃ তাঁহার জন্ম হয়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনিও ক্লাইবের ন্যায় কোম্পানীর কেরানী হইয়া এদেশে আসিয়া যোগ্যতার বলে ১৭৬২ খৃঃ কলিকাতা কাউন্সিলের ও ১৭৬৯ খৃঃ মাদ্রাস কাউন্সিলের সভ্য হইয়াছিলেন। ১৭৭৩ খৃঃ পার্লামেণ্টে রেগুলেটিং আইন (Regulating Act) বিধিবদ্ধ করিয়া স-কাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল নিয়োগের ব্যবস্থা করায় হেষ্টিংস বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন ও ক্লেভারিং, মনসন, ফ্রান্সিস ও বারওয়েল এই চারিজনকে লইয়া তাঁহার কাউন্সিল গঠিত হইল। রেগুলেটিং আইনের বিধানমত গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি ব্যতীত কোম্পানীর মাদ্রাস ও বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের কোন ভারতীয় রাজ্য আক্রমণ করিবার অধিকার থাকিল না।

১। ওয়ারেন হেষ্টিংস—গভর্ণর জেনারেল (১৭৭৪-৮৬ খৃঃ)। গভর্ণর জেনারেল হইবার পরেই হেষ্টিংস তাঁহার কাউন্সিলের মতানুসারে দ্বৈত শাসন তন্ত্র[১] রহিত করিয়া বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসন ও রাজস্ব আদায়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। রেজাখাঁ ও সেতাব রায় পদচ্যুত হইলেন। কালেক্টর নামক ইংরাজ কর্মচারীদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হইল। রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য কলিকাতায় 'রেভিনিউ বোর্ড' নামক

১। মুঘল শাসনকালে প্রত্যেক সুবা দুই জন প্রধান কর্মচারীর অধীনে ছিল। সুবাদার বা নবাব নাজিম সৈন্য দলের অধ্যক্ষ, দেশের শাসক ও ফৌজদারী বিচার বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। দেওয়ান রাজস্ব বিভাগের দেওয়ানী বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। সুবাদার ও দেওয়ান উভয়েই বাদসাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন ও বাদসাহের নিকট দায়ী ছিলেন।

একটি সমিতি স্থাপিত হইল। রাজ কোষ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইল, বৃত্তিভোগী নবাবের বৃত্তি কমাইয়া দেওয়া হইল[১] রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য জমিদারদের সহিত পাঁচশালা বন্দোবস্ত করা হইল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত স্থাপিত হইয়াছিল; ১৭৭৪ খৃঃ সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল। কলিকাতা সুবে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানীতে পরিণত হইল। হেষ্টিংস কার্য্যভার গ্রহণের কিছুপূর্ব্বে বাদসাহ সাহ আলম ইংরেজের আশ্রয় ত্যাগ

১। রাজস্ব (খালসা) বিভাগ কলিকাতায় আনিয়া খাস গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের অধীনে পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য একজন রায়রায়ান্ নিযুক্ত হইল। রাজা দুর্লভরামের পুত্র রাজা রাজবল্লভ প্রথম রায়রায়ান্ হইলেন। মন্বন্তরের বর্ষে বসন্তরোগে নবাব নাজিম সইফ-উ-দ্দৌলাব মৃত্যু হয়। অতঃপর মীরজাফরেব চতুর্থ পুত্র বব্বু বেগমের গর্ভজাত দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক মোবারক-উ-দ্দৌলা নবাব নাজিম হন। ১৭৭১ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট দেওয়ানী কার্য্যভার কোম্পানী স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৭৭২ খৃঃ জানুয়ারী হইতে নবাবের বৃত্তি কমাইয়া ষোল লক্ষ টাকা করা হয়।

মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্ক গুরুদাস "রাজা গৌরপৎ" উপাধিসহ নবাবের দেওয়ান ও হিসাব রক্ষক এবং নবাবের বিমাতা অতুল ধনের অধিকারিণী মণিবেগম তাঁহার অভিভাবিকা হইলেন। মণিবেগম ও বব্বু বেগম এই দুই রূপবতী নর্ত্তকী সিরাজের বিবাহের সময় নর্ত্তকী রূপে মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরের বেগম মহলে স্থান লাভ করিয়াছিল। পরে বুদ্ধিমত্তায় মণিবেগম তাঁহার প্রধানা বেগম ও গুপ্তধনের অধিকারিণী হন।

১৭৯৬ খৃঃ নবাব নাজিম মোবারক-উ-দ্দৌলার মৃত্যুর পর যথাক্রমে বাবর জঙ্গ আলিজা, ওয়ালীজা, হুমায়ুনজা নবাব নাজিম হইয়াছিলেন। হুমায়ুনজার সময় মুর্শিদাবাদে বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ নবাবী প্রাসাদ হাজার দুয়ারী সতের লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ার ম্যাকলাউডের তত্ত্বাবধানে দেশীয় রাজমিস্ত্রী দ্বারা নির্ম্মিত হয় (১৮৩৭ খৃঃ)। ১৮৩৮ খৃঃ মনসুর আলি নবাব নাজিম হন। ইহার পর ষ্টেট সেক্রেটারীর আদেশে নাজিমী পদ উঠিয়া যায়। এই বংশে কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠানুক্রমে নবাবী উপাধিসহ নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ও জমিদারী বহাল থাকে। মনসুর আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব সৈয়দ হোসেন ও তৎপুত্র নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জা, ক্রমে নবাব হন।

করিয়া মারাঠাদের সাহায্যে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজস্ব সৈন্য বা অর্থবল না থাকায় তিনি মারাঠা শক্তির আশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং সাহ আলমকে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর পরিবর্ত্তে বার্ষিক যে ২৬ লক্ষ টাকা কর দিবার কথা ছিল, হেষ্টিংস তাহা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কোড়া ও এলাহাবাদ জেলা ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সুজাউদ্দৌলাকে দেওয়া হইল। সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যায় একদল বৃটিশ সৈন্য রাখিবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হইলেন। এইরূপে অযোধ্যা রাজ্য ইংরেজের মিত্র রাজ্যে পরিণত হইল। অযোধ্যার সীমান্তে অবস্থিত রোহিলাখণ্ডে মারহাট্টাগণ[১] পুনঃপুনঃ অনুপ্রবেশ করায় নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের সামরিক শক্তির সাহায্যে রোহিলা খণ্ড অধিকার করিয়া লইলেন। এই ঘটনা রোহিলাযুদ্ধ নামে পরিচিত।

রেগুলেটিং এক্ট অনুসারে ১৭৭৪ খৃঃ যে চারিজন সদস্য লইয়া হেষ্টিংসের কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল, সেই কাউন্সিলে বারওয়েল ব্যতীত আর কোন সদস্যই হেষ্টিংসের স্বপক্ষে ছিলেন না। অথচ আইন অনুসারে হেষ্টিংসকে অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে কার্য্য করিতে হইত। সুতরাং হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধবাদী তিনজন সদস্যের মতেই প্রকৃত শাসন কার্য্য চলিতে লাগিল। ১৭৭৬ খৃঃ মনসনের মৃত্যু হইলে, গভর্ণর জেনারেলের একটি অতিরিক্ত ভোট (casting vote) থাকায় হেষ্টিংসের পক্ষই প্রবল হইল। ১৭৭৭ খৃঃ ক্লেভারিংও পরলোকগত হইলেন এবং ১৭৮০ খৃঃ হেষ্টিংসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে

(১) পেশোয়া বংশ (১৭১৪-১৮১৮ খৃঃ)।

১। বালাজি বিশ্বনাথ (১৭১৪-২০ খৃঃ), ২। তৎপুত্র প্রথম বাজীরাও (১৭২০-৪০ খৃঃ), ৩। তৎপুত্র বালাজি বাজী রাও (১৭৪০-৬১ খৃঃ), ৪। তৎপুত্র প্রথম মাধব রাও (১৭৬১-৭২ খৃঃ), ৫। তৎভ্রাতা নারায়ণ রাও (১৭৭২-৭৩ খৃঃ), ৬। তৎখুল্লতাত রঘুনাথ রাও (১৭৭৩-৭৪ খৃঃ), ৭। নারায়ণ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় মাধব রাও (১৭৭৪-৯৬ খৃঃ), ৮। রঘুনাথ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় বাজী রাও ১৭৯৬-১৮১৮ খৃঃ)।

শিবাজী ও তাঁহার বংশধরগণ—১। শিবাজী (১৬৩০-১৬৮০ খৃঃ), ২। পুত্র শম্ভুজী (১৬৮০-৮৯ খৃঃ), ৩। পুত্র রাজারাম (১৬৮৯-১৭০০ খৃঃ), পুত্র শিবাজী তৃতীয় (১৭০০-১৭১২ খৃঃ) (কোহ্লাপুর), শম্ভুজীর অপর পুত্র শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) (সাতারায় ১৭০৮-০৯ খৃঃ)।

আহত হইয়া ফ্রান্সিসও ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন[১]। ইতিমধ্যে ১৭৭৫ খৃঃ মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মণিবেগমের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ এবং হেষ্টিংসও নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই দুইটি অভিযোগের বিচার না হইতেই, মোহন প্রসাদ নামক একব্যক্তি নন্দকুমারকে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হেষ্টিংসের বাল্যবন্ধু স্যার ইলাইজা ইম্পের বিচারে নন্দকুমার অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় ইংলণ্ডের তৎকালীন আইন অনুসারে তাঁহার ফাঁসী হয়।

হেষ্টিংস প্রথম মারহাট্টা যুদ্ধে (১৭৭২-৮২ খৃঃ) ও দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে (১৭৮০-৮৪ খৃঃ) লিপ্ত হইয়াছিলেন[২]। কাশীর রাজা চৈৎ সিংহ কোম্পানীর

১। সেকালে স্বাস্থ্যের জন্য ফ্রান্সিস প্রভৃতি অনেক ইংরাজের ন্যায় ওলন্দাজদের বাণিজ্যকেন্দ্র চুঁচুড়ায় হেষ্টিংসও আসিতেন। এইখানে তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী ম্যারিয়ানও আসিতেন। কারণ এখানকার ডাচ গভর্ণর রস ছিলেন তাঁহার বন্ধু। ম্যারিয়ান ছিলেন একজন জার্ম্মান ব্যারনের স্ত্রী। ১৭৬৯ খৃঃ তাঁহারা জীবিকার জন্য জাহাজে ভারতে আসিতেছিলেন। ঐ জাহাজে বিপত্নীক হেষ্টিংসের সহিত পরিচিত হইয়া ম্যারিয়ান মুগ্ধ হন। ম্যারিয়ানের স্বামী ব্যারন হইলেও একজন গরীব চিকিৎসক ছিলেন। ম্যারিয়ান তাঁহার নিকট ডাইভোর্স লইয়া হেষ্টিংসকে বিবাহ করেন। এই ম্যারিয়ানকে লইয়াই হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ (duel) হয় (১৭৮০ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট)। এই সময় হেষ্টিংস আলিপুরের বেলভেডিয়র প্রাসাদে বাস করিতেন।

২। ১৭৭২ খৃঃ পেশোয়া মাধব রাও (১ম) পরলোকগত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও (১৭৭২-৭৩ খৃঃ) পেশোয়া হন। তিনি নিজ খুল্লতাত রঘুনাথ রাও-এর ষড়যন্ত্রে নিহত হন ও রঘুনাথ রাও পেশোয়া হন (১৭৭৩-৭৪ খৃঃ)। কিন্তু ১৭৭৪ খৃঃ নারায়ণ রাও-এর বিধবা পত্নী এক পুত্র সন্তান প্রসব করায়, বালাজি জনার্দ্দন (নানা ফড়নবিস) প্রভৃতি প্রধানগণ রঘুনাথ রাওকে সরাইয়া দিয়া এই নবজাত শিশুকে মাধব রাও (২য়) নাম দিয়া পেশোয়া পদে স্থাপিত করেন। পেশোয়া ২য় মাধব রাও-এর শাসন কালে (১৭৭৪-৯৬ খৃঃ) নানাফড়নবিসই মারহাট্টা রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন।

রঘুনাথ রাও বোম্বাইএর ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ও স্বীকার করিলেন যে ইংরেজরা যদি তাঁহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন তাহা হইলে

অধীনে করদ রাজ্য ছিলেন। ১৭৮১ খৃঃ হেষ্টিংস চৈৎসিংহকে একদল অশ্বারোহী সৈন্য সরবরাহ করিতে বলেন। চৈৎসিংহ আদেশ পালনে বিলম্ব করায় হেষ্টিংস

তিনি বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী সালসেটি ও বেসিন নামক স্থানদ্বয় ইংরেজদিগকে প্রদান করিবেন। রাজ্য লোভে বোম্বাই-এর ইংরাজগণ ঐরূপ সর্ত্তে রঘুনাথের সহিত সুরাটে এক সন্ধি করিলেন। (১৭৭৫ খৃঃ)। কিন্তু হেষ্টিংস ঐ সন্ধি বাতিল করিয়া দিলেন। পরে ১৭৭৬ খৃঃ মারহাট্টা দরবারের সহিত পুরন্দরের সন্ধি দ্বারা হেষ্টিংস রঘুনাথকে ত্যাগ করিয়া সালসেটি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের ডিরেক্টরগণ পুরন্দরের সন্ধি বাতিল করিয়া সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করায় তাহাদের সহিত মারহাট্টাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কয়েকটি যুদ্ধে মারহাট্টাদের পক্ষ এবং কয়েকটি যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ জয়লাভ করে। শেষে ১৭৮২ খৃঃ মহদাজি সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সালবাই-এর সন্ধি দ্বারা যুদ্ধ শেষ হয়। ইংরেজেরা সালসেটি লাভ করিয়া রঘুনাথের পক্ষ ত্যাগ করেন ও দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করেন।

মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত মালাবার উপকূলের মাহে বন্দরে ফরাসীদের একটি কুঠী ছিল। মহীশূরের হিন্দু রাজা চিক্ক কৃষ্ণকে তাঁহার মুসলমান সেনাপতি হায়দর আলি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করিয়া মহীশূর রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (১৭৬৪ খৃঃ)। ইংরেজ সেনাপতি স্যার আয়ার কুট মাহে অধিকার করায় হায়দরের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হয় (১৭৭৯ খৃঃ) ১৭৮০ খৃঃ হায়দর কাঞ্চির নিকট কর্ণেল বেইলীর সেনাদলকে পরাজিত করেন। কিন্তু ১৭৮১ খৃঃ হায়দর আলি পোর্ট নভোর যুদ্ধে স্যার আয়ার কুটের নিকটে স্বয়ং পরাজিত হন। ১৭৮২ খৃঃ হায়দরের পুত্র টিপু সুলতান তাঞ্জোরের নিকট কর্ণেল ব্রেথওয়েটকে পরাজিত করেন। এই সময় হায়দরের মৃত্যু হওয়ায় (১৭৮২ খৃঃ) পশ্চিম উপকূলের সন্ধি দ্বারা প্রথম মহীশূর যুদ্ধ শেষ হয়। উভয় পক্ষ পরস্পর বিজিত রাজ্য ফিরাইয়া দেয়।

এইরূপে ভারতবর্ষে যখন ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তার চলিতেছিল সেই সময় ১৭৮৩ খৃঃ আমেরিকা (ইউনাইটেড ষ্টেটস্) ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ইহার পাঁচ বৎসর পর ১৭৮৯ খৃঃ ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে পুরোহিত ও সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ, মানবাধিকার স্বীকৃত ও সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জয় ঘোষিত হয়। অতঃপর পৃথিবীতে গণজাগরণের সূত্রপাত হয়।

তাঁহার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। এই টাকা আদায়ের জন্য স্বয়ং হেষ্টিংস সসৈন্যে কাশীতে উপস্থিত হইয়া চৈৎসিংহকে বন্দী করেন এবং কাশীরাজ্যে চৈৎসিংহের এক আত্মীয়কে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তৎপুত্র নবাব আসফ-উ-দ্দৌলা কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় হেষ্টিংস অযোধ্যার রাজধানী ফয়জাবাদে একদল সৈন্য পাঠাইয়া নবাব আসফ-উ-দ্দৌলার মাতা ও পিতামহীর সঞ্চিত অর্থ হইতে ঐ প্রাপ্য টাকা আদায় করিলেন। ১৭৮৫ খৃঃ হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। তথায় বার্ক ফক্স প্রভৃতি কমন্স সভার সভ্যগণ কমন্স সভার পক্ষে লর্ড সভায় তাঁহার বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ আনয়ন করেন। ১৭৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত তাঁহার বিচার চলে। অবশেষে বিচারে মুক্তিলাভ করিয়া ১৮১৮ খৃঃ তিনি পরলোক গমন করেন। হেষ্টিংসের কার্য্যকালে ১৭৮১ খৃঃ কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তাঁহার পদত্যাগের পর কোম্পানীর কাউন্সিলের প্রবীণতম সদস্য স্যার জন ম্যাকফারসন্ প্রায় দেড় বৎসর কাল (১৭৮৫-৮৬ খৃঃ) অস্থায়ীভাবে গভর্ণর জেনারেলের কার্য্য করেন।

২। লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খৃঃ)।

অতঃপর লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্ণর জেনারেল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। তিনি একাধারে গভর্ণর জেনারেল ও সেনাপতি ছিলেন এবং কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছামত কার্য্য করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকা স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি ইংলণ্ডের পক্ষে সৈন্য পরিচালনা করিয়া যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০-৯৩ খৃঃ) ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা।

১৭৯০ খৃঃ মহীশূরের টিপু সুলতান ইংরেজে আশ্রিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করায় কর্ণওয়ালিস টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে স্বয়ং কর্ণওয়ালিস যুদ্ধ পরিচালনা করেন। পেশোয়া ও নিজাম এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে যোগদান করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সমবেত বাহিনী টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধিসূত্রে টিপু অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন ও তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ইংরেজদিগকে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই টাকার প্রতিভূ স্বরূপ টিপুর দুই পুত্রকে ইংরেজ শিবিরে বাস করিতে হইল। টিপুর নিকট প্রাপ্ত রাজ্যখণ্ড ইংরেজ, নিজাম ও পেশোয়া ভাগ করিয়া লইলেন। মালাবার, কুর্গ ও মাদ্রাজের অন্তর্গত মাদুরা ও সালেম

জেলার কিয়দংশ ইংরেজ অধিকারভুক্ত হইল।

ইংলণ্ডে জমিদারেরাই জমির মালিক। লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজে একজন জমিদার ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের প্রথানুযায়ী এদেশেও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী জমিদারি প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহাতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার জমিদারগণ প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট কিস্তিতে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিবার সর্ত্তে বংশানুক্রমিক জমিদারী ও জমির মালিক হইলেন। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি নিয়ম হইল নির্দ্দিষ্ট কিস্তিতে রাজস্ব না দিলে জমিদারী নিলামে বিক্রয় হইয়া যাইবে। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নির্দ্দিষ্ট তারিখে নির্দ্দিষ্ট রাজস্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোম্পানী নিশ্চিন্ত হইল। পরে বারাণসীতেও ঐ নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। অতঃপর শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য কর্ণওয়ালিস নিজ অধীনস্থ রাজ্যকে চারিটি বিভাগে ও বিভাগগুলিকে কতকগুলি জেলায় বিভক্ত করিলেন এবং প্রত্যেক জেলায় একজন ইংরেজ জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট ও একজন ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যেক বিভাগে একটি করিয়া বিভাগীয় আদালত স্থাপন করিয়া প্রত্যেকটি বিভাগীয় আদালতে তিনজন করিয়া ইংরেজ জজ নিযুক্ত করিলেন। নিয়ম হইল যে তাঁহারা বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফৌজদারী মোকর্দ্দমার বিচার করিবেন। কর্ণওয়ালিস 'কর্ণওয়ালিশ কোড' নামে একখানি আইন গ্রন্থও সংকলন করিয়াছিলেন। তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের অবৈধ উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ক্লাইব হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ণওয়ালিশ ও তাঁহার পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারেলগণ সকলেই অল্পবিস্তর রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

৩। স্যার জন সোর (১৭৯৩-৯৮ খৃঃ)।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে স্যার জন সোর গভর্ণর জেনারল হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। এই সময় কোম্পানী পার্লিয়ামেণ্টের নিকট হইতে পুনরায় বিশ বৎসরের জন্য সনন্দ (Charter) লাভ করিল।

এইসময় কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্য অযোধ্যার নবাব আসফ-উ-দ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী মীর্জ্জাআলির দাবী উপেক্ষা করিয়া তাঁহার ভ্রাতা সাদত আলিকে স্যার জন সোর অযোধ্যার নবাব করিলেন ও প্রতিদানে সাদত আলি কোম্পানীকে এলাহাবাদ প্রদেশ প্রদান করিলেন (১৭৯৭ খৃঃ)।

১৭৯৬ খৃঃ পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে রঘুনাথ রাওএর পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া হইলেন। পেশোয়াগণ মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্ব্বসম্মত নায়ক হইলেও মারাঠা সামন্তগণ ক্রমশ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে ছিলেন। নাগপুরের (বেরার) ভোঁসলা, বরদার গায়কবাড়, ইন্দোরের হোলকার ও গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়াবংশ প্রবল হইয়াছিল। ইন্দোরের মলহর রাও হোলকারের বিধবা পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই এই সময় ইন্দোররাজ্য শাসন করিতেছিলেন। মহদাজি সিন্ধিয়া ইউরোপীয় প্রণালীতে বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করিয়া তাহার সাহায্যে মধ্যভারতেও রাজপুতনায় নিজের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া বাদসাহ দ্বিতীয় সাহ আলমের (১৭৫৯-১৮০৬ খৃঃ) আশ্রয়দাতা হইয়া ছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মহদাজির মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তক পুত্র দৌলত রাও সিন্ধিয়া তাঁহার বিশালরাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী খুর্দ্দার যুদ্ধে নিজামকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। পরাজিত নিজাম তাঁহার রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ মারাঠাগণকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের বিধানমত এই যুদ্ধে স্যার জন সোর ঔদাসীন্য নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

৪। লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খৃঃ)।

স্যার জন সোরের পর লর্ড মর্ণিংটন (পরে মার্কুইস অব ওয়েলেসলি) কোম্পানীর ভারতীয় রাজ্যের গভর্ণর জেনারল হন (১৭৯৮ খৃঃ)।

ইনি পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের ঔদাসীন্য নীতির পরিবর্তে অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি প্রবর্ত্তন করিলেন। এই নীতি অনুসারে যে কোন ভারতীয় নৃপতি কোম্পানীর সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে তাঁহার রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ হইতে রক্ষা করিবার ভার কোম্পানী গ্রহণ করিত, তৎপরিবর্ত্তে ঐ নৃপতিকে কোম্পানীর একদল সৈন্যকে নিজ ব্যয়ে নিজ রাজ্যে পোষণ করিতে হইত; কোম্পানীর অনুমতি ব্যতীত তিনি অন্য কোন ভারতীয় কিম্বা বিদেশী শক্তির সহিত কোন সন্ধি বিগ্রহে লিপ্ত হইতে কি কোন ইউরোপীয়কে নিজরাজ্যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিতেন না; তাঁহাকে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখিতে ও ঐ রেসিডেন্টের পরামর্শ অনুসারে চলিতে হইত; এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য বিষয়ে ও নিজরাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে স্বাধীন থাকিতেন।

১৭৯৯ খৃঃ সুরাটের নবাব ও তাঞ্জোরের মারাঠারাজাকে[১] বৃত্তি দিয়া তাঁহাদের রাজ্য কোম্পানীর শাসনাধীন করা হইল। দুর্ব্বল নিজাম সর্ব্ব প্রথম অধীনতামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ হইলেন। মহীশূরের টিপু সুলতান অধীনতা মৈত্রী স্বীকারে সম্মত না হওয়ায় ইংরেজ সৈন্য মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রবেশ করে। টিপু সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণদান করেন। তাঁহার রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পশ্চিম উপকূলের জেলাগুলি কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত, হায়দারবাদের নিকটবর্ত্তী জেলাগুলি নিজামের রাজ্যভুক্ত ও অবশিষ্ট অংশে পূর্ব্বতন হিন্দুরাজ বংশের কৃষ্ণরাজকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৮০১ খৃঃ কর্ণাটকের নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার রাজ্য কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করা হয়। কুশাসনের অভিযোগে অযোধ্যার নবাব সাদত আলির রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ (গঙ্গা যমুনা দোয়াব, গোরক্ষপুর জেলা ও রোহিলাখণ্ড) কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করা হয়।

১৮০২ খৃঃ যশোবন্ত রাও হোলকার পুণার যুদ্ধে পেশোয়া বাজীরাও (২য়) ও দৌলতরাও সিন্ধিয়ার মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়া পুণা অধিকার করিলেন, পেশোয়া বাজীরাও প্রাণভয়ে পুণা ত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ের নিকবর্ত্তী বেসিনে যাইয়া ইংরেজের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন। ইংরেজ সৈন্য পুণায় যাইয়া বাজীরাওকে পুনরায় পেশোয়া পদে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৮০৩ খৃঃ দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময় বড় লাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেসলি দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে পরাজিত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সম্মিলিত বাহিনী আসাইএর যুদ্ধে আর্থার ওয়েলেসলির নিকট পরাজিত হইল (১৮০৩ খৃঃ)। অল্পদিন পর আরগাঁওএর যুদ্ধে ভোঁসলা পুনরায় ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইলেন (১৮০৩ খৃঃ)। অন্যদিকে উত্তরভারতে লর্ড লেকের সৈন্যদল দিল্লী ও লাসোয়ারীর যুদ্ধে সিন্ধিয়ার সৈন্যদল বিধ্বস্ত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইল (১৮০৩ খৃঃ)।

বারংবার পরাজিত হইয়া ভোঁসলা ও সিন্ধিয়া অবশেষে কোম্পানীর সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হইলেন (১৮০৩ খৃঃ)। দেওগাঁর নিকট সন্ধিদ্বারা ভোঁসলা কটক প্রদেশ ও সুরজি, অঞ্জন গাঁয়ের সন্ধিদ্বারা সিন্ধিয়া গঙ্গা-যমুনা

১। তাঞ্জোর রাজ্য শিবাজীর খুল্লতাতের বংশধরদের শাসনাধীনে ছিল।

দোয়াবে কোম্পানীর আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইলেন। এই অবস্থায় সম্রাট সাহ আলম সিন্ধিয়ার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন ও কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইয়া রহিলেন। নিজাম ইংরেজ দিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এজন্য ভোঁসলার বেরার ও আহম্মদনগর তাঁহাকে দেওয়া হইল।

অতঃপর যশোবন্ত রাও হোলকার একাকী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮০১ খঃ যদিও তিনি ইংরেজ সেনাপতি মনসনকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই দীগের যুদ্ধে স্বয়ং পরাজিত হইয়া রাজপুতানা হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্জাবে আশ্রয় লইলেন। ১৮০৫ খঃ লর্ড ওয়েলেসলি পদত্যাগ করিলে অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল স্যার জর্জ বার্লোর সহিত হোলকার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার রাজ্য বহাল থাকে।

ভরতপুরের জাঠরাজা যুদ্ধকালে হোলকারের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজ সেনাপতি লর্ড-লেক এই সময় ভরতপুর দুর্গ অবরোধ করিয়া ছিলেন (১৮০৫ খৃঃ), কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। তথাপি জাঠ রাজ ভবিষ্যৎনিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ ব্যয় বাবদ কুড়িলক্ষ টাকা ইংরেজপক্ষকে দিয়া সন্ধি করিলেন।

লর্ড ওয়েলেসলির শাসন কালে শাসনবিভাগের কর্ম্মচারীগণের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়।

৫। লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৮০৫ খৃঃ)।

ভারতে রাজ্য বিস্তার নীতির পরিবর্তে পুনরায় ঔদাসীন্য নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য লর্ড ওয়েলেসলির পর লর্ড কর্ণওয়ালিশ পুনরায় গভর্ণর জেনারেল হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু তিনমাস মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় কলিকাতা কাউন্সিলের প্রবীণ সদস্য স্যার জর্জ্জ বার্লো অস্থায়ীভাবে ১৮০৫-১৮০৭ খৃঃ পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেলের কার্য্য পরিচালনা করেন।

৬। লর্ড মিণ্টো (১ম) (১৮০৭-১৩ খৃঃ)।

অতঃপর লর্ড মিণ্টো গভর্ণর জেনারল হন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অমৃতসরের সন্ধিদ্বারা পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের সহিত কোম্পানীর মৈত্রী সাধন করেন। এই সন্ধি দ্বারা শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াবে কোম্পানীর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। শতদ্রুর উত্তরতীর অবধি রণজিৎসিংহের রাজ্যসীমা

স্থিরীকৃত হইল। রণজিৎ সিংহ আমরণ এইসন্ধিশর্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী পুনরায় বিশবৎসর মেয়াদে নূতন সনন্দ লাভ করে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য লর্ডমিণ্টো বার্ষিক ন্যূনপক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন।

৭। লর্ড ময়রা বা লর্ড হেষ্টিংস (১৮১৩-২৩ খৃঃ)।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর কার্য্যকাল শেষ হইলে লর্ড ময়রা বড় লাট হন। তাঁহার সময়ের প্রধান ঘটনা গুর্খা যুদ্ধ (১৮১৪-১৬ খৃঃ)। পিণ্ডারী দমন (১৮১৭-১৮ খৃঃ) ও তৃতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ (১৮১৭-১৯ খৃঃ)। ইনিও লর্ড ওয়েলেসলির ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ হইতে ১৮১৫ মধ্যে ইংলণ্ডে অনেকগুলি আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে কী নামক এক শিল্পী চলন্ত মাকু আবিষ্কার করে। ১৭৬৪ খৃঃ হারগ্রীভ্‌স স্পিনিং জেনী (বয়ন যন্ত্র)। ১৭৮২ খৃঃ ওয়াট বাষ্পীয় এঞ্জিন ১৭৮৩ খৃঃ কর্ট ইস্পাতের উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ১৮১২ খৃঃ বাষ্পচালিত জাহাজ 'কমেট' নির্ম্মিত হয়। ১৮১৪ খৃঃ ষ্টিফেনসন বাষ্পচালিত রেল এঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ১৮১৫ খৃঃ ডেভির নিরাপত্তা প্রদীপ আবিষ্কারের ফলে কয়লা খনির শ্রমিকদের জীবনে নিরাপত্তা আনিয়া দেওয়ায় কয়লা উৎপাদন হার অনেক বাড়িয়া যায়। এই সকল আবিষ্কারের ফলে দেখিতে দেখিতে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্ত্র ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র হইয়া উঠিল। তখন তাহার প্রয়োজন হইল সস্তাদরে অফুরন্ত কাঁচামালের ও কারখানা-সমূহে উৎপন্ন মালের জন্য উন্মুক্ত বাজার। তাই অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাস অসীম সাম্রাজ্য ক্ষুধার ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস।

গুর্খা যুদ্ধ—১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুর্খা নায়ক পৃথ্বী নারায়ণ নেপাল রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে যুদ্ধপ্রিয় গুর্খারা রাজ্য বিস্তার করিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে কোম্পানীর রাজ্য সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া লর্ড ময়রা গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (১৮১৪ খৃঃ)। তিনি স্বয়ং পার্ব্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮১৬ খৃঃ সেনাপতি অক্টারলোনী গুর্খানায়ক অমর সিংহ থাপাকে পরাজিত করিয়া রাজধানী কাঠমণ্ডুর দিকে অগ্রসর হইলে সন্ধি স্থাপিত হয়। সগৌলির সন্ধি দ্বারা গুর্খারাজ কুমাউন ও গাড়োয়ালা জেলা এবং তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ কোম্পানীকে ছাড়িয়া দেন এবং সিকিম রাজ্যের উপর তাঁহার দাবী ত্যাগ করেন। তিনি কাঠমণ্ডুতে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট রাখিতে সম্মত হন। এই সময়

হইতে সিকিম রাজ্যে বৃটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধে জয়লাভের ফলে লর্ডময়রা লর্ড হেষ্টিংস উপাধি লাভ করেন।

এই সময় পশ্চিম ও মধ্যভারতে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত পিণ্ডারী নামক কতকগুলি সশস্ত্র লুণ্ঠনকারীর দল নানা স্থানে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। কোম্পানী রাজ্যে শক্তি রক্ষার্থ ১৮১৭ খৃঃ লর্ড হেষ্টিংস তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই তাহারা নানা স্থানে পরাজিত হইল। তাহাদের প্রধান নেতা আমীরখাঁ বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজপুতানায় টঙ্কের নবাব হইলেন। অপর নেতা করিম খাঁও একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। তৃতীয় নেতা চিতু ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইল। অবশেষে নেতার অভাবে পিণ্ডারী দলগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত হইল।

ইতিমধ্যে মারহাট্টা রাজগণ ইংরেজের কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টিত হইল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া পুনার নিকটস্থ কির্কির ইংরেজ দূতাবাস সহসা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া পুনা ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। নাগপুরের সন্নিহিত সীতাবলদীর ইংরেজ রেসিডেন্সী আক্রমণ করিয়া ভোঁসলে রাজ পরাজিত হইলেন। হোলকারের সৈন্যদল ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মাহিদপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইল। অতঃপর পেশোয়া বাজীরাও কোরে গাঁও ও আষ্টির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। পেশোয়ারাজ্যের অধিকাংশ কোম্পানীর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হইল। বাকী অংশ শিবাজীর বংশধর প্রতাপ সিংহকে দিয়া তাঁহাকে সাতরার সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। বাজীরাও রাজ্য হারাইয়া ইংরেজের বৃত্তিভোগী হইয়া মৃত্যু (১৮৫২ খৃঃ) পর্য্যন্ত কানপুরের নিকটে বিঠুর গ্রামে বাস করেন। ভোঁসলা রাজ্যের উত্তরাংশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইল। বাকী অংশ ভোঁসলা বংশীয় এক নাবালকের শাসনাধীন হইল। হোলকার ও সিন্ধিয়ার নিজ নিজ রাজ্য ইংরেজের অধীনতামূলক মিত্র রাজ্য রূপে বহাল থাকিল বটে কিন্তু রাজপুত রাজগণ তাঁহাদের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া কোম্পানীর সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হইল।

এইরূপে ভারতবর্ষে পাঞ্জাবের শিখ রাজ্য, সিন্ধু, নেপাল ও আসাম ব্যতীত আর কোন স্বাধীন রাজ্য থাকিল না। ভারতে কোম্পানী অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

৮। লর্ড আমহার্ষ্ট (১৮২৩-২৮ খৃঃ)।

পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টের সময় প্রধান ঘটনা প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮২৪-২৬ খৃঃ) ও ভরতপুরের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৮২৬ খৃঃ)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অলংপায়া ব্রহ্মদেশে একটি শক্তিশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপুত্র বোদাপায়া আরাকান মনিপুর ও আসাম নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। বোদাপায়ার পৌত্র বগীতো কাছাড় ও চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে চট্টগ্রামের সীমান্তে রামু নামক স্থানের যুদ্ধে ইংরেজেরা ব্রহ্মসেনাপতি মহামন্দুলার হস্তে পরাজিত হইলেও, পরে ইংরেজরা আসাম ও আরাকান হইতে ব্রহ্মবাহিনীকে বিতাড়িত করে। ইতিমধ্যে আর একদল ইংরেজ সৈন্য জলপথে রেঙ্গুনে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম-রাজধানী আভার নিকটস্থ হইলে সন্ধি স্থাপিত হয়। ইয়ান্দাবুর সন্ধি (১৮২৬ খৃঃ) দ্বারা আসাম, কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, আরাকান টেনাসারিম, চট্টগ্রাম, ইংরেজ কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয়। ব্রহ্মরাজ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে বহু অর্থ দিতে বাধ্য হন। আভাতে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়। ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর একটি বাণিজ্য চুক্তিও সম্পাদিত হয়।

ভরতপুরের জাঠ রাজ বলদেও সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র বলবন্ত সিংহকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জনশাল সিংহাসন অধিকার করিলে, লর্ড আমর্হাষ্ট প্রকৃত অধিকারীকে রাজ্যদানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৮২৬ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারী প্রধান সেনাপতি লর্ড কম্বারমিয়ার কয়েকবার পরাজিত হইয়াও শেষে ভরতপুর দুর্গ অধিকার করিয়া উক্ত নাবালক অধিকারী বলবন্ত সিংহকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং দুর্জ্জনশালকে কাশীতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

৯। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খৃঃ)।

অতঃপর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক বড়লাট হন (১৮২৮ খৃঃ)। তিনি কাছাড় ও কুর্গ রাজ্য অধিকার ও মহীশূরের অত্যাচারী হিন্দু রাজার হস্ত হইতে সাময়িক ভাবে শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

তিনি বিভাগীয় বিচারালয়গুলি উঠাইয়া দিয়া কালেক্টরদের উপর ফৌজদারী মোকর্দ্দমার বিচারের ভার দেন, আদালতে ফার্শীভাষার পরিবর্ত্তে দেশী ভাষার প্রচলন করেন ;শাসন ও বিচারবিভাগে ভারতীয়দিগকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তের

ব্যবস্থা করেন; ভারতীয়দের জন্য সব জজের পদ সৃষ্টি করেন এবং ভারতীয় সৈন্যদের বেত্রদণ্ড রহিত করেন।

শাস্ত্র ও সমাজের অন্ধ শাসনে সাধারণতঃ উচ্চজাতীয়া হিন্দু বিধবাগণকে মৃত স্বামীর শবদেহের সহিত একই চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত। ইহা সতীদাহ বা সহমরণ নামে পরিচিত। ১৮১৭ খৃঃ একমাত্র বাঙলা দেশেই ৭০০ সতীদাহ হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়[১] ও দ্বারকানাথ

১। ১৭৭৪ খৃঃ ১০ই মে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের মূল উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক গ্রন্থ লিখিয়া প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় তিনি আত্মীয়গণের বিরাগভাজন হন। ১৮০৩ খৃঃ পিতার মৃত্যুর পর তিনি রঙ্গপুর জেলার কালেক্টরীর কেরানী পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে তিনি সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া চাকরী ত্যাগ করেন। ৪০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া অনন্যচিত্তে নানা ধর্ম্মমতের তত্ত্বালোচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮২৭ খৃঃ কলিকাতার কমল বসুর বাড়ীতে 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করেন। ইহাই পরে ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হয়। ইনি বাংলা, সংস্কৃত, উর্দ্দু, ইংরেজী, ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মোগল বাদসাহের বংশধর দ্বিতীয় আকবর সাহের বৃত্তি হ্রাস হইলে, তিনি রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দিয়া আপীল করিবার জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডেই ব্রিষ্টল সহরে তিনি ১৮৩৪ খৃঃ পরলোকগমন করেন। হিন্দুদের মধ্যে তিনিই প্রথমে বিলাতে গমন করেন। পারসী ভাষায় লেখা 'তুহফৎ-উল-মুবাহিহদ্দিন' গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্ম্ম লইয়া তাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে একেশ্বরবাদই সর্ব্ব ধর্ম্মের সার কথা; অন্য যা কিছু সবই দেশাচার, লোকাচার ও বিভিন্ন সংস্কারের ফল।

নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকে ভিত্তি করিয়া রামমোহন রায় যে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খৃঃ) ঋষি রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০ খৃঃ), ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ খৃঃ) ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯ খৃঃ) প্রভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে ইহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্ম সমাজ, কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজ ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ এই তিনটি শাখায় । প্রথমটি জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে, দ্বিতীয়টি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে

ঠাকুর প্রভৃতি প্রগতিশীল হিন্দু নেতাগণের সহযোগিতাপ্রাপ্ত হইয়া ১৮২৯ খৃঃ লর্ড বেন্টিঙ্ক একটি ঘোষণাদ্বারা এই সহমরণ প্রথা রহিত করিয়া দেন।

আইনসচিব মেকলে ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮৩৫ খৃঃ লর্ড বেন্টিঙ্ক নিয়ম করিলেন যে সরকারী তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা দানের জন্যই ব্যয়িত হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতবাসী ক্রমশঃ পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তের বিকাশ হওয়ায় ভারতের প্রাচীন সভ্যতা নূতন রূপ ধারণ করিতে লাগিল ও ভারতীয়গণ ক্রমশঃ দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময় পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়।

লর্ড বেন্টিঙ্কের আর একটি কাজ ঠগী দমন। এই ঠগীদল পথিকের ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফাঁসী লাগাইয়া পথিকদের হত্যা করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। বেন্টিঙ্কের আদেশে স্যার উইলিয়ম হেনরী স্লীম্যান বহু ঠগীদলকে গ্রেপ্তার করিয়া ঠগীদিগকে নির্ম্মূল করেন। স্লীম্যানের পৌত্র কর্ণেল স্যার জেমস স্লীম্যানের লেখা "Thug or A Million Murders" গ্রন্থের মতে ঠগীরা অন্তত দশলক্ষ মানুষকে হত্যা করিয়াছে।

১৮৩৩ খৃঃ কোম্পানী পার্লিয়ামেন্টের কাছে নূতন সনন্দ লাভ করে। এই সনন্দ মূলে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা কোম্পানীর অধিকৃত ভারতের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয়। এই সময় ১৮৩৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে বিশ্ববিখ্যাত রামকৃষ্ণ পরমহংস দে ব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। বাল্যকালে রামকৃষ্ণের নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এবং কলিকাতার সন্নিহিত দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি স্থাপিত কালী মন্দিরের পূজারীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এখানেই তাঁহার ধর্ম্মভাবের অপূর্ব্ব স্ফুরণ হয়। মাতৃভাবে

ভারতীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে, ও তৃতীয়টি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজ ভবনে অধিষ্ঠিত। ব্রাহ্মগণ প্রগতিশীল হিন্দু। তাঁহারা জাতিভেদ মানেন না এবং উপনিষদ-সম্মত একেশ্বরবাদী। কেশবচন্দ্র "ভারত সংস্কার সভা" স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে ভারতবাসীর সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই সময় পঞ্জাবের দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খৃঃ) 'আর্য্য সমাজে'র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ খৃঃ ১০ই এপ্রিল বোম্বাই সহরে প্রথম আর্য্য সমাজ স্থাপিত হয়।

ভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ সকল ধর্ম্মের মূল তত্ত্বে তাঁহার গভীর উপলব্ধি জন্মে। ইনি অতি মধুর স্বরে গান গাহিতে পারিতেন। গান গাহিতে গাহিতে ও ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিমগ্ন হইতেন। প্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী নাম্নী পরিচিতা এক সন্ন্যাসিনীর নিকট, পরে বৈদান্তিক সাধু তোতাপুরীর নিকট যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা করেন। ইনি সংসারে থাকিয়াই নির্লিপ্তভাবে সমাগত সকলকে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ দিতেন। সহজ উপমা ও ছোট ছোট গল্পের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের গূঢ় ও জটিলতত্ত্ব সমাধান করিয়া দিতেন। সেকালের প্রসিদ্ধ মনিষী কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া এই অশিক্ষিত পূজারীর উপদেশ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাঁর অসংখ্য ভক্ত শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে, আমেরিকায় ও ইউরোপে তাঁহার সমন্বয়ী বৈদান্তিক ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া ও প্রবুদ্ধ ভারতের জন্ম দিয়া যশস্বী হন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শয়ন গৃহ ও অধিবেশনের স্থান অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বহুলোক তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করেন। শিষ্যগণ তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবসকে পর্ব্বদিন জ্ঞানে উৎসব করেন। তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ ভারতে ও ভারতের বাহিরে নানা স্থানে 'রামকৃষ্ণ আশ্রম' ও 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোক সেবায় রত আছেন। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' নামে তাঁহার উপদেশাবলী তাঁহার শিষ্যগণ সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট এই অলোকসামান্য মহাপুরুষের মর্ত্ত্য লীলার অবসান ঘটে। তাঁহার ধর্ম্মমত সার্ব্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক ছিল। তাঁহার মতে সত্য এক হইলেও তাহার প্রকাশ বহু এবং এই জন্যই যত মত তত পথ। এ জন্য তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর 'বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে'র ও রাজা রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের' ন্যায় এমন কি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী 'বৌদ্ধ সম্প্রদায়' 'মুসলমান সম্প্রদায়' 'খৃষ্টান সম্প্রদায়', 'শিখ সম্প্রদায়ে'র ন্যায় কোন 'সাম্প্রদায়িক জাতি' ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম গড়িয়া উঠে নাই।

১০। লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬-৪২ খৃঃ)।

পরবর্ত্তী বড় লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের সময়ের প্রধান ঘটনা প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২ খৃঃ) ও উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষে বহুলোকের প্রাণহানি।

পারস্যে ও মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ভীত হইয়া লর্ড অকল্যাণ্ড কাবুলের আমির দোস্ত মহম্মদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য আলেকজাণ্ডার বার্ণেসকে কাবুলের দরবারে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। দোস্ত মহম্মদ মিত্রতার মূল্য স্বরূপ পেশোয়ার দাবী করেন। কিন্তু পেশোয়ার তখন পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের রাজ্যভুক্ত থাকায় তাঁহার প্রস্তাব পালন করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং দোস্ত মহম্মদ রাশিয়ার দূতকে দরবারে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ঐ সময় আফগানিস্থানের বিতাড়িত আমির সাহসুজা ইংরেজের আশ্রয়ে লুধিয়ানায় বাস করিতেছিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড সাহসুজা ও রণজিৎ সিংহের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া (১৮৩৮ খৃঃ) আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজ বাহিনী কান্দাহার, গজনী ও কাবুল অধিকার করিলে দোস্ত মহম্মদ আত্মসমর্পণ করিলেন, তাঁহাকে বন্দীরূপে কলিকাতায় আনয়ন করা হইল। সাহ সুজা কাবুলের সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হইলেন। কিন্তু ১৮৪১ খৃঃ আফগানেরা দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া বার্ণেস, ম্যাকনটন প্রভৃতি ইংরেজ সামরিক কর্মচারীগণকে হত্যা করে। অতঃপর ইংরেজবাহিনী ভীত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে আফগানগণের হস্তে সমগ্র বাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কেবলমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন কোনরূপে রক্ষা পাইয়া জালালাবাদে পৌঁছিয়া ঐ দুঃসংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হন। এই দুর্ঘটনার পর লর্ড অকল্যাণ্ড পদত্যাগ করেন।

১১। লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-৪৪ খৃঃ)।

পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড এলেনবরার আদেশে অবিলম্বে সেনাপতি নট কান্দাহার হইতে ও সেনাপতি পোলক পেশোয়ার হইতে আফগান রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গজনী সহর ও দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন ও কাবুলের বাজার ভস্মীভূত করিলেন। ইতিমধ্যে আমির সাহসুজা বিদ্রোহী প্রজাদের হস্তে নিহত হওয়ায় ইংরেজ সৈন্য ফিরিয়া আসিল ও দোস্ত মহম্মদ ফিরিয়া গিয়া পুনরায় আমির হইলেন (১৮৪২ খৃঃ)।

১৮৪৩ খৃঃ সিন্ধু প্রদেশের মুসলমান আমীরগণ ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলে তাহাদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মিয়ানী ও দাবোর যুদ্ধে সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ার আমিরগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। সিন্ধু প্রদেশে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময়ে

গোয়ালিয়রের সৈন্যগণ বিদ্রোহী হওয়ায় ইংরেজ বাহিনী গোয়ালিয়রে প্রবেশ করিয়া মহারাজপুর ও পনিয়ারের যুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করে। গোয়ালিয়রের সামরিক শক্তি হ্রাস করা হইল এবং নাবালক সিন্ধিয়াকে একজন ইংরেজ রেসিডেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা হইল ('৮৪৩ খৃঃ)।

১২। লর্ড হার্ডিঞ্জ (১ম) (১৮৪৪-৪৮ খৃঃ)।

অতঃপর স্যার হেনরী হার্ডিঞ্জ বড়লাট হন। তাঁহার সময়ের প্রধান ঘটনা প্রথম শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬ খৃঃ)। এই যুদ্ধে জয়লাভ করায় হার্ডিঞ্জ লর্ড উপাধি লাভ করেন। ১৮৩৯ খৃঃ মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। তৎপর তাঁহার পুত্র খড়্গ সিংহ, নেহাল সিংহ ও সের সিংহ যথাক্রমে রাজা হন। ১৮৪৩ খৃঃ সের সিংহ নিহত হইলে রণজিৎ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র পঞ্চ বর্ষ বয়স্ক দলীপ সিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার মাতা রাণী ঝিন্দন তাঁহার অভিভাবিকা স্বরূপ শাসন কার্য্যের ভার লন। দরবারের দুর্ব্বলতা বশতঃ শিখ সৈন্যগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৮৪৫ খৃঃ তাহারা শতদ্রু পার হইয়া কোম্পানীর রাজ্য আক্রমণ করিল, কিন্তু মুদ্‌কি, ফিরোজসহর, আলিওয়াল ও সোব্রাওএর যুদ্ধে তাহারা পরাভূত হইল। অতঃপর ১৮৪৬ খৃঃ ইংরেজ সৈন্য রাজধানী লাহোরে উপস্থিত হইলে সন্ধি স্থাপিত হয়। লাহোরের এই সন্ধির ফলে শতদ্রু ও বিপাসার মধ্যবর্ত্তী জলন্ধর দোয়াব এবং শতদ্রুর বাম দিকে অবস্থিত লাহোর দরবারের অধিকৃত যাবতীয় ভূভাগ কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয়। লাহোর রাজকোষের অর্থাভাব বশতঃ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সর্দ্দার গোলাব সিংহের নিকট বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর ক্ষতিপূরণের দাবী মিটান হয় এবং শিখ সৈন্যের সংখ্যাও কমাইয়া দেওয়া হয়। পরে অপর এক সন্ধি দ্বারা শিখরাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য এবং শাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রণের জন্য লাহোরে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় ভারতে রেলপথ নির্ম্মাণ ও সেচ কার্য্যের জন্য খাল খননের সূত্রপাত হয়।

১৩। লর্ড ড্যালহাউসী (১৮৪৮-৫৬ খৃঃ)।

পরবর্ত্তী বড় লাট লর্ড ড্যালহাউসীও সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। তাঁহার সময়ের প্রধান ঘটনা দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ ও ব্রহ্ম যুদ্ধ।

মূলতানের মূলরাজের নিকট শিখ দরবার অতিরিক্ত রাজস্ব দাবী করায় মূলরাজ পদত্যাগ করেন। এই ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য দুইজন ইংরেজ সামরিক

কর্ম্মচারী মুলতানে উপস্থিত হইলে তাঁহারা নিহত হন। রেসিডেন্টের নির্দ্দেশে শিখ সেনাপতি সের সিংহ বিদ্রোহ দমনার্থ তথায় প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তিনিও বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। তখন লর্ড ড্যালহাউসী শিখ দরবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৮৪৮ খৃঃ)। আফগানগণ পেশোয়ার পাইবার লোভে এই যুদ্ধে শিখদের পক্ষ অবলম্বন করে। ১৮৪৯ খৃঃ চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে শিখগণ অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দেয়। ফলে এই যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত ও বহু ইংরেজ সৈন্য হতাহত হয় ও কয়েকটি ইংরেজ কামান শিখদের হস্তগত হয়। কিন্তু ইংরেজরা নিরস্ত হইল না। কিছুদিন পর তাহারা শিখদিগকে হটাইয়া দিয়া মুলতান অধিকার করিল এবং গুজরাটের যুদ্ধে শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত করিল। এই যুদ্ধের পর লর্ড ড্যালহাউসী এক ঘোষণাপত্র দ্বারা সমগ্র শিখরাজ্য কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন (১৮৪৯ খৃঃ মার্চ্চ)। শিখরাজ দলীপ সিংহ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

এই সময় ব্রহ্মরাজ রেঙ্গুনের ইংরেজ বণিকদের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করায় বড় লাট ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ইংরেজ সৈন্য পেগু প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। কেবলমাত্র উত্তর ব্রহ্ম স্বাধীন রহিল।

কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে একটি নিয়ম করা হইয়াছিল যে ঐ সকল রাজারা অপুত্রক থাকিলে কোম্পানীর বিনানুমতিতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহাকে স্বত্বলোপ নীতি (Doctrine of Lapse) বলা হইত। এই নীতি প্রয়োগ করিয়া ড্যালহাউসী সাতারা[১], ঝাঁসি, নাগপুর ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের রাজা অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, তাহাদের রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। তাঞ্জোরের রাজা ও কর্ণাটের নবাবের বৃত্তি হইতে তাঁহাদের দত্তক পুত্রদিগকে বঞ্চিত করা হইল। পদচ্যুত পরলোকগত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওএর দত্তক পুত্র নানা সাহেবকে বৃত্তি দেওয়া হইল না। কুশাসনের অভিযোগে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলিকে বৃত্তিভোগী করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লওয়া হইল। সিকিম রাজ্যের একাংশ কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করা হইল। উত্তরাধিকারী অভাবে সম্বলপুর রাজ্য দখল করা হইল। কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার পরিবর্ত্তে নিজামের নিকট বেরার প্রদেশ লওয়া হইল।

১। সাতরার শেষ রাজা শাহাজী (১৮৩৯-৪৮ খৃঃ) নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে সাতারা রাজ্য কোম্পানী খাস করিয়া লয়। কোহ্লাপুর রাজ্য শিবাজীর অপর পুত্র রাজারামের বংশধরগণের অধিকারে থাকে।

ড্যালহাউসীর সময় রাস্তা নির্ম্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের জন্য একটি পূর্ত্ত বিভাগ স্থাপিত এবং ভারতের রেলপথ নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হইল। তিনি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংস্কার ও গঙ্গার খাল খনন সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার উদ্যোগে টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ ও সামান্য ব্যয়ে ডাকে পত্রাদি প্রেরণ জন্য ডাক বিভাগের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৪ খৃঃ বোর্ড অব কনট্রোলের অধ্যক্ষ স্যার চার্লস উডের শিক্ষাবিষয়ক নির্দ্দেশপত্র অনুসারে শিক্ষা বিভাগ গঠিত হয়। এই সময়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়।

পূর্ব্বে ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারী হিন্দুগণ পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত। লর্ড ড্যালহাউসী এই প্রথা রহিত করেন।

১৮৫৩ খৃঃ পালিয়ামেণ্ট কোম্পানীকে নূতন সনন্দ প্রদান করে। এই সনন্দ অনুসারে পালিয়ামেণ্টের পুনরাদেশ পর্য্যন্ত কোম্পানীর অধিকৃত ভারতীয় রাজ্যের শাসনভার কোম্পানীর উপর অর্পিত হয়, ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভা ও ডিরেক্টরগণের ক্ষমতা হ্রাস ও বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

এই সময়ে এদেশে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা উচ্চ পদে কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। আইন প্রণয়নের জন্য একটি ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং, প্রধান সেনাপতি, গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের ৪ জন সভ্য, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বাঙলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশ এই চারিটি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মনোনীত চারিজন কর্ম্মচারী ও অপর একজন বিচারপতি এই ১২ জন সদস্য থাকিবার নিয়ম হয়।

এই সময় হইতে বাঙলার শাসনভার একজন লেফটন্যাণ্ট গভর্ণরের (ছোট লাট) উপর প্রদত্ত হয়। স্যার ফ্রেডারিক হেলিডে বাঙলার সর্ব্ব প্রথম ছোট লাট হন (১৮৫৪ খৃঃ ২৮শে এপ্রিল-১৮৫৯ খৃঃ)।

উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৮৫৩ খৃঃ বহরমপুর কলেজ স্থাপিত, ১৮৫৫ খৃঃ হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত ও স্ত্রীলোকদের জন্য বেথুন সাহেবের নেতৃত্বে বেথুন বিদ্যালয় ও শিশুদের শিক্ষার্থ অনেকগুলি আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষা কমিটি উঠিয়া গিয়া বিদ্যালয় সমূহের ডিরেক্টর, ইনস্পেক্টর প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়।

নূতন যুগ

(১৮৫৭-১৯৪৭ খৃঃ)

বৃটিশ আমল

১। লর্ড ক্যানিং—গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় (১৮৫৬-৬২ খৃঃ)।

লর্ড ড্যালহাউসীর পর লর্ড ক্যানিং গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। পরে তিনি গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় হন। এই সময়ের প্রধান ঘটনা ভারতে কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ সিপাহী বিপ্লব[১] এবং কোম্পানীর শাসনের অবসান ও ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক স্বহস্তে ভারত শাসনের ভার গ্রহণ। ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যদের অধিকাংশই

১। সিপাহী বিপ্লবের পূর্ব্বে আরও ছোট ছোট তিনটি ঘটনার কথা জানা যায়। যথা—(ক) উত্তর বঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় ১৭৭০ খৃঃ মন্বন্তরের সময় ও তাহার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত একদল সন্ন্যাসী উত্তরবঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে শিবির স্থাপন করিয়া চারিদিকে লুণ্ঠনাদি করিত। ইহাকে পটভূমি করিয়া বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী রচনা করেন। ইহাদের উৎপাতে কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের ব্যাঘাত ঘটায়, ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত কোম্পানী সৈন্য নিয়োগ করে। ইহাদের সহিত যুদ্ধে যথাক্রমে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড ও ক্যাপ্টেন টমাস পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর এক বড় সৈন্যদল লইয়া বহরমপুর হইতে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ড তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কুচবিহারে একদল সৈন্য ক্যাপ্টেন জোন্সের অধীনে প্রস্তুত থাকে। ক্যাপ্টেন ব্রুকের অধীনে আর একদল সিপাহী রাজমহল হইতে গঙ্গা পার হইয়া সন্ন্যাসীদিগকে আক্রমণ করিতে থাকে। এইরূপে নানাদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া অনেকে নিহত হওয়ায় উহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

(খ) ওহাবী বিদ্রোহ—মধ্য আরবের নাজদ্ প্রদেশে অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে আলি ওহাব নামক এক ধর্ম্ম সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তি ও কবর পূজার বিরোধী ছিলেন। ১৮২৯ খৃঃ ২৪ পরগণা জেলার বারাসত নিবাসী

ছিল ভারতীয় সিপাহী। প্রধানতঃ এই সিপাহীদের বাহুবলেই ভারতে কোম্পানীর রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সতী দাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ আইনের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সমাজ সংস্কার মূলক ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে রক্ষণশীল হিন্দুসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের মনে ইংরেজরা হিন্দুধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলন করিবে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতেছিল এবং সেই ধারণা হিন্দু সিপাহীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইতেছিল। ব্রহ্ম যুদ্ধের সময় সিপাহীদিগকে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশে যাইতে বাধ্য করায় সমাজচ্যুতি ও ধর্ম্মনাশের ভয় তাহাদিগকে বিচলিত করিয়াছিল[১]। ইহার পর যখন তথাকথিত গো-শূকরের চর্ব্বিতে প্রস্তুত টোটা দাঁতে কাটিয়া এনভিল্ড রাইফেল ব্যবহারের হুকুম হইল তখন হিন্দু মুসলমান সকল সিপাহীই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অপর দিকে লর্ড ড্যালহাউসীর সাম্রাজ্যবাদের ফলে যে সকল দেশীয় রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, সেই সব রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, ক্ষতিগ্রস্ত

ঐ ওহাবী মতাবলম্বী তিতুমীর বসিরহাটের নিকটে বাঁশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া খৃষ্টান ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। ১৮৩১ খৃঃ ১৭ নবেম্বর স্বল্প সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য তিতুমীর ও তাহার দলকে আক্রমণ করিলে তিতুমীর তাহাদিগকে হটাইয়া দেয় এবং প্রচার করিতে থাকে সে মন্ত্রবলে 'সব গোলাগুলি খা ডালা'। পরে আর একদল সৈন্য আসিয়া বন্দুকের গুলিতে তিতুমীরকে ও তাহার দলের অনেককে নিহত করিলে ওহাবীরা আত্মসমর্পণ করে। বিচারে অনেকের কারাদণ্ড ও ফাঁসী হয়।

(গ) সাঁওতাল বিদ্রোহ—১৮৫৪-৫৫ খৃঃ কোম্পানীর স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা, বীরভূম ও বাঁকুড়ার সাঁওতালগণ বীরভূমের মুচিয়া সাঁওতাল, রাম সাঁওতাল, সুন্দরা সাঁওতাল ও সিরু মাঝির নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া আসানসোলের তিলাবনী হইতে ১৮৫৫ খৃঃ জুন মাসে কলিকাতা অভিমুখে অভিযান করে। ৭ই জুলাই তাহারা কলিকাতার উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগকে পরাজিত ও ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। ১৮৫৫ খৃঃ ১৩ই নবেম্বর ব্রিগেডিয়ার এল এম বার্ড বিদ্রোহী জেলাগুলিতে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া বহু সাঁওতালকে হতাহত করিয়া শান্তি স্থাপন করেন।

১। ১৮২৪ খৃঃ সমুদ্র পথে ব্রহ্ম যুদ্ধে যাইতে অস্বীকার করায় সেনাপতি প্যাগেটের আদেশে বারাকপুরে ৭০০ জন সিপাহীকে গঙ্গাতীরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

জমিদারগণ, পদচ্যুত সৈন্য ও কর্ম্মচারীগণ স্বার্থহানির জন্য ইংরেজ বিদ্বেষী হইল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে বিপ্লবের পথ বাছিয়া লইল এবং বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের মধ্যে নানা উপায়ে বিপ্লবের বীজ ছড়াইতে লাগিল। সিপাহীদের অপেক্ষা গোরা সৈন্যের সংখ্যা কম থাকায় সিপাহীরা জয় লাভের আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল[১] কিন্তু কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিবার মত উপযুক্ত নেতার অভাব তাহাদের ছিল। তাহাদের কোন সাধারণ পরিকল্পনা, এক-নায়কত্ব ও একরূপ কর্ম্মপদ্ধতি ছিল না। বিশেষত দেশের জনসাধারণ এই-বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। পঞ্জাবের শক্তিশালী শিখগণ এই বিপ্লবে যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, বরং বিপ্লব দমনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। দেশীয় রাজারা প্রায়ই ইংরেজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের মন্ত্রী দিনকর রাও ও নিজামের মন্ত্রী স্যর সালার জঙ্গ ও নেপালের গুর্খা নায়ক স্যর জঙ্গ বাহাদুর সৈন্য পাঠাইয়া ইংরেজের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এই সকল প্রতিকূল অবস্থার কথা ও পরিণাম চিন্তা না করিয়াই বাঙলা দেশের বহরমপুর ও বারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে সহসা বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৫৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারীতে বহরমপুরের ১৯ সংখ্যক সিপাহী দলে অসন্তোষ দেখা দিলে তাহাদিগকে বারাকপুরের সেনানিবাসে লইয়া আসিয়া নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ করা হয়। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বারাকপুরের ৩৪ নং সিপাহী দলের ১৪৪১ নং তরুণ সিপাহী মঙ্গল পাঁড়ে পিস্তল ও অসি লইয়া লেফটেন্যাণ্ট বগ ও মেজর হুডসনকে আক্রমণ করে। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া নিজেকে গুলি করে। পরে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হইয়া বাঁচিয়া উঠে ও বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ফাঁসী কাষ্ঠে জীবনদান করে (৮ই এপ্রিল)।

অতঃপর ১৮৫৭ খৃঃ ১ মে লক্ষ্ণৌতে বিপ্লবের শিখা দেখা দিল। গভর্ণর স্যার হেনরী লরেন্স প্রমাদ গণিলেন। তৎপর মীরাটে ও আম্বালায় বিপ্লবাগ্নি প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করে (১৮৫৭ খৃঃ ৫ মে)। মীরাটে বহু ইংরেজকে হত্যা করিয়া সিপাহীরা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে (১৮৫৭ খৃঃ ১১ই মে) এবং দিল্লী অধিকার করিয়া তথায় বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে। কানপুরে নানা সাহেব ধুন্ধুপন্থ তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রী আজিমুল্লার পরামর্শে

১। লর্ড ড্যালহাউসীর অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে কোম্পানীর অধীনে ২৩৩০০০ সিপাহী ও ৪৫৩২২ জন ইংরাজ (প্রাইভেট অফিসার) সৈন্য কাজ করিত।

নিজেকে পেশোয়া বলিয়া প্রচার করেন এবং তথায় সিপাহীরা বহু ইংরেজকে হত্যা করিয়া নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। লক্ষ্ণৌতে স্যার হেনরী লরেন্স সিপাহীদের হস্তে নিহত হন। কিন্তু শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সেনাপতি হ্যাভলক ও নীল নানা সাহেবকে পরাজিত করিয়া কানপুর পুনরধিকাব করিলেন। সেনাপতি নীল ও আউটরাম লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিতে যাইয়া নীল নিহত ও আউটরাম আহত হইলেন, কিন্তু সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্পবেল আসিয়া লক্ষ্ণৌ অধিকার করিলেন এবং অবরুদ্ধ ইংরেজদিগকে মুক্ত করিলেন (১৮৫৮ খৃঃ মার্চ্চ)। পঞ্জাব হইতে শিখ সৈন্যের সাহায্যে সেনাপতি উইলসন দিল্লীর কাশ্মীর তোরণ ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দিল্লী পুনরধিকার করিয়া লইলেন (২০শে সেপ্টেম্বর)। মধ্যপ্রদেশে সিপাহীদের নেতা ছিলেন মারহাঠা বীর তাঁতিয়া তোপী ও ঝান্সীর বীর্য্যবতী রাণী লক্ষ্মীবাই। স্যার হিউরোজ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া ঝান্সী অধিকার করিয়া লইলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া ৫০ মাইল দূরে কল্পী দুর্গে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সে দুর্গেরও পতন হইল। রাণী ক্ষিপ্রতার সহিত দুর্গ ত্যাগ করিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্য সহ চম্বল নদী পার হইয়া সিন্ধিয়া রাজ্য আক্রমণ করতঃ সিন্ধিয়ার সেনাদলকে পরাভূত করিল। তাহারা রাণীর পক্ষ অবলম্বন করিল। তথায় পুনরায় স্যার হিউরোজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন কালে রাণী বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁতিয়া তোপী বন্দী হইয়া ফাঁসী কাষ্ঠে প্রাণ দিলেন। বিহারের বিপ্লবী নেতা জগদীশপুরের জমিদার বাবু কুমার সিংহ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সর্ব্বত্র সিপাহীদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। সমগ্র ভারতে শান্তি স্থাপিত হইল। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে পলায়ন করিলেন। দিল্লী দখলের পর কাপ্তেন হডসন হুমায়ূনের সমাধিগৃহে প্রাণভয়ে পলায়িত দ্বিতীয় বাহাদুর সাহ ও তাঁহার তিন পুত্রকে দেখিতে পাইয়া পুত্রগণকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। বাহাদুর সাহ বন্দী হইয়া রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হইলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যুর পর মুঘল রাজ বংশের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইল[১] (১৮৬২ খৃঃ)।

১। ভারতে মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন বাবরের (রাজ্যকাল ১৫২৬-৩০ খৃঃ) পিতা মীর্জ্জা ওমর সেখ ছিলেন সমরখণ্ডের বিখ্যাত চাঘতাই তুর্ক জাতীয় তৈমুরলঙ্গের পঞ্চম পুরুষ ও মাতা কতলুঘ নিগার খানুম ছিলেন কারাকোরামের সামানী বৌদ্ধ চেঙ্গিজ খানের ত্রয়োদশ অধস্তন বংশধরের কন্যা

সিপাহী বিপ্লবের অবসানের সহিত ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর শাসনেরও অবসান হইল। "নূতন ভারত শাসন আইনে"র বলে ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী ভিক্টোরিয়া বিজিত ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন (নভেম্বর ১৮৫৮ খৃঃ)। ডিরেক্টর সভা ও বোর্ড অব কন্‌ট্রোল উঠিয়া গিয়া ভারত শাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য একজন সেক্রেটারী অব ষ্টেট এবং ১৫ জন মেম্বর লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। রাণীর ঘোষণানুসারে স্থির হইল যে লর্ড ক্যানিং ও ভবিষ্যৎ গভর্ণর জেনারেলগণ ভাইসরয় (রাজ প্রতিনিধি) ও গভর্ণর জেনারেল হইবেন এবং তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ভারত সচিবের (Secretary of State) নির্দ্দেশক্রমে ভারতের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। রাণী ভারতীয় প্রজাদের ধর্ম্ম ও অধিকার রক্ষা করিবেন এবং উপযুক্ত দেখিলেই তাহাদিগকে সকল রাজ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন।

এই সময় হইতেই বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার শাসনের জন্য একজন ছোট লাট নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়। স্যার জর্জ্জ গ্রাণ্ট (১৮৫৯-৬২ খৃঃ) বাঙলা, বিহার উড়িষ্যার প্রথম ছোট লাট নিযুক্ত হন।

বিপ্লবী নেতাগণের প্রতি কঠোর দণ্ড দানের পরিবর্ত্তে লর্ড ক্যানিং ন্যায়সঙ্গত দণ্ড দানের নীতি গ্রহণ করায় তাঁহাকে দয়ালু ক্যানিং বলা হইত। এই সময়

সুতরাং বাবর পিতৃমাতৃ কোন দিক দিয়াই মুঘল ছিলেন না। তথাপি ভারতে এই বংশ মুঘল বংশ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। পিতা জহির উদ্দিন বাবর ও মাতা মাহাম বেগম হইতে নাসির উদ্দিন হুমায়ুনের (রাজ্যকাল ১৫৩০-৩৯, ১৫৫৫-৫৬ খৃঃ) জন্ম হয়। পারস্য দেশীয়া মাতা হামিদাবানুর গর্ভে হুমায়ুনের ঔরসে সিন্ধুদেশে অমরকোটের রাণা বীরশালের গৃহে ১৫৪২ খৃঃ ১৫ অক্টোবর জালালউদ্দিন আকবরের জন্ম হয় (রাজ্যকাল ১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ)। পত্নী অম্বর-রাজ বেহারী মল্লের কন্যা যোধবাই (বেগম মরিয়ম উজ জমাণী)র গর্ভে আকবরের পুত্র সেলিমের (জাহাঙ্গীর) জন্ম হয় (রাজ্যকাল ১৬০৫-২৭ খৃঃ)। জাহাঙ্গীরের পত্নী যোধপুরের রাজা উদয় সিংহের কন্যা যোধপুরী বেগম জগৎ গোসাইনী মানমতীর গর্ভে পুত্র শাহজহানের (খুরম বা পূর্ণচন্দ্র) জন্ম হয় (রাজ্যকাল ১৬২৭-৫৮)। জাহাঙ্গীরের অপর পত্নী অম্বর রাজ রাণা ভগবান দাসের কন্যা (রাজা মানসিংহের ভগ্নী) মান বাই (সাহ বেগম)এর গর্ভে পুত্র খসরুর জন্ম হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে জাহাঙ্গীর তাহার চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের তৃতীয়া পত্নী জগৎ বিখ্যাত নূরজহান। সাহজহানের

হিন্দুদের দত্তক গ্রহণের রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসন নীতি স্বীকৃত হয়। এবং জমিদারদের পীড়ন হইতে বাঙলার প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৫৯ খৃঃ রাজস্ব বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয় ও বাঙলায় নীলকরদের অত্যাচার দমনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৬০ খৃঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আখন ও ১৮৬১ খৃঃ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন প্রবর্তিত হয়। ১৮৬১ খৃঃ বোম্বাই ও মাদ্রাজে এবং ১৮৬২ খৃঃ বাঙলায় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক লাট তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যগণ, এড্‌ভোকেট্‌-জেনারেল ও প্রাদেশিক মনোনীত ৫ হইতে ৮ জন পর্য্যন্ত সদস্য লইয়া এই ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবার নিয়ম[১]।

অন্ততঃ তিনজন পত্নী ছিলেন। প্রথমা পত্নী পারস্য দেশীয় মীর্জ্জা হোসেনের কন্যা, দ্বিতীয়া নূরজহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মমতাজ, তৃতীয়া পত্নী আব্দুল রহমান খান খানানের কন্যা। এতদ্ব্যতীত তাঁহার হিন্দু পত্নীও ছিল। মমতাজের গর্ভে শাহজহানের দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মোরাদ এই চারিপুত্র ও রোসেন আরা ও জাহান আরা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। ঔরঙ্গজেবের (রাজ্যকাল ১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ) দিলবাসবানু, জৈনাবাদী প্রভৃতি চারিজন মহিষী ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মামুদ তাঁহার জীবিতকালেই মৃত হন। দ্বিতীয় পুত্র সাহ আলম। দিলবাসবানুর (বিবাহ ১৬৩৭ খৃঃ মৃত্যু ১৬৫৪ খৃঃ) গর্ভে সাহজাদা আজম ও আকবর ও সাহজাদী জেবুন্নিসা, জিনতুন্নিসা, জুবদন্নিসার জন্ম হয় তন্মধ্যে আকবর বিদ্রোহী হওয়ায় পারস্যে নির্ব্বাসিত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করেন। ঔরঙ্গজেবের পর তৎপুত্র সাহ আলম (প্রথম বাহাদুর সা, রাজ্যকাল ১৭০৭-১২ খৃঃ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজম ও কামবক্সকে হত্যা করিয়া বাদসাহ হন। তাঁহার চারিপুত্র জান্দাহার সাহ, আজিম উসান, রফিউসান ও জহান সাহ মধ্যে জান্দাহার সাহ (১৭১২-১৩ খৃঃ), আজিমউসানের পুত্র ফারুকসিয়র (১৭১৩-১৯ খৃঃ), রবিউসানের পুত্র রফিউদ্দৌলা (১৭১৯ খৃঃ) ও রফিউদরজাত (১৭১৯ খৃঃ), জহান সাহের পুত্র মহম্মদ সাহ (১৭১৯-৪৮ খৃঃ) ও মহম্মদসাহের পুত্র আহম্মদ সাহ (১৭৪৮-৫৪ খৃঃ) ও তৎপর জান্দাহার সাহের পুত্র দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৮ খৃঃ) যথাক্রমে বাদসাহ হন। অতঃপর দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র দ্বিতীয় সাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খৃঃ), তৎপুত্র দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-৩৭ খৃঃ), তৎপুত্র দ্বিতীয় বাহাদুর সাহ (১৮৩৭-৫৮ খৃঃ) ইংরেজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইয়া নামমাত্র বাদসাহ হইয়াছিলেন।

১। ১৮৮৬ খৃঃ উত্তর প্রদেশে ও ১৮৯৭ খৃঃ পঞ্জাবে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হয়।

১৮৬২ খৃঃ কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট, সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত একত্র করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দেই ভারতীয় কাউন্সিল আইন প্রণয়ন দ্বারা ভারতীয় আইন সভায় বেসরকারী সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। অপরপক্ষে এই সময়েই অর্থসচিব উইলসন আয়কর প্রবর্ত্তন ও পরবর্ত্তী অর্থ সচিব লেইং কাগজের মুদ্রা প্রচলিত করেন।

এই সময় হইতেই ভারতীয় সিপাহীদের উপর যাহাতে বিশেষভাবে নির্ভর করিতে না হয় তজ্জন্য গোরা সৈন্যের অনুপাত বৃদ্ধি, বিশেষতঃ তোপখানার ভার সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হয়। এই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

বাঙলার ছোট লাট স্যার জর্জ্জ পিটার গ্র্যান্টের আদেশে এই সময় পাঠশালা-সমূহের বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়েই ১৮৬৩ খৃঃ ১২ই জানুয়ারী ভারতের গণআন্দোলনের ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত বিশ্ববিখ্যাত বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কলিকাতায় শিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ দত্ত কায়স্থ বংশে জন্ম হয়। এই বংশ কতিপয় পুরুষ পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার 'দত্তডেরিয়াটন' গ্রাম হইতে আসিয়া শিমুলিয়ার অধিবাসী হন। বিবেকানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী ছিলেন এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী নিত্য শিব পূজা করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, মেধা, আর্ত্ত ও দুঃখীর প্রতি সমবেদনা ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হইত। কলেজে পড়িবার সময় বিখ্যাত দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেনসারকে তৎপ্রবর্ত্তিত দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ লিখিয়া পাঠাইয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময় হইতেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া তিনি ব্রাহ্ম সমাজে ও অন্যত্র ধর্ম্মানুসন্ধানে যাতায়াত করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার জিজ্ঞাসু মন তৃপ্ত হয় না। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত ও তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৮৮৬ খৃঃ ১৫ আগষ্ট রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করিলেন। ঐ বৎসর ২৪ ডিসেম্বর বর্দ্ধমান জেলার আটপুর গ্রামে গুরুভ্রাতা বাবুরাম ঘোষের বাড়ীতে তিনি, বাবুরাম ঘোষ ও অপর সাতজন গুরুভ্রাতাসহ গৃহত্যাগের চরম সংকল্প ও সন্ন্যাসাশ্রমের নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হন। অতঃপর কাশীতে যান ও

তথা হইতে তিনি পাঁচ বৎসর হিমালয়ে অতিবাহিত করেন। সেই সময় বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভার্থ একবার তিব্বতে যান। গুরু রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শিক্ষানবিশীযুগেও তিনি বুদ্ধদেবের মানব প্রেমের আকর্ষণে বুদ্ধগয়ায় যান। ১৮৯১ খৃঃ ফেব্রুয়ারীতে তিনি পরিব্রাজকবেশে আলোয়ার যান। পরে তথা হইতে জয়পুর, আজমীড়, ক্ষেত্রী, আহম্মদাবাদ, কাথিয়াড়, জুনাগড়, গুজরাট, পোরবন্দর, দ্বারকা, পলিতানা (কাম্বে), বরোদা, খাণ্ডোয়া, বোম্বাই, পুনা, বেলগ্রাম, বাঙ্গালোর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, মাদুরা, রামেশ্বর ও কন্যাকুমারীতে গমন করেন এবং সর্ব্বত্রই মহাসমাদরে অভ্যর্থনা লাভ করেন। ১৮৯২ খৃঃ তিনি রামনাদে আসিয়া তথাকার রাজা ও জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন।

১৮৯৩ খৃঃ ৩১শে মে চিকাগোর সর্ব্বধর্ম্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য বন্ধুগণের প্রদত্ত সামান্য পাথেয়ের উপর নির্ভর করিয়া বোম্বাই বন্দর হইতে সমুদ্র পথে আমেরিকা যাত্রা করেন এবং জুলাই মাসে চিকাগো সহরে উপস্থিত হন। ১৮৯৩ খৃঃ ১২ই সেপ্টেম্বর কার্ডিনাল গিবসন ধর্ম্মমহাসম্মেলনের উদ্বোধন করিলে তথায় হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতাগণ বিমুগ্ধ হন। এই সময় আমেরিকার প্রসিদ্ধ 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকার সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিলেন "হিন্দুদের ন্যায় পণ্ডিত জাতির মধ্যে খৃষ্টান প্রচারক প্রেরণ করা যে নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ, তাহা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণের পর অনুভব করিতেছি।" এই মন্তব্যের পর আমেরিকা ও ইউরোপে সাড়া পড়িয়া যায় এবং বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য বহুস্থান হইতে আহ্বান আসিতে থাকে এবং তাঁহার বক্তৃতায় বহু ব্যক্তি আকৃষ্ট হন।

১৮৯৬ খৃঃ তিনি ইংলণ্ডে যান। এখানেও তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া বহুলোকের শ্রদ্ধা লাভ করেন। এখানে বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার তাঁহার নিকট "Life and Sayings of Ram Krishna" নামক গ্রন্থ রচনার প্রেরণা লাভ করেন। লণ্ডনে তাঁহার কথাবার্ত্তায় মুগ্ধা হইয়া মিস্ মার্গারেট নোবেল নাম্নী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা বাঙলায় আগমন করেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া 'সিস্টার নিবেদিতা' নামে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজী বেলুড়ে "রামকৃষ্ণ মিশনের" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯ খৃঃ তিনি পুনরায় আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। এইবার তিনি আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো সহরে একটি বেদান্ত সোসাইটি ও একটি শান্তি আশ্রম স্থাপন করেন। ১৯০০ খৃঃ ফ্রান্সে "Congress of Religion" সভায় বক্তৃতা দিয়া

যশস্বী হন। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া কাশীতে ‘ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম’ ও ‘রামকৃষ্ণ আশ্রম’ স্থাপন করেন। ১৯০২ খৃঃ ৪ জুলাই সন্ধ্যাকালে সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া ধ্যানমগ্ন হন ও রাত্রি ৯টায় মহাসমাধি লাভ করেন। বহুভাষায় জ্ঞান, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ধর্মপ্রাণতা, অসাধারণ বাগ্মীতা, অপরিসীম গুরুভক্তি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। বেদান্ত ধর্মকে বিশ্বব্যাপী মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত। তাঁহার রচিত রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ,আত্মার স্বাধীনতা প্রভৃতি বহুগ্রন্থে ও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ অসংখ্য বক্তৃতায় তাঁহার প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। তিনি বলেন (১) জীবাত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম (২) বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আত্মার ঐ অব্যক্ত ভাবকে ব্যক্ত করাই পুরুষার্থ (৩) কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান অথবা ইহাদের একাধিক উপায়ে ব্রহ্মভাব লাভ করা যায়।

ত্যাগ ও সেবা ইহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং বেদান্তের ভিত্তিতে সার্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রচারে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। হিউম ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের অনুরক্ত অবিশ্বাসী যুবক নরেন্দ্রনাথ যখন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত সুরু করেন, তখন দেশের ইংরাজী শিক্ষিত অংশ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে মোহাচ্ছন্ন। অপর অংশ নিদ্রামগ্ন। ভারতের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যে সকল শ্বেতাঙ্গ শ্বেত জাতির পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য এ দেশে আসিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে অসভ্য ভারতীয়দের স্থানে একদল নকল সাহেব গড়িয়া তুলিবেন, তাঁহাদের স্বপ্নে প্রথম আঘাত হানিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ তাঁহার অনুগামীগণ। কিন্তু তাঁহাদের বাণী মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল যুবককে সজাগ করিয়াছিল। অপর দিকে বিবেকানন্দের বজ্র নির্ঘোষ সমগ্র জাতীয় আত্মাকে স্পর্শ করিল। রোম্যাঁ রোলাঁ বলিয়াছিলেন “ভারতের জাতীয় আন্দোলন দীর্ঘকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন ছিল। বিবেকানন্দের নিঃশ্বাসের প্রবাহে সেই বহ্নি শিখা-বিস্তার করিল ও তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর মধ্যেই ১৯০৫ খৃঃ তাহা দুর্ব্বার হইয়া উঠিল।”

২। প্রথম লর্ড এলগিন (১৮৬২-৬৩ খৃঃ) ৩। স্যার উইলিয়ম ডেনিসন (অস্থায়ী) (১৯৬৩-৬৪ খৃঃ)। স্যার জন লরেন্স (১৮৬৪-৬৯ খৃঃ)

লর্ড ক্যানিংএর পরবর্ত্তী ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলগিনের (১ম)

কার্য্যকালে পূর্ব্ববাঙলা ও মাতলা রেলপথ নির্ম্মিত হয় ও কলিকাতা হাইকোর্টে দেশীয় জজ নিয়োগের নিয়ম হয়। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় জজ নিযুক্ত হন। ১৮৬৩ খৃঃ এলগিন পরলোক গমন করায় ১৮৬৩ খৃঃ স্যার জন লরেন্স পরবর্ত্তী ভাইসরয় ও বড়লাট হন। ইনি আফগানিস্থান সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু ভুটিয়াগণ ইংরেজ দূতের অবমাননা করায় তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন (১৮৬৪ খৃঃ)। দেওয়ানগিরির যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ না হইলেও, শেষে বাৎসরিক বৃত্তির বিনিময়ে ডুয়ার অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া ভুটিয়ারা ইংরেজের সহিত সন্ধি করে (১৮৬৫ খৃঃ)।

এই সময় সেচ বিভাগ (Irrigation Department) ও রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়।

এইসময় স্যর সিসিল বিডন বাঙ্গালার ছোট লাট ছিলেন (১৮৬২-৬৭ খৃঃ)। এই সময় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় পাঠশালা সমূহের উন্নতিমূলক কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হয়। ১৮৬৩ খৃঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। ১৮৬৪ খৃঃ বাঙলার প্রধান প্রধান নগরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়।

৪। লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২খৃঃ)

পরবর্ত্তী ভাইসরয় ও বড়লাট লর্ড মেয়োর সময় সুয়েজ খাল খনিত হওয়ায় ভারত হইতে ইংলণ্ডে যাওয়া সহজ হয়। ১৮৬৯ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা কলিকাতায় আগমন করেন। লর্ড মেয়ো ভারত ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের এক নূতন নিয়ম করেন। তাহাতে আথিক ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পায়। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন, এবং কৃষিবিভাগ স্থাপন, রেলপথ নির্ম্মাণ ও খাল খনন, লোকগণনা প্রভৃতি দ্বারা দেশের উন্নতি সাধন করেন। দুঃখের বিষয় আন্দামান পরিদর্শনে যাইয়া এক পাঠান দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক ছুরিকাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন (১৮৭২ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী)। অতঃপর স্যারজন ষ্ট্রোণ্ট ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ও লর্ড নেপিয়র ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত অস্থায়ী বড়লাট হন। এই সময় স্যর উইলিয়ম গ্রে বাঙলার ছোট লাট ছিলেন (১৮৬৭-৭১ খৃঃ)।

৫। লর্ড নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬খৃঃ)

অতঃপর ১৮৭২ খৃঃ ৩রা মে হইতে লর্ড নর্থব্রুক বড়লাট হন। এইসময়

স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বাঙ্গলার ছোটলাট ছিলেন (১৮৭১-৭৪ খৃঃ)। ইঁহার সময় সবডেপুটী ও কানুনগো পদ সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হয়।

বড় লাট নর্থব্রুক কুশাসনের অভিযোগে বরদার গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করিয়া গাইকোয়াড়ের এক আত্মীয়কে রাজ্য প্রদান করেন। এইসময় যুবরাজ এডওয়ার্ড (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতে আগমন করেন (১৮৭৫-৭৬খৃঃ)। ইঁহার শাসনকালে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত ও আয়কর হ্রাস হয়। ১৮৭২ খৃঃ প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন।

৬। লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০খৃঃ)।

পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড লিটন সুসাহিত্যিক, কূটনীতিবিদ ও তৎকালীন ইংলণ্ডের রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলীর আস্থাভাজন ছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ তিনি দিল্লীতে এক বিরাট দরবার করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নূতন আইন অনুসারে রাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি ঘোষণা করেন। এই সময় অবাধ বাণিজ্য নীতি আরও প্রসারিত হয়; বিভিন্ন প্রদেশের সীমান্তে যে শুল্ক আদায়ের নিয়ম ছিল তাহা রহিত করা হয়, মোটা কাপড়ের উপর কর উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলির আথিক স্বাতন্ত্র আরও বৃদ্ধি পায়। তৎকালে ভারতীয় সিভিলসার্ভিসে প্রবেশ করা ভারতীয় যুবকদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। তাহাদিগকে উচ্চপদ লাভের সুযোগ দিবার জন্য লর্ড লিটন এদেশে statutory সিভিল সার্ভিসের প্রবর্ত্তন করেন। অপর পক্ষে তিনি 'প্রেস আইন' করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করেন ও 'অস্ত্র-আইন' করিয়া গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত যাহাতে কেহ অস্ত্র ব্যবহার করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করেন। ফলে দেশবাসীরা নিরস্ত্র হইয়া পড়ে। এই সময়ের প্রধান ঘটনা দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮-৮১ খৃঃ)। লর্ডলিটন আফগান সীমান্তে কোয়েটায় বৃটিশ সেনানিবাস স্থাপন করায়, আফগানীস্থানের আমীর সের আলী রুষ্ট হইয়া রাশিয়ার দূতকে আফগানীস্থানে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু ইংরেজ দূতকে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না (১৮৭৮ খৃঃ) তজ্জন্য ইংরেজ সরকার আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজ সৈন্য তিনটি পৃথকদলে বিভক্ত হইয়া আফগানীস্থানে প্রবেশ করিল। আমীর সের আলী পরাজিত হইয়া তুর্কীস্থানে পলায়ন করিলেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। তৎপুত্র ইয়াকুব খাঁ গণ্ডামকের সন্ধি দ্বারা

ইংরেজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন (১৮৭৯ খৃঃ)। তিনি পররাষ্ট্র ব্যাপারে ইংরেজদের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে এবং কাবুলে একজন ইংরেজ দূত রাখিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু এই শান্তি স্থায়ী হইল না। শীঘ্রই দুর্দ্ধর্ষ আফগানীরা কাবুলে ইংরেজ দূত ক্যাভাগনরী (Cavagnary) কে হত্যা করায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেনাপতি রবার্টস আফগানদিগকে পরাজিত ও ইয়াকুব খাঁকে নির্ব্বাসিত করিলেন।

এইসময় ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচনে উদারনৈতিক দলের জয় হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী পদত্যাগ করিলেন ও গ্লাডষ্টোন প্রধানমন্ত্রী হইলেন। লর্ডলিটনও আফগান যুদ্ধ অসম্পূর্ণ রাখিয়া পদত্যাগ করিলেন (১৮৮০ খৃঃ)।

লর্ড লিটনের সময়ে স্যর রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪-৭৭ খৃঃ) বাংলার ছোটলাট ছিলেন। এইসময় বাংলায় অনেকগুলি মহকুমা স্থাপিত হয়, এবং ১৮৭৬ খৃঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্ব্বাচন হয়।

৭। লর্ড রিপণ (১৮৮০-৮৪ খৃঃ)।

ছোটলাট—স্যর এসলি ইডেন (১৮৭৭-৮২ খৃঃ)।

অতঃপর উদারনৈতিক দলের সভ্য ও গ্ল্যাডষ্টোনের অনুবর্ত্তী লর্ড রিপন বড়লাট হইলেন (১৮৮০ খৃঃ)। আফগান যুদ্ধ তখনও শেষ হয় নাই। আমীর ইয়াকুবের নির্ব্বাসনের পর সের আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুর রহমান কাবুলে আমীর হইলেন। তিনি এই নিয়মে ইংরেজের সহিত সন্ধি করিলেন যে তিনি ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না। ইহাতেও আফগানীস্থানে শান্তি স্থাপিত হইল না। সের আলির পুত্র আয়ুব খাঁ সিংহাসন দাবী করিয়া মাইবন্দের যুদ্ধে ইংরেজসৈন্যকে পরাভূত করিলেন। কিন্তু সেনাপতি রবার্টস শীঘ্রই আয়ুব খাঁকে পরাজিত করিয়া আব্দুর রহমানকে পুনরায় কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৮৮১ খৃঃ)।

এই যুদ্ধের ফলে খেলাতের মুসলমান নৃপতি ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং বৃটিশ বেলুচিস্থান নামক নূতন প্রদেশ গঠিত হইল, কোয়েটায় স্থায়ী বৃটিশ সৈন্যাবাস স্থাপিত, বোলান গিরিপথ ইংরাজের অধিকারভুক্ত ও ইংরেজের রুশ ভীতি দূর হইল। ১৮৮০ খৃঃ পোষ্টকার্ডের ও মণিঅর্ডারের প্রচলন হয়।

১৮৮১ খৃঃ মহীশূর রাজ্য পুনরায় হিন্দুরাজাকে ফিরিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ বৎসরেই ভারতের লোকগণনা সুরু হয়। তদবধি দশ বৎসর পর পর লোকগণনা চলিতেছে।

এই সময় ফ্যাক্টরী আইন জারী হওয়ায় কারখানা সমূহে শ্রমজীবীদের কার্য্যকাল নিয়ন্ত্রিত হয় এবং 'ভার্ণাকুলার প্রেসএ্যাক্ট' রদ হয়। ১৮৮২ খৃঃ লবণশুল্ক ও বস্ত্রশুল্ক হ্রাস হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন প্রচলিত হওয়ায় ও প্রতি জেলায় জেলাবোর্ড ও প্রতি মহকুমায় লোক্যালবোর্ড স্থাপিত হওয়ায় জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পূর্ত্তবিভাগ আংশিকভাবে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়।

পূর্ব্বে উচ্চপদস্থ ভারতীয় বিচারকগণও ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার করিতে পারিতেন না। লর্ড রিপন ভারত সরকারের আইন-সভার সদস্য মিঃ ইলবার্টের উত্থাপিত "ইলবার্ট বিল" পাশ করাইয়া ঐ বৈষম্য কতকটা দূর করেন। এই বিশেষ নিয়ম হয় ভারতীয় বিচারকগণকে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারের সময় ইউরোপীয় জুরীর সহায়তা লইতে হইবে।

এইসময় স্যর এসলি ইডেন বাঙ্গলার ছোটলাট ছিলেন (১৮৭৭-৮২ খৃঃ)। এই সময় শিক্ষাবিভাগে সহকারী ইন্সেপেক্টরের পদ সৃষ্টি হয়। অতঃপর স্যর রিভার্স টমসন (১৮৮২-৮৭ খৃঃ) বাংলার ছোট লাট হইয়াছিলেন। ইহার সময় ১৮৮৫ খৃঃ বাংলার প্রজা স্বত্ব বিষয়ক আইন পাশ হয়।

৮। লর্ড ডাফরিণ (১৮৮৪-৮৮ খৃঃ)।

পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডফরিণ তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে (১৮৮৫-৮৬ খৃঃ) লিপ্ত হন এবং ব্রহ্মরাজ থিবকে পরাজিত করিয়া উত্তর-ব্রহ্ম বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করেন। এইসময় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় ভারতে তাঁহার স্বর্ণ জুবিলী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় (১৮৮৭ খৃঃ)। এই সময় স্যর ষ্টুয়ার্ট কলভিন (১৮৮৭-৯০ খৃঃ) বাঙ্গলার ছোটলাট ছিলেন।

১৮৫১ খৃঃ বাঙ্গলার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির উদ্যোগে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি রাজনীতি করিতেন। রামগোপাল নিমতলার শ্মশান ঘাট রক্ষা করিয়া, হরিশচন্দ্র নালকরের অত্যাচারে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণপাল বাঙ্গলার জমিদারদের পক্ষে দাঁড়াইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এইসময় মধুসূদন দত্ত হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ স্বাধীনতার গান গাহিয়া লোকের চিত্তে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ তাহাতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। এইরূপে ১৮৫৮ খৃঃ সিপাহী বিপ্লবের পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলার শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত

হইতে থাকে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল খ্যাতনামা রাজনারায়ণ বসুর রচিত একটি জাতীয় সভার অনুষ্ঠান পত্রের ভাবধারা অবলম্বন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় কলিকাতার নাগরিক নবগোপাল মিত্র কলিকাতায় "হিন্দু মেলা" (Hindu National Gathering) নামক একটি জাতীয় সভার প্রতিষ্ঠান করেন। এই হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য ছিল "সর্ব্বপ্রকার পরবশতা পরিহার করিয়া স্বাবলম্বন গুণটির উন্মেষ ও আত্মশক্তি ও ঐক্যবোধের বৃদ্ধি সাধন। ইহার উপায় স্বরূপ জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সঙ্গীতসভা, জাতীয় শিক্ষালয়, জাতীয় সভা ও জাতীয় ব্যায়ামাগারের প্রতিষ্ঠা প্রতিবৎসর হিন্দুমেলায় সমবেত হইয়া ঐ সকল বিষয়ের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা।" এইরূপে ইংরেজের সাম্রাজ্য নীতির ও শোষণ নীতির কুফল হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তা বোধ ক্রমশঃ জাগ্রত হইতে থাকে। অবশেষে ১৮৮৪ খৃঃ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীগণ "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের" প্রথম অধিবেশনে বোম্বাই নগরে মিলিত হইয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার রূপদানের চেষ্টা করেন[১]। এই অধিবেশনে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি সভাপতিত্ব করেন। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন যাহাতে বিপ্লবের পথে না গিয়া

১। এই কংগ্রেস অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান—এ. ও. হিউম (A. O. Hume)। তিনি এই কার্য্যে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডফরিণের অনুমোদন সংগ্রহ করেন। ইহাতে নানা প্রদেশের ৭২জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাঙলা হইতে উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র নাথ সেন (ইণ্ডিয়ান মিরর), জানকী নাথ ঘোষাল ও গিরিজা ভূষণ মুখোপাধ্যায় (নববিভাকর) যোগ দিয়াছিলেন। তখন ছিল "আবেদন নিবেদনের থালা"। কিন্তু কংগ্রেস ক্রমশঃ বল সঞ্চয় করিতে থাকে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন দাদাভাই নৌরোজির সভাপতিত্বে কলিকাতায় (১৮৮৬ খৃঃ), তৃতীয় অধিবেশন বদরউদ্দিন তায়েবজির সভাপতিত্বে মাদ্রাজে (১৮৮৭ খৃঃ), চতুর্থ অধিবেশন জর্জ ইউলের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে (১৭৮৮ খৃঃ), পঞ্চম অধিবেশন স্তর ওয়েডরবার্ণের সভাপতিত্বে (১৮৮৯ খৃঃ) বোম্বাইয়ে, ষষ্ঠ অধিবেশন স্তর পি মেহতার (১৮৯০ খৃঃ) সভাপতিত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর প্রতিবৎসর ইহার অধিবেশন হইতেছে।

নিয়মতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হয়, এইজন্য এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তৎকালীন ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের অনুমোদন লাভ করে।

৯। বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৪ খৃঃ)।

বাঙ্গলার ছোট লাট ১। স্যর ষ্টুয়ার্টকলভিন (১৮৮৭-৯০ খৃঃ), ২। স্যর চার্লস ইলিয়ট (১৮৯১-৯৩ খৃঃ) ৩। এন্টোনী প্যাট্রিক ম্যাকডোনেল (১৮৯৩-৯৭ খৃঃ) বড়লাট ল্যান্সডাউনের সময় ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে সিকিম, লুসাই পাহাড় ও শান রাজ্যে বৃটিশ প্রভাব বিস্তৃত হয়। মণিপুরের সেনাপতি কুমার টিকেন্দ্র জিতের বিদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও কাশ্মীরে ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। গিলগিট উপত্যকার কয়েকটি স্থান ইংরেজ রাজ্য-ভুক্ত হয় ও খেলাতের মুসলমান শাসক পদচ্যুত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থান ও ভারতের মধ্যসীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সীমারেখা "ডুরাণ্ড লাইন" নামে পরিচিত।

এই সময় 'ফ্যাক্টরী আইন' জারি করিয়া নারী শ্রমিকদের দৈনিক কার্য্যের সীমা ঠিক করিয়া দেওয়া হয়, এবং ভারতীয় কাউন্সিল আইন (১৮৯২ খৃঃ) দ্বারা ভারতীয়দিগকে রাজনৈতিক অধিকার দানের সূত্রপাত হয়।

১০। বড়লাট দ্বিতীয় লর্ড এলগিন (১৮৯৩-৯৯ খৃঃ)।

বাঙ্গলার ছোটলাট (১) স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি (২) স্যর সিসিল ষ্টীভেন্স (৩) স্যর জর্জ উডবর্ণ (১৮৯৮-১৯০২ খৃঃ) দ্বিতীয় লর্ড এলগিন প্রথম লর্ড-এলগিনের পুত্র ছিলেন। ইঁহার শাসনকালে অক্ষু (Oxus) নদী মধ্য এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৮৯৭ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৬০ বৎসর রাজত্ব পূর্ণ হওয়ায় ভারতে মহাসমারোহে তাঁহার হীরক জুবিলি উৎসব সম্পন্ন হয়।

১৮৯৩ খৃঃ ডিসেম্বরে স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী বাঙ্গলার ছোটলাট হন। তিনি পীড়িত হইলে ১৮৯৭ খৃঃ জুন হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্যর সিসিল ষ্টীভেন্স তৎপদে কার্য্য করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে স্যর জর্জ উডবর্ণ বাঙ্গলার স্থায়ী ছোটলাট হন। ১৮৯৭ খৃঃ ২৩শে জানুয়ারী বাঙলার প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্নিসাধক স্বামী বিবেকানন্দের তিনি জলন্ত উত্তর-সাধক ছিলেন। পনের বৎসর বয়সে স্বামিজীর রচনা পাঠে তাঁহার ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া সুভাষ নিজ জীবনের লক্ষ্য খুঁজিয়া

পান। স্বামিজীর সাম্যবাদের ভিত্তি ছিল অদ্বৈতবাদ। নেতাজী এই অদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করিয়াই ভারত সংগ্রামে অগ্রসর হন। তাঁহার মতে ভারতীয় সাম্যবাদ অগ্রসর হইবে সংগ্রাম ও সমন্বয়ের পথে। সমন্বয় হইবে প্রাচ্যের আত্মিক সাধনা ও পাশ্চাত্যের বস্তু সাধনার মধ্যে, সংঘর্ষ হইবে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে।

অনেক আগে স্বামীজী ইহা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন "মানব সমাজে পুরোহিত, যোদ্ধা, বণিক ও শ্রমিক—এই চারিবর্গ পর পর রাজত্ব করে। প্রথম তিনবর্ণের রাজত্ব শেষ হয়ে আসছে। এইবার চতুর্থ বর্ণের পালা। কেউ তাদের রুখতে পারবে না।" ইহা রুশ বিপ্লবের বিশ বৎসর আগের কথা। ১৯৩৮ খৃঃ হরিপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণে সমাজের দিক্ দর্শনে স্বামীজীর ঐ বাণী মূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। নেতাজি বলেন তাঁহার পরমাদ্বৈত কোন অবাস্তব সত্ত্বা নহে। কর্ম্মময় জীবনের মধ্যদিয়া মানব এই পরমাদ্বৈতকে লাভ করে। কর্ম্মজীবনে প্রতিপদক্ষেপে বিরোধ ও সংঘাত এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। বস্তুজগতের এই নিরন্তর সংঘাত ও সমন্বয়ের পথেই সেই পরমাদ্বৈতের বিবিধ অভিব্যক্তি প্রস্ফুট হইতেছে। নিষ্ক্রিয় মায়াবাদের নেশা ও জড়বাদের আত্মঘাতী মত্ততার বাহিরে আদর্শের সন্ধান দিলেন নেতাজী।

১১। বড়লাট লর্ড কার্জ্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খৃঃ)।

ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত সহানুভূতি না থাকায় বড়লাট কার্জ্জন জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রক্ষাই ছিল তাঁহার শাসনের মূলনীতি। তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকটি জেলা পাঞ্জাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ নামক চীফকমিশনারের শাসনাধীন একটি নূতন প্রদেশ গঠন করেন (১৯০১ খৃঃ)। কর্ণেল ইয়ংহাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে একটি সামরিক মিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু লাসা অধিকার করিয়াও এই মিশন কোন স্থায়ী রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করিতে পারে নাই। বরং তিব্বতকে চীনের সার্ব্বভৌমত্বের অধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। যাহা হউক তিনি পারস্যে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন।

ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়কে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যপদেশে জনসাধারণ হইতে পৃথক রাখিবার অভিসন্ধিতে লর্ডকার্জ্জন "ইম্পেরিয়াল ক্যাডেট কোর" গঠন করেন। বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা দেওয়া স্বীকারে তিনি চিরকালের জন্য নিজামের নিকট হইতে বিরার প্রদেশ গ্রহণ করেন।

তিনি "কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি" স্থাপন করিয়া ও "ভারতীয় পুরাকীর্ত্তি সংরক্ষণ" আইন প্রণয়ণ করিয়া জনগণের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে চেষ্টা করেন, অপরদিকে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪ খৃঃ) জারি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিতে চেষ্টিত হন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমনের পর, তৎপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসনারোহণের উপলক্ষে তিনি দিল্লীতে এক বিরাট দরবারের আয়োজন করেন (১৯০৩ খৃঃ)।

তিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কূটনীতির পরিচয় দেন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর বাঙ্গলাদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া। কিন্তু তাহার ফল বিপরীত হইয়াছিল। এতদিন বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা লইয়া বঙ্গদেশ গঠিত ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন সেই বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। পশ্চিমবঙ্গ-বিহার উড়িষ্যা লইয়া 'বঙ্গদেশ' এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশ গঠিত হইল। এই উপায়ে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজনীতিক চৈতন্য সম্পন্ন বাঙ্গালী জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়। প্রথম প্রদেশে হিন্দুর ও দ্বিতীয় প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকায়, উক্ত বিভাগের দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করা হইল। কিন্তু বাঙ্গালীরা এই বিভাগ সহজে মানিয়া লইল না। ইহা হইতে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল, তাহার তরঙ্গ সর্ব্বভারতে ছড়াইয়া পড়িল। দেশের এই অবস্থায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন পদত্যাগ করিলেন। "পূর্ব্ববঙ্গ-আসাম" প্রদেশের ছোটলাট পদে নিযুক্ত হইয়া স্তর বমফিল্ড ফুলার এই প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতি সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদিগকে লেলাইয়া দিয়া হিন্দুদের প্রতি জঘন্য অত্যাচার চালাইতে লাগিলেন।

এইরূপে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভেদ নীতি, পীড়ন নীতি ও তোষণ নীতিকে আশ্রয় করিয়া চলিতে লাগিল। মুক্তিকামী ভারতবাসীর একদল বিপ্লবের পথে অপর দল কংগ্রেসী আবেদন নিবেদনের পথে এবং আরও পরে মহাত্মাজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অনুগামীগণকে লইয়া অহিংস সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্যের পথে ইংরেজের কঠোর শাসন ও ততোধিক নির্ম্মম শোষণ হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াস পাইতে থাকেন।

১২। দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো (১৯০৫-১০ খৃঃ)।

লর্ড কার্জ্জনের পরবর্ত্তী বড়লাট দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো প্রথম লর্ড মিণ্টোর

প্রপৌত্র ছিলেন। তাঁহার সময় ১৯০৬ খৃঃ কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজী স্বরাজ মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

ভারত সচিব লর্ড মর্লে ও বড়লাট লর্ড মিণ্টোর তোষণ নীতির ফলস্বরূপ "মর্লে মিণ্টো" শাসন-সংস্কার আইনটি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন দ্বারা ভারতীয় ও প্রাদেশিক সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

একজিকিউটিভ কাউন্সিল বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ ব্যতীত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আরও ৬০ জন পর্য্যন্ত, এবং বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় আরও ৫০ জন পর্য্যন্ত এবং পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভায় আরও ৩০ জন পর্য্যন্ত সভ্য গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। প্রত্যেক ব্যবস্থাপক সভায় তিনশ্রেণীর সভ্য থাকিবার নিয়ম হইল। (১) সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারী কর্ম্মচারী, (২) সরকারের মনোনীত বেসরকারী সভ্য, (২) ভারতীয়গণের নির্ব্বাচিত বেসরকারী সভ্য।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা অপর দুই শ্রেণীর সমবেত সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা অধিক, এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সমবেত সভ্যসংখ্যা প্রথম শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইবে। কেবল বাংলায় তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা অপর দুই শ্রেণীর সমবেত সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইল। লর্ড কার্জ্জন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। এই শাসন সংস্কারের সর্ব্বাপেক্ষা কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল অংশ হইল সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা, যাহার ফলে হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভাব সৃষ্টি হইল। ভারতীয় প্রতিনিধিদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া শাসনকার্য্য চালাইবার ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকিয়া যাওয়ায় সমস্ত সংস্কার ব্যাপার অর্থহীন হইয়া গেল।

১৯০৭ খৃঃ ভারত সচিবের কাউন্সিলে স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামীকে ও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে স্যর সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহকে ভারতীয় সভ্য হিসাবে লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া একশ্রেণীর ভারতবাসীর সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করা হইল।

মর্লে মিণ্টো শাসন সংস্কার লর্ড মিণ্টোর আমলে কার্য্যকরী হয় না। উহা পরবর্ত্তী বড়লাটের সময় কার্য্যকরী হয়। এই শাসন-সংস্কার দায়িত্বমূলক না হওয়ায় রাজনৈতিক আন্দোলন প্রশমিত না হইয়া প্রবলতর হইল। ১৯০৯ খৃঃ ১লা জুলাই অমৃতসরের মদনলাল ধিংড়া লণ্ডনে লর্ড মর্লির সহকারী উইলিয়াম

কার্জ্জনকে গুলী করিয়া হত্যা করিল।

১৩। বড়লাট দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৬ খৃঃ)।

বাঙলার গভর্ণর—লর্ড কারমাইকেল (১৯১২-১৭ খৃঃ)।

পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (২য়) প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জের পৌত্র ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড পরলোকগমন করায় তৎপুত্র পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাট হন। এই নূতন সম্রাট ১৯১১ খৃঃ ভারতে আগমন করিলে দিল্লী দরবারে সম্বর্ধিত হন এবং তদুপলক্ষে তিনি তোষণ নীতি অবলম্বন করিয়া বঙ্গভঙ্গ রহিত করিয়া দেন। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীরা বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আহত করে। এই ঘটনার পর ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে বাঙালীদের এক্তারের বাইরে বহুদূরে দিল্লীতে অপসারিত হয় এবং কৌশলে ভেদ বহাল রাখিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ মিলিয়া বাঙলা দেশ নামে একটি প্রদেশ, উড়িষ্যা ও বিহার লইয়া একটি ও আসামকে লইয়া অপর একটি প্রদেশ গঠিত হয়। ১৯১১ খৃঃ বাঙলায় ও ১৯১২ খৃঃ বিহার উড়িষ্যায় একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হয়। বাঙলার এই নব গঠিত একজিকিউটিভ কাউন্সিলে একজন দেশীয় সভ্য নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং তদনুসারে বাবু কিশোরী মোহন গোস্বামী ইহার প্রথম সভ্য নিযুক্ত হন।

এই সময়ে ১৯১৩ খৃঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হন। যাহাতে চীন দেশ হইতে কোন গোলযোগের সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য ১৯১৪ খৃঃ ভারত ও তিব্বতের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা স্থির করার জন্য ভারত, তিব্বত ও চীন সরকারের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। ভারতের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব স্যার হেনরী ম্যাকমেহন, তিব্বতের পক্ষে লাঞ্চেন সাত্রা ও চীনের পক্ষে আইভান চেন ঐ সীমা স্থির করিয়া একটি সন্ধিপত্রে তিন পক্ষই স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধিতে তিব্বতকে ইনার টিবেট ও আউটার টিবেটে ভাগ করিয়া আউটার টিবেটের উপর তিব্বতের সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। ভারত ও তিব্বত সরকার ঐ সন্ধিপত্র অনুমোদন করেন। কিন্তু ঐ সন্ধিপত্রে ইনার ও আউটার বিভাগ বিষয়ে মতদ্বৈধতার জন্য অন্যান্য বিষয়ে তাহার সম্মতি থাকা সত্ত্বেও চীন সরকার উহাতে অনুমোদনসূচক স্বাক্ষর দেন না। তিব্বত ও ভারতের ঐ মধ্যবর্ত্তী সীমা রেখা যাহা ম্যাকমেহন লাইন নামে পরিচিত হয় তাহাতেও চীন সরকার কোনই আপত্তি করেন না। এই ম্যাকমেহন লাইনের দক্ষিণ হইতে আসামের সীমা পর্য্যন্ত অঞ্চলটি ভারতের 'নেফা অঞ্চল' (N. E. F A.) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে আবর, দাফ্‌লা প্রভৃতি আদিবাসীগণের বাস।

ইহাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। এখানে ডিহং, লোহিত ও সুবর্ণশ্রী নদী প্রবহমান।

এই সময় ১৯১৪ খৃঃ সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্য ক্ষুধার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ভারত সরকারের যোগে এই যুদ্ধে ইংরেজ প্রচুর অর্থ ও সৈন্য ভারত হইতে গ্রহণ করে। ১৯১৫ খৃঃ মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকা আন্দোলন শেষ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং আহম্মদাবাদে একটি "সত্যাগ্রহ আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১৫ খৃঃ বিপ্লব দমনের চেষ্টায় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়। আসামী ছিল ৬১ জন। ১৯১৫ খৃঃ ১৫ই নবেম্বর মামলা সেসনে সোপর্দ্দ হয়। মোকর্দ্দমার বিচারে ২৪ জনের ফাঁসীর হুকুম হয়। ২৭ জনের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ৬ জনের কারাদণ্ড হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ পরে ফাঁসীর আসামীদের ১৭ জনের দণ্ড দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্ত্তিত করেন।

গণেশ বিষ্ণু পিলে, বিষণ সিং, সুরণ সিং (১ম), হরণাম সিং, কর্ত্তার সিংএর ফাঁসী হয়। বলবন্ত সিং, ভাই পরমানন্দ, রামশরণ দাস, মোহন সিং প্রভৃতির দ্বীপান্তর হয়।

১৪। লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (১৯১৬-২১ খৃঃ)।

অতঃপর লর্ড চেমসফোর্ড বড় লাট হইয়া আসিলেন। তখনও প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ চলিতেছিল। সেই সুযোগে রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা এক গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া কেরেনস্কির নেতৃত্বে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া গণতন্ত্রের জন্মদান করে। মার্কসবাদী লেলিনের নেতৃত্বে বলশেভিক (কমিউনিষ্ট) দল এই বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯১৭ খৃঃ ৭ই নবেম্বর মার্কসবাদী লেলিনের দল প্রবল হইয়া কেরেনস্কির দলকে বিতাড়িত করিয়া শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে। রাষ্ট্রের সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক হইল এই সোভিয়েট রাষ্ট্র। ইতিমধ্যে ভারতের জনগণও নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহাদের হস্তে স্বাধীনতার আন্দোলন নানা পথে অগ্রসর হইতেছিল। ১৯১৬ খৃঃ বাল গঙ্গাধর তিলক ও আনি বেশান্ত একই রাজনীতিক উদ্দেশ্যে দুইটি পৃথক হোমরুল লীগ স্থাপন করিয়া আন্দোলনের মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করেন। ১৯২০ খৃঃ ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ খৃঃ তিলকের নেতৃত্বে জাতীয় দল কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু ১৯১৬ খৃঃ কারামুক্ত তিলক ও আনি বেশান্তের উদ্যোগে কংগ্রেসের অধিবেশনে পুনরায় মিলনের বাণী ঝঙ্কৃত হয়। ১৯১৭ খৃঃ

কলিকাতা কংগ্রেসে বেশান্তের সভানেতৃত্বে নরমপন্থীদল কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া লিবারেল দল নামে নূতন দল গঠন করায় কংগ্রেস জাতীয় দলের করায়ত্ত হইল। অপর দিকে আন্দোলনের বেগ রোধ করিবার অভিপ্রায়ে ১৯১৯ খৃঃ লর্ড চেমস্ ফোর্ড ও ভারত-সচিব মণ্টেগু মিলিত হইয়া ভারতের জনগণের তুষ্টির জন্য অপর একটি শাসনতন্ত্র (Government of India Act 1919) রচনা করেন। এই শাসনতন্ত্রকে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। ১৯২১ খৃঃ এই শাসন কার্য্যকরী হয়। এই শাসনতন্ত্র দ্বারা (১) ভারত সচিবের কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যা ও ভারত সচিবের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। (২) ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধান, ভারত গভর্ণমেণ্টের দ্রব্যাদি ক্রয়, সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন ও পেন্সন দান প্রভৃতির জন্য ইংলণ্ডে একজন হাই-কমিশনার নিযুক্ত হন। (৩) সমর বিভাগ, পোষ্টঅফিস, রেলওয়ে প্রভৃতি ভারত সরকারের নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে। (৪) প্রাদেশিক শান্তিরক্ষা, বিচার বিভাগ স্বায়ত্ত শাসন, কৃষিশিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগগুলি প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃ'ত্বাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। (৫) বৈদেশিক ব্যাপারেও দেশীয়রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি স্বয়ং বড়লাটের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

সর্ব্বভারতীয় আইনসভার দুইটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়। উচ্চতর কক্ষের নাম রাষ্ট্রীয়সভা (Council of States) ও নিম্ন কক্ষের নাম ব্যবস্থাপক সভা। রাষ্ট্রীয় সভার সভ্যসংখ্যা ৬০ জন। তন্মধ্যে ৩৪জন জনসাধারণের নির্ব্বাচিত ও ২৬ জন বড় লাটের মনোনীত। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা ১৪৫ জন, তন্মধ্যে ১০৫ জন জনসাধারণের নির্ব্বাচিত, ৪০ জন বড় লাটের মনোনীত। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের নিয়ম বলবৎ রাখা হয় এবং বড়লাট প্রয়োজন বোধ করিলে উভয় সভার মতামত উপেক্ষা করিয়া নিজ বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করিবার অধিকারী থাকেন। রাষ্ট্রিয় সভার সভাপতি বড়লাট কর্তৃ'ক নিযুক্ত হইবেন। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ঐ সভাকর্ত্তৃক সভ্যদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

বড়লাটের কার্য্যকরী সভা (Executive Council)য় সাত জন সভ্য থাকিবে—তন্মধ্যে তিনজন হইবে ভারতীয়। কার্য্যকরী সভায় সভ্যগণ ভারতীয় রাষ্ট্রসভা ও ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সভ্য রহিবেন কিন্তু তাঁহারা উক্ত সভাদ্বয়ের নিকট দায়ী থাকিবেন না—পূর্ব্ব'বৎ বড়লাট ও ভারত সচিবের নিকট দায়ী থাকিবেন।

ইতিপূর্ব্বে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ গভর্ণর শাসিত হইয়াছিল। এক্ষণে বিহার-উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশের শাসনকর্ত্তা ও গভর্ণর হইলেন।

স্থির হইল যে গভর্ণর শাসিত প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে। এই সভার সভ্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।

(১) গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত সরকারী কর্ম্মচারী, (২) গভর্ণরের মনোনীত বেসরকারী সভ্য, (৩) জনসাধারণের নির্ব্বাচিত সভ্য। নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সংখ্যা অপর দুই শ্রেণীর সমবেত সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইবে ।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯১৮ খৃঃ আন্দোলন দমন করিবার জন্য কুখ্যাত 'রাউলাট আইন' জারী হয়। এই আইনের বশে যে কাহাকেও বিনাবিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ করা যায়। এই দমনমূলক আইনের প্রতিবাদে ১৯১৯ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল অমৃতসহরের জালিয়ান ওয়ালা বাগে যে সভা হয় তাহাতে ব্রিগেডিয়ার জেনারল ডায়ার কর্ত্তৃক প্রায় ১০ হাজার নিরস্ত্র শান্ত নরনারীদের উপর গুলি বর্ষণের ফলে ৪০০ লোক হত ও প্রায় ১০০০ লোক আহত হয়। আবার এই সময়েই উচ্চ শিক্ষায় সরকারী প্রভাব বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে স্যর স্যাড্‌লারের সভাপতিত্বে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে' নিযুক্ত হয়।

এই সকল গোলযোগের মধ্যে ১৯১৯ খৃঃ আফগান আমীর আমানুল্লা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করেন। ইহা তৃতীয় আফগান যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধাবসানে ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক আভ্যন্তরীণ শাসন ও পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমীরের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল ও আমানুল্লা রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন।

এই সময় লর্ড রোনাল্ডসে বাঙলার গভর্ণর ছিলেন (১৯১৭—২২)।

১৫। বড়লাট লর্ড রেডিং (১৯২১-২৬)।

বাঙলার লাট—লর্ড লিটন (১৯২২-২৬ খৃঃ)।

অতঃপর লর্ডরেডিং বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি রাউলাট আইন রহিত করিয়া ভারতীয় কলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর ধার্য্য শুল্ক তুলিয়া দিয়া ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বিচার বৈষম্য কিয়ৎ পরিমাণ দূর করিয়া জনআন্দোলন শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার মতের বিরুদ্ধে লবণশুল্ক বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের বিরাগভাজন হন। তাঁহার শাসনকালে "ভারতীয় নৌ-বাহিনী গঠন আরম্ভ হয়।
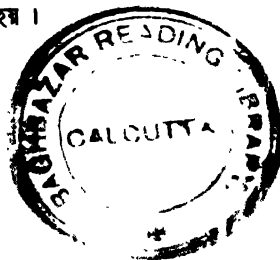
১৬। লর্ড আরউইন (১৯২৬-৩১ খৃঃ)।

১৭। লর্ড উইলিংডন (১৯৩১-৩৬ খৃঃ)।

১৮। লর্ড লিনলিথগো (১৯৩৬-৪৩ খৃঃ)।

১৯। লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-৪৭ খৃঃ)।

লর্ড আরউনের সময় ১৯২৭ খৃঃ স্যার স্ট্যানলী জ্যাক্‌সন বাঙলার গভর্ণর হন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড আরউনের শাসন কাল হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড-ওয়াভেলের শাসনের শেষ পর্য্যন্ত এই ২২ বৎসর উপরোক্ত চারিজন বড়লাটের শাসন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্য্যায় রূপে স্মরণীয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে শিক্ষিত ভারতবাসীগণ কংগ্রেসের মধ্য দিয়া ভারতের শাসন কার্য্যে কিছু কিছু অংশ লাভের আন্দোলন চালাইতেছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ কংগ্রেসের মধ্য হইতে এক দল বামপন্থী ভারতে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য বিদেশী সরকার দমন নীতি অবলম্বন করিতে উদ্যত হওয়ায় সরকারের সহিত ভারতীয়দের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া গঠিত তৎকালীন বঙ্গদেশ ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রগামী থাকায় বঙ্গদেশেই স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল ছিল। বঙ্গদেশের এই প্রভাব খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বড়লাট লর্ড কার্জ্জন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, তখন বাঙালীরা তাহা মানিয়া লইল না। তাহারা এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিল তাহা "স্বদেশী আন্দোলন" নামে পরিচিত। স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্য, বিশেষ করিয়া স্বদেশে প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের মধ্যদিয়া এই আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। দেখিতে দেখিতে বহ্নিশিখার ন্যায় এই আন্দোলন সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও ক্রমশঃ দুর্ব্বার হইয়া উঠে। সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বিপিন চন্দ্র পাল, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গালীর নেতাগণ বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠের" "বন্দে মাতরম্‌" সংগীতকে এই আন্দোলনের বীজমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিলেন। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ উভয় বঙ্গের মধ্যে রাখীবন্ধনের উদ্বোধন করিলেন।

বিদেশী সরকার জনমত শান্ত না করিয়া এই আন্দোলন দমন করিবার উদ্দেশ্যে পীড়ননীতি অবলম্বন করায় আন্দোলন গুপ্তপথে চালিত হইল। কৃষ্ণনগরে যতীন মুখার্জি সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে বরোদারাজ্যে গমন করিলেন। তখন সৈন্য বিভাগের প্রবেশ দ্বার বাঙালীর জন্য উন্মুক্ত ছিলনা। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তখন শিক্ষা-সচিব ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় "যতীন্দ্র উপাধ্যায়"

এই ছদ্মনামে যতীন মুখার্জি তথায় মিলিটারীতে ঢোকার সুযোগ পাইলেন। এই সময় শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শে বাংলায় বিপ্লবকেন্দ্র স্থাপনের কল্পনা করিতেছিলেন। তিনি যতীনকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। যতীন সামরিক শিক্ষা শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াই বিপ্লব সমিতি গঠনে লাগিয়া গেলেন। সতীশ বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য বারীন ঘোষ এই সমিতিতে যোগ দিলেন, নৈহাটির বিখ্যাত মিত্র পরিবারের ব্যারিষ্টার পি, মিত্র (১৮৫৩-১৯২৯ খৃঃ) সুরেন্দ্র ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাস, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। এইরূপে কলিকাতা অনুশীলন সমিতি গড়িয়া উঠিল। ঢাকায় পুলিন বিহারী দাস অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করিলেন। ক্রমে যুগান্তর সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি প্রভৃতি বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতিতে দেশ ছাইয়া গেল।

এই সময়ে যাদবপুরে 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ' গঠিত হইল। বিখ্যাত এটর্ণি ও বৈদান্তিক হীরেন্দ্র নাথ দত্ত তাহার সভাপতি হইলেন। গৌরিপুরের ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ও রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি অর্থ সাহায্য করিতে আসিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বরোদারাজের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ইহার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে এক্ষণে যাহা 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়' তাহার গোড়াপত্তন হইল। ১৯০৭ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর বিপ্লবীরা মেদিনীপুরের নিকট ছোট লাটের গাড়ীতে একটি বোমা নিক্ষেপ করে। ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পৃষ্ঠদেশে পিস্তলের গুলি মারিয়া তাঁহাকে আহত করা হয়। ১৯০৮ খৃঃ এপ্রিল মাসে চন্দননগরের মেয়রের জীবননাশের চেষ্টা হয়। ঐ এপ্রিল মাসেই অত্যাচারী জজ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী ও মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুরে যাইয়া একটি গাড়ীতে বোমা ফেলিয়া ভুলক্রমে মিসেস ও মিস কেনেডিকে নিহত করে। প্রফুল্ল পুলিশের হাতে ধরা না দিয়া স্বহস্তে পিস্তলের গুলি চালাইয়া আত্মাহুতি দেয়। কিন্তু ক্ষুদিরাম পুলিশের দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জ্জীর হাতে ধরা পড়িয়া ফাঁসীকাষ্ঠে জীবন দান করে। ইহারাই বিপ্লবী যুগের প্রথম আত্মোৎসর্গকারী। ইহার পর ২রা মে কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মানিকতলার পৈতৃক বাগানে খানাতল্লাসী করিয়া পুলিস বহুসংখ্যক বোমা, পিস্তল ডিনেমাইট ও কার্ট্রিজ হস্তগত করে। ফলে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, তাঁহার ভ্রাতা বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, উল্লাসকর দত্ত, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হেম কাননগো, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ৩৮ জন আসামী পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আলিপুর জজ কোর্টে বিচারার্থ প্রেরিত হন। উদীয়মান ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস (পরে

দেশবন্ধু) এই মোকর্দ্দমায় আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু অন্যতম আসামী নরেন্দ্র গোস্বামী রাজসাক্ষী হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে অপর আসামী চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু জেলহাজতে থাকিয়াই গোপনে বাহির হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া সেই পিস্তলের গুলিতে রাজসাক্ষী নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যা করে। ১৯০৮ খৃঃ পুলিশের দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জ্জী কলিকাতায় বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হয়। ১৯০৯ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী খুলনা জেলার শোভনা গ্রামের চারুচন্দ্র বসু আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলি করিয়া হত্যা করে। চারু চন্দ্রের ফাঁসী হয়। অবশেষে আলিপুরের জজ সি, পি, বীচক্রফ্‌টের বিচারে ১৯০৯ খৃঃ ৫ই মে শ্রীঅরবিন্দ[১], দেবব্রত, নিখিলেশ্বর, হেমচন্দ্র-

১। ১৮৭২ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন। ঋষি রাজ নারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতা দেবী তাঁহার মাতা ও সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁহার পিতা ছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ লণ্ডনে স্থাপিত 'কমল ও কৃপান' নামক গুপ্ত সমিতিতে তিনি যোগদান করেন। এই সমিতির সদস্যগণকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে তাঁহারা প্রত্যেকে ভারতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্যে প্রাণপণ করিবেন।

১৮৯৩ খৃঃ বরদা রাজ্যের চাকুরী লইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ১৯০৬ খৃঃ যখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া বিপ্লবী রাজনীতিতে যোগ দিলেন। তখন তিনি বরদা রাজ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৯০১ খৃঃ রাঁচি প্রবাসী ভূপাল বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। ১৯০৭ খৃঃ শ্রীঅরবিন্দের প্রধান প্রচেষ্টা হইল বাঙলার স্বাধীনতাবাদী দলকে সুরাট কংগ্রেসে জয়যুক্ত করা। এই অধিবেশনে চরমপন্থীদের নেতা ছিলেন লোকমান্য তিলক। অধিবেশন বসার আগেই চরমপন্থী স্বাধীনতাবাদীর দল শ্রীঅরবিন্দের সভাপতিত্বে স্থির করিলেন যে সভাপতি নির্ব্বাচনের সময়েই নরমপন্থীদের প্রস্তাবিত সভাপতির বিরুদ্ধে অন্য নাম প্রস্তাব করিবেন। তদনুসারে নরমপন্থীরা শ্রীরাসবিহারী ঘোষের নাম সভাপতিরূপে প্রস্তাব করামাত্র লোকমান্য তিলক পালটা প্রস্তাবে লালা লাজপৎ রায়ের নাম প্রস্তাব করিলেন। গোলমালে সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে এক নূতন শক্তির সৃষ্টি হইয়া থাকিল। অরবিন্দ অতঃপর তাঁহার স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য বরদা, বোম্বাই, নাসিক ও অমরাবতীতে গেলেন। এই সকল প্রচারের মধ্যে ১৯০৮ খৃঃ গোয়ালিয়র হইতে তাঁহার যোগগুরু লেলে আসিয়া তাঁহাকে যোগমার্গে আরও

ঘোষ, সতীন্দ্র সেন, নরেন্দ্র বক্সী, নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ, ধরণী গুপ্ত, নগেন গুপ্ত, পূর্ণ সেন, বীরেন ঘোষ, প্রভাস দে, দীনদয়াল, বিজন ভট্টাচার্য্য, কুঞ্জ সাহা ও হেম সেন মুক্তি লাভ করে। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসুর ফাঁসীর হুকুম হয়। বাকী আসামীদের মধ্যে হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ, বীরেন, বিভূতি, সুধীর সেন, ইন্দ্রনাথ, অবিনাশ ও শৈলেন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ ও নিরাপদ রায়ের ১০ বৎসর দ্বীপান্তর; অশোক, সুশীল, বালকৃষ্ণ হরিকেলের ৭ বৎসর দ্বীপান্তর ও কৃষ্ণ জীবনের এক বৎসর কারাদণ্ড হয়। পরে আপীলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের[১] চেষ্টায় বারীন ঘোষ

অগ্রসর হইয়া মনকে নির্ব্বিষয় করিতে উপদেশ দিলেন। ক্রমে এই অবস্থায় পৌঁছিবার ফলে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ক্রীড়নক বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রেম ও রাজনীতির ভিত্তিই ছিল আধ্যাত্মিকতার রসে ভরপুর। যুগান্তর ও বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তাঁহার দেশাত্মবোধ-পূর্ণ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া দেশের যুবকদের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিল। মাণিকতলা বোমার মামলার আসামীরূপে জেল-হাজত বাসের সময় তিনি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করেন। মোকর্দ্দমার বিচারে খালাস পাওয়ার পর তাঁহার সম্পাদনায় "কর্ম্মযোগীন" নামক ইংরেজী ও "ধর্ম্ম" নামক বাঙলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯১০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যগুলি চলিল। কিন্তু তারপর ভিতর হইতে সুস্পষ্ট আদেশ পাইয়া প্রথমতঃ চন্দননগরে, পরে ১৯১০ খৃঃ ৪ঠা এপ্রিল ডুপ্লে জাহাজে পণ্ডিচেরীতে চলিয়া গেলেন। এখানে তিনি তাঁহার সমুদ্রতীরবর্ত্তী ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীর আশ্রমে গভীর সাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া ১৯২৬ খৃঃ ২৪শে নভেম্বর সিদ্ধিলাভ করেন। এই দিনটির পর হইতে শ্রীঅরবিন্দ একেবারেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেলেন। তার পর বছরের পর বছর ধরিয়া বাহিরের সহিত তাঁহার যা কিছু আদান প্রদান ঘটিত তাহা শ্রীমায়ের মধ্যস্থতায়। শ্রীমা বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক পল রিশারের বিদুষী স্ত্রী শ্রীমতী মীরা রিশার। ১৯৫০ খৃঃ ৫ই ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করেন।

১। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৮৭০ খৃঃ (১২৭৭ সাল ২০শে কার্ত্তিক) নবেম্বর ১৪৮ নং রসা রোড (ভবানীপুর) বাটিতে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতা ভুবনমোহন দাস কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন। তাঁহাদের পৈতৃক বাস ঢাকা বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে ছিল। চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পাশ

ও উল্লাসকর দত্তের ফাঁসীর হুকুম রদ হইয়া তাহাদের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

এই ঘটনার প্রায় ৫০ বৎসর পরে (১৯৫৯ খৃঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর) আলিপুর জজ আদালতের ঐ আদালতের বিচার কক্ষে ইংরেজীভাষায় এই মর্ম্মে উৎকীর্ণ লিপি যুক্ত একটি মর্ম্মর ফলক স্থাপিত হয় যে "এই কক্ষে ১৯০৮-৯ খৃঃ ভারতের মুক্তি যোদ্ধাদের বিচার হয়। এই বীর যোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন 'দিব্য জীবনের' প্রবক্তা শ্রীঅরবিন্দ।"

এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে মর্লে-মিণ্টো বিরচিত শাসন সংস্কারমূলক যে আইন ১৯০৯ খৃঃ পার্লিয়ামেণ্টে পাশ হইল তাহাতেও সত্যকারের স্বাধীনতার কোন দাবী মিটানোর চেষ্টা হইল না। অপর পক্ষে ভেদনীতিমূলক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের নিয়ম করিয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করায় স্বাধীনতাকামী ভারতীয়রা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। ফলে আন্দোলন শান্ত হইল না। পাবনা জেলার অষ্টমনিষা গ্রামের সতীশচন্দ্র সরকার ও তাঁহার অনুগামী বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত বিপ্লবীদের দলভুক্ত ছিলেন। ধৃত বিপ্লবীদের প্রতি অমানুষিক নৃশংস যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য আলীপুরের তৎকালীন পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেডেণ্ট শামসুল আলম বিপ্লবীদের মনে জিঘাংসার উদ্রেক করে। যতীন মুখার্জ্জী বা বাঘা যতীনের নির্দ্দেশক্রমে সতীশ সরকার ও বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। একদিন হাইকোর্টের জজ হ্যারিংটনের এজলাস হইতে সিঁড়ি দিয়া যখন সে নামিয়া আসিতেছিল, সেই সময় বীরেন দত্তগুপ্তের পিস্তলের অব্যর্থ গুলির আঘাতে তাহার আচকান পরিহিত দীর্ঘ শ্মশ্রুযুক্ত লম্বা দেহ ধরাশায়ী হইল (১৯১০ খৃঃ

করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তিনি ব্যারিষ্টারীতে অসাধারণ ছিলেন। তিনি ভদ্রতায় ও আলাপে যেমন মধুর, সাহিত্য আলোচনা ও কাব্য রচনায় তেমনি সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার 'সাগরসংগীত' কাব্য অতীব হৃদয়গ্রাহী। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা ও ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১০-১২ খৃঃ) পরিচালনা তাঁহার অমর কীর্ত্তি (37 Cal p. 467 & 160 C. W. notes p. 705)।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ঢাকা অনুশীলন সমিতি ও তাহার মধ্যপাড়ার জ্ঞান বিকাশিনী সমিতি, নারায়ণগঞ্জ ব্রতী সমিতি ও শিরাজগঞ্জ সমিতি প্রভৃতি শাখার সভ্যগণ জড়িত হন।

২৪শে জানুয়ারী)। এইরূপে অত্যাচারী শামসুল নিহত হইল বটে, কিন্তু পুলিশের হস্তে ধৃত হইয়া অসমসাহসী বীরেনের প্রাণদণ্ড হইল। সতীশ সরকার পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া কোনরূপে পলায়ন করিয়া বাঁচিয়া গেল। সতীশ নিরাপদ হইবামাত্র প্রথমে অখিল মিস্ত্রী লেনের অন্যতম বিপ্লবী নেতা অবিনাশ চক্রবর্ত্তীকে খবর দিয়া শ্যামপুকুরে 'কর্ম্মযোগীন' অফিসে শ্রীঅরবিন্দের নিকট ছুটিয়া গেলেন। ভগ্নী নিবেদিতার নিকট অরবিন্দ পূর্ব্বেই গোপনে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে। শামসুল হত্যার সংবাদ পাইয়াই তিনি অবিলম্বে নৌকাযোগে চন্দননগরে ফরাসী অধিকারে গোপনে চলিয়া গেলেন। তথায় ভারতের অন্যতম মুক্তিসাধক 'প্রবর্ত্তক' আশ্রমের সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় তাঁহাকে তিনমাস প্রবর্ত্তকের কাঠগোলায় লুকাইয়া রাখিয়া সুকুমার মিত্রের সাহায্যে পাশপোর্ট যোগাড় করিয়া পণ্ডিচেরীতে যাইবার গোপন বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অরবিন্দ সৌম্যেন্দ্র ঠাকুরের ছদ্ম নামে পণ্ডিচেরীতে চলিয়া যান। হাওড়া গ্যাং কেসের সময় সুরেশ সরকারকে ধরিবার জন্য পুলিশ ৫০০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ওয়ারেণ্ট জারি করে। কিন্তু সফল হয় নাই।

১৯০৯ খৃঃ জানুয়ারীতে ঢাকা অনুশীলন সমিতি ও তাহার বরিশাল, ফরিদপুর ও ময়মনসিং শাখা বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯১০ খৃঃ জুলাই মাসে ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামের ডেপুটি বাড়ীর প্রসিদ্ধ লাঠি বিশারদ পুলিনবিহারী দাস ও তাঁহার দলের আশুতোষ দাসগুপ্ত, শান্তি মুখার্জ্জি, অক্ষয় দত্ত, নলিনীগুহ, অমরেন্দ্র ঘোষ মোক্তার, ললিত রায় উকিল, অশ্বিনী ঘোষ প্রভৃতি ৪৪ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হয় এবং আসামীদের কঠোর দণ্ড হয়। পুলিন দাস, আশুতোষ দাসগুপ্ত প্রভৃতির দ্বীপান্তর বাস ঘটে।

১৯১৪ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার দলের প্রতুল গাঙ্গুলী, মদন ভৌমিক, রমেশ চৌধুরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা দায়ের হয় ও বিচারে আসামীদের কঠোর দণ্ড হয়। দলের নেতা ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী মহারাজ ৩০ বৎসর জেলেই কর্ত্তন করেন।

পশ্চিম বঙ্গের যুগান্তর দলের ধ্বংসের পর চন্দননগরে বিপ্লব কেন্দ্র অপসারিত হয়। বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার রাসবিহারী বসু কাশীর শচীন সান্যালের সহযোগিতায় উত্তরভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু করেন। রাসবিহারী বসুর নির্দ্দেশে ১৯১২ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে আউধবিহারী, আমীরচাঁদ, বাল মুকুন্দ ও নদীয়া

জেলার বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসী হয় এবং রাসবিহারীর বিরুদ্ধে ১২০০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ওয়ারেণ্ট জারী হয়। এই সময় রাসবিহারী গোপনে লাহোরে, পরে কাশীতে, শেষে চন্দননগরে আসিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। এদিকে পুলিস তাঁহার খোঁজে সমস্ত উত্তরভারত উৎখাত করিতেছিল এবং ঐ অবসরে ভারতীয় সেনাদলে বৈপ্লবিক মনোভাব সৃষ্টির জন্য রাসবিহারী চন্দননগরে বসিয়া নূতন পরিকল্পনা রচনায় মনোনিবেশ করেন। এইখানে বসিয়াই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঘা যতীন ও মানবেন্দ্র রায়ের সহিত পরামর্শক্রমে তিনি কাশী ও লাহোর ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা স্থির করেন।

১৯১৪ খৃঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময় ইংরেজ সরকার ভারত হইতে স্বেচ্ছাক্রমে ৮ লক্ষ সৈন্য, ১৫০ কোটি টাকা ও বহু খাদ্য, বস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী গ্রহণ করে। ১৯১৪-১৫ খৃঃ জর্ম্মন ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হয়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতুল্লা, ভূপেন গুপ্ত, তারক দাস, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তি, হেরম্ব গুপ্ত ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। যতীন মুখার্জ্জির দলের চেষ্টায় ৫০ মজার পিস্তল ও ৪৬০০০ গোলাগুলি কাষ্টম হাউস হইতে বডা কোম্পানীর গুদামে লইয়া যাইবার সময় লুণ্ঠিত হয়। এই সময়ে সানফ্রান্সিসকোতে সংগঠিত হরদয়ালের গদর দল ও বাঙলার দলগুলির মধ্যে সংযোগ সাধিত হয়। ১৯১৪ খৃঃ নবেম্বর মাসে পিংলে ও সত্যেন সেন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসে। পিংলে উত্তর ভারতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে লাগিয়া যায়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে নরেন ভট্টাচার্য্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) বাটাভিয়াতে প্রেরিত হন। অবনী মুখার্জ্জী জাপানে যান। নরেন্দ্র ভটাচার্য্য বাটাভিয়ায় জর্ম্মন কন্সালের সহিত স্থির করেন যে তিনি ম্যাভারিক জাহাজে ৩০,০০০ রাইফেল ও ৪০০,০০০ রাউণ্ড গোলাগুলি সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নামক স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। যতীন মুখার্জ্জি, যাদুগোপাল মুখার্জ্জি, অতুল ঘোষ ও মানবেন্দ্র রায় ঐ সকল অস্ত্র লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গের হাতিয়া, পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা ও উড়িষ্যার বালেশ্বর হইতে এই বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে এইরূপ পরিকল্পনা স্থির হয়। ১৯১৫ খৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর যতীন মুখার্জ্জি পাঁচজন সঙ্গীসহ বালেশ্বরে গমন করেন। কিন্তু টেগার্টের গোয়েন্দা বিভাগ তাহাদের অনুসরণ করে। ৯ই সেপ্টেম্বর যতীন মুখার্জ্জি, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন দাসগুপ্ত, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী বালেশ্বরের বুড়াবালাম গ্রামে সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর সম্মুখীন হন। যতীন মুখার্জ্জি যুদ্ধে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, চিত্তপ্রিয় যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন, মনোরঞ্জন ও নীরেন

ধৃত হইয়া ফাঁসী কাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন করেন। পুলিস পক্ষেও অনেকে হতাহত হয়। এইরূপে ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া যাওয়ায় জর্ম্মন জাহাজ ফিরিয়া যায়।

১৯১৪ খৃঃ একদল শিখ কোমাগাটামারু নামক জাহাজে বজবজে উপস্থিত হয়। পুলিসের সহিত সংঘর্ষে তাহাদের ১৮জন নিহত ও ৩১ জন ধৃত হন। বাবা গুরুদিৎ সিংহসহ ৩০ জন পলায়ন করে। উত্তর ভারতে বান্নু হইতে কাশী পর্য্যন্ত অধিকাংশ দুর্গের দেশী সৈন্যগণ ১৯১৫ খৃঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে স্থির হয়। ১৯ বৎসর বয়স্ক কর্ত্তার সিং প্রত্যেক সৈন্যাবাসে বিদ্রোহের বাণী পৌছাইয়া দেয়। রাসবিহারী বসু লাহোর ও দিল্লীতে এই গোপন বার্ত্তা বহন করেন। শচীন সরকার কাশীর ভার লন। জব্বলপুরে নলিনী মুখার্জ্জি তাহার দলবল লইয়া আদেশের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু ১৮ই ফেব্রুয়ারী কৃপাল সিং নামক একব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ ঐ ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারায় বিপ্লবীদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কর্ত্তার সিং, আব্দুল্লা, পিংলে ধৃত হয়। রাসবিহারী বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর ছদ্মনামে আবশ্যকীয় পাসপোর্ট সংগ্রহ করিয়া জাপানে পলায়ন করেন। অতঃপর বেনারস ও লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা সরকার কর্ত্তৃক দায়ের হয়। শচীন সান্যাল, নগেন দত্ত প্রভৃতির দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। দামোদর স্বরূপ, গণেশলাল, নলিনী মুখার্জ্জি, প্রতাপ সিং, লছমীনারায়ণ, আনন্দ ভট্টাচার্য্য, বঙ্কিম মিত্র, কালীপদ, জিতেন সান্যাল বিভিন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ঢাকা হইতে ১৯১৭ খৃঃ অনুশীলন সমিতি গৌহাটিতে স্থানান্তরিত হয়। এখানে আসিয়াও পুলিসের অনুসরণ হইতে বিপ্লবীরা নিস্তার পায় না। পাহাড়ে পুলিসের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। নলিনী বাগচী ও প্রবোধ দাস পুলিসের লাইন ভেদ করিয়া আসাম হইতে বিহারে পলায়ন করে। পরে ১৯১৮ খৃঃ জুন মাসে ঢাকার ফলতা বাজারে পুলিসের সহিত যুদ্ধে নলিনী বাগচী ও তারিণী মজুমদার জীবন দান করে। বাঙলায় ১২০০ দেশভক্ত জেলে বন্দী হয়।

১৯১৮ খৃঃ প্রথম যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজকে দুর্ব্বল করিলেও মার্কিনের সহিত সেও জয়মাল্য অর্জ্জন করিল। অতএব বিজয়ী ইংরেজের দমননীতি শেষ হইল না। এই বৎসরেই ১৯১৮ খৃঃ ২রা ডিসেম্বর ইংলণ্ডের কিংস বেঞ্চের স্যার সিডন রাউলাটকে সভাপতি, কুমার স্বামী শাস্ত্রী ও প্রভাসচন্দ্র মিত্রকে মেম্বর করিয়া রাউলাট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে বড় লাট লর্ড চেমসফোর্ড রাউলাট আইন পাশ করিয়া (১৯১৯ খৃঃ মার্চ্চ) যে কোন ভারতীয়কে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার নীতি

গ্রহণ করিলেন এবং ইহার প্রতিবাদে ১৯১৯ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক শান্তিপূর্ণ সভায় সম্মিলিত বহু নিরস্ত্র নরনারীর উপর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার গুলি বর্ষণ করিয়া বহু নরনারীর প্রাণবধ করে। ১৯০৫ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৩০০টি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে এবং তাহাতে তিন হাজারের অধিক বিপ্লবী অংশ গ্রহণ করে।

গভর্ণমেণ্ট দমননীতি প্রত্যাহার না করায় জাতীয়তাবাদী দেশবাসীদের পক্ষেও গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করা আর সম্ভব হইল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাধি ত্যাগ করিলেন এবং আরও অনেকে সরকারী উপাধি বর্জ্জন করলেন। গুর্জ্জর কেশরী মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'অহিংস সত্যাগ্রহ' বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি লইয়া ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিলেন (১৯১৯ খৃঃ)।

১৯১৯ খৃঃ মতিলাল নেহরু অমৃতসরের কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হন। ১৯২০ খৃঃ মহাযুদ্ধের শেষে ইংরেজ ও মিত্রশক্তিগণ তুরস্কের সুলতানের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার না করায় ভারতে সৌকত আলি, মহম্মদ আলি ও আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরাও অসহযোগ আন্দোলনের সহিত খেলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

১৯২০ খৃঃ বিজয় রাঘব আচারিয়ারের সভাপতিত্বে নাগপুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁহার দলবলের উপস্থিতিতে মহাত্মার অসহযোগনীতি স্বীকৃত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজলাভই কংগ্রেসের নীতি বলিয়া পরিগণিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাস স্বয়ং অসহযোগ নীতিতে দীক্ষা লইয়া বাঙলায় ফিরিয়া আসিলেন এবং তিনি ও মতিলাল নেহরু ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় তরুণ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু[১] বিলাতের আই-সি-এস পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান

১। সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু কটকের সরকারী উকিল ছিলেন ও প্রভাবতী দেবী তাঁহার মাতা ছিলেন। ইহাদের আদি নিবাস চব্বিশ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রামে থাকিলেও তাঁহাদের কটকের বাসগৃহে সুভাষ ভূমিষ্ঠ হন। কটকেই তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব্ব সমাপ্ত হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, পড়িবার সময় মিঃ এফ, ওটেন নামক শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকের বর্ণ বিদ্বেষের প্রতিবাদ করার অপরাধে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু ১৯১৯ খৃঃ স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে দর্শন শাস্ত্রে

লাভ করিয়া পাশ করা সত্ত্বেও সরকারী চাকুরী গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে চিত্তরঞ্জনের পাশে স্থান গ্রহণ করিলেন। মেদিনীপুরের বীরেন্দ্র শাসমলও ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন (১৯২১ খৃঃ)।

১৯২১ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীর 'অসহযোগ' প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই সাতটি কার্য্য-পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইল—(১) সরকারী উপাধি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির মনোনীত সদস্যপদ ত্যাগ, (২) সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজ হইতে ছাত্রদিগকে সরাইয়া আনিয়া জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, (৩) সরকারী দরবার ও ভোজাদি বর্জ্জন (৪) সরকারী আদালত বর্জ্জন ও শালিসী আদালত স্থাপন, (৫) সরকারী সৈন্য, কেরাণী ও মজুররূপে মেসোপোটামিয়া না যাওয়া, (৬) কাউন্সিল ও এসেম্বলি বর্জ্জন, (৭) বিলাতী বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য বর্জ্জন ও স্বহস্তে চরকায় সুতাকাটা ও খদ্দর প্রস্তুত ও ব্যবহার।

এই সময় অসহযোগ আন্দোলনের দুশ্চিন্তা লইয়া বড় লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ভারত ত্যাগ করিলেন এবং লর্ড রেডিং বড় লাট হইয়া আসিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে রাউলাট আইন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে গান্ধীজীর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাশ হয়। যথা—তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা এক কোটি করিতে হইবে, সমগ্র ভারতে অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ চরকা চালাইতে হইবে।

১৯২১ খৃঃ ১৭ই নবেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজ বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করিলে গান্ধীজী ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল ঘোষণা করেন। তাহাতে বোম্বাই সহরে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। সৈন্যেরা গুলি চালাইয়া হাঙ্গামা বন্ধ করে। অনেক লোক হতাহত হয়। গান্ধীজী আত্মশুদ্ধির জন্য তিন দিন উপবাস করেন।

যুবরাজের অভ্যর্থনা বয়কট করায় ১৯২১ খৃঃ ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস,

অনার্স সহ প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হইয়া বি, এ, পাশ করেন। তৎপর বিলাতে যাইয়া ঐ খৃষ্টাব্দেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া চতুর্থ স্থান অধিকার ও ইংরেজী রচনায় প্রথম হইয়া সিভিল সার্ভিস পাশ করেন। ১৯২১ খৃঃ মে মাসে কেম্ব্রিজের ট্রাইপস পরীক্ষায় পাশ করেন কিন্তু চাকুরী তুচ্ছ করিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সুভাষচন্দ্র বসু, বীরেন শাসমল, পণ্ডিত মতিলাল, লালা লাজপৎ রায়, আবুল কালাম আজাদ, আলী ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি প্রধান প্রধান কংগ্রেস নেতাগণ ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঐ বৎসর ডিসেম্বরে আমেদাবাদের কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি জেলে থাকায় হাকিম আজমল খাঁ সভাপতি হন। সেবারেও নিরুপদ্রব আইন অমান্য নীতি গৃহীত হয় এবং মহাত্মাজি কংগ্রেসের ডিক্টেটর বলিয়া পরিগণিত হন।

১৯২২ খৃঃ জানুয়ারী মাসে মহাত্মা গুজরাটের বার্দ্দৌলী তালুকে 'আইন অমান্য' আরম্ভ করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামের কৃষক ও জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া থানা পোড়াইয়া দেয় এবং ২১জন পুলিশ কর্ম্মচারীকে হত্যা করে। ইহাতে মহাত্মাজি বিপ্লবী জনবিক্ষোভকে অহিংসার পথে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব মনে করিয়া ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বার্দ্দোলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা আহ্বান করিয়া আইন অমান্য পিকেটিং ও সভাসমিতি করা বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়। গভর্ণমেণ্ট ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ঐ অশান্তির জন্য মহাত্মাজিকে দায়ী করিয়া ১০ই মার্চ্চ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে এবং গুজরাটের সাহীবাগে বিচারপতি ব্রমফিল্ডের বিচারে তাঁহার ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা কারামুক্ত হইয়া ১৯২২ খৃঃ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে গয়া কংগ্রেসে মিলিত হইয়া কংগ্রেসের মধ্যে 'স্বরাজ্যদল' নামক একটি নূতন দল গঠন করেন। এইরূপে চিত্তরঞ্জনের যুগ আরম্ভ হইল। অতঃপর ১৯২৪ খৃঃ চিত্তরঞ্জন দাস কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন এবং সুভাষচন্দ্র বসু চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন। ১৯২৫ খৃঃ জানুয়ারী হইতে ১৯২৭ খৃঃ মে পর্য্যন্ত সুভাষবাবুকে বিনা বিচারে বর্ম্মার মান্দালয় জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। ১৯২৫ খৃঃ ১৬ জুন দেশবন্ধুর মৃত্যুতে কংগ্রেসের কর্ম্মধারার তৃতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয়।

১৯২৭ খৃঃ বড়লাট লর্ড আরউইনের (১৯২৬–৩১ খৃঃ) সময় নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন সংস্কারের ফলাফল বিবেচনা করিবার জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে মুক্তিপ্রাপ্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। কলিকাতার এই অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯২৪।৫ ফেব্রুয়ারী অসুস্থতার

জন্য কারামুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিও এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে গভর্ণমেণ্টের নিকট উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী করা হয়। এক বৎসরের মধ্যে ভারতকে উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রদত্ত না হইলে 'পূর্ণস্বরাজ' ভারতের দাবী হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সম্বৎসর মধ্যে কংগ্রেসের এই দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ সেপ্টেম্বর লাহোরের এক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী যতীন দাস নামক বাঙ্গালী বিপ্লবী লাহোর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সুভাষ বসু পুনরায় ৯ মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভারতের কোন রাজনৈতিক দলই ইহা গ্রহণ করে নাই। এই সালের আগষ্ট মাসে কারাগারে থাকা অবস্থায় সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে মনোনীত হন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অহিংসা নীতির সহিত বিপ্লববাদীদের কাজও চলিতে থাকে। ১৯২০ খৃঃ ঢাকা সহরে হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে 'স্বদেশী ভলাণ্টিয়ার্স দল' নামে এক শক্তিশালী বিপ্লবীদলের গোড়াপত্তন হইয়াছিল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বয়স্ক ছাত্র বিনয়কৃষ্ণ বসু এই স্বদেশী ভলাণ্টিয়ার্স দলে যোগ দিয়া বিপ্লব মঞ্চে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় বিনয় প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক ও আই. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ঐ স্বদেশী ভলণ্টিয়ার্স বিখ্যাত "বেঙ্গল ভলণ্টিয়ার্সে" পরিণতি লাভ করে।

বগুড়া সহরের "গণমঙ্গল"[১]কে কেন্দ্র করিয়া উত্তর বঙ্গের যাঁহারা স্বাধীনতার

১। ১৯২০ খৃঃ মহাত্মাজির আহ্বানে বগুড়া বারের উকিল এই গ্রন্থকার ও সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রমুখ অনেক উকিল কিছুদিনের জন্য ওকালতি ত্যাগ করিয়া মফঃস্বলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গণজাগরণের কার্য্যে ব্রতী হন। এই সময় উত্তরবঙ্গের অন্যতম নেতা যতীন্দ্রমোহন রায়ও শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সময়ে তাঁহারা আন্দোলনের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক হন। তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে এই গ্রন্থকার চাঁদা তুলিয়া নিজ নামে একখণ্ড ভূমি খরিদ করিয়া উদ্যোক্তাগণকে জানাইলে তাঁহারা তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ জমির উপর "গণমঙ্গল" প্রতিষ্ঠা করেন। বগুড়ার সেন পরিবারের মধ্যে এই

আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন রায়, সুরেশচন্দ্র গুপ্ত ও বগুড়ার সেন পরিবারের অবদান উল্লেখযোগ্য।

দিনাজপুরে খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত আন্দোলন চালাইয়া তিনি ও তাঁহার দলের অনেকে কারাবরণ করেন। ১৯৩০ খৃঃ ৩রা জুন মেদিনীপুরের দাসপুর থানার চেটুয়া গ্রামের হাটে একদল লোক বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতেছিল। দারোগা ভোলানাথ বাধা দিতে গিয়া জনতার হস্তে নিহত হন। ৭ই জুন মহকুমা হাকিম ফজলে করিম পুলিশ বাহিনী সহ তদন্তে আসিয়া নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণের আদেশ দেন। ঘটনাস্থলে চৌদ্দজন শহীদের রক্তে কংসাবতীর সৈকতভূমি রঞ্জিত হয়। মেদিনীপুর জেলে তখন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত আবদ্ধ।

১৯৩০খৃঃ ২৯শে আগষ্ট ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে নারায়ণগঞ্জের জল-পুলিসের অসুস্থ সুপারিণ্টেডেণ্ট এইচ, এস, বার্টকে দেখিবার জন্য বাংলার কারাগারসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল লোম্যান উপস্থিত। এমন সময় মেডিক্যাল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর বিনয়কৃষ্ণ বসুকে হাসপাতালের সম্মুখে দেখা গেল। অল্প দূরে হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়াইয়া লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সাহেব হড্‌সন্। অন্যের অলক্ষ্যে জামার পকেট হইতে বিনয় ছোট একটি পিস্তল বাহির করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দৃঢ়হস্তে পিস্তলের নিশানা ঠিক করিয়া লোম্যানকে অব্যর্থ সন্ধানে উপর্যুপরি তিনটি গুলি দ্বারা বিদ্ধ করিল। অত্যাচারী লোম্যান আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া গেল। গুলির শব্দে হতবুদ্ধি হডসন্ চোখ তুলিয়া তাকাইতেই বিনয়ের পিস্তল হডসন্‌কে লক্ষ্য করিয়া আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। পর পর দুইটি গুলি খাইয়া বিরাট-দেহ হডসন্ বিকট চীৎকার করিয়া ধরাশায়ী হইল। নিকটে দণ্ডায়মান সরকারী ঠিকাদার সত্যেন সেন বিনয়ের গুলি নিঃশেষিত হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু সত্যেনের নাকের উপর এক প্রচণ্ড ঘুসী মারিয়া নিজকে মুক্ত করিয়া বিনয় এক দৌড়ে স্কুলের মাঠে উপস্থিত হইল। তথা হইতে ডিসেক্‌সন রুমের পশ্চাদ্ভাগের দেওয়াল টপকাইয়া মেডিক্যাল মেসের সামনে আসিয়া পড়িল। তথা হইতে

লেখকের ভ্রাতা মহেন্দ্রচন্দ্র সেন, পুত্র শ্যামপদ সেন, ভ্রাতুষ্পুত্র সতীন্দ্র সেন ও খুল্লতাত ভ্রাতা নরেশচন্দ্র সেন দীর্ঘকাল অন্তরীনে আবদ্ধ ছিল। ১৯২১ খৃঃ সুভাষচন্দ্র বসু যখন বগুড়া সহরে উপস্থিত হন, তখন তিনি সদলবলে এই গ্রন্থকারের গৃহে পদার্পণ ও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারকে ধন্য করেন ও গণমঙ্গলে গমন করিয়া কার্য্যাদি দর্শন করেন।

পায়খানার ছাদ টপকাইয়া একটি বাড়ীর খোলা দরজা দিয়া আরমানীটোলার নির্জ্জন মাঠে ছুটিয়া আসিল। তারপর রাস্তায় আসিয়া একটি অপেক্ষমান ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া দ্রুতবেগে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বক্সীবাজারে তাহাদের পার্টির অন্যতম নেতা মণি সেনের বাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং তথায় মণি সেন ও সুপতি রায়ের সহিত মিলিত হইল।

সংবাদ পাইয়া যুব বাংলার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল সমগ্র ভারতের বিপ্লবীগণের মনে আশার সঞ্চার হইল। পুলিসের অত্যাচারও অসহনীয় হইয়া উঠিল। বিপ্লবী বিনয়ের গ্রেপ্তারের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইল। কিন্তু এক ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বিনয় ও সুপতি ঢাকা সহরের দোলাইগঞ্জ ষ্টেসন হইতে নারায়ণগঞ্জের পূর্ব্ব ষ্টেসন চাষড়ায় পৌঁছিয়া নারায়ণগঞ্জে এক গোপন গৃহে আশ্রয় লইল। পরদিন শেষ রাত্রে তথাকার বিপ্লববাদীদের সাহায্যে গ্রাম্য মুসলমানের ছদ্মবেশে নদীতীরে আসিয়া উভয়ে নৌকাযোগে অপরপারে বন্দরের উত্তর প্রান্তে পৌঁছিল। তথায় সুপতি ভদ্রলোকের পোষাক পরিল ও তাহার পশ্চাতে মুসলমান চাকরের বেশে বিনয় চলিতে লাগিল। মেঘনার তীরে আসিয়া একটি ছোট নৌকায় ফ্ল্যাগ ষ্টীমার ষ্টেসনে আসিল। তথায় সুপতি পুনরায় গ্রাম্য মুসলমানের বেশ ধারণ করিল এবং উভয়ে ভৈরব ষ্টেসনগামী ষ্টীমারে উঠিয়া কৃষক যাত্রীদের ভিড়ে আত্মগোপন করিয়া রহিল। যথাসময়ে ভৈরব ষ্টেসনে পৌঁছিয়া পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া টিকিট সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা-গামী ট্রেনে উঠিল এবং জগন্নাথ ঘাটে ষ্টীমারে উঠিয়া সিরাজগঞ্জের ঘাটে মুসলমান যাত্রীগণের সাথে নামিয়া নিরাপদেই ট্রেনের কামরায় উঠিয়া বসিল এবং যথাসময়ে কলিকাতায় আসিয়া বিনয় ৭০২ ওয়ালিউল্লা লেনের বিপ্লবী নেতা সুরেশ মজুমদারের গ্যারেজের দোতালার এক ঘরে সুরেশ মজুমদার, রসময় শূর, শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইল।

এই সময় মেদিনীপুর জেল হইতে মেজর সত্যগুপ্তকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা আসিয়া এলগিন রোডে বিপ্লবীদলের জি, ও, সি সুভাষচন্দ্র বসুর ভবনে উঠিলেন। তাঁহারা এই সময় রসময় শূরের সহিত পরামর্শ করিয়া 'রাইটার্স বিল্ডিং'এ হানা দিবার জন্য বিনয়কে নেতা নির্ব্বাচিত করিলেন। কিন্তু আপাততঃ কলিকাতার লর্ড সিংহ রোডের গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টি হইতে তাহাকে দূরে নিরাপদ স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল।

২রা সেপ্টেম্বর রাত্রি তৃতীয় প্রহরে হরিদাস দত্ত বিনয়কে ধানবাদে লইয়া যাইবার জন্য একটি মোটর গাড়ী লইয়া ওয়ালিউল্লা লেনের সেই গ্যারেজে উপস্থিত

হইলেন। এই হরিদাস দত্তই একদিন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান সাজিয়া রডা কোম্পানীর একগাড়ী মজার পিস্তল ও পঞ্চাশ হাজার কার্ত্তুজ লইয়া উধাও হইয়াছিলেন। দরজায় টোকা দেওয়া মাত্রই রঙিন সিল্কের পাঞ্জাবী, রেশমী লুঙ্গী ও মাথায় ফেজ টুপী পরিহিত বিনয় নামিয়া আসিয়া হরিদাস দত্তের সহিত গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী হুগলী জেলার চুঁচুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রধান কেরাণী বিপ্লববাদী সরোজ রায়ের বাসায় আসিয়া থামিল। সেখান হইতে সরোজ রায়ের কার্য্যকুশলতায় সন্ধ্যার পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ীতে রওনা হইয়া পুলিসের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহারা সরোজ রায়ের সঙ্গে ব্যাণ্ডেল ষ্টেসনে পৌছিল। যথাসময়ে সরোজ রায় তাহাদিগকে ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন। ধানবাদ ষ্টেসনে নামিয়া একখানা ট্যাক্সিতে উঠিয়া তাহারা কাটরাসগড়ে ভোরবেলা অনাথ দাসের বাড়ীতে আশ্রয় লইল। এখানে বিনয় অনাথ দাস ও তাঁহার স্ত্রীর আদরযত্নে দুইমাস কাটাইবার পর কলিকাতার দলের নির্দ্দেশে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। ওয়ালিউল্লা লেনে দুই দিন থাকিয়া সুরেশ মজুমদার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেলেঘাটা মেইন রোডে আসিল। এখানে পুলিসের নজর পড়ায় জি. ও. সির আদেশে রসময় শূর আসিয়া তাহাকে বজবজ রোডে বিপ্লবী রাজেন গুহের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

১৯৩০ খৃঃ ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংএ হানা দিবার দিন স্থির হইয়া গেল। আরও স্থির হইল, বিনয়ের নেতৃত্বে বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত ও সুধীর গুপ্ত (বাদল) এই অভিযান চালাইবে। ইতিমধ্যে প্রফুল্ল দত্ত ও ফণি গুপ্ত (মেজর সত্যগুপ্তের ভ্রাতা) নিখুঁতভাবে রাইটার্স বিল্ডিংএর একটি নক্সা তৈয়ার করিয়া ফেলিল।

১৯৩০।৮ ডিসেম্বর ৯০এ নিউ পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে বেলা সাড়ে নয়টায় দীনেশ গুপ্ত ও সুধীর গুপ্ত একটি ট্যাক্সিতে চড়িয়া পাইপ রোডের মোড়ে আসিয়া পৌছিল। ৫ মিনিট পর আর একখানি ট্যাক্সি বিনয় বসু ও রসময় শূরকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। রসময় আর তিনজনকে জিজ্ঞাসা করিল "জি. ও. সির আদেশ 'Last man and last bullet' এর কথা মনে আছে?" বি. ভির মেজর বিনয় বসু জবাব দিলেন 'নিশ্চয়ই'। রসময় চলিয়া গেল। একটা চলন্ত ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িল বীরত্রয়। তিনজনেরই সাহেবী পোষাক।

ঠিক সাড়ে বারোটায় ট্যাক্সি আসিয়া রাইটার্স বিল্ডিংএর সম্মুখে দাঁড়াইল। বৃটিশ সরকারের বাংলার প্রধান দপ্তরখানা এই রাইটার্স বিল্ডিংস্। দেশকে শাসন ও শোষণ করার নামে যত অত্যাচার, যত বর্ব্বরতার ভয়াবহ মন্ত্রণালয় ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত এই রাজপ্রাসাদ।

বিনয়, বাদল, দীনেশ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল সাহেবী কায়দায় শিস্ দিতে দিতে। দোতালার উপরে বারান্দায় সার্জেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে দেখা হইল। উচ্চ রাজকর্ম্মচারী মনে করিয়া ফোর্ড ইহাদিগকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করিল। পাশেই এক কামরায় ঢুকিয়াছিলেন বাংলার কারাসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল কর্ণেল সিম্‌সন। পার্সনাল এসিস্‌টাণ্ট রায়বাহাদুর জ্ঞান গুহ হুজুরের পাশেই দণ্ডায়মান। অকস্মাৎ দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল বীরত্রয়। একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল তিনটি রিভলভার। একবার নয়—দুইবার। ছয়টি গুলি বিদ্ধ হইয়া কর্ণেল সিমসনের প্রাণহীন দেহ পড়িয়া গেল—ভয়ে খট্ খট্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন রায়বাহাদুর। বীরত্রয় দরজা ঠেলিয়া আবার বারান্দায় আসিল। দ্রুতবেগে দপ্তর হইতে দপ্তরে হানা দিয়া ফিরিতে লাগিল। আর মুহুর্মুহু গর্জ্জিতে লাগিল তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র। আহত হইলেন জুডিসিয়াল সেক্রেটারী টুইনহাম্, হোম সেক্রেটারী আলবিয়ান। তখন সকল সিভিলিয়ানের দল ভয়ে পলাইতে লাগিল। পাদ্রী জন্‌সন্ জলের পাইপ ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল। হোম মেম্বর প্রেন্টিস্ আলমারির পশ্চাতে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

ইতিমধ্যে লালবাজারে সংবাদ গেল। কলিকাতা পুলিসের বড় কর্ত্তা চার্লস্ টেগার্ট সশস্ত্র দলবল লইয়া হাজির হইল। সুরু হইল সম্মুখ যুদ্ধ। অকস্মাৎ একটি গুলি আসিয়া দীনেশ গুপ্তকে ডান বুকের উপর বিদ্ধ করিল। কিন্তু বাঁ-হাতে সে পিস্তল তুলিয়া লইল। আগাইয়া আসিয়া সেই অকুতোভয় বীরত্রয় পাসপোর্ট অফিসে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু তখন তাহাদের গুলি প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন আছে প্রত্যেকের নিকট এক একটি গুলি ও পকেটে পোটাসিয়ম সাইনেডের প্যাকেট। অগণিত সশস্ত্র পুলিশ তখন চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর বিলম্ব করিলে তাহাদের হাতে ধরা পড়িতে হইবে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট বাদল গুপ্ত পোটাসিয়ম সাইনেডের প্যাকেট মুখে পুরিয়া দিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া চির-নিদ্রায় অভিভূত হইল। মেজর বিনয় বসু ও ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত ও পোটা-সিয়ম সাইডেনের প্যাকেট গলাধকরণ করিল। কিন্তু তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বিনয় কানের উপর রিভলভার চাপিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া ট্রিগার টানিয়া ধরিলেন। দীনেশও থুতনীর নীচে রিভলভার চাপিয়া ধরিল। উভয় রিভলবারের শেষগুলি একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া লক্ষ্যভেদ করিল। কিন্তু তাহাদের জীবনদীপ তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। ভয়ে ভয়ে পুলিসের দল ঢুকিয়া পড়িল। আই বি অফিসার ভয়ে ভয়ে বিনয়কে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। দৃঢ় কণ্ঠে বিনয় বলিয়া উঠিল "I am Benoy Bose, Major Benoy of the

Bengal volunteers, don't disturb me. Let me die in peace."

বিনয় ও দীনেশকে কড়া পুলিস পাহারায় এ্যাম্বুলেন্স যোগে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লওয়া হইল। ১৩ই ডিসেম্বর জামসেদপুর হইতে বিনয়ের মা, বাবা, বোন, ভাই, ভগ্নিপতি আসিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর খবরের কাগজের স্তম্ভে বড় অক্ষরে প্রকাশিত হইল তিন বীরের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী। দৈনিক লিবার্টির সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইল "Benoy is dead—Long live Benoy" (প্রবর্ত্তক মাসিক পত্রিকা ফাইল দ্রষ্টব্য)। দীনেশ বাঁচিয়া উঠে। এবং আলিপুরের জজ মিঃ গালিকের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। ১৯৩১।২৭শে জুলাই দীনেশের ফাঁসির হুকুমদাতা এই জজকে এজলাসের মধ্যে গুলি করিয়া হত্যাকরতঃ কানাই ভট্টাচার্য্য পটাসিয়াম সাইনেড খাইয়া প্রাণত্যাগ করে।

১৯২৮ খৃঃ হইতে চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা সূর্য্যসেন (মাষ্টার দা) চট্টগ্রামে বিপ্লবীদল গঠন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৩০।১৮ই এপ্রিল রাত্রে এই বিপ্লবীদল সৈনিকের পোষাকে সজ্জিত হইয়া দলবদ্ধ ভাবে চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগারে হানা দিয়া প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাগুলি সংগ্রহ করিয়া পাহাড়ের জঙ্গলে পলায়ন করে। এই অভিমানে কেবলমাত্র হিমাংশু সেনের মৃত্যু হয়। অতঃপর চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিলে সূর্য্যসেন, নির্ম্মল সেন, অপূর্ব্ব সেন প্রভৃতি সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষিপ্রতার সহিত পুলিস বেষ্টনীভেদ করিয়া পলায়ন করে। যুদ্ধে জিতেন দাস, মধুদত্ত, পুলিন ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য্য, হরিগোপাল বল, মতি কাননগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক সেন, নির্ম্মল পাল জীবন দান করে। এপ্রিল মাসে অমরেন্দ্র নন্দী, ৫ই মে রজত সেন, স্বদেশরায়, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন পুলিসের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়।

সূর্য্যসেন, নির্ম্মল সেন, অপূর্ব্ব সেন, প্রীতিলতা প্রভৃতি যখন ধলঘাটে স্বদেশপ্রাণা এক বিধবার বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তখন ১৯৩২। ১৩ই জুন ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ পুলিস ও সৈন্যবাহিনীসহ সহসা ঐ বাড়ী আক্রমণ করে। নির্ম্মলের গুলিতে ক্যামেরণ নিহত হয়। ইত্যবসরে সূর্য্যসেন ও প্রীতিলতা পলায়ন করে। এই প্রীতিলতা ১৯৩১ খৃঃ জুলাই মাসে কলিকাতা কলেজে অধ্যয়নরতা অবস্থায় আলিপুর জেলে প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত বিপ্লবী আসামী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত তাহার ফাঁসির দিন পর্য্যন্ত বহুবার দেখা করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল। ১৯৩২ খৃঃ ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে সাহেবদের ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব করিয়া আক্রমণ কার্য্য শেষ করতঃ পলায়ন কালে এই বীর বালিকা পোটা-

সিয়ম সাইনেড খাইয়া প্রাণত্যাগ করে। পরিশেষে ধৃত হইয়া সূর্য্যসেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি এবং অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর দ্বীপান্তর হয়। ১৯৩২ খৃঃ ৭ই আগষ্ট শ্রীমতী অনুজা সেন চার্লস টেগার্টের উপর বোমা ফেলিতে যাইয়া স্বয়ং বোমা ফাটিয়া মারা যায়। ১৯৩৩ খৃঃ জুলাই নৃত্য ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণ চৌধুরী, চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউণ্ডে সৈনিকের গুলিতে নিহত হন। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েসনের বৈপ্লবিক কার্য্য-কলাপের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কাকোরী বন্দীদের প্রাণদণ্ড ও কারাদণ্ডের প্রায় একবৎসর পর বিপ্লবীদের নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ ও ভগৎসিং প্রভৃতি ঐ এসো-সিয়েসনের নাম বদলাইয়া উহার নাম 'হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্লিক এসোসিয়েসন' রাখেন। এই গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি ১৯২৩-৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কার্য্য করিয়া সরকারের ভীতি উৎপাদনের কারণ হয়। এক-বার পুলিসের হস্তে বন্দী হইয়া চন্দ্রশেখর ম্যাজিষ্ট্রের সম্মুখে নীত হইবার পর ম্যাজি-ষ্ট্রেট তাঁহার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন 'আমার নাম আজাদ (স্বাধীনতা), আমার পিতার নাম আজাদ, আমার নিবাস জেলখানা।' এই কথায় আই, সি, এস ম্যাজিষ্ট্রেট রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি ১৫ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন। এই হইতে তিনি 'আজাদ' নামে পরিচিত হন। সেই বেত্রদণ্ড তিনি অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেত্রদণ্ডের সেই বর্ব্বরতা ও নৃশংসতা আজাদ সারা জীবন ভুলিতে পারেন নাই। তাই পুলিসের শতচেষ্টা সত্ত্বেও, তিনি আর কখন পুলিসের হাতে ধরা দেন নাই। লালা লাজপৎ রায়কে দণ্ড দেওয়ার অপরাধে বিপ্লবীরা ম্যাজিষ্ট্রেট স্যাণ্ডার্সের প্রাণদণ্ডের নির্দ্দেশ দিলে, আজাদ স্বহস্তে সেই নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করেন। প্রকাশ্য দিবালোকে আফিস হইতে বাহির হইয়া স্যাণ্ডার্স সাইকেলে রওনা হইবামাত্র আজাদ অব্যর্থলক্ষ্যে পিস্তলের গুলিতে তাঁহার ললাট ভেদ করেন এবং সেই আঘাতেই স্যাণ্ডার্সের প্রাণহীন দেহ ধুলায় লুটিয়া পড়ে। আজাদ অক্ষত দেহে পলায়ন করেন। কাকোরী ট্রেনডাকাতিতে আজাদ যোগ দিয়াছিলেন। বিপ্লবী যোগেশ চট্টোপাধ্যায়কে যখন সশস্ত্র পুলিস পাহারায় আগ্রা সেণ্ট্রাল জেল হইতে লক্ষ্ণৌ সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হইতেছিল তখন আজাদ তাঁহাকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯৩১ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারী, এলাহাবাদে পুলিস বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে আজাদ নিহত হন।

এদিকে মহাত্মাজির নেতৃত্বে সমগ্রভারতে আবার আইন অমান্য ও বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল (১৯৩০ খৃঃ)। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা দিবস বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৩০।১২ই মার্চ্চ লবণ

আইন অমান্য করিবার জন্য ৭০ জন সঙ্গীসহ মহাত্মাজি সবরমতী আশ্রম হইতে শত মাইল দূরে সমুদ্রতটে তাঁহার ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযান আরম্ভ করেন। ডাণ্ডী সমুদ্রোপকুলে ৬ই এপ্রিল লবণ আইন অমান্য করিয়া তাঁহারা লবণ প্রস্তুত করেন। ৪ঠা মে প্রত্যুষে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহাত্মাজিকে যারবেদা জেলে রাখা হয়। মহাত্মাজিকে অনুসরণ করিয়া ভারতের নানা স্থানে আইনভঙ্গ করতঃ লবণ তৈয়ারী আরম্ভ হয়। গভর্ণমেণ্ট দমননীতি অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেশের অনেক নেতাকে কারারুদ্ধ করে। কিন্তু বিরাটগণবিক্ষোভের নিকট নতি স্বীকার করিয়া মহাত্মাজি, পণ্ডিত জহরলাল, সুভাষ বসু প্রভৃতি নেতাগণকে পুনরায় মুক্তিদান করে। মডারেট নেতা জয়াকর, তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রভৃতির মধ্যস্থতায় গান্ধি-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাহাতে স্থির হয় যে গান্ধিজি কংগ্রেস পক্ষে বিলাতে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন, গভর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিবেন, অডিনান্স ও লবণআইন প্রত্যাহার করিবেন ও শান্তিপূর্ণ বয়কটে বাধা দিবেন না। ১৯৩০।১২ নবেম্বর লণ্ডনের সেণ্ট জেমস প্রাসাদে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে কার্য্য না করায় কংগ্রেস ইহাতে যোগ না দেওয়ায় ঐ বৈঠকে কোন মীমাংসা হইল না। এদিকে এই সময় ভারতীয় অধ্যাপক সি, ভি, রমণ এশিয়াবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন (১৯৩১ খৃঃ)।

পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড উইলিংডনের (১৯৩১-৩৬ খৃঃ) সময় লণ্ডনে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হয় (১৯৩১) সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর। ১৯৩১।মার্চ্চ মাসে করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে গান্ধিজি এই বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু ইহাতে জিন্নার বিরুদ্ধতার জন্য কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় গান্ধীজি ফিরিয়া আসিলেন, ফলতঃ পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হয়। ১৯৩১ খৃঃ মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্যাডি বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। ১৯৩১ খৃঃ সমাবর্ত্তনের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার গভর্ণর এণ্ডার্সনকে গুলি করিয়া শ্রীমতী বীণা দাস কারাবরণ করে। ১৯৩২।৫ জুন ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনকে গুলি করিয়া অতুল সেন পটাসিয়ম সাইনেড খাইয়া জীবন দান করে ও ননী গোপাল চৌধুরী পুলিসের গুলিতে নিহত হয়। এই সময় মেদিনীপুরের গণ আন্দোলন ইংরেজ দমন নীতির নিষ্ঠুর পীড়ন সহ্য করিয়া বহুদিন অহিংস সংগ্রাম চালাইতে থাকে। এবং শ্রদ্ধেয়া সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গের অভিযানে দুই সহস্র নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বৃটিশ অশ্বা-

রোহী সশস্ত্র পুলিসের আক্রমণ তুচ্ছ করিয়া অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দেয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগ্লাসকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দেয়। ১৯৩২ খৃঃ আইন অমান্তের অপরাধে ৬৬৯৬ জন দণ্ডিত হয়। ১৯৩২। সেপ্টেম্বরে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসিল, কিন্তু তাহাতেও কোন মীমাংসা হইল না।

১৯৩৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জ বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হয়। ফলে অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্ম্মল ঘোষের ফাঁসী হয়। এই সময় শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামক তরুণীদ্বয় কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টীভেন্সের বাংলোয় ঢুকিয়া তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। কুমিল্লার পুলিশ সাহেব মিঃ এলিসও বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হয়। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্গো আহত ও স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট কামাখ্যা সেন নিহত ও এ, এস, পি গ্রাসবী আক্রান্ত হয়। শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কালীপদ রায়ের ফাঁসী ও বিনোদ রায়ের দ্বীপান্তর হয়।

১৯৩৫ খৃঃ বৃটিশ পার্লামেণ্টে নূতন এক শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ হইল। বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া ভারতে একটি যুক্ত রাষ্ট্র গঠন ও প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব দান ইহার মূলমন্ত্র হইলেও ইহাতে হিন্দুদের মধ্যগত প্রায় ছয়কোটি অনুন্নত হিন্দুকে "তপঃশীলি হিন্দু" নাম দিয়া তদ্বারা আর একটি রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করায় অপর হিন্দুরা গভর্ণমেণ্টের এই ভেদনীতি মানিয়া লইল না। মহাত্মাজি পুণায় আগা খাঁ প্রাসাদে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলেন। শেষে তপশীলি হিন্দুদের নেতা আম্বেদকারের সহিত অপর হিন্দু নেতাদের ২০শে সেপ্টেম্বর 'পুণাপ্যাক্ট' হওয়ায় গভর্ণমেণ্টকেই ভেদনীতি প্রত্যাহার করিতে হইল।

ইহার পূর্ব্বে ১৯৩৪ খৃঃ মে লিবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে গভর্ণর এণ্ডারসনকে গুলি করিয়া আহত করায় ভবানী ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী হয়। ১৯২৭ খৃঃ হইতে ১৯৩২ খৃঃ পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৩ খৃঃ জানুয়ারী হইতে ১৯৩৩। ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আইন অনুসারে কারাগারে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্বাস্থ্য লাভের জন্য সরকারের অনুমতিক্রমে ১৯৩৩। মার্চ্চ মাসে তিনি ইউরোপে যান এবং তথায় ১৯৩৬ খৃঃ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ভিয়েনায় থাকিবার সময় শ্রীমতী এমেলী সোঙ্কল তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। দেশে ফিরিবার পরেও ১৯৩৮ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি পুনরায় ৩ আইন অনুসারে আটক থাকেন। ১৯৩৬ খৃঃ জানুয়ারীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ পরলোক-

গমন করায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড সম্রাট হন। কিন্তু তিনি সিংহাসন ত্যাগ করায় ১৯৩৬। ডিসেম্বরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ষষ্ঠ জর্জ্জ সম্রাট হন। এই সময়ে লর্ড লিনলিথগো ভারতের বড়লাট ছিলেন (১৯৩৬-৪২ খৃঃ), স্যার জন উডহেড বাঙলার অস্থায়ী গভর্ণর, তৎপর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জে এ হারবার্ট বাঙলার গভর্ণর ছিলেন।

১৯৩৭ খৃঃ নূতন ভারত শাসন আইন অনুসারে ব্রহ্মদেশ ও এডেন বন্দর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ভারতের ১১টি প্রদেশে প্রাদেশিক আত্ম কর্ত্তৃত্ব আংশিকভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যুক্ত রাষ্ট্র প্রবর্ত্তন স্থগিত থাকে।

১৯৩৮ খৃঃ হরিপুর কংগ্রেসে মহাত্মাজীর অনুমোদনক্রমে সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি হইলেন। কিন্তু সভাপতির ভাষণে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড নিরাশ হইলেন। সভাপতি সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভাষণে সমাজবাদের এক আর্থিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া মন্তব্য করিলেন সারা কৃষি ও শিল্প সম্পদ জাতীয় সম্পত্তি হইবে। উৎপাদনে ও বিতরণে সমাজের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। এক বিরাট ও ব্যাপক উন্নয়ণ পরিকল্পনা গঠিত হইবে। ভারতের স্বকীয় প্রতিভা ও সংস্কৃতিকে সম্বল করিয়া এখানকার সমাজবাদ গড়িয়া উঠিবে। বিদেশী শাসনাধীনে ইহা সম্ভব হইবে না।[১] অতঃপর ১৯৩৯। ফেব্রুয়ারী মাসে রয়টারের এইরূপ একটি খবর 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে' প্রকাশিত হইল, "গত কয়েক মাসের মধ্যে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের দক্ষিণপন্থী নেতাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়ার ফলে মনে হয় মহাত্মা গান্ধী 'যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা' প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের মতই কার্য্যকরী করিতে অগ্রসর হইবেন।" সম্ভবতঃ মহাত্মাজী যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষপাতী থাকায় ও সুভাষবাবু ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়ায় পর বৎসর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় মহাত্মাজী ও কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড দ্বিতীয়বার ভুল করিলেন না। তাঁহারা পট্টভি সীতারামাইয়াকে সভাপতিরূপে দাঁড় করাইলেন। কিন্তু বামপন্থীগণ তাহাতে রাজী না হইয়া সভাপতির পদে সুভাষবাবুর নাম প্রস্তাব করিলে ভোটাধিক্যে সুভাষবাবুই সভাপতি হইলেন। কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়লাভ এই বোধহয় প্রথম। তাই

১। এই সময় সুভাষবাবু কংগ্রেস সভাপতিরূপে কংগ্রেসের যে সমাজবাদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাহার সভাপতি ছিলেন, যদিও এই কমিটিকে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলিয়া গান্ধীজী ও গান্ধীপন্থীরা মনে করিতেছিলেন।

মহাত্মাজী বলিলেন, 'পট্টভির পরাজয়ে আমারই পরাজয়'। সুভাষবাবু কিন্তু ছুটিলেন মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদ লইতে। বলিলেন, 'মহাত্মার আশীর্ব্বাদ না পাইলে জয়ে আমার আনন্দ নাই।'

১৯৩৯। ফেব্রুয়ারীতেই সুভাষবাবুর কর্ম্মসূচী বাহির হইল। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—(১) যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা গ্রহণে বাধা দান, (২) দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দান, (৩) প্রয়োজন হইলে ব্যাপকভাবে আইন অমান্য সুরু করার জন্য একদল স্বেচ্ছসেবক বাহিনা তৈয়ারী রাখা। এদিকে ত্রিপুরী কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটিতে মহাত্মার অনুগত পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থ দ্বারা এইরূপ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করাইয়া ভোটাধিক্যে পাশ করাইয়া রাখা হইল যে "প্রেসিডেন্টের মনোনীত ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মার দ্বারা সমর্থিত হইবে।"

সুভাষবাবু ১২ জন পুরাতন ও তিনজন নূতন এই ১৫ জন সদস্য মনোনীত করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করিলেন। কিন্তু মহাত্মাজীর অনুগত পুরাতন ১২ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করিলেন। তখন সুভাষবাবু সমুদয় ব্যাপার বুঝিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে সভাপতি পদের পদত্যাগ পত্র দাখিল করিলেন। এইরূপ স্থলে পদত্যাগ পত্র পুনর্ব্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠানই নিয়ম। কিন্তু সুভাষবাবুর বেলায় তাহা হইল না। মে মাসে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি'র অধিবেশনে সুভাষবাবুর পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইল এবং নূতন নোটিশ না দিয়াই অবৈধভাবে ক্ষিপ্রতার সহিত ঐ মিটিংয়েই বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে সভাপতি করা হইল। সভানেত্রী সরোজিনী নাইডু বলিলেন "অবৈধতার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াই আমি এই নূতন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে অনুমতি দিলাম।"

কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের গুরু দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া সুভাষ বাবু "ফরওয়ার্ড ব্লক" গঠন করিলেন এবং গভর্ণমেন্টের সহিত কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের আপোষ প্রচেষ্টায় বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। জুলাই মাসে লেফ্ট কন্সলিডেসন কমিটির প্রত্যক্ষ বিক্ষোভ প্রদর্শনে সুভাষবাবু স্বয়ং নেতৃত্ব করিয়া কংগ্রেসের "mass action" (জন বিক্ষোভ) বর্জ্জনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিলেন। ফলে শৃঙ্খলা-ভঙ্গের অভিযোগে তাঁহাকে তিনবৎসরের জন্য কংগ্রেসের অফিস (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বপূর্ণ কোন পদ) গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সুভাষবাবু তখনও বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। হাই কম্যাণ্ডের ঘোষণা সত্ত্বেও তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিলেন না। তখন হাই কম্যাণ্ড বাংলায় 'এড হক্' কংগ্রেস কমিটি

গঠন করিয়া পট্টভি সীতারামাইয়াকে তাহার সভাপতি ও যুগান্তর দলের সুরেন্দ্র ঘোষকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু সুভাষবাবু তখনও বাংলাতে প্রাদেশিক কমিটি চালাইতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় ১৯৩৯ সেপ্টেম্বরে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল ও ভারতের পক্ষ হইতে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো মহাত্মা কি কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া জর্ম্মনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতরক্ষা অর্ডিনান্স জারি হইয়া গেল। প্রমাণ হইল ভারত মানেই বড়লাট—বড়লাট মানেই ভারত। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টও অবিলম্বে "গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট" পাশ করিয়া বড়লাটের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তুলিয়া দিল যাহাতে তিনি শাসনবিধি বিরোধী আদেশ নির্দ্দেশ চালাইবার অধিকারী হইলেন। নানারকমের বিশেষ ক্ষমতাও তাঁহাকে দেওয়া হইল। ভারত সরকারের গণতন্ত্রের মুখোস খসিয়া পড়িল। তাহার স্বেচ্ছাতন্ত্রের সেই কদর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়া কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া গেল। যুগান্তর বিপ্লবীদলের নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ভয়ে প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা তাঁহার বিপ্লবী দল ভাঙ্গিয়া দিলেন। অক্টোবরে (১৯৩৯ খৃঃ) ভারত রক্ষা আইনে সুভাষ বাবুকে আটক করিয়া প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ করায় তিনি অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিলেন। ১২ দিন আন্দোলনের পর অসুস্থতার জন্য তাহাকে জেল হইতে আনিয়া কড়া সশস্ত্র পুলিস পাহারাধীনে স্বগৃহে অন্তরীন করিয়া রাখা হইল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে মুসলমান তোষণের তাগিদে আবুল কালাম আজাদকে সভাপতি করা হইল। তদবধি ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনিই সভাপতি রহিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাগণ ক্রমে সাহস সঞ্চয় করিয়া এই মহাযুদ্ধে সহযোগিতার মূল্যস্বরূপ পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে লাগিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মুসলমান সভাপতি সত্ত্বেও ইংরেজের কূট কৌশলে মুসলীম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না ভারতকে খণ্ডিত করিয়া মুসলমানদের জন্য পাকিস্থান দাবী করিয়া বসিলেন (১৯৪০। নবেম্বর), এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুসলীম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্থান দাবীর প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল।[১]

১। প্রকৃত পক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্থান পরিকল্পনার স্রষ্টা নহেন।

এদিকে জাতীয়বাদীদের দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় মহাত্মাজী পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু স্বগৃহে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া শিখ ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে পলায়ন করতঃ আফগানিস্থানে উপস্থিত হইলেন (১৯৪১ খৃঃ জানুয়ারী) এবং তথায় জর্মান কন্সালের যোগসাজসে জর্মানীতে হিটলারের সহিত সংযোগ স্থাপন

ইহার উদ্ভাবনের গোড়ায় বহুপূর্ব্ব হইতেই লণ্ডন ও ভারতের কতিপয় ইংরাজ রাজপুরুষের গোপনহস্ত কার্য্য করিতেছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে যখন জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটি সমগ্র ভারতের জন্য অধিকতর স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলভুক্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছিলেন সেই সময় ইংলণ্ডেই গোপনে ইহার বীজবপন করা হইয়াছিল। তখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত চৌধুরী রহমান আলি নামক পঞ্জাবী মুসলমান ছাত্র ও তাহার সহাধ্যায়ী মহম্মদ আসলাম খাঁ, সেক মহম্মদ সাদিক ও এনায়েতুল্লা দ্বারা 'Now or Never' নামে ক্ষুদ্র চারিপাতার একখানি পুস্তিকা প্রচার করান হয়। ইহাতে লিখিত থাকে 'Muslims are a separate nation and are therefore entitled to a separate state of their own' তখন এখনকার পাকা পাকিস্থানী কাদিয়ানী নেতা চৌধুরী স্যর মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটিতে মিঃ আইজাক ফুটের প্রশ্নের (প্রঃ ৯৫৯৯) উত্তরে (উঃ ৯৫৯৯) বলিয়াছিলেন "So far we have considered it, we have considered it chimerical and impracticable." ঐ কমিটিরই অন্যতম সদস্য স্যর রেজিনাল ক্র্যাডকও, অন্যতম মুসলীম নেতা খলিফা সুজাউদ্দিনকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন (প্রঃ ৯৬০০) "I have received communication about the proposal of forming certain Muslim state under the name of Pakisthan." কিন্তু খলিফা সুজাউদ্দিন উত্তর দিলেন (উঃ ৯৬০০) "Perhaps it will be enough to say that no such Scheme has been considered by any representative gentleman or Association so far." দেখা যাইতেছে বৃটিশ রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণের মনে পূর্ব্ব হইতেই পাকিস্থান পরিকল্পনাকে অগ্রসর করিয়া দিবার আগ্রহ জন্মলাভ করিয়াছিল। মনে হয় ভিতরে ভিতরে বৃটিশ কর্ণধারগণই পাকিস্তানের পরিকল্পনা মুসলমান নেতাদের মনে ঢুকাইয়া দিতেছিল, যাহার ফলে সাতবর্ষ পরে জিন্না সাহেব পাকিস্থান দাবী করিয়া বসিলেন।

করিয়া জার্ম্মানীতে চলিয়া গেলেন। তথায় ১৯৪২ খৃঃ ইটালী ও জার্ম্মানীর হস্তে যে ৬৫০০০ ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ছিল তাহাদিগকে সংহত করিয়া "ফ্রি ইণ্ডিয়া লিজিয়ন" গঠন করিলেন।

১৯৪১ খৃঃ ২২ জুন জর্ম্মানী অনাক্রমণচুক্তি ভঙ্গ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করায় ও ডিসেম্বরে জাপান আমেরিকার পার্লহারবার আক্রমণ করায় আমেরিকা জর্ম্মান, ইটালী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

১৯৪১ খৃঃ ৭ই আগষ্ট জাতীয়তার অগ্রদূত ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাপ্রয়াণ করায় সমগ্র ভারতে শোকের প্রবাহ বহিয়া গেল।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে পার্লিয়ামেণ্ট মিটমাটের একটা ভিত্তি স্থির করার জন্য স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে পাঠাইল। কিন্তু তিনি বিফল হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ১৯৪২। জুলাই মাসে পুনরায় অসহযোগ আন্দোলন মস্তকোত্তোলন করিল এবং বিপ্লবী আন্দোলনও চলিতে লাগিল। ১৯৪২। আগষ্ট মাসে বোম্বাইএ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মহাত্মাজীর "Quit India" (ভারত ছাড়) প্রস্তাব গৃহীত হইল। বলা বাহুল্য সুভাষবাবু হরিপুরা কংগ্রেসেই এই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পর মহাত্মাজী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রভৃতি ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বরগণ বন্দী হইলেন ও কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হইল। বিহারে, মেদিনীপুরে, বালুরঘাটে এবং আরও অনেক স্থানে বিপ্লবীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ১৯৫২ খৃঃ মেদিনীপুরে তাম্রলিপ্ত সরকার গঠিত হয়। ৭৩ বৎসর বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠিত হয়। পুরুষেরা বারেন্দ্র বাহিনী গঠন করে। ইহারা মহিষাদল থানা, বেলকুচি, কাঁথি, নন্দীগ্রাম থানা বৃন্দাবনপুর ফাঁড়ি আক্রমণ করায় পুলিসের গুলিতে বহুলোক হতাহত হয়। ১৯৪২। ২৯শে সেপ্টেম্বর তমোলুক আদালত অভিমুখে অগ্রসর হইলে পুলিসের গুলিতে মাতঙ্গিনী হাজরা নিহত হন। ১৯৪২।৪৩ খৃঃ মধ্যে ৬০,০২৯ জন বিপ্লবী বন্দী হইল। ভারত রক্ষা আইন অনুসারে ১৮০০০ জন জেলে প্রেরিত হইল ও পুলিশের গুলিতে ৯৪০ জন হত, ১৬৩০ জন আহত হইল। ৩৫০০০ স্থানে বিপ্লবীরা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিল।

১৯৩২ খৃঃ বন্যায় মেদিনীপুরে লক্ষ লক্ষ নরনারী খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু বাঙলার চাউল বিদেশে রপ্তানী হইতেই থাকে। এই সময় স্যার জন হারবার্ট বাঙলার গভর্ণর ছিলেন।

১৯৪২। ১৬ই ফেব্রুয়ারী জাপানীরা সিঙ্গাপুর অধিকার করে। ইহার প্রায়

একবৎসর পর ১৯৪৩। জুন মাসে সুভাষচন্দ্র বসু জর্ম্মানী হইতে জার্ম্মান সবমেরিণ-যোগে মাদাগাস্কারে, তথা হইতে জাপানী সবমেরিণে পেনাং, তথা হইতে এরোপ্লেনে টোকিও উপস্থিত হইলে জাপান-প্রবাসী বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু তাঁহার গঠিত 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লীগে'র কর্ত্তৃত্ব সুভাষ বসুর হাতে ছাড়িয়া দেন। এই সময় হইতে সুভাষবাবু 'নেতাজী' নামে খ্যাত হন। অতঃপর নেতাজী সিঙ্গাপুরে একটি অস্থায়ী 'আজাদ হিন্দ' গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন, এবং জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি আটটি দেশ এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকৃতি দান করে। এই সময় জাপান সরকারের হাতে ৬০,০০০ ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ছিল। তিনি দুই কোটি টাকা চাঁদা উঠাইয়া ঐ যুদ্ধবন্দী দ্বারা 'আজাদ হিন্দ' বাহিনী গড়িয়া তোলেন (১৯৪৩। ৫ই জুলাই) এবং ২৩শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি 'জয়হিন্দ' নামক জয়ধ্বনি ও 'দিল্লীচলো' ভণিতা (slogan)-যুক্ত জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়া ১৯৪৩। ২৫শে অক্টোবর যুদ্ধের সূচনা করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই যুদ্ধ ঘোষণা ও যুদ্ধাভিযানের বার্ত্তা ভারতে পৌঁছিয়া সমগ্র ভারতকে আলোড়িত করিবে এবং সমগ্র ভারত তাঁহার সমর্থনে আগাইয়া আসিবে। কিন্তু ভারতের ইংরেজ সরকার প্রকৃত ঘটনা গোপন রাখিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে জাপানীরা ভারত আক্রমণ করিয়াছে। নেতাজি সৈন্য পরিচালনার সুবিধার জন্য সমগ্র আজাদ বাহিনীকে পাঁচটি ব্রিগেডে বিভক্ত করিলেন যথা—(১) মেজর জেনারল সাহ নেওয়াজের নেতৃত্বে সুভাষ ব্রিগেড (২) কর্ণেল ইনায়াংকিয়ানীর নেতৃত্বে গান্ধী ব্রিগেড, (৩) কর্ণেল মোহন সিংএর নেতৃত্বে আজাদ ব্রিগেড (৪) কর্ণেল গুরুবক্স সিং ধীলনের নেতৃত্বে নেহরু ব্রিগেড, (৫) কর্ণেল লক্ষ্মীবাঈয়ের নেতৃত্বে ঝান্সীরাণী ব্রিগেড। এই সময় ভারতের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি ও বিশ্বযুদ্ধে উত্তর আফ্রিকার ইংরেজ বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন (১৯৪০। অক্টোবর)। ১৯৪৪ খৃঃ জানুয়ারীতে আজাদহিন্দ সরকারের দপ্তরের একাংশ সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুনে অপসারিত করা হইল ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের উদ্ধার কামনায় অভিযান আরম্ভ করিল। তাহারা ১৮ই মার্চ্চ ব্রহ্ম সীমান্ত পার হইয়া আসামে প্রবেশ করিল এবং মেজর জেনারেল সাহ নওয়াজের সুভাষ ব্রিগেড মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অবরোধ করিয়া স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ভারতের মাটিতে প্রোথিত করিল। দেড় হাজার বর্গ মাইলের অধিক ভারতীয় ভূভাগ তখন তাহাদের করতলগত। তাহারা 'জয় হিন্দ' ও 'দিল্লী চলো' ধ্বনি

করিতে করিতে অসাধারণ বীর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত নাগাভূমিতে কোহিমা পর্য্যন্ত আগাইয়া চলিল, কিন্তু ইংরেজের চক্রান্তে ঐ সংবাদ ভারতে পৌছিল না। ১৪৯৫। মে মাসে রুশ সেনা বার্লিনে ও ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য পশ্চিম জার্ম্মানীতে প্রবেশ করিলে জার্ম্মানী এবং ১৯৪৫। ৬ আগস্ট মার্কিনের জঙ্গী বিমান জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এটম বোমা নিক্ষেপ করায় জাপান আত্মসমর্পণ করায় জাপানের স্বীকৃত খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হইয়া গেল। তখন আজাদ হিন্দ বাহিনীকে খাদ্যাভাবে বহু দুর্যোগের মধ্য দিয়া অসাধারণ কষ্ট সহ্য করিয়া পশ্চাৎপদ হইতে হয়। নেতাজি তখনও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে কৃতসংকল্প। কিন্তু তাঁহার দলের বিশিষ্ট কর্ম্মীগণের প্রবল অনুরোধে তিনি তাঁহার সেই সংকল্প ত্যাগ করিয়া অবশেষে সিঙ্গাপুর হইতে জাপানের উদ্দেশ্যে বিমানযোগে যাত্রা করিলেন। ১৯৪৫ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট নেতাজি ব্যাঙ্ককে, ১৭ই আগষ্ট সাইগনে, ১৮ই আগষ্ট ফরমোজায় উপস্থিত হন। এখানে বিমান ঘাঁটির অদূরে বিমানে আগুন ধরিয়া বিমানটি ভূপতিত হইলে অৰ্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় নেতাজিকে নিকটবর্ত্তী তাইহাকু হাসপাতালে লওয়া হয়। তথায় অল্পক্ষণ মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করেন।

প্রায় একমাস পর তাঁহার অনুরাগী শ্রীমূর্ত্তি নামক জনৈক ভদ্রলোক জাপানের টোকিও সহরে লইয়া গিয়া রেঙ্কোজি মন্দিরের পুরোহিত কাইওই মুটিজোকির হস্তে সমর্পণ করিলে, ঐ মন্দিরেই একটি বাক্সে ঐ চিতাভস্ম রক্ষিত হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর টোকিওর ভারতীয় প্রবাসীগণ তথায় নেতাজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন[১]। এইরূপে নেতাজির অন্তর্দ্ধান ঘটিলে আজাদহিন্দ বাহিনী ভাঙ্গিয়া গেল ও অনেকে বন্দী হইলেন এবং দিল্লীর লালকেল্লায় তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় অনেকের বিচার আরম্ভ হইল। পণ্ডিত

১। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্ণেল হবিবর রহমান ১৯৫৭ খৃঃ ২২ [illegible] ভারতে আসিয়া ঐ ঘটনার বিষয় প্রকাশ করেন এবং বলেন তিনি নেতাজির একমাত্র সঙ্গী ও তাঁহার মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তথাপি কেহ কেহ বিশ্বাস করেন নেতাজি অদ্যাপি বাঁচিয়া আছেন। ১৩৬৬ সালের ২৫শে বৈশাখে (১৯৫৯ খৃঃ ৫ই মে) জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটায় শ্রীমৎ সারদানন্দজি নামক একজন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ১৯৫৯ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট তিনি ফালাকাটার অদূরে শৌলমারী আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার চেলারা ঐ সন্ন্যাসীকে নেতাজি বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

জহরলাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতারাও মুক্ত হইয়া আসামীগণের পক্ষ সমর্থনে আগাইয়া আসিলেন। এইরূপে আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্য্যকলাপ সাধারণে প্রকাশ হইয়া পড়ায় সমগ্র ভারতে ও বাঙলার ও মাদ্রাজের ছাত্রদল ও বোম্বাই-নৌবাহিনী, বিহারের পুলিসদল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় অভিযুক্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃগণ বিচারে মুক্তিলাভ করিলেন। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের অধিকার আদালত কর্ত্তৃক পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইল। মিঃ রবার্ট কেসি এই সময় বাঙলার গভর্ণর ছিলেন (১৯৪৪-৪৬ খৃঃ)।

১৯৪৫ খৃঃ সেপ্টেম্বরে লর্ড ওয়াভেল ভারতে সাধারণ নির্ব্বাচনের দ্বারা দল গঠনের প্রস্তাব করেন। এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ৫৭, মুসলীম লীগ ৩০, ইউরোপীয় ৮, অকালী শিখ ২টি আসন লাভ করিল। অতঃপর ১৯৪৬ খৃঃ জানুয়ারীতে পার্লামেন্টের কতিপয় প্রতিনিধি ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনার জন্য আগমন করিলেন। স্যার ক্রীপস্, আলেকজাণ্ডার ও স্বয়ং ভারত-সচিব পেথিক লরেন্স দ্বারা গঠিত ক্যাবিনেট মিশন আসিয়া কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করিলেন।

১৯৪৬ খৃঃ ২৬শে এপ্রিল পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সময় মুসলীম লীগ কাউন্সিল ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি উভয়েই ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মানিয়া লইতে সম্মত হইল। ১৯৪৬ খৃঃ ৬ই জুলাই অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি লর্ড পেথিক লরেন্স ও স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ও আলেকজাণ্ডারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। কিন্তু ২৭শে জুলাই কোনও কারণে বোম্বাইতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল মিটিংএ মিঃ জিন্না সহসা ঐ পরিকল্পনা গ্রহণে অসম্মত হইয়া পাকিস্থানের দাবী বহাল রাখিলেন ও পাকিস্থান আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৮ই আগষ্ট পুনরায় ঐ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিল। কিন্তু মুসলীম লীগ পাকিস্থান প্রস্তাবে অটল রহিল।

অবশেষে ১৯৪৬ খৃঃ ১২ই আগষ্ট বড়লাট পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে মধ্যবর্ত্তী সরকার গঠন করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্না ১৬ই আগষ্টকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

তৎকালে মুসলীম লীগের নীতির পৃষ্ঠপোষক অবিভক্ত বাঙলার ইংরেজ গভর্ণর ছিলেন ফ্রেডারিক ব্যারোজ। বাঙলা ও কলিকাতা ছিল মুসলীম লীগের প্রভাবাধীন এবং মুসলীম লীগ নেতা এইচ, এস, সুরাবর্দী ছিলেন বাঙলার প্রধান মন্ত্রী। সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের করায়ত্ত ছিল।

১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় অমানুষিক দাঙ্গা আরম্ভ হইল। হাজার দশেক নরনারী নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল। কত যে ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার জের নোয়াখালিতে গেল। তথায়ও বহু ধনপ্রাণ বিনষ্ট হইল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"শত শত লোক নিহত হইল। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। সমগ্র কলিকাতায় যখন শত শত নরনারী হত হইতেছিল, তখন সৈন্যদল ও পুলিস তাহাতে বাধা না দিয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিতেছিল।"

এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে আর বাঙালীর এই নিগ্রহ দেখিয়া ইংরেজ গভর্ণর বোধ করি মনে মনে আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। কলিকাতায় ও বাঙলার সর্ব্বত্র কত নর নারী হতাহত ও নির্য্যাতীত এবং কত সম্পত্তি ভস্মীভূত হইল তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় বিলাতের পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল পরাজিত ও শ্রমিকদল জয়লাভ করায় রক্ষণশীল প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল পদত্যাগ করিলেন এবং মিঃ এটলী প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

নূতন যুগ

স্বাধীন ভারত (১৯৪৭খৃঃ ১৫ই আগষ্ট)।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে শ্রমিকদলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও তাঁহারা ভারতকে স্বাধীনতা দানের সংকল্প করায়, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে রক্ষণশীল বড়লাট লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করিলেন, এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন (১৯৪৬-৪৮ খৃঃ) বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি ভারতে আসিয়াই বৃটিশ মন্ত্রীসভার পরামর্শে ভারতের সকল-দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার দ্বারা একটি অন্তর্ব্বর্ত্তী পরিষৎ গঠন করিলেন এবং ঐ পরিষদের হস্তে ভারত শাসনের ভারার্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কংগ্রেস ইহাতে যোগ দিল, কিন্তু মুসলীম লীগ ইহাতে যোগ দিতে সম্মত হইল না। এইরূপ অবস্থায় ১৯৪৭।জুলাই বৃটিশ পার্লামেণ্টে "ভাবত স্বাধীনতা আইন" পাশ হইয়া গেল। ৬২ বৎসর সংগ্রামের পর ১৯৪৭।১৫ই আগষ্ট সমগ্র ভারতবর্ষ ভারত (হিন্দুস্থান) ও পাকিস্থানে বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল।[১] এইরূপে বৃটিশ কূটনীতির ও জিন্নার সাম্প্রদায়িক মুসলীমনীতি অবশেষে জয়যুক্ত হইল। বাংলা দেশ পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ও পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ ভারত ভুক্ত হইল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের ও মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্থানের গভর্ণরজেনারল হইলেন এবং শ্রীরাজাগোপাল আচারী পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর হইলেন। অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্ণর স্যর জন ফ্রেডারিক ব্যারোজ পূর্ব্বপাকিস্থানের গভর্ণর হইলেন। কিন্তু অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দিকে ভোটে হারাইয়া খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে লেফটেন্যাণ্ট জেনা-রল স্যর রব লকহার্ট ভারতের ও ডগলাস গ্রাসী পাকিস্থানের সেনাপতি ও মার্শাল স্যর রক অকিনলেক তাঁহাদের উভয়ের উপরে যুক্ত সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হইলেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপতিগণ স্বেচ্ছামত তাঁহাদের রাজ্যকে ভারত অথবা পাকি-

১। ভারত বিভাগে প্রথমে মহাত্মাজি সম্মত ছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস যদি দেশবিভাগ মানিয়া লয়, তবে তাহা হইলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়া হইবে। অবস্থানুসারে জহরলাল ও সর্দ্দার প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড উহা মানিয়া লওয়ায়, গান্ধিজির মত পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

স্থানের সহিত সংযুক্ত করিবার অধিকার লাভ করিলেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সহকারী প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

১৯৪৮।জুন মাসে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট পদ ত্যাগ করেন এবং চক্রবর্ত্তী রাজাগোপাল আচারী ভারতের প্রথম ভারতীয় বড়লাট (১৯৪৮-৫০ খৃঃ) ও শ্রীকৈলাশনাথ কাটজু পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন।

এইরূপে ইংরেজের কূট-কৌশলে ভারতবর্ষ দুইটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সহযোগিতার পরিবর্ত্তে বিরোধ দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বিভীষিকা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল। প্রায় ১৫।২০ লক্ষ লোক দিশেহারা হইয়া সীমান্তের এপার ওপার ছুটিতে লাগিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আতঙ্কগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ হিন্দুনরনারী ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। সাম্প্রদায়িক হানা-হানি তখন এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল যে ১৯৪৮।৩০ জানুয়ারী নাথুরাম বিনায়ক গডসে নামক মহারাষ্ট্র দেশীয় এক হিন্দু যুবক বর্ত্তমান কালের অহিংসবাদের প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতি প্রদর্শন করিতেছেন এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মহাত্মাজিকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করিয়া বসে। বিচারে ১৫ই নবেম্বর গডসের ফাঁসি হয়। তাহার সহকারী গোপাল গডসে ও বিষ্ণু করকরের কারাদণ্ড হয়।

ইতিপূর্ব্বে বৃটিশ মন্ত্রীসভার পরামর্শে ১৯৪৬।৯ ডিসেম্বর স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য দিল্লীতে একটি গণপরিষদ গঠিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই গণপরিষদ সার্ব্বভৌমিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া ভারতের জন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় উদ্যোগী হইল। ১৯৪৭।২৯ আগষ্ট ইহা একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সভা গঠিত করে। ইহার সদস্যগণ ১৯৪৮।২১ ফেব্রুয়ারী গণপরিষদের নিকট খসড়া শাসনতন্ত্র দাখিল করেন। ইতিমধ্যে গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে একটি সর্ব্বভারতীয় ভাষা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রেসিডেন্টের কাষ্টিং ভোটে হিন্দী ভাষা সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গৃহীত হয়। অতঃপর দীর্ঘকাল বিবেচনার পর ১৯৪৯।২৬ শে নবেম্বর ঐ খসড়া শাসনতন্ত্র সংশোধিত আকারে গণপরিষদে গৃহীত এবং গণপরি-ষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত ও ১৯৫০।১লা জানুয়ারী হইতে এই শাসনতন্ত্র ভারতে প্রচলিত হয়। ইংরাজীতে 'ইণ্ডিয়া' নাম থাকিলেও শাসনতন্ত্রে এ দেশের নাম 'ভারত' ও ইহা একটি ধর্ম্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া

গৃহীত হয় যাহার লক্ষ্য স্ত্রীপুরুষের সার্ব্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

যাই হউক এই শাসনতন্ত্র অনুসারে পশ্চিম বঙ্গে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ[১] মুখ্য মন্ত্রী ও শ্রীঈশ্বরদাস জালান স্পীকার হন। এই সময় পশ্চিম বঙ্গের বাজারে পুরাদমে কালো বাজারের রাজত্ব চলিতেছিল। এই বিরাট চোরাকারবারের গতিরোধের জন্য মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ ঘোষ অসমসাহসিকতার সহিত 'ব্ল্যাক মার্কেট বিল' নামে একটি আইন পাশ করাইলেন। কিন্তু আইনটিতে গভর্ণরের সম্মতি পাইবার পূর্ব্বেই পাঁচ মাস মাত্র কার্য্য চালাইবার পর তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের[২] নেতৃত্বে পশ্চিম বাঙলার

১। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পি, এইচ. ডি। ১৯২০ খৃঃ রসায়ণ শাস্ত্রে ডক্টরেট লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৯১৯ খৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন ও এক বৎসর পর কলিকাতা টাকশালের ডেপুটি এসেমাষ্টার হন। ১৯২১ খৃঃ চাকুরী ত্যাগ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে দশ বৎসর কাল নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

২। ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র রায়—প্রতাপাদিত্যের বংশধর বিধানচন্দ্র রায় ১৮৮২ খৃঃ ১লা জুলাই পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের আদি নিবাস যশোহর জেলার শ্রীপুর গ্রামে। তাঁহার পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় পাটনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বিধানচন্দ্র ১৯০১ খৃঃ পাটনা কলেজ হইতে গণিতে অনার্সসহ বি-এ পাশ করেন, ১৯০৬ খৃঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল, এম, এস, ও ১৯০৮ খৃঃ এম, ডি, পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯১১ খৃঃ লণ্ডনের এম, আর, সি, পি, ও এফ, আর, সি, এস ডিগ্রী লাভ করেন এবং প্রথমোক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ভারতে আসিয়া অচিরেই তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। ১৯২২ খৃঃ রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯২৩ খৃঃ নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করেন। ১৯২৫ খৃঃ স্বরাজ্য দলে যোগদান করেন। ১৯২৮ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৯ খৃঃ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩০ খৃঃ বেআইনী ঘোষিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং

নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্য মন্ত্রী হন। এই সময়ে শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার মোট ২৩৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৫০, কমিউনিষ্ট দল ২৮, প্রজা সোসালিষ্ট দল ১৫, ফরওয়ার্ড ব্লক ১৩, স্বতন্ত্র, হিন্দুমহাসভা ও জনসংঘ মিলিয়া ১২ ও অন্যান্য দল ১৯টি আসন লাভ করে। কংগ্রেস একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্য মন্ত্রী হন। অতঃপর ১৯৫৭ খৃঃ দ্বিতীয়বার ও ১৯৬২ খৃঃ ফেব্রুয়ারীতে তৃতীয়বার সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। এই উভয়বারেই কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় কংগ্রেস নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সরকার গঠন করেন এবং তিনি মুখ্য মন্ত্রী হন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদেও কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

পশ্চিম বঙ্গের তৃতীয় বারের মন্ত্রী সভায় যখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্য মন্ত্রী তখন সহসা ১৯৬২ খৃঃ ১লা জুলাই তাঁহার জন্ম দিনের (জন্ম ১৮৮২ খৃঃ ১লা জুলাই) উৎসবের মধ্যে তিনি পরলোকগমন করেন। অতঃপর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্য মন্ত্রী হইয়াছেন[১]।

কমিটির নয়াদিল্লী অধিবেশনে যোগদান করিয়া ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩১-৩২ খৃঃ কলিকাতা কর্পোরেসনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪২ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর হন। ১৯৪৭ খৃঃ হইতে ১৯৬২ খৃঃ ১লা জুলাই পর্য্যন্ত আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী থাকিয়া অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি ভারতের ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন।

১। শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের পিতা বিহারে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁহার পৈতৃক বাস খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। ১৮৯৭ খৃঃ সাহাবাদে একটি সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। ১৯১৮ খৃঃ কলিকাতার স্কটিস চার্চ্চ কলেজ হইতে পদার্থ বিদ্যায় অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন। তিনি চাকুরী গ্রহণ না করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া হুগলী জেলার আরামবাগে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র বাছিয়া লন এবং তথায় 'সাগরকুঠি' নামক একটি কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া নিজ হাতে চরকায় সূতা কাটা, কুটির শিল্প ও খদ্দর

আধুনিক যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি

১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর খণ্ডযুদ্ধের ফলে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দেওয়ার পর হইতে বাঙালীর শত সহস্র বৎসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভাঙ্গনের সুরু হয়। পাশ্চাত্ত্যের আলোকরশ্মি সবেমাত্র চোখে লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু পুরাতনের মোহনিদ্রা তখনও ভাঙ্গে নাই। শোষক সাম্রাজ্যবাদী চতুর ইংরেজ পুরাতন শাসনধারা না বদলাইয়া দেশীয় সামন্ত ও কর্ম্মচারীদের সহায়তায় দেশের শাসনকার্য্য আরম্ভ করিল। তাহারা রাজস্ব আদায়ের ভার দিল স্বদেশপ্রীতিশূন্য অত্যাচারী রেজাখাঁর উপর। রেজাখাঁর অতিরিক্ত করভারে পীড়িত বাঙ্গালার প্রজা ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খৃঃ) যে নিদারুণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়া ধনেপ্রাণে বিনষ্ট হয় তাহার ইতিহাস আজও বাঙালী ভুলিতে পারে নাই। বাঙলার লোকে তাহার নাম দিয়াছিল "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"। সাবধানী ইংরাজ প্রজাকে অভয় দিবার জন্য ১৭৭১ খৃঃ কলিকাতায় "বোর্ড অব রেভিনিউ" (রাজস্ব সভা) ও ১৭৭১ খৃঃ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিল। অতঃপর ১৭৯৩ খৃঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইলে প্রজার জীবনে কতকটা স্থিতিশীলতা দেখা দিল। পুরাতন রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে প্রজার দৃষ্টি কলিকাতার দিকে ফিরাইবার জন্য তাহারা ছোট বড় সকল আদালতকে সরাইয়া কলিকাতায় আনিয়া শাসন-ক্ষমতা নিজ আয়ত্তাধীন করিল। এইভাবে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়াও

নির্ম্মাণ ও প্রসারে মনোযোগী হন। ১৯৩০ খৃঃ লবণ আইন অমান্যের জন্য বাঙলায় যে কমিটি গঠিত হয় তাহার চতুর্থ সভাপতি হন। ইনি মোট সাড়ে এগার বৎসর কারাগারে যাপন করেন। ১৯৩২ খৃঃ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় পুলিস সাগর কুঠি জবর দখল করিয়া তথায় থানা স্থাপন করে। ১৯৪৫ খৃঃ জেল হইতে মুক্ত হইয়া ক্যাবিনেট মিশনের পরামর্শে যে গণপরিষদ গঠিত হয় তাহার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৮ খৃঃ আরামবাগ কেন্দ্র হইতে বিধান সভায় নির্ব্বাচিত হইয়া বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রী সভায় অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৫৮ ও ৬২ খৃষ্টাব্দের বিধান সভায় নির্ব্বাচনেও আরামবাগ কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া খাদ্য মন্ত্রী হন। ১৯৬২ খৃঃ জুলাই মাসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে মুখ্য মন্ত্রী হন।

ইংরেজ তাহার শোষণনীতি ও বাণিজ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিল না। তাহারা ক্রমাগত গঙ্গার ধারে ধারে কল-কারখানা স্থাপন করিতে লাগিল। গঙ্গা-বক্ষ ভেদ করিয়া বড় বড় বাণিজ্য জাহাজে তাহারা বিলাত হইতে সস্তা বিলাতী পণ্য আমদানী করিয়া কলিকাতার বাজার দখল করিয়া লইল। তখন গ্রাম হইতে বুদ্ধিজীবী বাঙালীরা কলিকাতায় ভিড় করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে শাসনকার্য্যে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজের সহায়তা করিয়া প্রভূত ধন-সম্পত্তির মালিক হইল। ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট হইয়া যাঁহারা হঠাৎ বড়লোক হইয়া পড়িলেন তাঁহাদের বিলাসব্যসন, খেয়ালখুশীর অমিতব্যয়িতার কিছু কিছু বিবরণ সেকালের অনেক ইংরেজ ও বাঙালী লেখক রাখিয়া গিয়াছেন। এই বড় লোকদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব। কোম্পানীর মুন্সী তেজাউদ্দিন খাঁর বদলে কোম্পানীর গভর্নর ড্রেক সাহেবের পারসীনবীশ নবকৃষ্ণকে মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুন্সী পদে নিযুক্ত করেন। কোম্পানীর পক্ষে আবেদন নিবেদন ষড়যন্ত্র সন্ধির সম্বন্ধে যাবতীয় লেখালেখি ও নবাব দরবারে যোগাযোগ করা ছিল মুন্সীর কাজ। ক্লাইব প্রথমে দিল্লীর দরবার হইতে নবকৃষ্ণকে রাজাবাহাদুর পরে মহারাজ বাহাদুর উপাধি আনিয়া দেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ হেষ্টিংসের আমলে তাঁহার ফরাসী ভাষার প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত হন। হেষ্টিংস গভর্ণর-জেনারেল হইয়া নবকৃষ্ণকে সমগ্র সুতানুটির জমিদার করিয়া দেন। তৎপর তিনি কলিকাতায় শোভাবাজারে বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রাজোচিত আড়ম্বরে বাস করিতে থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংরেজের সহিত সর্ব্বাধিক মেলামেশা করিয়াও তাহাদের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া তিনি দেশীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের স্থান পূরণ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত ও দেশী শিল্পী ও গুণী জ্ঞানীগণের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তজ্জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই জন্য তাঁহার বিস্তীর্ণ গৃহপ্রাঙ্গণ তাঁহাদের একটি বড় নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থলে পরিণত হইয়াছিল।[১]

১। তৎকালে আন্দুলের দেওয়ান রামচন্দ্র রায়, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং, কাশীমবাজারের কান্তবাবু প্রভৃতি সমসাময়িক প্রতিভাধারী ব্যক্তিগণের কেহই লোকপ্রিয়তায় নবকৃষ্ণের সমকক্ষ ছিলেন না।

১৭৬০ খৃঃ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রের ৫৮ বৎসর বয়সে মৃত্যুতে মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের যুগ সমাপ্ত হয়। কিন্তু ১৮৩০ খৃঃ কবি ঈশ্বর গুপ্তের খ্যাতি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আর কোন কাব্যাদর্শ প্রচলিত হয় নাই। এই সত্তর বৎসরের ব্যবধানের মধ্যে যাঁহারা বাঙলার কবিতার আসর দখল করিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন কবিয়াল, ভাটিয়াল, আউল-বাউল ও কীর্ত্তনীয়ার দল। ইঁহাদের মধ্যে কবিয়ালদের কাব্যরচনা আরম্ভ হয় 'আখড়াই সঙ্গীতে' ও শেষ হয় 'খেউড়ে'। আর এই কবিসঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব স্বয়ং। আখড়াই গান ছিল তানলয়-সমন্বিত। ইহার প্রথম গায়ক ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণের সভাসদ কুলুইচন্দ্র সেন ও তাঁহার ভাগিনেয় রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু—১৮৩৭ খৃঃ ৯৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়) এই গানকে যিনি জনপ্রিয় করিয়াছিলেন তিনিও রাজা নবকৃষ্ণের অপর একজন সভাসদ হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী— সঙ্গীতামোদী সমাজে যিনি হরু ঠাকুর নামে পরিচিত (১২১৮ বঙ্গাব্দে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়)। ক্রমশঃ রাজা নবকৃষ্ণের সাহায্য প্রত্যাশায় বাঙলার নানা স্থান হইতে বহু কবির দল কলিকাতায় আসিতে থাকে।

কবির গানে প্রথম প্রথম বিচিত্র সুরে বিচিত্র তানলয়ের সাহায্যে গান করাই ছিল প্রধান। প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণ অথবা হরপার্ব্বতীর কথা লইয়া গান হইত। দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে যাহারা গানে উৎকৃষ্ট হইত, সেই দলই বিজয়ীর সম্মান লাভ করিত। ক্রমশঃ গানের সুবিধার জন্য সুরবৈচিত্র্যকে সহজতর করিয়া বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসুর দ্বারা সৃষ্টি হইল 'হাফ্-আখড়াই' আরও পরে এই 'হাফ্-আখড়াই' উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিগানে পরিণত হয়। এই সময় আসিল 'দাঁড়া কবির' দল। ইহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই উপস্থিতমত গান রচনা দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া পালাগান গাহিত। কবিগান অশ্লীল আদিরসাত্মক হইলে তাহাকে 'খেউড়' বলা হইত।

এই সুদীর্ঘ ৭০ বৎসর মধ্যে যে সব খ্যাতনামা কবিওয়ালা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, লক্ষ্মী বিশ্বাস, ভোলা ময়রা, এণ্টুনী ফিরিঙ্গী, ভবানী সেন, মধুসূদন কাণ প্রভৃতি।

সে যুগের কবির লড়াইয়ে যে সকল কবি আসরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুখে মুখে নিজ অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তিবলে উপস্থিতমত উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন তাঁহাদের মধ্যে নামজাদা ছিলেন হরু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য বাগবাজারের ভোলা ময়রা।

ভোলা ময়রার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এণ্টুনী ফিরিঙ্গী। এণ্টুনী ছিলেন পর্ত্তুগীজ ক্রিষ্টিয়ান। বৌবাজারের এক বাঙালী মেয়েকে বিবাহ করিয়া একেবারে বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন। বাঙলা ভাষা আয়ত্ত করিয়া স্বভাবদত্ত কবি-প্রতিভাবলে তিনি উৎকৃষ্ট কবিওয়ালা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

এই কালেই শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) 'শব্দকল্পদ্রুম' সঙ্কলিত করিয়া যশস্বী হন। কবিওয়ালাদের পরেই দেখা দেন 'সংবাদপ্রভাকরের' বার্ত্তা লইয়া কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮০৭-৫৯ খৃঃ)। ঈশ্বর গুপ্তের রচনাভঙ্গীতে শব্দপ্রয়োগ ও অলঙ্কারবিন্যাসে অনেকটা ভারতচন্দ্রের ভাবভঙ্গীর আভাস পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্তই বোধ হয় শেষ খাঁটি বাঙালী কবি। অতঃপর যাঁহারা আসিলেন তাঁহাদের ভাব ও আদর্শ পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারা এবং আদর্শে সিক্তিত ও পরিপুষ্ট। ভাবে, চিন্তায়, আদর্শে ও কর্ম্মে সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মজীবনে মুক্তি আনিয়া দেওয়া যদি সাহিত্যের কাজ হয় তবে এই যুগের সাহিত্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙলা সাহিত্য একটা প্রগতিশীল নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এই যুগের আদি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' নামক সংবাদপত্রে কবি নিজের ও অন্যের অনেক কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপর মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩ খৃঃ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-৭৮ খৃঃ), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৪), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খৃঃ), বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৬-১৮৯৪ খৃঃ), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮ খৃঃ জন্ম) প্রভৃতি শক্তিশালী কবিগণ বাংলার গদ্য সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে বাঙলার মহাকাব্যের যুগ। আবার এই সময়েই রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৬-১৮৩০ খৃঃ), পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খৃঃ), 'আলালের ঘরের দুলালে'র রচয়িতা টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৮১৫-৭৬ খৃঃ), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২১-৮৭ খৃঃ), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪ খৃঃ), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০ খৃঃ), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ খৃঃ) প্রভৃতি সাহিত্য-রথীগণ গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পাদ্রী কেরী প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করিয়া বাঙলা গদ্যে বাইবেলের অনুবাদ ছাপাইয়া বাঙলা গদ্যে পুস্তক রচনার সূচনা করিয়াছিলেন (১৮০০ খৃঃ)। পরে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের বাঙলা ভাষা শিক্ষার্থ উক্ত কলেজের পণ্ডিত

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রাজীবলোচন রায় ও রামরাম বসুকে গদ্যে বাঙলা পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করেন। তদনুসারে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রাজীবলোচন রায় ও রামরাম বসু বাংলা গদ্যরচনার পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন।

বাঙলা গদ্যসাহিত্যের সেই শৈশব কালের সংস্কৃতবহুল বিদ্যাসাগরী ভাষা ও গ্রাম্য শব্দবহুল 'আলালী' ভাষার সমন্বয় সাধন করিয়া যিনি স্বচ্ছন্দগতি অভিনব বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি করিলেন তিনি বন্দেমাতরম মন্ত্রের ঋষি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ খৃঃ)[১]। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ইতিহাসের চরিত্র লইয়া বাঙলা উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খৃঃ) সারা বাঙলাদেশের শিক্ষিত সমাজে একটি নূতন আনন্দধারা বহাইয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাই বাঙলাভাষার প্রথম গদ্য কাব্য বা উপন্যাস। তারপর ক্রমে তাঁহার কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, ইন্দিরা প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস বাহির হইয়া উপন্যাস রচনার আর একদিক উদ্‌ঘাটিত করে। ক্রমে তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া আদর্শবাদ হিসাবে বাঙালীর সম্মুখে স্বদেশপ্রীতির এক অভিনব আদর্শ উপস্থিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রই হাস্যরসকে নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামি ও ইতরতা হইতে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। শুধু উপন্যাস রচনা নহে, তিনি প্রবন্ধ, সমালোচনা, 'বঙ্গদর্শনে'র ন্যায় মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার মধ্য দিয়া বাঙলা গদ্য সাহিত্যে একটি অভিনব ও সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য ও কৃষ্ণচরিত্র সাহিত্য হিসাবে অপূর্ব্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া এই সময়েই রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯ খৃঃ), দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭ খৃঃ), 'স্বর্ণলতা'-রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গবিজেতা, মাধবী কঙ্কন, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ আজিও আগ্রহের সহিত পঠিত হয়। বাঙলা ভাষায় যখন এই সব গদ্যপদ্য সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, সেই সময় মধুসূদন দত্ত ও রাজকৃষ্ণ রায় নাট্যসাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন। ক্রমশঃ দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রভৃতি নাট্যকারগণ বাঙলা ভাষায় নূতন নূতন নাটক রচনা করিয়া বাঙলা

১। ১৮১৭ খৃঃ ২০ শে জানুয়ারী কলিকাতায় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-সাহিত্য-ইতিহাস-চর্চ্চার প্রথম বিদ্যাপীঠ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হিন্দু কলেজেই মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষী শিক্ষা লাভ করেন।

সাহিত্যের এই দিকটি উদ্‌ঘাটন করেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের প্রভাবে বাঙলার কৃষকেরা নীলকর সাহেবদের অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভের জন্য আন্দোলন করে। বহরমপুরের রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭ খৃঃ) ভারত রহস্য প্রভৃতি অনেক গদ্যপদ্য গ্রন্থ এই সময়ে রচনা করেন।

বাঙলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রবর্ত্তিত তথাকথিত মহাকাব্যের যুগের অবসান ঘটিল বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী-প্রবর্তিত আধুনিক গীতিকবিতার যুগের সূত্রপাতে।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর দ্বারা বাঙলা রোমাণ্টিক গীতিকবিতা যে নূতন পথের সন্ধান পাইল সেই পথেই কবিতা লিখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, স্বর্ণকুমারী দেবী, অক্ষয়কুমার বড়াল, কামিনী রায় প্রমুখ কবিগণ বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্ত্তী যুগের কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

অতঃপর বিহারীলালের ভাবাদর্শকে নানারূপে নানাবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করিয়া বাঙলা কাব্যের ধারাকে বিশ্বসাহিত্যের ধারার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিরূপে খ্যাত। তাঁহার রচিত সাহিত্যের নূতন ভাষা, ভাব ও রচনাকৌশল বিশ্বের দরবারে বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্যকে সুপরিচিত করিয়াছে। তাঁহার জীবনের প্রায় দীর্ঘ ৬১ বৎসর কালকে মোটামুটি 'রবীন্দ্রযুগ' বলিয়া অভিহিত করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, অভিনেতা, দেশপ্রেমিক ও সমাজসংস্কারক। কিন্তু এই সকলেরও উর্দ্ধে ছিলেন উপনিষদের আধ্যাত্মিক ভাবপুষ্ট বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁহার রচনায় সাম্প্রদায়িকতা নাই— আছে বিশ্বমানবতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁহার রচিত সাধারণ ও শিশুমনস্তত্ত্বমূলক কবিতায়, গানে, উপন্যাসে, নাটকে, ছোট-গল্পে, প্রবন্ধে যেমন তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি চিত্রাঙ্কনে ও নাট্যাভিনয়ে, রাজনীতি ও সমাজচিন্তায় তাঁহার সযত্নসৃজিত শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মধ্যেও তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি ছিলেন সত্যের, সুন্দরের ও ন্যায়ের পূজারী, সাহিত্যের এমন কোন দিক নাই যাহা তাঁহার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠে নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন শব্দের, ধ্বনির, ছন্দের এবং ভাবের যাদুকর।

এই কালেই অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) বাঙলা কথাশিল্পে যুগান্তর আনয়ন করেন। দুঃখদৈন্যে জীর্ণশীর্ণ মধ্যবিত্ত ও

নিম্নবিত্ত বাঙালী জীবনের সুখদুঃখের নিখুঁত চিত্র শরৎচন্দ্রের নিপুণ তুলিকায় অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্র সম্ভবত আজ পর্য্যন্ত বাঙলা দেশের সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক।

বাঙলা সাহিত্যে 'রবীন্দ্রযুগ' পরিপূর্ণতা লাভ করে প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত 'সবুজপত্র' নামক পত্রিকার মাধ্যমে। প্রমথ চৌধুরী স্বনামে ও 'বীরবল' ছদ্মনামে বিবিধ পদ্য ও গদ্য রচনায় বাঙলা সাহিত্যে নবভাব আনয়ন করেন। চলিত গদ্যরীতি ও নূতন বুদ্ধিবাদের প্রবর্ত্তনায় এই পর্ব্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালের মধ্যেই 'রবীন্দ্রোত্তর' ভাবধারার বিকাশ ঘটিতে আরম্ভ করে। কাব্যের ক্ষেত্রে দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় রবীন্দ্রানুসারী ও রবীন্দ্র-বিরোধী দুই দল কবির কাব্যসাধনা বিংশ শতাব্দীর প্রায় চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা এই দুই বিপরীত ভাবাদর্শে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। রবীন্দ্রানুসারী কবিগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ কবিবৃন্দ উল্লেখযোগ্য। অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের উপর শ্রদ্ধাশীল থাকিয়াও নূতন ভাবাদর্শের অনুসন্ধান দেখিতে পাওয়া যায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজি নজরুল, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ কবিগণের কাব্য-চর্চ্চায়। এই কালের অন্যান্য কবি ও গীতকার হিসাবে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, রমণীমোহন ঘোষ, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী প্রভৃতি স্মরণযোগ্য।

এই যুগের মহিলা সাহিত্যিকরূপে অনুপমা দেবী, নিরুপমা দেবী, মানকুমারী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, সরোজকুমারী দেবী, সুকুমারী দাসী, অনঙ্গমোহিনী দেবী ইত্যাদির নামও বিশেষ বিখ্যাত।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ ও জলধর সেনের চিত্তাকর্ষক ভ্রমণকাহিনী বা উপন্যাসসমূহ এই সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। রঙ্গরসের কথাসাহিত্যিক রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' ছদ্মনামে গল্প রচনা করেন। এই হাস্যরসপ্রধান বা ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যের সূত্রপাত হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা। হাস্যরসপূর্ণ গান ও ব্যঙ্গ কবিতার লেখক হিসাবে বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামও করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন হইতেই আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে যে নূতনতর ভাবধারার আবির্ভাব ঘটিতেছিল তাহা পূর্ণতার পথে যাইতে থাকে তাঁহার তিরোধানের পরে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতেই 'অতি

আধুনিক' সাহিত্যের আন্দোলন আরম্ভ হয়। দুই প্রান্তে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয় আন্দোলনের নানা প্রবাহ, বিশ্ব সাহিত্য, আধুনিক নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেতনা সমাজ-পরিবার ইত্যাদিতে নূতন মূল্যবোধের প্রসার এবং ক্রমশ স্বাধীনতা লাভ, দেশবিভাগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের সাহিত্যের প্রত্যেক শাখায় নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। এই অতি-আধুনিক সাহিত্যে শুধু একটি আঞ্চলিক জীবনবৈশিষ্ট্য নহে, সচল বিশ্বের বিচিত্র ভাবধারা ছায়া ফেলিয়াছে। কথাসাহিত্য আধুনিক নব ভারতের নবীন গণজীবনের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে, কবিতা নব নব ভাবরসে মানবানুভূতির নানা সূক্ষ্ম ও জটিল স্তরকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গালয় আধুনিক সমস্যার চিত্র ফুটাইয়াছে। প্রবন্ধসাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শনের বিচিত্র ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করিয়া চলিয়াছে।

এই সকল আধুনিক সাহিত্যকারের মধ্যে কবি হিসাবে কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কথা-সাহিত্যিক হিসাবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, জগদীশ গুপ্ত, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ সেনগুপ্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম স্মরণীয়।

১৯৫০ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে মৌলিক অবদানকে পুরস্কৃত করিবার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারের প্রবর্ত্তন করেন। ১৯৫০ খৃঃ সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস 'জাগরী' ও ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব্ব'; ১৯৫১ খৃঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' ও আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের 'Life in Ancient India'; ১৯৫২ খৃঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' 'বাংলার সাময়িকপত্র' ও 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' এবং ডাঃ কালীপদ বিশ্বাস ও তিনকড়ি ঘোষের 'ভারতীয় বনৌষধি'; ১৯৫৩ খৃঃ ডাঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' (নব্যন্যায়চর্চ্চা); ১৯৫৪ খৃঃ শ্রীমতী রানীচন্দের 'পূর্ণকুম্ভ'; ১৯৫৫ খৃঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' ও রাজশেখর বসুর 'কৃষ্ণকলি' ইত্যাদি গল্পগুচ্ছ; ১৯৫৬ খৃঃ সমরেন্দ্র সেনের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রথম খণ্ড'; ১৯৫৭ খৃঃ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'The History and Culture of the Indian People' ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী' এই পুরস্কার লাভ করিয়াছে। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ

লিখিয়া দিল্লীর সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই পুরস্কার প্রায় প্রতি বৎসরই বিভিন্ন বিষয়ের বাঙালী লেখকগণ পাইয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রেষ্ঠ বাঙলা গ্রন্থের জন্য 'নরসিংহ দাস পুরস্কার' দেওয়া হয়।

কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি ছাড়া হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' ও 'উপনিষদে ব্রহ্মবাদ', আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ খৃঃ) চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯২৯ খৃঃ), আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাসায়নিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের একটি অঙ্ক সংশোধন করায় আইনষ্টাইন সেই সংশোধন স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার সেই তত্ত্বের নাম দেন "বোস আইনষ্টাইন ষ্টাটিসটিকস্"। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'সিরাজদৌল্লা' ও 'মীরকাশিম', স্তর যদুনাথ সরকারের আওরঙ্গজেবের ইতিহাস, শিবাজী, মোগল সাম্রাজ্যের পতন প্রভৃতি, রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌড় রাজমালা', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ও ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহ, নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'Coins and Chronology of Early Independent Sultans of Bengal' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। জেলার ইতিহাসের মধ্যে সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস', প্রভাসচন্দ্র সেনের 'বগুড়ার ইতিহাস' ও 'বারেন্দ্র কাহিনী', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', সুধীরচন্দ্র মিত্রের 'হুগলীর ইতিহাস', কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়ার ইতিহাস', নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস' অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। শেষোক্ত লেখকের বিখ্যাত 'বিশ্বকোষ' উল্লেখযোগ্য। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত', ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of Bengali Language', ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক শিল্পকলা।

ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে এদেশের শিল্পীগণ যে ধরনের শিল্পচর্চ্চা দ্বারা দেশের শিল্পভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিত তাহাতে পরানুকরণ ছিলনা, এবং তাহা দেখিয়া বিদেশীরাও মুগ্ধ হইত[১]। দেশের গৃহ ও মন্দির নির্ম্মাণ, মন্দির প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রাবলীতে, জীবনযাত্রার বহু আসবাবপত্রে, নানা জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, পত্র-পুষ্প ও ফলাদির রূপদানের ও দেবতা ও নরনারীর মূর্ত্তি গঠনের মধ্য দিয়া প্রাচীন ও মধ্য যুগের শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। এমনকি গ্রামের মাটির গৃহে গৃহস্থ রমণীগণের হাতের আলপনায় লতাপাতা ও মূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কনের মধ্যে যে শিল্পধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে এ দেশের মৌলিক শিল্পচর্চ্চার সাক্ষ্য মিলে। সমগ্র ভারতবর্ষে মোগল-রাজপুত-কাংড়া-অজন্তা রীতি ও পটচিত্র প্রভৃতিতে শিল্পকলার বিষয়বস্তু, রচনাকৌশল ও বর্ণলেপনে যে শিল্প পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতেও বৈদেশিক অনুকরণের কোন চিহ্ন নাই। কিন্তু ইংরাজ আমলে এদেশের শিল্পকলায় পাশ্চাত্যভাবের ছায়াপাত হয় এবং শিল্পীদের মনে শিল্পরচনার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্ত্তন আসে। অতঃপর দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় ধীরে ধীরে শিল্পীদের মনেও স্বাধীনতার পরিপোষক চিত্রাঙ্কনের স্পৃহা জন্মে। এই সময়ের শিল্পীদের চিত্রে ভারত জননীর মুক্তির কথা, একতার কথা, এদেশের লৌকিক ও পৌরাণিক কথা স্থান পাইয়াছে। এই শিল্পীদের মধ্যে পরলোকগত চিত্রশিল্পী সুরেশচন্দ্র বাগচীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতের বহু পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে চিত্রাঙ্কন করিয়া তিনি ও তাঁহার অনুগামীগণ দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল চিত্রশিল্পার বিষয়বস্তু ভারতীয় হইলেও তাঁহাদের অঙ্কন-পদ্ধতি ছিল পাশ্চাত্যভাবধারা-প্রসূত। বাঙলার বাহিরে রাজা রবিবর্ম্মা ও বোম্বাইয়ের ধুরন্ধরের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত দেশী ছবি এই সময় খুব খ্যাতি অর্জ্জন করে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনেই বোধহয় সর্ব্বপ্রথম বিষয়বস্তু ও অঙ্কনপদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় ভাবধারা

১। গুপ্তযুগের 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্' ও তৎপরবর্ত্তী 'শিল্পরত্নম্' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া আছে। তাহাতে কাপড়, দেয়াল, কাঠ ও লোহা প্রভৃতির উপর ছবি আঁকিবার উপদেশ দেওয়া আছে। কাগজ ও রেশমে পট আঁকার কথাও আছে।

প্রবর্ত্তনের কথা জাগ্রত হয়। স্বদেশী যুগের প্রথম দিকে উভয়ক্ষেত্রেই ভারতীয় রীতি বজায় রাখিয়া অবনীন্দ্রনাথ ভারতমাতার একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিলেন এবং তাহাতে জোর দিয়া রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিলেন "আমাদের যাত্রা হলো সুরু"। অতঃপর চিত্রজগতে বিলাতী ক্যানভাসে ধনীর প্রতিকৃতি, অর্দ্ধনগ্ন নারীমূর্ত্তি ও উলঙ্গ চিত্রাবলীর পরিবর্ত্তে জনসাধারণের কথা, রাজবন্দীদের কথা, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের কথা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, নাটকাদির কথা, চৈতন্যলীলার কথা প্রভৃতিকে বিষয়বস্তুরূপে চিত্রকরেরা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য নন্দলাল বসুর 'গান্ধিজির ডাণ্ডী অভিযান' এবং হরিপুরা কংগ্রেসের মণ্ডপ সজ্জার চিত্রগুলি ভারতের জনচিত্তে স্বাদেশিকতার তরঙ্গ তুলিল। পরলোকগত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় বসু প্রভৃতি চিত্রকরগণ আচার্য্য নন্দলালের অনুকরণে তাঁহাদের চিত্রে জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিতে লাগিল। ই, বি, হ্যাভেল নামক একজন শিল্পকলা-পারদর্শী ইংরাজের প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ ১৮৯৬ খৃঃ ভারতীয় শিল্প শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাহাতে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, মোগল ও রাজপুত শিল্পকলাকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষাদান করিতেন। মডেলিং, স্পেসিং, ডিজাইন ও কম্পোজিসন-এর মূল তত্ত্বগুলি তিনি ইউরোপীয় রীতি হইতে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু অন্য বিষয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যকে বজায় রাখিলেন। এখানের আদর্শে শিক্ষিত শিল্পীগণের চিত্রাঙ্কনে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা রূপায়িত হইয়া উঠিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত, মুকুল দে, ক্ষিতিশ মজুমদার প্রভৃতি শক্তিশালী শিল্পীবৃন্দ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ভারতের বাহিরে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠা লাভ হয় প্রথমে ১৯১৪ খৃঃ পারী নগরের প্রদর্শনীতে। ঐ বৎসর লণ্ডনেও তাঁহাদের চিত্র প্রদর্শিত হয়। তাহাতে প্রদর্শিত চিত্রগুলি খুব প্রশংসা লাভ করে। এইরূপে বাঙালীর প্রতিভায় ভারতে চিত্র শিল্পের নবজাগরণ সম্ভব হয়।

নাট্যাভিনয়।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' হইতে প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিনয় ও নাট্যশালার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সময় রঙ্গমঞ্চের নাম ছিল 'প্রেক্ষাগৃহ'। প্রাচীন ভারতে নামজাদা রাজাদের এক একটি প্রেক্ষাগৃহ থাকিত।

মধ্যযুগে গৌড়বঙ্গে ঐরূপ প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এখনকার যাত্রাগানে যেমন আসরে নামিয়া নাট্যাভিনয় করা হয় ঐরূপভাবের

নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল। বাঙলা দেশে নাট্যশালা ও মঞ্চাভিনয়ের উৎপত্তি ও বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীতে হইয়াছে। ইহা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফল। ১৭৯৫ খৃঃ হেরাসিম লেবেডফ নামক একজন রুশবাসী বাঙলায় প্রথম নাট্যশালা স্থাপন করিয়া 'The Disguise' ও 'Love is the Best Doctor' নামক দুইখানি ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনয় করান। তৎপর নবীন বসুর নাট্য প্রতিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৩১ খৃঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' ও ১৮৫৩ খৃঃ অরিয়েণ্টাল থিয়েটার পর্য্যন্ত নাট্যশালার প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়। অতঃপর ১৮৫৭ খৃঃ জোড়াসাঁকোর জমিদার মহাভারত-বঙ্গানুবাদক বিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজ বাসভবনে 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার' স্থাপন করিয়া 'বেণীসংহার নাটক', 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' ও 'মালতী মাধব নাটক' অভিনীত করান। ১৮৫৮ খৃঃ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির উদ্যোগে বেলগাছিয়ায় একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৮ খৃঃ ২১শে জুলাই 'রত্নাবলী' নাটিকার অভিনয় হয়। মাইকেল মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকও এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। অতঃপর রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' জোড়াসাঁকো রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফি, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, অমৃতলাল বসু, ধর্ম্মদাস সুর, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির চেষ্টায় ক্রমশঃ রঙ্গমঞ্চের উন্নতি ঘটে। বাগবাজারের অরুণচন্দ্র হালদারের বাড়ীতে 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয়ে নিমচাঁদের পাঠ অভিনয় করিয়া নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্ব্বপ্রথম খ্যাতি অর্জ্জন করেন। জোড়াসাঁকোর 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' সর্ব্বপ্রথম টিকিট বিক্রয় হয় (১৮৭২)। ইহার পর বিডন ষ্ট্রীটে পেশাদারী হিসাবে 'দি গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র সখের অভিনেতা ছিলেন। ১৮৮৩ খৃঃ বিডন ষ্ট্রীটে 'ষ্টার থিয়েটার' ও তাহার কিছু পরে 'এমারেল্ড থিয়েটার' স্থাপিত হয়। গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকের অভিনয় ষ্টার থিয়েটারে হইয়াছিল। এই সময় ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গল থিয়েটার' স্থাপন করেন। গিরিশ চন্দ্রের শেষজীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলির আবির্ভাব হয়। অতঃপর কলিকাতায় ও বাঙলার জেলায় জেলায় এমনকি অনেক বড় বড় গ্রামেও রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বাঙলা লিপির উৎপত্তি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ কোন ঘটনা দেখিলে তাহার ছবি আঁকিয়া রাখিত। ঐ ছবি দীর্ঘস্থায়ী করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা পাথরে আঁকিয়া রাখিত। মিশর দেশে ঐরূপ পাথরে আঁকা ছবি অনেক দেখা যায়। ইহাদিগকে "হিয়েরোগ্লিফিক" বা চিত্রলিপি বলা হয়। চীনদেশে আর এক প্রকার চিত্রলিপি প্রচলিত হয়। একটা মাছের ছবি আঁকিয়া তাহা দ্বারা মৎস্য জাতিকে, একটা গাছ আকিয়া বৃক্ষমাত্রকেই বুঝান হয়। তারপর বিশেষ বিশেষ মাছ কি গাছ বুঝাইতে হইলে, ঐ মাছ ও গাছের উপর বিশেষ বিশেষ দাগ লাগান হয়। চীনা ভাষায় প্রায় চল্লিশ হাজার শব্দ আছে। এক একটি শব্দে এক একটি অক্ষর। সুতরাং চীনে অক্ষরের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। মনের ভাব ও পৃথিবীর ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য আর এক প্রকার অক্ষরের সৃষ্টি হয়, তাহাকে 'কিউনিফরম' বা কীলকাক্ষর বলে। ইহাতে তীরের আগার মত দুইটা, তিনটা, চারটা করিয়া দাগ কাটিয়া মনের ভাব ও পৃথিবীর ঘটনাবলী প্রকাশ করা হইত। প্রাচীন ইরাকে এবং বোধ হয় দক্ষিণ ভারতে এইরূপ কীলকাক্ষর প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখনও প্রকৃত অক্ষর আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রায় ৫৫৮টি বিভিন্ন আকারের শিলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা পাঁচ হাজার বছরেরও অধিক পুরাতন। এই শিলমোহরগুলিতে যে লেখা অঙ্কিত আছে তাহা চিত্রমূলক। ইহাতে মনুষ্য, মৎস্য, তীর ধনুক, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতির চিত্র দৃষ্ট হয়। এখানকার লেখা পাথরের শিলমোহরে, তামার বা ব্রোঞ্জের ফলকে, পোড়ামাটির শিলমোহরের ছাপে ও মৃন্ময় পাত্রের গায়ে শক্ত চক্‌চকে মাটির বলয়ে দেখা যায়।

মিঃ সিডনী স্মিথ ও মিঃ গ্যাডগিল ঐ সকল লেখায় ৩৩৬টি চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন। এই লেখার মধ্যে একটি মূল চিহ্নের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই শীলমোহরের লেখায় সংযুক্ত বর্ণও আছে বলিয়া মনে করা হয়। এইগুলির মধ্যে কোন কোনটি বাম হইতে আরম্ভ করিয়া ডান সীমা পর্য্যন্ত যাইয়া তারপর দ্বিতীয় পংক্তিতে ডান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকের শেষ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ লেখাই ডান হইতে বামে। তখনও বোধ হয় কোন বর্ণমালার উদ্ভব হয় নাই, কারণ তাহা হইলে এত বহুসংখ্যক চিহ্ন আবশ্যক হইত না। এখানকার লিপির সহিত প্রাচীন সুমেরীয়, আদিম এলাম, প্রাচীন ক্রীট ও হিটাইটদের চিত্রাক্ষরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইষ্ট আয়ারল্যাণ্ড (পোলিনেসিয়া) ও চীনদেশের চিত্রাক্ষরের সহিতও

ইহার সাদৃশ্য আছে। অধ্যাপক ল্যাংডন ও স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহামের মতে এই সিন্ধু লিপি হইতেই ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হইয়াছে। সিন্ধু লিপিতে সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার ও উচ্চারণের সুবিধার জন্য চিহ্নাদির ব্যবহার হইত বলিয়া মনে করা হয়। এইগুলি ব্রাহ্মীলিপির চিহ্নের সহিত মিলিয়া যায়। তবে উভয়ের মধ্যে উচ্চারণের সাদৃশ্য আছে কিনা তাহা সিন্ধুলিপি পঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বলা সম্ভব নহে।

মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপ হইতে যে ২৯।৩০টি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া ডাঃ গুহ ও কর্ণেল স্যুয়েল তন্মধ্যে (১) ভূমধ্যসাগরীয় (দ্রাবিড়), (২) ককেশীয় (৩) আলপাইন ও (৪) মঙ্গোলীয়—এই চারিটি মানব গোষ্ঠীর সন্ধান পাইয়াছেন। এখানে নডিক গোষ্ঠীর সংস্রব ছিল কিনা তাহা বলা কঠিন। বোধ হয় তাম্রযুগের এই সহরগুলি আন্তর্জাতিক সহর ছিল এবং এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রাচীন ভারত, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের লোকদের ব্যবসাবাণিজ্যাদির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল। এই জন্যই বোধ হয় এখানকার লিপির মধ্যে ঐ সব দেশের লিপির কিছু কিছু সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

বিউলার প্রভৃতি পাশ্চাত্তা পণ্ডিতগণের মতে ফিনিকিয়গণ সর্ব্বপ্রথম অক্ষরের সৃষ্টি করে। তাহাদের অক্ষর সংখ্যা ছিল বাইশটি। তাহাদের এই অক্ষরগুলি বাহিরের ২২টি পদার্থের প্রথম অক্ষর লইয়া গঠিত। যেমন আলফা অর্থ ষাঁড়। এই অক্ষরটি দেখিতেও ষাঁড়ের দুইটি সিংএর মত। পারসী, আরবী, গ্রীক, রোমান, ইংলিশ, রাশিয়ান প্রভৃতি সকল পাশ্চাত্ত্য জাতির বর্ণমালা এই ফিনিকিয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত। বিউলার সাহেব বলেন মোয়াবাইট (Moabite) শিলালিপি (৮৯০ খৃঃ পূঃ) হইতে প্রাচীন ফিনিকিয়দের অক্ষরগুলি জানা গিয়াছে। এই ফিনিকিয় লিপির সহিত ব্রাহ্মী অ, ব, গ, দ, প, জ, ট, ত, ষ, ক, ল, ম, ন, এ, ফ, স, র অক্ষরগুলির সাদৃশ্য আছে। ইহা হইতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে ভারতের ব্রাহ্মী লিপিও ঐ ফিনিকিয় লিপি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ফিনিকিয় লিপিই বা কোথা হইতে আসিল? দুঃখের বিষয় আধুনিক পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিতগণ ভারতের দুর্দ্দিনের অবস্থাটাই দেখিয়াছেন। তাই বৈদিক আর্য্যরা যে এখানকার আদি অধিবাসীও হইতে পারেন এবং এখান হইতেই ইহাদের এক শাখা ইরানে এবং তথা হইতে ইরাক, মিশর, যবন প্রভৃতি দেশে যাইয়া তথায় তাঁহাদের ভাষা, লিপি প্রভৃতি সভ্যতার উপকরণ যোগাইতে পারেন এরূপ কল্পনা তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইত না। তাই তাঁহারা ভারতের মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের দেবদেবী, ভাষা, লিপি, শিল্পাদি সমস্তই বাহিরের কোন

স্থান হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করিতেন। আমরা এই গ্রন্থের ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় অনুমান করিয়াছি বৈদিক 'পণিগণেরই'[১] একাংশ ভারত হইতে ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ফিনিকদের পক্ষে তাহাদের ভাষা ও লিপি ভারত হইতে লওয়াই সম্ভব। এবং এই জন্যই বোধহয় ফিনিকীয় লিপির ২২টি অক্ষরের ১৭টি অক্ষরই ব্রাহ্মীলিপির সহিত মিলিয়া যায়। বোধহয় এ দেশের আদি লিপি চিত্রলিপিতে আরম্ভ হইয়াছিল। নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আদি দশমিক সংখ্যার ন্যায় ফিনিকীয় লিপি ও তাহার উৎকর্ষে ব্রাহ্মলিপির সৃষ্টি ভারতীয় আর্য্য মনীষার দান। এবং এই ব্রাহ্মী-লিপিই পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন লিপির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত। এই ব্রাহ্মী অক্ষরের ক্রমপরিণতির ফল বঙ্গলিপি।

স্যার জন মার্শাল বলেন সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনতম কাল ২৮০০ হইতে ৩০০০ খৃঃ পূঃ এবং ভারতে বৈদিক আর্য্যগণের আদিকাল ১৫০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে। সুতরাং তাঁহার মতে সিন্ধু সভ্যতা প্রাক্‌আর্য্য সভ্যতা। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ইণ্ডোলজিষ্টদের গুরু স্থানীয় স্বয়ং ম্যাক্সমূলার তাঁহার গিফোর্ড বক্তৃতায় (১৮৮৯ খৃঃ) বলিয়াছেন, Whether Vedic Hymns were composed 1000 or 1500 or 3000 year B. C., no power on earth will ever determine." উইণ্টারনিৎজ-এর মতে ২৫০০ পূঃ খৃঃ ঋগ্বেদের প্রাচীনতম কাল (History of Indian Literature)। অপর পক্ষে অধ্যাপক জ্যাকোবি-র মতে ঋগ্বেদের সময় ৪৫০০ পূঃ খৃ. ও অধ্যাপক জিমারম্যান হিন্দু বিবাহের ধ্রুবদর্শন পদ্ধতি হইতে অনুমান করেন যে ঋগ্বেদ রচনার কাল ২৭৮০ পূঃ খৃঃ হইতে ৩০০০ পূঃ খৃঃ।

অতএব সিন্ধু সভ্যতার কালেও পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে যে বৈদিক আর্য্যগণ বাস করিতেন ইহা অসম্ভব নহে। সম্প্রতিকালের খননের ফলে জানা গিয়াছে যে সিন্ধু সভ্যতার মত তাম্র যুগের সভ্যতা কেবল সিন্ধু ও পাঞ্জাবেই আবদ্ধ ছিল না। হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা, কৌশাম্বী, বর্দ্ধমানে, পাণ্ডু রাজার ঢিপি, ডায়মণ্ডহারবার, দেউলবাড়ী প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় নগর সমূহেও ইহার নিদর্শন

১। ঋগ্বেদের ৯।১১১।২, ১০।৬৭।৪, ও ১০।১০৮ সুক্তে বর্ণিত হইয়াছে পণি নামক অসুরগণের নেতা বলাসুরকে দেবরাজ ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও মরুদগণের সাহায্যে বধ করিয়া পণিগণের কবল হইতে দেবগণের গাভীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

পাওয়া গিয়াছে (এই গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং মার্শাল সাহেব কেবল সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন দৃষ্টে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা ভ্রান্ত বলিয়াই মনে করিতে হইবে। (I. H. Q. Vol VIII p. 122-164; ৪২৪পৃষ্ঠার পর ১—৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সাউথ ইষ্টার্ণ রেল পথের বেলপাহাড় ষ্টেশন হইতে ৭।৮ মাইল দূরে সম্বলপুর জেলায় বিক্রমখোল পাহাড়ের গায়ে খোদিত একটি সুপ্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ বিক্রমখোল লিপিরও পাঠোদ্ধার এখন পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন এই লিপির ১২।১৪টি অক্ষর সিন্ধুলিপির, ১৭।১৮টি অক্ষর ব্রাহ্মীলিপির ও ১০।১২টি অক্ষর খরোষ্ঠি লিপির অক্ষরের সদৃশ (I. Antiquary, March, 1933 ও প্রবাসী ১৩৪০ শ্রাবণ পৃঃ ৫৪৯)।

অশোকের লিপিগুলির মধ্যে মানসেরা ও সাহবাজগড়ীর লিপি খরোষ্ঠি অক্ষরে ও অবশিষ্ট লিপিগুলি ও মহাস্থানগড়ের লিপি ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত। পারস্ত সম্রাট দারয়বউশের (৫২২-৪৮৬ পূঃ খৃঃ) সাম্রাজ্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় তথায় পারস্তের খরোষ্ঠিলিপি প্রচলিত হইয়াছিল। এইজন্য অশোক তথায় খরোষ্ঠিলিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রাচীন পারসীক ভাষা ছিল বৈদিক ভাষার জ্ঞাতি। পাণিনি ব্যাকরণের ৩।২।২১ সূত্রে লিপি শব্দের উল্লেখ আছে। পারসী ভাষায় লিপিকে দিবি বলা হয়। প্রাচীন ভারতের সিন্ধুলিপির ও বিক্রমখোল লিপির ক্রমপরিণতিতেই বোধ হয় ভারতীয় পনিলিপি, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠি লিপির উদ্ভব হইয়াছে। অশোকের পর ৪০০ বৎসরে ব্রাহ্মীলিপিতে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহা কুশান যুগের লিপিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। কুশান যুগের লিপি পরিবর্ত্তন হইতে হইতে ৩০০ বছরে গুপ্তযুগের অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে প্রতি ৩।৪ শত বৎসরে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত (সম্ভবতঃ পালরাজগণের সময়ের, খৃঃ নবম দশম শতকের) নন্দীবংশের শিলালিপিতে (১৩২৬ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পৃঃ ১৯৭) এই পরিবর্ত্তন বেশ বুঝা যায়। মুসলমান বিজয়ের পর বাংলা লিপির ক্রমশ পরিবর্ত্তন হইতে হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় বঙ্গলিপির যে বিশিষ্টরূপ দান করেন, তাহাই এক্ষণে চলিতেছে।[১]

১। ১৮৫৩ খৃঃ ম্যাক্সমূলার সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙলার সংগীত

সংস্কৃত ভাষায় 'গীত' অর্থ গান ও 'সংগীত' অর্থ গান, বাদ্য ও নৃত্য। 'গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চত্রয় সংগীত মুচ্যতে।' নৃত্য আবার দুই প্রকার—তাণ্ডব ও লাস্য। পুং নৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রী নৃত্যকে লাস্য বলে। "তাণ্ডবঞ্চ তথা লাস্যং দ্বিবিধং নৃত্য মুচ্যতে। স্ত্রী নৃত্যং লাস্যমাখ্যাতং পুং নৃত্যং তাণ্ডবং স্মৃতং।

বাঙলা দেশের গান ও সংগীতের ইতিহাসে দুইটি প্রধান ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। একটি তাহার নিজস্ব ধারা যাহার পরিচয় পাই প্রাচীন পাল-রাজাদের সময়ের চর্য্যাপদ সমূহে, সেনরাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের কান্তপদাবলীতে ও মধ্যযুগের ধামালী ও পাঁচালী গানে, বড়ুচণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির কৃষ্ণকীর্ত্তনে, শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলীতে, মঙ্গলগানে, রামায়ণগানে, চণ্ডীরগানে, ভাটিয়ালী, কবিয়ালী, বাউল প্রভৃতি গানে। অপরটি তাহার সমাহৃত ধারা যাহা আধুনিক কালের নিধুবাবুর টপ্পা, বৈঠকী টপ্পা ও খেয়াল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ভারতীয় দাদরা ধামার ধ্রুপদ ঠুংরি প্রভৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে।

প্রাচীন চর্য্যাপদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী বজ্রযানীদের রহস্যময় প্রার্থনা গীতি। এই গীতগুলি গৌড়ী, মালসী, শবরী, মল্লারী, অরুগুর্জ্জরী, দেবক্রী, দেশাখী, ভৈরবী, বংগাল, বরাড়ী ইত্যাদি রাগে ও ইন্দ্রতাল ছন্দে নানারকম বংশীবাদন সহ গাওয়া হইত। গীতগোবিন্দের পদ গানেও নির্দ্দিষ্ট তাল, রাগ ও গীতশৈলী ছিল।

জয়দেবের পরেই মধ্যযুগের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির ভাব ও রসসমৃদ্ধ রাধা কৃষ্ণের সম্বন্ধীয় পদ গান বিশেষ বিশেষ রাগ, তাল, যতি প্রভৃতি সহযোগে অদ্যাপি গীত হইয়া বাঙালীর মনে অপূর্ব্ব ভাবোন্মাদনা জন্মায়। আবার এই কৃষ্ণ কীর্ত্তনের পটভূমিকায় গড়িয়া উঠিয়াছে শ্রীচৈতন্য যুগের পদাবলী কীর্ত্তন যাহা ভাবের গভীরতায় ও রসের মাধুর্য্যে কোন কোন স্থলে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করিয়াছে। বরেন্দ্রভূমির গড়েরহাট পরগণা ছিল ঠাকুর নরোত্তম

কর্ত্তৃক নাগরাক্ষরে প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ খৃঃ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তকে নাগরী অক্ষর গ্রহণ করে। তৎপূর্ব্বে বৈদিক ও লৌকিক সর্ব্ব প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ বিভিন্ন প্রাদেশিক লিপিতেই লিখিত হইত। এখনও পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ প্রায়ই প্রাদেশিক লিপিতে লিখিত হয়।

দাসের পৈতৃক জমিদারী। সেই গড়েরহাট পরগণার খেতুরী গ্রামের ঠাকুর নরোত্তম দাস বিলম্বিত ধ্রুপদরীতির ছন্দে আরও ভাবগম্ভীর সংযত ও সুগঠিত করিয়া কীর্ত্তনের যে বিশিষ্ট রীতি সৃষ্টি করিলেন তাহাই "গরানহাটি" নামে পরিচিত। পরে তাহারই বিবর্ত্তনে নূতন রূপ লইয়া আসিল রাঢ় বিভাগের ময়না-ডালের মিত্র ঠাকুরদের মনোহরশাহী কীর্ত্তনের ধারা এবং ক্রমশঃ ইহাদিগকে আদর্শ করিয়া আসিল রেনেটি, মন্দারিনী, ঝাড়খণ্ডী প্রভৃতি কীর্ত্তনশৈলী।

এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গল গান এবং শিবায়ণ, রামায়ণ ও যোগীগান প্রভৃতি গীতগুলিও তাহাদের বিশিষ্টরীতিতে গ্রামে গ্রামে পূজাপার্ব্বন উপলক্ষে পূজাপ্রাঙ্গণে গীত হইয়া বাঙালা সমাজের মনোরঞ্জন করিত। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সঙ্গীত শাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব তাঁহার 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে এই সকল গীতের কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙলার গীতি সম্পদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেনের শ্যামাসঙ্গীত এক অপূর্ব্ব অবদান। তা ছাড়া উমাসঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, কবিগান, যাত্রা, পাঁচালী, ভাটিয়ালী, তরজা প্রভৃতি লোকগীতি এবং বর্দ্ধমান রাজের দেওয়ান রঘুনাথ (১৭৫০ খৃঃ জন্ম), নদীয়ারাজ শ্রীশচন্দ্রের দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (জন্ম ১৮২০ খৃঃ), রামবসু, নিধুবাবু, দাশরথি রায়, রসিক চন্দ্র রায়, মনোমোহন বসু, শ্রীধর কথক, গোবিন্দ অধিকারী, গোবিন্দ চৌধুরীর ঢপখেয়াল শ্রেণীর গান, মধুকাণের ঢপকীর্ত্তন প্রভৃতি গান এককালে বাঙালী সমাজকে প্রভূত আনন্দ দান করিত। যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে ছিদাম, সুবল, পরমানন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, রামচন্দ্র অধিকারী, গোপাল উড়ে, মদন মাষ্টার, মতি রায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি বিখ্যাত ছিলেন। এই বিংশ শতকে বাঙলার গীতরচনার ও সংগীত সাধনের ক্ষেত্রে যে সকল দিকপালের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্ব্বোচ্চে। দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, রজনী কান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজি নজরুল প্রভৃতির গানও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাদের সকলেরই গানের মধ্যে যে দেশাত্মবোধ, কাব্যসৌন্দর্য্য ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার পরিচয় আছে তাহা অনন্যসাধারণ। অভিজাত শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশ প্রচলিত সকল রকম সুর, ছন্দ ও রাগরাগিণী রবীন্দ্রনাথের গীত রচনায় স্থান লাভ করিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি গানে কথা ছন্দ ও সুরের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার গানের ভাবে, সুরে, ছন্দে, তালে একটা নিজস্ব রীতি ও বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নাট্য ও উপন্যাসের মধ্যেও সেই বিশিষ্টতা বিদ্যমান। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন আর একজন গীতিকার ও

নাট্যকার। তাঁহার গানে পাশ্চাত্য রচনা ও সুরের প্রভাব বিদ্যমান। তাঁহার হাসির গানগুলি বাঙলার সংগীত সাহিত্যে অতুলনীয়। রজনীকান্ত ও অতুল প্রসাদের গানগুলিও রসোত্তীর্ণ ও আধ্যাত্মিক আবেদনপূর্ণ। কবি নজরুলের গান যেমন তেজোদীপ্ত, তেমনি মনোহর, দেশপ্রেমের আধার ও প্রগতিশীল ভাবপূর্ণ।

১৪২৮ খৃঃ (১৩৫০ শকাব্দ) রচিত 'সঙ্গীত শিরোমণি' নামক একখানি প্রাচীন গীতগ্রন্থের নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। ১৮১৮ খৃঃ "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক একখানি বাঙলা গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার ২৪ বৎসর পর কৃষ্ণানন্দ ব্যাস সঙ্কলিত "সংগীত রাগকল্পদ্রুম" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং ১৮৪৯ খৃঃ মধ্যে ক্রমশঃ ইহার অপর খণ্ডগুলি মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বহুদেশের গীত সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার তৃতীয় খণ্ডে বাঙলা গান সংগৃহীত হইয়াছে। এই তৃতীয় খণ্ডের একখানি গ্রন্থ বেঙ্গল ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে। এই তৃতীয় খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে নানা রাগরাগিণী ও তালের পরিচয়, রাগাধ্যায়, তালাধ্যায়, নৃত্যাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, গানাধ্যায় প্রভৃতি অধ্যায় আছে। শেষে 'স্বর প্রস্তাবাধ্যায়ে' নানা সার্গম, রাগরাগিণী, রাগালাপ, স্বরপ্রস্তাব, উড়ব রাগ স্বর প্রস্তাব, সপ্তস্বর রাগস্বর প্রস্তাব, ধ্রুপদের স্বরগ্রামের ২৩টি বিভিন্ন রাগের স্বর পরিচয় আছে। ইহাতে নির্গুণ গান (ব্রহ্মসংগীত) ও রঙ্গীন গান (টপ্পা ঠুংরি প্রভৃতি) ইত্যাদি ৯৫০টি বাঙলা গান আছে। গ্রন্থের রচয়িতা রাজপুতানার অধিবাসী ছিলেন (জন্ম ১৭৯৪ খৃঃ)।

১৮৪৬ খৃঃ নিধিরাম গুপ্তের (নিধুবাবু) গানগুলি সংগৃহীত হইয়া 'গীত রত্ন' নামে প্রকাশিত হয়। তৎপর 'বিশ্ব সংগীত' নামে একখানি সংগীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন মুদ্রা

মানব সমাজের আদিম অবস্থায় আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহের উপায় ছিল 'বিনিময় প্রথা'। পরে ইহাকে সহজ করিবার জন্য 'মুদ্রার' আবিষ্কার হয়। স্বর্ণ, রজত ও তাম্র প্রধানতঃ এই তিন ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রাই প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে লৌহ, সীসক, পিত্তল ও টিন নির্ম্মিত মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। গ্রীস দেশের স্পার্টানগরে লৌহ মুদ্রা, মলয় উপদ্বীপে টিনের মুদ্রা, চীনে পিত্তল মুদ্রা ও দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্ররাজ্যে সীসক মুদ্রা ব্যবহৃত হইত।

ধাতব মুদ্রা ব্যবহারের প্রথম অবস্থায় 'স্বর্ণ চূর্ণ' (gold dust) মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগণের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল। স্বর্ণ মুদ্রার নাম স্বর্ণ বা নিষ্ক, রৌপ্য মুদ্রার নাম পুরাণ বা ধরণ, তাম্র মুদ্রার নাম কার্ষাপণ ছিল। বেদে ও মনুসংহিতায় 'নিষ্ক' নামক স্বর্ণ মুদ্রার উল্লেখ আছে (ঋকসংহিতা ৩।৪।৭৪, ২।৩৩।৩০ ; মনুসংহিতা ৮ অঃ। ১৩২-৩৭ শ্লোঃ)। প্রাচীন স্বর্ণ বা নিষ্কমুদ্রা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ চতুষ্কোণ ও গোলাকার প্রাচীন পুরাণ বা ধরণ ও কার্ষাপণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রাবস্তীবাসী শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ রাজকুমার জেতকে তাঁহার জেতবন আবৃত করিতে যে পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা আবশ্যক তাহা অর্থাৎ অষ্টাদশ কোটি চতুষ্কোণ নিষ্কমুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহার জেতবন ক্রয় করতঃ তথায় ভিক্ষুগণকে জেতবন বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বেষ্টনীর একটি স্তম্ভগাত্রে ও মধ্যভারতে নাগোড় রাজ্যে বরহুৎ স্তূপে জেতবনকে চতুষ্কোণ স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারা আবৃত করিবার দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত আছে।

আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তীকালে গান্ধার সীমান্তে সৌভূতি নামক একজন হিন্দু রাজা ছিল। তাঁহার মুদ্রায় গ্রীক প্রভাব দৃষ্ট হয়। এই মুদ্রার গাত্রে রাজার মূর্ত্তির নীচে গ্রীক বর্ণমালায় রাজা সোফাইটিশ-এর (Sophytis) নাম দৃষ্ট হয়। ভারতীয় ও গ্রীক আদর্শের সমন্বয়ে নির্ম্মিত গান্ধার অঞ্চলের পংতলেব (Pantaleon) নামক এক হিন্দু-গ্রীক নৃপতির (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রার আকৃতি 'পুরাণ' মুদ্রার ন্যায়। ইহার একদিকে ভারতীয় সিংহমূর্ত্তি ও গ্রীক অক্ষরে রাজার নাম Basileos Pantaleontos ও অপর দিকে ডানহাতের নীচে পদ্মাসনা স্ত্রীমূর্ত্তি ও ব্রাহ্মী অক্ষরে প্রাকৃত ভাষায় 'রাজনে পতলেবস' অঙ্কিত আছে। হিন্দু গ্রীক রাজাদের পরে মধ্য এশিয়ার ইরানী গোষ্ঠীভুক্ত কুশান রাজাদের মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহাদের মুদ্রার একদিকে বর্ম্ম, বর্শা ও পাদুকাধারী অগ্নিবেদীতে উপাসনারত রাজমূর্ত্তি ; অপরদিকে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইরাণী অথবা গ্রীকদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। মুদ্রার গায়ে পহ্লবী ভাষায় গ্রীক অক্ষরে লিখিত বিবরণী।

কনিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতকে পুরুষপুরে রাজধানী করিয়া যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ধ্বংস হইলে কণিষ্কের বংশধরগণ আফগানীস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সপ্তম খৃষ্টাব্দে হিউএনসাঙ ও দশম খৃষ্টাব্দে মুসলমান পণ্ডিত আবু রিহান আলবিরুণী আফগানিস্থানের রাজগণকে কনিষ্কের বংশধর

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আলবিরুণী লিখিয়াছেন কনিষ্কের শেষ বংশধরকে তাঁহার হিন্দু মন্ত্রী কল্লর [রাজতরঙ্গিনীর মতে 'লল্লিয় শাহি'] সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হন। এই শাহি বংশের রাজধানী প্রথমে কাবুলে ছিল। তুর্কী মুসলমানগণ ইয়াকুব লাইসের নেতৃত্বে ২৫৭ হিজরিতে (৮৭০-৭১ খৃঃ) কাবুল অধিকার করিলে শাহিরাজবংশ উদ্ভাণ্ডপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। কহ্লন শাহিরাজগণের মধ্যে লল্লিয়ের পুত্র কমলুক (আলবিরুণীর কমলু) ভীম শাহি ও ত্রিলোচন পাল শাহির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিলোচন পাল গজনীরাজ মাহমুদ কর্ত্তৃক তোষি নদীতীরে পরাজিত হইলে তাঁহার পুত্র ভীম পাল ৫ বৎসর কাল স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর এই শাহি রাজবংশ লুপ্ত হয় (রাজতরঙ্গিনী ৭।৬৩-৬৭ শ্লোঃ)। এই বংশের একটি মুদ্রার একদিকে সিংহ ও অপর দিকে ময়ূরের মূর্ত্তি ও রাজার নাম 'শ্রীকমর' অঙ্কিত আছে। ইহা সম্ভবতঃ কমলু বা কমলুকের মুদ্রা। হস্তী ও সিংহযুক্ত কয়েকটি তাম্র মুদ্রায় 'শ্রীপদম' 'শ্রীবক্কদেব' ও 'শ্রীসামন্তদেব' নামক রাজ-নাম খোদিত আছে। এই বংশের স্পলপতি দেব, বক্ক দেব ভীম দেব ও খুড়বয়কের রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রার একদিকে বৃষ, অপর দিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। উদ্ভাণ্ড পুরের শাহি মুদ্রার অনুকরণে পরবর্ত্তীকালে আর্য্যাবর্ত্তের অনেক রাজবংশ মুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তোমর বংশ প্রধান। শাহি ত্রিলোচন পালকে পরাজিত করিয়া মাহমুদ নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় রজতমুদ্রা প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রার একদিকে আরবী ভাষায় লিপি আছে, অপর দিকে নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় "অব্যক্তমেব মহম্মদ অবতার নৃপতি মহম্মদ" ও চতুর্দ্দিকে "অয়ংটঙ্কঃ মহমদপুর ঘটিতে হিজিরিয়েন সম্বতি ৪১৮" খোদিত আছে (Cunningham, Coins of medieval India p. 65-66 No. 21)। খৃষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতকে গুপ্ত রাজগণ যে সকল মুদ্রা প্রচলন করেন তাহাতে যথেষ্ট শিল্পসৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের বহু প্রকারের বহু সংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৃটিশ মিউজিয়ম কর্ত্তৃক প্রকাশিত জন এলেনের "Catalogue of Gupta Coins" ও রাখাল বাবুর 'প্রাচীন মুদ্রা' নামক গ্রন্থে গুপ্তদের অনেকগুলি মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। C. G Brown এর The Coins of India নামক গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমান যুগের অনেকগুলি মুদ্রার চিত্র দেওয়া আছে। ডাঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালীর Coins & Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal-এ বাঙলার স্বাধীন সুলতানগণের অনেকগুলি মুদ্রার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মোগল সম্রাটগণের অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

তন্মধ্যে আকবরের একটি মুদ্রায় বাজপাখীর, আর একটিতে হাঁসের ও অপর একটিতে রাম সীতার মূর্ত্তি অঙ্কিত ও নাগরাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইংরাজ আমলে কলিকাতায় ১৮২৪ খৃঃ ইংরেজেরা টাকশাল প্রতিষ্ঠিত করে। ও তাহাতে ১৮২৯।১লা আগষ্ট হইতে ইংলণ্ডের রাজাদের মস্তকের ছাপ সহ স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত হইতে থাকে। পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও টাকশাল স্থাপিত হয়। ভারত স্বাধীন হইবার পর ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে আলীপুরে একটি বৃহদাকার টাকশাল স্থাপিত হইয়াছে। তথা হইতে সারনাথের অশোক স্তম্ভের উপরিস্থ সিংহমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা মুদ্রিত হইতেছে।

গ্রন্থাগার, মুদ্রাযন্ত্র ও সাধারণ পাঠাগার।

শেষ অসুররাজ আসুর বনীপাল (খৃঃ পূঃ ৬৬৮-৬২২) মাটির টালিতে লিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থাগার করিয়াছিলেন। বাবিলোনিয়ার নিপুর নগরের ধ্বংসস্তুপের নীচে প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বেকার মন্দির মধ্যে সারি সারি মাটির সেল্‌ফে সাজান প্রায় ২৫০০০ নানা বিষয়ক মৃৎলিপির একটি গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ২৮৩ খৃষ্টাব্দে টলেমি সোডার ও তৎপুত্র টলেমি ফিলাডেল-ফাস আলেকজেন্দ্রিয়ায় যে বৃহৎ গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাতে হাতে লিখা প্রায় সাত লক্ষ পুস্তক ছিল। জুলিয়াস সিজর (খৃঃ পূঃ ১০০-৬৫) এই গ্রন্থাগারের ও গ্রীসের ইউরিপিডিসের লাইব্রেরীর গ্রন্থগুলি আনিয়া রোমের 'এট্রিয়াম লিবারণ্টাটিস গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। ৪০০ খৃঃ রোমে এইরূপ ২৮টি গ্রন্থাগার ছিল। ইহাতে ত্রিশ হইতে ষাট হাজার গ্রন্থ ছিল। এসিয়া মাইনরের পার্গামন সহরের গ্রন্থাগার ও বাগদাদ সহরে খলিফা মামুন ও হারুণ অল্ রসিদের গ্রন্থাগার বিখ্যাত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রন্থাগার দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় বিদ্যামহাপীঠ সমূহের মধ্যে সুপ্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। তক্ষশীলা প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাওলপিণ্ডি নগরের ২০ মাইল দূরে ছয় মাইল ব্যাপিয়া ইহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ষ্ট্রাবো, প্লিনী, আরিয়ন প্রভৃতি গ্রীক লেখকগণ তক্ষশীলার বিদ্যাগৌরবের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। মহামতি পাণিনি ও মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। হিউএনসঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে তৎকালে তক্ষশিলায় অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ ছিল। কথিত আছে যে, মহারাজ অশোক পাটলীপুত্রের ত্রিশ মাইল দূরে বর্ত্তমান বড়গাঁ নামক স্থানে একটী

বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করেন। তাহা 'নরেন্দ্র বিহার' ও পালি ভাষায় 'নালন্দা বিহার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিউএনসঙ লিখিয়াছেন, এখানকার 'রত্নোদধি' নামক একটি নয়তলা সুবৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। গৌড়ের পালরাজাদের আমলে মগধে বিক্রমশীলা ও ওদণ্ডপুরী ও বরেন্দ্রে 'জগদ্দল' ও সোমপুর মহাবিহারের বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। মধ্যযুগে নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভট্টপল্লী, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের চতুষ্পাঠীসমূহেও গ্রন্থালয় ছিল কিন্তু উপরোক্ত গ্রন্থালয়গুলি হস্তলিখিত পুঁথি দ্বারা সজ্জিত থাকিত। তাহা অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ব্যতীত সাধারণের আয়ত্তাধীন ছিল না।

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও তৎসাহায্যে মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলনের পরেই সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। ১৭৭৮ খৃঃ হিকি সাহেব হুগলী সহরে ও ১৭৮০ খৃঃ গ্লাডউইন সাহেব কলিকাতায় ও ১৮০০ খৃঃ পাদ্রীকেরি শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করার পর আমরা পাণ্ডুলিপির যুগ হইতে মুদ্রিত গ্রন্থের যুগে পদার্পণ করি। ১৮৩৫ খৃঃ মিঃ জন গ্রান্টের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলের এক সভায় কলিকাতা সহরে একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তজ্জন্য একশতজন সাহেব প্রত্যেকে তিন শত টাকা হিসাবে ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন (সমাচার দর্পণ ১৮৩৫।১২ সেপ্টেম্বর)। তদ্দ্বারা একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৮৩৯।১৬ ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বিশিষ্ট ধনীরা এক সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ঐ পুস্তকালয়ে ১৮০০ খানি মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হয়। অতঃপর ক্রমশঃ কলিকাতা ও মফঃস্বলে বহু সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পর সংবাদপত্র ও মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। উপরোক্ত হিকি সাহেব একটি গেজেট ও গ্রান্ট সাহেব 'কলিকাতা গেজেট' প্রচার করেন। ১৮১৮ খৃঃ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কলিকাতায় 'বাঙ্গালা গেজেট প্রেস' ও 'বাঙ্গালা গেজেট' প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর ১৮২৯ খৃঃ 'বঙ্গদূত পত্রিকা' ও তাহার কিছুপূর্ব্বে 'সমাচার দর্পণ' 'কলিকাতা গেজেট' 'ইণ্ডিয়া গেজেট' প্রভৃতি প্রচারিত হয়। শোভাবাজারে একটি বটগাছের ছায়ায় কবিওয়ালাদের আসর বসিত। কালক্রমে এইখানে বটতলার ছাপাখানাগুলি স্থাপিত হয়। ১৮১৮-২০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথ দেব সর্ব্বপ্রথম 'বটতলা'র ছাপাখানা স্থাপন করেন। তৎকালে এই 'বিশ্বনাথ প্রেস' ব্যতীত কলিকাতায় 'বাঙ্গালী প্রেস' 'সংস্কৃত প্রেস' ও 'হিন্দুস্থানী প্রেস' নামক আরও তিনটি প্রেস ছিল। এইরূপে ক্রমশঃ ছাপাখানা ও সংবাদপত্রসমূহে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ ছাইয়া যায়। বটতলার ছাপাখানা হইতে প্রাচীন ও মধ্য যুগের অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছাপা হইয়া কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

বটতলার গ্রন্থ বলিয়া একালের মানুষের মনে যে অবজ্ঞার ভাব রহিয়াছে তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই সকল গ্রন্থ আমাদের দেশে জনশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বাহন হইয়াছে। অনুরূপ কারণে 'বঙ্গবাসী প্রেস' ও 'বসুমতী' প্রকাশন সংস্থার নামও স্মরণীয়॥

সমাপ্ত